অর্থ-তত্ত্ব

হরশংকর ভট্টাচার্য,

চ্যা টা র্জি পা ব্‌ লি শা স'
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

Published by
B. Chatterji
for Chatterji Publishers,
15, Bankim Chatterji Street,
Calcutta-12

দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ, ১৯৬৫

Printed by
S. Chatterji,
Chatterji Printers,
26, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-5

১

জাতীয় আয়

National Income

সামগ্রিক বিশ্লেষণ নীতি বা সমষ্টিভিত্তিক ধনবিজ্ঞান (Aggregative analysis or Macro Economics)

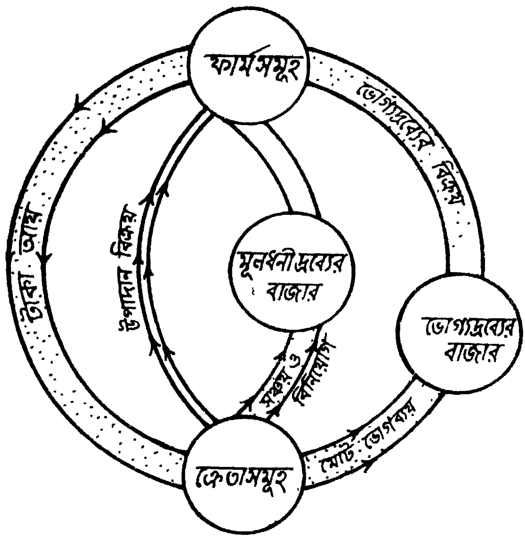
কোনো দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক দেহের গতিবিধির দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই যে ছোট বড় নানাবিধ উৎপাদক ফার্ম এবং অসংখ্য ছোট ছোট ক্রেতা লইয়া এই দেহ গঠিত। যে সকল সংগঠন দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে ও বিক্রয় করে তাহাদের ফার্ম বলা হয়। সমাজে বিভিন্ন প্রকার জিনিসপত্র উৎপাদন ও বিক্রয় করার জন্য অসংখ্য ফার্ম রহিয়াছে। এই ফার্মগুলির কোনোটি ছোট কোনোটি বড়, কোনোটি ব্যক্তিগত মালিকানায়, কোনোটি অংশীদারী অথবা যৌথ মূলধনী। ঠিক সেইরূপ, সমাজে অসংখ্য ক্রেতা আছে, প্রত্যেকের আয় ও রুচির পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন পরিমাণের জিনিসপত্র তাঁহারা ক্রয় করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, এই ক্রেতারা ঐ সকল বিভিন্ন ফার্মে নিজেদের উপাদান যোগান দিয়া আয় করিতেছে। সেই আয় হইতে তাহারা নিজ নিজ ক্ষমতা ও অভিরুচি অনুযায়ী সঞ্চয় করিয়া অবশিষ্ট অংশ ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিতেছে।

অর্থনৈতিক দেহের দুইটি হাত : ফার্ম ও ক্রেতা

ফার্মগুলির এবং ক্রেতাদের এই কাজকর্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত তাগিদে, নিজের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য অনুযায়ী, নিজ নিজ কক্ষে কাজ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন কাজগুলির মধ্য দিয়াই সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর ও টাকার বিভিন্ন স্রোত দেখা দিতেছে। ফার্মগুলি যখন শ্রমিক ক্রয় করে তখন প্রতিটি ফার্ম পৃথক ভাবে নিজের আর্থিক অবস্থা চিন্তা করিয়া শ্রমিক-নিয়োগের সিদ্ধান্ত লয়। কিন্তু সকল ফার্মের মিলিত সিদ্ধান্তের ফল হইল সমাজে কর্মসংস্থানের স্তর। তাঁহারা যে-পরিমাণ টাকা দিয়া ঐ শ্রমিকদের নিয়োগ করেন উহাই ক্রেতা-গোষ্ঠীর হাতে মোট আয় হিসাবে চলিয়া যায়। সেই আয় হইতে কিছু অংশ সঞ্চিত রাখিয়া বিভিন্ন ভোগ্য দ্রব্যে ক্রেতারা ব্যয় করেন। সঞ্চিত

টাকা বিভিন্ন প্রকার মূলধনী দ্রব্যের জন্য চাহিদা সৃষ্টি করে। এইরূপে সমাজে দেখা দেয় মোট ভোগব্যয় ও মোট বিনিয়োগ। ফার্মগুলি মোট যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনে উহাদের ক্রয় করে ক্রেতারা, সবটা কিনিতে পারিল কিনা তাহা নির্ভর করে ক্রেতারা মোট কতটাকা ভোগব্যয় করিতে চাহিতেছে, উহার উপর। নীচের ছবি হইতে জিনিষটি বুঝা যাইবে।

ইহাদের কাজকর্ম হইতেই দেখা দেয় টাকার স্রোত



উপরের ছবি হইতে আমরা দেখিতে পাই বিক্ষিপ্ত ফার্ম এবং ক্রেতাদের পৃথক পৃথক কাজকর্মের মধ্য দিয়া কতকগুলি বিশেষ প্রকার টাকার স্রোত সমাজে দেখা দিতেছে, যেমন উপাদান সমূহের আয় বা জাতীয় আয়, মোট ভোগব্যয়, মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রভৃতি। এক এক দিকের টাকার স্রোত-কে আমরা এক একটি 'সমষ্টি' (Aggregate) বলিয়া মনে করিতে পারি। জাতীয় আয়, মোট ভোগব্যয়, মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রভৃতি এইরূপ এক একটি সমষ্টি। সমাজে বিভিন্ন প্রকার আয় ও রুচির ক্রেতা আছে, নির্দিষ্ট সময়ে তাহাদের মধ্যে কে কেন কত পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেছে বা সঞ্চয় করিতেছে তাহাতে অনেক পার্থক্য আছে। এই সকল ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলি হিসাবে না আনিয়া আমরা সমষ্টিগত ভাবে মোট ভোগব্যয় বা মোট সঞ্চয়ের কথা চিন্তা করিতে পারি। একক কোনো ফার্ম বা একক কোনো ক্রেতার আচরণ দিয়া এই সকল সমষ্টির উঠানামা ও

পরিবর্তনের রূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। ইহারা ফার্ম ও ক্রেতাদের সর্বজনীন বা একত্রীভূত রূপ।*

টাকার স্রোতের এই সকল বিভিন্ন সমষ্টি লইয়া এবং উহাদের উঠানামার কারণ বিশ্লেষণের জন্য যে সকল অর্থনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে তাহাদের বলে সমষ্টিমূলক অর্থনীতি বা ম্যাক্রো-অর্থনীতি (Macro-Economics)। ম্যাক্রো কথাটি গ্রীক্ ভাষায় 'বৃহৎ' শব্দটি বুঝায়। অর্থনীতির এই বিভাগ নবজাত হইলেও এই দৃষ্টিভঙ্গী মোটেই নূতন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফিজিয়োক্র্যাটগণ যখন সম্পদের স্রোতধারার গতি বিশ্লেষণ করিতেছিলেন তখন তাঁহারা সমাজকে তিনটি 'শ্রেণীতে' বিভক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ম্যাক্রো-অর্থনীতির সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক হইল কেইনসের লেখা, "General theory of employment, interest and money."

ম্যাক্রো-অর্থনীতি কাহাকে বলে

সমষ্টিমূলক অর্থনীতির বিপরীত হইল এককভিত্তিক অর্থনীতি বা Micro-economics ; গ্রীকভাষায় মাইক্রো শব্দটির অর্থ হইল 'ক্ষুদ্র'। একক ভিত্তিক অর্থনীতিতে আমরা বিশেষ কোন একটি দ্রব্যের বাজার, সেই দ্রব্যটির দাম, একক কোন ক্রেতা বা ফার্ম প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করি। সমষ্টিমূলক অর্থনীতিতে আমরা মোট দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনের স্তর বা মোট জাতীয় উৎপাদন লইয়া আলোচনা করি। এই সময়ে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের ও যে বিভিন্ন প্রকার জিনিসপত্র লইয়া এই জাতীয় উৎপাদন গঠিত, (যেমন চেয়ার, টেবিল, চা, কফি, জামা, জুতো, গাড়ি প্রভৃতি) উহাদের দিকে তাকাই না। মাইক্রো-অর্থনীতিতে আলোচনার পদ্ধতি ইহার ঠিক বিপরীত। সেখানে আমরা আলোচনা করি কেন X লক্ষ চেয়ার উৎপন্ন হইয়াছে, কেন Y লক্ষ টন চা উৎপাদন হইয়াছে। ম্যাক্রো-অর্থনীতিতে আলোচনা করি কেন দাম-স্তর (সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড়) ঐ স্তরে আছে এবং কেন উহাতে কিরূপ পরিবর্তন আসিয়াছে। মাইক্রো-অর্থনীতিতে আমরা ধরিয়া লই সমাজের মোট উৎপাদন সমান আছে, এই

মাইক্রো ও ম্যাক্রো আলোচনার পরিধি

* উপরের এই ছবিটি হইতে আমরা আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারি : উহা হইল দ্রব্যের বাজার ও টাকার বাজারের সম্পর্ক (relation between commodity market and money market)। উৎপাদকেরা যখন বেশি টাকা চায় তখন তাহারা বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়। আগের তুলনায় টাকার চাহিদা বাড়িয়াছে বলিলে বুঝা যায় সে দ্রব্যের বাজারে বেশি যোগান দিয়া বেশি টাকা পাইবার চেষ্টা করিতেছে। 'টাকার জন্য চাহিদা' কথাটির তাৎপর্যই হইল বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বাড়া। আবার

অবস্থায় একটি দ্রব্যের বাজারে চাহিদা ও যোগান বদ্‌লায় কেন, দাম-ই বা কিরূপে, কতটা, এবং কোন্‌দিকে উঠানামা করে। মাইক্রো-অর্থনীতি ধরিয়া লয় যে আলোচনার সময়ে এই সকল "অন্যান্য বিষয় সমান আছে"।

এই প্রসঙ্গে, তত্ত্বের দিক হইতে আমাদের একটি বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন। ধরা যাউক আমরা কোনো একটি বিশেষ ফার্ম বা বিশেষ কোনো ক্রেতার আচরণ পর্যালোচনা করিয়া কতকগুলি 'নিয়ম' গঠন করিলাম। সমগ্র জাতীয় উৎপাদন, কর্মসংস্থান, ভোগব্যয় প্রভৃতি 'সমষ্টি' বিশ্লেষণের কার্যে যদি এই নিয়মগুলিকে আমরা প্রয়োগ করি তাহা হইলে আমরা ভুল করিব। ইহার কারণ হইল সামগ্রিক অর্থ নৈতিক বিষয়গুলি একক বিষয়গুলির ন্যায় একইভাবে আচরণ করে না। যদি মজুরি কমিয়া যায় তাহা হইলে এককভাবে কোনো ফার্মের ব্যয় কমিয়া গেল, উৎপাদন বাড়ানো লাভজনক হইল, ফলে ফার্মটি আরও শ্রমিক নিয়োগ করিবে। একক বিশ্লেষণে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি। কিন্তু দেশের সাধারণ মজুরির হার যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে দেশের মোট কর্মসংস্থান বাড়িবে ইহা সত্য নয়, কারণ সাধারণভাবে মজুরি হ্রাস পাইলে লোকের মোট আয় কমিয়া যাইবে, দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা হ্রাস পাইবে, উৎপাদন কমিয়া যাইবে, মোট কর্মসংস্থান হ্রাস পাইবে। আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কোনো ব্যক্তি এককভাবে ভোগ-ব্যয় কমাইয়া দিয়া সঞ্চয় বাড়াইতে পারে, ইহা সম্ভব। কিন্তু সমগ্র জনসমষ্টি এককভাবে ভোগব্যয় কমাইলে জাতির মোট সঞ্চয় হ্রাস পাইবে। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় যে 'মাইক্রো' ও 'ম্যাক্রো' অর্থনীতির বিশ্লেষণে সিদ্ধান্তসমূহ অনেক সময়ে পরস্পর বিরোধী হইতে পারে।

এই সমষ্টিভিত্তিক অর্থনীতির আলোচনার সময়ে কতকগুলি অসুবিধার কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। যেমন, মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ জানিতে হইলে সারা দেশের ধান, গম, লাউ, কুমড়া, মাখন, পেন্সিল, জুতা, গাড়ি প্রভৃতির বিভিন্ন উৎপাদন-পরিমাণগুলিকে যোগ করা দরকার। খাদ্য-দ্রব্যের মোট পরিমাণ জানা সহজ, আমরা মণ বা টনের সাহায্যে হিসাব করিতে পারি। দৈর্ঘ্য পরিমাপেরও কোন অসুবিধা নাই, গজ, মাইল প্রভৃতি মানদণ্ড ব্যবহার করা চলে। কিন্তু X লক্ষ

ম্যাক্রো-আলোচনার অসুবিধা কি কি

ক্রেতাদের দিক হইতে তাকাইলে টাকার জন্য চাহিদা বলিলে বুঝা যায় কম জিনিস ক্রয় করিয়া বেশি টাকা হাতে ধরিয়া রাখা। টাকার যোগান বলিলে বোঝা যায় দ্রব্য সামগ্রীর ক্রয়। টাকার যোগান বাড়িয়াছে অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রীর বাজারে লোকে বেশি টাকা ঢালিয়া দিতেছে, অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা বাড়িয়াছে।

টন গমের সঙ্গে Y লক্ষ গজ কাপড় যোগ দেওয়া যায় কি উপায়ে? যোগ দিতে হইলে সকল জিনিসের পরিমাণকেই সমান কোন মানদণ্ড দিয়া পরিমাপ করা দরকার। কেইনস এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সমাজের মোট উৎপাদনকে কর্মসংস্থানের হিসাবে পরিমাপ করিয়াছিলেন। দ্রব্যসামগ্রীর মোট পরিমাণ হিসাব না করিয়া তিনি কর্মসংস্থানের স্তর হিসাব করিয়াছিলেন, কারণ কর্মে নিযুক্ত সকল শ্রমিক মিলিয়াই এই বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করিয়াছে। যেমন, যদি ধরিয়া লওয়া হয় 100 জন শ্রমিক X পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে, তবে অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে, 200 জন শ্রমিক 2X পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করিবে। মোট উৎপন্ন দ্রব্যের সমষ্টি পরিমাপের আর একটি উপায় হইল টাকার অঙ্কে উহাদের বিক্রয়-মূল্য হিসাব করিয়া যোগ করা। কিন্তু টাকার নিজের চাহিদা, যোগান ও মূল্যে পরিবর্তন হইলে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করা খুবই অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে।

জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক রূপ (A Total picture of the National Economy)

সমাজের সামগ্রিক রূপ চোখের সম্মুখে রাখিলে আমরা দেশের মোট অর্থনৈতিক গতিধারার আভাস পাইতে পারি। বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী যেমন সমুদ্রে প্রভাবিত হয় এবং আবার মেঘের আকারে নূতন বারিধারায় পুষ্ট হইয়া সমুদ্রের সহিত মেশে—মানুষের অর্থ নৈতিক কাজকর্মও সেইরূপ ব্যক্তিগত আয় সৃষ্টি করিয়া সামগ্রিক ভাবে জাতীয় আয় সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত আয় হইতেই সমাজে মোট ভোগ ও চাহিদার সৃষ্টি হয়—পুনরায় উৎপাদন চলিতে থাকে—জাতীয় আয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠে। চক্রের ন্যায় সঞ্চরণশীল, উৎপাদন—আয় সৃষ্টি—ব্যয়—ভোগ ও সঞ্চয়—পুনরুৎপাদন, ইহাই সমাজের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি।

সামগ্রিক গতিশীল চিত্র

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কোন কোন উপাদান হিসাবে সম্পদ উৎপাদনের কাজে (দ্রব্যাদি বা কার্যাদি) নিযুক্ত আছে। উৎপাদনের সকল উপাদান দেশের বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়া বহুপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদি (goods & services) উৎপন্ন করিতেছে। এই সকল দ্রব্য ও কার্য (goods & services) অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হয় অথবা তাহাদের অর্থ-মূল্য হিসাব করিতে পারা যায়। উহাদের বিক্রয়-মূল্য হইতে সৃষ্টি হয় ব্যক্তিগত আয়; এই মোট বিক্রয়-মূল্য উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানসমূহের (অর্থাৎ

স্রোতধারা

খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা) আয় সৃষ্টি করে। উপাদানসমূহের আয় যোগ করিয়া আমরা জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানিতে পারি। এই জাতীয় আয়-ই সমাজের মোট দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় হইয়া যায় * ; ইহা মোট ব্যয়ের সমান ।।

মোট ব্যয়ের কিছু অংশ ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয়, যে অংশ সঞ্চয় হয় তাহা নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয়িত হয়। সমাজে ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন সুরু হয় ; সমাজের লোকজন উপাদান হিসাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ কর্মে নিযুক্ত হইয়া যায়। পুনরায় তাহাদের আয় সৃষ্টি হয়, ব্যয় ও সঞ্চয় চলিতে থাকে, এইভাবে অবিরাম ধারায় সমাজে অর্থ নৈতিক গতিধারার স্রোত বহিয়া চলে। ইহাদের সাজাইলে দেখা যায় :

মোট উপাদানের নিয়োগ
|
মোট উৎপাদন (জাতীয় সম্পদ)
|
মোট আয় (জাতীয় আয়)
|
মোট ব্যয়
|
মোট ভোগ | মোট সঞ্চয়
|
ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন | মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন
|
মোট উপাদানের নিয়োগ

এই ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেশের অর্থ নৈতিক জীবনযাত্রার গতি ও প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বোঝা যায়। দেশে যদি উপযুক্ত পরিমাণে উপাদান না থাকে

* এই আলোচনায় বহু জটিলতা বাদ দেওয়া হইয়াছে, প্রাথমিক ধরনের আলোচনা মাত্র। এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা 'আয় ও কর্মসংস্থানতত্ত্ব' পরিচ্ছেদে পাওয়া যাইবে।

রাষ্ট্র যাহা কর হিসাবে আয় হইতে তুলিয়া লয়, উহা ব্যক্তির ব্যয় না হইলেও রাষ্ট্র ব্যয় করে ; সুতরাং সমাজের মোট ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

। দুই দিক হইতে ইহা দেখা যায়। এক ব্যক্তির আয় নিশ্চয় অন্য ব্যক্তির ব্যয়, সুতরাং মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান। মোট আয়ের কিছুটা ভোগ্য দ্রব্যে সরাসরি ব্যয়িত হইবে, কিছুটা সঞ্চিত হইবে। সেই সঞ্চয় মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যয় হইবে। অথবা কোন কিছুতে ব্যয় না হইলে মোট আয় কমাইয়া দিবে, কারণ উহার ব্যয় না হওয়ায় অন্যের আয় সৃষ্টি হইতে পারিবে না।

বা তাহারা দক্ষতাবিহীন ও অনুন্নত হয় তাহা হইলে মোট দ্রব্য সামগ্রী বা সম্পদের উৎপাদন কম হইবে। সম্পদ কম উৎপন্ন হইলে উহার বিক্রয় মূল্যও কম হইবে, লোকের আয়ও কমিয়া যাইবে। ভোগ্য-দ্রব্যক্রয়ে ব্যয় কম হইবে, এবং কম সঞ্চয়ের দরুন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ও কমিয়া যাইবে। দেশে জীবন যাত্রার মান, মোট আয়, ব্যয়, মোট ভোগ-পরিমাণ এবং মোট মূলধন গঠন (capital-formation) সব হ্রাস পাইবে।

জীবন যাত্রার গতি ও প্রকৃতি

আরও জানা যায়, মোট ব্যয় যদি বাড়ানো হয় তাহা হইলে উপাদান-সমূহের অধিক নিয়োগ সম্ভবপর এবং তাহারই ফলে দেশে অধিক আয় সৃষ্টি হইতে পারে। রাষ্ট্র যদি সমাজের মোট ব্যয় বাড়াইতে পারে, তাহা হইলে উপাদানগুলি বেকার থাকিবে না, সমাজে সম্পদ উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে এবং আয়ের স্তরও বৃদ্ধি পাইবে।

দেশে কর্মনিয়োগের পরিমাণ মোট ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল

দেশের লোকের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে যে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হয় উহার একাংশ লোকে ভোগ করে এবং অপরাংশ নূতন দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করে। মোট উৎপাদন বাড়াইতে পারিলেই ভোগের জন্য দ্রব্যসামগ্রী বা বিনিময়ের জন্য মূলধনী দ্রব্যাদি সকল কিছু বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এইভাবে মোট উৎপাদন, জাতীয় সম্পদ এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

এই সকল কারণে জাতীয় আয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। সমাজের কত পরিমাণ উপকরণ কোন্ অংশে (কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ইত্যাদিতে) কিরূপ ভাবে সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ত আছে তাহা জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায়। এই সম্পদ কোন্ কোন্ দ্রব্য লইয়া গঠিত ; কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপন্ন হইল ; কোন্ শ্রেণীর হাতে জাতীয় আয়ের কত অংশ চলিয়া যাইতেছে ; দেশে মোট ভোগ্যদ্রব্য কোন্ শ্রেণীর মধ্যে কিরূপভাবে বন্টিত হইয়া আছে, সকলই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। ইহার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমগ্র-ভাবে দেখা যায় এবং কি কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (component parts) পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর অর্থনৈতিক কাজকর্ম আপনগতিতে আবর্তিত হইতেছে তাহা বোঝা যায়, দেশের অর্থনৈতিক ব্রহ্মাণ্ডের রূপ পর্যবেক্ষণ করা যায়। ভাগীরথী

জাতীয় আয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণের গুরুত্ব

যেরূপ মহাদেবের জটা হইতে নামিয়া আবার মহাদেবের জটাতেই ফিরিয়া যায়—কোন দেশের অধিবাসীদের সকল প্রকার দৈনন্দিন কাজকর্মের স্রোতধারাও জাতীয় আয় হইতে সৃষ্ট হইয়া জাতীয় আয়কেই পুনরায় পুষ্ট করিয়া তোলে।

জাতীয় আয় (National Income)

"কোন দেশের শ্রম ও মূলধন, প্রকৃতির উপকরণ আহরণের দ্বারা এক বৎসরের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তুজাত দ্রব্য বা বিভিন্ন কার্যাদির নীট সমষ্টি (net aggregate) উৎপন্ন করে"—মার্শাল তাহাকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন।*

জাতীয় আয়

সমাজের বিভিন্ন দিকে উৎপাদনে নিযুক্ত সকল উপাদান যে পরিমাণ সম্পদ এক বৎসরের মধ্যে সৃষ্টি করে তাহার নাম মোট জাতীয় আয় (Gross National Income)। এই মোট জাতীয় আয় হইতে সেই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়-ক্ষতি হইল তাহা পূরণের জন্য কিছু সম্পদ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট জাতীয় আয় (Net National Product) বা জাতীয় বিভাজ্য-আয় (National Dividend)। এই জাতীয় আয় বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক উপাদানের আয় সৃষ্টি করে। সকল উপাদান এই জাতীয় বিভাজ্য আয় হইতে নিজস্ব আয় পায় বলিয়া ইহাকে বিভাজ্য-আয় (Dividend) বলে।

এই জাতীয় আয় কোন নির্দিষ্ট ভাণ্ডার (fund) নহে, ইহা স্রোতশীল ধারা। প্রতি বৎসর সকল উপাদানের কার্যের ফলে এই সম্পদ উৎপন্ন হয় এবং সকল

* অধ্যাপক ফিসার বলেন যে, জাতীয় সম্পদ বলিলে সারা বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্য ও কার্যাদির পরিমাণ বোঝা উচিত নয়। তাঁহার মতে প্রধানত জীবনযাত্রার মান আলোচনার জন্যই জাতীয় আয়ের ধারণা দরকার এবং উহার পরিমাপ গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি সারা বৎসরে মোট ভোগের পরিমাণকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন। যেমন 1959 সালে 60 হাজার টাকা মূল্যের একটি বাড়ি তৈয়ারি হইল। মার্শালের মতে উহাকে সেই বৎসরের জাতীয় আয়ের মধ্যে হিসাব করিতে হইবে। কিন্তু ওই বাড়ীটিকে ব্যক্তি (ধরা যাউক) 30 বছর ধরিয়া ভোগ করিবে, প্রতি বৎসর উহার $\frac{1}{30}$ অংশ ভোগ করা হইতেছে। তাই বছরে 2 হাজার টাকার বেশি যোগ করা উচিত নহে, ইহাই ফিসারের অভিমত। কিন্তু এই মত সাধারণভাবে গৃহীত হয় নাই, উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবেই জাতীয় আয়কে গণনা করার নীতি গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছে। কারণ, জাতীয় আয়ের উৎপাদনে উঠানামাই দেশের কর্মসংস্থান ও আয়স্তরে উঠানামা প্রকাশ করে।

উপাদানের মধ্যেই তাহা বন্টিত হয়। উপাদানসমূহের মিলিত কার্যফলে উৎপন্ন এই সম্পদ তাহাদের আয়ের উৎসও বটে। এই জাতীয় আয় চারি প্রকার আয়ে বিভক্ত হইয়া (খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা) সমগ্র দেশের জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয় সৃষ্টি করে।

মার্শাল এই জাতীয়-আয় বলিতে এক বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী ও কার্যাদির পরিমাণকে বুঝিয়াছেন। দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির এই পরিমাণকে বাস্তব ক্ষেত্রে হিসাব করা এবং তাহার সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নহে। দেশের সকল প্রান্তে কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপন্ন হইল তাহার ঠিকানা নাই। তাহা ছাড়া একই দ্রব্যের বহু প্রকার-ভেদ আছে (যেমন বহুপ্রকারের আম, কুমড়ো, চা, জুতা ইত্যাদি)। একই মানদণ্ডের মাধ্যম ব্যতীত ইহাদের হিসাব করিতে হইলে বিরাট তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। আরও অসুবিধা হয় 'আসল' ধারণা অনুযায়ী ('Real' concept) মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হিসাবের ক্ষেত্রে। 10000 পেন্সিল হইতে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য কত পেন্সিল বাদ দিয়া রাখিতে হইবে? আবার হিসাবে যাহা বাদ দেওয়া হইল (ধরা যাক্ 200টি), তাহা কি ব্যবহৃত হইয়া দেশের সম্পদ ও কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে না? তাই জাতীয় আয়কে 'আসল' আয় হিসাবে গণনা করার বহু বাস্তব অসুবিধা আছে।

দ্রব্য কার্যাদির হিসাবে জাতীয় আয়ের পরিমাপে অসুবিধা

এই সকল অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক পিগু জাতীয় আয়কে হিসাব* করিয়াছেন টাকার হিসাবে; এক বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির অর্থ-মূল্যের মোট পরিমাণ হিসাব করিয়া। এক বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্য সামগ্রীর ও কাজকর্মের টাকার হিসাবে প্রকাশিত দাম যোগ করিয়া মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায় এবং ওই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণের জন্য

পিগু: মোট উৎপন্নের অর্থ-মূল্য

* কিন্তু এই ভাবে অর্থমূল্যের সাহায্যে হিসাব করারও অনেক ত্রুটি আছে। বহু দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদক নিজেই ব্যবহার করে (যেমন চাষী নিজের উৎপন্ন ধান ভোগ করে, বা তাঁতী নিজের উৎপন্ন কাপড় ব্যবহার করে, শিক্ষক নিজের ছেলে মেয়েদের পড়ায়, হোটেলওয়ালা নিজের হোটেলেই খাদ্যাদি গ্রহণ করে)। এই সকল দ্রব্যের মূল্যকে অর্থের হিসাবে পরিমাপ করা চলে না, ইহারা অর্থমূল্য সৃষ্টি করে না, অথচ ইহাদের বাদ দিলে জাতীয়-আয়ের প্রকৃত পরিমাণ বোঝা যায় না। কোনো ব্যক্তি তাহার টাইপিষ্টকে বিবাহ করিয়া যদি তাহাকে আর

প্রয়োজনীয় টাকা উহা হইতে বাদ দিয়া নীট জাতীয়-আয় বা জাতীয় আয় হিসাব করা হয়।

জাতীয় আয় সম্পর্কে আরও দুইটি বিষয় বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমত, দেশের সম্পদের উপর বিদেশীদের মালিকানা থাকিলে উহা হইতে আয় জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইতে বাদ দেওয়া উচিত। বিদেশের সম্পদের উপর দেশীয় লোকের মালিকানা থাকিলে উহা হইতে আয় জাতীয় আয়ের সহিত যোগ করা উচিত। আমদানি-রপ্তানি হইতে দেশের পাওনাকে জাতীয় আয়ের সহিত যোগ করা উচিত; অথবা দেনা-কে বিয়োগ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র কর ধার্য করার ফলে সকল উপাদানের আয় হইতেই সেই কর আদায় করা হয়। নীট জাতীয় আয় হইতে করের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সকল ব্যক্তির ব্যয়োপযুক্ত আয়ের সমান (Disposable Income)। রাষ্ট্র কর্তৃক উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপন্নের মধ্যে যোগ করা দরকার। সরকারী কর্মচারীদের মাহিনাকে অবশ্যই মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে হিসাব করা প্রয়োজন, কারণ বিভিন্ন কার্যাদির পারিশ্রমিক হিসাবেই সেই আয়ের সৃষ্টি হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও রাষ্ট্রের কার্যকলাপ

মাহিনা না দিয়া টাইপের কাজ করাইয়া লয় তাহা হইলে সেই কাজের মূল্য সৃষ্টি না হওয়ায়, এইরূপ অবস্থায় অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় কমিয়া যায়। এই সকল অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও পরিমাণগত পরিমাপ করার সুবিধা থাকার দরুণ অধ্যাপক পিগুর সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অর্থমূল্যের হিসাবেই জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হইয়া থাকে।

অর্থমূল্যের সাহায্যে জাতীয় আয় পরিমাপের আরও দুইটি অসুবিধা আছে। প্রথমত, অর্থের নিজেরই মূল্যে পরিবর্তন হইতে পারে, ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণে পরিবর্তন দেখা দেয়, কিন্তু তাহাতে দেশের সম্পদের পরিবর্তন হয় না। যেমন দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে (অর্থাৎ অর্থের নিজস্ব মূল্য কমিয়া গেলে) অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু দেশের সম্পদ বাড়িল না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য অর্থের নিজস্ব মূল্য স্থির ধরিয়া লইয়া, অর্থাৎ দামস্তর স্থির ধরিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয়। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যকার্যাদির অর্থ-মূল্যে অর্থাৎ দামে কোন পরিবর্তন হইল না, অথচ দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইল, তাহা ঘটিতে পারে। ইহার ফলে জীবনযাত্রার মানে বাস্তব পরিবর্তন আসিবে, কিন্তু জাতীয় আয় পরিমাণগত ভাবে সমানই থাকিয়া যাইবে। যেমন পূর্বের 4 টাকা ভিজিটের ডাক্তারের তুলনায় এখনকার একই দামের ডাক্তারের কার্য অনেক উন্নত ধরনের।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income)

জাতীয় আয় হইল (ক) এক বৎসরের উৎপন্ন সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির মোট দাম ; (খ) সকল উপাদানের আয় সৃষ্টি হইবার উৎস ও ভাণ্ডার, এবং (গ) সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের যোগফল। সুতরাং ইহার পরিমাপ তিন ভাবে হইতে পারে। প্রথমত, সেই বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির দাম যোগ করিয়া ; দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের কার্যে সহায়তার দরুণ উপাদান-সমূহের সকল পাওনা (Payment) যোগ করিয়া, এবং তৃতীয়ত, সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয় যোগ করিয়া। এই তিনটি হিসাব স্বভাবতই সমান হইবে, কারণ মোট উৎপন্নের দামের সমষ্টি হইতে সকল উপাদানের আয় সৃষ্টি হয় ; মোট উৎপন্নের দাম সকল উপাদানের পাওনা লইয়াই গঠিত হয় ; এবং সমাজের মোট আয় সকলের হাতে ভোগব্যয় ও সঞ্চয় রূপে ছড়াইয়া থাকে। প্রথমটিকে বলা হয় সম্পূর্ণ-উৎপন্নের সমষ্টি (Final products total) ; দ্বিতীয়টিকে বলা হয় উপাদান-পাওনার সমষ্টি (Factor payments total) ; এবং তৃতীয়টিকে বলা হয় ভোগ-সঞ্চয়ের সমষ্টি (Consumption-Savings Total)। প্রথম পদ্ধতিতে সকল উৎপন্ন দ্রব্যকার্যাদির (goods and services) দাম যোগ করিয়া ; দ্বিতীয় পদ্ধতিতে. সকল উপাদানের পাওনা বা আয় যোগ করিয়া ; এবং তৃতীয় পদ্ধতিতে সকল ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ পরিমাপ করা সম্ভব। সংখ্যাতাত্ত্বিকগণ (Statisticians) সাধারণত প্রথম দুইটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন, কারণ কোন ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিতে হিসাব করা সুবিধা (যেমন শিল্প, কৃষি খনি ইত্যাদি) ; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতি সুবিধাজনক (যেমন ওকালতী, ডাক্তারী, শিক্ষকতা ইত্যাদি)। পরিমাপের পক্ষে তৃতীয় পদ্ধতি বিশেষ সুবিধাজনক নয়।

পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি

(ক) উৎপাদন-সুমারী পদ্ধতি বা সম্পূর্ণ-উৎপন্নের সমষ্টি (Census of Production Method or The Final Products Total)

এক বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যকার্যাদির অর্থ-মূল্য যোগ করিলে আমরা মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product) পাইতে পারি। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সর্বশেষ স্তরের উৎপন্ন দ্রব্যের দামই কেবলমাত্র যোগ দিতে হইবে। যে সকল দ্রব্য অর্ধ-উৎপন্ন অথবা উৎপাদনের মাধ্যমিক স্তরে (inter-

mediate stages) রহিয়াছে, তাহাদের ধরা চলিবে না। যেমন আসবাব প্রস্তুতকারী যে-কাঠের সাহায্যে আসবাব উৎপাদন করিতেছে সেই কাঠের দাম যোগ দেওয়া হইবে না, কারণ তাহা উৎপাদনের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছায় নাই। কিন্তু যদি পুড়িবার জন্য কাঠ ব্যবহৃত হয় তাহা সেই কাঠের দাম হিসাব করিতে হইবে, কারণ তাহা সম্পূর্ণ দ্রব্য (Final Product) হিসাবেই ব্যবহৃত হইতেছে। এইভাবে হিসাব করিলে ডবল-গণনার (double counting) হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়, বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশে আমদানি হয়। রপ্তানি ও আমদানির মূল্যের পার্থক্য মোট জাতীয় আয় হিসাবের সময়ে যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে। যদি তুলনায় আমদানি বেশি হয়, তাহা হইলে বিয়োগ হইবে, যদি তুলনায় রপ্তানি বেশি হয়, তাহা হইলে যোগ হইবে।

এইভাবে মোট জাতীয়-আয় হিসাব করিয়া মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য কিছু অর্থ বাদ দিয়া নীট জাতীয়-আয়ের পরিমাপ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ দেশের সকলে মিলিয়া যে সকল ভোগদ্রব্য বা কার্যাদি ক্রয় করিয়াছে তাহাদের দাম, গভর্ণমেণ্ট যাহা ক্রয় করিল তাহার দাম, নূতন মূলধনী দ্রব্যের দাম, এই সকল যোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

(খ) আয়-সুমারী পদ্ধতি বা উপাদান-পাওনার সমষ্টি (Census of Income Method or The Factor Payments Total)

এক বৎসরে দেশের, (ক) সমগ্র মজুরি মাহিনা, ইত্যাদি (খ) সকল ফার্ম বা ব্যবসায়ের নীট আয় (মজুরি মাহিনা ইত্যাদি বাদ দিয়া, কারণ তাহা অন্যত্র ('ক'-তে) হিসাব করা হইয়াছে) ; (গ) সকল ঋণ হইতে নীট সুদ ; এবং (ঘ) সকল নীট খাজনা, এই সকল যোগের দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করা চলে।

এই ভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। (ক) হস্তান্তর-পাওনাসমূহ (Transfer Payments) বাদ দিতে হইবে। যেমন, একখণ্ড জমি বিক্রয় হইলে সেই পাওনা জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আসিবে না ; কারণ তাহা কোন নূতন আয় নহে, কোন নূতন উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর অর্থ মূল্য নয়। ভিক্ষুকের আয় বা কোন দান-গ্রহণও গণনার মধ্যে আসে না, কারণ ওইরূপ আয় কোন দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন ধারায় কাজ করিবার

দরুণ সৃষ্টি হয় না। কোন দ্রব্যোৎপাদন বা কোন কাজকর্মের দরুণ যে আয় তাহাই জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে আসিবে। (খ) মালিকের নিজের যে সকল উপাদান (যেমন নিজের বাড়ী, জমি, পরিচালনা ক্ষমতা বা মূলধন) উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদের বাজারদরের হিসাবে অর্থ-মূল্যে রূপান্তরিত করিয়া গণনার মধ্যে আনা প্রয়োজন। (গ) বিনা দামে যে সকল দ্রব্য বা কার্যাদি পাওয়া যাইতেছে (যেমন, বাড়িতে স্ত্রীলোকের কাজ বা নিজের বাগানের তরী-তরকারী) তাহাদের কোন আয় বা অর্থমূল্য সৃষ্টি না হওয়ায়—জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আনা হইবে না। (ঘ) ফার্মের মোট মুনাফার যে অংশ মজুত-তহবিলে (Reserve Fund) জমাইয়া রাখা হইয়াছে (অর্থাৎ যাহা লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ার-ক্রেতাদের আয় সৃষ্টি করে নাই), তাহাও যোগ দিতে হইবে। কারণ আয় হিসাবে ব্যক্তিদের হাতে না গেলেও ঐ মূল্য দেশে সৃষ্টি হইয়াছে।

(গ) ভোগসঞ্চয় পদ্ধতি বা ভোগসঞ্চয়ের সমষ্টি (Consumption Saving Method or The Consumption Saving Total)

সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই আয়ের এক অংশ ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয় এবং অপর অংশ সঞ্চয় হয়। তাই এক বৎসরের মধ্যে সমাজের মোট ভোগ ব্যয় ও মোট সঞ্চয় যোগ করিতে পারিলে নীট জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে পারা যায়।

সাধারণত ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না, তাই এই পদ্ধতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুবিধা নাই।

জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা (Difficulties in the measurement of National Income)

জাতীয় আয়ের পরিমাপ সকল দেশেই বহু বাস্তব অসুবিধার মধ্য দিয়া করিতে হয়; বিশেষত অনুন্নত দেশসমূহে অসুবিধার পরিমাণ বেশি। প্রথমত, যে সকল দ্রব্য বা কার্যাদি বিক্রয় হয় না অথবা বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসে না, তাহাদের ক্ষেত্রে বাজার দাম কি হইতে পারিত ইহা ধরিয়া লইয়া জাতীয় আয়ের মধ্যে যোগ করিতে হয়। ইহা অসুবিধাজনক তো বটেই, হিসাবও নির্ভুল না হইবার সম্ভাবনা। অনুন্নত দেশসমূহে সমাজের মোট উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ

উৎপাদকগণ নিজেরা ব্যবহার করেন। অনেক ক্ষেত্রে অর্থের প্রচলন কম; পণ্য-বিনিময় (Barter) প্রচলিত আছে। এই সকল দেশে অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা বিশেষ অসুবিধাজনক। দ্বিতীয়ত, অনুন্নত দেশে অধিক সংখ্যায় একক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠন প্রচলিত থাকায় এবং সাধারণভাবে ব্যবসায়ের হিসাবপত্র বৈজ্ঞানিকভাবে না রাখায়, উৎপাদনের পরিমাণ এবং দাম সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার সুবিধা কম। তৃতীয়ত, এই সকল দেশে উপাদান-সমূহের বিশেষায়ণ (Specialisation) অনেক দূর প্রসার লাভ করে নাই। যেমন, একই ব্যক্তি চাষ করিয়া, মাছ ধরিয়া, বস্ত্রাদি উৎপাদন করিয়া এবং দোকান চালাইয়া আয় করে। জাতীয়-আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র-ভেদ করার (Classification of sectors), অর্থাৎ কোন্ ক্ষেত্র হইতে কি আয় হইল তাহা স্পষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার উপায় থাকে না।

অনুন্নত দেশে, যেমন ভারতবর্ষে, পরিমাপের বাস্তব অসুবিধা

কি বিষয়ের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে (Factors determining the size of the National Income)

জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে দেশের নীট উৎপাদন এবং বিদেশ হইতে নীট আয়ের উপর। এই দুইটি বিষয় লইয়াই জাতীয় আয় গঠিত।

প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ স্থির ধরিয়া লইলে, দেশের মোট উৎপাদন নির্ভর করে কর্মনিয়োগের পরিমাণ ও শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর। দেশে মোট কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে দ্রব্যসামগ্রীর জন্য কার্যকরী চাহিদার (Effective Demand) উপর। কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অধিক দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনের জন্য অধিক শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে। অনুন্নত দেশে জীবনযাত্রা ও আয়ের স্তর এত নিচে যে কার্যকরী চাহিদা কম; তাই শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কম।

শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ভর করে প্রধানত শ্রমিক-পিছু মূলধন নিয়োগের অনুপাতের উপর। শ্রমিক-পিছু মূলধন-নিয়োগের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইবে, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা ততই বাড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং মূলধন ও তাহার নিয়োগের পরিমাণের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করিবে। বিদেশ হইতে নীট আয় নির্ভর করে দেশ কত কম আমদানি করিয়া চালাইতে পারে এবং কত

কার্যকরী চাহিদা, মূলধন নিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্য

বেশি রপ্তানি করিতে পারে তাহার উপর। এই সকল বিষয়ের উপর জাতীয়-আয়ের আয়তন নির্ভর করে।

মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখা (Maintaining Capital Intact)

উৎপাদন ধারায় মূলধনী দ্রব্য নিয়োগের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিয়া মূলধনের মূল্য পূর্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ রাখা—ইহাকে মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখা বা মূলধন বজায় রাখা বলে।

যদি একটি যন্ত্রের দাম 500 টাকা হয় এবং ওই যন্ত্রটির আয়ু 10 বৎসর ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর উহার 10 ভাগের 1 ভাগ অর্থাৎ 50 টাকা ক্ষয় হইতেছে, এইরূপ মনে করা চলে। ওই যন্ত্র দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হইতে ওই পরিমাণ অর্থ (অর্থাৎ 50 টাকা) প্রতি বৎসর সরাইয়া রাখিলে 10 বৎসর পরে ওই যন্ত্রটি সম্পূর্ণ ক্ষয় হইলেও নূতন যন্ত্র ক্রয় করিবার মতন অর্থ সঞ্চিত হইবে, উৎপাদন ধারা অব্যাহত থাকিবে। যন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত পূরণ না হইলে 10 বছর পর যন্ত্রটি সচল থাকিবে না এবং ইহার ফলে ফার্মের আয় কমিয়া যাইবে।

ক্ষতিপূরণ কিভাবে পরিমাপ করা হয়

'মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখা'র এই তত্ত্ব হইতে জানা যায় যে, ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত ভাবে পূরণ হইলে দেশে মূলধন বজায় থাকিবে। কিন্তু মূলধনের পরিমাণ একই থাকিলে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির (Economic growth) সম্ভাবনা থাকে না, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো একই স্তরে আবর্তন করিতে থাকে। সুতরাং মোট জাতীয় আয় হইতে শুধু ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্যই নহে, দেশে আরও যন্ত্রপাতি প্রসারের জন্য ক্রমাগত অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতি বৎসর জাতীয় আয় হইতে আগের বৎসরের তুলনায় অধিকতর উপকরণ মূলধন-গঠনের উদ্দেশ্যে সরাইয়া লইলে দেশে ক্রমবর্ধনশীল হারে মূলধন-গঠন সম্ভব হয় এবং সেই মূলধন প্রয়োগের দ্বারা শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যায়।

মূলধন-গঠন ও অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি

জাতীয়-আয় বিশ্লেষণের তাৎপর্য : সামাজিক হিসাব গ্রহণ (Significance of National Income analysis : Social Accounting)

জাতীয় সম্পদ ও আয় সম্বন্ধে এমন ভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয় এবং শ্রেণীবদ্ধ করা হয় যে, তাহা হইতে আমরা জাতীয় আয়ের গঠনকারী বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (Component parts) বুঝিতে পারি। যেমন ব্যবসাদি হইতে কি

পরিমাণ মুনাফা, জমির মালিকানা হইতে কি পরিমাণ খাজনা, চাকুরি ইত্যাদি হইতে কি পরিমাণ মাহিনা, ঋণ-প্রদান হইতে কি পরিমাণ সুদ এবং পরিশ্রমের দরুণ কি পরিমাণ মজুরি দেশের লোকে পাইতেছে—এই সকল আমরা জানিতে পারি জাতীয় আয় বিশ্লেষণের সাহায্যে। জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো, ইহার সামগ্রিক রূপ, এক অংশের সহিত অপর অংশের সম্পর্ক, ইহার গতিপ্রকৃতি সকল কিছু আমরা জাতীয় আয় গঠনকারী অংশ-সমূহের বিভাগ হইতে বুঝিতে পারি। আয় ব্যয়ের ধরন (pattern of Income and Expenditure), জাতীয় উৎপাদনের কোন্ অংশে কি পরিমাণ মূলধন নিযুক্ত, কোন্ অংশে শ্রমিকদক্ষতা কিরূপ, কোন্ অংশ হইতে মূলধন সরাইয়া আনিয়া কোন্ অংশে নিয়োগ করা দরকার—সবই এই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে জানিতে পারা যায়। কতটুকু আয় সরাইয়া লইলে (কর, ঋণ ইত্যাদির সাহায্যে) মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায়, তাহাও জানা যায়। জাতীয় আয়ের উঠানামা (Fluctuations in National Income) রোধ করিতে হইলেও এই সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দেশের উপকরণ সমূহের সর্বাধিক সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা সঞ্চয়ের ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনুমান করা চলে। এক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত অপর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক বিচারে জাতীয় আয়ের ধারণা খুবই সাহায্য করে।

জাতির অর্থনৈতিক কাঠামো ও গতি-প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের দ্বারা আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। একটি দেশের জাতীয় আয়ে উঠা নামা, অপর দেশের জাতীয় আয়কে কিরূপে প্রভাবিত করে, তাহার পর্যালোচনা জাতীয় স্বার্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন দেশের অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ও প্রগতির হার (Rate of Economic Growth or Progress) পরিমাপ করার ব্যাপারে ইহা খুবই কার্যকরী। আধুনিক ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ, তাই, কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করার সময়েও ইহা বিশেষ উপযোগী। কোন্ ক্ষেত্র হইতে উপকরণ সরাইয়া কোন্ ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইবে তাহা এই বিশ্লেষণ হইতেই জানা যায়। কোনো ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগ করিলে যে-হারে

উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, অপর ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগের অনুপাত ভত রাখিলে উৎপাদন হয়তো সেই হারে বাড়ে না।

অনুশীলনী

1. What is Macro-economics? Why macro-analysis has become important in our times?

2. Discuss the circular Flow of a National Economy. Or, Give a total picture of the National Economy.

3. Define National Income and discuss how to measure it.

4. What precautions should be taken in computing the National Income of a country?

5. Discuss the need and importance of National Income calculation or Social Accounting.

6. Write a short note on : Social Accounting.

২

টাকার প্রকৃতি

The Nature of Money

টাকার উৎপত্তি ও ব্যবহারিক উপকারিতা (Origin and usefulness of Money)

প্রত্যেক দেশে সমাজ-বিবর্তনের প্রাথমিক কোন এক স্তরে অর্থের বা টাকা-কড়ির আবিষ্কার ও চলন শুরু হইয়াছে। এমন সময় ছিল যখন ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজেই উৎপাদন করিত, দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে সে স্বাবলম্বী ছিল। সেই অবস্থায় বিনিময়ের প্রয়োজন হইত না এবং বিনিময়ের কোন মাধ্যম ব্যবহারের প্রয়োজনও ছিল না। ক্রমে সমাজে শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হইল, স্বাবলম্বিতা লুপ্ত হইয়া গেল, অন্যের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত নিজের উৎপন দ্রব্য বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম সৃষ্টি হইল। বহু প্রকার স্থূল ও অসুবিধাজনক দ্রব্যের সাহায্যে প্রথম যুগের বিনিময় চলিত, বর্তমানে উন্নত ধরনের মুদ্রা, কাগজীনোট, চেক, হুণ্ডি, বিনিময়-বিল বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছে।

বার্টার কাহাকে বলে

যখন হইতে গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত শ্রমবিভাগ শুরু হইয়াছে তখন হইতেই এক গোষ্ঠীর বা এক ব্যক্তির দ্রব্যের সহিত অন্য গোষ্ঠী বা অন্য ব্যক্তির দ্রব্য-বিনিময়ের সূচনা হইয়াছে। যখন পণ্যের সহিত পণ্য বিনিময় হইতেছে, বিনিময়ের মাধ্যম রূপে টাকা যেখানে উপস্থিত নাই, সেই প্রকার দ্রব্য বিনিময়কে বলা হয় 'অর্থ বিহীন পণ্যবিনিময়' বা বার্টার (Barter)। এই বার্টার প্রথায় পণ্যের সহিত পণ্যের সরাসরি বিনিময় হইয়া থাকে।

কিন্তু এই প্রথার বহুপ্রকার অসুবিধা আছে। বিনিময়কারী ব্যক্তিদের অভাবগুলি পরস্পরের পরিপূরক হওয়া চাই। বস্ত্র উৎপাদনকারী তাঁতী যদি

বস্ত্রের বিনিময়ে চাউল পাইতে চায় তবে তাহাকে কেবলমাত্র একজন চাষীর নিকট গেলেই চলিবে না, এমন একজন চাষী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যাহার ঠিক সেই পরিমাণ বিনিময়যোগ্য চাউল আছে, এবং তাঁতী যে-পরিমাণ ও যে-প্রকারের বস্ত্র বিনিময় করিতে ইচ্ছুক, চাষীরও ঠিক সেই পরিমাণ ও সেই প্রকার বস্ত্রের দরকার। এরূপ অবস্থায় বিনিময়ের গতিধারা নিয়মিত ভাবে চলিতে পারে না, যদি পরস্পরের পরিপূরক অভাবযুক্ত ব্যক্তি জুটিয়া যায় তবেই ইহা সম্ভব। এইরূপ বিনিময়ের মধ্যে আকস্মিকতা আসিয়া যায়। দ্বিতীয় অসুবিধা হইল, পণ্যবিনিময় প্রথায় একটি দ্রব্যকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করিয়া বিক্রয় বা ক্রয় করার সুবিধা নাই। কেহ যদি জামার বিনিময়ে এক সের চাউল পাইতে চায়, তবে সে কি জামাটাকে বহু অংশে বিভক্ত করিয়া একসের চাউল পাইবে? এইরূপ বৃহৎ দ্রব্যের সহিত ক্ষুদ্র দ্রব্যগুলি বিনিময়ের সুযোগ এই প্রথায় নাই। তৃতীয়ত, বাটার প্রথায় প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত প্রত্যেকটি দ্রব্যের অসংখ্য বিনিময়-মূল্যের হার উদ্ভূত হয়। সমাজে এইরূপ অসংখ্য বিনিময়ের অনুপাত থাকিলে বিনিময়ের কাজ সুচারুরূপে চলিতে পারে না। চতুর্থত, টাকা না থাকিলে সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয় থাকিতে পারে না, কারণ দ্রব্যসামগ্রী বেশিদিন সঞ্চয় করিয়া রাখা চলে না। সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে সুবিধা অনুযায়ী ও ইচ্ছানুযায়ী বিনিয়োগ করাও চলে না।

বাটার প্রথার অসুবিধা

পণ্য-বিনিময় প্রথার এই সকল অসুবিধা থাকায় বিনিময়ের সুবিধার জন্য নানা প্রকার মাধ্যমের ব্যবহার শুরু হইয়াছে। টাকা ব্যবহারের প্রথম যুগে যে-জিনিস সকলে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, সকলের নিকট প্রয়োজনীয়, সকলেই যাহা পাইতে চায়, যাহা বহন করা সুবিধাজনক, সেইরূপ কোন দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হইতে শুরু করিয়াছিল। গো-ধন, কড়ি, হাতীর দাঁত, কাঁচ প্রভৃতি দ্রব্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ও বাহিরে পণ্য-বিনিময়ের মাধ্যমরূপে প্রচলিত ছিল। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইলে ক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি বিনিময়ের উপযোগী মাধ্যমরূপে প্রচলিত হইয়াছে। বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ভালভাবে কাজ করিতে হইলে সেই দ্রব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকা দরকার। (১) দ্রব্যটিকে বহন করার সুবিধা থাকা চাই। বিনিময়ের মাধ্যমটি এমন হওয়া চাই যাহাতে ক্ষুদ্র আয়তন ও কম ওজনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ মূল্য নিহিত থাকিতে পারে। তাহা হইলেই ইহা স্থানান্তরে বহন

সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিময়ের মাধ্যম হইবার গুণসমূহ

করা সুবিধাজনক হইতে পারে। বিনিময়ের মাধ্যমটি দীর্ঘস্থায়ী হওয়া চাই। কারণ, মূল্য ও ক্রয়শক্তি সঞ্চিত অবস্থায় অর্থের রূপে জমাট বাঁধিয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। ইহা অনবরত হস্তান্তরিত হইবে, তাই সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় সেইরূপ হওয়া দরকার। (৩) বস্তুটিকে বিভাগ-যোগ্য হইতে হইবে, যাহাতে উহাকে সমানভাবে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং উহাকে গলাইয়া উহার উপর সীলমোহর বা স্বাক্ষর মুদ্রণ করা সম্ভব হয়। (৪) বিনিময়ের মাধ্যমগুলি আকারে ও প্রকারে একই রকম হওয়া দরকার, একজাতীয়তা না থাকিলে লোকে উহা গ্রহণ করিতে চাহিবে না, উহার আদান-প্রদানে বিঘ্ন ও বিলম্ব দেখা দিবে। (৫) মাধ্যম বস্তুটি এরূপ হওয়া দরকার যে, সকলেই উহাকে সহজে চিনিতে পারে, বিনিময়ের কাজ যাহাতে ব্যাহত না হয়। (৬) বস্তুটির নিজস্ব মূল্য সাধারণভাবে মোটামুটি স্থির থাকা প্রয়োজন নতুবা বিনিময়ের অসুবিধা দেখা দিবে। যে-মানদণ্ডের সাহায্যে অপরাপর পণ্যসমূহের মূল্য পরিমাপ করা হইবে উহার নিজস্ব মূল্য সঠিক ও স্থির থাকা প্রয়োজন। সকল জিনিসের মূল্য-পরিমাপের আদর্শ মানদণ্ড হইতে হইলে মাধ্যম-বস্তুটির নিজ-মূল্যের ঘন ঘন পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয়।

আধুনিক কালে দেখা গিয়াছে, ধাতু দ্বারা নির্মিত মুদ্রার পরিবর্তে কাগজী নোটের প্রচলন তুলনামূলক ভাবে অধিকতর সুবিধাজনক। বিনিময়ের মাধ্যমবস্তু হইবার সকল প্রকার গুণই কাগজের আছে। কম মূল্যের বিনিময়-কার্যগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য অল্প মূল্যের ধাতু নির্মিত মুদ্রাও রহিয়াছে। কারণ অল্পমূল্যের বিনিময়ের পরিমাণ খুবই বেশি, এই উদ্দেশ্যে কাগজের নোট ব্যবহার করিলে উহা অতি দ্রুত ক্ষয় হইয়া বিনিময়ের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করিবে।

টাকার কাজ (Functions of Money)

বার্টার বা পণ্যবিনিময় প্রথার সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিয়া পণ্য বিনিময়ের গতিধারাকে অব্যাহত রাখা ও মসৃণ করা টাকার প্রধান কাজ। বার্টার প্রথায় অভাবের পারস্পারিক পরিপূরকতা না থাকিলে বিনিময় হইতে পারে না, টাকার প্রচলন ঐরূপ আকস্মিকতা হইতে বিনিময়-প্রথাকে মুক্তি দেয়। পণ্য বিনিময়ের ধারার মধ্যে এইরূপে টাকা এক পণ্যের সহিত অপর পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কাজ করে।

মাধ্যম

দ্বিতীয়ত, টাকা হইল মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড বা মূল্যের মাপকাঠি। স্থানের পরিমাপের জন্য যেরূপ ফুট, গজ, মাইল; কালের পরিমাপের জন্য সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা ইত্যাদি; সেইরূপ সমাজে উৎপন্ন বিনিময়যোগ্য বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের পরিমাপের জন্য সাধারণ কোন মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন। অর্থের নামেই সকল দ্রব্যের মূল্যকে পরিমাপ করা হয়।

মানদণ্ড

তৃতীয়ত, সমাজে দেনাপাওনার হিসাব রাখার ব্যাপারে মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে টাকা। সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্মে সকল সময়ে নগদ টাকার লেনদেন না-ও হইতে পারে, বরং আধুনিককালে ঋণের সাহায্যে অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলিতেছে। ঋণের পরিমাণ ও মূল্য সঠিকভাবে স্থির রাখা টাকার অন্যতম প্রধান কাজ। কোন ব্যক্তি যে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য বর্তমানে ঋণ গ্রহণ বা প্রদান করিতেছে সে সেই পরিমাণ মূল্যই ফেরৎ পাইবে বা দিবে। টাকা ঋণ প্রদান ও ঋণ-পরিশোধের ভিত্তি হওয়ার ফলে ঋণ লেনদেনের প্রচুর সুবিধা হইয়াছে। ঋণের বাজার সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে প্রচুর পরিমাণে অর্থের ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ চলিতেছে, উৎপাদন ও যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকর্মের সুবিধা হইয়াছে। ভবিষ্যতের বাজার ও বর্তমানের বাজারের মধ্যে, দূরবর্তী স্থানের বাজারসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। টাকাই হইল এইরূপ ঋণ লেনদেনের মাপকাঠি।

ঋণের মাপকাঠি

চতুর্থত, মূল্যকে বিশেষ একটি আকারে বা রূপে সঞ্চয় করিয়া রাখা অথবা মূল্যের সঞ্চিত রূপ হিসাবে কাজ করা টাকার কাজ। ইহা হইল জমাট বাঁধা ক্রয়শক্তি; ভবিষ্যতে ব্যয়ের জন্য বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে ইহাকে জমাইয়া রাখিতে পারে। এই ক্রয়শক্তি সে অপর কাহাকেও দিতে পারে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই ক্রয়শক্তির উপর অধিকার ছাড়িয়াও দিতে পারে। অন্য কোন আকৃতিতে এই সম্পত্তি বা ক্রয়শক্তি পরিবর্তিত করা যায়, রূপান্তরিত করা চলে, তাই টাকাকে বলা হয় তরল সম্পত্তি (Liquid asset)। সমাজে উৎপন্ন পণ্যের মূল্যসমূহ যেন টাকার আকৃতিতে লোকের হাতে ক্রয়-শক্তির রূপ ধরিয়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে—তাই টাকা হইল মূল্যেরই সঞ্চিত রূপ।

মূল্যের সঞ্চিত রূপ

টাকার এই সকল কাজ হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক সমাজে ইহার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। টাকা প্রচলনের দরুণ লোকেরা অর্থনৈতিক দিক

হইতে ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। টাকা ব্যবহারের দরুণ পারস্পরিক পণ্য বিনিময়ের কাজ বাজার-যোগান ও বাজার-চাহিদায় রূপান্তরিত হয়। জিনিসপত্রের লেনদেন মূলত নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal) হইয়া উঠে। পণ্যবিনিময় যুগের তুলনায় এই ব্যবস্থায় বিনিময়ের স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা ও নির্দিষ্টতার বাধা অপসারিত হয়। দ্রব্যগুলিকে আর মানুষের শ্রমজাত সামগ্রী বলিয়া মনে হয় না; মানুষের শ্রমনিরপেক্ষ নিজস্ব গতিসম্পন্ন কোন জিনিসপত্র বলিয়া ইহারা প্রতিভাত হয়। যোগান, চাহিদা ও বাজারের শক্তিসমূহের ক্রিয়াকলাপ দেখা দিতে থাকে। দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শ্রমের বদলে অদৃশ্য এই বাজারী শক্তিসমূহ দ্রব্যের দাম নির্ধারণে প্রধান প্রভাব বলিয়া মনে হয়। বিনিময় ব্যবস্থার প্রসার ঘটে, দেশের অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্ম বেচাকেনার জন্য বাজারে উপস্থিত হইতে থাকে। টাকার পরিমাণ বাড়াইলে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়ের পরিমাণে বিপুল পরিবর্তন আসে, সমাজের শ্রেণীবিন্যাসে প্রভূত পরিবর্তন সূচিত হয়।

অর্থের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Money)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে যে-সকল ধরনের অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় উহাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। প্রথমত, অর্থকে হিসাবী-অর্থ (Money of account) এবং প্রকৃত-অর্থ (Actual money) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রকৃত অর্থ হইল, যে-মুদ্রার বা কাগজী নোটের সাহায্যে সমাজে

হিসাবী অর্থ ও বাস্তব অর্থ

বিনিময়ের কাজকর্ম চলে, যেমন পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স অথবা আমাদের দেশে ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত টাকা বা কাগজী নোটের টাকা। হিসাবী-অর্থ হইল যে-নামে একটি দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও বিনিময়ের লেনদেনের হিসাব রাখা হয়। সব দেশেই এমন একটি নাম থাকে যাহার দ্বারা সমস্ত হিসাব পরিরক্ষিত হয়, যেমন বৃটেনে স্টার্লিং, আমেরিকায় ডলার, ফ্রান্সে ফ্রাঙ্ক, রাশিয়ার রুবল্ ইত্যাদি। হিসাবী-অর্থ হইল সেই দেশের অর্থের নাম বা উপাধি মাত্র, প্রকৃত অর্থ হইল যে-বস্তুটি বিনিময়ের মাধ্যমরূপে হস্তান্তরিত হয়। নাম বা উপাধি স্থির ও সমান থাকিতে পারে, আসল অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। যেমন আমাদের দেশে টাকা এই নামটি হিসাবী-অর্থরূপে বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে, 1941 সালের পূর্বে প্রত্যেকটি

প্রকৃত মুদ্রাতে 160 গ্রেন রৌপ্য থাকিত, কিন্তু বর্তমানে প্রকৃত মুদ্রা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, ইহা নিকেলে প্রস্তুত বা কাগজী নোট।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃত অর্থকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, ধাতব অর্থ (Commodity money) ও প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ (Representative money) ধাতব অর্থ হইল যাহা ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত এবং যাহার উপরিলিখিত-মূল্য (Face-value) উহার অন্তর্নিহিত ধাতুর (Intrinsic value) মূল্যের সমান। এই ধাতব অর্থ যেরূপ বিনিময়ের মাধ্যম, তেমনই মূল্যের সঞ্চয়। কিন্তু প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হইলেও মূল্যের সঞ্চয় নহে। এই প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থকে (যেমন, কাগজী নোট) আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, রূপান্তর-যোগ্য (Convertible) ও রূপান্তরের অযোগ্য (Inconvertible)। যদি সেই কাগজী নোট ও প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থকে ধাতব অর্থে পরিবর্তিত করা যায় অর্থাৎ যদি আর্থিক কর্তৃপক্ষ কাগজী নোটের পরিবর্তে দেশের জনসাধারণকে ধাতব অর্থ দিতে বাধ্য থাকেন, তবে সেই অর্থকে রূপান্তর-যোগ্য প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ বলা যাইতে পারে। অপর পক্ষে, যদি আর্থিক কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থের পরিবর্তে ধাতব অর্থ দিতে বাধ্য না থাকেন, তবে উহাকে অরূপান্তরণীয় প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ বলা হইয়া থাকে।

ধাতব অর্থ ও প্রতিনিধিত্বমূলক অর্থ

তৃতীয়ত, অর্থকে আইন সিদ্ধ অর্থ (Legal tender) এবং ঐচ্ছিক অর্থে (Optional money) বিভক্ত করা যাইতে পারে। আইন-সিদ্ধ অর্থ হইল যাহার সাহায্যে যে-কোনরূপ বিনিময় করা সম্ভব এবং সমাজের সকল ব্যক্তি ঐ অর্থ দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে বা প্রদান করিতে বাধ্য। আইন যাহাকে অর্থ বলিয়া স্বীকার করে এবং জনসাধারণকে অর্থ হিসাবে মানিয়া লইতে চাপ দেয়, যাহা কেহ অর্থ বলিয়া স্বীকার না করিলে তাহা আইন-বিরোধী কাজ হয়, তাহার নাম আইন-সিদ্ধ মুদ্রা। ইহাকে প্রচলিত প্রধান অর্থও (Standard money) বলা হয়। ইহা ব্যতীত সমাজে আর একরূপ অর্থের প্রচলন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইল ঐচ্ছিক অর্থ। এই অর্থকে আমানতী অর্থও বলা যাইতে পারে। বর্তমান সমাজে বেশির ভাগ লেনদেন নগদ অর্থে হয় না, অন্তত বেশির ভাগ বৃহৎ লেনদেন প্রায়ই চেকের সাহায্যে হইয়া থাকে। লোকে ব্যাঙ্কে যে-অর্থ আমানত রাখে

আইন সিদ্ধ অর্থ ও ঐচ্ছিক অর্থ

তাহারে ভিত্তিতে চেক কাটিয়া সে দেনা মিটায়। এইরূপে যে-বিনিময় কাজ চলে তাহার মাধ্যম হইল চেক। আমানতকারীর উপর লোকের আস্থা আছে—এই জন্যই স্ব-ইচ্ছায় পাওনাদার চেক গ্রহণ করে, আইন তাহাকে জোর করিয়া চেক গ্রহণে বাধ্য করিতে পারে না। তাই ইহার নাম ঐচ্ছিক অর্থ। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের খাতাতেই হিসাব রক্ষিত হয়, সকল ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক দেনা-পাওনা কাগজে পত্রেই শেষ হইয়া যায়, ইহার দরুণ নগদ অর্থ প্রচলনের কোনরূপ প্রয়োজন হয় না। চেক যেহেতু বিনিময়ের মাধ্যম, সুতরাং ইহাও বিনিময়-ক্ষেত্রে প্রায় টাকার কাজ করে।

অর্থ বা টাকার প্রকৃতি (The Nature of Money)

সমাজবদ্ধ সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিচার করিলে দেখা যায় টাকাকড়ি বা অর্থের লেনদেনই এই সম্পর্কের ভরকেন্দ্র। সমাজের মানুষে মানুষে বহুবিচিত্র সকল প্রকার সম্পর্কের কেন্দ্রস্থল হইল টাকা। অর্থ বা টাকাকড়ির বৈশিষ্ট্য হইতে ইহা দেখা গিয়াছে। প্রথমত, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বেশির ভাগ দেনাপাওনাই টাকা দিয়া মেটানো হয়। জিনিসপত্র বা অপরের কাজকর্ম ক্রয় করা, শেয়ার ও বণ্ড কেনা, করপ্রদান সমস্ত কিছুই করা হয় টাকার সাহায্যে। এই কথাটির গভীর তাৎপর্য আছে। আমরা সকলে আমাদের সকল আয় পাই টাকার মাধ্যমে ; আমরা টাকা আয় করি এবং টাকাই ব্যয় করি। অপর কাহারও নিকট কোন-না কোন উপকরণ বিক্রয় করিয়াই আমাদের আয় হয়, তাই টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া আমাদের আয় হয় টাকা। দ্বিতীয়ত, যত রকম বিভিন্ন পদ্ধতিতে লোকে তাহাদের সম্পদ হাতে রাখে, তাহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হইল এই টাকা। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রায় প্রতিটি ব্যক্তির কিছু-না কিছু পরিমাণ টাকা হাতে আছে, কম হউক বা বেশি হউক।

টাকার দুইটি বৈশিষ্ট্য
১। টাকার রূপেই আয় দেখা দেয়

সমাজে বহু রকমের সম্পদ আছে, যেমন ঘর বাড়ি, জায়গা-জমি, খনি-কারখানা, শেয়ার, বণ্ড প্রভৃতি। কোন ব্যক্তির হাতে এই সকল বিষয় থাকিলে তাহার মনে হয় যে, সেই দ্রব্যটি বা অপর কোন কিছুর উপর তাহার অধিকার আছে। টাকাও এক ধরনের সম্পদ, ইহারও মূল কথা হইল অধিকার বা দাবি (claim)। কাগজের নোট হাতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দাবি থাকে, আবার চেক বই হাতে থাকিলে ব্যাঙ্কের উপর দাবি থাকে। অবশ্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য

২। ইহা দাবি বা অধিকার প্রকাশ করে

আছে। নগদ টাকা সকলে লইতে রাজি, কিন্তু পরিচিত লোক ছাড়া অন্য কেহ বিনা দ্বিধায় চেক লইতে রাজি নয়। উপরন্তু, দাবি বা অধিকার বলিলে আর একটি কথা বোঝা যায়। টাকার সাহায্যে যে-কোন জিনিস কেনা যায় বলিয়া আমরা বলিতে পারি যে, টাকা হাতে থাকিলে সমাজের সকল প্রকার দ্রব্যের উপর অধিকার বা দাবি জন্মায়। অর্থের বা টাকার সংজ্ঞা হিসাবে আমরা তাই বলিতে পারি, সমাজের সকল প্রকার বিনিময়যোগ্য দ্রব্যের উপর সাধারণভাবে যে-জিনিসটির দাবি বা অধিকার আছে, তাহাই টাকা।

টাকা বা অর্থের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে টাকা ছাড়া সমাজের অন্যান্য প্রকার সম্পদের কথাও অল্প আলোচনা করা দরকার। টাকা ছাড়া সমাজে আরও কতকগুলি জিনিসের মধ্যে এই অধিকার ও দাবি আছে। কোন ব্যক্তির হাতে যদি এমন একটি কাগজ বা দলিল থাকে যাহার সাহায্যে সে অল্প কিছুদিনের মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু পরিমাণ টাকা পাইবে, তাহা হইলে সেই দলিলটি নিশ্চয় এক ধরনের সম্পদ। ইহা টাকা নয়, কারণ সমাজের সর্বসাধারণ লেনদেনের ক্ষেত্রে সেই দলিলটি গ্রহণ করিতে না-ও রাজি হইতে পারে। তাহা ছাড়া, এই সকল দলিল বা ঋণপত্র হইতে এক ধরনের আয় পাওয়া যায় তাহাকে সুদ বলে।

এই দাবি বা অধিকার আরও কিছুর মধ্যে দেখা যায়

যে-সকল দলিল বা ঋণপত্র হইতে সুদ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে দুই ধরনের ঋণপত্র সম্পর্কে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার, ইহারা হইল বিল এবং বণ্ড। যে-সকল ঋণপত্রের নাম বিল, তাহাতে লেখা থাকে নির্দিষ্ট কিছুকাল পরে (সাধারণত 3 মাস) উল্লিখিত কিছু পরিমাণ টাকা দেওয়া হইবে। সুদের হার সম্পর্কে বিলে কোন কিছু লেখা থাকে না। লেখা না থাকিলেও সুদের হারের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, তাহা নয়। 1000 টাকার একটি বিল যদি আমি 990 টাকা দিয়া ক্রয় করি, তবে এই 990 টাকা খাটাইয়া তিনমাস পরে আমার 10 টাকা বেশি আয় হইল। ইহাই সুদ। আমরা হিসাব করিয়া বলিতে পারি যে, তিনমাসে 1%-এর অল্প একটু বেশি সুদের হারে আমি টাকা খাটাইলাম। বণ্ডের বিষয় একটু পৃথক। এইরূপ দলিলে লেখা থাকে যে, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সাধারণত এক বছরের শেষে, নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ টাকা সুদ হিসাবে এই দলিলের মালিক পাইবে। এই প্রতিশ্রুতি কয়েক বছরের জন্য দেওয়া হইতে পারে,

বিল ও বণ্ড কাহাকে বলে

তাহার পরে যে-মূলধন ঋণ লওয়া হইয়াছিল উহা ফেরৎ দেওয়া হয়। আবার এই প্রতিশ্রুতি অনির্দিষ্ট কালের জন্যও হইতে পারে।

বিল ও বণ্ডের মধ্যে এই পার্থক্য হইতেই জানা যায় সমাজে কত বিচিত্র ধরনে সুদের উদ্ভব হয়; এবং সুদ প্রদানশীল এই দলিলগুলি কত সূক্ষ্মভাবে শ্রেণীবিভক্ত। প্রথমত, বিল ও বণ্ড হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঋণের উপর সুদ দিবার প্রতিশ্রুতি দুইটি ধরনে প্রকাশ করা যাইতে পারে—ঋণ পরিশোধের মধ্যে ইহা লুকানো থাকিতে পারে (যেমন বিলের ক্ষেত্রে); অথবা পৃথকভাবে ইহা উল্লিখিত থাকিতে পারে (যেমন বণ্ডের ক্ষেত্রে)। দ্বিতীয়ত, ঋণ পরিশোধ পাইবার জন্য ঋণদাতাকে কতদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে সেই বিষয়েও ইহাদের মধ্যে বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। বিলকে সাধারণত গণ্য করা হয় স্বল্পকালীন ঋণ বলিয়া, আর বণ্ডকে গণ্য করা হয় দীর্ঘকালীন ঋণ হিসাবে। সাধারণত সুবিধার জন্য এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধ্য ঋণকে স্বল্পকালীন ঋণ বলে, আর উহার বেশি দিনের জন্য পরিশোধ্য ঋণকে দীর্ঘকালীন ঋণ বলে।

ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি

বিল ও বণ্ড ছাড়াও, আধুনিক সমাজে আর এক গুরুত্বপূর্ণ ধরনের দাবি বা অধিকার দেখা দিয়াছে, উহারা হইল শেয়ার বা স্টক। কোন একটি কোম্পানীর সম্পত্তির উপর মালিকানার অংশীদারত্ব স্বীকার করিয়া এই শেয়ারগুলি সর্বসাধারণের ক্রয়ের জন্য বাজারে ছড়ানো থাকে; ইহাদের ক্রয় করিলে কোম্পানীর কিছু পরিমাণ মুনাফার উপর অধিকার বা দাবি জন্মায়। শেয়ার হইতে আয় সম্পূর্ণ অনিশ্চিত. কোম্পানীর পরিচালনার সাফল্যের উপর নির্ভর করে আয় হইবে কি না, এমন কি মূলধনের বাজার-মূল্য বজায় থাকিবে কি না। এই সকল শেয়ারের ক্রয় সম্পর্কে তাই ঝুঁকি লইতে হয়, বিভিন্ন রকমের শেয়ার থাকে বলিয়া কেউ কম বা কেউ বেশি ঝুঁকি লইতে পারেন।

ইহাদের সঙ্গে শেয়ারের পার্থক্য আছে

ইহা ছাড়াও সমাজে বহু প্রকার সম্পত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বহু বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, যে-রূপ ধারণ করিলে মালিকের সুবিধা হয়, ইহারা সেইরূপে অবস্থিত থাকে, যেমন ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, জায়গা-জমি, রাস্তাঘাট প্রভৃতি। সমগ্র দেশের দিক হইতে দেখিতে গেলে সমাজের মোট সম্পদ এই সকল বিভিন্ন রূপ লইয়া অবস্থান করে।

এই সকল ছাড়া বহুবিধ রূপে সমাজে সম্পদ অবস্থান করে

টাকা (money) ; বিভিন্ন প্রকার দাবি ও অধিকার (claims) ; এবং এই সকল সম্পত্তি (assets) – ইহা ছাড়া, আর এক ধরনের সম্পদ (wealth) আছে, যাহাদের উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। ইহাদের কোন বাস্তব রূপ নাই, ইহারা অশরীরী সম্পত্তি (incorporeal assets), যেমন ব্যবসায়ের সুনাম (good will), সরকারী মালিকানা স্বীকার (patent rights), ব্যক্তির দক্ষতা ও জ্ঞান প্রভৃতি (skill and knowledge)। এই সকল বিষয়কে কেবলমাত্র উহার মালিকের দৃষ্টিতে দেখিলেই সম্পদ বলা চলে ; সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী ইহাদের আমরা মোট সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি না।

কতকগুলির আবার বাস্তব রূপ নাই

আর্থিক বিশ্লেষণের তাৎপর্য (Significance of Monetary Analysis)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে. অর্থসংক্রান্ত ঘটনাসমূহ সমাজের প্রকৃত ঘটনার রূপ ও গতি-প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে ; বিনিময়-কাঠামোর প্রকৃত গতিবিধি অর্থরূপ পর্দার অন্তরালে ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা তাই প্রধানত উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগ-কার্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন, যোগান ও চাহিদার 'প্রাকৃতিক' নিয়মসমূহ অর্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না, অর্থ এই সকল নিয়মের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ বা বিকৃত করিতে পারে না ; অর্থ নৈতিক আচরণ (economic behaviour) নিরূপণকারী এই সকল মৌলিক নিয়মসমূহ আর্থিক বিষয়ের দ্বারা বিচলিত হয় না।

ক্লাসিকাল ধারণা

এইরূপ ধারণা থাকার মূল কারণ হইল, তাঁহারা অর্থের নিজস্ব মূল্য অপরিবর্তিত মনে করিতেন। বলা চলে, তাঁহারা কার্যত অর্থের মূল্যকে স্থির অপরিবর্তনশীল ধরিয়া লইতেন। অর্থের মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ সমাজের সামগ্রিক দামস্তর স্থির ধরিয়া লইলে আর্থিক বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন থাকে না, অর্থের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করিয়া পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের দাম বা ফার্ম বা শিল্পের ভারসাম্যাবস্থা বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হয়।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থের মূল্য কখনই স্থির থাকে না, দাম-স্তর সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল, ইহা ধরিয়া লইয়াই আধুনিক কালের আর্থিক তত্ত্বসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থের মূল্য বা দামস্তরের ভারসাম্য যে-সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ ভারসাম্যের (Monetary equilibrium) শর্ত-নিরূপণ

আধুনিক ধারণা

বর্তমান যুগের আলোচনায় অন্যতম প্রধান অংশ গ্রহণ করে। অর্থের মূল্যকে অস্থির ও চঞ্চল গণ্য করিয়াও তাহাকে স্থির ও অচঞ্চল রাখার প্রয়াস আধুনিক ধনবিজ্ঞানে আর্থিক তত্ত্বের লক্ষ্য।

আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে গতিশীলতা আনিয়া দেওয়া ব্যাপক অর্থ ব্যবহারের প্রধান ফল। বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু বন্ধন অর্থের অন্যতম প্রধান কাজ এবং ইহারই ফলে সমাজে এই গতিশীলতার সৃষ্টি হয়। ভবিষ্যতের দামস্তর বা অর্থের মূল্য সম্বন্ধে ধারণা বর্তমান কালের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে।

অর্থ ও সমাজ-দেহ

অর্থের ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন সমগ্র সমাজের মোট উৎপাদন, মোট কর্মনিয়োগ, মোট আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে পরিবর্তিত করিয়া সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করিতে পারে। সমাজের বহু সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য করে এই অর্থ; এবং তাই আর্থিক নীতি ও কৌশল (Monetary policy) অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশলের (Economic policy) অবিচ্ছেদ্য অংশ। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ অর্থের মূল্যকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহেন, যাহাতে সমাজে উৎপাদন, পূর্ণ কর্মসংস্থান বা অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

কিন্তু আর্থিক তত্ত্বালোচনা যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, ইহা প্রধানত স্বল্পকালীন বিশ্লেষণ, কারণ স্বল্পকালেই আর্থিক শক্তিগুলির প্রভাব তীব্রভাবে অনুভব করা যায়, দামস্তর এবং আয়স্তর বিশেষভাবে উঠানামা করে। সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির (Economic growth) দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে আর্থিক তত্ত্বসমূহের গুরুত্ব অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অনেক কম; উহার আলোচনায় যন্ত্র-কৌশলগত (Technological), প্রতিষ্ঠানগত (Institutional) এবং কাঠামোগত (Structural) বিষয়ের পরিবর্তন প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ও অর্থের ভূমিকা

ইহাও মনে রাখা দরকার যে, আর্থিক পদ্ধতিসমূহ অন্যান্য অনার্থিক (non-monetary) পদ্ধতিসমূহের সাহায্য লাভ ব্যতীত কোন সময়ে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। শুধু আর্থিক ও কর-কৌশল (Monetary and fiscal policies) সমাজের সকল মৌলিক সমস্যার মূলোদ্‌ঘাটন ও সমাধান করিতে পারে না। রবার্টসন বলিয়াছেন, "সমাজের প্রকৃত অর্থনৈতিক আপদ

(economic evils) হইল অপ্রচুর উৎপাদন এবং অসম বণ্টন, ইহারা নিছক আর্থিক মলমের প্রয়োগে দূর হইবার নয়''। সুতরাং আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ যতই শুধু আর্থিক সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করুন-না-কেন, সমাজে মৌলিক ও প্রকৃত শক্তিসমূহের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে অর্থের বিশ্লেষণকে প্রধান স্থান দেওয়া চলে না।

অনুশীলনী

1. What is money ? Discuss its chief functions.

2. What were the difficulties of Barter Economy ? How money has facilitated economic transactions ?

3. Money has been classified in your text book as follows :

(i) Standard money.

(ii) Representative money.

(iii) Credit money :—(a) Token money, (b) Government Notes, (c) Bank Notes. Explain and illustrate this classification.

4. Define Money. "There are different degrees of money." Explain.

5. Discuss the Significance and role of Money in a modern economy.

৩

আর্থিক ব্যবস্থা

Monetary Systems

আর্থিক ব্যবস্থা কাহাকে বলে এবং উহা কয় প্রকার

যে পদ্ধতিতে কোন দেশের অর্থ প্রচলিত রাখা হয় এবং তাহার পরিমাণ ও মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহাকে আর্থিক ব্যবস্থা বলে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে তিনপ্রকার আর্থিক ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় ; একধাতুমান, দ্বিধাতুমান এবং কাগজীমান। একধাতুমান ব্যবস্থায় আইনসিদ্ধ মুদ্রা স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা প্রস্তুত হয়। এরূপ ব্যবস্থায় ইহাকে হয় স্বর্ণমান অথবা রৌপ্যমান বলা হয়। দ্বিধাতুমান অবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুদ্বারা প্রস্তুত দুই প্রকার মুদ্রা প্রচলিত থাকে ; ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়-হার সরকারীভাবে নির্দিষ্ট থাকে। কাগজীমান অবস্থায় কাগজের নোটসমূহ আইনসিদ্ধ অর্থরূপে সমাজ দেহে প্রচলিত থাকে।

দ্বিধাতুমান (**Bimetallism**)

দ্বিধাতুমানের বৈশিষ্ট্য

দ্বিধাতুমানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে দুইটি ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা আইনসিদ্ধ ভাবে প্রচলিত থাকিবে যেমন (সোনা ও রূপা) ; সরকারীভাবে নির্দিষ্ট বিনিময়-হার অনুযায়ী ইহাদের পারস্পরিক বিনিময় হইবে ; দেশে মুদ্রায়ন (coinage) প্রচলিত থাকিবে, অর্থাৎ সোনা এবং রূপা লইয়া টাঁকশালে গেলে কোন খরচ না লইয়া বা অতি অল্প ব্যয়ে মুদ্রা প্রস্তুত করা সরকারী নীতিসম্মত। যখন এরূপ নিয়ম থাকে যে, একটি ধাতু মুদ্রায়নের জন্য গৃহীত হয় এবং অন্য ধাতুটি গৃহীত হয় না ; তখন তাহাকে খঞ্জমান (**Limping Standard**) বলা হয়।

দ্বিধাতুমানের বহু সুবিধা আছে। প্রথমত, স্বর্ণমান বা রৌপ্যমানের তুলনায় এই ব্যবস্থায় দামস্তর অধিকতর স্থির থাকে। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের

প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ বাড়ানো সহজ হয়, কারণ একটি ধাতুর যোগান কম পড়িলে অন্য ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো যায়। অথবা যখন কোন একটি ধাতুর যোগান বৃদ্ধি পাইতেছে তখন অপর ধাতুটির যোগান কমিয়া যাইতে পারে, ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা এড়ানও সম্ভবপর। শুধু স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে, পৃথিবীর সকল দেশেই স্বর্ণের প্রয়োজন বেশি হইত। এই অবস্থায় স্বর্ণের যোগান পর্যাপ্ত না হইবার সম্ভাবনা; ফলে দামস্তর নামিয়া আসিতে পারে এবং ব্যবসায় সংকট শুরু হইতে পারে। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে ইহা সুবিধাজনক, কারণ তাহারা যে-কোন ধাতুর সাহায্যে নিজেদের নিম্নতম জমার ভাণ্ডার রক্ষা করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, রৌপ্য উৎপাদনকারী দেশসমূহ রৌপ্য বিক্রয় করিতে না পারিলে নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে পারিত না; তাই রৌপ্যের অর্থগত ব্যবহারের ফলে তাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকিতে পারে। এই যুক্তি এক সময়ে দ্বিধাতুমানের স্বপক্ষে প্রবলভাবে প্রচারিত হইল। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক দ্বিধাতুমান আপনাআপনি বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির রাখে, কারণ স্বর্ণ ব্যবহারকারী দেশসমূহ এবং রৌপ্য ব্যবহারকারী দেশসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে ধাতু-বিনিময় সম্ভবপর হইয়া থাকে। যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়-হার নির্দিষ্ট থাকে, সেই কারণে বৈদেশিক বিনিময় হারও স্থির থাকে।

সুবিধা

দ্বিধাতুমানের অসুবিধা হইল, যদি দুইটি ধাতুর উৎপাদন ও যোগান পরস্পর-বিরোধী দিকে না হইয়া একই দিকে ধাবিত হয়, তাহা হইলে ফলে হয় প্রবল মুদ্রাস্ফীতি নতুবা প্রবল মুদ্রাসঙ্কোচন ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের পক্ষে দ্বিধাতুমান বজায় রাখা শক্ত, কারণ গ্রেশামের নিয়ম অনুযায়ী স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাজার-মূল্য সরকারী মূল্য হইতে পৃথক হইলে 'নিকৃষ্ট' অর্থ (অর্থাৎ বাজারে যাহার মূল্য কমিয়া গিয়াছে) বা এইরূপ ধাতু মুদ্রা 'উৎকৃষ্ট' অর্থকে, (অর্থাৎ বাজারে যাহার মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে) এইরূপ ধাতুমুদ্রাকে বাজার হইতে অপসারিত করে। দুইটি ধাতুমুদ্রা লইয়া ফাটকাদারি বৃদ্ধি পায়, দেশের বিনিময় কাঠামো বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা যায় যে, কার্যত একধাতুমান প্রচলিত থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল দেশ যদি দ্বিধাতুমান গ্রহণ করে, তবেই ইহার সাফল্য সম্ভবপর।

অসুবিধা

আধুনিক কালে দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা কোথাও প্রচলিত নাই এবং ভবিষ্যতেও প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে। কাগজী অর্থের বহুল ও ব্যাপক প্রচলন রৌপ্যের পুনরর্থীকরণের (**Remonetisation of silver**) সম্ভাবনা বিশেষভাবে কমাইয়া দিয়াছে।

গ্রেশামের নিয়ম (Greshm's Law)

উৎপত্তি

ইংলণ্ডে টিউডার রাজবংশের স্বেচ্ছাচারী রাজবৃন্দ নিকৃষ্ট মুদ্রা বাজারে প্রচলন করিয়াছিলেন। এলিজাবেথ রাণী হইয়া ঐ নিকৃষ্ট ধরনের মুদ্রাগুলিকে অসম্মান-জনক বিবেচনা করিয়া উৎকৃষ্ট ধরনের মুদ্রা প্রচলিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি যতই উৎকৃষ্ট মুদ্রা বাজারে ছড়ান না কেন, নিকৃষ্ট মুদ্রা-গুলি প্রচলিত হইতে লাগিল, উৎকৃষ্ট মুদ্রাসমূহ বাজার হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। রাণী বার বার চেষ্টা করিয়াও উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বাজারে প্রচলিত করিতে পারিলেন না, অবশেষে তাঁহার আর্থিক উপদেষ্টা টমাস গ্রেশামকে ইহার কারণ দর্শাইতে বলিলেন। গ্রেশাম এই ঘটনার যে-কারণগুলি দেখাইলেন, তাহাই পরে গ্রেশামের নিয়ম নামে পরিচিত হইল।

নিয়ম

গ্রেশামের নিয়ম হইল, কোন সমাজে যদি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ধরনের অর্থ পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তবে নিকৃষ্ট অর্থ উৎকৃষ্ট অর্থকে প্রচলন ধারা হইতে অপসারিত করিয়া দেয়। যদি গুণ বা মূল্যের দিক হইতে পৃথক একটি উৎকৃষ্ট ও একটি নিকৃষ্ট প্রকার অর্থ একই সঙ্গে আইন-সিদ্ধ অর্থ হিসাবে বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে কিছুদিন পরে দেখা যাইবে উৎকৃষ্ট প্রকার অর্থ আর প্রচলন-ধারার মধ্যে নাই, নিকৃষ্ট প্রকার অর্থ-ই সমাজের সকলের মধ্যে হস্তান্তরিত হইতেছে। 'যখন উভয়েই সীমাহীনভাবে আইনসিদ্ধ, তখন নিকৃষ্ট-প্রকার অর্থ উৎকৃষ্ট-প্রকার অর্থকে প্রচলন ধারা হইতে অপসারিত করিবে'' —সংক্ষেপে ইহাই হইল গ্রেশামের নিয়ম।

এই নিয়মে অর্থের উৎকর্ষ বা নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নিকৃষ্ট অর্থ বলিতে অচল মুদ্রা বা অর্থ বুঝায় না। গুণ বা ধাতুগত মূল্যে দিক হইতে যাহার মূল্য অপরের তুলনায় কম, তাহাকেই তুলনামূলকভাবে নিকৃষ্ট বলা যাইতে পারে। যেমন, যখন দেশে কেবলমাত্র স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত মুদ্রার

প্রচলন থাকে তখন পুরাতন, ঘষা, ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি তুলনামূলকভাবে নূতন, পরিমাণে বেশি ধাতুযুক্ত, এখনও পর্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, এইরূপ উৎকৃষ্ট অর্থের তুলনায় নিকৃষ্ট। যখন ধাতব মুদ্রা এবং কাগজী নোট পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তখন যেহেতু কাগজী অর্থের বস্তুগত মূল্য কম, সেই হেতু তাহারা নিকৃষ্ট। যখন সমাজের আর্থিক কাঠামো দ্বি-ধাতুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত তখন দুইটি ধাতু-মুদ্রার বাজার-দর এবং সরকারী দরের তারতম্য অনুযায়ী যাহার মূল্য কম তাহা নিকৃষ্ট।

কারণসমূহ

কি-ভাবে এই নিকৃষ্ট-প্রকার অর্থ উৎকৃষ্ট-প্রকার অর্থকে বাজার হইতে অপসারিত করে? কি-কারণে উৎকৃষ্ট অর্থ দেশের প্রচলন-ধারা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়? তিনটি কারণের সাহায্যে এই ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রথমত, স্বর্ণ বা রৌপ্যের ধাতু হিসাবে মুদ্রাতে ব্যবহৃত হওয়া ব্যতীত আরও অনেক ধরনের অনার্থিক (non-monetary) ব্যবহার আছে। উৎকৃষ্ট ধরনের মুদ্রাগুলির ভিতরে ধাতুর পরিমাণ বেশি থাকায় লোকে সেইগুলি সর্বাপেক্ষা পূর্বে গলাইয়া ফেলিবে। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী রপ্তানীকারিগণ মুদ্রার ভিতরকার ধাতুর পরিমাণ অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিবে; সুতরাং, যে-সকল মুদ্রার মধ্যে ধাতুর পরিমাণ বেশি, সেইগুলি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অর্থগুলি দেশের বাহিরে চলিয়া যাইবে। তৃতীয়ত, লোকের স্বভাব হইল উৎকৃষ্ট-প্রকার অর্থ যতক্ষণ সম্ভব নিজেদের নিকট রাখিয়া দেওয়া; বিনিময় ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট-প্রকার অর্থই তাহারা প্রথমে চালাইবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং, উৎকৃষ্ট অর্থ লোকের জিম্মায় থাকিবে, প্রচলন-ধারা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, এবং নিকৃষ্ট ধরনের অর্থ প্রচলিত হইতে থাকিবে।

এই নিয়ম যাহাতে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী না হয়, সেই উদ্দেশ্যে আধুনিক কালের আর্থিক কর্তৃপক্ষ সর্বদাই পুরাতন, ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রা বা নোটকে বাজার হইতে অপসারিত করিয়া নতুন উৎকৃষ্ট ধরনের অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে ছাড়িয়া দেন।

বাস্তবক্ষেত্রে দুইটি বিশেষ অবস্থায় এই নিয়ম কার্যকরী হইবে না। যদি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় প্রকার অর্থের মোট পরিমাণ, সমাজের বিনিময়-কার্যে মাধ্যমের নিকট প্রয়োজনের তুলনায় কম হয় তবে এই নিয়ম কার্যকরী হইবে না। দ্বিতীয়ত, যদি নিকৃষ্ট অর্থ এতই নিকৃষ্ট হয় যে লোকে ইহা মোটেই গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না, তবে বাধ্য হইয়াই উৎকৃষ্ট অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে চলিতে থাকিবে।

সীমাবদ্ধতা

৩

স্বর্ণমান (Gold Standard)

যখন কোন দেশের প্রধান আইনসিদ্ধ অর্থ হইল সোনার দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা এবং এরূপ কাগজী অর্থ যাহার বিনিময়ে সরকারী মুদ্রা-দপ্তর হইতে নির্দিষ্ট হারে সোনা পাওয়া সম্ভবপর, তখন সেইরূপ আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণমান বলা হয়। পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হইবার সময় হইতে সোনা প্রধান বিনিময়ের মাধ্যম হিসাব প্রচলিত হইতেছে এবং বহুদেশ নিজেরা স্বর্ণমান গ্রহণ করায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও স্বর্ণের সাহায্যে লেনদেন চলিত। অর্থের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলেই পৃথিবীতে এককালে স্বর্ণমানের উদ্ভব ও প্রচলন হইয়াছিল।

স্বর্ণমান কাহাকে বলে

স্বর্ণমান প্রচলিত থাকায় স্বর্ণ ও অর্থের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল; স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত, স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া গেলে অর্থের পরিমাণও হ্রাস পাইত। স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, হয় সেই স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত হইত অথবা সেই স্বর্ণকে মজুত করিয়া ব্যাঙ্কগুলি দেশে ঋণগত অর্থের (Credit Money) পরিমাণ বাড়াইয়া দিত। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি এমনভাবে পরিচালিত হইত যাহাতে স্বর্ণের যোগান বৃদ্ধি পাইলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে, এবং স্বর্ণের যোগান কমিলে অর্থের যোগানও কমিয়া যাইতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এইরূপ স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে ইহা স্বয়ংক্রিয় মানরূপে (Automatic Standard) বিভিন্ন দেশের দামস্তর ও লেনদেন ব্যালান্সের (Balance of Payments) ভারসাম্য রক্ষা করে। প্রত্যেকটি দেশের বৈদেশিক বিনিময়-হারে ভারসাম্য আপনা-আপনি রক্ষিত হয়। এই স্বয়ংক্রিয়তা (Automatism) স্বর্ণমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ বলিয়া পরিগণিত হইত।

যদি এইরূপ অবস্থায় কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল (unfavourable) হইয়া উঠে, অর্থাৎ রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হয়, তবে সেই দেশ হইতে স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইবে। স্বর্ণের পরিমাণ কম হওয়ায় দেশে মুদ্রা সঙ্কোচন (Currency Contraction) ঘটিবে, দামস্তর নামিয়া আসিবে। অপরপক্ষে, যে-দেশের লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল (favourable) হইয়াছিল, সেই দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিবে, মুদ্রাপ্রসার (currency expansion) ঘটিবে,

স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয় গতি-পদ্ধতি

এবং দামস্তর ঊর্ধ্বে উঠিবে। দুই দেশের দামস্তর এইরূপ পরিবর্তিত হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি ও পরিমাণে পরিবর্তন আসিবে। যে-দেশের দামস্তর কম, ক্রমে সেই দেশ অধিক রপ্তানি করিতে সক্ষম হইবে ও স্বর্ণ ফিরিয়া পাইবে; যে-দেশের দামস্তর অধিক, তাহার রপ্তানি কমিবে এবং স্বর্ণ দেশের বাহিরে চলিয়া যাইবে। পুনরায় স্বর্ণের আনাগোনা শুরু হইবে, এবং ক্রমে দুই দেশের দামস্তর এরূপ অবস্থায় আসিবে যখন স্বর্ণের আনাগোনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বৈদেশিক বাণিজ্যের দরুন লেনদেনের মারফত পৃথিবীর স্বর্ণ বিভিন্ন দেশে বণ্টিত হইয়া থাকিবে।

স্বর্ণমান ব্যবস্থার এই স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্য সাধনের কারণ দুই দিক হইতে দেখা চলে: ব্যাঙ্কিং-প্রতিক্রিয়া ও গুণক-প্রতিক্রিয়া। দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া গেলে অর্থের যোগান হ্রাস পাইবে, ফলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের ঋণদানের পরিমাণ ও নীতি সংকুচিত করিবে। স্বর্ণ প্রবেশ করিতে থাকিলে ইহার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হইবে, অর্থাৎ টাকার যোগান বৃদ্ধি পাইবে, সুদের হার হ্রাস পাইবে, ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের ঋণদানের পরিমাণ ও নীতি প্রসারিত করিবে। এই ব্যাঙ্কিং প্রতিক্রিয়ার কিছুটা পরিবেশের প্রভাব আছে (palliative effects), তাহা আমাদের মনে রাখা দরকার। সুদের হার বাড়িলে স্বর্ণক্ষয়শীল দেশে বাহির হইতে কিছুটা স্বল্পকালীন মূলধন (short term capital) প্রবেশ করিতে থাকিবে। উপরন্তু, সুদের হার বাড়িলে পরোক্ষভাবে আমদানি কিছুটা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা, কারণ, ব্যবসায়ীদের টাকা ঋণ করার খরচা বেশি। গুণক-প্রতিক্রিয়ার কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার, কারণ ইহা দ্বারাও স্বর্ণমানের সামঞ্জস্য সাধনকারী ধারা প্রভাবিত হয়। স্বর্ণ বাহির হইতে থাকিলে দেশের মধ্যে সংকোচক শক্তিসমূহ কাজ করিতে শুরু করে। স্বর্ণ প্রবেশ করিতে থাকিলে প্রসারশীল শক্তিগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্কিং-প্রতিক্রিয়া ও গুণক-প্রতিক্রিয়ার মিলিত ফলে দেশে অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তর (level of business activity) হয় নিচে নামিবে, অথবা উপরে উঠিবে। অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তর হ্রাস পাইলে অর্থাৎ উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ কম হইলে সেই দেশের আমদানি হ্রাস পাইবে। আবার অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তর উচ্চে উঠিলে অর্থাৎ উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেশি হইলে সেই দেশে বাহির হইতে আমদানির পরিমাণ বাড়িবে। ইহার ফলে স্বর্ণক্ষয়শীল দেশ হইতে স্বর্ণক্ষয়ের

ব্যাঙ্কিং প্রতিক্রিয়া ও গুণক প্রতিক্রিয়া

পরিমাপ কমিয়া আসিবে, আবার স্বর্ণবৃদ্ধিশীল দেশে স্বর্ণবৃদ্ধির পরিমাণ হ্রাস পাইবে। আয় ও কর্মসংস্থানের এই উঠা-নামা কেবলমাত্র নিজেদের প্রভাবের মধ্য দিয়া দুই দেশে ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিতে পারে না বটে, কিন্তু ব্যাঙ্কিং ও গুণক-প্রতিক্রিয়া অনেকখানি বৈদেশিক লেনদেনের খাতে ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করে।*

স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্যসাধনের এই ধারা সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা দরকার। এই ভারসাম্যে যখন কোন দেশ পৌঁছিবে, তখন উহার বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার ব্যালান্সই রক্ষিত হইবে। একমাত্র বাহ্য ব্যালান্স থাকিলেই স্বর্ণের স্রোত (আগমনের বা বহির্গমনের) বন্ধ থাকিবে, ফলে আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স বা ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার কোন ভয় থাকিবে না। প্রতিটি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স বজায় থাকিলে তবেই উহার দামস্তর ও আয়স্তর সমান থাকিবে, বাহ্য ব্যালান্স ভাঙিবার মত প্রভাব দেশের মধ্যে দেখা দিবে না। ভারসাম্যের একমাত্র সম্ভাবনা হইল যখন উভয় দেশের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ভারসাম্য বজায় আছে, কারণ কোন দেশে ইহার কোন একটিতে পরিবর্তন দেখা দিলে উভয় দেশেই উভয় প্রকার ভারসাম্যে বিচ্যুতি দেখা দিতে থাকিবে।

উভয় দেশে উভয় প্রকার ভারসাম্য থাকাই ব্যালান্সের মূল কথা

পূর্ণ ও দ্রুত ভারসাম্যের শর্ত (Conditions of full and rapid Adjustment)

আমরা আলোচনা করিলাম যে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় এই ধারা পূর্ণ ভারসাম্যে তখনই পৌঁছিতে পারে যেখানে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স বজায় আছে। কিন্তু এই ধারার মধ্যে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই যে কোনরূপ ভারসাম্য নিশ্চয় স্থাপিত হইবে। উপরন্তু, এই ভারসাম্য অতি দ্রুত ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহারও কোনরূপ স্থিরতা নাই। সুতরাং ভারসাম্যে পৌঁছানোর শর্ত এবং তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর শর্ত দুইটি বিষয়ই আলোচনা করা দরকার।

3. * "The two forces that set the gold standard adjustment process in montion...are the banking reaction...and the multiplier induce reactions. ...In general and in the long run the banking forces and the multiplier forces operate together. Both forces lead to a change in the level of activity, which is an essential stage in the adjustment process in gold standard conditions in industrialized countries ..But in so doing they cause a serious disturbance in internal balance in both countries." A. C. L Day, *Outline of Monetary Economics.* P. 483-5.

প্রথমত, সামঞ্জস্য সাধনের এই ধারার একটি মূল কথা হইল অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তরে উপযুক্ত পরিবর্তন আসা এবং একমাত্র এই ধারার শেষেই পরিপূর্ণ আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য ফিরিয়া আসিতে পারে। যদি উভয় দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তরে পরিবর্তন না হয় তবে ভারসাম্য ফিরিয়া আসা সম্ভব হয় না। কিন্তু দামস্তরে পরিবর্তন আনিতে হইলে দেশের মজুরি ও দাম-কাঠামো (wage and price structure) খুবই নমনীয় হওয়া দরকার। তবেই অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিমাণে পরিবর্তনের স্তরগুলি অল্প সময়ে পার হইয়া আসা চলে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই খেলার নিয়মগুলি (rules of the game) পালন না করিলেও ভারসাম্য ফিরিয়া আসিতে পারে যদি স্বয়ংক্রিয় গুণকের সাহায্যে দেশে আয়স্তরের প্রসার বা সংকোচন ঘটে। ইহা সম্ভব, কারণ ব্যাঙ্কিং নীতি অপরিবর্তিত থাকিলেও আয়স্তরে পরিবর্তন দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তরে কিছুটা পরিবর্তন আনিতে পারে। তৃতীয়ত, দামস্তরে কিছুটা পরিবর্তন যদি লোকের মনে ফাটকা-বাজির প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দিয়া সেই পরিবর্তনের গভীরতা বাড়াইয়া দেয় তবে ইহার ফলে ভারসাম্য ফিরিয়া আসিতে পারে না। যেমন, দামস্তর হ্রাস পাইল, আরও দাম কমিবার আশায় ক্রেতারা ক্রয় করা স্থগিত রাখিল, ইহাতে দামস্তর আরও হ্রাস পাইবে। এইরূপ অবস্থায় ভারসাম্যবিন্দুর আশেপাশে অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তর উঠানামা (oscillate) করিবে, কিন্তু ভারসাম্যে পৌঁছিবে না।

পূর্ণ ভারসাম্যের শর্তগুলি

চতুর্থত, সামঞ্জস্য সাধনের এই ধারা ভারসাম্যে না-ও পৌঁছিতে পারে যদি উভয় দেশেই আমদানির প্রান্তিক প্রবণতা (marginal propensity to import) খুব বেশি হয়। যে-দেশটি হইতে স্বর্ণ বাহির হইতেছে, উহার দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান স্তর হ্রাস পাওয়া দরকার। পরবর্তী বাণিজ্যকালে ইহার আমদানি কম হওয়া প্রয়োজন এবং রপ্তানির আধিক্য দরকার। যদি ইহার প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা বেশি থাকে, তবে এই ধারা সম্ভব না-ও হইতে পারে। ঠিক একই কারণে, যদি উভয় দেশেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাগুলির মোট সমষ্টি (the sum of the price elasticities of demand) কম হয়, তবে এইরূপ ভারসাম্য না-ও আসিতে পারে।

উপরের এই শর্তগুলি বজায় থাকিলেও ভারসাম্যে পৌঁছানোর পথ অতি দীর্ঘ হইতে পারে, ফলে এই পথে গুরুত্বপূর্ণ ভাঙাগড়ার (serious fluctuations)

সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুতরাং দ্রুত ভারসাম্যে পৌঁছিবার শর্তগুলি আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, স্বর্ণমান ব্যবস্থার "খেলার নিয়মগুলি" সকলের মানিয়া চলা চাই। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি ভারসাম্য ঘটাইতে হয়তো পারে ঠিকই, কিন্তু তাহাতে দেরি হইতে পারে। সকল খেলোয়াড় যদি সচেতনভাবে এই নিয়মগুলিকে অনুসরণ করে, তবে ইহা দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইতে পারে। যেমন, স্বর্ণের আনাগোনায় কেহ কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ করিবে না, ইহার প্রভাব সুদের হার, দামস্তর ও আয়স্তরের উপর পড়িবে, তাহাতে কেহ বাধা দিবে না। দ্বিতীয়ত, ভারসাম্য দ্রুত ফিরিয়া পাওয়া যায় যদি দেশের দাম ও মজুরির কাঠামো নমনীয় হয়। তৃতীয়ত যদি উভয় দেশের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাগুলি প্রবল হয়, তবে দ্রুত ব্যালান্স ফিরিয়া আসে। সর্বোপরি, কোন দেশে দামস্তর বাড়িলে ফাটকাবাজি যাহাতে শুরু হইয়া না যায় অর্থাৎ দামস্তরের উপর ফাট্‌কাবাজির প্রভাব কম পড়ে, তাহাও লক্ষ্য রাখা দরকার।

দ্রুত ভারসাম্যের শর্তগুলি

স্বর্ণমানের এইরূপ স্বয়ংক্রিয় গতিবিধির পূর্ণ সাফল্যের জন্য (Full equilibrium under gold standard adjustment process) কয়েকটি শর্ত বজায় থাকা চাই। প্রথমত, স্বর্ণের আনাগোনায় কোনরূপ বাধানিষেধ থাকা চলিবে না। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার স্বর্ণের আনাগোনার ফলে দামস্তরের উপর ইহার হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। স্বর্ণের আনাগোনায় বাধানিষেধ থাকিলে বা উহা দামস্তরের উপর প্রভাব ফেলিতে না পারিলে লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্যবিহীনতা দূর হইতে পারে না। স্বর্ণমান সফল ভাবে চালাইতে গেলে এই সকল "খেলার নিয়ম" (Rules of the gold standard game) মানিয়া চলিতে হয়।

সাফল্যের সম্ভাবনা

স্বর্ণমানের বিভিন্ন রূপ (Different types of gold standard)

স্বর্ণের সহিত দেশে প্রচলিত অর্থের সম্পর্কের গভীরতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের স্বর্ণমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে দেখা গিয়াছে।

(১) স্বর্ণমুদ্রামান বা বিশুদ্ধ স্বর্ণমান (Gold currency standard or the pure Gold Standard)

1914 সালের পূর্বে ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং আরও কয়েকটি দেশে বিশুদ্ধ স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা প্রধান অর্থরূপে প্রচলিত থাকে ; মুদ্রাকর্তৃপক্ষ (Currency Authority) আইনত স্বর্ণের বদলে অধিবাসীদিগকে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন এবং দেশের ভিতরে বা বাহিরে স্বর্ণের যাতায়াতের উপর কোন প্রকার বাধা-নিষেধ থাকে না।

(২) স্বর্ণধাতুমান (The gold Bullion Standard)

যখন দেশে স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকে না, কাগজীমুদ্রার দ্বারাই দেশের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ চলে, মুদ্রাকর্তৃপক্ষ আইনত স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দিতে বাধ্য থাকেন না, তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের জন্য নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ বিক্রয় করেন বা নির্দিষ্ট হারে লেনদেন করেন, তখন এইরূপ আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণধাতুমান বলা হয়। 1925 সাল হইলে 1931 সালের মধ্যে ইংলণ্ডে এবং 1927 সাল হইতে 1931 সালের মধ্যে ভারতবর্ষে এইরূপ স্বর্ণধাতুমান প্রচলিত ছিল।

(৩) স্বর্ণবিনিময় মান (Gold Exchange Standard)

1898 সাল হইতে 1931 সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণ-বিনিময় মান বলা হইত। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকে না, মুদ্রাকর্তৃপক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিবার জন্য স্বর্ণ গ্রহণ করেন না বা স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয়ও করেন না। তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদানের জন্য প্রয়োজন হইলে নির্দিষ্ট হারে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে এমন কোন দেশের মুদ্রা বিক্রয় করেন, যাহা স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৪) স্বর্ণ মজুত মান (Gold Reserve Standard)

এইরূপ ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকে না, কাগজী নোট বা অপর কোন মুদ্রা চালু থাকিতে পারে। মুদ্রাকর্তৃপক্ষ স্বর্ণের বা বৈদেশিক মুদ্রার একটি ভাণ্ডার গঠন করেন এবং মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়-হারের উঠানামা নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহাতে

ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত সেই ভাণ্ডার হইতে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়বিক্রয় করেন। এইরূপ ভাণ্ডারকে বিনিময়-হারে সমতারক্ষাকারী ভাণ্ডার (Exchange Equalisation Fund) বলা হয়। ইহারই সাহায্যে দেশীয় অর্থের বহির্মূল্য এইভাবে স্থির রাখার চেষ্টা করা হয়। যখন অর্থের বহির্মূল্য বা বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানামা ঘটে, তখন এইরূপ ভাণ্ডার হইতে নিজদেশের মুদ্রা বা স্বর্ণের ক্রয় এবং বিক্রয়েব দ্বারা বিনিময়-হারকে স্থির রাখার অথবা লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়। পশ্চিম ইউরোপে এবং ব্রিটেনেও 1936 সাল হইতে 1939 সালের মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

স্বর্ণমানের গুণ ও দোষ বিচার (Merits and Demerits of Gold Standard)

স্বর্ণমানের গুণ হইল, এই ব্যবস্থায় দামস্তর ও বৈদেশিক বিনিময়-হার আপনা-আপনি স্থির হইয়া পড়ে এবং কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যালান্সে ভারসাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উহা পুনরায় ভারসাম্যের বিন্দুতে ফিরিয়া আসে। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় স্বর্ণ আনাগোনার মাধ্যমে উহার প্রভাবের ফলে আপনাআপনি লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান চলিতে থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেনাপাওনা সুবিধাজনক হয় এবং একটি সর্বজনগ্রাহ্য সাধারণ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণের ব্যবহার সম্ভবপর হয়। তৃতীয়ত, স্বর্ণমান বজায় থাকিলে অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে দেশে স্বর্ণের যোগানের উপর; রাজনৈতিক কারণে টাকার যোগান নিরূপিত হয় না, মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে না। চতুর্থত, জনসাধারণ স্বর্ণ পছন্দ করে, স্বর্ণমান চালু রাখিলে সেই দেশের মুদ্রাব্যবস্থা দেশে ও বিদেশে সম্মান লাভ করে এবং উহার উপর জনসাধারণের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ইহার গুণ কি কি

স্বর্ণমানের ত্রুটি হইল, প্রথমত, ইহাকে কখনই স্বয়ংক্রিয় মান বলিয়া গণ্য করা চলে না। কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক বা মুদ্রাকর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সাবধানতা ও বিবেচনার সহিত স্বর্ণমানের খেলার নিয়মসমূহ মানিয়া না চলিলে নিছক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইহা সচল থাকে না; ইহাকে তাই পরিচালিত মান (Managed Standard) হিসাবেই গণ্য করা উচিত। শুধু তাহাই নহে, বাস্তবক্ষেত্রে তথাকথিত 'খেলার

নিয়মসমূহ' পরিপূর্ণভাবে কখনো পালন করা হইত না। দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ 'ব্যাঙ্ক হার' বাড়াইয়া স্বর্ণের পুনরায় বহির্গমন বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন, অথবা বর্ধিত স্বর্ণের বিনিময়ে নিজ দেশের অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে চাহিতেন না। দেশীয় স্বার্থরক্ষাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেই স্বার্থের তাগিদে পরবর্তীকালে স্বর্ণমানের নিয়ম কেহই বিশেষ মানিয়া চলেন নাই। দ্বিতীয়ত, স্বর্ণমান ব্যবস্থায় অর্থের আভ্যন্তরীণ মূল্য স্থির রাখার পরিবর্তে প্রধানত উহার বহির্মূল্যের স্থিরতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত। নিজেদের দামস্তর, উৎপাদন ও আয়স্তর অবহেলা করিয়া কেবল বৈদেশিক বিনিময়-হার স্থির রাখা কখনই যুক্তিসঙ্গত কাজ বলিয়া মনে করা যায় না। তাহা ছাড়া, এই ব্যবস্থায় কোন দেশ নিজস্ব পৃথক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আয়স্তর বৃদ্ধির জন্য নিজস্ব অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করিতে পারে না।* তৃতীয়ত, কেইনসের অভিমতে, স্বর্ণমান ব্যবস্থার ফলে মুদ্রাসঙ্কোচন ও বেকারির দিকে ঝোঁক আসিয়া পড়ে। যে-দেশে আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ বেশি, সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়াইয়া স্বর্ণের রপ্তানি বন্ধ করিতে চায়। ইহার ফলে দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ কমিয়া যায় এবং দেশে আয়স্তর ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পায়। যদি দেশে আমদানির তুলনায় রপ্তানি অধিক হইতে থাকে তাহা হইলে দেশের মধ্যে স্বর্ণ প্রবেশ করে এবং মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় সুদের হার কমে, দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তর উত্তীর্ণ হইয়া মুদ্রাস্ফীতি ও সঙ্কটের সৃষ্টি করে। চতুর্থত, স্বর্ণমান ব্যবস্থা কিন্তু বাস্তবে কখনই কোন দেশের দামস্তর বা বিনিময়-হার স্থির রাখিতে পারে নাই। কালিফোর্নিয়ার স্বর্ণ খনি আবিষ্কার স্বর্ণের যোগান বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইয়াছিল। গত শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন কারণে স্বর্ণের চাহিদা ও ব্যবহার খুবই বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থের পরিমাণ কমিয়া মুদ্রাসঙ্কোচনের সৃষ্টি করিয়াছিল। পঞ্চমত, কাগজী মানের তুলনায় স্বর্ণমান খুবই ব্যয়বহুল।

ইহার দোষ কি কি

* "But the gold standard is a jealous god. It will work—provided it is given exclusive devotion. The Central Bank must be prepared to work for stability of exchange rates and for nothing else; it must be prepared to expand credit when—but only when—it is receiving gold from abroad, and to contract credit when—but only when—it is losing gold for export." Crowther, ***An outline of Money.*** **P. 306.**

কাগজী অর্থের দ্বারা বিনিময়ের কাজ চালানো মোটেই অসুবিধাজনক নহে, সুতরাং স্বর্ণের প্রচলন বা স্বর্ণ মজুত রাখা অযথা অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নহে। সভ্য মানুষের এইরূপ 'হল্‌দে ধাতুর' (yellow metal) প্রতি অহেতুক আকর্ষণ শোভনীয় নহে। কেইন্‌সের অভিমতে ইহা একপ্রকার 'বর্বর যুগের নিদর্শন' (Barbarous relic)।

স্বর্ণমানের পতনের কারণ (Causes of breakdown of the gold Standard)

স্বর্ণমান ব্যবস্থার তথাকথিত 'খেলার নিয়মসমূহ' যথাযথভাবে কখনই প্রতি-পালিত হয় নাই, প্রায় সকল দেশই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্বর্ণমানকে প্রায় অচল অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছিল। স্বর্ণের আনাগোনার উপর যথেষ্ট বাধা-নিষেধ আরোপিত হইত, এবং স্বর্ণের আগমনের বা বহির্গমনের কোন প্রভাব দামস্তরের উপর পড়িতে দেওয়া হইত না। ইহাই স্বর্ণমান পতনের প্রধান কারণ।

খেলার নিয়ম ভঙ্গ

প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে অস্ত্র বা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং স্বর্ণ দ্বারা উহার মূল্য প্রদানের ফলে আমেরিকাতে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সেই স্বর্ণ আমেরিকার দামস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ মুদ্রাকর্তৃপক্ষ সেই স্বর্ণকে ভিত্তি করিয়া মুদ্রাপ্রসার না করিয়া তাহাকে বন্ধ্যা ধাতু হিসাবে জমাইয়া রাখিয়াছিল। ফলে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমেরিকার দামস্তর তুলনামূলক ভাবে কম থাকায় দামস্তরের এই অসমতার (Disparity) ফলে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণ আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছিল। এইরূপে অন্যান্য দেশে স্বর্ণের যোগান কম হওয়ায় তাহারা বাধ্য হইয়া স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ ও আমেরিকার নীতি

অন্যান্য দেশে স্বর্ণ ছিল অল্প পরিমাণ, উহাকে জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার দরুন রক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল ; সুতরাং বৃটেন হইতে যখন স্বর্ণত্যাগের হিড়িক শুরু হইল, সেই অবস্থায় 1931 সালে ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (Auturcky) প্রসার লাভ করায় বৈদেশিক বাণিজ্যহারের তুলনায় নিজ দেশের দামস্তর, আয়স্তর প্রভৃতি স্থির রাখা, বেকারি দূর করা ও কর্মনিয়োগের স্তর ঊর্ধ্বে তোলা, এই সকল

অধিকতর প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয় লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। তাই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই স্বর্ণমান ভাঙিয়া পড়া অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল।

সাফল্যের শর্ত

সাফল্যের সহিত স্বর্ণমান চালু থাকিতে হইলে ইহাও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, যেন অধমর্ণ দেশগুলি আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাড়াইয়া রপ্তানি-উদ্বৃত্ত (Export Surplus) সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা উত্তমর্ণ দেশগুলিকে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। অর্থাৎ স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত কোন দেশ এমন কোন আর্থিক বা বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করিবে না যাহাতে লেনদেনের ব্যালান্সের কোন ভারসাম্যবিহীনতা বিদূরিত হইতে বাধা পায়। লেনদেন ব্যালান্সের প্রয়োজনে মুদ্রাপ্রসার ও মুদ্রাসঙ্কোচন করিতে হইবে, এবং প্রয়োজন হইলে অপর দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি গ্রহণ করিতে হইবে এবং স্বর্ণের বহির্গমন মানিয়া লইতে হইবে, কোন শুল্ক-প্রাচীর তুলিয়া বা কৃত্রিম বাধানিষেধ আরোপ করিয়া দ্রব্য বা স্বর্ণের গতিবিধি বন্ধ করা চলিবে না। স্বর্ণমানের এই স্বর্ণসূত্র (golden rule) কেহই মানিয়া না লইবার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে ইহার পতন হইয়াছে।

কি-ভাবে স্বর্ণমানের পতন হইল

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে স্বর্ণমানের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়ে ইংলণ্ড স্বর্ণের সহিত পুরাতন হারে স্টার্লিং-এর বিনিময়-মূল্য ধার্য করিল, এবং এই বিনিময়-হার ধার্য করার ফলে স্টার্লিং 'বর্ধিত-মূল্য' মুদ্রাতে (Overvalued Currancy) পরিণত হয়। ফ্রান্সের বিনিময়-হার এরূপ স্থির হয় যে, ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাস (Devaluation) ঘটিয়া গেল। জার্মানীতে নূতন এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন হইল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধকালীন উদ্বৃত্ত ক্রয়ক্ষমতার বিলোপসাধন অর্থাৎ মুদ্রার অতি-স্ফীতি (hyper-inflation) রোধ করা।

ইংলণ্ডের মুদ্রা মূল্য বৃদ্ধি (over-valuation) রপ্তানির পরিমাণ কমাইয়া দিল। তাহার অর্থনৈতিক কাঠামোর কাঠিন্য বা অনমনীয়তা (Rigidities) রপ্তানি দ্রব্যাদির দাম কমাইবার সুযোগ দেয় নাই, ফলে সে রপ্তানি বাড়াইয়া অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই, রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হইয়াছে, এবং ফলে স্বর্ণের বহির্গমন হইয়াছে। অপর পক্ষে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে, রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সেই স্বর্ণ ফ্রান্সের দামস্তরের

উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহা মজুত করিয়া রাখিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানি দ্রব্যের আগমন এবং স্বর্ণের বহির্গমন উভয়ের উপরেই বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া স্বর্ণমানের ভারসাম্য-সাধনকারী পদ্ধতিকে (Equilibrating mechanism) বানচাল করিয়া দিয়াছিল।

এই সকল কারণ ছাড়াও সমস্যা ছিল 'উত্তপ্ত অর্থের' (Hot Money)। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী আন্তর্জাতিক আবহাওয়ায় ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের প্রভূত পরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা ও সুদের লোভে দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। তদানীন্তন পৃথিবীতে বিপুল আন্তর্জাতিক ঋণ, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ-জনিত বিপুল দেনা-পাওনা এবং তাহার লেনদেন স্বর্ণমানের মুদ্রাপরিবর্তন পদ্ধতির (Transfer-mechanism) উপর গুরুতর চাপ ফেলিয়াছিল, যাহার ভারে উহার ভরাডুবি প্রায় অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। 1929 সালে আমেরিকার শেয়ার-বাজারে সহসা দ্রুত মন্দার ফলে যে-সকল দেশ আমেরিকার অর্থ-সাহায্যের দ্বারা বাঁচিতেছিল বা আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত নিজের অবস্থা সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল (বিশেষত জার্মানী ও অস্ট্রিয়া), সেই সকল দেশে বিপুল সংকট উপস্থিত হয়। স্বল্পকালীন ঋণসমূহ তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চাওয়া হয় এবং ব্যবসায়ীদের আশার মূলে কুঠারাঘাতের ফলে উৎপাদন ও বিনিয়োগ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। 1930 সালে জার্মানীর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হয়, আমেরিকা এক বৎসর যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণ গ্রহণ স্থগিত রাখে। ইংলণ্ডে বহু দেশ হইতে অর্থ জমা রাখা হইত, তাহা সহসা তুলিয়া লইবার প্রচেষ্টা শুরু হওয়ায় স্বর্ণমান টিঁকাইয়া রাখা খুবই কঠিন হইয়া উঠে। নৌ-বিদ্রোহের ফলে ইংলণ্ড হইতে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণের বহির্গমন চলিতে থাকায় বাধ্য হইয়া 1931 সালের সেপ্টেম্বরে ইংলণ্ড স্বর্ণ-প্রদান বন্ধ করিয়া দিল। 1933 সালে আমেরিকা স্বর্ণমান ত্যাগ করিল এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী সকলেই নেতৃস্থানীয় দেশগুলির পদাঙ্ক অনুসরণে বাধ্য হইল। স্বর্ণমানের কলঙ্ক-বিজড়িত গৌরবময় ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটিল। নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির বাধাস্বরূপ স্বর্ণমানের স্বর্ণশৃংখল অপসারিত হইল।

স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা (Possibility of Restoration)

আধুনিক কালে সকল দেশের সরকারই নিজ দেশে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, পূর্ণকর্মসংস্থান, দেশের সামগ্রিক উন্নতি প্রভৃতিকে আর্থিক নীতির লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। 'মুদ্রা-সংকোচনের দিকে অন্তর্নিহিত ঝোঁক' (inherent bias towards deflation), অনমনীয় বিনিময়-হার, সর্বদা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখা, স্বর্ণের গতিবিধি অনুযায়ী পারস্পরিক মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসঙ্কোচন, রক্ষণশীল আভ্যন্তরীণ ঋণ-নীতি, বাজেটে সমতা রক্ষা করা বা ঘাটতি বাজেট না করা ; স্বর্ণমানের এই সকল নিয়ম নিজ দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় আর্থিক নীতিকে সাহায্য করে না। উপরন্তু, অনুন্নত দেশগুলিতে বর্তমানে যে বিপুল উন্নয়নের কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে, তাহার জন্য প্রভূত পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন এই সকল দেশের মধ্যে আসিতেছে। এইরূপ একপাক্ষিক মূলধনের প্রেরণ বা প্রবেশ (unilateral capital transfer) কোনটিই স্বর্ণমান থাকিলে সম্ভবপর নয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, যুদ্ধ-পূর্ব ধরনের স্বর্ণমান ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

জাতীয় অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতি

শুধু তাহাই নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ স্বর্ণ এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মজুত হইয়া রহিয়াছে ; অন্যান্য দেশে স্বর্ণের পরিমাণ এত কম যে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার উপযোগী স্বর্ণ তাহারা পাইবে না। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের সংরক্ষণী-বাণিজ্যনীতি স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বিরাট প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিক কালে, আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে, স্বর্ণের গুরুত্ব বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে, ফলে প্রধান প্রধান মুদ্রা নিজস্ব লেনদেনের সুবিধার জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে ; স্টার্লিং এলাকা, ডলার এলাকা, রুবল এলাকা প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়াছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও 1944 সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডারের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটি দেশ তাহার প্রধান আইন-সিদ্ধ মুদ্রার সহিত স্বর্ণ বা মার্কিন ডলারের বিনিময় হার নির্দিষ্ট করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে সর্বসম্মত পারস্পরিক বিনিময়-হার নির্দিষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হইয়াছে। ইহাকে তাই অনেকে মিশ্রমান (Mixed Standard) বলেন। কিন্তু ইহা মনে

রাখা দরকার যে, স্বর্ণের ভিত্তিতে আর্থিক ব্যবস্থা গঠন করা এই নিয়মের উদ্দেশ্য নহে, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন উপায়ে ইহাকে চালু করা বাস্তব অবস্থা বিচার করিলে আর সম্ভবপর নয়।

কাগজী মান (Paper Standard)

দেশের প্রধান আইন-সিদ্ধ টাকা হিসাবে কাগজী নোট প্রচলিত থাকিলে তাহাকে কাগজী মান বলা হয়। এই কাগজী নোট আজকাল সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচলিত হয় এবং সরকারী আর্থিক নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। চেক বা বিনিময়-বিলকে কখনই নোট বলা হয় না, কারণ তাহা সীমাবদ্ধভাবে আইন-সিদ্ধ (Limited legal tender)। এই কাগজী নোট রূপান্তরযোগ্য (convertible) বা রূপান্তরহীন (Inconvertible) হইতে পারে।

কাগজী মান

কাগজী নোটের বহু সুবিধা আছে। একসঙ্গে বহু টাকার লেনদেন করিতে হইলে ধাতু দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রার তুলনায় কাগজী টাকা বিশেষ সুবিধাজনক। দ্বিতীয়ত, ধাতুমুদ্রার তুলনায় ইহাতে ব্যয় অনেক কম। এবং ক্রমাগত হস্তান্তরের ফলে ধাতুর প্রভূত অপব্যয় কাগজী নোটের ক্ষেত্রে বহন করিতে হয় না। তৃতীয়ত, কাগজী মান ব্যবস্থাতে দেশের অর্থনৈতিক নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আর্থিক নীতি গঠন করা চলে। কেইন্‌সের মতে, দেশে কর্মসংস্থানের স্তরোন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করিতে হইলে আর্থিক নীতির সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, সুতরাং উহা এরূপ নমনীয় হওয়া উচিত যে, আভ্যন্তরীণ নিয়মকানুনের দ্বারা টাকা প্রচলনের পরিমাণকে প্রয়োজনানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা চলে। ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত কোন মানের পক্ষে এরূপ নমনীয়তা সম্ভবপর নয়। বাণিজ্যচক্র বা ব্যবসায়-সংকট দূর করিতে হইলে অর্থের পরিমাণ সহজে পরিবর্তনযোগ্য রাখা প্রয়োজন। কাগজীমান ব্যবস্থাতে প্রভূত ধাতু মজুত রাখার প্রয়োজন নাই, ইহার নমনীয়তা (flexibility) এবং স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) অধিক। বর্তমান পৃথিবীতে অনমনীয় অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহ (Rigid Economic Institutions) থাকায়, (যেমন শ্রমিক সংঘ, মালিক সংঘ, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি) এবং অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী মনোভাব (Auturcky) শক্তিশালী হওয়ায় কাগজী টাকার গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সুবিধা

কাগজী অর্থের অসুবিধা হইল, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবন্ধক এই ব্যবস্থার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিহিত নাই। যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি জনসাধারণের স্মৃতিতে এখনও জাগরূক আছে। তাই তাহাদের মনে বিশ্বাস ও আস্থা উৎপাদন করা কাগজী মানের দ্বারা মোটেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়ত, পরিচালনার ত্রুটিবিচ্যুতি হইতে পারে, শ্রেণীস্বার্থে বা দলগত স্বার্থে টাকার নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক নীতি পরিচালিত হওয়াও অসম্ভব নয়। তৃতীয়ত, কাগজী মান ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানামার কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, কাগজী মান ব্যবস্থায় টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্যের স্থিরতা বা স্থায়িত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়, কিন্তু টাকার বহির্মূল্যকে বৈদেশিক বাজারে দেশীয যোগান ও চাহিদার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চতুর্থত, টাকার পরিমাণ যথেচ্ছ বৃদ্ধি করিলে দেশে দামস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস (Devaluation) ঘটাইতে হয়, এবং রপ্তানি বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিতে পারে। অন্যান্য সকল দেশও আত্মরক্ষামূলক বা প্রতিশোধমূলক বহির্মূল্য হ্রাসের (Devaluation) চেষ্টা করিবে এবং এই ভাবে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হইবে। এইরূপে প্রতিযোগিতামূলক বহির্মূল্য হ্রাসের দৌড় শুরু হইবে ও বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশৃংখলা দেখা দিবে। কাগজী টাকা প্রচলনের এই সকল বিশেষ অসুবিধা রহিয়াছে।

অসুবিধা

কাগজী নোট প্রচলনের নীতিসমূহ (Principles of Note Issue)

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি নীতি অনুযায়ী কাগজী টাকা প্রচলন করিবে, তাহার সম্পর্কে দুই প্রকার মতবাদ এককালে প্রচলিত ছিল। একদল ধনবিজ্ঞানীর অভিমত, দেশে কাগজী নোট প্রচলিত হয় ধাতুমুদ্রার পরিবর্তে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা হিসাবে রক্ষিত মূল্যবান ধাতুর প্রতিনিধি হিসাবে ইহা সমাজে প্রচলিত থাকে মাত্র। সুতরাং যে-পরিমাণ মূল্যের নোট প্রচলিত হইবে তাহার সমমূল্যের ধাতু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের নিকট জমা রাখিবে। ইহাকে বলা হয় কারেন্সী নীতি (Currency Principle)। অপর মতবাদ অনুযায়ী নোটের কাজ হইল ব্যবসায়-বাণিজ্যে সহায়তা করা, ইহা তাই সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যে অনবরত হস্তান্তরিত হইতে থাকে, খুবই অল্প

কারেন্সী নীতি ও ব্যাঙ্কীয় নীতি

পরিমাণ কাগজী নোট ধাতু-মুদ্রায় বা ধাতুতে রূপান্তরণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থাপিত হয়। যদি অর্থনৈতিক লেনদেনের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধিক টাকা সমাজে চালু করা হয়, তাহা হইলেই ধাতুতে রূপান্তরণের জন্য সেই টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ফিরিয়া আসিবে, প্রয়োজনীয় পরিমাণের সমান হইলে উহা প্রচলিত হইতেই হইবে। সুতরাং কোন সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক যেরূপ অল্প মজুত রাখিয়া অধিক ঋণদান করিতে পারে, সেরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও জনসাধারণের আস্থা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অতি অল্প ধাতু মজুত রাখিয়া কাগজী নোট চালু করিতে পারে। নোট-প্রচলনের এই নীতিকে ব্যাঙ্কিং নীতি (Banking Principle) বলে।

কারেন্সী প্রথায় প্রচলিত কাগজী নোট জনসাধারণের আস্থাভাজন হইলেও ইহা ব্যয়বহুল এবং অপব্যয়মূলক, কারণ প্রভূত পরিমাণ মুদ্রা বা ধাতু অযথা অনুৎপাদকভাবে সঞ্চিত থাকে। এই প্রথায় সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নোটের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো সম্ভব হয় না, ধাতুব যোগানই টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করে। কারেন্সী প্রথায় দেশে সকল উপকরণের পূর্ণনিয়োগের পক্ষে প্রয়োজনীয় টাকার পরিমাণ অপেক্ষা বাস্তবে কম বা বেশি টাকা প্রচলিত হইয়া যাইতে পারে, কারণ সেই ধাতুর যোগানের ও মূল্যের উপর টাকার যোগান ও মূল্য নির্ভর করে। ব্যাঙ্কিং প্রথায় এই অসুবিধা দূর হইলেও দেশের আর্থিক ব্যবস্থা কিছুটা ঝুঁকিবহুল হইয়া পড়ে।

ধাতু জমার পরিমাণ সম্পর্কীয় বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী নোট প্রচলন ব্যবস্থাসমূহকে চারিপ্রকারে বিভক্ত করা যায়।

১। নির্দিষ্ট ফিডিউসিয়ারী ব্যবস্থা (Fixed Fiduciary System)

এই ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত বিনা মজুতে টাকা প্রচলন করা যাইতে পারে ; এই সীমাকে ফিডিউসিয়ারী সীমা (Fiduciary Limit) বলে। এই সীমার পরে টাকা চালু করিতে হইলে উহার অতিরিক্ত কাগজী নোটের সম্পূর্ণ মূল্য ধাতুতে জমা রাখিতে হয়। যেমন 1000 পর্যন্ত টাকা চালু করিতে গেলে কোন জমা দরকার হয় না ; কিন্তু উহার পরে যে-কোন পরিমাণ টাকা, যেমন 10 টাকা যদি বাজারে ছাড়ার দরকার হয়, তবে 10 টাকার মূল্যের ধাতুই

জমা রাখিতে হইবে। এই প্রথা অপচয়মূলক, কারণ ফিডিউসিয়ারী সীমার ঊর্ধ্বে প্রভূত পরিমাণে ধাতু অযথা আটক থাকে, যাহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দরকার-মত খাটানো চলিত। তাহা ছাড়া, ইহা যথেষ্ট প্রসার-ক্ষম নহে, সম্পূর্ণ মূল্যের ধাতু মজুত রাখার নিয়ম বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করিতে পারে।

1844 সালের ব্যাঙ্ক চার্টার আইন অনুসারে ইংলণ্ডে এই বিধি গৃহীত হইলেও এবং আরও কয়েকটি দেশ ইহা অনুসরণ করিলেও, দেখা গিয়াছে যে বহুবার ব্যাঙ্ক চার্টার আইন মুলতুবী রাখিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডকে ধাতু জমা না রাখিয়া নোট প্রচলনের সুবিধা দিতে হইয়াছে। অবশেষে ম্যাক্‌মিলান কমিটির সুপারিশে এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়।

২। সর্বোচ্চ সীমা ব্যবস্থা (The Maximum Limit System)

এই ব্যবস্থায় আইনসভা একটি সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, যে-পর্যন্ত কোন জমা না রাখিয়া টাকার প্রচলন করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সীমার পরেও অর্থপ্রচলনের চেষ্টা করিলে আইনসভার অনুমোদনের ও আইন-পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থার দুইটি গুণ আছে: অর্থ-কর্তৃপক্ষ অর্থপ্রচলনের ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ চালাইতে পারে, অযথা ধাতু মজুত করিয়া রাখিতে হয় না। ইহার অসুবিধা হইল যে, যদি এই সীমা খুব নিচুতে ধার্য করা হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থার প্রসার ক্ষমতা রহিল না, আর যদি খুবই উঁচুতে ধার্য করা হয় তবে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা রহিয়া গেল। ফ্রান্সে 1929 সালের পূর্বে ইহা প্রচলিত ছিল কিন্তু তাহার পরে ইহাকে তুলিয়া দেওয়া হয়।

৩। আনুপাতিক জমা ব্যবস্থা (The Proportional Reserve System)

এই ব্যবস্থায় মোট প্রচলিত নোটের কিছু অংশ ধাতুতে জমা হিসাবে রাখিতে হয় (শতকরা হিসাবে, যেমন 55% বা 30% বা 40% ইত্যাদি)।

এই ব্যবস্থার সুবিধা হইল, ইহার পরিচালনা খুবই সহজ ও সরল। তদুপরি, ইহা প্রসার-ক্ষম এবং ইহাতে অধিক ধাতু অযথা মজুত রাখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই ব্যবস্থার ত্রুটি হইল, ইহা কিছু পরিমাণ ধাতুকে অযথা মজুত রাখে। তাহা ছাড়া, এই ব্যবস্থায় ধাতুর মজুত কমিয়া গেলে উহা হইতে অধিক হারে টাকার প্রচলন কমাইয়া ফেলিতে হয়। যেমন 500টি নোটের পিছনে 25% হারে জমা

হিসাবে 125টি স্বর্ণমুদ্রা জমা রাখা হইয়াছে; যদি স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া 124টি হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ 4টি কাগজী নোটের প্রচলন বন্ধ করিতে হইবে। সর্বোপরি বলা যায়, যদি আর্থিক কর্তৃপক্ষের উপর লোকের আস্থা বজায় থাকে তবে ওই জমা নিতান্তই অনাবশ্যক এবং যদি লোকে আস্থা হারাইয়াই ফেলে তবে ওই আংশিক জমা সকল নোটের স্বর্ণে রূপান্তরণের পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত।

৪। **স্বর্ণব্যতীরকী আনুপাতিক জমা ব্যবস্থা (Proportional Reserve System not based on gold)**

এই ব্যবস্থায়, কোন দেশের নোটের বিনিময়ে, আইনত, একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে অপর দেশের অর্থ এবং কিছু পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখিতে হয়। যেমন, কিছুকাল পূর্বেও, ভারতবর্ষে প্রচলিত নোটের মূল্যের 40% জমা রাখা হইত, তবে এই জমা কিছু স্বর্ণমুদ্রা, কিছু স্বর্ণ (ধাতু) এবং কিছু বৈদেশিক মুদ্রাতে (স্টার্লিং বা ডলার)। এই ব্যবস্থার সুবিধা অনেক। ইহা প্রসার-ক্ষম, বৈদেশিক বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং বিদেশের ব্যাঙ্কে বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখার সুবিধা থাকায় সুদ হিসাবে দেশের কিছু আয়ও হইতে পারে।

এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলা হয় যে, বৈদেশিক মুদ্রাকে নিজ দেশের অর্থের পিছনে জমা হিসাবে না রাখাই ভাল। যেমন, গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে প্রাপ্ত স্টার্লিং জমা হিসাবে গণ্য করিয়া ভারতের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে নোট প্রচলিত হইয়াছিল এবং ফলে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল। সুতরাং, বৈদেশিক বিনিময়-হারে স্থিরতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সুফলদায়ী হইলেও দেশের মধ্যে নোট-প্রচলনের ভিত্তি হিসাবে কোন বৈদেশিক মুদ্রাকে গ্রহণ না করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

নোট-প্রচলনের নিয়ন্ত্রণের সঠিক নীতি (Right Principle of Regulation):

আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই অর্থনৈতিক উন্নতি, দামস্তরের উঠানামা বন্ধ করা, পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌঁছানো—এই রূপ বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্য অনুযায়ী টাকা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত আছে। সুতরাং, কি-পরিমাণ নোট চালু করা দরকার অথবা প্রচলন-ধারা হইতে তুলিয়া লওয়া দরকার, এই সকল নির্ধারণ করা অতি অবশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। অর্থকর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যথেষ্ট দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান,

সুতরাং তাহার বিবেচনার উপর এই ব্যাপারে নির্ভর করা চলে। আর সমাজের ঋণরূপ অর্থ নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের, তখন নোটের উপর তাহার দায়িত্ব স্বীকার না করার কি যুক্তি থাকিতে পারে? যখন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নের জন্য অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব এবং ঘাটতি বাজেটের দ্বারা উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাসমূহে অর্থবিনিয়োগের ভার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বহন করিতেছে, তখন নোট প্রচলনের দায়িত্ব তাহার উপর নিশ্চয়ই ছাড়িয়া দেওয়া চলে, আইনের দ্বারা তাহার ক্ষমতার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে চলিবে না।

কিন্তু তবুও জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের সুবিধার জন্য, হঠাৎ প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ, লেনদেন ও বিনিময়-হার সঠিক রাখিবার নিমিত্ত কিছু পরিমাণ স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখার নিয়ম করিয়া দেওয়া ভাল। শুধু তাহাই নহে; নোট প্রচলনের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত করিয়া রাখা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের উপায় হিসাবে যথেষ্ট কার্যকরী। তবে এই সীমা বেশ উর্ধ্বে ধার্য করা দরকার, যাহাতে স্বাভাবিক সময়ে উন্নয়নমূলক আর্থিক নীতি গ্রহণে কোন বাধা না আসিতে পারে।

এই সীমা কোথায় ধার্য হইবে বা কি-পরিমাণে স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা থাকিবে তাহা বিভিন্ন দেশের পৃথক অর্থনৈতিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী পৃথক হইবে। শুধু তাহাই নহে, একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী তাহা নির্ধারিত হইবে। নোট-প্রচলনের এমন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা দরকার যাহা কম ব্যয়শীল বা ব্যয়সঙ্কোচমূলক, প্রসারক্ষম, ঝুঁকিহীন ও নিরাপদ এবং অর্থের অন্তর্মূল্য (Internal Value) এবং বহির্মূল্য (External Value) মোটামুটিভাবে স্থির রাখে।

অনুশীলনী

1. When is a country said to be on Gold Standard? "There are degrees of Gold Standard"—Illustrate the statement.

2. Discuss the automatic mechanism of restoring equilibribum under Gold Standard. What are the conditions of full and rapid adjustment?

3. Discuss the merits and demerits of Gold Standard.

4. Explain what you understand by the Gold Bullion Standard and the Gold Exchange Standard.

5. Elucidate the merits and drawbacks of a paper currency system.

6. Discuss the different methods for the regulation of the Note issue. Which of them you prefer and why?

৪

টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা

Money Market and Banking

ঋণপ্রথা ও ঋণপত্র (Credit system and Credit Intrument)

কোন দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যদি টাকা লেনদেন হয় তবে তাহাকে নগদ লেনদেন (Cash Transaction) বলা হয়। যদি ক্রেতা দ্রব্য ক্রয়ের সময়েই দ্রব্যের মূল্য হিসাবে টাকা দিতে রাজী না হয়, কিছুদিন পরে দিবে এইরূপ আশ্বাস দেয় এবং তাহার এই অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাখিয়া বিক্রেতা যদি দ্রব্য বিক্রয় করে, তবে তাহাকে ঋণভিত্তিক লেনদেন (Credit Transaction) বলা যাইতে পারে। এই ঋণভিত্তিক লেনদেনের মূল হইল আস্থা বা বিশ্বাস। ভবিষ্যতে ঋণগ্রহীতার নগদ অর্থ দিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতার উপর ঋণদাতার আস্থা ও বিশ্বাস এইপ্রকার ঋণভিত্তিক লেনদেনের মূল ভিত্তি।

ঋণপ্রথা

যে-ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে সে ভবিষ্যতে নগদ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া দেয়। এই সকল বিভিন্ন প্রকার চুক্তিপত্রকে ঋণপত্র (Credit Instruments) বলা হইয়া থাকে। সমাজে বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র প্রচলিত আছে, যেমন—কাগজী নোট, চেক, হুণ্ডি বা বিনিময়-বিল, ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ ইত্যাদি। বর্তমানের ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিপুল লেনদেন ও জটিল সম্পর্ক-জালে ঋণের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য।

ঋণপত্র

কি উদ্দেশ্যে ও কেমনভাবে এই গ্রহণ করা হইতেছে সেই অনুযায়ী ইহাকে ভোগোদ্দেশী-ঋণ এবং উৎপাদনী-ঋণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্যক্তির ভোগের উদ্দেশ্যে জিনিসপত্র ক্রয়ের দরুন যখন ঋণ গ্রহণ করা হয় তখন তাহা ভোগোদ্দেশী-ঋণ এবং নতুন বা বর্ধিত উৎপাদনের কার্যে নিয়োজিত হইলে তাহাকে উৎপাদনী-ঋণ বলা চলে।

বহুপ্রকার ঋণপত্র

বহু প্রকারের ঋণপত্র বর্তমান সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, (ক) প্রমিসরি নোট, (খ) চেক, (গ) বিনিময়-বিল, (ঘ) ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ প্রভৃতি। কোন নির্দিষ্ট তারিখে অথবা চাহিদা অনুযায়ী নগদ অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ থাকিলে সেইরূপ ঋণপত্রকে প্রমিসরি নোট বলা হয়। পূর্বে কোন ব্যক্তি, কোন ব্যাঙ্ক বা সরকার এইরূপ প্রমিসরি নোটের প্রচলন করিতে পারিত। প্রমিসরি নোটের প্রচলনকারীর উপর আস্থা ও বিশ্বাস থাকিলে এইসকল নোট এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত হইতে থাকে এবং ইহার সহায়তায় অর্থনৈতিক লেনদেন ঘটে। সাধারণভাবে, আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা গভর্নমেণ্ট এইরূপ নোট চালাইবার অধিকার নিজেরা গ্রহণ করিয়াছেন। (খ) ব্যাঙ্কে আমানতকারী ব্যক্তি কর্তৃক কাহাকেও টাকা দিবার জন্য ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশপত্রকে চেক বলা হয়। এই চেক্ হস্তান্তরিত হইয়া অর্থনৈতিক লেনদেন বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কাজ করে। এই চেকের সহিত কাগজী নোটের পার্থক্য আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার কর্তৃক প্রচলিত নোটগুলি হইল আইন-সিদ্ধ মুদ্রা, চেক কখনই আইন-সিদ্ধ নহে ; ইহা গ্রহণ করিতে আইনত কেহ বাধ্য নহেন। (গ) দ্রব্যের ক্রেতার উপরে দ্রব্যের বিক্রেতা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার নির্দেশ দিয়া যে-পত্র দেয় তাহাকে বিনিময়-বিল বলে। সাধারণত, ৩০ দিন, ৬০ দিন, বা ৯০ দিন পরে ক্রেতা বিক্রেতাকে এই অর্থ প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দ্রব্যের বিক্রেতা ঐ বিল ভাঙাইতে পারে অথবা বন্ধক দিয়া টাকা পাইতে পারে। (ঘ) যখন কোন ব্যাঙ্ক নিজের অপর কোন শাখাকে বা অপর কোন ব্যক্তিকে কিছু টাকা দিবার জন্য নির্দেশ দেয় তখন সেই নির্দেশ-নামাকে ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ বলে।

ইহাদের সুবিধা

ঋণ-ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হইল, ইহার ফলে নগদ টাকা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যায়। প্রভূত পরিমাণে টাকা বহনের ও লেনদেনের ঝুঁকি এবং অসুবিধা থাকে না। সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন সকল কিছু ঋণপ্রথার দ্বারা উপকৃত হয় ; স্থান ও কালের মধ্যে সংযোগ-সেতু হিসাবে ঋণ-প্রথা কাজ করে। ধাতু ও ধাতব মুদ্রার বদলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ঋণপত্র দ্বারা লেনদেন অনেক বেশি সুবিধাজনক।

ঋণ-প্রথার বিশেষ বিপদ ও ত্রুটি হইল, ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে খুব বেশি। ব্যাঙ্ক ঋণদানের পরিমাণ বাড়াইলে বা সরকার অধিক পরিমাণে

প্রমিসরি নোটের প্রচলন করিলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতি হইতে পারে। হট্রে বলেন যে, ব্যবসা-সংকট বা বাণিজ্য-চক্র সৃষ্টিতে এই প্রকার ঋণপ্রথাই প্রধানত দায়ী, ব্যাঙ্ক-ঋণের সংকোচ ও প্রসারই এইরূপ ব্যবসায়-চক্র ঘটাইয়া থাকে। ঋণ-প্রথার ফলে সমাজে অনির্দিষ্টতা আসিয়া পড়ে; শেয়ার বাজারে বা দ্রব্যের বাজারে ফাট্‌কা ব্যবসায় শুরু হইতে পারে। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ট্রাস্ট বা বৃহৎ একচেটিয়া ব্যবসায় সংগঠন স্থাপিত হইতে পারে।

সুবিধা ও অসুবিধা

ব্যাঙ্ক (Banks): ঋণ লইয়া যে-সংগঠনের ব্যবসায় পরিচালিত হয় সেইরূপ প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক বলে। সমাজের নিকট হইতে ঋণ করা এবং সেই টাকা ব্যক্তিদের মধ্যে ঋণ হিসাবে খাটানো, ইহাই ব্যাঙ্কের কাজ। সমাজে বহু প্রকার ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়; বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণদানের কাজে বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক নিযুক্ত থাকে।

ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল ব্যক্তিদের সঞ্চয়গুলি আমানতের আকারে একত্র সংগ্রহ করা। আমানত অনেক প্রকারের হইতে পারে। কারেণ্ট বা চল্‌তি আমানত, সেভিংস বা সঞ্চয়ী-আমানত ও স্থির-আমানত। কারেণ্ট আমানত হইতে ইচ্ছানুযায়ী টাকা উঠানো চলে, কিন্তু সেভিংস ও স্থির-আমানত হইতে টাকা উঠাইবার কিছু কিছু বাধা-নিষেধ থাকে। আমানত হইল ব্যাঙ্কের ঋণ এবং ইহা ব্যাঙ্কেরই দায়িত্ব (Liability)। কারেণ্ট হিসাবে রক্ষিত টাকাকে চাহিদা আমানত (Demand deposit) বলা চলে এবং অন্যান্য ধরনের আমানতকে কাল-আমানত (Time deposit) বলা চলে।

দ্বিতীয়ত, এই সকল টাকা ব্যাঙ্ক নিজের ব্যবহারের জন্য ধার করে না। সুদ পাইবার আশায় সে এই টাকাকে বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্রে খাটায় অর্থাৎ শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজে ঋণ দেয়। ব্যাঙ্ক ঋণ দেয় ঋণগ্রহীতার নামে আমানত সৃষ্টি করিয়া, কোন আমানতকারীকে ওভারড্রাফট্ দিয়া, বিল অব এক্সচেঞ্জ বা হুণ্ডি ক্রয় করিয়া। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত ঋণ দেয় স্বল্প কালের জন্য, আবার বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক বা শিল্প ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দেয় দীর্ঘকালের জন্য। বণ্ড বা অন্যান্য প্রকার দীর্ঘকালীন ঋণপত্র ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়।

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজী নোট প্রচলন করে এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কও চেকের সাহায্যে লেনদেনের সহায়তা করে। কোন ব্যাঙ্ক যখন টাকা জমা রাখে

তখন আমানতকারীকে চেক কাটিয়া টাকা তুলিয়া লইবার সুযোগ দেয়। এক ব্যাঙ্কের চেক অপর ব্যাঙ্কে জমা হয়, একজনের চেক বহুজনে গ্রহণ করে। এইরূপে বিনিময় ও প্রচলনের মাধ্যম হিসাবে টাকা সৃষ্টি করা ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলা চলে।

চতুর্থত, ব্যাঙ্কের বিবিধ প্রকার কাজ আছে। দলিল-পত্র বা অলঙ্কার প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যাদি নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে লোকে ব্যাঙ্কে জমা রাখে। ব্যক্তির হিসাব রক্ষা করে, বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনা করে, অথবা ব্যবসায়ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন প্রকার কাজ করিয়া থাকে। বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনা করে। দেশের এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে টাকার যাতায়াত সহজ করিয়া তোলে।

বর্তমান সমাজে ব্যাঙ্কের গুরুত্ব

দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। উপযুক্ত ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ছাড়া শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠা কোন দেশের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। অনুন্নত ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে অনুন্নতির কারণ বলা চলে। ব্যাঙ্ক-প্রথার ফলে মূলধনের চলনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ব্যাঙ্ক সংযোগ ঘটাইয়া দেয়। যাহারা মজুত টাকা ব্যবহার করিতে পারে না তাহাদের নিকট হইতে সেই টাকা লইয়া আসিয়া উপযুক্ত বিনিয়োগকারীদের সেই টাকা ঋণ দিয়া ব্যাঙ্ক উভয়কেই সাহায্য করে। সমগ্র দেশে টাকার যে কেনাবেচা চলিতেছে ব্যাঙ্ক সেই কাজে সহায়তা করে। চেক কাটিয়া ও জমা লইয়া দেশের ব্যাঙ্কগুলি মিলিয়া যে প্রভূত পরিমাণ টাকা 'সৃষ্টি' করে তাহাতে দেশের আর্থিক কাঠামোতে প্রসারশীলতা ও নমনীয়তা দেখা দেয়। সমাজে সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বা সঞ্চয়-প্রবণতা বাড়িয়া যায়; ব্যাঙ্কে বিনিয়োগের সুযোগ থাকায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে একত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা বিনিয়োগ করা হয় বলিয়া সমাজে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বৃদ্ধি পায়, অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়।

ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শীট (Balance Sheet of a Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উদ্বর্ত পত্র বা ব্যালান্স শীট (Balance sheet) বিশ্লেষণ করিলে ব্যাঙ্কের কাজকর্মের রূপ প্রকৃতভাবে বোঝা যায়। যে-সকল টাকা ব্যাঙ্কের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে, ব্যাঙ্ক সেই সকলের জন্য জনসাধারণের

নিকট দায়ী ; ইহা তাহার দেনা (liabilities)। যে সকল টাকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক খাটাইয়াছে, নিযুক্ত সেই সকল টাকা ব্যাঙ্কের পাওনা (assets)। দেনা ও পাওনার কাঠামো বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা, উহার কার্যাবলী প্রভৃতি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। সাধারণভাবে, দেনা ও পাওনার উভয়দিক সমান থাকে ; কারণ ব্যাঙ্কের সকল পাওনা বা অর্থনিয়োগ বা সম্পত্তি অন্যের নিকট হইতে গৃহীত টাকার সাহায্যে করা হয়। সাধারণত, ব্যাঙ্কসমূহ যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গঠিত হয় ; সুতরাং শেয়ার বিক্রয় করিয়াই প্রাথমিক মূলধন সংগৃহীত হয়।

দেনা ও পাওনা

দেনার দিকে (ক) শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। (খ) দ্বিতীয়ত, চলতি আমানত বা চাহিদা-আমানত। (গ) তৃতীয়ত, স্থায়ী আমানতসমূহ। (ঘ) চতুর্থত, সাবধানতার জন্য সকল ব্যাঙ্কই মুনাফার অংশ দ্বারা রিজার্ভ তহবিল গড়িয়া তোলে। উহা শেয়ার ক্রেতাদের সম্পত্তি বলিয়া ব্যাঙ্কের দেনা হিসাবে ধরা হয়। (ঙ) পঞ্চমত, অন্যান্য ব্যাঙ্ককে দেয় যে অর্থ বাকি রহিয়াছে অথবা ব্যাঙ্কের নিকট যে-সকল বিল দেনা হিসাবে রহিয়াছে।

দেনার বিষয়সমূহ

পাওনা বা সম্পত্তির দিকে, (ক) সর্বপ্রথমে ধরিতে হয়, যে নগদ টাকা ব্যাঙ্কের হাতে রহিয়াছে, দৈনন্দিন লেনদেনের কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য যে নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিজের রিজার্ভে অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। (খ) অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট যে-পাওনা আছে, অথবা অত্যল্পকালীন বিনিয়োগসমূহ। (গ) তৃতীয়ত, সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক যে টাকা বিনিয়োগ করিয়াছে। (ঘ) ঋণ হিসাবে যে টাকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিয়াছে। (ঙ) পঞ্চমত, ব্যাঙ্কের নিজস্ব ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র অথবা অন্যান্য সম্পত্তিসমূহ।

পাওনার বিষয়সমূহ

ব্যাঙ্কের এই ব্যালান্স শীট বা দেনাপাওনার হিসাব পর্যবেক্ষণ করিয়া ব্যাঙ্কের কাজকর্মের স্বরূপ জানিতে পারা যায়। কোন বিশেষ ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থাও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-প্রথার নিয়মসমূহ সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহাও বুঝা যায়। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কপ্রথার তিনটি নীতি আছে ; সাবধানতা, মুনাফালভ্যতা ও তরলতা (safety, profitability and liquidity)। ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ এরূপ

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কপ্রথার তিন নীতি

হওয়া আবশ্যক যাহাতে জনসাধারণের আমানতী টাকার কোন লোকসানের ভয় না থাকে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উপযুক্ত বন্ধক লইয়া তবেই টাকা বিনিয়োগ করা উচিত। মুনাফার দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। সর্বোপরি, বিনিয়োগ এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে প্রয়োজন হইলেই অতি সত্বর উহাকে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যায়। অর্থাৎ, এরূপ সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা উচিত, যাহাকে অতিদ্রুত নগদ টাকায় পরিণত করা চলে।

বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তিতে ব্যাঙ্কের টাকা খাটানো (Distribution of assets of a Bank)

কোন ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শীটের পাওনা বা সম্পত্তির দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাইব ব্যাঙ্কটি কোন্ কোন্ খাতে কত টাকা খাটাইয়াছে। দেশে বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তি আছে, যেমন নগদ টাকা, বেসরকারী ও সরকারী ঋণপত্র, বিল্ অফ্ এক্সচেঞ্জ, বণ্ড ও ডিবেঞ্চার, বিভিন্ন শিল্পে বা ব্যবসায়ে ঋণ দেওয়া, ঘর ভাড়া, আসবাবপত্র, জায়গা-জমি প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে কোন্ ধরনের সম্পত্তিতে সে কত টাকা খাটাইবে, তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন।

ব্যাঙ্ক জানে যে, তাহার সকল আমানত যদি সে ধার দিয়া দিতে পারিত তবে তাহার মুনাফা হইত খুব বেশি। কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। বেশির ভাগ আমানতকারীই চেক কাটিয়া লেনদেন করে সুতরাং ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের পারস্পরিক দেনাপাওনা খাতায়-পত্রেই মিটাইয়া ফেলিতে পারে ; নগদ টাকার বিশেষ দরকার হয় না। তবুও কিছু সংখ্যক আমানতকারী নগদ টাকা অনেক সময় ফেরৎ চায়। তাই কিছু পরিমাণ নগদ টাকা তাহাকে নিজের কাছে সর্বদা জমা রাখিতেই হইবে। বেশি ঋণ দিলে বেশি সুদ আয় হইবে, সুতরাং ব্যাঙ্কের ইচ্ছা হইল নগদ টাকা কম রাখিয়া বেশি টাকা ঋণ দেওয়া। কিন্তু সাবধানের মার নাই, তাই ব্যাঙ্ক এই লোভ সংবরণ করিয়া রাখে, মোট আমানতের কিছু অংশ সে নগদ টাকা রূপে জমা রাখে। নগদ টাকাই সর্বাপেক্ষা তরল সম্পত্তি (most liquid of all assets)। দরকার মত ইহার সাহায্যে ব্যাঙ্ক তাহার যে-কোন দেনা মিটাইতে পারে, কিন্তু নগদ টাকা হাতে জমাইয়া রাখিলে সেই টাকা হইতে সুদ পাওয়া যায় না। বেশির ভাগ দেশে সরকারী আইন অনুযায়ী বা চিরাচরিত প্রথা (convention) অনুযায়ী মোট আমানতের কিছু অংশ সকল ব্যাঙ্ক নগদ টাকার আকারে জমা রাখিয়া থাকে।

নগদ টাকা জমা রাখা

ইহার পরেই সর্বাধিক তরল সম্পত্তি হইল অন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওনা টাকা। ইহাই তাহার আত্মরক্ষার বা প্রতিরোধের প্রথম লাইন (first line of defence)। ব্যাঙ্ক যখন দরকার মনে করে তৎক্ষণাৎ সে অন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নিজ পাওনা আদায় করিয়া নিজের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া ফেলিতে পারে।

অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট পাওনা

সম্পত্তিগুলির তারল্য ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে (in descending order of liquidity); তাই দেখা যায় যে, অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওনার পরেই স্থান হইল তলব-ঋণের (call loans) বা অত্যল্পকালীন ঋণের। একদিন বা কয়েকদিনের জন্য এই ঋণ দেওয়া হয়। এই ধরনের ঋণ হইতে ব্যাঙ্কগুলি সুদ পায় খুবই কম, ঋণগ্রহীতাকে কোনরূপ সময় না দিয়া (without notice) এই ধরনের ঋণ ফেরৎ লওয়া চলে অর্থাৎ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। অনুন্নত দেশের তুলনায় উন্নত দেশগুলি ব্যাঙ্কের এই প্রকার বিনিয়োগে বেশি টাকা খাটাইয়া থাকে। তারল্য অনুযায়ী ইহার পরের ধাপের বিনিয়োগ হইল সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করা। স্বল্পকালীন ঋণপত্র বা ট্রেজারী বিল ক্রয় করিয়া অথবা দীর্ঘকালীন ঋণপত্র বা সরকারী প্রমিসরি নোট ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক এই খাতে টাকা খাটায়। এই সকল সূত্র হইতে একটু বেশি সুদ পাওয়া যায়। ইহাদের তারল্যও বিশেষ কম নয়, কারণ যে-কোন সময় এইগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ডিস্‌কাউণ্ট করিয়া নগদ টাকা পাওয়া যায়। এই খাতে ব্যাঙ্কগুলির বিনিয়োগ যুদ্ধের মধ্যে ও পরবর্তীকালে বাড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের মোট আমানতের 30% সরকারী ঋণপত্রে খাটায়, ভারতের ব্যাঙ্কগুলি প্রায় 50%।

তলব-ঋণ বা অত্যল্পকালীন ঋণ

সরকারী ঋণপত্র

বেসরকারী ব্যবসায়ীদের যে বিলগুলিকে ডিস্‌কাউণ্ট করিয়া ব্যাঙ্ক নিজের হাতে রাখিয়াছে, সেইগুলিও তাহার গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি। ইহাদের মধ্যে যেগুলি খুব শীঘ্র ফলপ্রসূ হইবে (nearing maturity) উহাদের তারল্য অপেক্ষাকৃত বেশি। এই বিলগুলি নিজে নিজেই ফলপ্রসূ হয়, অর্থাৎ, 3 বা 6 মাসের মধ্যে ইহা হইতে টাকা পাওয়া যাইবে, দরকার হইলে এই সময়-সীমার পূর্বেই অন্য ব্যাঙ্কে বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ইহাদের ভাঙাইয়া লওয়া চলিবে, অর্থাৎ ডিস্‌কাউণ্ট করিয়া নগদ টাকা পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া, এই বিলগুলি

বেসরকারী ব্যবসায়ীদের বিল বা বণ্ড

হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি (negotiable instruments), তাই ইহাদের বন্ধক দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দরকার মত নগদ টাকা পাওয়া যায়।

ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়, অবশ্য কোন-না-কোন সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া সে এই ধরনের বিনিয়োগ করিয়া থাকে। আজকাল অবশ্য কোন কোন দেশে (যেমন ইংলণ্ডে) অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামিনের ভিত্তিতে ঋণ দেওয়া হয়। ঋণগ্রহীতার নামে নূতন আমানত বা জমা খুলিয়া দিয়া বা তাহার নিজস্ব আমানতের তুলনায় বেশি টাকা তুলিয়া লওয়ার অনুমতি দিয়া (overdraft) ব্যাঙ্ক এইরূপ ঋণ দিয়া থাকে। এই ধরনের বিনিয়োগের তারল্য প্রধানত নির্ভর করে বন্ধক-রাখা জিনিসের তরলতার উপর।

আমানত সৃষ্টি এবং ওভারড্রাফট

তাহা ছাড়া, নিজস্ব ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র প্রভৃতিও ব্যাঙ্কের নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু এই প্রকার সম্পত্তির তারল্য অন্যান্য প্রকার বিনিয়োগের তুলনায় কম।

নিজস্ব ঘরবাড়ি

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মূলনীতি বা ঋণনীতি (Fundamental Principles of Commercial Banking or the Credit Policy of a Commercial Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাজ হইল জনসাধারণের নগদ টাকাকে আমানতে পরিণত করা, আবার সেই আমানতকে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা। জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত হিসাবে তাহারা যে ঋণ লয়, সেই ঋণ আমানতকারী ব্যক্তিরা যখন খুশি ফেরৎ চাহিতে পারে। ব্যাঙ্কের টাকা ফেরৎ দিবার ক্ষমতার উপর এই আস্থা বা বিশ্বাসই ব্যাঙ্কের দিক হইতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। তাই তাহাকে সর্বদা সাবধান থাকিতে হয়, সে এমন পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখিবে বা এমন জায়গায় টাকা খাটাইবে যাহাতে আমানতকারীর টাকা নষ্ট না হয়। কিন্তু কেবলমাত্র সাবধানতার নীতি অবলম্বন করিয়া টাকা হাতে লইয়া বসিয়া থাকিলেই তাহার চলিবে না। ব্যাঙ্ক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, আর মুনাফা করাই সকল ব্যবসায়ের লক্ষ্য। যত কম

সাবধানতা, মুনাফা লভ্যতা ও তরলতা

টাকা জমা রাখিয়া বেশি টাকা ধার দিবে, ততই তাহার মুনাফার সম্ভাবনা। তাই যে-ধরনের বিনিয়োগে সর্বাধিক মুনাফা পাওয়া যায় সেই ধরনের বিনিয়োগে টাকা খাটাইবার কথা তাহাকে ভাবিতে হইবে। কেবলমাত্র সাবধানতার নীতি অবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহার চলিতে পারে না। তাহাকে মুনাফালভ্যতার নীতি অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণে বিনিয়োগও করিতে হইবে। কিন্তু, ব্যাঙ্ক সর্বোচ্চ মুনাফার নীতি অনুযায়ী টাকা খাটাইতে পারে না, কারণ কেবলমাত্র এই নীতি অনুসরণ করিলে তাহাকে বিপদে পড়িতে হইতে পারে। ব্যাঙ্ক নিজের টাকায় ব্যবসায় করে না, অপরের নিকট হইতে ঋণ-লওয়া টাকা বা আমানতই সে ঋণগ্রহীতাদের ধার দেয়। এই আমানতকারীরা যখন খুশি নিজেদের টাকা ফেরৎ চাহিতে পারে, অধিকাংশ আমানতকারীরা তাহাদের আমানত একত্রে তুলিয়া লইতে চাহিলে ব্যাঙ্কে রান্ (run) হইতে থাকে। এই সময়ে ব্যাঙ্কের উপর লোকের আস্থা ও বিশ্বাস টলিয়া যায়, সকল আমানতকারীকে নগদ টাকা ফেরৎ দিতে পারিলে তবেই এই আস্থা সে পুনরায় অর্জন করিতে পারে। সুতরাং ব্যাঙ্কগুলি এমনভাবে টাকা খাটায় যাহাতে তাহার বিনিয়োগগুলিকে সে যথাসম্ভব দ্রুত নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতে পারে। কোন কোন সম্পত্তি দ্রুত অপর ধরনের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, তাহাই সেই সম্পত্তির তরলতার মাত্রা (degree of liquidity), তাই নগদ টাকাই সর্বাপেক্ষা তরল সম্পত্তি। ব্যাঙ্ক তাই এমনভাবে বিনিয়োগ করে যাহাতে তাহার বেশির ভাগ আমানতই তরল বিনিয়োগে আবদ্ধ থাকে। এই তারল্যের নীতি স্মরণ না করিয়া সে পারে না।

বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারের কাজই হইল এই সকল পরস্পরবিরোধী নীতির মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্য আনা। সে সাবধান থাকিবে, মুনাফাও বাড়াইবে, আবার এমন রূপে বিনিয়োগ করিবে যাহা সহজে নগদ টাকায় রূপান্তর-যোগ্য। সাবধান হইয়া যদি সে বেশি টাকা জমা রাখে তবে বিনিয়োগের জন্য টাকা কম থাকিবে, লাভের আশা কম। যদি সর্বাধিক তরল সম্পত্তি, অর্থাৎ একেবারে নগদ টাকা হাতে রাখে তাহা হইলে লাভ হইবে কোথা হইতে? যত বেশি অতরল বা তারল্যহীন বিনিয়োগে টাকা খাটাইবে তত বেশি সুদ পাইবে, তাহার লাভও বেশি হইবে। কিন্তু তারল্যহীন বিনিয়োগে তাহার ঝুঁকি বেশি, নিরাপত্তা কম। তাই বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারের কাজই হইল এই তিনটি নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা।

বিজ্ঞ ব্যাঙ্কার এই তিনটি নীতি স্মরণ রাখিবে

প্রথমেই ধরা যাউক জমার কথা। বলা হয় যে, ব্যাঙ্কিং-এর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে জমা বা রিজার্ভের উপযুক্ত পরিচালনার উপর (Successful banking depends largely on the management of reserves)। নিজের হাতে রক্ষিত নগদ টাকা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত জমা ইহাই তাহার আত্মরক্ষার প্রথম সোপান। এই জমার পরিমাণ বেশি হইবে না, কিন্তু পর্যাপ্ত হইবে। জমা উপযুক্ত না হইলে ব্যাঙ্ক নিজের বিপদ নিজেই ডাকিয়া আনিবে আবার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হইলে যে-মুনাফা সে পাইতে পারিত তাহা হইতে ব্যাঙ্ক বঞ্চিত হইবে। এই জমা বা রিজার্ভ পরিচালনার ব্যাপারে তাই বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারকে ধনলিপ্সা ও ভীরুতার মধ্যে কোথাও একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আমানতের ঠিক কত অংশ সে নগদ টাকায় জমা রাখিবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে তাহার বিবেচনার উপর, কি হারে আমানতকারীরা নগদ টাকা তুলিয়া লইবার কথা চিন্তা করিতেছে সেই সম্পর্কে ব্যাঙ্কারের অভিজ্ঞতার উপর। ব্যাঙ্কের মোট দেনার তুলনায় তাহার নগদ জমার পরিমাণ সর্বদাই কম, তাই সকল আমানতকারী এক সঙ্গে নগদ টাকা চাহিলে ব্যাঙ্ক ফেরৎ দিতে পারে না। কোন একটি ব্যাঙ্ক অবশ্য অন্যান্য ব্যাঙ্কের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে হঠাৎ প্রয়োজন হইলে টাকা আনিয়া আমানতকারীদের দেনা মিটাইতে পারে, কিন্তু সকল ব্যাঙ্কের পক্ষে একই সঙ্গে ইহা সম্ভবপর নয়। ব্যাঙ্কের উপর যতক্ষণ আমানতকারীদের আস্থা আছে, ততক্ষণ এই রিজার্ভের গুরুত্ব ততটা নাই, কিন্তু একবার আস্থা হারাইতে থাকিলে মোট আমানতের 100% জমা রাখাই একমাত্র নিরাপদ। সুসময়ে ইহার প্রয়োজন নাই, কিন্তু অসময়ে এই জমা পর্যাপ্ত নয়—এই অবস্থা মানিয়া লইয়াই ব্যাঙ্কারকে কাজ চালাইতে হয়।* সাধারণত ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের মোট আমানতের 8 হইতে 10% জমা রাখে; সকল দেশেই ব্যাঙ্কারদের অভিজ্ঞতা হইতে মোটামুটি এই রিজার্ভের অনুপাত সকল ব্যাঙ্কারের জানা থাকে।

রিজার্ভ সম্পর্কে ব্যাঙ্কের নীতি

রিজার্ভ বা জমার পরিমাণ সম্পর্কে মোটামুটি মন স্থির করিয়া ব্যাঙ্কার তাহার বিনিয়োগের দিকে নজর দেয়। মুনাফা বাড়াইতে হইবে, আবার বিনিয়োগের তারল্যও বজায় রাখিতে হইবে। বিভিন্ন ঝুঁকিসম্পন্ন ঋণে বিভিন্ন সুদের

*"Modern private banking is an uneasy compromise of elements which are unnecessary if the sun is shining, and insufficient if it is not."

হারে সে টাকা খাটায়। এই বিষয়ে কোন ব্যাঙ্কারকে অনেক দিকে চিন্তা করিতে হয়। যেমন, সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বেশি দিন আবদ্ধ থাকিতে পারে এইরূপ স্থানে টাকা খাটায় না। সাধারণত লোকে অল্প সময়ের জন্য টাকা আমানত রাখে, তাই ব্যাঙ্ককেও ঐ আমানত অল্পসময়ের মধ্যেই খাটাইয়া লইতে হয়। অল্প-সময়ী আমানত লইয়া দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা খাটাইবার ঝুঁকি সে নিতে পারে না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে (যেমন তিন মাসে) যে-বিলগুলি আপনাআপনি ফলপ্রসূ হইয়া উঠে (self liquidating), সেই ধরনের ঋণপত্রে নিয়োগ করাই ব্যাঙ্কের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। অধিক সময়ের জন্য ধার দেওয়ার দুইটি বিপদ, টাকা ফেরৎ না পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আর বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য বাজারে হ্রাস হইতে পারে। সেইজন্য বলা হয় যে, বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারের গুণ হইল বিল ও বন্ধকের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারা (difference between bill and mortgage)।

বিনিয়োগ সম্পর্কে ব্যাঙ্কের নীতি

কেবলমাত্র প্রথমশ্রেণীর বিল চিনিতে পারিলেই ব্যাঙ্কারের কাজ শেষ হয় না, তাহাকে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে এই বিনিয়োগগুলি উপযুক্তভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হয়। এই বিষয়ে তাহাকে অনেক দিকের উপর নজর রাখিতে হয়। দেশে কখনও কখনও টাকার লেনদেন বাড়ে, তাহাকে বলে তেজী মরসুম (busy season); আবার কখনও কখনও টাকার লেনদেন কমে, উহাকে বলে মন্দা মরসুম (slack season)। মন্দার মরসুমে ব্যাঙ্কের ঋণের জন্য চাহিদা কম, আবার তেজী মরসুমে উহার চাহিদা বেশি। তাই ব্যাঙ্কার এমনভাবে বিল ও সিকিউরিটিগুলি কেনে যাহাতে মন্দার মরসুমে বেশি টাকা তাহার কাছে ফিরিয়া না আসে অথচ তেজী মরসুমে অধিকাংশ বিল ও সিকিউরিটিগুলি ফলপ্রসূ হয় এবং তাহার নিকট নগদ টাকা পৌঁছে। মন্দার মরসুমে যখন ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা বেশি, তখন সে অতি অল্প সময়ের জন্য টাকা খাটাইবে, ইহাতে খুব কম আয় হইলেও সে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা আবদ্ধ করিবে না। কারণ সে তেজী মরসুমের অপেক্ষায় আছে, সেই সময় তাহার হাতে নগদ টাকার পরিমাণ যথাসম্ভব বেশি থাকা দরকার। দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা খাটানোর ঝোঁক আজকাল ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে দেখা যাইতেছে। যদি হাতে বেশ কিছু পরিমাণ বেশি টাকা থাকে তবেই ব্যাঙ্ক এই চিন্তা করিতে পারে। বিনিয়োগের

বিভিন্ন সময়ে ফলপ্রসূ ঋণপত্র

ঝুঁকির পরিমাণ কমাইবার উদ্দেশ্যে আজকাল কয়েকটি ব্যাঙ্ক মিলিয়া সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান (consortiumn) গঠন করিয়া দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখার জন্য ব্যাঙ্ক তাহার মোট বিনিয়োগকে বিভিন্ন প্রকার ঋণের মধ্যে সুচিন্তিতভাবে ছড়াইয়া রাখিবে। কিছু টাকা সে তরল-ঋণ ও অত্যল্পকালীন ঋণের বাজারে খাটাইবে। এবং নির্দিষ্ট সময়ে যে-বিলগুলি আপনা-আপনি ফলপ্রসূর সম্ভাবনা তাহাতে কিছু টাকা রাখিবে। সরকারী স্বল্পকালীন বিল বা ট্রেজারী বিলে সাধারণত বেশি টাকা রাখা হয়। মধ্যকালীন বা দীর্ঘকালীন সরকারী বিনিয়োগে টাকা রাখা ততটা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া অনেকে মনে করেন, কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদ সম্পর্কে নীতির উপর এই সিকিউরিটি-গুলির দাম নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়াইলে সরকারী সিকিউরিটি-গুলির বাজার-দর কমিয়া যায়, তাই ইহাতে টাকা খাটানো বিশেষ নিরাপদ নয়।

বিভিন্ন তরলতা-সম্পন্ন ঋণপত্র

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ব্যাঙ্কের ধনসম্পন্নতা (solvency) ও তরলতা (liquidity) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কোন ব্যাঙ্কের অবস্থা ভাল, ইহা বেশ ধনসম্পন্ন—এই কথা বলিলে বোঝা যায় তাহার ঋণ-পরিশোধের যোগ্যতা আছে। অর্থাৎ, ব্যাঙ্কের মোট সম্পত্তির পরিমাণ এত যে সে মোট দেনা মিটাইতে সক্ষম, তাহার ঋণশোধযোগ্যতা আছে। কিন্তু এই অবস্থাতেও তাহার তারল্য না থাকিতে পারে। তারল্য নির্ভর করে সে কি ধরনের সম্পত্তিতে টাকা খাটাইয়াছে, উহাদের কত দ্রুত এবং ক্ষতি স্বীকার না করিয়া আবার নগদ টাকায় পরিণত করা সম্ভব—ইহার উপর। ঋণসম্পন্নতা থাকিলেই ব্যাঙ্কটি নিরাপদ নহে, তারল্য থাকিলে তবেই তাহার ঝুঁকি কম। অনেক সম্পত্তি থাকা অবস্থাতেও যদি চাহিবামাত্র ব্যাঙ্কটি আমানতকারীকে নগদ টাকা ফেরৎ দিতে না পারে, তবে তাহার নিরাপত্তা নাই। তাই বিনিয়োগের দিক হইতে ব্যাঙ্কের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা।

ঋণশোধযোগ্যতা ও তরলতা এক নয়

সম্পত্তি বা বিনিয়োগ পরিচালনার তত্ত্ব (Theories of Asset Management)

কেমন করিয়া ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের বিনিয়োগের বা সম্পত্তির তারল্য বজায় রাখিতে পারে সেই বিষয় ব্যাঙ্কিং-এর পণ্ডিতেরা বহু আলোচনা করিয়াছেন। অনেকদিন ধরিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে যে, এই ব্যাঙ্কগুলি কেবলমাত্র স্বল্পকালের জন্য আপনাআপনি পরিশোধ্য এবং উৎপাদক-ঋণ (shorterm self-liquiding, productive loan) দিবে। এই নীতি অনুসরণ করিলে ব্যাঙ্কগুলি কেবলমাত্র দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ের (বা বণ্টনের) উদ্দেশ্যে ঋণ দিবে। কোন কারখানায় দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, বা কারখানা হইতে দ্রব্যগুলি বিক্রয়ের জন্য বাজারে যাইতেছে —এই সকল ধারাকে সাহায্য বা ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যাঙ্কগুলি ধার দিবে, অনেকে এইরূপ মনে করেন। দ্রব্য উৎপন্ন হইলে বা বিক্রয় হইয়া গেলে ব্যাঙ্ক সেই টাকা হইতে এই ঋণ ফেরৎ পাইবে, উৎপাদন ও বিক্রয়ের ধারার মধ্যেই এই ঋণ শোধ হইয়া যাইবে—তাই ইহাদের স্বয়ংশোধ্য ঋণ বা সম্পত্তি (self-liquidating assets) বলিয়া মনে করা হয়। এই ধরনের কাজে ঋণ দানের নীতিকে বলা হয় "আসল-বিলের নীতি" (Real Bills Doctrine) বা "স্বয়ং পরিশোধের তত্ত্ব" (Theory of Self-Liquidity)। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাঙ্কিংজগতে এই নীতির প্রাধান্য ছিল, এবং বর্তমানেও বহু পণ্ডিত ইহাকে সমর্থন করেন।

আসল-বিল বা স্বয়ংশোধের নীতি

আধুনিক কালে এই তত্ত্বের বহুবিধ সমালোচনা হইয়াছে এবং মোটামুটি ইহার পরিবর্তে ভিন্নরূপ নীতির কথা বলা হইতেছে।* যেমন, প্রতিটি ব্যাঙ্কের প্রতিটি ঋণই যদি এইরূপ 'আসল বিলের নীতি' অনুযায়ী করা হয় তাহা হইলে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিতে পারে না। যে-উৎপাদনধারা বা বিক্রয়-ধারা সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ঋণ লওয়া হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্বমুহূর্তে আবার ঋণ লওয়া দরকার হয় অথবা পুরাতন সেই ঋণ আবার দেওয়া হইবে (renewal of old loans) এইরূপ প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন হয়। পুরাতন ঋণ সম্পূর্ণ শোধ পাইলে আবার

এই নীতির ত্রুটি

*"The real bills doctrine, as Mr. Hart has observed, sounds very nice as it has a flavour of unattainable 'moral beauty' about it. But it conceals several fallacies."—Dr. S. K. Basu, *A Survey of Contemporary Banking Trends*, P 281.

নূতন ধারা শুরুর সময়ে ঋণ পাওয়া যাইবে এইরূপ হইলে সমাজে উৎপাদন ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। দেশের কোন কোন ব্যাঙ্ক যদি নূতন ঋণ সৃষ্টি করিয়া চলে তবে সেই ঋণস্রোতই দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইয়া দিয়া সকল ব্যাঙ্ক হইতে ঋণগ্রহীতাদের পুরাতন ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা গড়িয়া তুলিতে থাকে। পুরাতন বিলগুলি পরিশোধের পূর্বে যদি ব্যাঙ্কেরা নূতন বিল গ্রহণ করিতে রাজি না হয়, তবে সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতাদের কাজকর্ম প্রসারিত হয় না, উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য হ্রাস পায়, দেশের ক্রয়শক্তি কমিয়া যায়, দামস্তর কমে, পুরাতন ঋণগ্রহীতারাও তাহাদের ঋণ শোধ করিয়া উঠিতে পারে না।* বিশেষত, ব্যবসায় সংকটের যুগে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া অনেক সময় ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, এই অবস্থায় যদি ব্যবসায়ীদের নূতন ঋণ পাইবার পূর্বেই পুরাতন ঋণ শোধ দিতে হয় এবং দেশে সকল ব্যাঙ্ক মিলিয়া ঋণ-সংকোচনের নীতি গ্রহণ করে তবে ব্যবসায়-বাণিজ্য নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই নীতি তাই সমর্থনযোগ্য নহে।

তাহা ছাড়া, আধুনিক কালে তারল্য সম্পর্কে ধারণা পূর্বাপেক্ষা একটু ভিন্নরূপ হইয়া উঠিয়াছে। কোন ব্যাঙ্ক যদি তাহার সম্পত্তিগুলিকে অন্য ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে পারে অথচ তাহার কোনরূপ আর্থিক ক্ষতি না হয়, তবেই সেই ব্যাঙ্ক তরল অবস্থায় আছে বলিয়া মনে করা যায়।

অপসারণের তত্ত্ব

দরকারমত আমার হাতের বিল ও সিকিউরিটিগুলি বিনা-ক্ষতিতে আমি যদি অন্যত্র বিক্রয় করিতে পারি, তবেই আমার ঋণশোধযোগ্যতা এবং তারল্য বজায় রহিল, এইরূপ মনে করা চলে। ইহাকে বলে 'অপসারণের নীতি' (Shiftability theory)। দ্রুত এবং লোকসান না দিয়া কোন ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের নিকট নিজ সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিয়া নগদ টাকা ফেরৎ পাইতে পারে—

* "If bankers, in a misguided attempt to 'liquidate' their assets, refuse to take up any new bills and do simply sit back in their parlours and wait for the maturities of the bills in their portfolios there is a catastrophic fall in the supply of purchasing power and the catastrophic fall in prices which makes it impossible for debtors to meet bills out of the proceeds of their operations. Only by maintaining their assets can banks maintain the 'self-liquidating' character of a substantial class of them. The banks are for the most part important direct lenders in the short-term Capital market, and the availability of means to pay off maturing short-term debts depends essentially on the bank's readiness to make new short-term loans." Sayers, *Modern Banking* (4th Edn) P, 196.

এই ধরনের সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করিলেই তারল্য বজায় থাকে। ফলপ্রসূ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই—দরকার হইলে উহার পূর্বেই বিলগুলিকে অন্যত্র অপসারণ করা সম্ভব হইলে উহাকে তারল্য বলিয়া মনে করা হয়।*

অপসারণ তত্ত্বের সমর্থনকারীরা মনে করেন যে, কেবলমাত্র অন্য ব্যাঙ্কের নিকট নয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট অপসারণের যোগ্য বিবেচিত হইলেই সেই বিলগুলি কিনিয়া বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা চলে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে-সকল বিল বা ঋণপত্র কিনিতে প্রস্তুত আছে, কোন ব্যাঙ্ক সেইগুলিতে টাকা খাটাইলেই তাহার তারল্যাবস্থা বজায় থাকে, কারণ দরকারমত সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে উহাদের বিনিময়ে নগদ টাকা পাইবে।

'আসল-বিলের তত্ত্ব' বা 'অপসারণের তত্ত্ব' যাহাই গ্রহণ করা হউক না কেন ব্যবসায়-সংকটের যুগে ইহাদের কোনটিই ব্যাঙ্ককে বাঁচাইতে পারে না। সংকট-কালে বিল ও সিকিউরিটিগুলি আপনা-আপনি ফলপ্রসূ (self liquidating) হইয়া উঠে না, কারণ ঋণগ্রহীতাদের ঋণশোধের ক্ষমতা হ্রাস পায়। সকল ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা আসিলে কোন ব্যাঙ্কই অপর কাহারও নিকট নিজের কোন সম্পত্তি অপসারণ করিতে পারে না। এই অবস্থায় একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঋণপত্রগুলি গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়, তবে সেই ব্যাঙ্কের পক্ষে তারল্য বজায় রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গ্রহণযোগ্য বিলগুলিতে বিনিয়োগ করিতে পারাই তাই তারল্যরক্ষার প্রকৃষ্ট পথ।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই আশ্রয়স্থল

সর্বশেষে আমেরিকার ব্যাঙ্কিং-জগতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝোঁকের কথা উল্লেখ করা দরকার। আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলি আজকাল ব্যবসায়ীদের মধ্যকালীন ও দীর্ঘকালীন প্রয়োজন মিটাইবার জন্যও ঋণ দিতেছে। ইহাদের টার্ম লোন্ (Term loan) বলে। বর্তমানের চুক্তি অনুযায়ী এক বৎসর পরে যে-ঋণ পরিশোধনীয় উহাকে টার্ম ঋণ বলা হইতেছে। সাধারণত এই সকল ক্ষেত্রে ঋণ-কাল 1 বৎসরের বেশি, কিন্তু 5 বৎসরের কম। সমস্ত ঋণকাল ধরিয়া ভবিষ্যতের

* "What is essential is maintenance of a substantial quantity of assets which can be shifted on to other banks before maturity in case of necessity. Thus liquidity is tantamount of shiftability." S.K. Basu *Contemporary Banking Trends*, P 283.

আয় হইতে এই ধরনের ঋণ পরিশোধ করা হইয়া থাকে। যন্ত্রপাতি, মজুত দ্রব্য-সামগ্রী এবং অনেক সময় ঘরবাড়িও বন্ধক লওয়া হয়। বারবার স্বল্পকালীন ঋণ দান ও গ্রহণ করার অসুবিধা এড়াইবার জন্য এবং আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলির হাতে প্রভূত উদ্বৃত্ত টাকা বিনিয়োগের পথ বাহির করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের ঋণনীতির উদ্ভব হইয়াছে। মার্কিন ব্যাঙ্কিং-জগতের এই নূতন কাজকর্ম বহুলাংশে পুরাতন ব্যাঙ্কিং নীতির বিরোধী। 'আসল-বিলের তত্ত্বে' ঋণগ্রহীতার দ্রব্য বা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক টাকা আদায় করে; 'অপসারণ তত্ত্বে' অপর কোন ঋণদাতার নিকট হইতে ব্যাঙ্ক এই ঋণ পরিশোধ পায়। কিন্তু এই টার্ম ঋণগুলি ব্যাঙ্ক ফেরৎ পায় "ঋণগ্রহীতার প্রত্যাশিত আয়" হইতে (anticipated income of the borrower)। এইরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্কগুলির বিনিয়োগের তারল্য সম্পর্কে নূতন এক তত্ত্ব গড়িয়া উঠিতেছে। ঋণগ্রহীতা নিজের ভবিষ্যৎ আয় হইতে সঞ্চয় করিয়া ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করিবে—এই তত্ত্ব পূর্বের দুইটি হইতে অনেকাংশে পৃথক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

ঋণগ্রহীতার ভবিষ্যৎ প্রত্যাশিত আয়ের তত্ত্ব

ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণসৃষ্টি (Creation of credit by Banking system)

আধুনিককালে ব্যাঙ্কের আমানত দুই প্রকারে সৃষ্টি হইতে পারে। প্রথমত, আমানতকারী কোন ব্যক্তি নগদ টাকা লইয়া ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলে ব্যাঙ্ক তাহার নামে আমানত-হিসাব (Deposit account) খুলিয়া দেয়; ইহাকে প্রকৃত আমানত (Actual deposit) বলে। দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিলে ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতার নামে নিজের খাতায় হিসাব খুলিয়া দেয়; সেই হিসাব হইতে ঋণের পরিমাণ পর্যন্ত টাকা চেকের সাহায্যে তুলিয়া লইবার অনুমতি দেয়। ইহাকে সৃষ্ট-আমানত (Created deposit) বলা হয়।

দুই প্রকার আমানত সৃষ্টি

প্রথম প্রকার বা প্রকৃত আমানত সৃষ্টি হয় আমানতকারী ব্যক্তির তাগিদে। দ্বিতীয় প্রকার বা সৃষ্ট-আমানত সৃষ্টির তাগিদ আসে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে। এইরূপে আমানত সৃষ্টি করিয়াই ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়।

ব্যাঙ্ক কোথা হইতে ঋণ দেয়? যে নগদ টাকা তাহার নিকট আমানত হিসাবে

* Dr. S. K. Basu, *Contemporary Banking Trends*, P. 285—89.

আসে, তাহার সম্পূর্ণ পরিমাণ ঋণ দিতে পারে না, কারণ আমানতকারী যদি টাকা উঠাইয়া লইতে চায়, ব্যাঙ্ককে তাহা দিতে হইবে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক জানে যে, সকল আমানতকারীগণ এক সঙ্গে তাঁহাদের সকল আমানত উঠাইয়া লইতে চাহেন না। মোট নগদ আমানতের সম্পূর্ণ পরিমাণ ব্যাঙ্কে না রাখিলেও দৈনন্দিন লেনদেনের কাজ চালানো যায়। সুতরাং নগদ আমানতের কিছু অংশ, শতকরা কিছু ভাগ নগদ টাকা দৈনন্দিন লেনদেনের উদ্দেশ্যে জমা রাখিয়া অধিকাংশ টাকাই ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। নগদ সঞ্চয়াংশের (Cash Reserve) পরিমাণ বেশি হইলে ব্যাঙ্ক কম ঋণ দিতে পারে, নগদ সঞ্চয়াংশের পরিমাণ কম হইলে ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে পারে।

ব্যাঙ্ক কর্তৃক আমানতী অর্থের নির্দিষ্ট হার নিজের হাতে নগদ জমা

ব্যাঙ্ক যখন আমানত স্বষ্টি করে তখন ঋণগ্রহীতার নামে আমানত হিসাবে ব্যাঙ্কের খাতায় হিসাব লিখিয়া রাখে এবং সেই হিসাব হইতে চেক কাটিয়া ঋণ-গ্রহণকারী ঋণ দেয়। সেই ঋণ পুনরায় নগদ আমানত হিসাবে, হয় ঋণপ্রদানকারী ব্যাঙ্কে, অথবা অপর কোন ব্যাঙ্কে জমা হইয়া পড়ে। এই নূতন জমার ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক পুনরায় ঋণবৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পায়। এইরূপে প্রতিবার ঋণদানের ফলে নূতন আমানত স্বষ্টি হয় এবং প্রতিবার নূতন আমানত স্বষ্টির ফলে নূতন ঋণদান সম্ভব হয়। এইরূপে ব্যাঙ্কগুলি মিলিয়া সামগ্রিকভাবে তাহাদের মোট নগদ-আমানতের বহুগুণ বেশি মোট ঋণ স্বষ্টি করিয়া থাকে।

ব্যাঙ্কব্যবস্থা কর্তৃক ঋণার্থ স্বষ্টি

মনে করা যাউক, A-ব্যাঙ্ক কোন এক ব্যক্তির নিকট হইতে 1000 টাকার নগদ আমানত পাইল। ধরা যাউক, দেশে এইরূপ আইনসঙ্গত নিয়ম বা প্রথা চালু আছে যে, মোট নগদ আমানতের 10% ব্যাঙ্ককে নিজের কাছে জমা রাখিতে হয়। এমতাবস্থায় A-ব্যাঙ্ক নগদ আমানতের 10% অর্থাৎ 100 টাকা জমা রাখিয়া অবশিষ্ট 900 টাকা কাহাকেও ঋণদান করিবে।

কিন্তু বর্তমান ব্যাঙ্কব্যবস্থাই এইরূপ যাহাতে ঘটনার স্রোত আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়া যায়। যাহারা 900 টাকা ঋণ পাইল তাহারা এই টাকা ব্যয় করার ফলে যাহাদের হাতে গিয়া ইহা নূতন আয়রূপে দেখা দিল, তাহারা A-ব্যাঙ্কে বা অন্য কোন ব্যাঙ্কে জমা দিবে। মনে করা যাউক, সেই 900 B-ব্যাঙ্কে নগদ আমানতরূপে জমা পড়িল। B-ব্যাঙ্ক 900 টাকা নগদ-আমানতের 10%

অর্থাৎ 90 টাকা জমা রাখিয়া 810 টাকা অপর কাহাকেও ঋণ হিসাবে দিয়া দিল। সেই 810 টাকা, আবার ধরা যাউক, C-ব্যাঙ্কে জমা পড়িল এবং C-ব্যাঙ্ক ইহার 10% অর্থাৎ 81 টাকা জমা রাখিয়া 729 টাকা নূতন ঋণ সৃষ্টি করিল। যতদিন না পর্যন্ত নগদ আমানতের পরিমাণ বিশেষভাবে কমিয়া গিয়া পরিমাণ এইরূপ দাঁড়াইবে যাহাতে নূতন ঋণসৃষ্টি করা আর সম্ভব নহে, ততদিন এইরূপে নূতন ঋণসৃষ্টি ধারা চলিতে থাকিবে। এই ক্ষেত্রে 900 টাকার প্রথম ঋণদানের ফলে সমগ্র সমাজে 9000 টাকার ঋণ সৃষ্টি পাইবে। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, ব্যাঙ্কগুলি একত্রে মিলিয়া সমাজে মোট অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে পারে।

দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা (Banking System) কর্তৃক ঋণসৃষ্টির ক্ষমতার কিন্তু সীমা আছে। কোন ব্যাঙ্ক যদি বেশি নগদ টাকা নিজের হাতে জমা রাখিয়া দেয়, তবে ভবিষ্যতে অন্য ব্যাঙ্কও নগদ-আমানত কম পাইবে এবং সমাজে মোট ঋণসৃষ্টির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তি যদি ঋণ গ্রহণ করিয়া কোন ব্যাঙ্কে জমা না দিয়া সেই নগদ টাকা নিজের হাতে জমাইয়া রাখে, তবে তাহা ঋণসৃষ্টি করিতে পারে না। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির (খোলা বাজারে কার্যাদির) দ্বারা সমাজে নগদ টাকার পরিমাণ কমাইয়া দিলে মোট ঋণসৃষ্টির পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে তখনই রাজি থাকে যখন উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য পায়। উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য না থাকিলে ঋণ দেওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে বিপজ্জনক। তাই দেশে বন্ধক-যোগ্য উপযুক্ত শেয়ার ও সম্পত্তি থাকা দরকার ; তবেই ঋণের প্রসার সম্ভব। অধ্যাপক সেয়ার্স ঠিকই বলিয়াছেন যে, "The banks put this newly created money into the hands, not of everybody at once, but of those individuals who can offer to the bank the kind of asset which the bank thinks attractive."

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কর্তৃক ঋণসৃষ্টির সীমাবদ্ধতা

সর্বোপরি, মনে রাখা দরকার যে, ব্যাঙ্কগুলির ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা নির্ভর করে দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থার উপর, অর্থাৎ দেশে উপযুক্ত আশাবাদী আবহাওয়া আছে কি নাই তাহার উপর। যদি বেশিসংখ্যক ব্যক্তি ঋণ লইতে না আসে, তবে ব্যাঙ্কের নিজের ইচ্ছা থাকিলেও ঋণপ্রসারের এই ধারা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে না। ঘোড়াকে জলের নিকট পৌঁছানো চলে, কিন্তু জলপানে

বাধ্য করা যায় না ; ঠিক সেইরূপ ব্যাঙ্কের ইচ্ছা থাকিলেও দেশে ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তির অভাবে ঋণপ্রসারের ধারা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে।

মিশ্র ব্যাঙ্কিং (Mixed Banking)

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে, ইউরোপের কয়েকটি দেশে (যেমন ইতালী, জার্মানী, হাঙ্গেরী বেলজিয়াম প্রভৃতিতে) প্রাচীন ব্যাঙ্কিং-নীতির বদলে নূতন ব্যাঙ্কিং রীতি-পদ্ধতি দেখা দিয়াছে। চিরাচরিত ব্যাঙ্কিং-নীতি ছিল স্বল্পকালীন প্রয়োজনে ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা খাটানো : ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত শিল্প-কলকারখানাকে ধার দিত না, কারণ ইহাতে বেশিদিনের জন্য টাকা অপরের নিকট আবদ্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু এইসকল দেশের ব্যাঙ্কসমূহ শিল্পগুলিকেও ধার দিয়াছে এবং বেশিদিনের জন্য তাহাদের নিকট টাকা ফেলিয়া রাখিয়াছে। নিজেদের দেশের শিল্পোন্নয়নে ব্যাঙ্কসকল এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, ইহাদের প্রচেষ্টায় নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। এই সকল দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ বিনিয়োগ-ব্যাঙ্কিং (Investment Banking) শুরু করিয়াছে। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট, শিল্প-পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা, দেশে অর্থনৈতিক সংগঠনের পরিবর্তন (যেমন জার্মানীতে যুদ্ধের প্রয়োজনে অতি দ্রুত শিল্পায়ন), এই সকল কারণে রক্ষণশীল ব্যাঙ্কিং-নীতি ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং পৃথিবীর বহুদেশে নূতন ধরনের এই প্রকার মিশ্র ব্যাঙ্কিং গড়িয়া উঠিয়াছে।

মিশ্র ব্যাঙ্কিং কি ও কেন

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে এই প্রকার মিশ্র ব্যাঙ্কিং বিশেষ সুবিধাজনক—ইহা জার্মানী, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ইতিহাস হইতে জানা যায়। এখানকার ব্যাঙ্কাররা ঋণগ্রহণকারী শিল্পপতির আদ্যন্ত খোঁজখবর রাখে, সেই শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা লইয়া যথেষ্ট চিন্তা করে। ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য বাজারে শেয়ার ছাড়া হইবে ইহার ভিত্তিতেই ব্যাঙ্ক শিল্পপতিকে ঋণ দেয়, শেয়ার ছাড়া হইলে যাহাতে উহা বিক্রয় হয় সেইজন্য ব্যাঙ্ক সেই শেয়ার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তোলে, নিজেরা অনেক সময় শেয়ার বিক্রয়ের আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করে, গ্যারান্টি দেয়, আণ্ডাররাইট করে, নিজের সুনাম জড়াইয়া দিয়া শিল্পপতিকে টাকা তুলিতে এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। যদি কোন একটি ব্যাঙ্কের আমানতের

মিশ্র ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা ও কি অবস্থায় ইহা সম্ভব

তুলনায় নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ বেশি হয়, আমানতের অধিক অংশ দীর্ঘকালীন আমানত হয়, তবে তাহা হইতে ব্যাঙ্কের মোট বিনিয়োগের কিছু অংশ শিল্পের দীর্ঘ-কালীন মূলধন ভাণ্ডারে নিয়োগ করা সম্ভবপর। এই ধরনের বিনিয়োগে লাভের হার বেশি, উপরন্তু যে-ঝুঁকি আছে তাহা দূর করা অসম্ভব নয়। খুব সাবধানতার সহিত ও বিবেচনা করিয়া যদি ভবিষ্যতে উন্নত হইবে এইরূপ শিল্পে টাকা খাটানো যায়, এবং কয়েকটি ব্যাঙ্ক একত্র হইয়া সিণ্ডিকেট বা কনৃসর্টিয়াম গঠন করিয়া শিল্পে ঋণ দেওয়া হয় তবে স্বভাবতই ঝুঁকির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। ব্যাঙ্কার ও শিল্পপতি পরস্পরের অভিজ্ঞতা হইতে লাভবান হন; শিল্পপতি বাজারের অবস্থা জানিতে পারেন, আবার ব্যাঙ্কাররাও শিল্পটির আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানেন বলিয়া লোকসান এড়াইবার চেষ্টা করিতে পারেন।

মিশ্র ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতির দিকটাও আলোচনা করা দরকার। এই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সর্বাধিক প্রকাশ পায় ব্যবসায়-সংকটের যুগে; কারণ এই সময় মূলধনী দ্রব্যসামগ্রীর দাম বা বিনিয়োগের মূল্য হ্রাস পায়। ব্যাঙ্কের অধিকাংশ বিনিয়োগই আবদ্ধ হইয়া পড়ে, নগদ টাকায় রূপান্তরণ সম্ভব হয় না। ১৯২৯—৩০ সালের অর্থনৈতিক সংকটে আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান ও অন্যান্য দেশে ইহাই ঘটিয়াছিল। আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলি নিজেরা বা তাহাদের সহপ্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে শেয়ার-বাজারে প্রভূত টাকা খাটাইয়াছিল, তাই শেয়ারের দাম কমিয়া যাওয়ায় তাহাদের অবস্থা হঠাৎ বিপদজনক হইয়া উঠে। ব্যাঙ্কগুলি প্রায়ই সাবধানতার সীমারেখা অতিক্রম করিয়া দীর্ঘকালীন ঋণে টাকা খাটাইত, ফলে তাহাদের অবস্থা সর্বদাই তারল্যহীন হইয়া উঠিত। শিল্পে অতি-বিনিয়োগের দরুণই ১৯৩২ সালে ফ্রান্সের Banque National de credit ভাঙিয়া পড়িয়াছিল; ঠিক একই কারণে Austrian Creditanstalt বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মিশ্র ব্যাঙ্কিং-এর ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোর সকল অঙ্গে এমন এক ফাটকাদারির মনোভাব দেখা দেয় যে, তাহা দেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক গতিকে তুচ্ছ করিয়া অস্বাভাবিক কতকগুলি প্রবণতার সৃষ্টি করে। ব্যাঙ্কসমূহ অসঙ্গত ধরনের বিনিয়োগে প্রমত্ত হইয়া উঠে, অবশেষে তারল্যহীন সম্পত্তিতে আমানতকারীদের টাকা আবদ্ধ করিয়া ফেলে।

মিশ্র ব্যাঙ্কিং-এর ত্রুটিবিচ্যুতি

এই সকল বিরূপ অভিজ্ঞতার ফলে অনেক দেশই মিশ্র ব্যাঙ্কিং-এর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন করিয়া বলা হইয়াছে যে,

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ শিল্পে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করিতে পারিবে না। 1936 সালের 1লা জানুয়ারী হইতে বেলজিয়ামের ব্যাঙ্কসমূহ আর শেয়ারে বা শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিতে পারিবে না—এইরূপ আইন করা হইয়াছে। সুইডেন, ভারতবর্ষ সর্বত্র এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু, মিশ্র ব্যাঙ্কিং-এর বিরুদ্ধে এইরূপ আইন করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সম্মুখীন হইয়া পুনরায় মিশ্রব্যাঙ্কিং রীতি গ্রহণ করার কথা চিন্তা করিতেছেন। ব্যাঙ্কগুলির হাতে টাকার পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছে, স্বল্পকালীন বিনিয়োগে আর তাহাদের উপযুক্তভাবে নিয়োগ করা যাইতেছে না। তাই উন্নত দেশগুলিতে ব্যাঙ্কি-বিশেষজ্ঞগণ অল্প পরিমাণে মিশ্রব্যাঙ্কিং গ্রহণ করার প্রস্তাব সমর্থন করিতেছেন।

বিরূপ প্রতিক্রিয়া, কিন্তু উহা কাটিয়া যাইতেছে

ব্যাঙ্কিং-কাঠামো: একক ব্যাঙ্কিং বনাম শাখা-ব্যাঙ্কিং (Banking Structure : Unit-Banking vs. Branch-Banking)

প্রত্যেক দেশের অগ্রগতির ইতিহাসে বিশেষ প্রকার কতকগুলি প্রভাব কাজ করিয়াছে, তাই সকল দেশের অর্থনৈতিক সংগঠন সমান নয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এর কাঠামোও সকল দেশে সমান হইতে পারে না। তবুও সাধারণভাবে ব্যাঙ্কিং-কাঠামোকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়: ব্রিটিশ ধরনের শাখা-ব্যাঙ্কিং এবং মার্কিন ধরনের একক বা ইউনিট ব্যাঙ্কিং। ইংলণ্ড ছাড়া কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে শাখা-ব্যাঙ্কিং প্রচলিত আছে। একটিমাত্র অফিস হইতে ব্যাঙ্কিং-এর কাজকর্ম করা হইলে উহাকে বলে একক ব্যাঙ্কিং; আবার একাধিক অফিস হইতে ব্যাঙ্কিং-এর কাজকর্ম করা হইলে তাহাকে বলে শাখা-ব্যাঙ্কিং। সাধারণত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই একক ব্যাঙ্কিং দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের অনেক সময় স্থানীয় ব্যাঙ্কিং (Localized Banking) বলে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধাগুলি পাওয়ার জন্য করেসপণ্ডিং ব্যাঙ্ক-প্রথা (Corresponding Bank System) প্রভৃতি দেখা দিয়াছে। এই প্রথায় গ্রামাঞ্চলের কোন স্থানীয় ব্যাঙ্ক বড় বড় শহরের কোন কোন ব্যাঙ্কে নিজের টাকা জমা রাখিতে পারে। এই ভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টাকা পাঠানো তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়, অন্য কোন

ইউনিট ব্যাঙ্কিং ও শাখা-ব্যাঙ্কিং কাহাকে বলে

শহরের ব্যবসায়ীর বিল আদায় করাও সুবিধাজনক হয়। বিরাট শাখা-অফিস না রাখিয়া এইরূপে মার্কিন ব্যাঙ্কগুলি শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা কিছুটা ভোগ করিতে পারে। উভয় প্রকার ব্যাঙ্ক-কাঠামোর সুবিধা-অসুবিধা আলোচনার সময়ে এই কথা মনে রাখা দরকার। শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধাগুলি আলোচনা করিলে ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর অসুবিধাগুলি ধরা পড়িবে ; আবার ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধাগুলি বিশ্লেষণ করিলে শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর ত্রুটিগুলি বোঝা যাইবে।

শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধার মধ্যে প্রথম হইল যে, ইহা বৃহৎমাত্রায় উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ ও সুযোগসমূহ পাইতে পারে, অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের সুবিধা পাওয়া যায়। তাহাদের বেশি অর্থ-সামর্থ্য থাকে, তাই বেশি মাহিনায় দক্ষ ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগ করিতে পারে। ইউনিট-ব্যাঙ্কিং-এ বিশেষায়ণ প্রসার করার সুবিধা খুবই কম, তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষ ব্যক্তিকে পরিচালনার কাজ হইতে অব্যাহতি দিয়া নীতি-নির্ধারণ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে (যেমন কোথায় টাকা খাটানো হইবে, ঝুঁকি ও ফলপ্রসূতা কেমন ইত্যাদি বিচার করার কাজে নিয়োগ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা হইল যে, প্রতিটি শাখা-অফিস কম নগদ জমার সাহায্যে কাজ চালাইবার সুযোগ পায়। দরকারের সময় একটি শাখা অপর শাখা হইতে টাকা লইয়া আসিয়া কাজ চালাইতে পারে তাই প্রতিটি শাখাতেই কম জমা রাখিলে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় না। করেসপণ্ডেণ্ট ব্যবস্থায় ইউনিট ব্যাঙ্কগুলিও এই সুবিধা পায় ; ইউনিট ব্যাঙ্কটি অপর ব্যাঙ্কে যে-টাকা জমা রাখে তাহা হইতে সুদ পায় না (বা পাইলেও খুব কম পায়)। তৃতীয়ত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর তুলনায় শাখা-ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কম খরচে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টাকার আদান-প্রদান করা চলে। আমানতকারীরা যখন টাকা জমা রাখে তখন তাহারা এই সকল সুযোগ-সুবিধা খুঁজিবে, যে-ব্যাঙ্কে কম খরচায় ভাল কাজ পাওয়া যায়, তাহারা সেই ব্যাঙ্কেই টাকা জমা রাখিবার চেষ্টা করিবে। চতুর্থত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর তুলনায় শাখা-ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থা বিভিন্ন স্থানের মধ্যে ঝুঁকি ছড়াইয়া রাখিতে পারে। এক বাক্সে যেমন সকল ডিম রাখা যুক্তিযুক্ত নয় সেই রকম একটি অঞ্চলের অর্থ নৈতিক শ্রীবৃদ্ধির উপর ভরসা না করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়া ভাল কোন দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলের লোকসান সমৃদ্ধশালী অঞ্চলের লাভ দিয়া পূরণ

শাখা-ব্যাঙ্কিংএর সুবিধা ও ইউনিট ব্যাঙ্কিংএর অসুবিধা কি কি

চলে। এই কারণেই ১৯২৯-৩০ সালের সংকটকালে আমেরিকার কৃষি-অঞ্চলের ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ব্রিটেনের ব্যাঙ্কসমূহ কোনমতে টিঁকিয়া যায়। ভারতেও এইরূপ দেখা গিয়াছে। পঞ্জাবে দাঙ্গার সময়ে ওখানকার স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু উপদ্রুত অঞ্চলে যে-সকল ব্যাঙ্কের শাখা ছিল, তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও নিজেদের অবস্থা সামলাইয়া লইতে পারিয়াছে। পঞ্চমত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর দরুণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মূলধনের চলনশীলতার অভাব সুদের হারে আঞ্চলিক তারতম্যের অন্যতম প্রধান কারণ। কোন অঞ্চলে সুদের হার বেশি হইলে কম সুদের অঞ্চল হইতে টাকা তুলিয়া আনিয়া সেখানে খাটানো যায়, ফলে উভয় অঞ্চলের সুদের হারে পার্থক্যের মাত্রা কমিয়া আসে। ষষ্ঠত, এইভাবে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে টাকা পাঠানো সহজ ও সুবিধাজনক হওয়ায় ব্যাঙ্কের মোট মুনাফা বৃদ্ধি পায়। কোন একটি শাখায় টাকা অলস হইয়া পড়িয়া থাকার উপক্রম হইলে উহাকে অপর অঞ্চলে পাঠানো চলে যেখানে বেশি সুদের হারে উহাকে নিয়োগ করা হয়। সকল অঞ্চলে তেজী বা মন্দার মরসুম একই সময়ে আসিবে এমন কোন কথা নাই, তাই শাখা-ব্যাঙ্কিং এই দিক হইতে বিশেষ সুবিধাজনক। সপ্তমত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র এবং বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাঙ্ক পছন্দ বা বাছাই করার সুবিধা পায়। কোন এক বিশেষ ধরনের ঋণপত্রে টাকা খাটানো হইবে, এই সিদ্ধান্ত একবার গ্রহণ করা হইবার পর বিভিন্ন শাখার মারফৎ সারা দেশে সেই প্রকার ঋণপত্র খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব। অষ্টমত, শাখা-ব্যাঙ্কিং কম ব্যয়শীল, শাখা-অফিসগুলি সাধারণত জাঁকজমক-হীনভাবে পরিচালনা করা চলে, কিন্তু ইউনিট ব্যাঙ্কের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু এই যুক্তি অনেকেই মানিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে সকল শাখার ব্যয় যোগ দিলে দেখা যায় ইহাতে ব্যয়ের পরিমাণ বেশিই হইবে। নবমত, শাখা-ব্যাঙ্কিং থাকিলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থা ও সমস্যাগুলি ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ জানিতে পারেন, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অধিবাসীদের অভ্যাস, রীতিনীতি ও জীবিকা প্রভৃতি সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞান গভীরতর হয়। ব্যাঙ্কারদের জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি অনেক তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে, ব্যাঙ্কিং-পরিচালনার মান উন্নত হয়। উপরন্তু, বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রয়োজন মিটানোও সম্ভবপর হয়। সর্বোপরি, ব্যাঙ্কের শাখাগুলি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষণকেন্দ্র, নূতন শিক্ষার্থীরা কোন এক শাখায়

কাজ করিলে ব্যাঙ্কিং-এর সকল প্রকার কাজকর্ম শিখিতে পারে, ক্রমে জটিল ধরনের কাজ বুঝিতে পারে।

শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর অসুবিধাগুলি বা ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধাগুলি আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমত, ব্যাঙ্কটির কাজের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি প্রয়োজনবোধ না করে, তবে শাখা-ব্যাঙ্কিং-এ লাভ নাই। বিভিন্ন দেশে ব্যাঙ্কটির শাখা প্রতিষ্ঠা করিলে বহুপ্রকার অসুবিধা দেখা দেয়। বিভিন্ন দেশের আইন-কানুন, ব্যবসায়ের রীতিনীতি, প্রথা, অবস্থা ও টাকার ইউনিট সকল বিষয়ে পার্থক্য থাকে—শাখা-ব্যাঙ্কিংকে এই সকল অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এ উপযুক্ত পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের বহুবিধ সমস্যা দেখা দেয়। বহুদূরে অবস্থিত, বিক্ষিপ্ত শাখাগুলির উপর নজর রাখা খুবই অসুবিধা-জনক, উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের অভাবে যে কোন শাখা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তৃতীয়ত, শাখা-ব্যাঙ্কিং খুবই ব্যয়বহুল ও অপচয়মূলক। প্রত্যেকটি শাখার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যাঙ্কের ব্যয় বাড়িয়া চলে, মুনাফাও হ্রাস পায়। ব্যাঙ্কগুলি দূরে অবস্থিত থাকায় তাহাদের ব্যবসায়িক কাজকর্মের মোট পরিমাণ বাড়ে বটে, কিন্তু শাখাগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা ও কেন্দ্রীয়ভাবে উহাদের পরিচালনা করার ব্যয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। চতুর্থত, কোন শাখার অবিবেচনা ও গাফিলতির দরুণ সেই শাখার প্রতি লোকের আস্থাহীনতা জন্মাইলে অন্যান্য শাখার উপরও আমানতকারীদের বিশ্বাস টলিয়া যায়, সমগ্র ব্যাঙ্কটি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অবশ্য ইহাদের বিপক্ষে বলা চলে যে, প্রতিটি শাখা অপর শাখার শক্তিস্তম্ভও বটে, কারণ কোন একটি শাখায় রান্ হইতে সুরু হইলে অন্যান্য সকল শাখার অর্থ ভাণ্ডার ঐ শাখার সাহায্যে অবিলম্বে ছুটিয়া আসিতে পারে। পঞ্চমত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কোন একটি ব্যাঙ্ক দুর্বল হইলে সেই ব্যাঙ্কটি উঠিয়া যায়। কিন্তু শাখা-ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কোন একটি দুর্বল শাখাও সমগ্র ব্যাঙ্কটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুলিতে পারে। শাখা ব্যাঙ্কিং-এর ছত্রচ্ছায়ায় দুর্বল ব্যাঙ্কগুলি বাঁচিয়া থাকে, জনসাধারণ তাঁহাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি ধরিতে পারে না। ষষ্ঠত, শাখা-ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রতা আসিয়া পড়ে; সকল সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রধান-কার্যালয়ের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, ফলে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দ্রুত কাজকর্ম সম্পাদন সম্ভবপর হয় না। সপ্তমত, প্রয়োজনের মাত্রা ছাড়াইয়া শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর প্রসার ঘটাইলে যত্রতত্র ব্যাঙ্কের শাখা গজাইয়া উঠে,

শাখা-ব্যাঙ্কিংএর অসুবিধা ও ইউনিট ব্যাঙ্কিংএর সুবিধা কি কি

ব্যাঙ্কের আধিক্য দেখা দেয়। ইহার ফলে শুরু হয় আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা, দাম কাটাকাটি, আমানত আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত হারে সুদ ঘোষণা, ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগে টাকা খাটাইবার প্রবণতা। অষ্টমত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর স্বপক্ষে বলা হয় যে, এই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের স্থানীয় লোকজন, তাহাদের ব্যবসায়িক ক্ষমতা, সততা ও সমস্যা সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞান থাকে, ফলে কোন্ ব্যবসায়ে টাকা খাটানো নিরাপদ তাহা ভালভাবে বুঝিতে পারে। কিন্তু জ্ঞান থাকিলেও উহা প্রয়োগ করা স্থানীয় ব্যাঙ্ক পরিচালকের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা-জনক। পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক ঘনিষ্ঠতা প্রভৃতি কারণে এই পরিচালক অনেক সময় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকেও ঋণদানে বাধ্য হন।* কিন্তু শাখা-ব্যাঙ্কের পরিচালকের এই অসুবিধা নাই। ঋণদানের প্রত্যেকটি প্রস্তাব প্রধান-কার্যালয়ে পাঠাইতে হয়, তাই কাহাকেও কোন ঋণ অগ্রাহ্য করিতে হইলে তিনি প্রধান-কার্যালয় নামে এক অদৃশ্য শক্তির উপর দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিজের মুখ রক্ষা করিতে পারেন। †

উপসংহারে, আমরা বলিতে পারি যে, উভয়ের তুলনামূলক বিচারে শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর পক্ষে যুক্তিগুলি দৃঢ় এবং সুবিধাই বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে শহরের ব্যাঙ্কারদের সম্পর্কে একটা ভীতি ও বিরূপতা আছে, তাহা ছাড়া সারা দেশে অর্থের বাজারে একচেটিয়া অর্থ-ট্রাস্ট (Money trust) গড়িয়া উঠিতে পারে এইরূপ ভয়ও লোকের মনে আছে। তাই প্রকাশ্যে শাখাব্যাঙ্কিং গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু অপ্রকাশ্যে, বিভিন্ন ইউনিট ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় করিয়া পরস্পর সংলগ্ন ডিরেক্টারী (interlocking directorates), হোল্ডিং কোম্পানী

শাখা-ব্যাঙ্কিং এরই প্রসার দেখা যাইতেছে

---

* "The individual bankers may have been too unwilling to refuse a loan to the incompetent or dishonest scion of a family with which his father or grand-father had been on intimate social terms." Sayers, *Modern Banking*, P. 26.

† "At the sametime, the remoteness of Head office and the local managers subjection thereto enables him, when he has to refuse a loan, to do so without the social awkwardness that might arise if he took sole responsibility for the decision. The local manager can always place his personal knowledge of a client at the disposal of Head office, and, if there is occassion to refuse a loan, he can always thurst the unpleasant onus on that remote abstraction 'Head office' without jeopardizing his social contacts with the client." Sayers, *Modern Banking* Pp 26-27.

গঠন করা, প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে মোটামুটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও একচেটিয়া কর্তৃত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সর্বোত্তম ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ (The essentials of a sound banking system)

আধুনিক জগতের উন্নত দেশসমূহে বিনিময়-মাধ্যমের বেশির ভাগ সরবরাহ করে ব্যাঙ্কসমূহ। দেশের শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মূলধনগঠন, এই সকল কিছু প্রসারের জন্য উপযুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দেশের অধিকাংশ লোক তাহাদের সমস্ত সঞ্চয় ব্যাঙ্কে আমানত রাখে, সুতরাং তাহারা আশা করিতে পারে যে, তাহাদের এই সঞ্চয় বিনষ্ট হইবে না এবং প্রয়োজনমত তাহারা এই আমানত নগদ টাকায় ফিরিয়া পাইবে। দেশের ব্যাঙ্কগুলি বেশি সংখ্যায় ফেল পড়িতে শুরু করিলে লোকেরা নগদ টাকা নিজেদের হাতে রাখিবে, উহা শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিয়োগ করিতে দ্বিধা করিবে। ভাল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় গুণ হইল নিরাপত্তা। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার এই নিরাপত্তার জন্য সাধারণত কয়েকটি পদ্ধতি প্রত্যেক দেশেই অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রথমত, দেশের সরকার বা আর্থিক কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কিং পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দেয়—নিম্নতম মূলধনের পরিমাণ, নিম্নতম জমা বা রিজার্ভের অনুপাত, শাখা ও উপশাখার সংখ্যা, রিজার্ভ তহবিল গঠন প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, সাধারণত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অনেক ধরনের ক্ষমতা দেওয়া হয় যাহার দ্বারা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির হিসাব পরিদর্শন করিতে পারে, সময়মত বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ ও উপদেশ দিতে পারে। তৃতীয়ত, অনেক দেশে, যেমন আমেরিকায়, ব্যাঙ্কের আমানত নষ্ট হইবার ঝুঁকি এড়াইবার জন্য বীমার ব্যবস্থা আছে। এই সকল ব্যবস্থা থাকিলে তবেই দেশে ভাল ব্যাঙ্কিং-কাঠামো গড়িয়া উঠিতে পারে।

কিরূপে ব্যাঙ্কগুলির নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

এই বিষয়ে মনে রাখা দরকার যে, কেবলমাত্র কতকগুলি ভাল আইন থাকিলেই যে ভাল ব্যাঙ্কিং গড়িয়া উঠিবে এরূপ কোন কথা নাই। ভাল ব্যাঙ্কার থাকাই ভাল ব্যাঙ্কিংয়ের অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত। ব্যাঙ্কারদের মধ্যে সততা, কর্মদক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা, বিচার-বিবেচনা এবং ব্যবসায়িক নৈপুণ্য এই সকল গুণের সমাবেশ আবশ্যক।

ভাল ব্যাঙ্কার

ভাল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার জন্য দরকার সারা দেশে সকল অঞ্চলে সমান ভাবে ব্যাঙ্ক গড়িয়া ওঠা। যে-কোন শিল্পে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে লোকেরা নিযুক্ত থাকুক না কেন, অথবা যে কোন অঞ্চলেই তাহারা বসবাস করুক না কেন, আমানত হিসাবে টাকা জমা রাখা এবং প্রয়োজনমত ঋণ পাওয়ার সুবিধা সকলের সমানভাবে থাকা দরকার।

দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া উঠিতে হইলে একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার, ইহা হইল তাহাদের বিনিয়োগের তারল্য। আমানতকারীরা চাহিবামাত্র যদি নগদ টাকা না পায় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের উপর আস্থা টুটিয়া যায়, সুতরাং ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সম্পত্তিকে সর্বাপেক্ষা তরল অবস্থায় রাখিতে পারিবে এইরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

তারল্য

আমরা জানি, দেশের সকল ব্যাঙ্ক মিলিয়া অনেক পরিমাণে ঋণসৃষ্টি করিতে পারে। নিজেদের খাতায় আমানত হিসাবে লিখিয়া রাখিয়া ঋণগ্রহীতাদের টাকা ধার দেয়। দেশের লোকেরা নিজেদের ইচ্ছায় যে-পরিমাণ সঞ্চয় করে ব্যাঙ্কগুলি সেই স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ দ্বারা তাহাদের ঋণের পরিমাণ প্রভাবিত হইতে দেয় না। নিজেদের ঋণ দিবার ক্ষমতা তাহারা নিজেরাই সৃষ্টি করে। ব্যাঙ্কগুলির হাতে ঋণসৃষ্টির এই ক্ষমতা প্রকৃত পক্ষে দেশের ঋণ-ভাণ্ডারের যোগান বাড়াইয়া চলে এবং ইহার স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে। ব্যাঙ্কঋণের প্রসারের ফলে বহুপ্রকার অর্থনৈতিক কাজকর্মের সুবিধা হয়, ব্যবসায়ীরা তাহাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য চলতি মূলধন এই ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতেই পাইয়া থাকে। সুতরাং ভাল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হইল উহার স্থিতিস্থাপকতা।

স্থিতিস্থাপকতা

সর্বোপরি, দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার স্থায়িত্বের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। যদি অতিরিক্ত ঋণসৃষ্টি হইতে থাকে, তবে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক সমৃদ্ধি দেখা দেয়, অপরপক্ষে ঋণসৃষ্টির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হইলে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যাঙ্কঋণের অতিরিক্ত প্রসার বা সঙ্কোচন কোনটিই বাঞ্ছনীয় নয়, ইহার স্থায়িত্বই হইল মূল কথা। দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থায় এই স্থায়িত্ব আছে কি না সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতিগুলির সাহায্যে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে পারিলে দেশে উপযুক্ত ব্যাঙ্কিং সংগঠন গড়িয়া উঠিতে পারে।

স্থায়িত্ব

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ (Nationalisation of commercial banks)

ব্যাঙ্কিং-এর জাতীয়করণ বলিলে বোঝা যায় সাধারণভাবে দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইবে। কোন ব্যক্তির হাতে ইহার মালিকানা ও পরিচালনা থাকিবে না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাঙ্কগুলির উপর সরকারী কর্তৃত্ব বাড়িয়া যাইতেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রমশ দেখা গেল পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সরকারী মালিকানায় অথবা নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অবাধ বাণিজ্যের ধারণা আর নাই। রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও জাতীয় পরিকল্পনা এই দুই ভাবধারার প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ব্যাঙ্কের লক্ষ্য হইয়াছে পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা, আর অনুন্নত দেশগুলিতে দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণ জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড এবং তাহা ছাড়া ব্যাঙ্ক অফ্ ফ্রান্স, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ চেকোস্লোভাকিয়া, কমনওয়েলথ ব্যাঙ্ক অফ্ অষ্ট্রেলিয়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতির জাতীয়করণ হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ সম্পর্কে মোটামুটি সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত হইয়াছেন। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ বিষয়ে এই পর্যন্ত কোন ঐক্যমত দেখা যায় নাই।

আধুনিককালে জাতীয়করণের দাবি উঠিয়াছে

অধ্যাপক সেয়ার্স (Sayers) জাতীয়করণের এই সমস্যাকে বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়াছেন। প্রথমত, বলা হয় যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ হইলে উহারা আরও দক্ষতার সহিত কাজকর্ম করিতে পারিবে, বেসরকারী মালিকানায় থাকিলে এতটা দক্ষতা আশা করা যায় না। বেসরকারী নিয়ন্ত্রণে ব্যাঙ্কগুলি দেশের সঞ্চয় সংগ্রহ করা এবং বিভিন্ন দিকে উহাকে বিনিয়োগ করা প্রভৃতি কাজ সরকারী কর্তৃপক্ষের ন্যায় ততটা দক্ষতার সহিত করিতে পারে না। আরও বলা হয় যে, জাতীয়করণের পরে ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন-ব্যয় কমিয়া যাইবে এবং বহুপ্রকার অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্য হইল দেশের অর্থনৈতিক গতিবিধিকে উপযুক্তভাবে

জাতীয়করণের দাবির পিছনে যুক্তিসমূহ

নিয়ন্ত্রণের ভার রাষ্ট্রের হাতে লইয়া আসা, কিন্তু দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ না হইলে এই নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি সফল করিয়া তুলিতে হইলে দেশের সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হওয়া দরকার। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি হইল যে উহা টাকা তৈয়ারী করে। কিন্তু অর্থসৃষ্টির ক্ষমতা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিরও কম নয়। সুতরাং দেশের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য, উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান, দামস্তর ও জীবনযাত্রার মান বেসরকারী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের খেয়াল খুশির উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না। চতুর্থত, দেশে যদি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে পরিবর্তনের এই মধ্যবর্তী স্তরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়-করণ করা অবশ্যই দরকার। দেশে সমাজতান্ত্রিক পথে শিল্প ও কৃষির প্রসার তখনই দ্রুত হইতে পারে যদি দেশের অর্থসৃষ্টি এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই মূল কেন্দ্রগুলি, অর্থাৎ দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে রাষ্ট্রের হাতে আসে। বেসরকারী টাকার ব্যবসায়ীরা বেসরকারী শিল্পকেই সাহায্য করিবে। সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে তাহারা অর্থসাহায্য করিলেও ইহা সমাজতান্ত্রিক নীতিসম্মত নয়, কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হইতে উৎপাদনের এক অংশ সুদ হিসাবে বেসরকারী ক্ষেত্রে চলিয়া যাইবে। সর্বশেষে বলা চলে যে, বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীরা ফাট্‌কাবাজি ও নিজেদের ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় বহু ব্যাঙ্ক নষ্ট করিয়াছে, দরিদ্র জনসাধারণের সারা জীবনের সঞ্চয় যতটা গুরুত্ব সহকারে রক্ষা করা উচিত ছিল, তাহা করে নাই। সুতরাং সকল আমানত-কারীর স্বার্থে এবং সঞ্চয়ের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালিত হওয়া উচিত।

এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে অনেকে বলেন যে, ব্যাঙ্কগুলি সরকারী হাতে চলিয়া গেলে দীর্ঘসূত্রতা, আমলাতান্ত্রিক পরিচালনা, জরুরী কাজগুলি দ্রুত সম্পাদনে অক্ষমতা প্রভৃতি দোষ দেখা দিবে; ফলে দক্ষতার মান নামিয়া যাইবে। দ্রুততা ও দক্ষতা ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের দুইটি পরম-প্রয়োজনীয় গুণ, কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় তাহা হইবার নয়। জাতীয়করণের পক্ষে যে-সব উপকারের কথা বলা হইয়াছে তাহার অনেকটাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পাওয়া সম্ভবপর। পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বন্ধ-

এই সকল যুক্তির বিরোধী বক্তব্য

হইলে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের মান হ্রাস পাইবে, সুতরাং অবিলম্বে জাতীয়করণ দরকার নাই—ইহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

অর্থের বাজার (Money Market)

যে-বাজারে ঋণ হিসাবে অর্থের লেনদেন হয় তাহাকে অর্থের বাজার বলা হয়। এই বাজারে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতাগণ পরস্পরের সহিত ঋণের লেনদেন করেন। সাধারণত, ব্যাঙ্কসমূহ ঋণের 'বিক্রেতা', সুদ হইল ঋণের 'দাম', এবং ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিগণ বা সংগঠনসমূহ হইল ঋণের 'ক্রেতা'। শিল্পে বাণিজ্যে উন্নত দেশসমূহে অর্থের বাজার খুবই সংগঠিত ; অনুন্নত দেশে অর্থের বাজার অনুন্নত এবং অসংগঠিত।

অর্থের ক্রয়-বিক্রয় ও অর্থের দাম

অর্থের বাজারকে সময়ানুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় : অত্যল্পকালীন বাজার, স্বল্পকালীন বাজার ও দীর্ঘকালীন বাজার। বিভিন্ন পরিমাণ সময়ের জন্য সমাজে ঋণের চাহিদা ও যোগান হইতে পারে। যদি একদিন, কয়েকদিন বা মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য ঋণ দেওয়া হয় তবে তাহাকে তলব-ঋণের (Call-loan Market) বাজার বলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণভাবে এই তলব-ঋণের বাজারে ঋণ দেয় ; এইরূপ ঋণকে তাহারা খুবই তরল-বিনিয়োগ (Liquid Investment) বলিয়া মনে করে, কারণ প্রয়োজন হইলে খুব কম সময়ের মধ্যে এই ঋণ আদায় করিয়া নগদ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর। অনেক সময় যৌথ-মূলধনী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহও মুনাফা বণ্টনের পূর্বে সেই মুনাফাকে কিছু সময়ের জন্য এইরূপ তলব-ঋণের বাজারে খাটাইয়া লয়। এই বাজারে ঋণগ্রহীতা হইল (ইংলণ্ডে প্রধানত) বিলের দালালগণ (Bill-brokers), এবং (আমেরিকায় প্রধানত) শেয়ারের দালালগণ (Share brokers)। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বিলের দালালগণ ঋণ গ্রহণ করিয়া বিল ক্রয় করে এবং উহা ফলপ্রসূ (mature) হওয়া পর্যন্ত ধরিয়া রাখার চেষ্টা করে। যে-সুদে এই ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহার নাম তলব-হার (Call rate)। সাধারণত, ব্যাঙ্কগুলি এই প্রকার তলব-ঋণ পুনরনুমোদন (Renew) করে বটে, কিন্তু নগদ অর্থের প্রয়োজন অধিক হইলেই তাহারা ইহা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চায়। তখন ঋণগ্রহীতাগণ যে-কোন উপায়ে অন্য যে-কোন স্থান হইতে এই অর্থ আনিয়া দেয়। প্রধানত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতেই তাহারা ঋণ গ্রহণ করিয়া আনে। অর্থাৎ বিলের দালালগণকে বা ঋণ-

বিভিন্ন প্রকার ঋণের বাজার : অত্যল্পকালীন

গ্রহীতাগণকে 'নিঙড়াইয়া" ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য করা হয় বা অর্থ আদায় করিয়া লওয়া হয়। তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহে বাধ্য হয়; বলা হয় যে, "বাজার ব্যাঙ্কের নিকট হাজির হইয়াছে" ("to go into the bank")। আমেরিকায় প্রধানত, শেয়ার বাজারের দালালরাই তলব-ঋণের বাজারে ঋণ করে; কারণ আমেরিকায় ফাটকা বাজারে শেয়ার ক্রয়ের সময়ে উহার মূল্যের 25% অংশ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হয়। অবশিষ্ট 75% অংশ দিবার সময়ে ফাটকা বাজারের শেয়ারের দালালগণ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিতে আসে এবং ওই শেয়ারগুলিকেও অন্যান্য সম্পত্তির সহিত সহ-বন্ধকী (Colateral security) হিসাবে জমা রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। ব্যাঙ্ক এইরূপ ক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ের জন্য যে-সুদে তাহাদের ঋণ দেয় তাহাকে ঋণের তলব-হার (Call-rate) বলে। ফাটকা বাজারের অবস্থা অনুযায়ী এই তলব হারও উঠানামা করে। সাধারণত, যুক্তরাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাজারের তলব-হার নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ।

স্বল্পকালীন ঋণের বাজার

কিছু বেশিদিনের, যেমন সাধারণত, ৩ মাসের জন্য স্বল্পকালীন ঋণ দেওয়া হয়। বিশেষ করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ এইরূপ স্বল্পকালীন ঋণের বাজারে (Short period Loan Market) ঋণ দেয় এবং বিল ডিস্‌কাউন্ট করিয়া বা ব্যাঙ্ককে তাহার আমানতের পরিমাণের অধিক উঠাইবার সুযোগ দিয়া এই ঋণ প্রদান করা হয়। ব্যবসায়ীরা ছাড়াও কোন দেশের সরকার ট্রেজারী বিল ভাঙ্গাইয়া এই বাজার হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া থাকে।

দীর্ঘকালীন ঋণের বাজার

ইহা ব্যতীত দেশে দীর্ঘকালীন ঋণের বাজারও থাকে। এই দীর্ঘকালীন ঋণের বাজারে ব্যক্তিদের মূলধন-সঞ্চয়, সেই সঞ্চয়ের সংগ্রহীকরণ (accumulation) ও দেশে মূলধন-গঠন হইয়া থাকে। ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও শেয়ার বিক্রয় প্রতিষ্ঠান-সমূহ সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়গুলিকে একত্রে সংগ্রহ করিয়া শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগের উপযোগী মূলধনে রূপান্তরিত করে। বিভিন্ন কার্যে লগ্নীর জন্য সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি, জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ (Public bodies) বা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বাজারে ঋণের চাহিদা করে। শেয়ার-বাজারে শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ ঘটে এবং মূলধনের হস্তান্তর হইয়া থাকে।

বিভিন্ন বিনিয়োগ-ক্ষেত্র অনুযায়ী ঋনের বাজারে বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন

ঋণের বাজারে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণদানের জন্ম পৃথক ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকে এবং সাধারণত, বিশেষ ধরনের বাজারে ঋণদানের জন্ম বিশেষ প্রকার প্রতিষ্ঠানই নিয়োজিত থাকে। যেমন, বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক আছে: বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, শিল্প ব্যাঙ্ক বা বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রভৃতি। এই সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের বাজারে ঋণদান করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

সর্বোপরি, অর্থের বাজারের মধ্যমণি এবং পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের সকল প্রকার অর্থ সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান-গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে; ঋণের বাজারে অর্থের চাহিদা ও যোগান নির্ধারণ করে। ঋণের দাম অর্থাৎ সুদের হাব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও লক্ষ্য অনুযায়ী নির্ধারিত করার প্রয়াস পায়। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী আর্থিক নীতি পরিচালনা করা এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। সমাজে অর্থের শুষ্কতা দেখা দিলে অর্থ ঢালিয়া দেওয়া এবং অর্থাধিক্য দেখা দিলে অর্থ ছাঁকিয়া তুলিয়া আনা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই অন্ততম প্রধান দায়িত্ব।

ক্লিয়ারিং হাউস (Clearing House)

ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে পারস্পরিক দেনাপাওনা মিটাইবার প্রতিষ্ঠান

অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে কোন বিশেষ অঞ্চলের ব্যাঙ্কসমূহ খুবই ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সহিত যুক্ত এবং একে অন্তের উপর নির্ভরশীল। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের গ্রাহক, সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্যে এক ব্যাঙ্কের আমানতকারীগণ অন্ত ব্যাঙ্কের আমানতকারীগণের নিকট হইতে চেক পান এবং তাহাদের চেক দিয়া থাকেন। ফলে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কই অন্ত ব্যাঙ্কের নিকট দেনাদার ও পাওনাদার হইয়া পড়ে। কোন ব্যাঙ্ক অন্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওনা নগদ অর্থ লইয়া আসিল আবার সেই ব্যাঙ্কেই নগদ অর্থ দিয়া দিল, এইরূপ পারস্পরিক নগদ লেনদেন অহেতুক পরিশ্রমসাধ্য ও অপব্যয়মূলক। সুতরাং বিশেষ কোন স্থানে একত্র হইয়া ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ পারস্পরিক দেনাপাওনার হিসাব করিয়া খাতায়-পত্রে নিজেদের হিসাব মিলাইয়া লন; এই সংগঠনই ক্লিয়ারিং হাউস বলিয়া পরিচিত। সাধারণত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্থানীয় অফিসে এই কার্য

পরিচালিত হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত নিজের জমা হইতে প্রতিটি ব্যাঙ্কের হিসাব বাড়াইয়া বা কমাইয়া ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের মধ্যে লেনদেন করে।

অনুশীলনী

1. Distinguish between credit and cash and explain how credit affects an economy of cash.

2. What are credit instruments ? Discuss their utility.

3. Discuss the various functions performed by a modern Bank. Indicate the benefits that banks render to society.

4. Draw an imaginary Balance-sheet of a commercial bank and explain the items mentioned therein.

5. "Banks are not merely purveyors of money, but also in one important sense, manufacturers of money " Discuss.

6. Describe how the commercial banking system can create credit.

7. Discuss the process of multiple credit creation by the Banking System.

8. Explain how banks create money, and discuss the limitations, if any, on the bank's power of creating money

9. "The bank does not create money out of thin air ; it transmutes other forms of wealth into money." Discuss.

10. How do the commercial banks distribute their assets to ensure liquidity ?

11. "A constant tug of war between the competing aims of liquidity and profitability summarises the functions of a Modern Bank." Explain.

12. Commercial banks should employ their resources in self-liquidating trade bills and not in the long term financing of the industry." Discuss.

13. Analyse briefly the assets of a modern Bank and explain the principles which govern its structure.

14. "The art of banking lies in being able to distinguish between a bill of exchange and a mortage"—Explain.

15. Examine carefully the "real bills doctrine" and the "shiftability" theory of bank liquidity. Discuss in this connection the 'anticipated income theory of liquidity' that has been recently developed.

16. Discuss the advantages and disadvantages of Unit-Banking and Branch-Banking structures.

17. What is Mixed Banking ? What are its merits and dangers ?

18. Discuss whether you would like to nationalise the Commercial banks of a country.

19. Discuss the essential requirements of a good banking system.

20. What is Money Market ? Discuss the constituents of a typical money market.

৫

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

Central Bank

প্রত্যেকটি দেশে টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে। টাকার বাজারে টাকার যোগান যাহাতে কম না পড়ে অথবা বেশি না হয়, টাকার চাহিদা যাহাতে মিটিতে পারে, টাকার দাম বা সুদের হার যাহাতে খুব বেশি বা খুব কম না হয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে লগ্নী করার জন্য টাকার দামে যাহাতে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকে, এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্য একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কর্তা দরকার। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এইরূপ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান। শুধু টাকার দাম নয়, টাকার মূল্যে কখন কিরূপ উঠানামা হইতেছে, সেই বিষয়েও লক্ষ্য রাখা দরকার। যে-সকল প্রতিষ্ঠান টাকার বাজারে লেনদেন করে (যেমন ব্যাঙ্ক) তাহাদের কাজকর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখাও কম দরকার নহে। সর্বোপরি, যত দিন যাইতেছে, ততই সকল দেশের সরকার অর্থ নৈতিক কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছে। কেহ পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে, কেহ বা দ্রুত শিল্পোন্নয়নকে অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতেছে—এই সকল লক্ষ্য সাধনের চেষ্টায় তাহারা টাকার যোগান, চাহিদা, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও সুদের হার প্রভৃতিকে নিজেদের প্রভাবাধীন করিবার চেষ্টা করিতেছে। রাষ্ট্রকে তাহার অর্থনৈতিক লক্ষ্য (economic objective) সাধনে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে দেশে টাকার যোগান, চাহিদা, দাম ও মূল্য—এই সকল বিষয়ে নীতি অর্থাৎ আর্থিক নীতি পরিচালনা করার দায়িত্ব লইতে পারে, এইরূপ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সকল দেশেই অবশ্য প্রয়োজনীয়।

টাকার যোগান, চাহিদা, দাম ও মূল্যের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান

এমন সময় ছিল যখন ধনবিজ্ঞানীরা টাকার বাজারকে এইরূপ নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। মানুষমাত্রেই ভুল করে, সুতরাং দেশের সামগ্রিক লেনদেন (বা অর্থ নৈতিক কল্যাণ) এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উপর ছাড়িয়া

দিতে তাঁহারা রাজি ছিলেন না। যোগান ও চাহিদার স্বয়ংক্রিয় শক্তি টাকার মূল্যকে যে-স্তরে রাখিবে, উহাই স্বাভাবিক স্তর, সেই স্তর হইতে বিচ্যুত হইলে আপনাআপনি স্বয়ং-শোধনের ধারা শুরু হইবে, বাহিরের কোন হস্তক্ষেপ দরকার নাই, তাঁহারা এইরূপ মনে করিতেন। আজকাল অবশ্য এই সকল যুক্তি অচল হইয়া গিয়াছে। বারবার পৃথিবীতে বহুবিধ অর্থ নৈতিক সংকট দেখা দিয়াছে, বাজারের আত্ম-নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি সেই সংকট রোধ করিতে পারে নাই। টাকার মূল্যে কখনো তীব্র উঠানামা ঘটিয়াছে : কখনও-বা ব্যবসায়ের প্রয়োজন থাকিলেও টাকার পরিমাণ বাড়িতে পারে নাই ; আবার কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দেশের স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক কাজকর্ম বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। সমাজে টাকার নিরপেক্ষ (neutral) ভূমিকা সম্পর্কে তাঁহাদের যে-বিশ্বাস ছিল, বর্তমান কালে সকল সমাজেই টাকার সক্রিয় শক্তি সেই বিশ্বাস টলাইয়া দিয়াছে। তাই আজকাল সবাই টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষে।

অনেকে বলিতেন ইহার কোন দরকার নাই

তাহা ছাড়া, বর্তমান কালের সমাজে বহু প্রকার পরিবর্তন আসিয়াছে। আজকালকার সমাজে টাকা বলিলে অনেক ধরনের সম্পত্তি বোঝা যায়, ইহাদের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য খুব কম। নগদ টাকা, চেক, বিল, বণ্ড, শেয়ার, সোনা -ইহারা সবাই টাকা, সকলেই কোন না কোন ক্ষেত্রে বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের সঞ্চয়রূপে কাজ করে। তাহা ছাড়া, এই সকল লইয়া ব্যবসায় করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈয়ার হইয়াছে। এত বিভিন্নরূপের টাকা এবং এত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান লইয়া যে-সমাজ গঠিত, তাহা কতটা আত্ম-নিয়ন্ত্রণশীল হইতে পারে, সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই কারণে দেশে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এবং দক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিশ্চয় দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু বর্তমান কালে ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয়

টাকার বাজারে জটিলতা থাকিলেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দরকার—এই যুক্তির দরুণ একদল ব্যক্তি বলেন যে, অপূর্ণোন্নত দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কোন দরকার নাই। এই সকল দেশে এখনও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ততটা প্রসার হয় নাই, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম, মূলধন-গঠন ও মূলধন-নিয়োগ কম, তাই টাকার বাজারের জটিলতা ততটা নাই। উপরন্তু, এই সকল দেশে ব্যাঙ্ক বা বিনিয়োগ-

কারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম, উপযুক্ত সংখ্যক চেক, বিল, বণ্ড, শেয়ার না থাকায় ইহাদের কাজকর্মও সীমাবদ্ধ। দেশে স্বল্পকালীন টাকার বাজার এখনও গড়িয়া উঠে নাই। এইরূপ বাজারেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি স্বল্পকালীন বিল ও সিকিউরিটিগুলি বেচাকেনা করিয়া টাকা খাটায়। কিন্তু যদি দেশে এইরূপ টাকার বাজার না থাকে, তবে সেই দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দরকার নাই মনে করা চলে। তাহা ছাড়া, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার কম বলিয়া লোকের স্বল্পকালীন বিনিয়োগের ততটা দরকার নাই, বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্রগুলির মধ্যে সুদের হারে সমতা রাখার প্রশ্নও ততটা উঠে না। এই সকল ঋণপত্র বা তরল সম্পত্তির সুষ্ঠু আদানপ্রদান নির্ভর করে এই সকল বিভিন্ন ঋণকালের মধ্যে সুদের হারে সামঞ্জস্য থাকার উপর। এই উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু যদি উপযুক্ত পরিমাণে ঋণপত্র না থাকে, বা লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান না থাকে তবে অযথা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া লাভ কি? সর্বোপরি, অনুন্নত দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা খুবই প্রবল, তাই উচ্চাকাংক্ষী অপরিপক্ক রাজনৈতিক নেতাদের হাতে দেশের টাকার বাজারের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা চলিয়া যাইতে পারে। এইরূপ দেশে, তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কোন দরকার নাই, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

অনুন্নত দেশে ইহার দরকার আছে কি?

এই সকল যুক্তি আমরা মানিয়া লইতে পারি না। ইঁহারা মনে করেন যে, ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর কোন কাজ নাই। কিন্তু দেশে টাকার প্রচলন ও গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা, সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করা এই সকল কাজ কে করিবে? অধ্যাপক সেয়ার্সের (Sayers) মতে অনুন্নত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন সুষ্ঠুভাবে চালানো বা টাকার বৈদেশিক মূল্যকে স্থির রাখা সবই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গুরুদায়িত্ব, এই সকল বিষয়ে সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে উহার ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। তাহা ছাড়া, এই সকল দেশে উপযুক্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। আর রাজনৈতিক প্রভাব উন্নত অনুন্নত সকল দেশেই আসিতে পারে, এইরূপ অবাঞ্ছনীয় কিছু না ঘটে, সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার চেষ্টা সর্বদা করা প্রয়োজন। বহু অনুন্নত দেশের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, কেন্দ্রীয়

ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা বহুভাবে এই সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সাহায্য করিয়াছে।

দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্ক হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেকাংশে পৃথক। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি পরিচালিত হয় উহাদের মালিকদের মুনাফা বাড়াইবার জন্য, ইহাই উহাদের লক্ষ্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয় জাতীয় ও সামগ্রিক দৃষ্টিভংগী লইয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্য সাধনের জন্য, মুনাফার জন্য নয়। তাই নোট প্রচলনের অধিকার অন্যান্য ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয় না, কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ইহার একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য ব্যাঙ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, উহাদের সর্বশেষ স্তরের টাকা পাইবার মহাজন (lender of the last resort) হিসাবে সে কাজ করে। সরকারের ব্যাঙ্কার রূপে অন্যান্য ব্যাঙ্ক কাজ করে না, ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই দায়িত্ব। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নীতি সাবধানতা, মুনাফা করা এবং বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা এই সকল কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-এর নীতি নয়।

অন্যান্য ব্যাঙ্কের সহিত ইহার অনেক পাথক্য

প্রথম মহাযুদ্ধের পর এইরূপ ধারণা ছিল যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী হস্তক্ষেপ হইতে স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে। ইহার কারণ হইল প্রধানত রাজনৈতিক প্রভাব হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে মুক্ত রাখা। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় পরিচালনা আমলাতান্ত্রিক প্রভাবের বৃদ্ধি ঘটায়। বেতনভুক্ সরকারী কর্মচারীদের চাকুরির স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা অধিক থাকায় তাহাদের উৎসাহ ও উদ্যোগ ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। ইহাও বলা হইত যে, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় একটি বিশেষ ধরনের কার্য, ইহার জন্য বিশেষ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন; আইন সভার সদস্য বা পার্টি-নেতাদের এইরূপ জ্ঞান না থাকাই সম্ভব। এই সকল কারণের দরুণ শেয়ার-ক্রেতাদের বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন করাই তখন প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই সকল যুক্তি থাকা সত্ত্বেও দেখা গিয়াছে যে, জনস্বার্থ রক্ষাকারী কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্তাদের ঝুঁকি গ্রহণ বা অধিক উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজন নাই, ইহা মুনাফা অনুসন্ধানকারী প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নয়। আর যদি কোন মুনাফা হয়, তবে তাহা জাতীয় স্বার্থে জাতীয় অর্থভাণ্ডারে যাওয়াই উচিত। রাষ্ট্রের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কিরূপ সম্পর্ক হইবে তাহা মূলত নির্ভর করে

জাতীয় করণ ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ

কেন ও কিরূপে

দেশের রাজনৈতিক, আদর্শগত ও অর্থনৈতিক বহুবিধ কারণের কার্যফলের উপর। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ, যুদ্ধকালীন উপকরণ সংগ্রহ ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সকল কিছু মিলিয়া জাতীয়করণের দিকে ঝোঁক বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। দেশের অর্থনীতি ঠিক কিরূপ ভাবে চলে, সেই গতিধারা বর্তমানকালে অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রাশিবিজ্ঞানের উন্নতি, গণচেতনা বৃদ্ধি, ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি—সকল কিছু মিলিয়া সমাজ-দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিগুলির চিত্র আমরা অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি। তাই নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছে। রাষ্ট্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে; শেয়ার ক্রয় করিয়া, পরিচালকমণ্ডলীতে মনোনীত সদস্য নিয়োগ করিয়া অথবা সম্পূর্ণ মালিকানা স্থাপন করিয়া।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী (Functions of a Central Bank)

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন রকম কাজ করিয়া থাকেন।

প্রথমত, দেশে অর্থের প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণের একচেটিয়া অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ন্যস্ত থাকে। পূর্বে রাষ্ট্র নিজেই অর্থ প্রচলন করিতেন। পরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ এই কার্যের ভার গ্রহণ করে, কিন্তু বর্তমানে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতেই এই ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কাগজী নোট প্রচলনের অধিকার যাহাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয় সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ইহা ন্যস্ত থাকা উচিত। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকার নোট থাকে; সুতরাং দেশে অর্থনৈতিক লেনদেনের প্রভূত অসুবিধা হয়। এক প্রকার নোট প্রচলিত হইলে নোটের অতিরিক্ত প্রচলনের (Excess issue) সম্ভাবনা কম। দেশে ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়াতেও নোট প্রচলনের ক্ষমতা বাড়িয়া গিয়াছে কারণ নোট প্রচলনের ক্ষমতা থাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের ঋণপ্রদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। রাষ্ট্রের নির্দেশ ও পরিচালনায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রচলিত কাগজী নোটের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস স্বভাবতই

আর্থিক ব্যবস্থার সংগঠন গড়িয়া তোলা ও পরিচালনা

বেশি থাকে। তাহা ছাড়া, নোট-প্রচলন হইতে যাহাতে মুনাফার উদ্ভব না হয় সেইজন্য নোট-প্রচলনের ক্ষমতা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের হাতে না দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতেই রাখা উচিত।

সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সরকারের সকল আয় জমা হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতেই সকল ব্যয় করা হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেক ক্ষেত্রে এই সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাবও রক্ষা করে। সরকারী ঋণ পরিচালনার ভারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর। সরকারের জন্য প্রয়োজন হইলে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ঋণ গ্রহণ করে, নিয়মিত সুদ দেয় এবং পরিশোধের ব্যবস্থা করে।

ব্যাঙ্কসমূহের ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য

তৃতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের নগদ আমানতের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে। জমার পরিমাণ আইন বা প্রথার দ্বারা নির্ধারিত। এই জমা রাখিবার ফলে ব্যাঙ্কগুলি প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ পায় অথবা প্রথম শ্রেণীর বিনিময়-বিল ভাঙাইয়া দরকার মত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইল সর্বশেষ স্তরের ঋণদাতা। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ প্রয়োজন হইলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ বিনিময় বিলের বদলে অথবা স্বল্পকালীন ঋণপত্রের (Short-term Securities) বদলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ পাইতে পারে এবং সেই ঋণের দ্বারা নিজেদের দেনা মিটাইতে সক্ষম হয় বা উচ্চ সুদে কোথাও লগ্নী করিতে পারে। কোনরূপ ব্যাঙ্কিং-সংকটের সময় তাহাদের সম্পত্তি-গুলির বদলে হঠাৎ নগদ-অর্থ পাওয়ার এই সুবিধার ফলে তাহাদের পক্ষে বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা সুবিধাজনক হয়। দেশের সমগ্র ঋণ-কাঠামোতে এইরূপে তারল্য ও প্রসারতা (Liquidity and elasticity) বজায় থাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজের ফলেই ঘটে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক না থাকিলে, অথবা ঋণ-পত্র বা বিনিময়-বিল প্রভৃতিকে প্রয়োজন হইলেই নগদ অর্থে রূপান্তরণের সুবিধা না থাকিলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ আমানতের আরও বেশি অংশ নিজেদের নিকট নগদ অর্থরূপে জমা রাখিতে বাধ্য হইত; তাহাদের অর্থলগ্নীর পরিমাণ আরও কম হইত, দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে নগদ অর্থ পাইবার সম্ভাবনা কম থাকিত; ঋণ-ব্যবস্থা সংকুচিত থাকিত।

সর্বশেষ স্তরের ঋণ দান

চতুর্থত, প্রচলিত কাগজী নোট বা দেশের ঋণব্যবস্থার নিরাপত্তা রক্ষার জন্ম স্বর্ণ বা বৈদেশিক অর্থ জমা রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব। দেশে স্বর্ণমান চালু থাকিলে দেশের মধ্যে ও বাহিরে স্বর্ণের আসা-যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার বা অর্থের বহির্মূল্য নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব। বৈদেশিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্তব্য। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহে দেশীয় স্বার্থ রক্ষা করা এবং বৈদেশিক বিনিময়-হারকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে লেনদেন ব্যালান্সে মৌলিক ভারসাম্যবিহীনতা (Fundamental Disequilibrium) আসিতে না পারে, তাহা দেখাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব।

অর্থের বহির্মূল্য নিয়ন্ত্রণ

পঞ্চমত, দেশে টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রণের জন্ম ব্যাঙ্কঋণকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান কাজ। ব্যাঙ্ক-হার পরিবর্তনের দ্বারা বাজারের সুদের হার নিয়ন্ত্রণ, খোলাবাজারের কার্যকলাপের দ্বারা দেশে টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে নগদ জমার পরিমাণে পরিবর্তন করিয়া এবং অনুরোধ বা নির্দেশ প্রভৃতির দ্বারা টাকার বাজারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই দায়িত্ব।

ঋণনিয়ন্ত্রণ

দেশের ঋণকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে দামস্তর স্থির রাখা সম্ভব হয় না; ব্যবসায়সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়সংকট বা বাণিজ্যচক্র দূর করা সম্ভব হয় না। আধুনিক কালে পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা স্থায়ীভাবে বজায় রাখিবার জন্যও ঋণনিয়ন্ত্রণের কাজ বিশেষ সাহায্যকারী। যে-সকল অনুন্নত দেশ অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে দ্রুত অর্থ নৈতিক ক্রমোন্নতির (Economic growth) চেষ্টা করিতেছে, উহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ হইল সেই উদ্দেশ্যে আর্থিক নীতিসমূহ পরিচালনা করা।

দামস্তর স্থির রাখা
বাণিজ্য-চক্র দূর করা,
পূর্ণ-কর্মসংস্থান, অর্থ-
নৈতিক ক্রমোন্নতি

ষষ্ঠত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যান্য বহু প্রকার কাজকর্ম আছে। ব্যাঙ্কসমূহের পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্ম ক্লিয়ারিং হাউস পরিচালনা করা, দেশের আর্থিক এবং অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রতি নজর রাখা, এই সকল কার্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককেই করিতে হয়।

ক্লিয়ারিং হাউস
পরিচালনা প্রভৃতি

ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (Methods of credit Control)

আমরা জানি যে, দেশের টাকার মূল্য মোটামুটি স্থির রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গুরু দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করিতে হইলে দেশে টাকার যোগান তাহাকে নিশ্চয় নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। কিন্তু টাকার যোগান বলিলে কেবল নগদ টাকা বুঝায় না, ব্যাঙ্কের যে আমানত হইতে চলতি লেনদেন চলে, উহা নিশ্চয় টাকার সমানই কাজ করে। বস্তুত, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে দেশে টাকার মোট যোগানের মধ্যে বেশির ভাগ অংশই এইরূপ ব্যাঙ্কের আমানত। তাই দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রয়োজন এবং ব্যাঙ্কগুলির ঋণ-সৃষ্টি বা ঋণদান-ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তারের উপযোগী পদ্ধতি ও ক্ষমতা উভয়ই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জানা থাকা দরকার।

ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক কয়েকটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল ব্যাঙ্ক-রেটে পরিবর্তন। যে-হারে সরকারীভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিনিময়-বিলসমূহের বদলে টাকা ঋণ দেয় তাহাকে ব্যাঙ্ক-হার বা ব্যাঙ্ক-রেট (Bank Rate) বলে। এই ব্যাঙ্ক-হার হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদের হার—এই হারেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়। সমাজে দ্রব্যসামগ্রী বৃদ্ধির তুলনায় আর্থিক আয়ের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে বা সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-হার বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্ক-হারে বৃদ্ধির ফলে বাজারে সুদের হারও বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে ঋণগ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি হয়, ঋণগ্রহণ ও বিনিয়োগ কম পরিমাণে হইতে থাকে, সমাজে আর্থিক আয়ের স্রোতে ভাঁটা পড়ে। ব্যাঙ্ক-হার কমাইলে ঋণগ্রহণের ব্যয় কমিয়া যায়, ঋণগ্রহণ ও বিনিয়োগ অধিক পরিমাণে হইতে থাকে, সমাজে আর্থিক আয়ের স্রোতে জোয়ার আসে।

ব্যাঙ্ক-হারে পরিবর্তন

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারে সরকারী ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয় করিয়া দেশে টাকার যোগান বাড়াইতে বা কমাইতে চেষ্টা করে ; এই পদ্ধতির নাম খোলা বাজারের কার্যকলাপ (open market operation)। সমাজে টাকার পরিমাণ কমাইতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করে, এইরূপে জনসাধারণের বা ব্যাঙ্কের হাত হইতে নগদ টাকা তুলিয়া লয়, ফলে ব্যাঙ্কসমূহের ঋণসৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও কমে। টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হইলে সে ঋণপত্রসমূহ ক্রয় করিয়া লয়, এইরূপে জন-

খোলাবাজারের কার্যকলাপ

সাধারণের বা ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা তুলিয়া দেয়, ব্যাঙ্কসমূহের ঋণসৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

দেশের ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের নিকট নগদ জমার কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে (Reserve Ratio)। ফলে ব্যাঙ্কের পক্ষে সেই নগদ টাকা ঋণসৃষ্টি করিবার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে ঋণসৃষ্টির পরিমাণ বাড়াইতে চান, তাহা হইলে জমার অনুপাত কমাইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাতে নগদ অর্থ বেশি থাকায় তাহাব ভিত্তিতে অধিক 'ঋণসৃষ্টি' সম্ভব হয়। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে ঋণরূপ অর্থের পরিমাণ কমাইতে চান, তাহা হইলে জমার অনুপাত বাড়াইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাত হইতে নগদ অর্থ সরাইয়া আনেন, ঋণ সৃষ্টির ভিত্তি কমিয়া যাওয়ায় ঋণরূপ অর্থের পরিমাণ কমিয়া যায়।

রিজার্ভের অনুপাতে পরিবর্তন

অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইতে বা বাড়াইতে চাহিলে পৃথক ভাবে তাহা করিতে পারেন (Rationing of credit)। যদি কেন্দ্রীর ব্যাঙ্ক মনে করেন যে, ধরা যাউক, বস্ত্র-শিল্পে বিনিয়োগ অধিক হইতেছে, কিন্তু ইস্পাত শিল্পে আশানুরূপ বিনিয়োগ হইতেছে না, তাহা হইলে ব্যাঙ্কসমূহকে নির্দেশ দিবেন যে নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক ঋণ বস্ত্র-শিল্পে দেওয়া চলিবে না। এইরূপে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন শেয়ার বাজারে ফাট্‌কাদারী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ঋণের রেশনিং

শেয়ার বাজারে ফাটকাদারী রোধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কঋণের ব্যবহার কমাইবার জন্য অনেক সময় এক প্রকার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। শেয়ারের কোন দালাল বা কোন ফাটকা-ব্যবসায়ী শেয়ার বন্ধক রাখিয়া ঋণ আনিতে গেলে যে-পরিমাণ নগদ টাকা জমা দেয় তাহাকে বলে প্রয়োজনীয় নগদাংশ (Margin Requirements)। যেমন 1000 টাকার কোন শেয়ার বন্ধক দিয়া যদি ঋণ হিসাবে 900 টাকা আনিতে পারা যায় তাহা হইলে 100 টাকা হইল প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মার্জিন। এক্ষেত্রে মার্জিন হইল শেয়ারের মূল্যের 10%। অর্থাৎ 10% মার্জিনে কোন ব্যক্তি সহবন্ধকী (Colateral Security) দ্রব্যের (শেয়ারের) মূল্যের 90% ঋণ লইতে পারে। প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মার্জিন যত অধিক হইবে তত অধিক নগদ টাকা জমা দিতে হইবে বা

শেয়ার বন্ধকী ঋণের মার্জিন পরিবর্তন

শেয়ারের বন্ধকীতে তত কম পরিমাণ ঋণ পাইতে পারিবে। যেমন প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মার্জিন 20% হইলে সে 400 টাকা ঋণ পাইবে। এইভাবে মার্জিন বাড়াইয়া ফাট্‌কাদারীতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ কমানো সম্ভবপর।

স্থায়ী ধরনের ভোগ্য দ্রব্যসমূহ (যেমন রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজিডেয়ার, গ্রামোফোন, আসবাবপত্র প্রভৃতি) আজকাল প্রায়ই কিস্তিতে দাম দেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় ; দ্রব্য ক্রয়ের সময় দামের একাংশ (যেমন 20% বা 25%) দেওয়া হয় এবং মাসিক বা ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক নির্দিষ্ট সংখ্যক কিস্তিতে (যেমন মাসিক হিসাবে 30 কিস্তি বা ত্রৈমাসিক হিসাবে 10 কিস্তি, ষাণ্মাসিক হিসাবে 5 কিস্তিতে) সম্পূর্ণ দাম পরিশোধ করা হয়। দেখা গিয়াছে যে, স্থায়ীধরনের ভোগ্য দ্রব্যসমূহের চাহিদা অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির (unstable), এবং তাহা দামস্তর, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর বিশেষ প্রভাবশীল। সুতরাং আধুনিককালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, বিশেষ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে দেশের স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের কিস্তি বা অন্যান্য শর্তাদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে (Consumer credit Regulation)। আমেরিকায় এই ক্ষমতা Regulation W নামে পরিচিত। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে মুদ্রাস্ফীতি ও বিনিয়োগ-বৃদ্ধি কমাইতে হইবে তাহা হইলে সে এই ঋণের শর্তাদি কঠিনতর করিবে যাহাতে দ্রব্যাদির ক্রয় কমিয়া যায়। যেমন ক্রয়ের সময় নগদ একাংশের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে, ঋণে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের সংখ্যা কমাইয়া দিবে, দাম পরিশোধের কিস্তির সংখ্যা কমাইবে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে এইরূপ স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পাউক এবং উহাতে উৎপাদন ও বিনিয়োগ বাড়িয়া যাউক, তাহা হইলে সে এই ঋণের শর্তাদি শিথিলতর করিবে। যেমন, ক্রয়ের সময় দামের নগদ একাংশের পরিমাণ কমাইয়া দিবে, ঋণে বিক্রয়-যোগ্য দ্রব্যের সংখ্যা বাড়াইয়া দিবে, দাম-পরিশোধের কিস্তির সংখ্যাও বাড়াইবে।

ভোগকার্যে ঋণের নিয়ন্ত্রণ

অর্থের বাজারের শীর্ষে অবস্থিত বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণত সকল ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুরোধ সকল প্রতিষ্ঠানই রক্ষা করিবে, এই আশায় অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনুরোধ-উপরোধের পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং ব্যাঙ্কঋণ বাড়ানো বা কমানো উচিত কিনা তাহা ব্যাঙ্কদের বুঝাইবার চেষ্টা করে (**moral persuasions**)।

অনুরোধ উপরোধের দ্বারা

ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহের সীমাবদ্ধতা (Limitations of the methods of Credit Control):

এই সকল পদ্ধতি বিনা বাধায় পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগশীল ও কার্যকরী হইয়া থাকে তাহা নহে ; বাস্তব ক্ষেত্রে ইহারা নানাবিধ কারণে সীমাবদ্ধ। সুচিন্তিত ভাবে প্রয়োগ করিলেও ইহারা সর্বত্র সফল না হইতে পারে।

যেমন ধরা যাউক, দামস্তরে পরিবর্তন আসিয়াছে। দেশে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতেছে, "স্বাভাবিক" অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজস্ব সুদের হার বা ব্যাঙ্কহার কমাইয়া বা বাড়াইয়া দিবে। (ক) কিন্তু সুদের হার ঠিক কি পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো দরকার তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি-ভাবে স্থির করিবে? ভুল-ত্রুটির মধ্য দিয়া পরীক্ষা (Trial and Error) করার সুযোগ এই ব্যাপারে খুবই কম। (খ) যদি ব্যাঙ্ক-হারের সেই 'আদর্শ' পরিবর্তনটুকু জানাও যায়, তাহা হইলেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-হার কমাইলে বা বাড়াইলে অন্যান্য ব্যাঙ্ক তাহাদের সুদের হার কমাইবে বা বাড়াইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। অনুন্নত দেশসমূহে, যেমন ভারতবর্ষে, অর্থের বাজার বিশেষ অসংগঠিত, "দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি" (যেমন গ্রাম্য মহাজন, শ্রেষ্ঠী, সাহুকার ইত্যাদি) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদের হার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারে। (গ) ব্যাঙ্কসমূহ সুদের হার পরিবর্তন করিলেও, যেমন মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সুদের হার বাড়িলেও, ব্যবসাদারগণ বিনিয়োগ কমাইবে এমন নিশ্চয়তা নাই, কারণ প্রত্যাশিত মুনাফার হার খুব বেশি এবং মোট ব্যয়ের মধ্যে সুদের দরুণ ব্যয় অতি অল্প অংশ মাত্র। আবার ব্যবসায়-সংকটের সময়ে সুদের হার কমাইলেও গভীর নিরাশার প্রভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি না হইবারই সম্ভাবনা।

ব্যাঙ্ক হার পদ্ধতির অসার্থকতা

খোলাবাজারের কার্যাবলীও যে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে তাহা নহে। (ক) দামস্তর বাড়িতে থাকিলে মুদ্রাস্ফীতি কমাইবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সরাইয়া আনিতে পারে, কিন্তু যদি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইয়া সেই নগদ টাকার সাহায্যে ঋণবৃদ্ধি করিতে থাকে তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। (খ) ব্যবসায়-সংকটের যুগে বাজার হইতে ঋণপত্রসমূহ ক্রয় করিয়া

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকার পরিমাণ সমাজে বাড়াইয়া দিতে পারে বটে কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহ পুরাতন ঋণ পরিশোধের জন্য বা সাবধানতা অবলম্বন করিয়া সেই নগদ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিবার জন্য ফেরৎ দিতে পারে ; ঋণসৃষ্টির ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার না করিয়া নিজের আলমারিতে জমাইয়া রাখিতে পারে ; জনসাধারণও নগদ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে সরাইয়া লইয়া নিজেদের হাতে মজুত করিয়া রাখিতে পারে। (গ) বর্ধিত নগদ টাকার সাহায্যে ঋণসৃষ্টি করিতে রাজি হইলেও ব্যাঙ্কসমূহ যে ঋণ দিতে পারিবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, কারণ ব্যবসায়-সংকটের কালে গভীর হতাশায় নিমগ্ন ব্যবসায়িগণ সস্তা ও সহজ ঋণ পাইয়াও অনেক সময় বিনিয়োগে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না। অনিচ্ছুক ঘোড়াকে জলের সম্মুখে পৌঁছানো যাইতে পারে, কিন্তু জলপানে বাধ্য করা যায় না।

খোলাবাজারে কার্যাদির সীমাবদ্ধতা

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন, (ক) সকল ব্যাঙ্ককে সমানভাবে প্রভাবিত করে না, কারণ অনেক ব্যাঙ্ক পূর্ব হইতেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট নিয়মের বেশি নগদ জমা রাখে। তাহা ছাড়া, নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই যে ব্যাঙ্কসমূহ ঋণবৃদ্ধি করিতে চাহিবে এরূপ নহে। আর, ঋণবৃদ্ধি করিতে চাহিলেই তাহারা করিতে পারে না, উদ্যোক্তাগণ ঋণগ্রহণে প্রস্তুত আছে কি না তাহাও লক্ষ্য রাখা দরকার।

নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তনের সীমাবদ্ধতা

তত্ত্বের দিক হইতে ঋণের রেশনিং সত্যই বিশেষ সুবিধাজনক, কারণ ইহার দ্বারা ঋণের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করা তো যায়ই, উপরন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমাজের বিভিন্ন দিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নতির জন্য ঋণবণ্টন করিতে পারে। তবে এই পদ্ধতি বাস্তবে প্রয়োগের অসুবিধা হইল ইহার বাধ্যতা-মূলক দিকটি, জবরদস্তি করিয়া ব্যাঙ্কের ঋণদানের ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ বলিয়া ইহাকে মনে করা চলে। এই পদ্ধতির কার্যকারিতাও কম, কারণ এক উদ্দেশ্যে ঋণ লইয়া উদ্যোক্তাগণ অন্য উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পক্ষে ঋণব্যবহারের দিকটি নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ অসুবিধাজনক।

ঋণের রেশনিং-এর অসুবিধা

শেয়ার-বন্ধকী ঋণের প্রয়োজনীয় নগদাংশে বা মার্জিনে পরিবর্তন ফাট্‌কা-

ব্যবসায়কে বহুপরিমাণে সংকুচিত করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে না। সমাজে টাকার পরিমাণ বা আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো এই পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব হয় না, ইহা কেবলমাত্র শেয়ার-লেনদেনে লগ্নীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ভোগ্যদ্রব্যক্রয় নিয়ন্ত্রণও কেবলমাত্র ঋণের বিশেষ দিকে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা যে মৌলিক কারণগুলির ফলে দামস্তর ভারসাম্যবিহীন হইয়া পড়ে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অনুরোধ বা প্রভাব-বিস্তার সাফল্য লাভ করে যদি অন্যান্য ব্যাঙ্ক স্বভাবতই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে নেতা হিসাবে স্বীকার করিয়া লয় এবং দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা কম থাকে। আর ব্যাঙ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেই দেশে ঋণসৃষ্টি কমানো বা বাড়ানো যায় না, ঋণগ্রহীতাদের আশা-নিরাশা ও কাজকর্মের উপর ইহা বহুলাংশে নির্ভর করে।

মার্জিন নীতির সীমাবদ্ধতা

ক্রয়নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

অনুরোধ বা প্রভাবের সীমা

ব্যাঙ্করেট সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা (A further discussion on Bank rate)

নিম্নতম যে-হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রথম শ্রেণীর বিলগুলিকে ডিস্‌কাউন্ট করে অথবা পছন্দসই সিকিউরিটির ভিত্তিতে ঋণ দেয়, তাহাকে ব্যাঙ্করেট বলে। এই ব্যাঙ্করেটের মোটামুটি উদ্দেশ্য হইল বাহির হইতে দেশের মধ্যে সোনা ও আন্তর্জাতিক মূলধন আকৃষ্ট করা এবং দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্তর নিয়ন্ত্রণ করা। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন কিরূপে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতির উপর প্রভাব বিস্তার করে সেই কার্যপদ্ধতি (Modus operandi) সম্পর্কে মোটামুটি তিনপ্রকার বিশ্লেষণ প্রচলিত আছে: প্রাচীন ধারণা, হট্রের (Hawtrey) বিশ্লেষণ ও কেইন্‌সের বিশ্লেষণ। প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী ব্যাঙ্করেটের কাজ হইল সোনার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা; হট্রে'র মতে ইহা বিনিয়োগের ব্যয়ে পরিবর্তন আনে; আর কেইন্‌সের মতে ইহা বিনিয়োগে পরিবর্তন আনে দীর্ঘকালীন সুদে পরিবর্তনের মাধ্যমে। হট্রে ও কেইন্‌সের আলোচনা অনেকাংশে একরূপ, উভয়েই ব্যাঙ্করেটের প্রধান প্রভাব যে বিনিয়োগের উপর তাহা

তিন দিক হইতে ইহাকে আলোচনা করা হইবে

বলেন। তবে হট্রে ইহাকে গণ্য করেন ব্যয়-প্রভাব হিসাবে (as a cost factor) কিন্তু কেইন্‌স ইহাকে গণ্য করেন মূলধনীকরণ-প্রভাব হিসাবে (as a capitalisation factor)। আমরা একে একে ইহাদের আলোচনা করিব।

প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী ব্যাঙ্করেটের প্রধান কাজ হইল দেশে স্বর্ণের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা। কোন দেশের বৈদেশিক ব্যালান্সে ঘাট্‌তি দেখা দিলে সেই দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইতে থাকে। দেশের স্বর্ণভাণ্ডার কমিয়া যায়, তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধির প্রভাব প্রথমেই পড়িবে বৈদেশিক বিনিময়ের উপর। সেই দেশের সকল ব্যাঙ্ক তাহাদের লেনদেনের উদ্দেশ্যে নিজস্ব সুদের হার বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্করেট বেশি বলিয়া বেশি সুদ পাওয়ার আশায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীরা সেই দেশের ব্যাঙ্কে টাকা লগ্নী করিতে চাহিবে, বিদেশ হইতে সোনা সেই দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে, অন্ততঃপক্ষে স্বর্ণের বহির্গমন বন্ধ হইবে। বিদেশের বাজারে সেই দেশের টাকার চাহিদা বাড়িয়া যাইবে, তাই বিদেশী মুদ্রার হিসাবে দেশীয় টাকার দাম বাড়িবে। বৈদেশিক বিনিময়হার দেশের অনুকূলে আসিবে। ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়ীরা কম ঋণ লইবে, দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য কম হইবে, আয় ও দামস্তর নামিয়া যাইবে। সেই দেশের বাজারে দ্রব্যসামগ্রী আর বেশি বিক্রয় হইবে না (কারণ সেখানে আয় ও দাম কম); বরং সেই দেশ হইতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে (কারণ অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহা পূর্বাপেক্ষা সস্তা)। ইহাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাট্‌তি দূর হইবে, দেশে অধিকতর স্বর্ণ প্রবেশ করিতে থাকিবে। এই-রূপে স্বল্পকালীন টাকার বাজার, দীর্ঘকালীন মূলধনের বাজার এবং লেনদেন ব্যালান্সে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে পরিবর্তন আনে।

ব্যাঙ্করেট কিরূপে বাণিজ্য ব্যালান্সে ভারসাম্য আনে

অবশ্য ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন তখনই লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য আনিতে পারে যখন সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা থাকে। সেই দেশের টাকার স্থায়িত্বের উপরই যদি লোকের বিশ্বাস না থাকে, তবে ব্যাঙ্কহার বাড়াইলেই তাহারা নিশ্চয় নিজ নিজ দেশের টাকা বা সোনা এই দেশে জমা দিতে ছুটিয়া আসিবে না।

প্রাচীন ধারণার মূল ভিত্তি ছিল স্বর্ণমান। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একমাত্র কাজ ছিল নিজের স্বর্ণভাণ্ডারকে রক্ষা করা। পৃথিবীর পরিবর্তিত

অবস্থায় ব্যাঙ্করেট আর প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী কাজ করে না। ইহার প্রধান প্রভাব আভ্যন্তরীণ আয়, কর্মসংস্থান ও দামস্তরের উপরে। তাই আজকালকার ধনবিজ্ঞানীরা বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্করেটের কিরূপ প্রভাব পড়ে উহাই আলোচনা করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে দুইটি ধারায় আলোচনা হইয়াছে।

হট্রে (Hawtrey) বলেন যে, ব্যাঙ্করেট বাড়িলে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের স্বল্পকালীন সুদের হার বাড়াইয়া দেয়। ইহার কারণ আমরা জানি : (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ করিয়াছে, তাহার দরুণ এখন উচ্চতর হারে সুদ দিতে হইবে, এবং (খ) ব্যাঙ্কগুলি যে-সকল বিল কিনিয়াছে উহাদের ভাঙাইতে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এখন পূর্বাপেক্ষা বেশি সুদ চাহিবে। দেশে যে-সকল পাইকারী বা খুচরা ব্যবসায়ী আছে, তাহারা সাধারণত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে স্বল্পকালীন ঋণ লইয়া জিনিসপত্র মজুত করে। এইরূপ সকল দ্রব্য মজুত করার খরচা এখন বাড়িয়া গেল, কারণ ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সুদের হার চড়াইয়া দিয়াছে। তাই এই ব্যবসায়ীরা যতটা সম্ভব কম দ্রব্য মজুত রাখিবে, উৎপাদকদের নিকট হইতে মালপত্র কেনার জন্য আর নূতন অর্ডার দিবে না। শুধু তাহাই নহে, ব্যাঙ্কের ঋণ তাড়াতাড়ি ফেরৎ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহারা মজুত দ্রব্য দ্রুত বিক্রয়ের চেষ্টা করিবে, প্রয়োজন মনে করিলে দাম একটু কমাইয়াও দিতে পারে। এদিকে উৎপাদকেরা নূতন অর্ডার না পাইয়া উৎপাদন হ্রাস করিতে থাকিবে, জিনিসের দাম একটু কমাইয়াও বিক্রয়ের পরিমাণ বজায় রাখার চেষ্টা করিতে থাকিবে। কিন্তু দাম কমাইলেও জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িবে না, কারণ দেশে ব্যাঙ্ক-ঋণের পরিমাণ কমিলে বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় কমে। ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পাইলে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন কম হইবে, পুরানো যন্ত্রের বদলে কেহ নূতন যন্ত্র বসাইবে না, তাই মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনও হ্রাস পাইবে। ঠিক ইহার বিপরীত ফল হইবে যদি ব্যাঙ্করেট কমানো হয়। পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীরা বেশি টাকা ঋণ লইবে, মালপত্র মজুত করার উদ্দেশ্যে বেশি অর্ডার দিবে, বিনিয়োগ, উৎপাদন ও আয় বাড়িতে থাকিবে।

হট্রে কি বলেন

এই বিশ্লেষণ কিন্তু কেইন্‌স মানিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি মনে করেন যে, মজুত করার জন্য ব্যবসায়ীরা যে-টাকা লগ্নী করে, তাহার খরচা সুদের হার

বদলাইলে ততটা বদলায় না। মজুত করার জন্ম টাকা চাই ঠিকই এবং সেই টাকা ব্যাঙ্ক হইতে ধার করিয়া আনিলে সুদও নিশ্চয় দিতে হয়। কিন্তু এই সুদের হারই তাহাদের মজুত করার পিছনে একমাত্র কারণ নয়, এমন কি প্রধান কারণও নয়। গুদামের ভাড়া, বীমার প্রিমিয়াম, নষ্ট হইবার জন্য কিছুটা ক্ষয় ও ক্ষতিপূরণ, এই সকল খরচা কম নয়; এবং সেয়ার্সের মতে "বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সকল ব্যয় সুদের হারের বিপুল পরিবর্তনকে অগ্রাহ্য করিবার পক্ষে যথেষ্ট।"* কেইন্‌স্ তাই হট্রের বিশ্লেষণকে ভুল না বলিলেও "a very incomplete account" বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন।

হট্রের অসম্পূর্ণতা কোথায়

কেইন্‌সের (Keynes) মতে ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় পরিবর্তন আনে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আনিয়া। স্বল্পকালীন সুদের হারগুলিতে পরিবর্তন আসিলে দীর্ঘকালীন সুদের হারও ক্রমে প্রভাবিত হয়, ইহার ফলে উদ্যোক্তাদের মনে স্থায়ী মূলধনী দ্রব্যে, যেমন কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে, দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করার ইচ্ছায় পরিবর্তন আসে। সুদের হার যত বেশি, দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের ইচ্ছা তত কম; আবার সুদের হার কম থাকিলে এই সকল যন্ত্রপাতিতে টাকা খাটাইবার সম্ভাবনা ও ইচ্ছা তত প্রবল।

কেইন্‌স কি বলেন

ব্যাঙ্করেট স্বল্পকালীন পরিবর্তনের প্রভাব কিরূপে দীর্ঘকালীন সুদের হারের উপর প্রসারিত হয়? স্বল্পকালীন সুদ বাড়িলে ব্যাঙ্ক ও বিনিয়োগকারী ব্যক্তিরা স্বল্পকালীন ঋণপত্র বা সিকিউরিটিগুলি বেশি কিনিবে, এবং এই উদ্দেশ্যে দীর্ঘকালীন ঋণপত্রগুলি বাজারে বেচিয়া দিবে। তাই দীর্ঘকালীন ঋণপত্রগুলির দাম কমিয়া যাইবে। ইহা আরও ঘটিবে এই কারণে যে, স্বল্পকালীন সুদের হার বাড়িলে লোকে কম টাকা ধার করিয়া ব্যবসায় চালাইতে চাহিবে, তাই দীর্ঘকালীন ঋণপত্রগুলি বেচিয়া দিয়া নিজের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করিবে। দীর্ঘকালীন ঋণপত্রের দাম কমিয়া যাওয়ার অর্থ হইল, কম টাকা খাটাইয়া পূর্বের ন্যায় নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ

স্বল্প ও দীর্ঘকালীন সুদের হারের সম্পর্ক কিরূপ

* "but in most cases they are sufficient to swamp any but the most extreme changes in interest rates...in general, in speaking of most modern economies we can say that the bankers cannot substantially influence economic activity through this particular channel." Sayers, *Modern Banking* (4th Edition) P. 168-169.

পাইতে থাকা, অর্থাৎ দীর্ঘকালীন সুদের হার বাড়িয়া যাওয়া। এইরূপেই স্বল্পকালীন সুদের হারে পরিবর্তনের ফলে দীর্ঘকালীন সুদের হারে একই দিকে পরিবর্তন আসে।

দীর্ঘকালীন সুদের হারে পরিবর্তন বিনিয়োগের বাজারে পরিবর্তন আনে। স্থায়ী মূলধনী দ্রব্য বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে উহা হইতে প্রত্যাশিত মুনাফার হারের উপর, ইহার উপর দীর্ঘকালীন সুদের হারের প্রভাব খুবই বেশি। প্রত্যাশিত মুনাফার হার সমান অবস্থায় সুদের হার বাড়িলে তাই বিনিয়োগ কমে ; আর সুদের হার কমিলে তাই বিনিয়োগ বাড়ে। বিনিয়োগ কমিলে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর কমে, ফলে সঞ্চয় ও ভোগব্যয় উভয়ের পরিমাণই হ্রাস পায়, মূলধনী দ্রব্যে বিনিয়োগ আরও কমিয়া যায়। সুদের হার কমিলে ইহার বিপরীত প্রভাব ঘটিতে দেখা যায়।

সুদের হার বদলাইলে বিনিয়োগ প্রভাবিত হয়

ব্যাঙ্করেটের কার্যপদ্ধতি যত সহজ সরল মসৃণরূপে আলোচিত হইল, বাস্তবে কিন্তু বিষয়টি এত সরল নহে। ব্যাঙ্করেট পদ্ধতির সাফল্যের জন্য কয়েকটি অবস্থা বজায় থাকা দরকার, এই শর্তগুলি প্রতিপালিত না হইলে ইহা সফলভাবে কাজ করিতে পারে না। দেশে সুসংগঠিত এবং ব্যাপক মূলধনের বাজার (well organised and broad capital market) থাকা ইহার সাফল্যের অন্যতম প্রধান শর্ত। আমরা জানি, স্বল্পকালীন সুদের হার কত দ্রুত এবং কতটা সাফল্যের সহিত দীর্ঘকালীন সুদের হারে পরিবর্তন আনিতে পারিল, তাহাই ব্যাঙ্করেট-প্রভাবের গোড়ার কথা। সুসংগঠিত ও প্রশস্ত মূলধনের বাজার গড়িয়া তুলিতে না পারিলে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন ঋণপত্রের কেনাবেচা ভালভাবে করা যায় না, উভয় কালের সুদের হার একই দিকে পরিবর্তিত হওয়ার পথ সুগম থাকে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট বাড়াইলে বা কমাইলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও সুদের হার বাড়াইবে বা কমাইবে—এইরূপ অবস্থা থাকা চাই। যদি অবশ্য তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে প্রভূত পরিমাণে ঋণ গ্রহণে অভ্যস্ত থাকে, তবে ইহা ঘটিবেই। এইরূপ ঋণের প্রয়োজন না থাকিলেও ইহা সম্ভব হয় যদি ব্যাঙ্কগুলি সহযোগিতা করে। সর্বোপরি, ব্যাঙ্করেটের সাফল্য নির্ভর করে দেশের আর্থিক কাঠামোর নমনীয়তার উপর। যেমন ব্যাঙ্করেট কমানো হইল, ব্যাঙ্কগুলির সুদের হারও কমিল, কিন্তু কোন না কোন প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো গেল না, বিনিয়োগ সম্ভব হইল না, এইরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন নিজ উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবে না।

ব্যাঙ্করেটে সাফল্যের শর্ত

ব্যাঙ্করেট পদ্ধতিকে বহুভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, বলা হইয়াছে যে, উপরের শর্তগুলি সর্বত্র পাওয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশ ছাড়া এই শর্তগুলি পালিত হইতে দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, এই নীতি সফল হইবে কি না তাহা অনেকটা নির্ভর করে ব্যবসায়ীদের মানসিক অবস্থার উপর। সংকটের সময়ে ব্যাঙ্করেট কমাইলেও ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করিবার মত মনের জোর খুঁজিয়া পায় না। আবার তীব্র মুদ্রাস্ফীতির সময়ে ব্যাঙ্করেট অল্প কিছু বাড়াইয়া কোনরূপ কাজ হয় বলিয়া মনে হয় না, কারণ ব্যবসায়ীদের মনে প্রত্যাশিত মুনাফা তখন খুবই উঁচুতে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট স্তরের পরে ব্যাঙ্কহার আর বেশিদূর বাড়ানো চলে না। তৃতীয়ত, যখন ব্যবসায়ীদের মনোভাবে আশা বা নিরাশার আতিশয্য থাকে না, তখন মনে রাখা দরকার যে, ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন দেশের সকল শিল্পকে সমান ভাবে প্রভাবিত করিতে পারে না। কোন কোন বিনিয়োগ হইতে স্বল্পকালে ফল পাওয়া যায়; আবার কোন কোনটি হইতে দীর্ঘকালে প্রতিদান আসে। দ্রুত-প্রতিদানশীল বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্কহারের প্রভাব ততটা নাই, কিন্তু দূর-প্রতিদানশীল বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্কহারের প্রভাব খুবই বেশি। চতুর্থত, সরকারী মালিকানা, ট্রাস্টসম্পত্তি, আধা-সরকারী মালিকানা প্রভৃতির কর্তৃত্বাধীনে যে-সকল বিনিয়োগ ঘটে, তাহারা সাধারণভাবে মূলধনের বাজার-নিরপেক্ষ, ইহারা সুদের হারে উঠানামায় ততটা বিচলিত হয় না। পঞ্চমত, আধুনিক কালে দুইটি নূতন বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে। আজকালকার দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও মূলধনী দ্রব্যগুলি অতি দ্রুত পুরাতন ও অকেজো হইয়া পড়ে (obsolescence), ফলে উদ্যোক্তারা অতি দীর্ঘদিন স্থায়ী অধিক মূল্যের যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ করিতে চায় না। ইহার সহিত আরও একটি বিষয় যুক্ত হইয়াছে। উদ্যোক্তারা উচ্চহারে মূলধনী দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ বাবদ টাকা উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যেই ধরিয়া লইতেছেন, তাই সুদের হার অনেকখানি গুরুত্বহীন হইয়া উঠিয়াছে। ষষ্ঠত, আধুনিক কালে সকল দেশেই সরকারী ঋণের পরিমাণে বিপুল প্রসার হইয়াছে। ব্যাঙ্করেট বাড়িলে সরকারের অসুবিধা, কারণ তখন তাহাকেও ধার করিতে হইবে পূর্বাপেক্ষা বেশি সুদে (সরকারী ঋণপত্রে বেশি সুদ না দিলে লোকেরা ইহা না কিনিয়া অন্য কিছু ক্রয় করিবে)। সুদের হার

ব্যাঙ্করেট নীতির সমালোচনা

বাড়ানোর ব্যাপারে আজকাল তাই সরকারপক্ষ ততটা মত দেন না। এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, গত কয়েক বৎসরে, এই পদ্ধতির কিছুটা পুনরভ্যুত্থান দেখা যাইতেছে। যুদ্ধোত্তর যুগের মুদ্রাস্ফীতি রোধের কাজে আজকাল সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র আর্থিক নীতি প্রয়োগ করেন না, আরও বহুপ্রকার ফিস্‌কাল ও শাসনতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করেন (যেমন রেশনিং, কোটা প্রভৃতি)। তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অস্ত্রাগারে ব্যাঙ্করেট একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহাকে একেবারে বাদ দেওয়া হয় না

খোলাবাজারে কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা (A further discussion on Open market operations)

উপরের আলোচনা হইতে আমরা দেখিয়াছি, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যদি ব্যাঙ্করেট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ সুদের হারে একই দিকে পরিবর্তন না আনে, তবে ঐ পদ্ধতি সাফল্য লাভ করিতে পারে না। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চেষ্টা হইবে যাহাতে অন্যান্য ব্যাঙ্ক তাহাকে অনুসরণ করে। এই উদ্দেশ্যেই প্রথম দিকে খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি প্রয়োগ করা হইত। কিন্তু বর্তমানে ইহাকে আর ব্যাঙ্করেটের সাহায্যকারী নীতি বলিয়া মনে করা হয় না—ইহার স্বাধীন কার্যক্ষমতা সকলে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

এখন আর ইহা ব্যাঙ্করেটের অনুগামী নয়

এই নীতি কিরূপে কার্যকরী হয় তাহা আমরা দেখিয়াছি। দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী সিকিউরিটিগুলি বিক্রয় করিতে থাকে, লোকের (ও ব্যাঙ্কের) হাত হইতে টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে চলিয়া যায়, ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা কমে, তাহাদের ঋণসৃষ্টির ভিত্তি সংকুচিত হয়, সমাজে ঋণগত টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়, মুদ্রাস্ফীতির বেগ মন্দীভূত হয়। আবার অর্থনৈতিক মন্দার অবস্থা থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই সিকিউরিটিগুলি ক্রয় করিতে থাকে লোকের (ও ব্যাঙ্কের) হাতে নগদ টাকা চলিয়া যায়, ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা বাড়ে, তাহাদের ঋণসৃষ্টির ভিত্তি প্রসারিত হয়, সমাজে ঋণগত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়া উঠিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি

পূর্বে এইরূপ ধারণা ছিল যে, একমাত্র ব্যাঙ্করেটের সহকারী নীতি হিসাবেই

খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি কাজ করিতে পারে। ব্যাঙ্করেট বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিত, ব্যাঙ্কগুলির হাতে টাকার পরিমাণ কমিয়া যাইত, ঋণদান সংকুচিত করিবার জন্য সুদের হার বাড়াইয়া দিত। ঠিক এইরূপ ব্যাঙ্করেট কমাইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই সিকিউরিটিগুলি ক্রয় করিত, ব্যাঙ্কের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাইত, ঋণদান বাড়াইবার উদ্দেশ্যে সুদের হার কমাইয়া দিত। এইরূপে উভয়নীতি একত্রে প্রযুক্ত হইত। অনেকে তাই খোলাবাজারী নীতিকে পৃথক বলিয়া মনে করিতেন না। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন না ঘটাইয়া স্বাধীনভাবে খোলাবাজারী নীতি গ্রহণ করা চলে না—ইহাই তাঁহারা মনে করিতেন। তাঁহাদের যুক্তি ছিল এইরূপ : যদি ব্যাঙ্করেট সমান থাকে, কিন্তু সংকট-ত্রাণের উদ্দেশ্যে বাজার হইতে সিকিউরিটি কিনিয়া লইয়া ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকা ঢালিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা সেই টাকা দিয়া ঋণের প্রসার না ঘটাইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের ঋণশোধ শুরু করিতে পারে। ইহারই সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ব্যাঙ্কহার কমাইলে, তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে টাকা না-ও ফেরৎ দিতে পারে, কারণ সুদের হার কম, এবং ব্যবসায়ীরা এই কম সুদের হারে বেশি টাকা চাহে বলিয়া তাহাদের ঋণদানের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে পারে। তাই ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন ছাড়া ইহার স্বাধীন কার্যকারিতা নাই, এইরূপ মনে করা হইত।

ইহাকে পূর্বে ব্যাঙ্করেটেরই অঙ্গ বলিয়া অনেকে বলিতেন

কেইন্‌স কিন্তু ভিন্নরূপ মনে করেন। তাঁহার মতে খোলাবাজারী নীতির কার্যকারিতা অনেক বেশি, ইহাকে তাই স্বাধীন নীতি বলিয়া গণ্য করাই ভাল। যেমন মনে কর, কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে নিজের রিজার্ভের অতিরিক্ত কিছু টাকা আছে। সে উহা কাহাকেও ঋণ দিবার কথা ভাবিতেছে। এই ঋণদানের ফলে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ টাকা আরও বহুগুণ ঋণ সৃষ্টি করিবে। এই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বেচিয়া ঐ টাকাটি তুলিয়া লইলে এই ঋণ প্রসারের ধারার সূত্রপাত হইতে পারিল না, গোড়াতেই বন্ধ হইয়া গেল। এইরূপে দেখা যায় অল্প অল্প করিয়া খোলাবাজারে সিকিউরিটি বেচিলে ব্যাঙ্কগুলি ধীরে ধীরে তাহাদের কাজকর্ম কমাইয়া দেয়। আবার ক্রমে ক্রমে খোলাবাজার হইতে সিকিউরিটি কিনিয়া লইতে থাকিলে ধীরে ধীরে ব্যাঙ্কগুলিও ঋণ প্রসারের নীতি অবলম্বন করে।

কিন্তু অনেকে ইহাকে স্বাধীন নীতির মর্যাদা দিতে চান

ব্যাঙ্করেট পরিবর্তন না করিয়াই খোলাবাজারী নীতির মাধ্যমে অনেক দূর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে।*

ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি এই দুই-এর মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। প্রথমত, দেশের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের উপর উভয়ের প্রভাব ভিন্নরূপ। খোলাবাজারে কার্যকলাপের ফল অনেকটা প্রত্যক্ষ, ব্যাঙ্কগুলির নগদ জমার পরিমাণ বদলাইলে তাহাদের ঋণ দিবার ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবিত হয়। কিন্তু ব্যাঙ্করেটের প্রভাব অনেকটা পরোক্ষ, বহু কিছু বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ঋণের বাজারে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্করেটের প্রভাব অনেকখানি অনিশ্চিত, বহু বিভিন্ন কারণের চাপে ব্যাঙ্করেট বাড়িলেও দেশের সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণের পরিমাণ না কমাইবার সিদ্ধান্ত লইতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকার পরিমাণে আঘাত দেয় বলিয়া খোলাবাজারী কার্যকলাপ অনেকটা নিশ্চিত। তৃতীয়ত, ব্যাঙ্করেটের প্রভাব প্রথমে পড়ে স্বল্পকালীন সুদের হারের উপরে, কিন্তু খোলাবাজারী কার্যের প্রভাবে দীর্ঘকালীন সিকিউরিটিগুলির কেনাবেচা হয় বলিয়া প্রথম হইতেই দীর্ঘকালীন সুদের হার কিছুটা প্রভাবিত হইতে থাকে।

ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারী কার্যকলাপে পার্থক্য

খোলাবাজারী কার্যকলাপের সাফল্যের জন্য তিনটি শর্ত বজায় থাকা দরকার। প্রথমত, এই সকল সিকিউরিটি বেচাকেনার জন্য সুসংগঠিত ও প্রশস্ত বাজার থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি মোটামুটি স্থির ও নির্দিষ্ট অনুপাতে জমা রাখে, এইরূপ হওয়া দরকার। তৃতীয়ত, সরকারী ঋণের পরিমাণ অতিরিক্ত না হওয়া দরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে প্রচুর পরিমাণ বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটি থাকা দরকার। উপরের এই

খোলাবাজারী কার্যকলাপের সাফল্যের শর্ত ও সীমাবদ্ধতা

* "In this way a progressive series of small deflationary open market sales by the Central Bank can induce the banks progressively to diminish little the scale of their operations. Certainly there can be no doubt that a progressive series of small inflationary open market purchases by the Central bank......are potentially, and almost invariably, effective in inducing the member banks to follow suit. In this way, much can be achieved without changing the Bank rate." Keynes, *A Treatise on Money*, Vol. II. Pp. 254-255.

শর্তগুলির মধ্যেই খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতির সীমাবদ্ধতা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। অনেক উন্নত দেশের টাকার বাজারেও এই নীতি কার্যকরী হওয়ার পথে অনেক বাধা থাকে। এই প্রসঙ্গ কিছু পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।*

অপূর্ণোন্নত টাকার বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-এর সমস্যা (Problems of Central Banking in underdeveloped Money Markets)

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু সকল দেশের টাকার বাজার সমান স্তরে উন্নীত হয় নাই। কোন দেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নত, সেখানকার টাকার বাজারে উন্নত শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ও মূলধনী প্রতিষ্ঠান আছে; আবার অপর অনেক দেশে এইরূপ কোন কিছু এখনও গড়িয়া উঠে নাই। অপূর্ণোন্নত দেশগুলির টাকার বাজারের কয়েকটি বিশেষত্ব থাকে। প্রথমত, এইরূপ দেশে অত্যল্পকালীন (12 দিন, 7 দিন প্রভৃতির জন্য) ঋণের বাজার, বা তলব-ঋণের বাজার (call-loan market) নাই, ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি নির্দিষ্ট হারে নগদ আমানতের সহিত জমার অনুপাত রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। যেখানে ব্যাঙ্কগুলির জমার অনুপাত নির্দিষ্ট নাই, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিপুল পরিমাণে খোলা-বাজারী কার্য না করিলে ব্যাঙ্কগুলির ঋণনীতি প্রভাবিত হয় না। কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশে এত বিপুল পরিমাণ সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা না-ও থাকিতে পারে। দ্বিতীয়ত, দেশে উপযুক্ত বিল-বাজারের অভাবও একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিল-বাজার না থাকিলে স্বল্পকালীন ঋণের জন্য রি-ডিস্‌কাউন্ট করিয়া ব্যাঙ্কগুলি বা ব্রোকাররা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হাজির হয় না। তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। বিল-বাজারের লেনদেনকারীরা যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট টাকার জন্য আসে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার পাল্টাইয়া বা ঋণের পরিমাণ কম বেশি করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু বিল-বাজার না থাকিলে নিয়ন্ত্রণের এইরূপ

এইরূপ দেশে টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য:
১। তরল-ঋণের বাজার না থাকা

২। বিল-বাজার না থাকা

* 'ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির সীমাবদ্ধতা' শীর্ষক আলোচনা দেখুন।

সম্ভাবনা কমিয়া যায়। তৃতীয়ত, অপূর্ণোন্নত দেশে টাকার বাজারে বহু বিচ্ছিন্ন, স্বয়ংস্বাধীন অসংলগ্ন অংশ থাকে, ইহাদের একের সহিত অপরের যোগ থাকে না, একটি বাজারে যে-দামে টাকা বিক্রয় হয়, পাশাপাশি অন্য বাজারে ভিন্ন দামে উহার লেনদেন চলে, বিভিন্ন বাজারের মধ্যে ঋণযোগ্য টাকার চলনশীলতা থাকে না, তাই দামের পার্থক্য দূর হয় না।

৩। বিচ্ছিন্ন বহু উপবাজার

ভারতবর্ষে টাকার বাজারে আমরা এক ধরনের দ্বৈতস্থিতি (dichotomy) দেখিতে পাই, সুসংগঠিত পশ্চিমী ধরনের ব্যাঙ্ক এবং অসংগঠিত ধরনের দেশীয় ব্যাঙ্ক। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রভাব পড়ে প্রধানত সংগঠিত অংশের উপর, অপর অংশের ঋণনীতি, ঋণ পরিমাণ, ঋণবিষয় বা ঋণের দাম (policy, volume, direction and price of loans) কিছুই সে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। দেশীয় ব্যাঙ্ক, অর্থাৎ মহাজন, শ্রেষ্ঠী ও সাহুকার প্রভৃতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ধার করিতে যায় না, তাই ব্যাঙ্করেটে হেরফের হইলে তাহার সুদের হার প্রভাবিত হয় না। চতুর্থত, অপূর্ণোন্নত অনেক দেশই অর্থনৈতিক দিক হইতে এখন পর্যন্ত অন্য নির্ভর ধরনের (dependent economies), এবং তাহাদের অবস্থা অর্থনৈতিক দিক হইতে স্ব-নির্ভর বা আত্মপ্রধান দেশের (dominant economies) তুলনায় ভিন্নরূপ। স্ব-নির্ভর দেশগুলিতে অর্থনৈতিক কাজকর্মের গতি স্থির হয় প্রধানত আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির চাপে, যেমন দেশে বিনিয়োগী কাজকর্মের হঠাৎ বৃদ্ধি; যদিও অবশ্য লেনদেন ব্যালান্সের অবস্থা দ্বারা এই আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির বেগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির চাপে কাজকর্মের গতিবেগ যত বাড়িতে থাকে ব্যাঙ্কের ঋণপ্রসার তত বৃদ্ধি পায়; যদি না ঠিক একই সময়ে তাহাদের নগদ ব্যালান্স বাড়ে তবে ব্যাঙ্কসমূহ এই চাহিদা মিটাইবার অবস্থায় আসে না। দেশে বিনিয়োগী কাজকর্ম বাড়িলে তাহাদের কাছে নগদ টাকা জমার পরিমাণ বাড়িবে এমন কোন কথা নাই। তাহারা এই অতিরিক্ত নগদ ব্যালান্স দুইটি উপায়ে পাইতে পারে, বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিয়া। ব্যাঙ্করেট বাড়িলে এই উভয় দিকেই অসুবিধা হইবে। তাই দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যের দ্বারা ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রভাবিত হইতে পারে। কিন্তু অপরপক্ষে, পরনির্ভর অর্থনীতিতে, অর্থনৈতিক কাজকর্মের গতিবেগ

৪। ব্যাঙ্কগুলি বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে ব্যালান্স বাড়াইতে পারে

স্থির হয় সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থার চাপে, বিশেষত রপ্তানি দ্রব্যাদির দামের দ্বারা। তাই যে-সকল শক্তির ফলে ব্যাঙ্কঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহারাই আপনা-আপনি ব্যাঙ্কসমূহের বৈদেশিক ব্যালান্স বাড়াইয়া তোলে। ব্যাঙ্ক তখন এই বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে বিক্রয় করিয়া নিজের হাতে দেশীয় টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিতে পারে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকার বৈদেশিক বিনিময়-হারে সমতা রাখিতে চায়, তবে সে ব্যাঙ্কগুলিকে নগদ ব্যালান্স যোগান দিতে থাকিবে। সুতরাং এইভাবে ব্যাঙ্কসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণের প্রয়োজনীয়তা এড়াইতে পারে, ফলে ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধির সংকোচক প্রভাব হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া চলিতে পারে"।*

পঞ্চমত, এই সকল অপূর্ণোন্নত বা পরনির্ভর দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি

* "There are however certain characteristics which may tend to make the bank-rate a less effective instrument of control in these money markets than in the industrially advanced countries. Many of the countries which have undeveloped money markets are also dependent economies, and their position is in some respects quite different from what may be called dominant economies. In the latter the pace of activities is set mainly by domestic factors, *i.e.*, a burst of investment activities at home, though these may be reinforced by the position of the balance of payments. As the pace of activities quickens under the impact of internal factors and the demand for bank-advances rise, banks may not be in a position to meet this demand unless their cash balances increase at the same time. There is nothing in the rise of investment activities at home to cause an increase in their cash reserve. They may get hold of additional cash balances in two ways, *viz* by selling a portion of their security holdings in the market, and by rediscounting bills of borrowing from the Central Bank. A rise in the Bank rate will cause difficulties in both directions. The banking system may therefore be influenced by the central bank action through changes in the bank rate. In a dependent economy, however, the pace of activities is usually set by the state of foreign trade especially by the level of export prices. So the same factors which give rise to increased demand for bank advances also cause an increase in the foreign balances of the banks. The latter may easily replenish their local cash balances by selling these foreign funds to the Central Bank. In so far as the Central Bank aims at keeping the rate of exchange steady, it will have to supply the banks with cash balances. Banks may therefore be enabled to avoid borrowing from the Central Bank and escape the restrictive effects of a change in the bank rate in the upward directions."

Dr. S. N. Sen, *Central Banking in undeveloped Money Markets*, P. 50-51.

আন্তর্জাতিক অর্থকেন্দ্র নয়, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের টাকার লেনদেন ইহাদের মাধ্যমে ঘটে না। ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া, অল্প কিছু বিদেশী টাকা আকর্ষণ করিতে পারিলেও অন্যান্য দেশ হইতে প্রভূত পরিমাণে স্বল্পকালীন মূলধন ইহাদের নিকট ছুটিয়া আসে না। তাহাদের বাণিজ্য ব্যালান্সের অবস্থা অনুযায়ী বিদেশী টাকা তাহারা পায়, ইহার বেশি নয়। তাই বৈদেশিক ব্যালান্সে ঘাটতি হইলে ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া তাহারা ইহা মিটাইতে পারে না।

৫। এই সকল দেশে ব্যাঙ্করেট বৈদেশিক ব্যালান্সে সমতা আনিতে পারে না

অপূর্ণোন্নত দেশের টাকার বাজারের যে-বৈশিষ্ট্যগুলি উপরে আলোচিত হইল, তাহা হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, এই সকল দেশে ব্যাঙ্করেটের কার্যকারিতা কেন সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া এইরূপ টাকার বাজারে ব্যাঙ্করেট পদ্ধতির একেবারেই কোন প্রকার উপযোগিতা নাই, এমন মনে করা চলে না। ডি'কক্ (De kock) বলেন যে, অপূর্ণোন্নত দেশেও ব্যাঙ্করেটের কিছুটা গুরুত্ব নিশ্চয় আছে। প্রথমত, নির্দিষ্ট ধরনের অনুমোদিত সিকিউরিটির বদলে জনসাধারণ কি হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের সুবিধা পাইয়া থাকে, তাহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা এই সকল দেশে ব্যাঙ্করেটের কাজ। এইরূপ একটি মান (Standard) ঘোষণা করিলে উহার প্রভাব অনেকটা ভাল হয়। দ্বিতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ এমন একটি সুদের হার পায়, যাহার ভিত্তিতে তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দরকারমত টাকা ধার আনিতে পারে। তৃতীয়ত, ব্যাঙ্করেট ঘোষণা করিলে টাকার বাজারে, অন্তত ইহার সুসংগঠিত অংশে, কিছুটা মানসিক প্রভাব পড়ে। কারণ এই ব্যাঙ্করেট দ্বারা মোটামুটি ভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ইচ্ছা-অনিচ্ছার রূপ প্রকাশ পায়, ব্যাঙ্কসমূহ টাকার বাজারে কি-নীতি অনুসরণ করিবে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ইচ্ছা ও নির্দেশের রূপ তাহারা জানিতে পারে। সর্বোপরি, অনেকে মনে করেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল দেশে ঋণ নিয়ন্ত্রণের নীতি হিসাবে ব্যাঙ্করেটের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে। কালপ্রবাহে ক্রমশ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেরা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নেতৃত্ব মানিয়া লইতেছে, বেশি পরিমাণ টাকা ঋণ লইতেছে এবং মোটামুটি উহার সহযোগিতা, উপদেশ ও নির্দেশ গ্রহণ করিতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, অপূর্ণোন্নত দেশের ব্যাঙ্কসমূহ আজকাল মোটামুটি নগদ জমার অনুপাত স্থির রাখিতেছে। ভবিষ্যতে, তাই ব্যাঙ্করেটের কার্যকারিতা বাড়িবে, এইরূপ মনে করা চলে।

ইহার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গুরুত্ব

অপূর্ণোন্নত টাকার বাজারে খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি কার্যকরী হয় কি না, এখন তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা জানি যে খোলাবাজারী নীতি সফল হইতে হইলে মোটামুটি তিনটি শর্ত প্রয়োজন : প্রশস্ত ও সক্রিয় সিকিউরিটি বা বিলের বাজার থাকা, ব্যাঙ্কগুলির নগদ জমার অনুপাত নির্দিষ্ট থাকা, এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পুনর্বাট্টার সুবিধা বা ঋণ লেনদেনের সুবিধা না থাকা। সাধারণত বেশির ভাগ অপূর্ণোন্নত দেশেই এই সকল শর্ত অনুপস্থিত থাকে। সেয়ার্স বলেন যে, এইরূপ দেশে সিকিউরিটির বাজার খুব ছোট বা নাই বলিলেই চলে, তাই খোলাবাজারী কার্যকলাপের সম্ভাবনা খুবই সীমাবদ্ধ। তাঁহার মতে "সংকীর্ণ সিকিউরিটির বাজারে ইহার প্রভাব মূলত পড়ে বিভিন্ন সুদের হারের কাঠামোর উপর, ব্যাঙ্কগুলির নগদ জমার পরিমাণের উপর নয়, ফলে তাহাদের ঋণ দিবার ইচ্ছার উপরেও নহে।" দ্বিতীয়ত, নগদ জমার অনুপাত অনির্দিষ্ট থাকিলেও এই নীতি কার্যকরী হয় না ; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি ক্রয় করিলে সেই নগদ টাকা ব্যাঙ্কেরা জমাইয়া রাখিতে পারে, অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিলে, হস্তে রক্ষিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দিয়া উহা ক্রয় করিতে পারে, ঋণের পরিমাণ কমানো দরকার হয় না। তৃতীয়ত, পুনর্বাট্টা বা ঋণ গ্রহণের সুবিধা থাকিলে খোলাবাজারী নীতি ততটা কার্যকরী হয় না ; কারণ নিজেদের হাতে টাকা বাড়িলে ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ দিয়া আসিতে পারে বা টাকা কমিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ঋণ লইয়া আসিতে পারে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। সকল অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতেই উন্নয়ন-প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে, সরকারী ঋণপত্র বেচিয়া টাকা উঠানোর পরিমাণ সকল দেশেই বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, কারণ দীর্ঘকালীন সুদের হার বাড়িয়া গেলে সরকারের বিশেষ লোকসান। তাহা ছাড়া, বিক্রয় যোগ্য ঋণপত্রের পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সকল সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিবে, এমন কথা বলা যায় না। সর্বোপরি, অপূর্ণোন্নত দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা খাটাইবার মনোবৃত্তির অভাব দেখা যায়, এই সত্য অস্বীকার করা চলে না। খোলাবাজারী নীতির দ্বারা টাকা ঢালিয়া দিলেই আপনা-আপনি ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ বাড়িবে, এমন কথা ধরিয়া লওয়া চলে না। এই সকল

খোলাবাজারী নীতির সীমাবদ্ধতা

কারণে এই নীতির কার্যকারিতা অপূর্ণোন্নত টাকার বাজারে বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ।

অবশ্য অনেক ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, এইরূপ দেশে, ক্রমশ সিকিউরিটি-বাজারের আয়তন ও কাজকর্ম বৃদ্ধি পাইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে এই নীতির কার্যকারিতা তাই বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন মরশুমে দেশে টাকার বাড়তি বা ঘাটতি দেখা যায়, এবং টাকার যোগানে এই তারতম্য ঘটানোর অস্ত্র হিসাবে খোলাবাজারী নীতি কিছুটা কার্যকরী। সর্বোপরি, এইরূপ টাকার বাজারের সকল অংশ সমান উন্নত নয় এবং বিভিন্ন খণ্ড-বাজারের মধ্যে টাকার লেনদেন ততটা নাই। কখনও, বাজারের কোন অংশে, হঠাৎ টাকার বাড়্তি ও ঘাট্তি দেখা দিলে ব্যাঙ্করেট অপেক্ষা এই নীতি অধিকতর কার্যকরী, কারণ ইহা সঠিক বা নির্দিষ্ট স্থানে আঘাত দিতে পারে। ব্যাঙ্করেট সামগ্রিকভাবে সকল প্রকার বিনিয়োগের উপর প্রভাবশীল, কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশে আঞ্চলিক বা অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ কোন অঙ্গের উপর প্রভাব বিস্তার করা অনেক সময় দরকার হইয়া পড়ে। এই উদ্দেশ্যে, তুলনামূলক-ভাবে, খোলাবাজারী নীতিকে বেশ কিছুটা ব্যবহার করা চলে।

তবে ব্যাঙ্করেটের তুলনায় ইহা গুরুত্বপূর্ণ

ব্যাঙ্কসমূহের রিজার্ভের অনুপাতে পরিবর্তন পদ্ধতিকে (variation in the reserve ratio) অনেকে অপূর্ণোন্নত দেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঘোষণা করে যে, ইহার পর হইতে মোট আমানত ও নগদ জমার অনুপাত বাড়াইতে হইবে, তবে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কের ঋণদান ক্ষমতা কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে ঋণপ্রসার ঘটুক—ইহা মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই নগদ জমার অনুপাত কমাইয়া দিবে, ব্যাঙ্কসমূহের হাতে ঋণদানের যোগ্য টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। যখন ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারী নীতি বিফল হয়, সেই অবস্থায় এই নীতি প্রয়োগ করা চলে, কারণ ইহার কার্যকারিতা অনেকটা প্রত্যক্ষ (direct)। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন অন্যান্য ব্যাঙ্কের সুদের হারকে না-ও প্রভাবিত করিতে পারে, খোলাবাজারী কার্য-কলাপও অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের ঋণনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। কিন্তু এই নীতি ব্যাঙ্কের ঋণ দিবার ক্ষমতাকে সরাসরিভাবে কমাইতে বা বাড়াইতে পারে। সরকারী ঋণের পরিমাণ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ঋণপত্রের পরিমাণ—এই সকল বিষয়ের উপর খোলাবাজারী নীতির কার্যকারিতা নির্ভর করে, কিন্তু পরিবর্তনীয় জমার নীতি ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত

ব্যাঙ্করেট ও খোলা বাজারী নীতির সহিত ইহার তুলনা

হয় না। এই সকল কারণে অধ্যাপক সেয়ার্স ও আরও অনেকে অপূর্ণোন্নত দেশে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ সুপারিশ করিয়াছেন।

কিন্তু অনেকে অপূর্ণোন্নত দেশে এই নীতি কার্যকরী হয় না বলিয়া মনে করেন। বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থা আলোচনা করিয়া Mr. Plumptre এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, এই নীতিতে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। তিনি বলেন যে, এই নীতি কার্যকরী হইতে গেলে দুইটি শর্ত স্বীকার করিতে হয়: (ক) ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের নগদ রিজার্ভের অনুপাত অনুযায়ী ঋণ দেয়, এবং (খ) তাহারা মোট আমানত ও নগদ জমার মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষা করে। কিন্তু Mr. Plumptre-র মতে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাঙ্কসমূহ সর্বদা-নজর রাখে কি-পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা তাহাদের হাতে আছে, স্থানীয় টাকার নগদ ব্যালান্সের প্রতি তাহাদের ততটা নজর নাই। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কগুলি নির্দিষ্ট অনুপাতে রিজার্ভ রাখার নীতি মানিয়া চলে না। নগদ জমার পরিমাণ ও অনুপাত তাহারা কখনও খুব বেশি বা কখনও খুব কম রাখে; তাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভের অনুপাত অল্প একটু-আধটু বদল করিলে তাহাদের ঋণনীতি বিশেষ প্রভাবিত হয় না। সর্বোপরি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জমার অনুপাত বাড়াইলে যদি তাহাদের ঋণযোগ্য টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়, তবে তাহারা সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট কিছুটা বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করিয়া স্থানীয় নগদ টাকার ভাণ্ডার বাড়াইয়া তোলে। Mr. Per Jacobsson-ও এইরূপে আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যাঙ্কের ঋণনীতি স্থির করার পূর্বে সে বহু বিষয়ের উপর নজর রাখে, উহার মধ্যে নগদ জমার অনুপাত হইল মাত্র ক্ষুদ্র একটি বিষয়। তাই কেবল ইহাতে পরিবর্তন আনিয়া ব্যাঙ্কের ঋণ-পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নয়। এই সকল আপত্তি ছাড়াও এই নীতির বিরুদ্ধে আর এক ধরনের যুক্তি দেখানো হয়। বলা হয় যে, এই নীতি জটিল, অনমনীয় ও পক্ষপাত দোষ-দুষ্ট (clumsy, inflexible and discriminatory)। খোলাবাজারী নীতিতে অল্প একটু পরিবর্তন ঘটানো যায়, কিন্তু নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন সারা দেশের ঋণব্যবস্থাকে বিপুলভাবে নাড়া দিতে পারে। ইহার নমনীয়তা নাই, কারণ দেশের কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে টাকার বাড়তি বা ঘাটতি দেখা দিলে এই নীতি প্রয়োগ করা চলে না। রিজার্ভের অনুপাতে পরিবর্তন সারা দেশের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। অপূর্ণোন্নত দেশে অনেক সময়

অনেকে বলেন এই নীতি কার্যকরী হয় না

আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, কিন্তু এই নীতি সেই লক্ষ্য সাধনে সমর্থ নয়। ইহা পক্ষপাতদুষ্ট, কারণ বড় ব্যাঙ্ক ইহাতে বিচলিত হয় না, কিন্তু ছোট ব্যাঙ্কগুলি বিব্রত হইয়া পড়ে। আরও বলা হয় যে, রিজার্ভের অনুপাত বদলাইলে উহার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ভাল নয়, কারণ ইহাতে দেশের শেয়ার-বাজারের স্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হইতে পারে।

তবুও অনেক ইহাকে বাদ দিতে চান না

এই সকল সমালোচনা সত্ত্বেও অনেক ধনবিজ্ঞানী ইহার প্রয়োগ পছন্দ করেন। যে সকল অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হইল, উহাদের দূর করিয়া এই নীতিকে কিছুটা কার্যকরী করিয়া তোলা যায়। যেমন, সেয়ার্স (Sayers) বলেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর বা বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যাঙ্ককে বিভিন্ন হারে জমার অনুপাত রক্ষা করিতে হইবে এইরূপ নীতি ঘোষণা করা চলে। অতি অল্প পরিমাণে জমার অনুপাত বদলাইতে থাকিলে দেশে হঠাৎ ইহার বিরূপ প্রভাব না-ও দেখা দিতে পারে।

অপূর্ণোন্নত দেশে উপরের এই সকল নীতির তুলনায় ঋণনিয়ন্ত্রণের বাছাই-পদ্ধতিসমূহ (selective methods of credit control) অনেক বেশি কার্যকর। এই সকল দেশে উপকরণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে এমনভাবে উপকরণের নিয়োগ পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে শিল্পসম্প্রসারণ দ্রুত হইতে পারে। তাহা ছাড়া, সমাজের দিক হইতে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া উপকরণের অপব্যয় না হয় তাহাও দেখা দরকার। এই সকল উদ্দেশ্যে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ও দিক নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। তাই বাছাই-পদ্ধতিসমূহ (selective methods) অধিকতর কার্যকরী। বাছাই-

বাছাই করার নীতি

পদ্ধতিসমূহ প্রধানত দুইটি : প্রয়োজনীয় মার্জিনের অনুপাতে পরিবর্তন এবং ভোগ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের কিস্তিতে পরিবর্তন। এই সকল দেশে ভোগ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় এখন পর্যন্ত এমন ব্যাপক স্তরে উন্নীত হয় নাই, যেখানে কিস্তিবন্দী ক্রয়-বিক্রয়ের বিপুল প্রসার হইয়াছে। তাই এই নীতির কার্যকারিতা ততটা নাই। কিন্তু প্রয়োজনীয় মার্জিনের অনুপাতে পরিবর্তনের নীতি খুবই কার্যকরী এবং ইহার প্রয়োজনীতাও খুব বেশি। তাই 1949 সালের ভারতীয় ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই ক্ষমতা দিয়াছে। আমাদের দেশে ইহার প্রয়োগও করা হইয়াছে, যেমন, ভারতে খাদ্যদ্রব্যের ফাটকাবাজি বন্ধ করার জন্য 1956 সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

নির্দেশ দিয়াছিলেন, যেন ব্যাঙ্কঋণের সাহায্যে খাদ্যশস্যের ফাটকাবাজি না হয়।

অপূর্ণোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে অনেক সময়ে বলা হয় যে, এই সকল দেশে টাকার বাজারে কিছুটা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত। সাধারণ ব্যাঙ্কেরা যে-সকল কাজ করে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরও সেইরূপ কিছু কিছু কাজ করা প্রয়োজন। ঋণনিয়ন্ত্রণের জন্য এইরূপ ক্ষমতা উহার হাতে থাকা দরকার যে, প্রয়োজন মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সোজাসুজি বাজারে প্রবেশ করিয়া যাহাকে খুশি ঋণ দিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইরূপ নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং যাহাতে নিজের ব্যাঙ্করেট বাজারে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে সেইজন্য কিছু কিছু বিল কেনা-বেচার পথও অবলম্বন করিয়াছিলেন। কোন কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট হইতে তাঁহারা আমানতও গ্রহণ করেন। টাকার বাজারের সহিত নিয়মিত ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা, টাকার দাম ও ব্যাঙ্কের নীতিকে প্রভাবিত করা, টাকার বাজারের অসংলগ্ন অংশসমূহের মধ্যে টাকার দাম ও পরিমাণে মোটামুটি সমতা রক্ষা করা—এই সকল উদ্দেশ্যে অনেকেই ইহাকে সমর্থন করেন। দেশে ব্যাঙ্কব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন এবং উপযুক্ত উৎকর্ষের স্তরে পৌঁছানো, এই নীতির দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন ব্যবসায়ে মূলধনের নিয়োগ পরিকল্পনা অনুযায়ী করিতে হইলে এইরূপ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে নিশ্চয় থাকা দরকার।*

কিছুটা সাধারণ ব্যাঙ্কিং-এর কাজ করা দরকার

* "The tendency for the lopsided distribution of credit is to be found in the less developed economies. One important characteristic of most of these countries is their reliance upon the production of a few commodities for export. This may induce the businessmen to concentrate their activities on the already known lines of production and to neglect the development of new industries. Moreover, these countries seem to be determined to crowd into the compass of 5 to 10 years the developments that took 50 or more years in the older countries. The authorities should naturally like to retain in their hands control over the misuse or direction of the limited resources...This has involved not only attempts to extend the sphere of influence of Central Banks into the comparatively inaccessible or inadequately organised branches of the short-term market, but even incursions into the domain of long term finance, whith is traditionally regarded as lying outside the proper interest of the Central Banks."

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা (British Banking System)

পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যাঙ্ক হইল ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড। 1694 সালে পার্লামেণ্টের আইন দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহার পর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির নমুনা (Model) হিসাবে ইহা গণ্য হইয়াছে। গঠনের সময় হইতে বেসরকারী শেয়ার ক্রেতাগণ ইহার মালিক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 1946 সালের ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড আইন অনুযায়ী সমস্ত শেয়ার রাষ্ট্র কিনিয়া লইয়াছে। বর্তমানে ইহার পরিচালনা করেন একটি কোর্ট। ইহাতে আছেন একজন গবর্ণর,—একজন ডেপুটি গবর্ণর এবং ষোল জন ডিরেক্টর—সকলেই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত। গবর্ণর এবং ডেপুটি গবর্ণর পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন, আর ডিরেক্টরগণ চার বৎসরের জন্য। ইহারা প্রত্যেকেই পুনর্নিযুক্ত হইতে পারেন।

ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের গঠন

ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের সমস্ত কাজকর্ম উহার দুইটি বিভাগের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়—ইস্যু বিভাগ ও ব্যাঙ্কিং বিভাগ। ইস্যু বিভাগের কাজ হইল নোট প্রচলন করা। Fixed Fudiciary Limit System অনুযায়ী ইংলণ্ডের নোট প্রচলন করা হইয়া থাকে। 1450000 পাউণ্ড পর্যন্ত কোন স্বর্ণ মজুত না রাখিয়া নোট প্রচলন করা চলে, উহার উপরে প্রচলিত নোটের শতকরা 100 ভাগই স্বর্ণে জমা রাখিতে হয়। স্বর্ণ মজুতের এই রীতি এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, যদিও মনে রাখা দরকার যে, কাগজের এই নোটগুলি স্বর্ণে রূপান্তর যোগ্য নয়।* 1939 সাল হইতে দেশের স্বর্ণমজুতের পরিমাণ বিনিময়ের সমতা সাধনকারী অ্যাকাউণ্টে (Exchange Equalisation Account) জমা রাখা হইয়াছে।

কাজকর্ম : ইস্যু বিভাগ

ব্যাঙ্কিং বিভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সকল প্রকার কাজ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বিশেষত্ব এই যে, যদিও ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড সকল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে ঋণ দিতে রাজি আছে এবং তাহাদের দ্বারা উপস্থাপিত বিলগুলিকে প্রয়োজন হইলে পুনরায় ভাঙ্গাইয়া দিতে রাজি আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক

---

* প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পরিচালকবৃন্দের সভায় ব্যাঙ্কের পরিচালন সম্পর্কীয় যাবতীয় নীতির পর্যালোচনা করা হয়, ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ বহুদিন যাবৎ এই ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

দরকার হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে টাকা চাহিতে যায় না। ব্যাঙ্কগুলির হঠাৎ টাকার দরকার হইলে তাহারা বিল-ব্রোকারদের দেওয়া ঋণ ফেরৎ চায় এবং এই বিল-ব্রোকাররা তখন ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নিকট হাজির হয় ঋণ বা পুনরায় ডিসকাউণ্টের সুবিধা পাইবার জন্য। এইরূপ অবস্থায় বলা হয়, যেন বাজার ব্যাঙ্কের নিকট হাজির হইয়াছে ("to go into the bank")।

ব্যাঙ্কিং বিভাগ

বৃটিশ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিল-ব্রোকার এবং ডিস্-কাউণ্ট হাউসগুলির কার্যকলাপ। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত তাহাদের নিয়মিত গ্রাহকদের নিকট হইতে পাওয়া বিলগুলি ডিস্কাউণ্ট করে। কিন্তু বেশির ভাগ বিল তাহাদের নিকট হাজির করে এই বিল-ব্রোকাররা। ডিস্কাউণ্ট হাউসগুলি বিলের ব্যবসায়ে বিশেষ পারদর্শী, কোন বিল ভাল বা মন্দ তাহা চিনিতে পারার বিষয়ে তাহাদের দক্ষতা খুবই বেশি। টাকা কম পড়িলে এই ডিস্কাউণ্ট হাউসগুলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট ধার লইতে যায় অথবা এই বিলগুলি পুনরায় ভাঙ্গাইবার জন্য উপস্থিত হয়। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেরা যদি ঋণ সংকোচনের নীতি গ্রহণ করে, অর্থাৎ ডিস্কাউণ্টের ও পুনর্ডিস্কাউণ্টের সুবিধা তুলিয়া লইতে থাকে, তবে এই ডিস্কাউণ্ট হাউসগুলি ঋণের জন্য বা বিলগুলিকে ভাঙ্গাইবার জন্য ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নিকট ছুটিয়া যায়। ব্যাঙ্ক এবং ডিস্কাউণ্ট হাউসগুলি যে-সকল বিল লইয়া কাজকর্ম করে সেগুলি সবই বৈদেশিক বিনিময় বিল (Foreign Bills of Exchange)। সাধারণত ইংলণ্ডে আভ্যন্তরীণ বিনিময়-বিল লইয়া লেনদেন বিশেষ করা হয় না। সাধারণত, ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের ডিস্কাউণ্টের হার অর্থাৎ ব্যাঙ্করেট ব্যাঙ্কগুলির বিল ভাঙ্গাইবার রেট অপেক্ষা অর্থাৎ ডিস্কাউণ্টের রেট অপেক্ষা বেশি।

বৃটেনের টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য

ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিংএর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, দেশের পাঁচটি বৃহৎ ব্যাঙ্ক তাহাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা লইয়া সারা দেশের টাকার বাজারে লেনদেন করে। এইরূপ শাখা-ব্যাঙ্কিংয়ের ফলে ব্যাঙ্ক পরিচালনার খরচ অনেক কম এবং খুব কম পরিমাণ নগদ জমা লইয়া তাহাদের পক্ষে ব্যবসায় পরিচালনা সম্ভবপর হয়। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যাঙ্করেট নীতি, খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি এবং অনুরোধ-উপরোধের নীতি প্রয়োগ

ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির বৈশিষ্ট্য

করেন। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি নিম্নতম কি-পরিমাণ নগদ টাকা জমা রাখিবে তাহা আইনের দ্বারা কোনরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই। তাই নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তনের নীতি এই দেশে প্রয়োগ করা চলে না। কিন্তু ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নিজস্ব সম্মান খুবই বেশি, তাহা ছাড়া ওই দেশে স্বল্পকালীন টাকার বাজার খুবই অনুভূতিশীল ও উন্নত ধরনে সংগঠিত—এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী।

ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Federal Reserve Bank)—সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বারোটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রতিটি অঞ্চলের জন্য নিজস্ব এক একটি ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে। যে-কোন অঙ্গরাজ্যে নিজস্ব আইনের অধীনে কোন একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং ইহাকে যে ফেডারাল রিজার্ভ ব্যবস্থার সভ্য হইতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। কিন্তু ফেডারাল রিজার্ভ আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাকে ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সভ্য হইতে হইবে; এই অবস্থায় তাহাকে নিজ অঞ্চলের ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় করিতেই হইবে। এইরূপ জাতীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা মোট ব্যাঙ্কের অর্ধেক। কিন্তু ইহাদের আমানতের পরিমাণ দেশের মোট আমানতের $\frac{5}{6}$ অংশ।

আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

1913 সালের ফেডারাল রিজার্ভ আইন অনুযায়ী ওয়াশিংটনে একটি উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন ফেডারাল রিজার্ভ বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। এই বোর্ডেরই বর্তমান নাম হইল ফেডারাল রিজার্ভ সিস্‌টেমের বোর্ড অফ গবর্ণরস্‌। এই বোর্ডই প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, এবং বারোটি ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইল কার্যত ইহার শাখা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত (সেনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে) সাতজন সভ্য লইয়া এই বোর্ড অফ্‌ গবর্ণরস গঠিত। প্রতি দুই বৎসর অন্তর একজন সভ্য পদত্যাগ করিয়া থাকেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ভাইস্‌ চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চার বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। ইহা ছাড়া একটি ফেডারাল উপদেষ্টা কাউন্সিল (Federal Advisory Council) আছে, ইহা প্রতিটি ফেডারাল রিজার্ভ জিলা হইতে একজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। এই বোর্ডের খোলাবাজারী কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য একটি ফেডারাল খোলাবাজারী

তবে সব ক্ষমতাই বোর্ড অফ্‌ গভর্ণরের হাতে

কার্যকলাপ কমিটি আছে (Federal Open Market Committee), বোর্ডের সাতজন সভ্য এবং ফেডারাল রিজার্ভ' ব্যাঙ্কগুলি হইতে পাঁচজন প্রতিনিধি লইয়া ইহা গঠিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে খোলা-বাজারী কার্যকলাপ এবং ব্যাঙ্করেট পরিবর্তনের নীতি প্রয়োগ করা হয়। ফেডারাল রিজার্ভ বোর্ড অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড-এর ন্যায় সভ্য ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ আদান-প্রদান সম্পর্কে, অনুরোধ বা উপদেশ জানান। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলি কি-হারে নগদ টাকা জমা রাখিবে তাহা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট এবং বোর্ড অফ্ গবর্ণরের হাতে এই অনুপাত পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। বাছাই-বিনিয়োগের নীতি এবং ঋণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের নীতি (Selective and Qualitative credit controls) আমেরিকাতে গত কুড়ি বৎসরে ক্রমশ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

ঋণনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি-সমূহ

আমেরিকার ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য করিয়া থাকেন। কোন সভ্য ব্যাঙ্ক তাহার নিকট কোন বিল লইয়া আসিলে তিনি ঐ বিলগুলি ভাঙ্গাইয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত আছেন। মার্কিন ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকা কম পড়িলে তাহারা সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কেরা এইরূপ অবস্থায় বিল ব্রোকার এবং ডিস্কাউণ্ট-হাউসগুলিকে বাধ্য করে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নিকট হইতে ঋণ লইতে। আধুনিক কালে আমেরিকায় দেখা যাইতেছে, যে কোন একটি ব্যাঙ্কের টাকা কম পড়িলে সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট না গিয়া অপর কোন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইতে পারে। তাহা ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলি আইনত প্রচুর পরিমাণ সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া রাখিতে পারে। নগদ টাকা কম পড়িলে সাময়িকভাবে বাজারে সে ঋণপত্রগুলি বিক্রয় করিয়া দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির সহিত এইরূপ ঋণ আদান-প্রদান সম্পর্কে থাকায় খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি ততটা সাফল্য লাভ করিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলিতে নগদ জমার অনুপাত বেশি বলিয়া তাহারা নগদ জমার পাঁচ ছয়গুণের বেশি ঋণ সৃষ্টি করিতে পারে না। অপর পক্ষে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলিতে নগদ জমা কম রাখা হয় বলিয়া তাহারা নগদ আমানতের প্রায় $12\frac{1}{2}$ ঋণ প্রসার করিতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সহিত তাহার সম্পর্ক

ইংলণ্ড ও আমেরিকার ব্যাঙ্কব্যবস্থার তুলনা (Comparison between British and U.S. Banking system)

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করিলে প্রথমেই চোখে পড়ে উভয় দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এর মধ্যে পার্থক্য। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কিংজগতে যেমন বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রাধান্য (Big Five) আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেইরূপ নাই। ইংলণ্ডের সকল শহরেই পাঁচ-ছয়টি বৃহৎ ব্যাঙ্কের শাখা দেখিতে পাওয়া যায়, মোটামুটি ইহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য বা কাজকর্মের ধরন একই। কিন্তু আমেরিকায় শাখা ব্যাঙ্কিং এর প্রসার ঘটে নাই, এক একটি অঞ্চল লইয়া এক একটি ব্যাঙ্ক নিজের ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। শুধু তাহাই নয়। এই সকল বিভিন্ন ইউনিট-ব্যাঙ্কগুলির সকলে সমান ধরনের কাজ করে না। কাহারও কৃষিতে ঝোঁক, কাহারও শিল্পে, কাহারও-বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে—তাহা ছাড়া কাজকর্মের খুঁটিনাটি ধরনেও অনেক পার্থক্য দেখা যায়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এর রীতিনীতিতে এত বৈচিত্র্য থাকায় দুই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজকর্মের ধরনও কিছুটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।*

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এ পার্থক্য

ইংলণ্ডে কয়েকজন ব্যক্তি একত্রে বসিয়া আলাপ-আলোচনা করিলে দেশের ব্যাঙ্কিংনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসিতে পারে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও তাহার ইচ্ছা অনিচ্ছা ও সুবিধা-অসুবিধার কথা কয়েকজনকে জানাইলেই ব্যাঙ্কিং জগতকে নিয়ন্ত্রণের কাজ সহজ হইয়া যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে 14000 স্বয়ংস্বাধীন ব্যাঙ্ক আছে, বহু সহস্র ব্যক্তি নিজেদের ব্যাঙ্কার বলিয়া দাবি তুলিতে পারে, বিস্তৃত অঞ্চলে ইহারা ছড়ানো ও বিক্ষিপ্ত। নিউ ইয়র্কের ব্যাঙ্কারদের বা ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি ইহাদের বশ্যতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলতি আমানতের পরিমাণ ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক বেশি।

* "The development of nationwide branch banks has been prevented by law and still more by the traditional feelings in which the legal restrictions are deeply entrenched. These feelings derived to some extent from the historical fear of the newer west for the money power of the older east; they also express the more general feeling in every region against remote control, and the distrust of any incipient monopoly of finance. The laws restricting branch banking are essentially those of the forty eight states, and they vary from one state to another." Sayers, *Modern Banking*. P. 257.

ঋণ দিবার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, তাহাদের মাঝারি সময়ের জন্য ঋণ বেশি, বন্ধকী-ঋণও (দীর্ঘকালীন) আছে। বর্তমান কালে ভোগের উদ্দেশ্যে ঋণের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংলণ্ডে এই সকল দেখা যায় না। লণ্ডনের বাজারে ব্যাঙ্কগুলি সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার করে না, দরকার হইলে ডিস্‌কাউন্ট মার্কেটে চাপ দেয় এবং বিল-ব্রোকাররা তখন বাধ্য হইয়া ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নিকট ছুটিয়া আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ ঘটে না। সেখানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার পায়। ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলি অনেক সময় বড় বড় ব্যাঙ্কের নিকট নিজেদের ব্যালান্স আমানতী হিসাবে জমা রাখে। ইংলণ্ডে এইরূপ কখনও ঘটে না।

বহু বিষয়ে এই পার্থক্য দেখা যায়

আমেরিকায় প্রচুরসংখ্যক ব্যাঙ্ক থাকার ফলে এবং ভৌগোলিক দিক হইতে বিক্ষিপ্ত থাকার দরুণ ক্লিয়ারিং ও টাকা লেনদেনের ব্যাপারে বহু জটিলতা ভোগ করিতে হয়। ইংলণ্ডে মোটেই এত অসুবিধা নাই। এই জটিলতার দরুণ যুক্তরাষ্ট্রে একজন আমানতকারীকে যতটা কমিশন ও পারিশ্রমিক দিতে হয়, ইংলণ্ডে তাহাপেক্ষা এই সকল দেয় র পরিমাণ অনেক কম। 1929-30 সালের ব্যাঙ্কিং-সংকটের পর হইতে দেশের অধিকাংশ আমানতই বীমাবদ্ধ হইয়া আছে। এইজন্য ফেডারাল আমানত-বীমা করপোরেশন (Federal Deposit Insurance Corporation or F. D. I. C.) গঠিত হইয়াছে। কোন ব্যাঙ্কের প্রতিটি আমানতকারীর 10000 ডলার পর্যন্ত এই বীমার দ্বারা সংরক্ষিত ; ফলে বৃহৎ কোম্পানী ও অতি ধনীব্যক্তি ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিবাসীদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় লোকসান যাইবার কোন ভয় নাই। একটি ব্যাঙ্ক এইরূপে বীমাবদ্ধ হইলে F. D. I. C. তাহার হিসাবপত্র সম্পর্কে খোঁজখবর রাখিবার অধিকারী। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অনেক ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারেন। এইরূপ কোন ব্যবস্থা ইংলণ্ডে নাই।

ইংলণ্ডে সাধারণত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কগুলি অতি অল্পকালীন ঋণদান করে। ব্যাঙ্কের হাতে টাকার পরিমাণ বেশি থাকিলেও তাহারা মোটামুটি এই নীতি মানিয়া চলে। কিন্তু আমেরিকায় 1939 সালের পর হইতেই টার্ম লোন (term loan) ও ক্রেতা-ঋণ (consumer credit) দেখা দিয়াছে। চার বা পাঁচ বৎসরের জন্য ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের এই ঋণ দেওয়া হয়। ইংলণ্ডের

তুলনায় আর একটি পার্থক্য হইল যে, ইংলণ্ডে অনেক সময়ে মুখের কথায় বা চিঠির আদান-প্রদানে ঋণের লেনদেন হয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঋণের ব্যাপারে বহুপ্রকার কাগজপত্র, উকিল-মুহুরী ও দলিল লেখাপড়ার দরকার হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে কি-পরিমাণ নগদ জমার অনুপাত হইবে তাহা নির্ভর করে আইনের উপর ; ফেডারাল রিজার্ভ ব্যবস্থা বা কোন কোন অঙ্গরাজ্য (member-state) এইরূপ আইন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডে এইরূপ কোন আইন নাই, ব্যাঙ্কগুলি মোটামুটি সর্বসম্মত একটি প্রথা মানিয়া চলে। সর্বোপরি, সারা ইংলণ্ডে সকল স্থানে ব্যাঙ্কে সমান প্রকার ঋণে সুদের হার সমান—এইরূপ অবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না।

এই সকল পার্থক্যের ফলেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-এ পার্থক্য

উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায়, উভয়েরই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে শক্তি ও ক্ষমতার উৎস হইল ইহারা নগদ টাকা জোটাইবার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড যে-রূপ টাকা প্রচলন করে, আমেরিকাতেও সেইরূপ ফেডারাল ট্রেজারী কর্তৃক বুলিয়ন সার্টিফিকেট (Bullion Certificates) প্রচলিত করা হয়। বৃটেন এবং আমেরিকা উভয় দেশেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত তাহাদের টাকাকে দরকার মত নগদ টাকা বা তরল সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করে। উভয় দেশেই সাধারণ ব্যাঙ্কেরা প্রয়োজন হইলে নগদ টাকার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়। উভয় দেশেরই ব্যাঙ্করেট অপেক্ষা বাজারের সুদের হার উর্ধ্বে।

উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিংয়ে এইরূপ সমতা থাকা সত্ত্বেও পার্থক্য কম দেখা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেকটা বিকেন্দ্রিক ধরনের। বারোটি ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং একটি ফেডারাল বোর্ড সকলেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিংয়ের কোন না কোন কর্তব্য করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড নিজ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্তৃত্ব যেন কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছে। ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড একটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলির মালিক হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ব্যাঙ্কেরা।

উভয় দেশের ইতিহাস, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের ধারা, জাতিগত বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রভেদ—সকল কিছু মিলিয়া এই সকল পার্থক্য গড়িয়া তুলিয়াছে।

অনুশীলনী

1. Discuss the necessity of a Central Bank in a country.

2. What is a Central Bank and in what respects it is different from ordinary banks ?

3. What is a Central Bank ? Do you support its Nationalisation ? What is its relation to the state ?

4. Discuss the functions of a typical Central Bank.

5. "The Central Bank operates as a bankers' bank and a lender to them of last resort." Elucidate.

6. Discuss the validity of the argument used to support the following propositions : (a) A Central Bank should not undertake ordinary banking business with public, (b) A Central Bank should have a monopoly of note-issue.

7. Consider the need for controlling money supply. Briefly enumerate the more important methods which the Central Bank of a country may adopt in order to control such supply.

8. Discuss the more important methods of controlling the volume of credit. What are their limitations ?

9. How does a modern bank control the quantity and quality of credit ?

10. What is a Bank Rate ? Discuss the effects of the Bank Rate on general prices, trade and industry.

11. What are open market operations ? How do they affect the volume of currency ?

12. Discuss the efficacy of monetary measures in controlling fluctuations in the price level.

13. How and how far a Central Bank can maintain monetary equilibrium ?

14. Discuss the operations of (a) Bank of England, and (b) Federal Reserve System.

15. Distinguish between the banking systems of the U. K. and the U. S. A.

16. Discuss the problems of Central Canking in uoderdeveloped money markets.

17. Discuss how far Bank Rate and Open Market Operation policies are suitable in the underdeveloped economies.

৬

আর্থিক তত্ত্ব : টাকার মূল্য ও তাহার পরিমাপ

Monetary theory : the value of money and its measurement

টাকার বিনিময়ে যে সকল জিনিসপত্র পাওয়া যায় তাহারাই টাকার মূল্য। কিছুকাল পূর্বের তুলনায় বর্তমানে টাকার বিনিময়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গেলে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা হয় : আবার পূর্বের তুলনায় দ্রব্যসামগ্রী কম পরিমাণে পাওয়া গেলে টাকার মূল্য হ্রাস হইয়াছে বলা চলে।

অর্থের মূল্য

টাকার বিনিময়ে দেশে কি-পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহা নির্ভর করে দামস্তরের (Price-level) উপর। দামস্তর ঊর্ধ্বাভিমুখী হইলে টাকার মূল্য কমিয়া আসে ; দামস্তর নিম্নাভিমুখী হইলে টাকার মূল্য বাড়িয়া যায়।

কিন্তু কিছু সময়ের ব্যবধানে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সমাজে কোন কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে, কোন কোন দ্রব্যের দাম কমিয়া গিয়াছে—সকল দ্রব্যের দামে একই সঙ্গে বৃদ্ধি বা একই সঙ্গে হ্রাস সচরাচর দেখা যায় না। ইহাদের দামে বৃদ্ধির বা হ্রাসের হারেও তারতম্য থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড় (average) হয় ঊর্ধ্বমুখী অথবা নিম্নগামী ; সকল দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় ঝোঁক থাকে। সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের এই গড়ের নাম হইল দামস্তর। বিভিন্ন সময়ের দামস্তরগুলিকে পাশাপাশি সাজাইলে সূচক-সংখ্যা (Index Number) পাওয়া যায়। কোন বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড়কে, অপর কোন সময়ের একই দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড়ের সহিত তুলনা করিতে হইলে এই সূচক সংখ্যা ব্যবহার করিতে হয়।

দামস্তর

সূচক সংখ্যা

যে-বৎসরের দামস্তরের সহিত পরবর্তী কোন বৎসরের দামস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে, তাহাকে বলা হয় মূল বৎসর (Base year)। সেই

মূল বৎসরের সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় এবং প্রত্যেকটি দামকে 100 হিসাবে ধরিতে হয়। তাহার পর, যে-বৎসরের দামস্তরে পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে সেই বৎসরের পূর্বোক্ত দ্রব্যসামগ্রীর দামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া মূল-বৎসরের দামসমূহের সহিত তুলনামূলক পরিবর্তন হিসাব করিতে হয়; 100-র তুলনায় আনুপাতিক ভাবে তাহাদের হ্রাস বা বৃদ্ধির হিসাব করা হয়। অবশেষে উভয়ের গাণিতিক গড় (Arithmetic average) নির্ণয় করিয়া মূল বৎসরের তুলনায় পরবর্তীকালের দামস্তরে পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারা যায়। নিচের উদাহরণ হইতে ইহা বুঝা যাইবে।

কিভাবে সূচক-সংখ্যা গঠন করিতে হয়

1939 সাল (মূল বৎসর)		1947 সাল (হিসাবী বৎসর)
চাল—প্রতি মণ 4 টাকা = 100	... ...	16 টাকা = 400
ডাল—প্রতি মণ 10 টাকা = 100	... ...	20 টাকা = 200
জুতা—প্রতি জোড়া 5 টাকা = 100	... ...	$7\frac{1}{2}$ টাকা = 150
চা—প্রতি পাউণ্ড 4 টাকা = 100	... ..	3 টাকা = 75
400÷4 = 100		825÷4 = $206\frac{1}{4}$

উপরের উদাহরণে দেখা যাইতেছে, কয়েকটি দ্রব্যের দামের সাহায্যে প্রস্তুত সূচকসংখ্যাতে 1939 সালের তুলনায় 1947 সালে দামস্তর শতকরা $106\frac{1}{4}$ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থের সহিত বিনিময় হয় এরূপ যত অধিক দ্রব্যসামগ্রী লইয়া হিসাব করা হইবে, সেই সূচক সংখ্যা তত সঠিকভাবে অর্থের সাধারণ ক্রয়শক্তিতে (general purchasing power of money) পরিবর্তন পরিমাপ করিতে পারিবে।

কিন্তু এইভাবে হিসাব করার একটি বিশেষ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। সকল দ্রব্যকে সমান গুরুত্ব দিয়া হিসাব করিলে সেই সূচক সংখ্যা নির্ভুল হইতে পারে না, কারণ দেশের সকল ক্রেতা তাহাদের ভোগ-পরিকল্পনায় সকল দ্রব্যকে সমান গুরুত্ব দেন না। তাই সকল দ্রব্যের দামে পরিবর্তন তাহাদের জীবনযাত্রার মানে, অর্থাৎ তাহাদের নিকট অর্থের ক্রয়-ক্ষমতাতে পরিবর্তনের সঠিক পরিমাপ করিতে পারে না। সমাজের ব্যয়-কাঠামোতে (Expenditure structure) দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব অবহেলা করা চলে না। গণিতের

বিভিন্ন দ্রব্যে যথাযোগ্য গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয়তা

হিসাব বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত না-ও করিতে পারে। সমাজের অধিকাংশ লোকের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অল্প পরিবর্তন সমাজের অল্পাংশ লোকের পক্ষে কম-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অধিক পরিবর্তন অপেক্ষা বাস্তব ক্ষেত্রে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ, গণিতের হিসাবে চালের দাম বৃদ্ধি টর্চের দামে হ্রাসের ফলে খণ্ডিত হইয়া যাইতে পারে, সূচক সংখ্যায় সেই পরিবর্তন প্রতিফলিত না ও হইতে পারে, অথচ এইরূপ পরিবর্তন নিশ্চয়ই টাকার সাধারণ ক্রয়শক্তি অর্থাৎ জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন আনিয়াছে, অর্থাৎ ব্যক্তির নিকট অর্থের বাস্তব মূল্য বদ্‌লাইয়া দিয়াছে।

গুরুত্বশীল সূচকসংখ্যা

এই অসুবিধা দূর করার জন্য দেশে গুরুত্বশীল সূচক সংখ্যা (weighted index number) গঠন করা হয়। দেশের মোট ব্যয়ের মধ্যে কত অংশ একটি দ্রব্যের পিছনে ব্যয়িত হইতেছে তাহা হিসাব করিয়া সমাজের ব্যয়-কাঠামোতে প্রত্যেকটি দ্রব্যসামগ্রীর গুরুত্ব অনুধাবন করা হয় এবং মূল ও হিসাবী বৎসরের দামগুলিকে সেই পরিমাণ গুরুত্ব দিয়া পূরণ (Multiplication) করিয়া গুরুত্বশীল সূচকসংখ্যা গঠন করা হয়। নিচের তালিকা হইতে ইহা দেখা যাইতেছে। পূর্বের সরল সূচক সংখ্যাটিকে গুরুত্ব দিয়া নূতন ভাবে হিসাব করা হইয়াছে।

	মূল বৎসর	হিসাবী বৎসর
	গুরুত্ব	গুরুত্ব
চাল	100×8=800	400×8=3200
ডাল	100×6=600	200×6=1200
জুতা	100×5=500	150×5= 750
চা	100×1=100	75×1= 75
	2000÷20=100	5225÷20=261¼

গুরুত্বহীন সূচক সংখ্যায় দামস্তরে বৃদ্ধি হইয়াছিল শতকরা 109¼ ; কিন্তু উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়ার পরে দেখা যাইতেছে ইহাতে বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা 161¼।

সূচকসংখ্যা গঠনের ও ব্যবহারের বহু বাস্তব (Practical) অসুবিধা এবং তত্ত্বগত (Theoretical) ত্রুটি আছে। প্রথমত, মূল বৎসর নির্বাচনের অসুবিধা। যে-মূল বৎসরের দামস্তরের সহিত অন্যান্য বৎসরের দামস্তরের তুলনা-

মূলক পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে, সেই বৎসরটি স্বাভাবিক হওয়া চাই, সেই বৎসরে অর্থের মূল্যকে স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করা দরকার।। কিন্তু যুদ্ধ-প্রস্তুতি, যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর অবস্থার প্রায় সকল বৎসরই কমবেশি অস্বভাবিক। তবে, এই সকল অসুবিধা দূর করার জন্য অনেক সময় কয়েক বৎসরের দ্রব্য-সামগ্রীর দামের গড়কে মূল বৎসরের দাম হিসাবে গণনা করা হয়। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যসামগ্রী নির্বাচনের অসুবিধা। যদি অর্থের সাধারণ ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন হিসাব করিতে হয়, তাহা হইলে যত অধিক সংখ্যক দ্রব্যের দাম গ্রহণ করা হইবে, ততই সেই সূচক সংখ্যা সঠিক ও অধিক প্রতিনিধিত্বমূলক হইবে। যে-উদ্দেশ্যে সূচক সংখ্যা প্রস্তুত করা হইতেছে, সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে কলেজের ছাত্রদের দ্বারা ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর দাম হিসাব করিলে ভুল হইবে। তৃতীয়ত, দাম নির্বাচনের অসুবিধা। দ্রব্য-সামগ্রীর পাইকারী দাম জানিতে পারা সুবিধাজনক, এই কারণে অনেক সময় পাইকারী দামের সাহায্যে সূচক সংখ্যা গঠনের চেষ্টা করা হয়; কিন্তু বাস্তবপক্ষে জনসাধারণ খুচরা দামেই দ্রব্য ক্রয় করে, খুচরা দামের পরিবর্তনই তাহাদের নিকট অর্থের মূল্য বা ক্রয়শক্তির পরিবর্তন হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু সকল দ্রব্যের খুচরা দাম সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে একই দ্রব্যের খুচরা দামে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। চতুর্থত, গড় নির্ণয়ের বহু পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করিলে কিছুটা তারতম্য ঘটিয়া থাকে। পঞ্চমত, গুরুত্বশীল সূচক সংখ্যা গঠনেও বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। ব্যয়-কাঠামোতে দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব নির্ধারণে বিশেষ সহজ নয়, প্রত্যেক পরিবারের ব্যয়-কাঠামো অন্য পরিবারের ব্যয়-কাঠামো হইতে পৃথক। বিভিন্ন পরিবর্ত-দ্রব্য বা অনুপূরক দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে বা নূতন দ্রব্য প্রচলনের ফলে ব্যয়-কাঠামোতে দ্রব্যাদির পারস্পরিক গুরুত্বে সর্বদাই পরিবর্তন হইতেছে। দ্রব্যাদির গুরুত্ব সর্বদাই নূতনভাবে হিসাব করিয়া প্রত্যেকটি সূচক সংখ্যা গঠন করা খুবই পরিশ্রমসাধ্য ও জটিল ব্যাপার।

নির্মাণগত অসুবিধা সমূহ
মূল বৎসর, দ্রব্যসামগ্রী ও দাম নির্বাচন
গড়নির্ণয় ও গুরুত্বপ্রদান

বিভিন্ন ব্যবহারে সূচক সংখ্যা প্রয়োগের বহু তত্ত্বগত আপত্তি (**Theoretical objections**) দেখা দিতে পারে। প্রথমত, একই দেশের মধ্যে সকল লোক সকল প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করে না; আয়, অভ্যাস, রুচি ও পরিবেশের

পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবারের ব্যয়-কাঠামো পৃথক থাকে, সাধারণভাবে নির্দিষ্ট ধরনের কয়েকটি দ্রব্য লইয়াই বিশেষ কোন পারিবারিক ব্যয়-কাঠামো গঠিত থাকে। একই আয়-স্তরের মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চল, পরিবেশ ও অভ্যাসের ফলে সকল পরিবার সমজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করে না। সুতরাং টাকার সাধারণ ক্রয়শক্তি বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না; বস্তুত, অষ্ট্রীয় ধন-বিজ্ঞানীদের একাংশ সাধারণ দামস্তরের ধারণাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে চাহেন। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সময়ের মধ্যে সূচক সংখ্যার সাহায্যে টাকার মূল্যে পরিবর্তন পরিমাপ করা সঠিক ভাবে সম্ভব নহে। সময়ের পার্থক্যে লোকের ভোগে বা দ্রব্য-ব্যবহারের ধরনে বিপুল পরিমাণে ও মৌলিক ধরনের' পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

তত্ত্বগত আপত্তিসমূহ : একই দেশের বিভিন্ন আয়স্তর এবং একই আয়স্তরের অন্তর্গত বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে এবং বিভিন্ন স্থানের মধ্যে, জীবন যাত্রার মানের তুলনা চলে না।

নূতন দ্রব্যাদির ব্যবহার সুরু হয়; বহু দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়; ব্যবহারিক জীবনে পুরাণো দ্রব্যের তাৎপর্যও পৃথক হইয়া পড়ে। দ্রব্যের দাম সমানই আছে, কিন্তু তাহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইয়াছে, এরূপ ঘটিলে সূচক-সংখ্যায় পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় না বটে, কিন্তু টাকার মূল্যে বাস্তবক্ষেত্রে নিশ্চয়ই পরিবর্তন আসে, জীবন-যাত্রার মান নির্ধারণে অর্থের বাস্তব তাৎপর্য ভিন্নরূপ হইয়া পড়ে। যেমন, পূর্বের 50 নয়া পয়সা দামের সিগারেট বর্তমানে একই দাম থাকিলেও পূর্বাপেক্ষা ভাল বা মন্দ হইলে জীবন-যাত্রার মান-স্তরে অর্থাৎ টাকার মূল্যে পরিবর্তন আসে, কিন্তু সূচকসংখ্যার গাণিতিক হিসাবে সেই পরিবর্তন ধরা পড়ে না, ইহাতে কোন পরিবর্তন আসে না। রবার্টসন তাই বলিয়াছেন "আসনে বসিয়া গাড়ী-চড়া এবং আসন না পাইয়া দাঁড়ানো অবস্থায় গাড়ী-চড়া, উভয় অবস্থাতে দাম এক দিলেও ভোগের দিক হইতে ইহারা কখনই সমান জিনিস নহে।"

তৃতীয়ত, বিভিন্ন স্থানের মধ্যে জীবন-যাত্রার মান স্তরে অর্থাৎ টাকার মূল্যে তুলনামূলক পরিমাপ করা তত্ত্বের দিক হইতে অযৌক্তিক। পরিবেশ, রুচি ও অভ্যাসের তারতম্য এত বিস্তৃত যে বিভিন্ন দেশে নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যের গুরুত্ব তুলনা করে চলে না, একই দামে ক্রীত দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত তৃপ্তির পরিমাণে বিপুল পার্থক্য থাকে। কেইন্‌সের ভাষায় বলা হয়, "একই ধরনের ব্যক্তিদের তৃপ্তির তুলনামূলক পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; ফ্যারাও'-র ক্রীতদাসের সহিত ফিফ্‌থ এভিনিউতে চলমান মোটর গাড়ীর, অথবা একদিকে

ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসীর নিকট দামী জ্বালানি ও সস্তা বরফ, অপরদিকে, হোটেন্‌টট্‌দের নিকট সস্তা জ্বালানি ও দামী বরফ—ইহাদের তৃপ্তির তুলনা করা চলে না।"*

এই সকল প্রয়োগগত তত্ত্বগত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও টাকার মূল্য বা সাধারণ ক্রয়শক্তির ধারণা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় তাহা বলা চলে না। সূচক-সংখ্যার হিসাব সঠিক না হইলেও, প্রায় কাছাকাছি ও মোটামুটিভাবে তুলনামূলক বিচারে ইহা কিছুটা সাহায্য করে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সময়ের পার্থক্য যদি কম হয় তবে ইহার সাহায্যে টাকার মূল্যে পরিবর্তন মোটামুটিভাবে পরিমাপ করা চলে, কারণ রুচি, অভ্যাস এবং ব্যয় কাঠামো স্বল্পকালে বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং দীর্ঘকালে না হইলেও, স্বল্পকালীন বিশ্লেষণে সূচকসংখ্যার ব্যবহার সম্ভবপর।

সূচকসংখ্যার প্রয়োজনীয়তা

বিভিন্ন প্রকার সূচক সংখ্যা (Different kinds of Index Numbers)

যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে, সেইজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট টাকার মূল্য সাধারণভাবে পৃথক। তাহা ছাড়া, টাকাকড়িও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যয় হয় বলিয়া বিভিন্ন উদ্দেশ্যের সূচকসংখ্যা প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। টাকা যে কেবলমাত্র ভোগ্যদ্রব্য বা সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করে, তাহা নহে, বিভিন্ন উৎপাদন-কার্যে নিয়োগের উপযোগী উৎপাদন দ্রব্যাদির ক্রয়েও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, টাকার সাহায্যে ক্রয় করা হইয়াছে এইরূপ বিভিন্ন দ্রব্যাদির গোষ্ঠী অনুযায়ী বিভিন্ন দামস্তর থাকিতে পারে, যেমন পাইকারী দামস্তর, রপ্তানি দামস্তর, মূলধনী দ্রব্যের দামস্তর প্রভৃতি। বিভিন্ন সূচকসংখ্যার সাহায্যে এই সকল বিভিন্ন দামস্তরে পরিবর্তন বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকার মূল্যে পরিবর্তন পরিমাপ করা চলে।

অনুশীলনী

1. How would you measure changes in the value of money?
2. Examine the difficulties that you have to face in constructing an Index number showing changes in the purchasing power of Money.
3. What are Index Numbers? Point out their usefulness.
4. What are Index Numbers? How they are prepared? Briefly discuss the utility and the limitations of Index Numbers.

---

* "We are not in a position to weigh the satisfactions of similar persons, of Pharaoh's slaves against Fifth Avenue motor cars, or dear fuel and cheap ice to Laplanders with cheap fuel and dear ice to Hottentots." Keynes. *Treatise on money.* Vol. I, P. 104.

৭

আর্থিক তত্ত্বঃ দামস্তরে পরিবর্তন

Monetary theory : Changes in the Price level

কোন দেশের টাকার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য দুই প্রকার মূল্য আছে। দেশের মধ্যে টাকার বিনিময়ে কি পরিমাণ দেশীয় জিনিসপত্র কিনিতে পারা যায়, তাহা হইল টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য। আর টাকার বাহ্য মূল্য হইল ইহার বিনিময়হার, অর্থাৎ একটি দেশের টাকার বদলে অন্য দেশের টাকা কি পরিমাণ পাওয়া যায়। আলোচনার সুবিধার জন্য টাকার এই দুই প্রকার মূল্য পৃথক করিয়া রাখা দরকার।

অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য হইতে টাকার পার্থক্য আছে। টাকার মূল্য হইল সাধারণ ক্রয়শক্তি, সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীকে কিনিতে পারা যায় এইরূপ সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা। টাকার মূল্যে পরিবর্তন হইলে ইহার বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী কিনিতে পারার ক্ষমতা বদলাইয়া যায়। সকল দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িলে তাই আমরা বলি যে, টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে; আবার দ্রব্যসামগ্রীর দাম কম হইলে আমরা বলি যে, টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। দামস্তরকে P ধরিয়া লইলে টাকার মূল্য হইল 1/P। টাকার মূল্য বদলাইয়া গেলে যাহাদের হাতে টাকা আছে তাহারা যেমন প্রভাবিত হয়, ঠিক সেইরূপ সকল অর্থনৈতিক কাজকর্মের ধরনও বদলাইতে থাকে। এই সকল পরিবর্তন বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। উপরন্তু, টাকার মূল্য পরিবর্তন সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে অস্থায়িত্ব (**an element of instability**) আনিয়া ফেলে। এই সকল কারণের জন্য টাকার মূল্যে পরিবর্তন কেন আসে তাহার আলোচনা এত গুরুত্বপূর্ণ।

টাকার মূল্য ও দামস্তর

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ক্লাসিকাল ও নয়া-ক্লাসিকাল লেখকেরা দামস্তরে পরিবর্তনকেই সমগ্র অর্থনৈতিক দেহের ভারসাম্যহীনতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলিয়া মনে করিতেন। দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে ইহা ধরিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, দেশে অর্থনৈতিক ও আর্থিক

ভারসাম্য রক্ষা করাই মূল কথা এবং অর্থের ক্রয়শক্তি বা টাকার মূল্য কেন পরিবর্তিত হয় সেই শক্তিগুলি খুঁজিয়া বাহির করাই আর্থিক তত্ত্বের লক্ষ্য। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা পূর্ণ কর্মসংস্থান ধরিয়া লইতে পারেন না, তাঁহাদের নিকট দামস্তরে পরিবর্তন অপেক্ষা উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানামাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

দামস্তরে পরিবর্তন কেন হয় সেই সম্পর্কে ক্লাসিকাল্ লেখকদের মতবাদের নাম অর্থের (বা টাকার) পরিমাণতত্ত্ব। তাঁহাদের মতে অন্যান্য সকল দ্রব্যের দামের মতনই টাকার মূল্য নির্ভর করে উহার যোগান ও চাহিদার উপর। টাকার যোগান ও চাহিদা কাহাকে বলে ?

অর্থের যোগান ও চাহিদা (The supply of and demand for money)

কোন দেশে অর্থের যোগান বলিলে নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক সৃষ্ট অর্থ—এই উভয়ের যোগফল বুঝায়। দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে নগদ টাকার পরিমাণ প্রধানত নির্ভর করে স্বর্ণের মোট পরিমাণের উপর। নূতন

টাকার যোগান
১। স্বর্ণমান

স্বর্ণখনির আবিষ্কার হইলে, অন্য ব্যবহার হইতে স্বর্ণ সরিয়া আসিয়া অর্থরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকিলে, বা বিদেশ হইতে দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে দেশে মোট স্বর্ণের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই স্বর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় এবং উহার বিনিময়ে লোকেরা নগদ টাকা লইয়া যায়, এইরূপে অর্থের প্রচলন বাড়িয়া যায়। যদি স্বর্ণ বা স্বর্ণ মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে না-আসিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে পৌঁছায় তবে এই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ উহার ভিত্তিতে ঋণপ্রসার সুরু করিয়া দেয়। এইরূপে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় স্বর্ণের পরিমাণ দেশে টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করে। কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় অর্থের যোগান নির্ভর করে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতির উপর। কাগজী নোটের পরিমাণ স্থির করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। আজকাল

২। কাগজী মান

সরকার নিজে নোট ছাপায় না। যখন সরকারের টাকার দরকার হয় সে তখন সরকারী সিকিউরিটি বা ঋণপত্রের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লয়। ঐ সকল ঋণপত্রের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারকে টাকা দেয়। সরকার যখন নিজের ঋণ-ভার লাঘব করে অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করে, তখন স্বভাবতই দেশের প্রচলন ধারায় টাকার পরিমাণ হ্রাস পায়। ব্যাঙ্ক কর্তৃক সৃষ্ট অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে

ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান নীতির উপর। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অবশ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে যেমন, ব্যাঙ্করেট পরিবর্তন, খোলাবাজারী কার্যকলাপ, জমার অনুপাতে পরিবর্তন প্রভৃতি উপায়ে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির ঋণনীতি অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করিতে পারে। তাই আমরা বলিতে পারি যে, কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় দেশে অর্থের যোগান নির্ভর করে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির উপর।

টাকার প্রচলন বেগ

নগদ টাকা বা ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট ঋণগত অর্থের পরিমাণ—কেবল এই উভয়ের যোগফলকেই আমরা কোন দেশের টাকার যোগান বলিতে পারি না। আমরা জানি প্রতিটি কাগজের নোট প্রতিদিনে বা সপ্তাহে বা মাসে বহুবার হাতবদল হইয়া অনেক টাকার কাজ করিতেছে। এইরূপে ব্যাঙ্কের রক্ষিত জমার উপর চেক-ও অনেকবার হাত বদল হইতেছে। প্রতিটি নগদ বা ব্যাঙ্কের অর্থ-ই যে এইরূপ কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঠিক নির্দিষ্ট কয়েকবার হাত বদল হয় তাহা নহে, তবে গড়ে কতবার হস্তান্তরিত হইল উহা হিসাব করিয়া বাহির করা চলে। ইহারই নাম অর্থের প্রচলন বেগ। টাকার পরিমাণকে উহার গড় প্রচলন বেগ দিয়া গুণ বা পূরণ করিলে দেশে টাকার মোট যোগান আমরা জানিতে পারি। টাকার পরিমাণ যদি হয় M, এবং গড় প্রচলনবেগ যদি হয় V, তবে দেশে টাকার মোট যোগান হইল $M \times V = MV$.

অর্থের মূল্য

এইরূপে দেশের প্রচলনধারায় যে অর্থ সঞ্চালিত হইতে থাকে উহার মূল্য বলিতে কি বোঝায়? অর্থের এক একটি ইউনিট (1 টাকা, 1 পাউণ্ড, 1 ডলার প্রভৃতি) নিজের বিনিময়ে যতটুকু দ্রব্য সামগ্রী কিনিতে পারে তাহাই অর্থের মূল্য। স্পষ্টত বুঝা যায় যে, অর্থের একটি ইউনিটের বিনিময়ে দ্রব্য সামগ্রী কতটুকু পাওয়া যাইবে তাহা নির্ভর করে জিনিস-পত্রের দামের উপর, অর্থের সাধারণ মূল্য বলিলে তাই আমরা বুঝি সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর দামের গড় বা দামস্তর। দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে আমরা বলি অর্থের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে, অর্থাৎ অর্থের একটি ইউনিট পূর্বাপেক্ষা কম জিনিস ক্রয় করিতে পারিতেছে। আবার দামস্তর হ্রাস পাইলে আমরা বলি যে অর্থের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে, অর্থাৎ টাকার একটি ইউনিট পূর্বাপেক্ষা বেশি জিনিস ক্রয় করিতে পারিতেছে।

অর্থের মূল্য কিসের উপর নির্ভর করে? কোন ধরনের শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দ্রব্য সামগ্রীর সাধারণ দামস্তর পরিবর্তিত হয়? উনবিংশ শতাব্দীতে

এইরূপ ধারণা ছিল যে অর্থ তৈয়ারী হয় স্বর্ণ বা রৌপ্যের দ্বারা, তাই এই স্বর্ণ বা রৌপ্য উৎপাদনের খরচের উপর অর্থের মূল্যও নির্ভর করে। কিন্তু আজকাল বেশির ভাগ টাকাই কাগজের নোট, ইহাদের উৎপাদন ব্যয় নিতান্ত অল্প, ইহা একেবারে না-ই বলিলেই চলে। তাই অর্থের উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত অর্থের মূল্যের কোনরূপ সম্পর্ক আজকাল আর মানিয়া লওয়া চলে না। বর্তমানে অর্থের মূল্য নিরূপণ সম্পর্কে দুই ধরনের তত্ত্ব প্রচলিত আছে: অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্ব। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মতে অর্থের যোগান ও চাহিদা উভয়ে মিলিয়া অর্থের মূল্যকে প্রভাবিত করে।

অর্থের মূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব

অর্থের যোগান সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। অর্থের চাহিদা কাহাকে বলে? চাল বা পাট বা গমের জন্য চাহিদার মত অর্থের চাহিদার প্রকৃতি নয়। এই সকল ভোগ্য দ্রব্যের জন্য লোকের চাহিদা হয় কারণ তাহারা এই সকল দ্রব্য হইতে উপযোগিতা বা তৃপ্তি পায়। কিন্তু অর্থের নিজস্ব কোন উপযোগিতা নাই, ইহাকে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করাও চলে না। ব্যক্তি টাকা চায় কারণ ইহার সাহায্যে দ্রব্যসামগ্রীর উপর সে নিজের প্রয়োজনমত অধিকার আরোপ করিতে পারে।

টাকার চাহিদা কাহাকে বলে

এই কারণে আরভিং ফিশার এবং প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা বলিতেন যে, অর্থের জন্য মোট চাহিদার পরিমাণ আর দেশে বিক্রয়-যোগ্য মোট দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য সমান। জিনিসপত্র কেনার জন্যই টাকার প্রয়োজন, তাই টাকার চাহিদা বলিলে দেশে টাকার সহিত বিনিময়-যোগ্য সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যকেই বুঝিতে হইবে। তাই বিনিময়-যোগ্য সকল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণকে দ্রব্যসামগ্রীর গড় দাম দিয়া গুণ বা পূরণ করিলে অর্থের জন্য চাহিদা জানিতে পারা যায়। যেমন যদি বিনিময়যোগ্য সকল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হয় T এবং উহাদের গড় দাম হয় P, তবে টাকার চাহিদা $P \times T = PT$.

ফিসারীয় মত

কেম্ব্রিজের ধনবিজ্ঞানীরা টাকার চাহিদার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন এবং ফিসারের ব্যাখ্যা হইতে তাঁহাদের ব্যাখ্যা ছিল ভিন্নরূপ। ফিসারীয় তত্ত্বে টাকার চাহিদা বলিলে বোঝা যায় ইহার সহিত বিনিময়যোগ্য

সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর স্রোতধারা, বিনিময়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যই হইল টাকার জন্ম চাহিদার পরিমাণ। কেম্ব্রিজের ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সকল দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম চাহিদা সৃষ্টি হয় না, সুতরাং টাকার জন্ম চাহিদা বলিলে সকল দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যকে ধরা যায় না। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, কিছু পরিমাণ টাকা জিনিসপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্ম রাখিতে চান বা পাইতে চান। অর্থাৎ মোট সামগ্রীর বা আসল আয়ের (real income) কিছু অংশ ক্রয়ের জন্ম বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে টাকার চাহিদা করে : টাকার জন্ম সকল ব্যক্তির এইরূপ চাহিদা যোগ করিলে সমাজে টাকার মোট চাহিদা পাওয়া যায়।

কেম্ব্রিজীয় মত

আধুনিক কালের লেখকেরা, প্রধানত কেইনস্ টাকার জন্ম চাহিদা বলিতে ভিন্নরূপ বোঝেন। তাঁহাদের মনে টাকার চাহিদা হইল নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছা। লেনদেন করা, সাবধান থাকা এবং ফাট্‌কা নিয়োগ—এই তিনটি অভিপ্রায়ে সমাজের সকল ব্যক্তি মিলিয়া কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চান বা ব্যাঙ্কে জমা রাখেন তাহাই সমাজে মোট টাকার চাহিদা। লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার অংশের নাম L_1 এবং ফাট্‌কানিয়োগের অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার নাম L_2। টাকার মোট চাহিদা L ইহাদের যোগফল। L_1 নির্ভর করে আয়ের স্তরের উপর এবং L_2 (বা ফাট্‌কা নিয়োগের অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদা) নির্ভর করে প্রধানত সুদের হারের উপর। সুদের হার বাড়িলে টাকা হাতে রাখার ইচ্ছা বা টাকার চাহিদা হ্রাস পায়, অপরপক্ষে সুদের হার কমিলে টাকা হাতে রাখার ইচ্ছা বা টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

কেইন্‌সীয় মত

টাকার মূল্যের পরিমাণ তত্ত্ব (Quantity theory of the value of Money)

পরিমাণতত্ত্বের অতি সরল আলোচনা ষোড়শ শতাব্দীর বিভিন্ন লেখা হইতেই পাওয়া যায়। সরল ভাবে বলা হইত যে, টাকার পরিমাণে পরিবর্তনের সহিত একই অনুপাতে দামস্তর পরিবর্তিত হয়। দেশে টাকার পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে দামস্তরও দ্বিগুণ হইবে, টাকার পরিমাণ অর্ধেক হইলে দামস্তরও অর্ধেক হইবে। ইহাদের মধ্যে এই সম্পর্ককে আমরা $M=KP$-রূপে সংক্ষেপে লিখিতে পারি। একই হারে বা সমান অনুপাতে পরিবর্তনের প্রতীক হইল K. যে হারে M পরিবর্তিত হয়, P-ও সেই অনুপাতে পরিবর্তিত হইবে—ইহাই টাকার পরিমাণতত্ত্ব।

স্থূল ও প্রাচীন ধারণা

পরিমাণতত্ত্বকে এইরূপ সরলভাবে ব্যাখ্যা করার সময়ে পণ্ডিতেরা দুইটি বিষয় নিজেদের অজান্তে সমান বা অপরিবর্তিত থাকিবে বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। প্রথমত, তাঁহারা মনে করিতেন যে, দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িলে সকল টাকাই যেন জিনিসপত্র কেনাতে খরচ হইবে। অর্থাৎ লোকে টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে পারে বা পূর্বেকার জমান টাকা বাজারে ছাড়িয়া দিতে পারে সেই কথা তাঁহারা চিন্তা করেন নাই। ধনবিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা চলে যে, তাঁহারা টাকার প্রচলনবেগ (velocity of circulation) সমান ধরিয়া লইয়াছিলেন।*

দুইটি অবাস্তব স্বীকার্য বিষয় ১। প্রচলনবেগ সমান থাকে

দ্বিতীয়ত, তাঁহারা মনে করিতেন যে দেশে জিনিসপত্রের পরিমাণ সর্বদা সমান থাকে। অর্থাৎ দেশে সকল উপাদানের পূর্ণনিয়োগ আছে, এই অবস্থা তাঁহারা ধরিয়া লইতেন। যদি টাকার পরিমাণে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়; অথবা টাকার পরিমাণ কমার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের পরিমাণও কমিয়া যায় তবে দামস্তরে কোনরূপ পরিবর্তন হইতে পারে না।

২। জিনিসপত্রের পরিমাণ সমান থাকে

টাকার পরিমাণ তত্ত্বের এই সকল অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া অধ্যাপক ফিসার ইহাকে উন্নত করেন। তিনি অবহেলিত এই দুইটি বিষয়কে অর্থাৎ, টাকার প্রচলনবেগ ও দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণকে—আলোচনার মধ্যে লইয়া আসিয়া পরিমাণতত্ত্বের উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁহার এই তত্ত্বকে তিনি একটি সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করিয়াছেন। সমীকরণটি হইল:

এই দুইটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফিসার কর্তৃক উৎকর্ষ সাধন

$$PT = MV + M'V' \text{; অথবা } P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

* এইরূপ মনে করার কারণ ছিল। তখনকার পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, লোকে টাকা চায় কেবলমাত্র লেনদেন ও সাবধানতার উদ্দেশ্যে। টাকা খাটাইয়া সুদ পাইবার জন্য খুশিমত হাতে টাকা জমাইয়া রাখা বা ছাড়িয়া দেওয়া—অর্থাৎ এইরূপ ফাট্‌কাদারিতে নিয়োগের অভিপ্রায়ে লোকে হাতে টাকা রাখে—ইহা তাঁহারা চিন্তা করেন নাই। টাকা যে কেবল বিনিময়ের মাধ্যম তাহা নহে, ইহা মূল্যের সঞ্চয়, ইহাকে হাতে জমাইয়া রাখা সহজেই সম্ভবপর। যেমন, দেশে টাকার পরিমাণ বাড়ে নাই, কিন্তু লোকের নগদ-প্রবণতা বা টাকা হাতে রাখার ইচ্ছা বাড়িয়া গেল, এই অবস্থায় টাকার প্রচলন-বেগ কম হইবে। অর্থাৎ টাকার পরিমাণ বাড়িলেই ইহা যে দেশের আয়স্রোতে প্রবেশ করিবে এইরূপ কোন কথা নাই। কারণ পূর্বের তুলনায় বেশি টাকা লোকে হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে। টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি সত্ত্বেও দামস্তর বাড়িল না, ইহা নিশ্চয় সম্ভবপর।

P হইল দামস্তর, T হইল টাকার সহিত বিনিময় হইতেছে এইরূপ সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণ, M হইল নগদ টাকার পরিমাণ, এবং V হইল নগদ টাকার প্রচলনবেগ, M′ হইল ব্যাঙ্ক কর্তৃক সৃষ্ট ঋণগত টাকার পরিমাণ এবং V′ হইল এই ঋণগত টাকার প্রচলনবেগ। ফিসারের মতে, উপরের এই সমীকরণটির মধ্যে স্বল্পকালে T, V, V′ এই বিষয়গুলি এবং M ও M′-এর অনুপাত পরিবর্তিত হয় না। T নির্ভর করে জনসংখ্যা, ভোগের কাঠামো, উৎপাদন পদ্ধতি, সমাজে টাকা ছাড়া পণ্য বিনিময়ের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর। স্বল্পকালে ইহারা অপরিবর্তিত থাকিবে মনে করা চলে। V এবং V′ নির্ভর করে, জনসাধারণের রীতিনীতি অভ্যাস প্রভৃতির উপর। M ও M′-এর অনুপাত নির্ভর করে লোকের ব্যাঙ্কিং অভ্যাস এবং প্রচলিত রীতিনীতির উপর। সুতরাং দামস্তর অর্থাৎ P নির্ভর করে একমাত্র M-এর উপর—নগদ টাকার পরিমাণ বদলাইলে দামস্তরেও সরাসরি ও সমহারে পরিবর্তন আসিবে।

ফিসারের তত্ত্বকে সমীকরণরূপে ব্যাখ্যা করা চলে

ফিসারের এই তত্ত্বকে আমরা অভেদরূপেও (Identity) প্রকাশ করিতে পারি।* সমাজের সকল জিনিসপত্র কিনিতে যে পরিমাণ টাকা দরকার হইল ঠিক সেই পরিমাণ টাকারই জিনিসপত্র বিক্রয় হইয়াছে—ইহার কমও নয় বা বেশিও নয়। সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে মোট ক্রয়মূল্য = মোট বিক্রয় মূল্য। টাকার পরিমাণকে (M) উহার প্রচলনবেগ (V) দিয়া গুণ করিলে আমরা মোট ক্রয়মূল্য জানিতে পারি, ইহাই দেশের মোট ব্যয় (MV)। আবার, জিনিসপত্রের পরিমাণকে (T) উহাদের গড় দাম (P) দিয়া গুণ করিলে আমরা মোট বিক্রয়-মূল্য জানিতে পারি, ইহা নিশ্চয় মোট ব্যয়ের সমান হইবে।

আবার অভেদরূপেও প্রকাশ করা চলে

এই নগদ লেনদেনের সমীকরণ (Cash transactions equation) সম্পর্কে বহুবিধ সমালোচনা করা হইয়াছে। সর্বপ্রথমেই বলা চলে, এই তত্ত্বের একটি

* "Two alternative methods of expressing it have to be considered, On the one hand the theory can be presented as an identity: that is, as a statement of a situation which is necessarily one, because of the way in which the terms used in it are defined. An identity is a statement of the same facts in two different ways; its usefulness depends on whether alternative presentations give additional insight into the situation. The other method of presenting the Quantity Theory is in the form of an equation. This form expresses causal relationships; its usefulness depends on the ability to something helpful about the causal relationships represented. A. C. L. Day, *Outline of Monetary Economies*, Pp. 247—248.

প্রধান ত্রুটি হইল যে, লোকে ফাট্‌কাদারির মনোভাব হইতে টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে এই তত্ত্ব তাহা বিচার করে না। টাকার পরিমাণ বাড়িলে তাহা দামস্তর বাড়াইতে পারে যদি লোকে উহা ব্যয় করে। কিন্তু যদি বর্ধিত টাকা তাহারা হাতে জমাইয়া রাখে, তবে দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর কিরূপে বাড়িবে? শুধু তাহাই নহে। দেশে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলেও যদি নগদ-পছন্দে পরিবর্তন আসে, তবে আয়স্তর পরিবর্তিত হইয়া দামস্তরে পরিবর্তন আসিতে পারে। দামস্তরে পরিবর্তন আসে আয়স্তর পরিবর্তিত হইলে; অতএব টাকার পরিমাণ বাড়িলে আয়স্তর বাড়িবে অথবা উহা কমিলে আয়স্তর কমিবে, ইহা মানিয়া লওয়া চলে না।

কার্যকরী চাহিদা ও টাকার পরিমাণের সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে না

সমীকরণটির কাঠামো বিশ্লেষণ করিলেও ত্রুটি ধরা পড়ে। M-এ পরিবর্তন হইলে P-তে প্রত্যক্ষ ও সমানুপাতিক (direct and proportionate) আসিতে পারে তখনই, যদি আমরা ধরিয়া লই যে, M-এ পরিবর্তনের ফলে V, T, M′ ও V′ কিছুতেই পরিবর্তন হইবে না। কিন্তু বাস্তবে ইহা ঘটে না।

অন্যান্য বিষয়গুলি "স্বাধীন" নয়

তাহা ছাড়া, এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা টাকার পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের সুস্পষ্ট পরিচয় জানিতে পারি না। টাকার পরিমাণ বদলাইলে কি ভাবে, কোন্ পথে, কোন্ কোন্ শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে, কাহাদের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে দামস্তরে পরিবর্তন আসিল তাহা এই সমীকরণে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ইহা নিছক অভেদ (identity) মাত্র। আর্থিক তত্ত্বের প্রধান কাজ অর্থের ও দ্রব্যের স্রোতকে যুক্ত করিয়া অভেদ বা নিশ্চল সমীকরণ দাঁড় করানো—ইহা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। সমস্যাটিকে গতিশীল পদ্ধতিতে আলোচনা করা দরকার।*

অভেদ মাত্র, সমীকরণ নয়

* "The fundamental problem of monetary theory is not merely to establish identities or statistical relations......but to treat the problem dynamically analysing the different elements involved in such a manner as to exhibit the causal processes by which the price level is determined and the method of transition from one position of equilibrium to another." J.M. Keynes, *mreatise on money.* Vol. I.

বিভিন্ন দেশের আর্থিক ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বাণিজ্যচক্রের এক প্রান্তে সমৃদ্ধির শীর্ষবিন্দু হইতে হঠাৎ যখন অবনতি সুরু হয়, তখন দামস্তর দ্রুত হ্রাস পায়, কিন্তু টাকার পরিমাণ কম থাকে তাহা নয়। সংকটকালে টাকার পরিমাণ বাড়িলেও দামস্তর বাড়িতে চাহে না। দামস্তরে স্বল্পকালীন উত্থান-পতন, বিশেষত বাণিজ্য-চক্রকালীন উঠানামা তাই টাকার পরিমাণ তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করে চলে না।

চক্রকালীন উঠানামা ব্যাখ্যা করিতে পারে না

মনে রাখা দরকার, এই তত্ত্ব ধরিয়া লয় যে, স্বল্পকালে T অপরিবর্তিত থাকে, অর্থাৎ সমাজে পূর্ণ কর্মনিয়োগ বর্তমান আছে, অনিযুক্ত উপকরণ সমাজে নাই। পূর্ণ কর্মনিয়োগ বজায় থাকিলেই সেই বিশেষ স্তরে ইহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অপূর্ণ নিয়োগের স্তরে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গেলে সুদের হার কমিবে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে, দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, দামস্তর প্রথমেই প্রভাবিত না হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং, এই তত্ত্ব সকল স্তরেই কার্যকরী নহে।

পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তর ধরিয়া লইতেছে

টাকার মূল্যে পরিবর্তন বলিলে বুঝা যায় টাকার ক্রয়ক্ষমতায় পরিবর্তন। শিল্প-সংক্রান্ত, ব্যবসায়-সংক্রান্ত, শেয়ার, ডিবেঞ্চার, অর্ধনির্মিত ও অপূর্ণনির্মিত সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী টাকার সহিত বিনিময় হইতেছে বলিয়াই উহাদের হিসাবের মধ্যে আনিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে অনেক দ্রব্য আছে যাহাদের টাকার ক্রয়শক্তি বা টাকার মূল্য-নিরূপণে হিসাব না করাই বাঞ্ছনীয়; যাবতীয় সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী মিলিয়া এইরূপ নগদ লেনদেনের স্তরমান (Cash Transactions Standard) আর্থিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ উপযোগী নয়, ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান আলোচনার উপযোগী বাস্তব ক্রয়শক্তি ইহা দ্বারা জানা যায় না।* শুধু তাহাই নহে। জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময়ে সর্বশেষ স্তরের সম্পূর্ণোৎপন্ন (final product) দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যকেই ধরা হয়। কিন্তু ফিসারীয় T এবং (ফলে) PT-র মধ্যে মূলধনী শিল্পদ্রব্য ও অর্ধনির্মিত দ্রব্য-সামগ্রীকেও হিসাবের মধ্যে ধরায় ইহা সঠিকভাবে জাতীয় আয়কে পরিমাপ করে

টাকার ক্রয়শক্তি হিসাব করার সময়ে অবাঞ্ছিত বহু দ্রব্য বাদ দেওয়া উচিত

* কেইন্‌সের মতে "the power of money to buy goods and services on the purchase of which for purpose of consumption a given community of individuals expend their money income"—ইহাই টাকার ক্রয়শক্তি। (*Treatise*, vol I P.55)

না, তাই কর্মনিয়োগের স্তর বা আয়স্তরের নির্ধারণও এইরূপ 'জগাখিচুড়ি দামস্তরের' (Hotch-potch price-level) দ্বারা সম্ভব হয় না।

উপরন্তু, এইরূপ সাধারণ দামস্তরের বিশ্লেষণের মধ্য হইতে আপেক্ষিক দাম বা কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের দাম নিরূপণ সম্পর্কে আমরা কিছু জানিতে পারি না। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা সাধারণ দামস্তরের এই বিশ্লেষণকে ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের মূল ধারা হইতে পৃথক করিয়া আলোচনা করিতেন। কোন বিশেষ দ্রব্যের দাম-নিরূপণ তত্ত্বে তাঁহারা যোগান ও চাহিদার ধারণা প্রযোগ করিতেন। কিন্তু সাধারণ দামস্তর আলোচনার সময়ে তাঁহারা টাকার পরিমাণ, প্রচলনবেগ প্রভৃতি অস্পষ্ট ধারণা-সমূহ ব্যবহার করিতেন। কেইন্‌স্‌ বলিয়াছেন যে, ইহার ফলে ধনবিজ্ঞানীরা "একবার চাঁদের এপিঠে আর একবার ওপিঠে পৌঁছিতেন কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না কোন্ পথ এই উভয়ের সংযোগ সেতু, অনেকটা আমাদের স্বপ্ন-মন ও সজাগ-মনের মধ্যে সম্পর্কের মত"।*

এই আলোচনা পৃথক দ্রব্যের দাম নিরূপণ হইতে অবাঞ্ছিত ভাবে দূরে

নগদ লেনদেনের স্তরমান বা টাকার পরিমাণতত্ত্ব সমগ্র অর্থতত্ত্বের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে আলোচিত ও সমালোচিত হইয়াছে। দামস্তরের পরিবর্তন নির্ভর করে কার্যকরী চাহিদার পরিবর্তনের উপর, টাকার পরিমাণে পরিবর্তনের উপর ইহা নির্ভরশীল নয়। দেশের মোট ব্যয়ের পরিমাণে যে সকল বিষয় পরিবর্তন আনে, উহারাই কার্যকরী চাহিদায় পরিবর্তন এবং দামস্তরে উঠানামা ভালভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে। এই সকল কথা মানিয়া লইলেও এই তত্ত্বের গুরুত্ব আমরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারি না। ইহার মূল কথা যে, টাকার মোট যোগান ও মোট চাহিদার উপর টাকার মূল্য (বা দামস্তর) নির্ভর করে—ইহার মধ্যে সত্যতা একেবারে নাই এমন কথা বলা চলে না। অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দামস্তরে বৃদ্ধির যুগে সাধারণত টাকার পরিমাণও বাড়িয়াছে,

পরিমাণ তত্ত্বের মধ্যে কিছুই কি সত্যতা নাই

* "So long as economists are concerned with what is called the Theory of Value they have been accustomed to teach that prices are governed by conditions of supply and demand......But when they pass in..... to the theory of Money and Prices,......we are lost in hage where nothing is clear and everything is possible. We have all of us become used to finding ourselves sometimes on the one side of the moon and sometimes on the other, without knowing what route or journey connects them, related apparently, after the fashion of our walking and our dreaming lives." Keynes, *General Theory*. P.292

যেমন, 1917-18 এবং 1939-45 সালে দেখা গিয়াছে। অবশ্য ইহা ঠিকই যে, এই পরিমাণতত্ত্ব 'কার্যকারণ শৃংখলের অনেক গ্রন্থিকে ঢাকিয়া রাখে' (hides many links in the chain of causation') ; কিন্তু মোটামুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর (অর্থাৎ টাকার পরিমাণে পরিবর্তন) জোর দেয় বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই স্থূলভাবে হইলেও ইহাকে কাজে লাগান যায়। রবার্টসন ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "a serviceable platitude." তাই, উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, "আর্থিক বা আসল আয়ে বিপুল কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়, যদি না টাকার পরিমাণে মোটামুটি সমপরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে ; টাকার যোগান যদি কম থাকে তবে যে কোন সময়ে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা চলে। ইহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বটে, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি-তত্ত্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র'' ।*

নগদ লেনদেন সমীকরণের বিষয়গুলি কিসের উপর নির্ভর করে (Determinants of Cash Transaction Variables)

দামস্তর নির্ধারণের জন্য অধ্যাপক ফিসার PT=MV এই সমীকরণকে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে V ও T স্বল্পকালে অপরিবর্তিত থাকে, তাই M-এ পরিবর্তন আসিলে, তবেই P-তে পরিবর্তন আসিতে পারে। সমীকরণের এই বিষয়গুলি একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমরা উহাদের প্রকৃতি ভালভাবে বুঝিতে পারিব। অর্থনৈতিক, প্রতিষ্ঠানগত, যন্ত্রকৌশলগত. মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক—সকল প্রকার শক্তিই এই বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করে।

এই সমীকরণের মধ্যে M বলিলে বুঝা যায় দেশে টাকার মোট যোগান ; নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্কের আমানতের যোগফল। ব্যাঙ্কের আমানতের সকল অংশ ইহার মধ্যে নাই, চেক কাটিয়া যে আমানত তুলিয়া আনা চলে, সেই চলতি আমানতকেই (current or demand deposits) কেবল মাত্র হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে। কারণ স্থির আমানতের সাহায্যে জিনিসপত্র কেনা যায় না,

* "The fact is that monetary economics is too complicated to be dealt with by theories as simple as Quantity Theory. The most important conclusion we can derive from it is that big rises in the level of real or of money income are not possible unless there are more or less equal rises in the quantity of money ; an inflation can always be brought to an end if the supply of money is limited This is an important fact, but it is only a small part of the theory of inflation"—A. C. L. Day, *Outline of monetary Economics.* P. 252.

উহার উপর চেক কাটিয়া লেনদেনের উদ্দেশ্যে ঐরূপ আমানতকে ব্যবহার করা চলে না। M-এর পরিমাণ নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর: (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ নগদ টাকা বাজারে ছাড়িয়া দিয়াছে; (খ) লোকের হাতে নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্কে রক্ষিত চাহিদা-আমানতের অনুপাত; (গ) চাহিদা আমানত ও ব্যাঙ্কের জমার (বা রিজার্ভের) অনুপাত। প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণ নগদ টাকা (নোট ও খুচরা প্রভৃতি) প্রচলন করে, দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে এই টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়, আবার অবস্থা বুঝিয়া কমাইয়া দেয়। দ্বিতীয়ত, লোকের হাতে নগদ 1 টাকা নিছক একটি টাকা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সে যদি ওই টাকাটি কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখে, তবে উহার ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণ ঋণগত অর্থ সৃষ্টি করিতে পারে। তাই দেশের মোট নগদ টাকার কত অংশ চাহিদা-আমানতের হিসাবে জমা আছে তাহা গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়ত, চাহিদা-আমানতের যত বেশি অংশ ব্যাঙ্ক নিজস্ব জমা বা রিজার্ভ হিসাবে রাখিবে, ঋণগত অর্থসৃষ্টি তত কম হইবে; আবার এই রিজার্ভের অনুপাত যত কম হইবে তত বেশি ঋণ-সৃষ্টি সম্ভব হইবে। তাই দেশের ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত আমানত ও জমার মধ্যে যে অনুপাত বজায় রাখিতে চান তাহা গুরুত্বপূর্ণ।

কিসের উপর M নির্ভর করে

V বলিলে বুঝা যায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি টাকা গড়ে কতবার হাত-বদল হইতেছে; জিনিসপত্র কেনার কাজে গড়ে কতবার উহাকে ব্যবহার করা হয়। দেশের মোট ব্যয়কে টাকার পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে আমরা প্রতিটি টাকার গড় প্রচলনবেগ জানিতে পারি। ফিসারের ভাষায় হইল V হইল PT/M, টাকার এই প্রচলনবেগ বা V অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। বাস্তব বিষয়গুলির (objective factors) মধ্যে প্রধান হইল দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও ব্যাঙ্কিং-অভ্যাসের প্রসার, কারণ ইহার উপর ঋণদান, ঋণগ্রহণ, ব্যয় করা—প্রভৃতির দ্রুততা নির্ভর করে। যদি সহজ কিস্তিতে ক্রয় বিক্রয়ের সুব্যবস্থা থাকে তবে টাকার প্রচলনবেগ বেশি হয়। দেশে মাহিনা ও মজুরি দেওয়ার রীতিনীতি কিরূপ, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বার্ষিক—তাহার দ্বারাও V প্রভাবিত হইবে। মাহিনা ও মজুরির মধ্যে সময়ের ব্যবধান যত কম, V তত বেশি। যন্ত্রকৌশলের উন্নতি, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কর ও ব্যয় সম্পর্কে সরকারী নীতি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণনীতি যৌথমূলধনী কোম্পানীগুলির ডিভিডেণ্ট-বণ্টনের নীতি, শেয়ারবাজারের কার্যকলাপ

কিসের উপর নির্ভর করে

তরল সম্পত্তির পরিমাণ ও ধরন—এইরূপ সকল বিষয় ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর প্রভাবের মাধ্যমে টাকার প্রচলনবেগ বা V-এর উপর প্রভাব বিস্তার করে। মনোগত বিষয়গুলির (subjective factors) মধ্যে প্রধান হইল ভোগ ও সঞ্চয় সম্পর্কে লোকের অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গী। সাধারণত লোকে সঞ্চয় করে ভোগ না করিয়া, তাই ভোগব্যয় কমিলে টাকার প্রচলনবেগ হ্রাস পাইবে। লোকে তাহাদের সঞ্চয় ভালভাবে বিনিয়োগ করিতে পারিতেছে কি না, বিনিয়োগের সুযোগ আছে কি না, সুদের হার কিরূপ, এই সকল বিষয় দ্বারা V প্রভাবিত হয়। ভবিষ্যতে দাম ও আয় বাড়িবে এরূপ ধারণা থাকিলে V বেশি হইবে—উহারা ভবিষ্যতে কমিবে এইরূপ মনে হইলে V কম হইবে।

T বলিলে বোঝা যায় সকল দ্রব্যসামগ্রী, কাজকর্ম, শেয়ারপত্র প্রভৃতি—যে কোন প্রকার ইউনিট যাহা টাকার বদলে বিনিময় হয়। যেমন, দেশে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হইল 200 ইউনিট। যদি উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে সর্বশেষ স্তরে ভোগ পর্যন্ত উহা পাঁচবার বেচাকেনা হয় তবে T হইল 1000। বাণিজ্যের পরিমাণ বা T কয়েকটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, (ক) উৎপাদক উপাদানগুলির পরিমাণ ও উৎকর্ষ, (খ) কর্মসংস্থানের স্তর, এবং (গ) উৎপাদনপদ্ধতির উৎকর্ষ। দেশে উপকরণ ও উপাদানের পরিমাণ যত বেশি থাকিবে, T তত বেশি হইবার সম্ভাবনা। উপকরণের পরিমাণ দেখিলেই চলিবে না, দেশে বিভিন্ন উপকরণের অনুপাতও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শ্রম ও ভূমির তুলনায় যদি মূলধন কম থাকে তবে শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা কম হয়, উৎপাদনের পরিমাণও কম। উপাদানগুলির উৎকর্ষের দিক হইতে বিচার করিলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যন্ত্রবিদ্যা বা টেকনিকাল জ্ঞান। দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে, তাই জাতির উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ভর করে উপকরণের পরিমাণ ও উৎকর্ষের উপর। স্বল্পকালে অবশ্য প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও যন্ত্রবিদ্যার স্তর স্থির ধরিয়া লইলে মোট উৎপাদন নির্ভর করে কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর। পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে উপাদানের অভাবে দ্রুত গতিতে T বাড়ান যায় না, অপূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে চেষ্টা করিলে T দ্রুত বাড়ান সম্ভবপর। পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে আর্থিক আয় বাড়িতে থাকিলেও T বাড়ান যায় না। তাই পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তর বলিলে বুঝা যায় যেখানে T সমান আছে; অথবা T স্থির থাকে বলিলেই বুঝা যায় যে পূর্ণ কর্মনিয়োগের অবস্থা ধরিয়া লওয়া হইতেছে।

T কাহাকে বলে ও কিসের উপর নির্ভর করে

দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনের উপরেও T নির্ভর করে। শ্রমবিভাগ ও

বিশেষায়ণ উৎপাদনের মোট পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে। উৎপাদন-সংগঠনের মধ্যে যত অধিকসংখ্যক স্তরে উৎপাদন ধারা বিভক্ত থাকিবে (যেমন, পাইকারী ব্যবসাদার, দালাল, খুচরা ব্যবসায়ী প্রভৃতি,) তত বেশি দ্রব্য-সামগ্রী একহাত হইতে অন্য হাতে চলাচল করিবে, T তত বেশি হইবে। যদি দেশে লম্বমুখী সংযুক্তি (vertical integration) বেশি থাকে, তবে T কম, কারণ একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎপাদন ধারার অনেকগুলি স্তর জড়িত থাকে। দেশে একচেটিয়া ব্যবসায় না থাকিলে এবং স্বাধীন ও পরস্পর প্রতিযোগী ফার্ম ও শিল্পের সংখ্যা বেশি থাকিলে T বেশি হইবে।

P এমন একটি বিষয় যাহা M, V ও T এই তিনটি শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র। বাস্তব জগতে, M, V এবং T একই দিকে বা একই অনুপাতে পরিবর্তিত হয় না। V-তে পরিবর্তন না হইলেও M-এ পরিবর্তন আসিতে পারে, আবার যখন MV বাড়িয়েছে তখন T সমান থাকিতে পারে। এই সকল বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন P-কে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে। M বাড়িলে যদি ঠিক সেই সময়ে V হ্রাস পায় তবে P-র উপর ইহার কোন প্রভাব পড়িতে পারে না। MV বৃদ্ধি পাইবার সময়ে যদি T-ও বাড়ে, তবে সাধারণভাবে P বৃদ্ধি পাইবে না। সুতরাং, যদি V এবং T স্থির থাকে, তবেই M এর পরিবর্তন P-তে পরিবর্তন আনিতে পারে। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে T-ও বৃদ্ধি পাইবে, তাই এই সময়ে MV না বাড়াইলে P কমিয়া যাইবে। আর্থিক নীতি প্রয়োগের ব্যাপারে এই সকল বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক তাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। মনে রাখা দরকার, P হইল টাকার সাধারণ ক্রয়শক্তি, অর্থাৎ এই P হইল দেশের সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড়। ভোগদ্রব্য, উৎপাদক দ্রব্য, অর্থনৈতিক কাজকর্ম, সোনা, শেয়ার সকল প্রকার দ্রব্য, যাহা লইয়া T গঠিত তাহাদের সকলের পক্ষে প্রযোজ্য টাকার এক সাধারণ ক্রয়-ক্ষমতা পরিমাপের সূচক হইল এই P.

P কাহাকে বলে কিসের উপর নির্ভর করে

কেম্ব্রিজ সমীকরণ (Cambridge Equation)

কেম্ব্রিজের ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেষত মার্শাল, অর্থমূল্যের পরিমাণ তত্ত্বের ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। ফিসার যেমন টাকার যোগান-এর উপর

জোর দিয়া তাঁহার তত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন, কেম্ব্রিজের ধনবিজ্ঞানীরা সেইরূপ টাকার চাহিদার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তাঁহাদের মতে, লোকে নির্দিষ্ট সময়ের বিন্দুতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধরিয়া রাখিতে চায়, তাহাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফিসারীয় সমীকরণে টাকার চাহিদা বলিলে বোঝা যায়, ইহার সহিত বিনিময় যোগ্য সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর স্রোতধারা, বিনিময়-যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণের দ্বারাই টাকার চাহিদা স্থির হয়। কেম্ব্রিজের ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সকল দ্রব্যসামগ্রীর জন্যই চাহিদা সৃষ্টি হয় না, সুতরাং সেইরূপে টাকার চাহিদা হিসাব করার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, কিছু পরিমাণ টাকা জিনিসপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ধরিয়া রাখিতে চান বা হাতে জমাইয়া রাখিতে চান। অর্থাৎ মোট দ্রব্যসামগ্রীর বা আসল আয়ের (Real Income) কিছু অংশ ক্রয়ের জন্য বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে টাকার চাহিদা করে : টাকার জন্য সকল ব্যক্তির এইরূপ চাহিদা যোগ করিলে সমাজে টাকার মোট চাহিদা পাওয়া যায়।

টাকার চাহিদার ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা

মনে করা যাক্, দেশে 100 খানা কাপড় সমাজের মোট আসল আয় (Real Income)। ইহার কিছু অংশ যেমন, $\frac{4}{5}$ অংশ, অর্থাৎ 80 খানা কাপড় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিনিময় হইবে। সমাজে যত টাকা আছে, তাহা দিয়া ব্যক্তিরা এই সময়ের মধ্যে সকলে মিলিয়া 80 খানা কাপড় ক্রয় করিতে চায়, সুতরাং সকল টাকা এই 80 খানা কাপড় ক্রয়েই ব্যয়িত হইবে। যদি দেশে টাকার যোগান 400 হয়, তবে প্রত্যেকটি কাপড় ক্রয় করিতে গড়ে 5 টাকা ব্যয় হইল, কাপড়ের গড় দামস্তর হইল 5। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দামস্তর বৃদ্ধি হইবে, কারণ সেই বর্ধিত অর্থও 80টি কাপড় ক্রয়ের উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হইল। টাকার পরিমাণ কমিলে দামস্তরও কমিবে।

কেম্ব্রিজ তত্ত্বকে আমরা একটি সমীকরণ বা ফর্মুলার আকারেও প্রকাশ করিতে পারি।

R হইল সমাজের আসল আয় (100); নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসল আয়ের যে আনুপাতিক অংশ লোকে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং যাহার জন্য তাঁহারা টাকার চাহিদা করে তাহা হইল K ($\frac{4}{5}$) ; টাকার পরিমাণ হইল M (400)। তাহা হইলে M পরিমাণ টাকা দিয়া তাহারা KR পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে

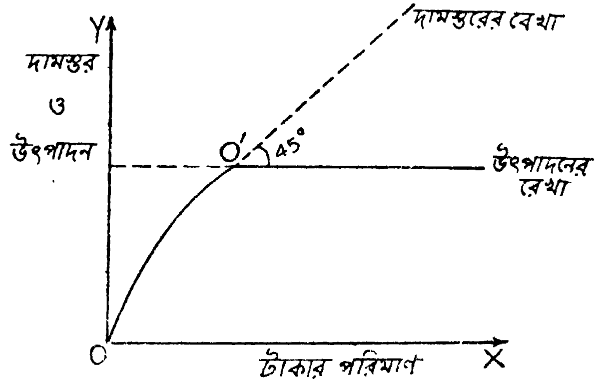
চাহে। টাকার মূল্য হইল ইহার বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, অর্থাৎ KR/M. টাকার মূল্যের বিপরীত হইল দামস্তর, সুতরাং উপরোক্ত সমীকরণকে উল্টাইয়া স্থাপন করিলে দামস্তর বা P পাওয়া যায়, অর্থাৎ P= M/KR. এই তত্ত্ব ও সমীকরণের আরও অনেক ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছিল; কেইন্‌স, পিগু সকলেই কোন না কোন বিষয়ের উপর জোর দিয়া নিজ নিজ সমীকরণ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিসারীয় পরিমাণতত্ত্ব এবং কেম্ব্রিজ পরিমাণতত্ত্বে মৌলিক কোন প্রভেদ নাই; ফিসারীয় পরিমাণতত্ত্বের সমালোচনাসমূহ মোটামুটি কেম্ব্রিজ পরিমাণতত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য। ফিসারীয় তত্ত্বে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, টাকার সহিত বিনিময় করা হইল এইরূপ সকল দ্রব্যসামগ্রীর গড় দামস্তর বা অর্থের মূল্য বাহির করার চেষ্টা করা হইয়াছে; রবার্টসনের ভাষায় ইহা হইল "উড়ন্ত টাকার মূল্য" (Value of "*Money on the wing*")। কেম্ব্রিজ তত্ত্বে, নির্দিষ্ট সময়ে কিছু পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতের লেন-দেনের জন্য হাতে জমা-রাখা টাকার মূল্য বাহির করার চেষ্টা হইয়াছে, রবার্টসনের ভাষায় ইহা হইল 'উপবিষ্ট' অর্থের মূল্য (Value of "*Money Sitting*")।

টাকার পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Quantity of Money and the Price level)

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, ক্লাসিকাল ও নয়াক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে দেশে টাকার পরিমাণের উপর দামস্তর নির্ভর করে। এই তত্ত্বকে ফিসার যে সমীকরণের আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইল PT=MV. তাঁহার মতে, স্বল্পকালে V ও T পরিবর্তিত হয় না, সুতরাং M-এ পরিবর্তন আসিলে তবেই একমাত্র P-তে পরিবর্তন আসিতে পারে। এই কারণে আমরা দেখিতে পাই যে, V ও T অপরিবর্তিত থাকিবে এইরূপ অনুমানের উপরই ফিসারীয় তত্ত্বের সত্যতা নির্ভর করে, অর্থাৎ এই তত্ত্বের মতে দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িলে সেই টাকা যাহাদের হাতে পৌঁছায় সেই অধিবাসীদের ক্রয়শক্তি সরাসরি ও সমপরিমাণে বৃদ্ধি পায়। লোকের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু জিনিসপত্রের পরিমাণ বাড়িল না, কারণ দেশে পূর্ণনিয়োগ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। তাই তৎক্ষণাৎ দামস্তর বাড়িবে। কিন্তু যদি পূর্ণনিয়োগ না থাকে তবে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িলে উহাদের উৎপাদন বাড়িবে, দেশের উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ স্তর বাড়িয়া যাইবে। ক্রমে সমাজে পূর্ণনিয়োগ দেখা দিবে।

ফিসারীয় তত্ত্ব

তাহার পরেও টাকার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। আমরা ইহাকে নিচের চিত্রে দেখাইতে পারি :



OX অক্ষে টাকার পরিমাণ এবং OY অক্ষে উৎপাদন ও দামস্তর পরিমাপ করা হইতেছে। O হইতে X-এর দিকে যত অগ্রসর হইতেছে উৎপাদন তত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সকল দেশে পূর্ণনিয়োগ নাই, অনিযুক্ত উপাদানগুলির নিয়োগ বাড়িতেছে। দামস্তর বাড়িতেছে না। উৎপাদন বৃদ্ধির শীর্ষতম বিন্দু হইল O′। এই বিন্দুতে পূর্ণনিয়োগ ঘটিয়াছে! ইহার পরে উৎপাদনের রেখা ঐ স্তরেই আছে। তখনও যদি টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তবে দামস্তরের রেখা উপরে উঠিতে থাকিবে। O′ বিন্দুতে এই দুই রেখার মিলনস্থলের কোণটি 45°, অর্থাৎ উহার পরে টাকার পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়িবে দামস্তরও সেই হারে বৃদ্ধি পাইবে। এইজন্য বলা হয় যে, যদিও অনেক বিষয়ে ইহা দোষদুষ্ট তবুও পূর্ণ-কর্মনিয়োগ স্তরে টাকার পরিমাণতত্ত্ব কার্যকরী হয়।

পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে ইহা কার্যকরী হয়

উপরের আলোচনা হইতে আমাদের নিকট বিষয়টি সরল মনে হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, টাকার পরিমাণ দামস্তরকে প্রত্যক্ষভাবে বা সোজাসুজি প্রভাবিত করে না, অনেক প্রকার বিষয় ও শক্তিকে প্রভাবিত করিয়া পরোক্ষভাবে দামস্তরের উঠানামার উপর নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, কেইন্‌সের মতে, টাকাব পরিমাণ বাড়িলে, অন্যান্য সকল কিছু সমান অবস্থায়, উহার

প্রথম প্রভাব হইবে সুদের হারের উপর। লোকের নগদ-পছন্দ সমান আছে ধরিয়া লইলে তাহারা কি পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায় তাহা মোটামুটি স্থির। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়লে ঋণের বাজারে বেশি টাকা আসিয়া যাইবে, তাই কম সুদে ঋণ পাওয়া সম্ভব হইবে, অর্থাৎ সুদের হার হ্রাস পাইবে। সুদের হার কমিলে দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, অনিয়োজিত উপাদানসমূহ ক্রমে নিযুক্ত হইতে থাকিবে। কেইন্‌স তাই বলিয়াছেন যে, "যতদিন পর্যন্ত বেকার থাকে, ততদিন টাকার পরিমাণে পরিবর্তনের অনুপাতে কর্মসংস্থান বাড়ে; এবং যখন পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকে তখন টাকার পরিমাণের একই অনুপাতে দাম পরিবর্তিত হয়।"*

কোন্ কোন্ শক্তির উপর প্রভাবের মাধ্যমে টাকা দামস্তরকে প্রভাবিত করে

টাকার পরিমাণে পরিবর্তন কোন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে কিরূপে প্রবেশ করে তাহা এখন আমরা মোটামুটি বুঝিতে পারিয়াছি। অনেক সময় বিষয়টি সহজ ও সরল করার উদ্দেশ্যে আমরা বলিতে পারি যে, টাকা এমন এক ধরনের মদ যাহা অর্থনৈতিক দেশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সতেজ রাখে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, পানাধার ও অধরের মাঝে বহুবার স্খলনের সম্ভাবনা আছে (several slips between the cup and the lip)। টাকার পরিমাণে পরিবর্তন সুদের হার কমাইয়া দিবে, ইহা আশা করা যায় বটে, কিন্তু টাকার পরিমাণ অপেক্ষা লোকের নগদ পছন্দ বেশি বাড়িতে থাকিলে ইহা ঘটিতে পারে না। আবার সুদের হারে হ্রাস দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইবে বলিয়া আশা করিতে পারি, কিন্তু ইহা সম্ভব হইবে না যদি মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা সুদের হারের তুলনায় অধিক হারে কমে। আবার, আমাদের আশা হইল বিনিয়োগের পরিমাণে বৃদ্ধি দেশে কর্মসংস্থান বাড়াইবে কিন্তু যদি ভোগপ্রবণতা হ্রাস পাইতে থাকে, তবে ইহা সম্ভবপর হয় না। সর্বশেষে, যদি কর্মসংস্থান বাড়ে, তবে দামস্তরে বৃদ্ধির মাত্রা নির্ভর করিবে দেশের উৎপাদন-কাঠামো হইতে যোগান বাড়াইবার ক্ষমতার

সেই পথে কি কি বাধা দেখা দিতে পারে

* "So long as there is unemployment, *employment* will change in the same proportion as the quantity of money; and when there is full employment *price* will change in the same proportion as the quantity of money." Keynes, *General Theory*, P. 296.

উপর (physical supply functions) এবং টাকার হিসাবে মজুরী বাড়িবার উপর।*

উপরের এই আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি এবং কার্যকরী চাহিদার পরিমাণে বৃদ্ধি ঠিক নির্দিষ্ট একই হারে ঘটে, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি না। এবং টাকার পরিমাণ বাড়িলেই কার্যকরী চাহিদা বাড়িল, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিল, সোজা লাইন ধরিয়া সমাজ একেবারে সরাসরি পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরে পৌঁছিয়া গেল—পথ এত সরল নহে—টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি ও আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, এই উভয়ের সম্পর্ক অতীব জটিল—অন্তত কোনরূপ পরিমাণগত ভবিষ্যদ্বাণী ইহাদের সম্পর্কে করা চলে না। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির ফল নির্ভর করে : (ক) নগদ-পছন্দের উপর ইহার প্রভাব (খ) গুণকের আয়তন, এবং (গ) মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার উপর ইহার প্রভাব—এই সকল বিষয়ের উপর। সঠিকভাবে ইহাদের কাহারও সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই পরিমাণগত পরিমাপ করা চলে কি ?

টাকার পরিমাণে বৃদ্ধির ফল কিসের উপর নির্ভর করে

দামস্তরে স্বল্পকালীন পরিবর্তন আনয়নকারী বিষয়সমূহ—(Factors bringing Short Period changes in the Price level)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে টাকার পরিমাণে পরিবর্তন হইলে দামস্তরে পরিবর্তন আসে। টাকার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর বাড়ে, ইহার পরিমাণ কমিলে দামস্তর কমে ; পরস্পরের এই সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও সমানুপাতিক।

* "We are able to catch a glimpse of the way in which changes in the quantities of money work their way into the economic system. If however we are tempted to assert that money is the drink which stimulates the system to activity, we must remind ourselves that there may be several slips between the cup and the lip. For whilst an increase in the quantity of money may be expected *cet par*, to reduce the rate of interest, this will not happen if the liquidity preferences of the public are increasing more than the quantity of money, and whilst a decline in the rate of interest may be expected *cet. par.*, to increase the volume of investment, this will not happen if the schedule of marginal efficiency of capital is falling more rapidly than the rate of interest ; and whilst an increase in the volume of investment may be expected, *cet. par*, to increase employment, this may not happen if the propensity to consume is falling off. Finally, if employment increase, prices will rise in a degree partly governed by the shapes of the physical supply functions and partly by the liability of the wage-unit to rise in terms of money. And when output has increased and prices have risen, the effect of this on liquidity preference will be to increase the quantity of money necessary to maintain a given rate of interest." Keynes, *General Theory*, P. 173.

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে, দেশের সাধারণ দামস্তর নির্ভর করে সমাজের মোট ব্যয় এবং মোট উৎপাদন-পরিমাণের উপর। মোট ব্যয় নির্ভর করে মোট আয়ের উপর। যদি আয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় তবে ব্যয়ের পরিমাণ নিশ্চয় হ্রাস পাইবে, দামস্তরও কমিয়া যাইবে, যদি উৎপাদনের পরিমাণ সমান থাকে। তাই বলা হয় যে, আয়স্তরে উঠানামা-ই দামস্তরে উঠানামা ঘটায়: টাকার পরিমাণে পরিবর্তন ইহা ঘটায় না। টাকার পরিমাণ কারণ নয়, ইহা কার্যফল, মোট ব্যয়ে পরিবর্তনের ফল। যে টাকা ব্যয় হয় তাহাই সমাজে বিভিন্ন উপাদানের মালিকের আয়, তাই মোট ব্যয়=মোট আয়। দামস্তর হইল মোট জাতীয় আয়÷মোট উৎপন্ন, অর্থাৎ $P=Y/O$. মোট উৎপন্ন অর্থাৎ O সমান অবস্থায়, যদি Y বাড়ে তবে P বাড়িবে, যদি Y কমে তবে P-ও কমিবে।

এই আয়স্রোতে বা ব্যয়স্রোতে পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির আর্থিক আয় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের অংশ যোগ করিয়া সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয় পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি এককভাবে পূর্বাপেক্ষা নিজের আয়ের অধিক অংশ সঞ্চয় করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে সমাজের মোট সঞ্চয় বাড়ে না। কোন ব্যক্তির অধিক সঞ্চয়ের ফলে নিশ্চয়ই কোন না কোন দ্রব্যের বিক্রেতার আয় কমিয়া যাইবে, ফলে তাহার সঞ্চয় কমিবে। সুতরাং, ইহাতে সমাজের মোট সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হইবে না। কোন ব্যক্তির ব্যয় বৃদ্ধি হইলে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি হয়, কোন ব্যক্তির ব্যয় কমিলে অন্যান্য ব্যক্তির আয় কমিয়া যায়। কিন্তু সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয় নির্ভর করে মোট জাতীয় আয় ও গড় সঞ্চয়প্রবণতার (Propensity to save) উপর। দেশে গড় সঞ্চয়-প্রবণতা বাড়িয়া গেলে, অর্থাৎ আয়ের সহিত সঞ্চয়ের অনুপাত বৃদ্ধি পাইলে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। পূর্বাপেক্ষা মোট আর্থিক আয়ের কম অংশ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হইবে, ভোগ্য দ্রব্যের দামস্তর কমিয়া যাইবে। অপর-পক্ষে, সঞ্চয়প্রবণতা কমিয়া গেলে মোট আর্থিক আয়ের অধিক অংশ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হওয়ায়, উহাদের দামস্তর বাড়িবার ঝোঁক দেখা দিবে।

সঞ্চয়ে পরিবর্তন হইলে

বিনিয়োগ বলিলে বুঝা যায়, নূতন মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে অর্থ লগ্নী করা। সমাজ অপূর্ণ কর্ম-নিয়োগের স্তরে থাকিলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে অনিয়োজিত উপাদান-সমূহের নিয়োগ বাড়িতে থাকে। নূতন কাজে নিযুক্ত এই সকল

উপাদানের মালিকদের আর্থিক আয় বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা ভোগদ্রব্য ক্রয়ে অধিক ব্যয় করিতে থাকায় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা, উৎপাদনের পরিমাণ, উপাদানের নিয়োগ, আর্থিক আয় ক্রমে বাড়িতে থাকে। কোন কোন উপাদানের পরিমাণ দেশে কম থাকিলে তাহাদের পূর্ণনিয়োগ ঘটিবে, দাম বাড়িতে থাকিবে, উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, দামস্তরও ক্রমে বাড়িয়া যাইবে। সমাজ পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌঁছিলে বা তাহার পূর্বেই তাই বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বাড়ে। দেশে বিনিয়োগ কমিলে ইহার বিপরীত ফলাফল হইবে। উপাদানসমূহের নিয়োগ কম হইবে, তাহাদের আর্থিক আয় কমিয়া যাইবে, দ্রব্যসামগ্রীর উপর সমাজের মোট ব্যয় কমিতে থাকিবে, দামস্তরও হ্রাস পাইতে থাকিবে।

বিনিয়োগে পরিবর্তন হইলে

সুতরাং কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঞ্চয়-প্রবণতা ও বিনিয়োগের পরিমাণের উপর দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তর নির্ভর করে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায়, সঞ্চয়-প্রবণতা মোটামুটিভাবে স্থির ও অপরিবর্তনশীল। লোকের অভ্যাস, জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে তাহাদের চিন্তা ধারণা প্রভৃতির উপর ইহা নির্ভরশীল, দীর্ঘকালে ইহার পরিবর্তন ঘটিলেও স্বল্পকালীন বিশ্লেষণে ইহা মোটামুটিভাবে স্থির। সুতরাং, বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তনই প্রধান শক্তি, ইহার ফলেই স্বল্পকালে দামস্তরে পরিবর্তন আসে। বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন সমাজের মোট আর্থিক আয়কে এবং ফলে মোট ব্যয়ের পরিমাণকে পরিবর্তিত করে, দামস্তর তাহার ফলে পরিবর্তিত হয়।

বিনিয়োগের পরিবর্তনই প্রধান

মনে রাখা দরকার, পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের দাম নির্ভর করে উহার উৎপাদন-ব্যয়ের উপর এবং উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে সেই উৎপাদন-ব্যয়ে পরিবর্তন আসে। দেশে টাকার পরিমাণে পরিবর্তন প্রত্যক্ষ ও পৃথকভাবে কোন বিশেষ দ্রব্যের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে না। তবে, টাকার পরিমাণে পরিবর্তন হইলে সুদের হারে পরিবর্তন ঘটিয়া উৎপাদন-ব্যয়ও পরিবর্তিত হইতে পারে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিবর্তন সমাজের আর্থিক আয় ও কর্মনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আনে, সুতরাং বিভিন্ন দ্রব্যের

পৃথকভাবে কোন দ্রব্যের দামে পরিবর্তন

চাহিদাও পৃথকভাবে প্রভাবান্বিত হয়। এইরূপে সমাজের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর দামের উপর পৃথক পৃথক ভাবেও প্রভাব বিস্তার করে।*

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation)

মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন তত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে মোটামুটি দুইটি পৃথক ধারা দেখিতে পাওয়া যায়—উহার মধ্যে একটি ধারা অতি প্রাচীন, অপরটি গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম বা প্রাচীন ধারাটি টাকার পরিমাণ তত্ত্বের কোন না কোনরূপ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই মত অনুযায়ী দেশে টাকার পরিমাণ-বৃদ্ধির ফলে যদি দামস্তর বাড়ে, তবে তাহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। টাকার সঙ্গে বিনিময়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ-বৃদ্ধির তুলনায় দেশে টাকার পরিমাণ বাড়ে বলিয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, ইহাই মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের মতানুযায়ী টাকার পরিমাণে যে কোন বৃদ্ধিকেই মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া মনে করা হইত। টাকার পরিমাণের উপর অহেতুক এই অস্বাভাবিক জোর দেওয়ায় অনেক সময় ভুল ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইল। যেমন, অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্য লইয়া যদি সরকার বেশি নগদ টাকা বাজারে ছাড়িত তবে তাহাকেও অনেক সময় মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া বিরোধিতা করা হইত।

পরিমাণতত্ত্বের ধারা

এই সম্পর্কে দ্বিতীয় মত বা ধারার সূত্রপাত হয় 'Lectures on Political Economy' নামক গ্রন্থে উইক্সেলের দামস্তর সম্পর্কে আলোচনা হইতে। তাঁহার অভিমত ছিল এই যে, ঠিক যেমন কোন একটি দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা হয় উহার চাহিদা ও যোগান দ্বারা, সেইরূপ সাধারণ দামস্তর নির্ভর করে এইরূপ দামস্তরের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা এবং মোট যোগানের উপর। "সুইডিশ" মুদ্রাস্ফীতি তত্ত্ব, অনেকাংশেই এই উইক্সেলীয় ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ও উহার পরবর্তীকালে ইহারই ভিত্তিতে মোটামুটি এই তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাড়্‌তি চাহিদাতত্ত্বের ধারা

টাকার পরিমাণের দিকে লক্ষ্য কম রাখিয়া যখনই দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা ও উহার যোগানের দিকে চিন্তা করা যায়, তখনই 'বাড়্‌তি চাহিদার ধারণা' (concept of excess demand) ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা-

* সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে পূর্ণতর আলোচনা আয় ও কর্মসংস্থান তত্ত্ব আলোচনার সময়ে করা হইয়াছে।

মূলক কোন এক বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান রেখা দুইটি দিকে লক্ষ্য রাখিলে আমরা মনে করিতে পারি যে, 'বাড়্তি চাহিদা' হইল নির্দিষ্ট দামে মোট চাহিদা ও মোট যোগানে পার্থক্য। নির্দিষ্ট কোন দামে এই বাড়্তি চাহিদা ধনাত্মক, শূন্য বা ঋণাত্মক (positive, zero, or negative) তিন প্রকার হইতে পারে।

'বাড়্তি চাহিদা'-র এই ধারণা ক্রমশ উন্নত হইয়া বর্তমানকালে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান (Inflationary Gap) রূপে আলোচিত হইতেছে। মুদ্রাস্ফীতির তত্ত্ব বিশ্লেষণের কাজে এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে আজকাল এই ফাঁক বা অবকাশ বা ব্যবধান (Gap) আলোচিত হইতেছে। লর্ড কেইন্‌স প্রথমে How to pay for the war গ্রন্থে এইরূপ আলোচনার সূত্রপাত করেন। তবে 'মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান' এই কথাটি প্রথমে ব্রিটেনের চ্যান্সেলর অব্ এক্সচেকার 1941 সালে কমন্স সভায় বক্তৃতাকালে ব্যবহার করেন।

মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক কাহাকে বলে

মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কাহাকে বলে? মুদ্রাস্ফীতির সুরু হওয়ার পূর্বে জিনিস-পত্রের দামকে বলে মূল দাম (base prices); বাজারে বিক্রয়যোগ্য জিনিসকে মূল দাম দিয়া গুণ করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতে সম্ভাব্য বা প্রত্যাশিত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ব্যয়ের আধিক্য বা বাড়্তিটুকু হইল মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান (An excess of anticipated expenditure over available output at base prices)। ইহাকে সূত্রের আকারে প্রকাশ করা চলে :

মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান = প্রত্যাশিত ব্যয় − বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র × মূল দাম।

মূল দাম (base prices) দিয়া বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র কিনিতে যে পরিমাণ টাকার দরকার যদি সম্ভাব্য ব্যয় তাহাই থাকে তবে কোন মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক দেখা দেয় না, দামস্তরও বাড়ে না। সাধারণত, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির মূল্য ও জাতীয় আয় সমান, সুতরাং এক্ষেত্রে কোন ব্যবধান সৃষ্টি হইতেছে না, দামস্তর স্থির আছে ও আর্থিক ভারসাম্য বজায় আছে। কিন্তু যদি পুরাণো সঞ্চিত আয় হইতে বা নূতন টাকা সৃষ্টি করিয়া জাতীয় আয় বা অর্থের স্রোতধারা বাড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে দেশের সম্ভাব্য ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। এইরূপে সম্ভাব্য ব্যয় অধিক হইলেই বিক্রয়-যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ সমান থাকায় জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে থাকে; মূল দামসমূহের

এই ফাঁক কেমন করিয়া মুদ্রাস্ফীতি বা দামস্তরে বৃদ্ধি ঘটায়

উপর অধিক ব্যয়ের চাপ পড়ে, দামস্তর বাড়ে ও মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হয়। যেমন, ধরা যাউক, মূল দামসমূহের হিসাবে বাজারে বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের মোট মূল্য হইল 1000 টাকা। সম্ভাব্য ব্যয় যদি 1000 টাকাই থাকে তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি হইবে না; কিন্তু যদি সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ 1400 টাকা হয়, তাহা হইলে এই 400 টাকা বিক্রয়-যোগ্য জিনিসপত্র কেনাতে খরচ হইতে চাহিবে; ফলে দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যাইবে। এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি আনয়নকারী ব্যবধান হইল 400 টাকা।

কিরূপে এই ফাঁক সৃষ্টি হয়

সম্ভাব্য-ব্যয়ের পরিমাণ স্থির হয় ভোগ-সঞ্চয়ের ধরণ ও কর-কাঠামোর (Consumption-savings patterns plus the tax structure) সম্মিলিত প্রভাবের দ্বারা; বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ স্থির হয় কর্ম-সংস্থানের অবস্থা ও যন্ত্র-কৌশলগত কাঠামোর দ্বারা (conditions of employment plus the technological structure) নিচের উদাহরণ হইতে কিরূপে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান সৃষ্টি হয়, তাহা আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

বর্তমানের জাতীয় আয় ও দ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যয়=1600 টাকা

বিভিন্ন প্রকার কর (কেন্দ্রীয়: প্রাদেশিক বা স্থানীয়)=200 টাকা

তাহা হইলে, ব্যয়োপযোগী আয় বা সম্ভাব্য ব্যয়=1400 টাকা

মোট জাতীয় আয় (মূল দামসমূহের হিসাবে)=1100 টাকা

(অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির পূর্বেকার দামসমূহের হিসাবে)

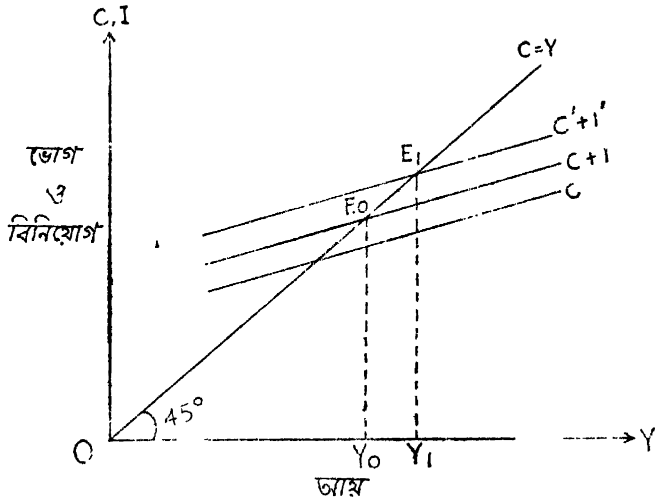
আত্মভোগ (Self-consumption) বা বিক্রয়ের জন্য বাজারে অনুপস্থিত দ্রব্যাদির মূল্য=100 টাকা

সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি আনয়নকারী ব্যবধান=400 টাকা।

আসলে অবশ্য 1400 টাকার ব্যয়োপযোগী আয় সবটাই ব্যয় হয় না, কিছুটা সঞ্চিত হয়। যদি স্বাভাবিক অবস্থায় জনসাধারণ শতকরা 10% সঞ্চয় করে তাহা হইলে 140 টাকা সঞ্চিত হইবে এবং 1260 টাকা (1400-140) দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয়িত হইতে চাহিবে। এমতাবস্থায়, প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক হইল 260 টাকা (1260-1000)। এই মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক ধারণাটিকে আমরা পরপৃষ্ঠায় ছবির সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি:

উপরের চিত্রটিতে লম্বমুখী অক্ষে ভোগ ও বিনিয়োগ এবং ভূসমান্তরাল অক্ষে আয় পরিমাপ করা হইতেছে। 45° রেখাটিতে দেখান হইতেছে, সকল আয়ই

ভোগব্যয় হইয়া যায়, উহাকে শূন্য-সঞ্চয়ের রেখা (zero saving function) বলিতে পারা চলে। বিভিন্ন আয়ের স্তরে কিরূপ মোট ভোগব্যয় হয় উহা C রেখা



দ্বারা বোঝা যাইতেছে। বিভিন্ন আয়ের স্তরে মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় মিলিতভাবে প্রকাশ করিতেছে C+I রেখা। ইহা C রেখাটির ঊর্ধ্বে অবস্থিত, কারণ ভোগব্যয়+বিনিয়োগব্যয় কেবলমাত্র ভোগব্যয় হইতে বেশি। মোট আয়=ভোগব্যয়+বিনিয়োগব্যয়, তাই E_0 বিন্দুতে ভারসাম্যের আয়স্তর অর্থাৎ OY_0 দেখা যাইতেছে। এই OY_0 আয়স্তরে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে ধরা হইতেছে।

এই অবস্থায় সমাজে সরকারী ও বেসরকারী ভোগ ও বিনিয়োগব্যয় বাড়িয়া গেল। C+I রেখাটি ঊর্ধ্বে উঠিল, ইহা এখন C'+I' রেখায় পরিণত হইল। ফলে নূতন আয়স্তর Y_1 দেখা দিবে। মোট উৎপন্ন হইল E_0Y_0, পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকায় ইহা আর বাড়িতে পারিল না, অথচ জাতীয় আয় E_1Y_1 (অথবা OY_1) ইহা হইতে বেশি। E_1 হইতে E_0-র লম্বমুখী দূরত্বই মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান। এই ব্যবধান দূর না হইলে E_0 Y_0-র দাম বৃদ্ধি পাইবে। এই ব্যবধান পূর্ণ করিতে হইলে (ক) সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কমাইতে হইবে, হয় কর বসাইয়া বা সঞ্চয় বাড়াইয়া, অথবা (খ) বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

আমরা জানি যে, পূর্ণনিয়োগ স্তরের পরেই একমাত্র প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি (True Inflation) দেখা দিতে পারে। অপূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে সুদের হার কমিবে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইবে, অনিয়োজিত উপাদানসমূহের নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে, দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়িবে। এইরূপে সমাজ পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে পৌঁছিবে। তাহার পর টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বা উপাদানের নিয়োগ বাড়াইতে পারিবে না, ফলে দামস্তর বাড়াইয়া দিবে।*

প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি

অনেক সময় পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে পৌঁছিবার পূর্বেই দামস্তর বৃদ্ধি পায়, এরূপ অবস্থাকে কেইন্‌স আংশিক মুদ্রাস্ফীতি (Partial Inflation) বলিয়াছেন। শিল্পে অনুন্নত দেশে বা উন্নত দেশেও পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরে পৌঁছিবার পূর্বেই এইরূপ আধা-মুদ্রাস্ফীতি (Semi-Inflation) দেখা দিতে পারে। এইরূপ আধা-মুদ্রাস্ফীতির 5টি কারণ আছে। (ক) প্রথমত, বর্ধিত টাকার সকল পরিমাণ কর্ম-সংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদন বাড়াইবার কাজে নিয়োজিত না হইতে পারে। যেমন, ব্যবসায়ীরা বর্ধিত টাকার কিছুটা ফাট্‌কাবাজারে খাটাইয়া দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দিতে পারে, এইরূপ কয়েকটি দ্রব্যের দাম বাড়িলে তাহা অপরাপর দ্রব্যের দামবৃদ্ধির জন্য চাপ দেয়। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যসামগ্রীর বাজার তেজী না হইয়া শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের বাজার তেজী হইয়া উঠিতে পারে।

আংশিক মুদ্রাস্ফীতির কারণসমূহ

(খ) দ্বিতীয়ত কোন উপাদান বা উপকরণের সকল ইউনিট নিপুণতার দিক হইতে সমান নয়। নিপুণ ইউনিটগুলি প্রথমেই নিযুক্ত হইয়া যায়; উৎপাদন বাড়িলে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কম নিপুণ ইউনিট বা একেবারে অনিপুণ ইউনিটগুলির সাহায্যে উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে উৎপাদনব্যয় বাড়িতে থাকে এবং দামস্তর বৃদ্ধির দিকে প্রবণতা দেখা যায়। (গ) তৃতীয়ত, কতকগুলি উপাদানের যোগান খুবই কম থাকিতে পারে, ফলে অন্যান্য উপাদানসমূহ বেকার অবস্থায় থাকিলেও দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন আরও বাড়ান অসম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। যে সকল উপকরণের যোগান হঠাৎ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ায় উৎপাদন

* তবে পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে পৌঁছিয়া যদি ক্রমাগত শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইয়া দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ান হয়, তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি না-ও ঘটিতে পারে। কিন্তু স্বল্পকালে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ান সম্ভব না-ও হইতে পারে সুতরাং ততদিন মুদ্রাস্ফীতি চলিতে থাকিবে।

বৃদ্ধিতে "প্রতিবন্ধকের" (Bottlenecks) সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের পরিবর্তে অন্য উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব হইলে দামস্তরে বৃদ্ধি কম হইবে। এইরূপ অবস্থায় দামস্তরে বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে ওই সকল উপকরণের বিনির্দিষ্টতার মাত্রার উপর (degree of specificity)। (ঘ) চতুর্থত, নবনিযুক্ত উপ-করণের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শ্রমিকদল মজুরি বৃদ্ধির জন্য চাপ দিতে পারে, কারণ ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির স্তরে দ্রব্যমূল্য কিছুটা বাড়ে। মজুরি বৃদ্ধি হইলে তাহা দুইভাবে দামস্তরকে বাড়াইয়া দেয়; দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়াইয়া এবং দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি করিয়া। (ঙ) পঞ্চমত, স্বল্পকালে ফার্মের মাত্রা স্থির রাখিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টায় প্রান্তিক ও গড় উৎপাদনব্যয় কিছুটা বাড়ে এবং দামস্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকার ভেদ (Types of Inflation)

লর্ড কেইন্স, তাঁহার 'Treatise on money' গ্রন্থে চারিপ্রকার মুদ্রাস্ফীতির কথা বলিয়াছেন; (ক) দ্রব্যস্ফীতি (Commodity Inflation), (খ) মূলধনী দ্রব্যস্ফীতি (Capital Inflation), (গ) মুনাফারূপে মুদ্রাস্ফীতি (Profit Inflation) এবং (ঘ) আয়রূপে মুদ্রাস্ফীতি (Income Inflation)।

দ্রব্যস্ফীতি (Commodity Inflation) বলিলে বোঝা যায়, দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণের তুলনায় বিনিয়োগের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে (The excess in the cost of investment over the volume of saving); অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যসমূহের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় উহাদের দামস্তরের বৃদ্ধি বেশি হইয়াছে।

দ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যস্ফীতি

মূলধনী দ্রব্যস্ফীতি (Capital Inflation) বলিলে বোঝা যায়, এই অবস্থায় নূতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় উহাদের দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। নূতন-মূলধনী দ্রব্যের দামস্তরে বৃদ্ধি টাকার ক্রয়ক্ষমতাকে প্রথমেই কমাইয়া দেয় না; কিছুকাল পরে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন আনিয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়।

মুনাফারূপে মুদ্রাস্ফীতি তখন ঘটে যে অবস্থায় দ্রব্যমূল্য স্থির আছে, কিন্তু উৎপাদনের ব্যয় কমিয়া যাওয়ায় মোট মুনাফা পূর্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে। আয়রূপে মুদ্রাস্ফীতি হইল যে অবস্থায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে উৎপন্ন দ্রব্য-

পিছু পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ দক্ষতাজনিত পারিশ্রমিকের হার (rate of efficiency-earnings) বাড়িয়া গিয়াছে।

পরবর্তী কালে, কেইন্‌স্‌ প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি (True Inflation) এবং ভুয়া মুদ্রাস্ফীতির (False Inflation) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। পূর্ণ কর্মসংস্থানের পূর্বে কোন কোন উপাদানের যোগান কম থাকায় বা বিভিন্ন প্রকার "প্রতিবন্ধকের" দরুণ উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া ভুয়া মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিতে পারে। অনেক সময় প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতিকে পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি (Full Inflation) এবং ভুয়া মুদ্রাস্ফীতিকে আংশিক মুদ্রাস্ফীতি (Partial Inflation) বলা হয়।

প্রকৃত ও ভুয়া

অধ্যাপক পিগুর মতে মুদ্রাস্ফীতি দুই প্রকারের: ঘাটতি ব্যয়ের চাপজনিত (Deficit Induced) বা মজুরির চাপজনিত (Wage-induced)। দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং দামস্তরের বৃদ্ধির জন্য, যুদ্ধের প্রয়োজনে বা বিশেষ কারণে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে সমাজে আয়ের পরিমাণ বাড়ে এবং এই আয়বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বাড়িতে থাকে। দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে সরকারী ব্যয় আরও বাড়াইতে হয়, নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া সেই ব্যয় বাড়ান হয়, ফলে মুদ্রাস্ফীতির আরও প্রসার ঘটে। ইহাকে ঘাটতিব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

ঘাটতি-উদ্ভূত ও মজুরি-উদ্ভূত

দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং দামস্তরের বৃদ্ধির দরুণ শ্রমিকগণের সংঘবদ্ধ চাপের ফলে মজুরির পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদন-ব্যয় আরও বৃদ্ধি পায়; বর্ধিত মজুরি দিবার জন্য ব্যবসায়ীরা মুনাফা না কমাইয়া দামস্তর বাড়াইয়া দেয়। শ্রমিকগণ পুনরায় মজুরি বৃদ্ধির জন্য চাপ দেয়। উৎপাদন-ব্যয় পুনরায় বৃদ্ধি পায় এবং দামস্তর আরও বর্ধিত হয়; এইরূপে চক্রধারায় (Spiral movement) মুদ্রাস্ফীতি বাড়িতে থাকে, দামস্তরে বৃদ্ধি—মজুরি বৃদ্ধি—দামস্তরে আরও বৃদ্ধি, এইরূপ এক দুষ্টচক্রের (Vicious Circle) সৃষ্টি হয়। ইহাকে মজুরির চাপজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

মুদ্রাস্ফীতি আরও দুই ধরনের হইতে পারে, অবাধ মুদ্রাস্ফীতি (Open Inflation) এবং দমিত মুদ্রাস্ফীতি (Suppressed Inflation)। সমাজের মোট-আয় ও ব্যয়ের পরিমাণে বৃদ্ধি যখন অবাধভাবে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা এবং দামস্তর বাড়াইবার সুযোগ পায় তখন দামস্তরের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে অবাধ মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অবাধ মুদ্রাস্ফীতিরোধের কোনরূপ প্রচেষ্টা না

হইলে উহা অবশেষে উল্লম্ফনশীল মুদ্রাস্ফীতিতে (Galloping Inflation) পরিণত হয়। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, অল্প সময়ের মধ্যে দামস্তরে অনবরত বৃদ্ধিকে, অর্থাৎ টাকার মূল্যে দ্রুত পতনকে উল্লম্ফনশীল মুদ্রাস্ফীতি বলা চলে। যদি মুদ্রাস্ফীতি রোধের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিকট হইতে অধিক টাকা বা আয় সরাইয়া না আনিয়া দ্রব্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বা ভোগ-নিয়ন্ত্রণ (রেশনিং) চালু করা হয় অথবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে (Investment sector) সংকুচিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দ্রব্যমূল্য বিশেষ বৃদ্ধি না হইয়াও ব্যাঙ্ক-আমানতের পরিমাণ ও নগদ টাকার মজুতের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এইরূপ অবস্থাকে 'রুদ্ধ'বা 'দমিত' মুদ্রাস্ফীতি (Repressed) বলা চলে।

উন্মুক্ত ও দমিত

কেন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে (Why Inflation)

চাহিদা ও যোগান উভয় দিক হইতেই মুদ্রাস্ফীতির চাপ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে চাহিদা বলিলে বোঝা যায় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করিবার জন্য সমাজে কি পরিমাণ ব্যয়োপযোগী আয় রহিয়াছে এবং এক্ষেত্রে যোগান বলিলে বোঝা যায় আর্থিক আয় ব্যয় করা যাইতে পারে এরূপ কি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বাজারে রহিয়াছে। চাহিদার দিকে মুদ্রাস্ফীতিকারী প্রধান শক্তিসমূহ (Inflationary forces) হইল : (ক) টাকার যোগান, (খ) ব্যয়োপযোগী আয় (Disposable income), (গ) ভোগকারীদের ব্যয় ও ব্যবসায়ীদের লগ্নী, (ঘ) বৈদেশিক চাহিদা।

(ক) ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রসারের ফলে নগদ টাকার যোগান যেমন বাড়ান হয়, সেইরূপ ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজনেই ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ বা ঋণগত টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়। ব্যাঙ্কঋণের বৃদ্ধি এক সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও ফল উভয়ই বটে। (খ) ব্যয়োপযোগী আয় নির্ভর করে কর-কাঠামোর উপর। যদি করভার কমান হয় তাহা হইলে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বা মোট ব্যয় বাড়িয়া যায়; যদি করভার বাড়ান হয়, তাহা হইলে ব্যয়োপযোগী আয় বা মোট ব্যয় কমে। শ্রমিক সংঘের চাপে মজুরি-হারের বৃদ্ধি হইলেও সমাজে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বাড়ে। ব্যবসায় সমৃদ্ধির যুগে বেশি পরিমাণে নূতন মূলধন লগ্নী হয় এবং এই লগ্নী বিভিন্নরূপে, যেমন

চাহিদার দিক হইতে কারণসমূহ

শেয়ারের লভ্যাংশ, মজুরি, কাঁচামাল ক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রভৃতি দ্বারা সমাজের আয়স্রোতে প্রবেশ করে। ইহার সহিত "কল্যাণ রাষ্ট্রের" জনহিতকর কার্যে ব্যয় বা অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির (economic growth) দরুণ ব্যয় সমাজের মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান (Inflationary gap) আরও বাড়াইয়া দেয়।

(ঘ) দেশের দ্রব্যসামগ্রীর জন্য বৈদেশিক ব্যয়ও মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ। যদি কোন দেশ নিয়মিতভাবে "রপ্তানির উদ্বৃত্ত" (Export surplus) বজায় রাখিতে চাহে, তাহা হইলে দেশে আয়-স্তর বাড়ে এবং বিদেশী দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ কম হওয়ায় দেশী দ্রব্যের উপরই এই অধিক আয়ের চাপ পড়ে, আভ্যন্তরীণ দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যোগানের দিক হইতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবার অন্যতম মূল কারণ হইল (ক) উপাদানসমূহের পূর্ণতর নিয়োগ। কাঁচামাল, শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির দুষ্প্রাপ্যতা দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ করে। (খ) দেশ হইতে বিদেশে দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানিও আভ্যন্তরীণ যোগান কমাইয়া দেয়। রপ্তানির উদ্বৃত্ত একদিকে আভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে দেশে দ্রব্যের যোগান কমাইয়া দেয়। যে সকল দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বিশেষ শক্তিশালী, তাহাদের অধিক রপ্তানি মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ আরও বাড়াইয়া তোলে।

যোগানের দিক হইতে কারণসমূহ

সর্বশেষে, একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা দরকার। টাকার চাহিদা ও যোগান দ্বারা অথবা মোট ব্যয় ও মোট দ্রব্যসামগ্রীর হিসাব দ্বারা মুদ্রাস্ফীতিকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা চলে না, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ধারণা ও প্রত্যাশা (Expectations) মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যক্ষ কারণ না হইলেও ইহার গতিবেগ নির্ণয় করে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা ও আন্দাজী ধারণা চারিটি উপায়ে মুদ্রাস্ফীতির প্রসার-বেগকে প্রভাবান্বিত করে। (ক) ভবিষ্যতে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িবে, এই ধারণার ফলে বর্তমানেই বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া যায়, ফলে মুদ্রাস্ফীতির গতিবৃদ্ধি সুরু হইতে পারে। (খ) ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধি হইবে এইরূপ ধারণার ফলেও বর্তমানে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে। ভবিষ্যতে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা যত প্রবল ততই বর্তমানে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা; প্রধানত ইহা নির্ভর করে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতার (Income elasticity of Demand)

দাম ও আয় সম্বন্ধে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন আশানিরাশা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিনিয়োগকারীদের ধারণা

উপর। উদ্যোক্তাগণ বা ব্যবসায়ীরাও ভবিষ্যৎ আয় বৃদ্ধির ধারণা অনুযায়ী বর্তমানে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া থাকে। ভবিষ্যতে মজুরির হার বৃদ্ধি হইতে পারে এই ধারণার ফলে ব্যবসায়ীরা বর্তমানেই দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দিতে পারে। (ঘ) ভবিষ্যৎ বৈদেশিক চাহিদা সম্বন্ধে ধারণা বর্তমানের উৎপাদন ও দামকে প্রভাবান্বিত করে।

অর্থের মূল্যে পরিবর্তনের ফলাফল (Effects of Changes in the Value of Money):

উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব: দামস্তরে বৃদ্ধি বা দামস্তরে হ্রাস অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন (Deflation) দেশে উৎপাদনের এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। দামস্তর বাড়িয়া গেলে কর্মনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে, উৎপাদনের প্রসার হয়। অধিক মুনাফা লাভের আশায়, ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়িবে এই ভরসায়, ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন বাড়াইয়া ফেলেন এবং তাহাদের বিনিয়োগে বৃদ্ধি সমাজে মোট আয়ের পরিমাণকে আরও বাড়াইয়া মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ ক্রমে প্রবলতর করিয়া তোলে। বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর সকলেই পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে বাড়িতে থাকে, ঘূর্ণিচক্রের (Spiral) গতিতে ইহারা প্রসার লাভ করে। অর্থনৈতিক কাজকর্মের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলাফল সকল সময়ে শুভ নহে, উৎপাদন-ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা ও ফাট্‌কা মনোভাব বৃদ্ধি পায়, বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় উদ্যোক্তাগণ ও ফাট্‌কাদারগণ অসঙ্গত আশাবাদের ঝোঁকে সমাজে দ্রব্যের প্রয়োজন ও উহার বিক্রয়-যোগ্যতার কথা চিন্তা না করিয়া অহেতুক উৎপাদনকে ফাঁপাইয়া তোলেন। এই সকলের পুঞ্জীভূত ফল হইল অধিকোৎপাদন এবং হঠাৎ ব্যবসায়-সংকটের সৃষ্টি, ব্যবসায়-সমৃদ্ধির বুদ্বুদ হঠাৎ ফাটিয়া গিয়া উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর সকল কিছুকে অস্বাভাবিক ভাবে কমাইয়া দেয়। অবিক্রীত দ্রব্যের বোঝা বাড়িতে থাকে, অস্বাভাবিক নিরাশাবাদের ঝোঁকে সংকট গভীরতর হইতে থাকে। দামস্তর কমিতে থাকিলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়, বিনিয়োগ সবই দ্রুত হ্রাস পায়। সম্ভাব্য মুনাফার হার কম থাকায় মুদ্রাসংকোচনের (Deflation) সৃষ্টি হয়।

উৎপাদনের উপর প্রভাব

মনে রাখা দরকার যে, অনুন্নত দেশসমূহে বা অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে

অল্পমাত্রায় মুদ্রাস্ফীতি প্রয়োজনীয় এবং উহা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক বলিয়া আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে, সমাজে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিতে ইহা সাহায্য করে। তবে, লক্ষ্য রাখা দরকার যেন ইহা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া না যায়, আয়ত্তরের মধ্যে রাখিয়া ইহাকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় ব্যবহার করা চলিতে পারে।

বণ্টনের উপর প্রভাব: দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের উপর মুদ্রাস্ফীতি বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করে, সমাজের একাংশ হইতে সম্পদ অপর অংশের হাতে চলিয়া যায়।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে ইহাতে ঋণগ্রহীতাগণের সুবিধা, মুদ্রাস্ফীতিতে তাহাদের আয়ও বৃদ্ধি হওয়ায় ঋণপরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়ায় তাহারা সমান পরিমাণ টাকা পরিশোধ করিলেও দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাদের কম পরিশোধ করিতে হইতেছে। দামস্তর বেশি থাকায় টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়াছে এবং সেই কম-ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন টাকার সাহায্যে ঋণ পরিশোধ করিলে দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাকে কম দিতে হইতেছে। ঋণদাতাগণের অসুবিধা, কারণ মুদ্রাস্ফীতির পূর্বে টাকার মূল্য যখন বেশি ছিল সেই অবস্থায় তাঁহার ঋণ দিয়াছিলেন, এখন সেই ঋণের পরিশোধ হইলেও সমপরিমাণ টাকার দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য, যদি ক্রয়ক্ষমতা কমে নাই এমন বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণের পরিশোধ সে পায় তাহা হইলে ঋণদাতার লোকসান হয় না। তবে সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সমাজের ব্যক্তিগণ একই সঙ্গে সাধারণত ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতারূপে কাজ চালায়। তাই ঋণদাতা হিসাবে কোন ব্যক্তির লোকসান হইলেও ঋণগ্রহীতা হিসাবে লাভ হয়।

ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতা

মুদ্রাস্ফীতির সময়ে উদ্যোক্তাগণের সুবিধা হয় কারণ দামস্তর বাড়িলে বেশি দামে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া তাহাদের লাভ বাড়িবার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া, সাধারণত তাঁহারা ঋণগ্রহীতা, সুতরাং মুদ্রাস্ফীতিকালের কম ক্রয়ক্ষমতা-বিশিষ্ট টাকার সাহায্যে তাঁহারা ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। দাম-বৃদ্ধি এবং ব্যয়বৃদ্ধির মধ্যে কিছুদিন সময়ের ফাঁক (time-lag) থাকে, যতদিন না পর্যন্ত শ্রমিকের মজুরি, কাঁচামালের দাম, যন্ত্রপাতির দাম বা সুদের হার বৃদ্ধি পায় ততদিন তাহারা দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির সম্পূর্ণ সুবিধা লাভ করেন। "স্বাভাবিক মুনাফা" হইতে বাস্তবে-প্রাপ্ত মুনাফার

উদ্যোক্তা

পরিমাণ খুবই বেশি থাকে। মুদ্রাসংকোচনের সময় উদ্যোক্তাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ তাঁহারা সাধারণত ঋণগ্রহীতা, এবং তাহা ছাড়া, দ্রব্যের দামহ্রাস ও উহার ব্যয়হ্রাসের মধ্যে কিছুকাল সময়ের ফাঁক থাকে।

দাম ও মজুরি উভয়ের দৌড়ে মজুরি কখনও জেতে না, তাই শ্রমিকগণ বা মজুরি আয়কারীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাহাদের আয় স্থির ও নির্দিষ্ট, সুতরাং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে তাঁহার নির্দিষ্ট আয়ের দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাইয়া থাকেন। দামস্তর বৃদ্ধি হারের তুলনায় মজুরি বৃদ্ধির হার কম থাকে, সুতরাং দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাঁহাদের আয় কমিয়া যায়; আর্থিক আয়ের বৃদ্ধি হইলেও আসল আয় কমে। পেনশনভোগী বা নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিদেরও এই প্রকার অসুবিধা হয়। তবে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকের সুবিধা, বেকারি বা কর্মে নিযুক্ত থাকার সম্ভাবনা মোটামুটি বেশি।

শ্রমিক ও বেতনভোগী

বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যাঁহারা শেয়ার প্রভৃতিতে টাকা বিনিয়োগ করিয়াছেন মুদ্রাস্ফীতিতে তাঁহাদের সুবিধা হয়; কিন্তু যাঁহারা নির্দিষ্ট সুদ বা আয় লাভের জন্য বণ্ড বা ডিবেঞ্চারে টাকার লগ্নী করেন, তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। নিম্ন মধ্যবিত্তগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ তাঁহারা সাধারণত নির্দিষ্ট সুদে ব্যাঙ্কে বা বীমা কোম্পানীতে অর্থ-সঞ্চয় করেন।

বিনিয়োগকারী

কৃষিজীবিদের মধ্যে যাঁহাদের জমি-জমা আছে এবং মজুর খাটাইয়া জমি চাষ করেন বা নির্দিষ্ট খাজনাতে জমি ভাড়া দেন তাঁহাদের লাভ হয়। কিন্তু ভূমিহীন কৃষি মজুরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। সাধারণত শিল্প-জাত দ্রব্যের দাম কৃষিজাত দ্রব্যের তুলনায় বেশি বাড়ে, সুতরাং, শিল্পে নিযুক্ত উদ্যোক্তাদের তুলনায় কৃষিতে নিযুক্ত উদ্যোক্তাগণ কম লাভবান হন।

কৃষিজীবি

মুদ্রাস্ফীতির ফলে করদাতাদের সুবিধা হয়, কারণ করভার একটু বৃদ্ধি হইলেও টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাদের কম দিতে হয়। রাষ্ট্রীয় ঋণের ভারও কমে, কারণ ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্র দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে কম সম্পদ পরিশোধ করে। মুদ্রা-সংকোচনের সময় করের আর্থিক ভার সমান থাকে, কিন্তু টাকার মূল্য বেশি হওয়ায় আসল ভার (Real burden) বাড়ে। রাষ্ট্রীক ঋণের আসল ভারও মুদ্রা সংকোচনের সময় বৃদ্ধি পায়।

করভার ও রাষ্ট্রীয় ঋণ

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ (Control of Inflation) :

সমাজের মোট ব্যয় যখন মোট দ্রব্যোৎপাদনের তুলনায় অধিক হারে বাড়িতে থাকে তখন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি রোধের দুইটি উপায় আছে: দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে বৃদ্ধি এবং সমাজের টাকার পরিমাণ বা আর্থিক আয়-ব্যয়ের পরিমাণ কমান। দেশে উৎপাদনের পূর্ণ নিয়োগ থাকিলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় কেবলমাত্র শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইয়া এবং উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিয়া। দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় উপাদানের নিয়োগ বাড়াইয়া এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া। অবশ্য, ইহার ফলে সমাজের মোট ব্যয় বাড়িতে পারে এবং সাময়িকভাবে মুদ্রাস্ফীতি প্রবলতর হইতে পারে।

দ্রব্যোৎপাদন বৃদ্ধি

সমাজের মোট আর্থিক ব্যয় কমাইবার জন্য যে সকল পদ্ধতি আছে সেই সকল পদ্ধতিকেই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা সম্ভব। এই সকল পদ্ধতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (ক) আর্থিক (Monetary) পদ্ধতিসমূহ, (খ) ফিস্‌কাল (Fiscal) পদ্ধতিসমূহ এবং (গ) প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের (direct controls) পদ্ধতিসমূহ।

আর্থিক পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগকারী হইলেন দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। টাকার বাজারের শীর্ষে অবস্থান করিয়া দেশের আর্থিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের সুদের হার বা ব্যাঙ্কহার বাড়াইয়া দিবে। ব্যাঙ্কহার বাড়িলে দেশের ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণত তাহাদের সুদের হার বাড়াইবে এবং ঋণগ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় উদ্যোক্তাগণ বা ভোগকারীগণ ঋণের পরিমাণ কমাইয়া ফেলিবে এবং সমাজের মোট আর্থিক ব্যয় কমিয়া আসিবে। দ্বিতীয়ত, টাকার যোগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল ব্যাঙ্কঋণ; সুতরাং ইহার পরিমাণ কমাইবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের নিকট তাহাদের নগদ-আমানতের অধিক অংশ জমা হিসাবে চাহিতে পারে। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকার পরিমাণই ঋণপ্রসারের ভিত্তি, সুতরাং আমানতের যে অংশ জমা হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের নিকট গচ্ছিত রাখে, তাহার পরিমাণ বাড়াইয়া দিলে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ কমিবে, সুদের হারও বাড়িবার সম্ভাবনা। এইভাবে সমাজের ঋণগত টাকার প্রসারকে (expansion of credit money) কমাইয়া ফেলা সম্ভব।

আর্থিক পদ্ধতি : ব্যাঙ্ক হার বৃদ্ধি, নগদ জমার অংশ বৃদ্ধি, খোলা বাজারের কার্য-কলাপ, পৃথকভাবে বাছাই ক'রয়া বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারী কাজকর্ম (open market operations) চালু করিতে পারে, অর্থাৎ সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া লোকের হাত হইতে নগদ টাকা তুলিয়া লইতে পারে ; ফলে আয়-স্রোত হইতে নগদ টাকা কমিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণও কমিবার সম্ভাবনা। চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দেশ দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ বন্ধ করিয়া দিতে পারে বা কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ দান করিতে হইলে বন্ধকীমূল্যের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ দিতে পারে। ইহার ফলে যে শিল্পে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ বেশি বা যে দ্রব্যের বাজারে অধিক ফাট্‌কা ব্যবসায় চলিতেছে, অথবা যে মূল শিল্পসমূহে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব অবাঞ্ছনীয়—এইরূপ পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর। ঋণ নিয়ন্ত্রণের এই বাছাই পদ্ধতিগুলি (Selective credit control) মুদ্রাস্ফীতির সময়ে প্রয়োগ করা খুবই দরকার ; কারণ, সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সংকুচিত হইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যাহত হইবে এবং মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং, বাছাই করিয়া, বিশেষভাবে ফাট্‌কাদারী ব্যবসায়গুলি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই দরকার।

ফিস্‌কাল পদ্ধতিসমূহের মধ্যে, প্রথমত, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন সরকারী ব্যয় কম হয়। সরকারের চেষ্টা হইবে একই সঙ্গে ব্যয় কমান এবং আয়-বৃদ্ধি করা। সরকারী ব্যয় দেশের মোট ব্যয়ের একাংশ, সুতরাং ইহা কমাইলে দ্রব্যসামগ্রীর উপর চাহিদার চাপ কমিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইহারই সঙ্গে নূতন নূতন কর আরোপের দ্বারা বা বর্তমান করের হার বাড়াইয়া ব্যক্তির হাত হইতে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ কমাইয়া ফেলাও দরকার। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, করসমূহের প্রকৃতি কিরূপ, যেন তাহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যোৎপাদনে বিনিয়োগ কমাইয়া না দেয়। সাধারণভাবে, বাজেট উদ্বৃত্ত রাখিতে হইবে। মনে রাখা দরকার যে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সকল কর বাড়ান হইলেও আমদানি-শুল্ক বাড়ান উচিত নহে, তবে রপ্তানিশুল্ক বাড়ান উচিত। রপ্তানিশুল্কের বৃদ্ধি এবং আমদানিশুল্কের হ্রাস দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বাড়াইতে পারে, ফলে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ কমিতে পারে। তৃতীয়ত, সমাজ-দেহ হইতে টাকা সরাইয়া আনিবার জন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয়-পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা দরকার। ব্যক্তিদের আয় হইতে একাংশ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসাবে সরকারের হাতে তুলিয়া আনা উচিত। সরকারী ঋণপত্ররূপে সেই সঞ্চয় জমা থাকিবে, মুদ্রাস্ফীতির পরে অপসৃত এই আয় ব্যক্তিদের ফেরৎ দেওয়া হইবে।

করপদ্ধতি : সরকারীব্যয় কমান, আয় বৃদ্ধি, জনসাধারণের হাত হইতে আয় তুলিয়া লওয়া, রপ্তানি শুল্কের বৃদ্ধি আমদানি শুল্কের হ্রাস বাধ্যতামূলক সঞ্চয়

প্রত্যক্ষ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে প্রধান হইল দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ। স্বল্পকালের মধ্যে হঠাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব না হইলেও যে সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতিজনিত অনুভূতিশীল (Inflation-sensitive), তাহাদের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কম মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে এইরূপ ক্ষেত্র হইতে উপকরণ সরাইয়া আনা দরকার। এই সকল দ্রব্যের আমদানিও মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাইতে সাহায্য করিবে। এইরূপে উপকরণের নিয়োগবিন্যাসে পরিবর্তন (changes in the allocation of resources) মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ কমাইতে পারে। উপকরণের দাম বাড়াইবার প্রচেষ্টাও নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এবং উপাদানের বাজারে একচেটিয়া অধিকার থাকিলে তাহাও ভাঙিয়া দেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, মজুরি-নিয়ন্ত্রণের নীতি। দেশে মজুরির হার এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার যাহাতে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির দরুণ আয়-বৃদ্ধি পায় এবং জীবনযাত্রার মান না কমে, অথচ সেই মজুরির বৃদ্ধির দরুণ দ্রব্যসামগ্রীর দাম আরও বাড়িয়া না যায়। সুতরাং শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত মজুরি বৃদ্ধির যোগ থাকা দরকার, অধিক দ্রব্যোৎপাদন করিতে পারিলে তবেই যাহাতে মজুরি-বৃদ্ধি হয় (ফলে দ্রব্যের ইউনিট পিছু উৎপাদনব্যয় কমিতে পারে) তাহা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। উদ্যোক্তাগণ মজুরি বাড়াইলেও যেন দাম বাড়াইতে না পারে অর্থাৎ নিজেদের মুনাফা কমাইয়া যেন সেই বর্ধিত মজুরি দেয় সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। তৃতীয়ত, দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং-এর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সরকারী হস্তক্ষেপের দ্বারা অন্ততপক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। কিন্তু, সাধারণত দাম নিয়ন্ত্রণের ফলে দ্রব্যাদি খোলা বাজার হইতে 'কালোবাজারে' চলিয়া যায় এবং অতিরিক্ত দামে বিক্রয় হইতে থাকে। সুতরাং সকলে যাহাতে নিয়ন্ত্রিত দামে জিনিসপত্র পাইতে পারে এজন্য ইহার সঙ্গে রেশনিং-প্রথা প্রবর্তন করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতি: দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, মজুরি নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং ও দামনিয়ন্ত্রণ

অনুশীলনী

1. Examine critically the Quantity theory of money.
2. Critically examine Fisher's Quantity equation as an explanation of short period changes in the price level.
3. Explain the Cash Transactions Standard.
4. Discuss the determinants of cash transactions variables.
5. Explain the relationship between the Quantity of Money and the Price Level.
6. What factors bring short period changes in the price level.
7. Explain how Savings and Investment explain fluctuations in the general level of prices.
8. Define Inflation and discuss the various types of inflation.
9. When does inflation occur? Discuss the effects of inflation on production and distribution of wealh.
10. What do you mean by Inflation? Examine the methods that can be adopted for controlling inflation.

৮

আর্থিক নীতির লক্ষ্য

Objectives of Money Policy

আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক নীতি ও লক্ষ্য সাধনের জন্য আর্থিক নীতিকে প্রয়োগ করা হয়, আর্থিক নীতি অর্থ নৈতিক নীতিরই অঙ্গ। এরূপ ভাবে দেশের আর্থিক নীতি স্থির করা হয় যে তাহা সামগ্রিক অর্থ নৈতিক নীতির সাফল্য লাভে সাহায্য করে। সুতরাং স্থান কাল, ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজের ও রাষ্ট্রের কাঠামো, দেশের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য প্রভৃতির উপর আর্থিক-নীতি নির্ভর করে। বিভিন্ন অবস্থায় কিরূপ আর্থিক নীতি প্রয়োগ করা হয় তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। ব্যাঙ্কহারে পরিবর্তন, খোলাবাজারে কার্যকলাপ প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা শেষ হইয়াছে। এখন আমাদের জানা দরকার দেশের আর্থিক নীতির বিশেষ কোন লক্ষ্য থাকিবে কি না এবং কোন একটি লক্ষ্য গ্রহণ করার তাৎপর্য কি।

আর্থিক নীতি অর্থ-নৈতিক নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ

(১) বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিরতা (Stability of external value):

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যখন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন আর্থিক নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল টাকার বহির্মূল্যের স্থিরতা। উর্ধ্বে ও নিম্নে দুই স্বর্ণবিন্দুর মধ্যে বিনিময় হারে উঠানামা সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই সীমার মধ্যেই স্বর্ণের গমনাগমনের ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তর, উৎপাদন ও ব্যয়স্তরের কাঠামোতে পরিবর্তন হইত। "খেলার নিয়মসমূহ" মানিয়া চলিয়া স্বর্ণমান বজায় রাখা আর্থিক নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল বলা চলে। এই আর্থিক নীতির ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার হইয়াছিল, বৈদেশিক বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

স্বর্ণমান ব্যবস্থায়

কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিবর্তিত অর্থ নৈতিক অবস্থায় টাকার বহির্মূল্য অপেক্ষা উহার অন্তর্মূল্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ টাকার অন্তর্মূল্যে পরিবর্তন ঘটিলে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান প্রভাবান্বিত হয়, অন্তর্মূল্যকে বাহিরের বিভিন্ন ঘটনাস্রোতের দ্বারা নির্ধারিত হইতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। আধুনিক যুগের উগ্র অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদ (Autarcky) আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রার মান ও

বর্তমান অবস্থায় পরিবর্তন

দেশের অর্থ নৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়া টাকার বহির্মূল্যের ভারসাম্য রক্ষা করাকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করে না।

মনে রাখিতে হইবে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ থাকা উচিত নহে; দেশের স্বার্থ অনুযায়ী উভয় মূল্যকেই কখনও স্থির রাখা উচিত এবং কখনও বা পরিবর্তিত হইতে দেওয়া উচিত, যদিও পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ভরযোগ্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা নিশ্চয় দরকার।

(২) মৃদুবর্ধনশীল দামস্তর (A gently rising price level) :

অনেকের মতে দেশের আর্থিক নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত মৃদুবর্ধনশীল দামস্তর বজায় রাখা, কারণ (ক) দামস্তরে বৃদ্ধিই দেশে উদ্যোক্তাদের প্রেরণাশক্তি ও উৎসাহবর্ধক হিসাবে কাজ করে। দেশে দামস্তর বর্ধনশীল হইলে শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে, দেশে কর্মসংস্থান আয়স্তর প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, বেকারি দূর হয়। (খ) মৃদু বর্ধনশীল দামস্তরই উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প সমৃদ্ধির কারণ বলিয়া রবার্টসন মনে করেন। (গ) তাহা ছাড়া মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক কালের সমাজে মোট ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতেছে। যদি দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে না থাকে তাহা হইলে ব্যক্তিদের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ ঋণের ভার বহন করা ক্রমশ শক্ত হইয়া উঠিবে; দামস্তরে ক্রমশ বৃদ্ধিই ঋণের আসল ভার (Real burden) কমাইয়া দিতে পারে। ধীরে ধীরে অদৃশ্য উপায়ে, ঋণদাতাদের চক্ষুর অন্তরালে ঋণের আসল ভার কমাইয়া আংশিকভাবে ঋণপরিশোধের কাজ করাও মৃদুবর্ধনশীল দামস্তরের ফল বলা চলে।

গ্রহণের পক্ষে যুক্তি-সমূহ

কিন্তু অনেকের মতে, শিল্পবাণিজ্যের উদ্যোক্তাদের এইরূপ কোন উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহাদের 'স্বাভাবিক' মুনাফা এবং পারিশ্রমিকই যথেষ্ট উৎসাহ দান করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত। (খ) তাহা ছাড়া এই বর্ধনশীল দামস্তর তাহাদের মধ্যে অযোগ্য ও নিরুৎসাহী উদ্যোক্তাদের বাঁচাইয়া রাখিবে, দামস্তর বাড়িতে থাকায় অযোগ্যের বিলুপ্ত ঘটিয়া সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে না। (গ) দাম বাড়িবে ইহা পূর্বেই জানা থাকিবে কাঁচামাল ও উপকরণের দামও পূর্ব হইতে বাড়িয়া যাইবে, ফলে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া শিল্পোৎসাহ কমাইয়া দিতেও পারে। (ঘ) দামস্তরে বৃদ্ধিতে মুনাফার বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু মজুরির

গ্রহণের বিপক্ষে যুক্তি সমূহ

হার সেই অনুপাতে কখনই বাড়ে না ; ফলে জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বিশেষ ভাবে কমিয়া যায়। (ঙ) সর্বোপরি, দামস্তরে মৃদুবৃদ্ধি বিনিয়োগের বাজারে ফাট্‌কা ব্যবসায়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে, সমগ্র শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা ও অতিরিক্ত মুনাফালোভিতার আবহাওয়া আনিয়া দিবে, ব্যবসায়-সংকটের পথ ক্রমশ প্রশস্ত করিবে। অস্বাভাবিক শিল্প সমৃদ্ধির মধ্যেই আগামী শিল্পসংকটের বীজ উপ্ত থাকে।

সিদ্ধান্ত

এতদ্‌সত্ত্বেও, অনেকে মনে করেন যে, যদি উপাদানের ব্যয় এবং ফাট্‌কা ব্যবসায় বন্ধ রাখা যায় তাহা হইলে এই নীতি গ্রহণ করা উচিত ; কারণ, বেকারি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ ও আয়স্তরে বৃদ্ধির জন্য দামস্তরে মৃদু বৃদ্ধি বিশেষ সাহায্য করিতে পারে।

(৩) মৃদু পতনশীল দামস্তর (A gently falling Price level) :

গ্রহণের পক্ষে যুক্তি সমূহ

মৃদু পতনশীল দামস্তরের স্বপক্ষে বলা হয় যে, (ক) বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও উন্নত যন্ত্র-কৌশলের প্রয়োগের ফলে অর্থনৈতিক দিক হইতে সমগ্র সমাজের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদন ক্ষমতায় বৃদ্ধির হার অনুযায়ী দামস্তরও কমিয়া আসা উচিত, কারণ তাহা হইলেই জনসাধারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফল লাভ করিতে পারিবে। (খ) তাহা ছাড়া দামস্তর কমিতে থাকিলে শ্রমিক, বেতনভুক ব্যক্তিগণ ও নির্দিষ্ট আয়কারী ব্যক্তিগণ সকলেরই দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে আসল মজুরি বৃদ্ধি পায়, জীবন যাত্রার মান উন্নত হইয়া উঠে। (গ) সমাজের গড় উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও যদি দামস্তর না কমে তাহা হইলে মুনাফা বৃদ্ধি পায় (কারণ মজুরির হার বা অন্যান্য ব্যয় কখনই সেই হারে বাড়ে না) অর্থাৎ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফললাভ করে ব্যবসায়ী শ্রেণী ; জনসাধারণ সেই ফললাভে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। দামস্তরে বৃদ্ধি অবশেষে চরমতম স্তরে সমাজকে পৌঁছাইয়া ব্যবসায় সংকটের সৃষ্টি করে।

গ্রহণের বিপক্ষে যুক্তি সমূহ

এই আর্থিক নীতি গ্রহণের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে মৃদু পতনশীল দামস্তর শিল্পবাণিজ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া দেয় এবং দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আবহাওয়া বজায় রাখিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির বা অগ্রগতির হার পরিমাপের বহু বাস্তব অসুবিধা আছে, বিশেষত সেই অগ্রগতি ঘটিবার সময়েই উহা সঠিকভাবে পরিমাপ করা চলে না।

(৪) স্থির দামস্তর (Stable Price Level) :

টাকা হইল দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড, ঋণ পরিশোধের মাপকাঠি এবং মূল্যের সঞ্চিত রূপ। এরূপ অবস্থায় উহার মূল্য স্থির থাকা সর্বদা বাঞ্ছনীয়, কারণ একমাত্র তাহা হইলেই সমাজে বহুপ্রকার অনিশ্চয়তা ও ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। (খ) দামস্তরে হঠাৎ উঠানামা বা বাণিজ্যচক্র জনসাধারণের সুষ্ঠু জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক। সমৃদ্ধির "অস্বাভাবিকতা" এবং সংকটের গভীরতা উভয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে দামস্তর স্থির রাখিতে হয়। (গ) তাহা ছাড়া, দামস্তরের বৃদ্ধি বা হ্রাস সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে কাহারও উপকার করে বা কাহারও অপকার করে। সুতরাং দামস্তর স্থির রাখা সকলের স্বার্থরক্ষার পক্ষে একমাত্র ন্যায়সঙ্গত নীতি বলিয়া মনে হয়।

সুবিধাসমূহ

দামস্তর স্থির রাখার এই নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, (ক) ইহার ফলে শিল্প বাণিজ্য প্রসারের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ সৃষ্টি হয় না, সুতরাং ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। আরও বলা যায় যে, (খ) দামস্তর স্থির রাখার নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করা বিশেষ অসুবিধাজনক। কারণ দামস্তর বলিলে পাইকারী দামের স্তর না খুচরা দামের স্তর কি বোঝা যাইবে? তাহা ছাড়া সূচকসংখ্যা পরিমাপের সাহায্যে দামস্তর স্থির রাখা হইল; কিন্তু ধনীদের ব্যবহৃত বিলাস-দ্রব্যের দামে হ্রাস গরীবের ব্যবহৃত অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে বৃদ্ধি খণ্ডাইয়া দিতে পারে; এইরূপে জীবনযাত্রার মানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচকসংখ্যাতে ধরা না-ও পড়িতে পারে। (গ) বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনব্যয় হ্রাস পাইল, কিন্তু দামস্তর সমান থাকিলে জনসাধারণ সেই অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারিল না, শুধু ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধি হইল, এইরূপ ঘটিতে পারে। কেইন্‌স্ ইহাকে মুনাফা-নীতি বলিয়াছেন। সুতরাং সর্বদা দামস্তর স্থির রাখাও সম্পূর্ণ সঠিক আর্থিক নীতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

অসুবিধা-সমূহ

(৫) অর্থের নিরপেক্ষতা রক্ষা করা (Neutral Money) :

অধ্যাপক হায়েক এবং আরও কয়েকজন ধনবিজ্ঞানীর অভিমতে আর্থিক নীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার যাহাতে সমাজের আসল শক্তি সমূহের (Real forces) গতিবিধি প্রভাবিত না হয়। টাকা যেন পর্দার মত

কাজ করে, অর্থনৈতিক কাজকর্মকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করিতে না পারে ; নিষ্ক্রিয় বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কেবলমাত্র মূল্যের মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে। পণ্য-বিনিময় বা বার্টার প্রথায় সমাজে যেরূপ আসল শক্তিসমূহের দ্বারাই অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলিতে থাকে, টাকার উপস্থিতি যেন সেই আসল শক্তিসমূহের গতি প্রকৃতিকে মোটেই বিচলিত বা গতিভ্রষ্ট না করে। উৎপাদন-দক্ষতা, দ্রব্যোৎপাদনের আসল ব্যয়, ভোগকারীর পছন্দ প্রভৃতি অনার্থিক (non-monetary) শক্তিসমূহের দ্বারাই যেন দ্রব্যসমূহের দাম বা পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাত নির্দিষ্ট থাকে, টাকার পরিমাণের দ্বারা তাহারা যেন নির্ধারিত না হয়।

অর্থের নিরপেক্ষতা কাহাকে বলে

হায়েকের মতে বাস্তবে টাকার এই নিরপেক্ষতা বজায় রাখা চলে যদি সমাজে টাকার ও ঋণের "কার্যকরী যোগান" (Effective supply) স্থির রাখা যায়। সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন হইলে টাকার পরিমাণে পরিবর্তন করিতে হইবে, তাহা নহে ; দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন যেন টাকার পরিমাণকে আপনা-আপনি পরিবর্তন করায়। সমাজের মোট উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে দামস্তর যেন কমিয়া যায়, উৎপাদন-ক্ষমতা কমিয়া গেলে দামস্তর যেন বাড়িয়া যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে যেন টাকার পরিমাণ বাড়ে, জনসংখ্যা কমিয়া গেলে (যুদ্ধ বা মহামারী ইত্যাদির ফলে) টাকার পরিমাণ যেন কমে। টাকার প্রচলনবেগ বাড়িলে টাকার পরিমাণ কমাইতে হয়, প্রচলনবেগ কমিলে ইহার পরিমাণ বাড়াইতে হয়। শিল্প-কাঠামোতে পরিবর্তন হইলে, যেমন উৎপাদন-ধারা আরও বিভক্ত হইয়া গেলে, অর্থাৎ বিযোজন ঘটিলে (Disintegration in the process of Production) টাকার পরিমাণ বাড়ান দরকার।

কিরূপে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা চলে

এই নীতির বহুপ্রকার সুবিধা আছে সন্দেহ নাই। প্রথমত, উৎপাদন-ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি অনুযায়ী দামস্তরে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটান হইবে, সুতরাং দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক বিনিময়ের "আসল" অনুপাত বাহিরের প্রভাবে বিকৃত হইবে না। বাণিজ্য চক্রের সৃষ্টি হইবে না, দামস্তরে হঠাৎ উঠানামা হইয়া ব্যবসায়জগৎ বিধ্বস্ত করিবে না। দ্বিতীয়ত, যন্ত্রকৌশলে উন্নতির বা নূতনপ্রচলনের (Innovation) সহিত

এই নীতির সুবিধা-সমূহ

দামস্তর বা দ্রব্যবিনিময়ের পারস্পরিক অনুপাতে সামঞ্জস্য থাকিবে। তৃতীয়ত, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাগণ উপকৃত হইবে, শ্রমিকশ্রেণীও উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধির ফল ভোগ করিতে পারিবে।

কিন্তু অর্থের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার এই আর্থিকনীতি বাস্তবে প্রয়োগ করার বিশেষ অসুবিধা আছে। শিল্প-কাঠামোতে বা যন্ত্রকৌশলে বা টাকার প্রচলনবেগে পরিবর্তনের হার সঠিক পরিমাপ করা এবং টাকার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইয়া উহাদের প্রভাব খণ্ডাইয়া দেওয়া কোন আর্থিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে সঠিকভাবে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, সমাজে একচেটিয়া বা আধা-একচেটিয়া ব্যবসায় সংগঠন থাকায় উৎপাদনক্ষমতায় পরিবর্তন বা ব্যয়ে পরিবর্তন দ্রব্যের দামে সমহারে পরিবর্তন আনিতে পারিবে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না।

নীতি প্রয়োগের বাস্তব অসুবিধা

সর্বশেষে, ইহাও মনে রাখা দরকার, বর্তমান সমাজে টাকা হইল সক্রিয় শক্তি, ইহার পরিমাণে পরিবর্তন সুদের হারে বা মোট আয়ব্যয়ে পরিবর্তন আনিয়া দ্রব্যোৎপাদন ও কর্মসংস্থানে পরিবর্তন আনে। তরলসম্পত্তি (Liquid asset) হিসাবে ইহার আর কোন জুড়ি নাই, সুতরাং লোকে ইহা ব্যবহার করিবেই, ফলে সমাজে আসল সম্পত্তিসমূহের (Real assets) পরিমাণে ইহা নিশ্চয় প্রভাব বিস্তার করিবে।

তত্ত্বে গলদ

(৬) পূর্ণকর্মসংস্থান (Full Employment):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞান অনুযায়ী সমাজ সর্বদাই পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে আছে। কোন উপকরণ অনিয়োজিত অবস্থায় থাকিলে, উহার দাম কমাইলেই চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং উহার নিয়োগের পরিমাণ বাড়ে; দেশে শ্রমিক বেকার থাকলে মজুরির হার কমিয়া আপনা-আপনি এই বেকারি দূর হইয়া যায়।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে কেবলমাত্র মজুরির হার কমাইলেই পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে পৌঁছানো যায় না। কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে সমাজের মোট ব্যয়-পরিমাণের উপর। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উপর সমাজের মোট আয় ব্যয়িত না হইলে পূর্ণকর্মসংস্থানে পৌঁছান সম্ভব নহে। মোট ব্যয় দুই প্রকারের হইতে পারে; ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় ও মূলধনী দ্রব্য ক্রয়। সমাজের সঞ্চয়-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়া ভোগ্যদ্রব্যের ক্রয় কমিলে

মোট চাহিদা সেই পরিমাণে কমিয়া যায় এবং এই সকল ভোগ্যদ্রব্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় কমে। দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় ও চাহিদা আরও কমে, এইরূপে উৎপাদন ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পায়। এমতাবস্থায় কর্মসংস্থানের পরিমাণ বজায় রাখিতে হইলে বা বাড়াইতে হইলে মূলধনীদ্রব্যের উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। সুতরাং দেখা যায়, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছিতে হইলে তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে; ভোগপ্রবণতা বাড়াইয়া সমাজে ভোগ-ব্যয় বাড়ান, ব্যক্তি উদ্যোগী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগে বৃদ্ধি। আর্থিক নীতির সাহায্যে কি ভাবে বিনিয়োগ-ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় বাড়ান যাইতে পারে?

পূর্ণ কর্ম সংস্থানে পৌঁছিবার উপযোগী আর্থিক নীতিসমূহ

ব্যক্তি-উদ্যোগী বিনিয়োগ বাড়াইতে হইলে সুদের হার কমাইতে হয়, যাহাতে উদ্যোক্তাদের নিকট বিনিয়োগ লাভজনক বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুদের হার কমাইবার জন্য ব্যাঙ্কহার-পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় এবং টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য খোলাবাজারের কাজকর্ম প্রভৃতি নীতি গ্রহণ করা চলে। রাষ্ট্র উদ্যোগী বিনিয়োগ বাড়াইতে হইলেও টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হয়, কারণ তাহা হইলে সমাজে ব্যাঙ্কগুলির ঋণ দিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং কম সুদের হারে ঋণ পাওয়া সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, নূতন অর্থসৃষ্টি করিয়া, সেই টাকার সাহায্যে রাষ্ট্র-উদ্যোগী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ান চলে। সমাজের মোট ব্যয় বাড়াইতে হইলে কিস্তি-প্রথায় স্থায়ী ধরনের ভোগদ্রব্যের ক্রয় বাড়ান করা চলে, কিস্তির নিয়মকানুনে পরিবর্তন বা ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যাঙ্কঋণের বৃদ্ধি প্রভৃতি আর্থিক নীতির দ্বারা ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ান সম্ভবপর।

আর্থিকনীতির সীমাবদ্ধতা

অন্যান্য নীতির সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র আর্থিক নীতির দ্বারা পূর্ণকর্মসংস্থানে পৌঁছানো কি পরিমাণ সম্ভবপর তাহা সন্দেহজনক। দেশে আশাবাদী আবহাওয়া না থাকিলে টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া এবং সুদের হার কমাইয়া ব্যক্তি-উদ্যোগী বিনিয়োগ বাড়ান চলে না। এরূপ অবস্থায় শুধু আর্থিকনীতি ব্যর্থ হয়, তাই ইহারই সহিত প্রচুর পরিমাণে রাষ্ট্র-উদ্যোগী বিনিয়োগ-ব্যয় করিতে হয়; নিম্নতম ভোগব্যয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি বা নিম্নতম প্রাথমিক নগদ-জমার পরিমাণ (Minimum down Payments) কমাইলেই চলে না;

ইহারই সহিত পুনর্বণ্টনকারী কর-কাঠামো (Redistributive Tax-structure) প্রবর্তনও প্রয়োজন।

সুতরাং, অন্যপ্রকার নীতির সাহায্য ব্যতীত নিছক আর্থিক নীতির দ্বারা পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব নয়, বরং ইহাতে বিপরীত ফল হইতে পারে। যেমন সুলভ আর্থিক নীতির (Cheap money policy) ফলে সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং অসঙ্গত বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে।

৭। অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি (Economic growth) :

দামস্তর স্থির রাখা বা পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় রাখার তুলনায়, আধুনিক কালে বিশেষ করিয়া অনুন্নত দেশসমূহে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধি আর্থিক নীতির লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। আধুনিক কালে বিভিন্ন অনুন্নত দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংগঠন ও কার্যাবলী সংক্রান্ত নিয়মে স্পষ্টভাবে বলা হইতেছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির লক্ষ্য হইবে "জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত অগ্রগতি", "জাতীয় সম্পদ ও উপকরণের ক্রমোন্নতি", "দেশের ক্রমবৃদ্ধি" প্রভৃতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে যেরূপ পুরাতন লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণকর্মসংস্থান আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেইরূপ বর্তমানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগে পুরাতন ধরনের আর্থিক নীতি পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন প্রকার আর্থিক নীতি গ্রহণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে, বিশেষত অনুন্নত দেশ সমূহে

মনে রাখা দরকার যে, লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণকর্মসংস্থান এবং অর্থ নৈতিক ক্রম-বৃদ্ধি এক নহে, ইহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। পূর্ণ কর্মনিয়োগের লক্ষ্যে পৌঁছাইবার পথে যে সকল আর্থিক নীতিসমূহ গ্রহণ করা হয় তাহা অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এইরূপ হইতে পারে। অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির যে হার (the rate of economic growth) জাতির পক্ষে বজায় রাখা সম্ভব বা প্রয়োজনীয়; পূর্ণ কর্মসংস্থান লাভের পদ্ধতিসমূহের দ্বারা সেই হারে বৃদ্ধি না-ও আসিতে পারে। অন্য প্রকার পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন হইতে পারে। যেমন, পূর্ণ কর্ম-সংস্থানে পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে ভোগ-ব্যয় (Consumption expenditure) বাড়াইবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিস্তিবন্দী ক্রয়ের (Instalment

পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি—এই দুই লক্ষ্যে বিরোধ থাকিতে পারে, দুই লক্ষ্যের উপযোগী আর্থিক নীতি পৃথক হইতে পারে

purchases) সুবিধা করিয়া দিল। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য থাকিলে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে (Sector) বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়ত ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ কমাইতে হইবে। সুতরাং উভয় লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপযোগী পদ্ধতিসমূহের মধ্যে, অর্থাৎ সেই অনুযায়ী বিভিন্ন আর্থিক নীতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ দেখা দিতে পারে।

শুধু তাহাই নহে। দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় এই লক্ষ্যে বেশি বিরোধ দেখা যায় না বটে, কিন্তু কর্মনিয়োগ যতই বাড়িতে থাকে, তত উভয়ের মধ্যে গভীরতর সংঘাত সৃষ্টি হইতে পারে, কারণ তখনও ক্রমবৃদ্ধির হার পূর্বের ন্যায় অধিক রাখিলে মুদ্রাস্ফীতি ও সংকটের সম্ভাবনা বাড়িতে পারে।

অবশ্য উভয় লক্ষ্যের প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রধানত স্বল্পকালীন ধারণা এবং অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি দীর্ঘকালীন হিসাবের বিষয়।

দুই লক্ষ্যের প্রকৃতিতে কোথায় পার্থক্য

যন্ত্রকৌশল, উহার জ্ঞান ও উহার ব্যবহারের স্তর প্রভৃতি স্থির ধরিয়া সকল উপকরণের নিয়োগ পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য; কিন্তু ক্রমশ উন্নত ধরনের যন্ত্র কৌশলের (Technology) স্তর লাভ করিয়া, প্রত্যেক ধাপেই উপকরণের সফল ও পূর্ণ নিয়োগের দ্বারা তদানীন্তন উৎপাদন-ক্ষমতা ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য উপকরণ ও উৎপাদন-ক্ষমতা (Country's economic potential) ক্রমাগত বাড়াইয়া চলা অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য সাধনের জন্য কিরূপ আর্থিক নীতি গ্রহণ করা উচিত তাহা সাধারণভাবে স্থান, কাল, ক্রমবৃদ্ধির হার, প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাদি (Institutional arrangements) প্রভৃতির দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে।

অনুশীলনী

1. Examine the various objectives of Monetary policy. Which of them has become more important in modern times and why?

2. What are the objectives of Monetary policy? What objective in your opinion should be preferred?

3. How and how far full employment may be achieved through monetary policies?

৯

বেকারি ও পূর্ণনিয়োগ

Unemployment and Full Employment

কাজ করিতে সক্ষম ব্যক্তি যদি কাজ না করে, তাহা হইলেই তাহাকে বেকারি বা কর্মে অনিয়োগ বলা চলে না। অনেকে আছেন যাঁহারা নিজেরা ইচ্ছা করিয়া বেকার থাকেন, যেমন, ধনিকশ্রেণীর ব্যক্তিগণ, যাঁহাদের কাজ করিবার প্রয়োজন নাই; চোর ডাকাত প্রভৃতি এবং কর্মে নিয়োগের অযোগ্য ব্যক্তিগণ যেমন বৃদ্ধ, শিশু বা রুগ্ন প্রভৃতি। এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত বেকারিকে বা ইহাদের কর্মে অনিয়োগকে বেকারি বলা চলে না। অনেকে আছেন যাঁহারা বর্তমান মজুরির হারকে নিজেদের প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয় বলিয়া মনে করেন, সঠিকভাবে বিচার করিলে তাঁহাদেরও বেকার বলা চলে না। তবে, কেহ যদি বর্তমান মজুরির হারে কাজ করিতে চাহিয়াও শ্রম বিক্রয় করিতে না পারেন, তবেই তাঁহাকে বেকার গণ্য করা হইবে এবং এইরূপ অবস্থাকে বেকারি বা কর্মে অনিয়োগ বলা চলে। এইরূপ বেকারিকে **অনিচ্ছামূলক বেকারি** (Involuntary unemployment) বলে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে ইহা অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে গণ্য হয়। এইরূপ অনিচ্ছাকৃত বেকারি না থাকিলে সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান বা পূর্ণ কর্মনিয়োগ আছে, বলা চলে। ঐ অনিচ্ছাকৃত বেকারিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে এবং বিভিন্ন ধরনের বেকারির কারণে পার্থক্য থাকে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বেকারি ও তাহাদের কারণসমূহ নিম্নে বর্ণিত হইল।

স্বেচ্ছামূলক বেকারি ও অনিচ্ছামূলক বেকারি

(১) সমাজে **কাঠামোজনিত বা যন্ত্রজনিত বেকারি** (Structural and Technological) দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন উৎপাদন-সংগঠন, নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি, মূলধন-প্রগাঢ় নূতন যন্ত্রের প্রচলন, নূতন দ্রব্যের আবিষ্কার, চাহিদায় বিপুল পরিবর্তন, এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে কারখানা বা উৎপাদন-কেন্দ্রকে সরান, পুরাতন বা প্রাচীন শিল্প

যন্ত্রজনিত বেকারি

লোপ পাওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সমাজের কর্মসংস্থান কমিয়া যাইতে পারে, বেকারি উদ্ভূত হইতে পারে।

(২) **মরসুমী বেকারি** (Seasonal unemployment)—বহু কারণে মরশুমী বেকারী দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক শিল্পে বৎসরের কোন বিশেষ সময়ে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয় কিন্তু বৎসরের অন্য সময়ে তাহাদের কোন কাজ থাকে না (যেমন চিনির কারখানা, ধানকল, কৃষিকার্য, গৃহনির্মাণ শিল্প প্রভৃতি)। অনেক ক্ষেত্রে, বৎসরের যে কোন সময়ে হঠাৎ অধিক কাজ আসিয়া পড়ে এবং কিছুদিন পরে কাজের পরিমাণ কমিয়া যায় (যেমন বন্দর প্রভৃতি স্থানে)। বলা হয় যে, সকল কাজেরই বিশেষ ধরনের সময়-কাঠামো (Time-pattern) থাকে ; এই ধরনের বেকারিকে তাই কাল-কাঠামো জনিত বেকারি বা মরসুমী বেকারি বলা চলে।

মরসুমী বেকারী

(৩) বাণিজ্যচক্রের সংকট কালে সমাজে সামগ্রিকভাবে আয়স্তর ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং সেই ধরনের বেকারিকে **বাণিজ্য-চক্রজনিত বেকারি** (Cyclical unemployment) বলা হয়। সংকটের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায় সমৃদ্ধি সুরু হইলে এই বেকারি কমিয়া যায়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। এই বেকারির কারণ হইল বাণিজ্যচক্র ; ইহাকে আজকাল প্রধানত কর্মসংস্থান-চক্র (Employment cycle) বলিয়া গণ্য করা হয়।

বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারি

(৪) সমাজে স্বাভাবিক গতিশীলতার ফলে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত ব্যক্তিগণের বেকারিকে অনেকে **সংঘাতজনিত বেকারি** (Frictional unemployment) বলেন।

শ্রমিকের বাজারে শ্রম ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভাব থাকিলে, শ্রমিকের অচলনশীলতার ফলে, কাজকর্মের সুযোগ সুবিধা জানা না থাকিবার ফলে, উৎপাদনের পুনঃ-সংগঠনের ফলে, যন্ত্রপাতি ভাঙিয়া যাইবার ফলে, কাঁচা মালের সাময়িক অভাবের জন্য বা বৎসরের মধ্যে কিছু কাল কাজকর্ম চলিলে, বেকারি দেখা যায়। এই সকল কারণের জন্য উদ্ভূত বেকারিকে সংঘাতসৃষ্ট বেকারি (Frictional unemployment) বলে।

সংঘাত জনিত বেকারি

(৫) ইহা ব্যতীত দেশে **প্রচ্ছন্ন বেকারিও** (Disguised unemploy-

ment) থাকিতে পারে বিভিন্ন কারণের ফলে (যেমন মূলধন কম থাকায়) শ্রমিক এমন কাজে নিযুক্ত থাকিতে পারে যে তাহার শ্রমশক্তি, নৈপুণ্য, কার্যের সময় প্রভৃতি পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহার ফলে তাহার আয়ও কম হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থাকে মিসেস্ রবিনসন্ প্রচ্ছন্ন বেকারি বলিয়াছেন (যেমন ভারতীয় কৃষকগণ বৎসরের কয়েকমাস কাজের অভাবে বেকার থাকেন)। এইরূপ প্রচ্ছন্ন-বেকার ব্যক্তিদের অন্য কোথায়ও কর্মে নিযুক্ত হইবার সুযোগ নাই, তাই কম আয় হইলেও, বাধ্য হইয়া সেই কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইতেছে (যেমন মাত্র 5 বিঘা জমি 3 ভাই মিলিয়া সারা বৎসর চাষ করে); এইরূপ অবস্থাকেও বেকারি বলা হয়। ইহার কারণ হইল উপযুক্ত পরিমাণ কর্মসংস্থান ব্যবস্থার বা সুযোগের অভাব অর্থাৎ অনমনীয় কর্মসংস্থান-কাঠামোর মধ্যে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি।

প্রচ্ছন্ন বেকারি

মনে রাখা দরকার, পশ্চিমী ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা আলোচিত বেকারি আর ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশের বেকারি সম্পূর্ণ এক জিনিস নহে। উন্নত দেশসমূহে কোন লোক গরীব, কারণ সে বেকার ; আমাদের দেশে তাহার কাজ থাকিলেও সে গরীব, কারণ তাহার আয় কম, কাজ থাকা অবস্থাতেও সে আধা-বেকার। চাকুরি ও বেকারিতে পার্থক্যের সীমা রেখা টানা এইরূপ দেশে বিশেষ কষ্টকর।

এই সকল বিভিন্ন কারণ ছাড়াও সমাজে **কার্যকরী চাহিদা কম থাকায় বেকারি** থাকিতে পারে। সমাজে বেকারির সাধারণ স্তর (General level of unemployment) নির্ভর করে সমাজের সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ কম থাকার উপর শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার পরিমাণ এমন নহে যাহাতে সকল শ্রমিককে কাজে লাগান যায়। অর্থাৎ, শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে হইলে সমাজে যত পরিমাণ মোট ব্যয় হওয়া দরকার তাহা হইতেছে না, তাই শ্রমিকগণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে পারিতেছে না। এ ক্ষেত্রে বেকারির কারণ হইল সমাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কম। সমাজের মোট ব্যয়কে দুইভাগে বিভক্ত করা চলে : ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আয়বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের অনুপাত

অনিচ্ছাকৃত বেকারি

ক্রমাগত কমিয়া আসে, ফলে যদি বিনিয়োগ ব্যয় যথোপযুক্ত পরিমাণে বাড়ানো না যায়, তবে সমাজের সামগ্রিক চাহিদা কমিয়া যাইবে ; যে পরিমাণ শ্রমিক কাজ পাইতে চায়, তাহার কিছু অংশ বেকার থাকিয়া যাইবে। আধুনিক কালে ধনতান্ত্রিক সমাজের অগ্রগতির এমন স্তর আসিয়াছে যখন বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা আর বিশেষ সম্ভব হইতেছে না, ভোগপ্রবণতাও আর বাড়িতেছে না—ফলে, স্থায়ী ও দুরারোগ্য বেকার সমস্যার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি (Automation) আবিষ্কার ও প্রয়োগ সমাজের মোট কর্মসংস্থান, আয় ও ক্রয়ক্ষমতা কমাইয়া ভোগব্যয় যথেষ্ট কমাইয়া দিবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইহার ফলে বিভিন্নপ্রকার যন্ত্র উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের সম্ভাবনাও রহিত করিয়াছে। মূলধনের অতি-দীর্ঘকালীন জড়ত্ব (Secular Stagnation) আসিয়া গিয়াছে, সুতরাং বর্তমান-কালীন বেকারি এবং ভবিষ্যৎ-কালীন আরও বেকারির সম্ভাবনা—ইহাই শিল্পোন্নত দেশসমূহে আধুনিক কালে ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেছে।

যন্ত্রের স্বয়ংগতিত্ব ও মূলধনের অতি-দীর্ঘকালীন জড়ত্বের ফলে ভবিষ্যতে বেকারি বৃদ্ধি সম্ভাবনা

বেকারির ফলাফল (Effects of unemployment)

দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, সমাজের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রসার করিতে হইলে দ্রুত মূলধন-গঠনের সহিত কম মজুরিতে শ্রমিক পাওয়াও দরকার। উৎপাদন বাড়াইতে গেলে এমন একদল শ্রমিক সমাজে থাকা প্রয়োজন যাহাদের দিয়া সহজে শ্রমশক্তি বিক্রয় করানো যায়, অর্থাৎ কম মজুরিতে সেই শ্রমিকদের নিয়োগ করা চলে। বেকারি থাকিলেই ইহা সম্ভব, 'শিল্পে নিয়োগযোগ্য মজুত সেনাবাহিনী' (Industrial Reserve Army) না থাকিলে শিল্প বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার সম্ভব নহে। অর্থনৈতিক প্রগতি ত্বরান্বিত করিবার জন্য ব্যয়স্বীকার বা ত্যাগ হিসাবেই এই বেকারিকে ধরা উচিত ; ইহা বাণিজ্য বৃদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক, সুতরাং কল্যাণকর।

বেকারির সুফল

কিন্তু বেকারি থাকিলে দেশে জনসাধারণের একাংশ বিপুল দুঃখ দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে জীবন যাপন করে ; জীবনধারণের উপযোগী নিম্নতম

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যবহারের সুযোগ তাহারা পায় না। ইহাদের কর্মে নিয়োগ করিলে আয়, ব্যয় ও দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা সবই বৃদ্ধি পাইবে, দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইবে; ইহাদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে। শ্রমশক্তিই সম্পদ সৃষ্টির প্রধান সক্রিয় উপাদান, ইহার অব্যবহার সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ কম রাখে, জাতির পক্ষে ইহাকে অপচয় ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। নিরন্তর বেকারির ফলে শ্রমিকের মন ভাঙিয়া যায়; আশাহীন, উৎসাহহীন অবস্থায় তাহার দিন কাটে; বর্তমানের অভাব ও ভবিষ্যৎএর অনিশ্চয়তা তাহার মনোবল সম্পূর্ণ ভাঙিয়া দেয়। ইহার ফলে, সমাজের আইন শৃঙ্খলার উপর সে আস্থা হারাইয়া ফেলে, তথাকথিত "সমাজ-বিরোধী" কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়া পড়ে; দারিদ্র্য দূর করার "সহিংস" পথে চলিতে পারে। বলা হয় যে, ইহাই জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের কারণ।

বেকারির কুফল

বেকারি দূর হওয়া বা পূর্ণ কর্মসংস্থানের সুফল অনেক। ব্যক্তিগত অর্থ-নৈতিক নিরাপত্তা বজায় থাকে, অভাব দূর হয়। অভাব মোচন ও নিরাপত্তার ফলে সমাজের ও সভ্যতার অগ্রগতি বা প্রগতি সম্ভবপর হয়। মানুষ নিজের যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের পুরস্কার পাইয়া নিজেকে প্রকৃত মানুষ বলিয়া মনে করে, নিজের ও অপরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা গড়িয়া ওঠে। সমাজে পরশ্রমজীবির সংখ্যা কমিয়া যায়। গণতন্ত্রের প্রসার ঘটে, মোহ ও অন্ধতার পরিবর্তে যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করে।

পূর্ণ কর্মসংস্থানের সুফল

বেকারি দূরীকরণের উপায় (Remedies of Unemployment)

বিভিন্ন ধরনের বেকারি দূর করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। যেমন, কাঠামোজনিত বা যন্ত্রজনিত বেকারি দূর করার জন্য কর্মবিনিময় কেন্দ্র (Employment Exchanges) স্থাপনের উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরি সম্বন্ধে শ্রমিকদের সংবাদ দেওয়া। সাময়িকভাবে (casual) নিযুক্ত শ্রমিকদের স্থায়ী চাকুরির ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষা বিস্তার, যাতায়াতের ব্যয় কমানো বা যাতায়াতের বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়া শ্রমিকের চলনশীলতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা দরকার।

মরশুমী বেকারি (Seasonal Unemployment) দূর করার জন্য শিল্পের সংগঠনে পরিবর্তন প্রয়োজন, যাহাতে এক শিল্পে শ্রমিকের কার্যকাল শে

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য শিল্পের কাজ সুরু হইতে পারে। কৃষকদের জন্য অন্যান্য কুটির শিল্পের বন্দোবস্ত করা দরকার ; ইহার ফলে বৎসরের কোন সময়ে তাহাদের অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না ; আয় বৃদ্ধি হইবে, দেশে প্রচ্ছন্ন বেকারির পরিমাণ কমিবে। শিল্প প্রসারের গতিবৃদ্ধি করিয়া বিভিন্ন প্রকার কর্মনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইলেও এই বেকারি কমিতে পারে।

বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারি দূর করার উপায় হইল বাণিজ্য চক্র রোধ করা। আর্থিক পদ্ধতি, কর সম্পর্কীয় পদ্ধতি এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা এইরূপ বেকারি দূর করা যায়।

সামগ্রিকভাবে বেকারির স্তর কিভাবে কমান যায়, তাহার সম্বন্ধে দুই প্রকার তত্ত্ব প্রচলিত আছে। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, মজুরির হার কমাইলেই শ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে এবং বেকারি দূর হইবে। কেইন্‌সের মতে, বেকারি দূর করার উপায় দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। আর্থিক পদ্ধতি-সমূহের দ্বারা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান, কর সম্পর্কীয় পদ্ধতিসমূহের দ্বারা ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান, এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা সমাজে অধিক আয় সৃষ্টি করা—এই সকল পদ্ধতি দ্বারা পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে বেকারি দূর করা সম্ভব।

মজুরির হার ও বেকারি (Wages and Unemployment)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে শ্রমিকের যোগান, চাহিদা ও দামের উপর। তাঁহাদের মতে শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে দেশে আসল মজুরির হারের উপর (supply of labour is a function of the rate of real wages)। শ্রমিকেরা শ্রমের যোগান দেয় কিছু পরিমাণ খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতি পাইবার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট আসল মজুরি পাইলে তবেই শ্রমের যোগান হয়। আবার বিশেষ কোন একটি ফার্মে শ্রমিকের জন্য চাহিদা হয় উৎপাদন-পরিমাণের সেই স্তরে, যেখানে আসল মজুরির হার শ্রমিকের প্রান্তিক নীট উৎপাদনের সমান। সমাজে নির্দিষ্ট আসল মজুরির হারে সকল ফার্ম মিলিয়া মোট যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করে, তাহাই শ্রমিকের চাহিদা। এইরূপে, দেশে আসল মজুরির হার শ্রমের চাহিদা ও যোগান উভয় দিকের মধ্যে সমতা সাধন করে।

আসল মজুরির ভারসাম্য হার

যদি কখনও বেকারি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, দেশে শ্রমের বাজারে ভারসাম্য নাই। এই অবস্থা দূর করার উপায় হইল শ্রমিকদের কম হারে আসল মজুরি লইতে রাজি করান। কম আসল মজুরির হারে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, বেকার শ্রমিকের চাকুরি জুটে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। জিনিসপত্রের দাম কমান যায় না, কারণ মুনাফা কমিলে উৎপাদন কম হইবে, শ্রমিকের চাহিদাও হ্রাস পাইবে। সুতরাং আসল মজুরি কমাইবার উপায় হইল আর্থিক মজুরি হ্রাস করা। আর্থিক মজুরি কমাইয়া দিলে দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয় কমে, উহার দাম কমে, চাহিদা বাড়ে, বেশি শ্রমিকের দরকার হয়। ইহাই ক্লাসিকাল কর্মসংস্থানের তত্ত্ব।

বেকারি থাকিলে আর্থিক মজুরি কমাও

উপরের এইরূপ আলোচনা কেইন্‌স্ মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে, আসল মজুরির উপর শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে, এই কথা বাস্তবে সত্য নয়। ইহা সত্য হইলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে জিনিসপত্রের দাম অল্প একটু বৃদ্ধি পাইলেই (অর্থাৎ আসল মজুরি হ্রাস পাইলে) শ্রমিকেরা কাজ ছাড়িয়া দিত। কিন্তু তাহা ঘটে না। বরং আমরা দেখিতে পাই যে, আর্থিক মজুরির হার কমাইতে গেলে তাহারা তীব্রভাবে বাধা দেয়। তাই কেইন্‌স্ বলিয়াছেন যে, শ্রমের যোগান আসল আয়ের উপর নির্ভর করে না ; ইহা আর্থিক মজুরির উপর নির্ভরশীল। আর্থিক মজুরি বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকের যোগান রেখা উপরে উঠে, কিন্তু এই রেখা নিচের দিকে অনমনীয় (rigid downwards)।* ইহার কারণ হিসাবে কেইন্‌স্ বলেন যে, আধুনিককালের সমাজে শুধু শ্রমিকদের মধ্যে কেন, সর্বসাধারণের মধ্যেই, টাকা সম্পর্কে এক ধরনের ভ্রান্তি বা মোহ আছে (Money illusion)। সকলেরই মনে হয়, যেন দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে একটি টাকার মূল্য সকল সময় সমানই থাকে। আমরা ধরিয়া লই যে, একটি টাকা সব সময় একটি টাকারই সমান, ফিসারের ভাষায় বলা চলে, "আমরা লক্ষ্য করি না যে, ডলার বা টাকার যে কোন ইউনিটের মূল্য বাড়ে ও কমে, প্রসারিত হয় ও সংকুচিত হয়"।†

আর্থিক মজুরি কমান যায় কি না

ইহার অসুবিধা— টাকার ছলনা

* তাহা ছাড়া কেইনসের মতে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে এমন কোন পথ নাই যাহাতে তাহারা সংঘবদ্ধ ভাবে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে সমাজের অবস্থানুযায়ী প্রয়োজনমত আসল মজুরি কমাইবার জন্য উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে পারে।

† 'A failure to perceive that the dollar or any other unit of money expands or shrinks in value.'

এই কারণেই, কেইন্‌সের মতে, যদি দেশে মজুরির হার কমাইয়া দেশের সামগ্রিক বেকারি (general unemployment) কমাইতে হয়, তবে আর্থিক মজুরি সমান রাখিয়া, আসল মজুরির হার কমান বাঞ্ছনীয়। জিনিসপত্রের দাম বাড়াইলে আসল মজুরি কমে, সুতরাং সেই পথে অগ্রসর হইলে দেশে বেকারি হ্রাস পাইয়া কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। কেইন্‌সের ভাষায় বলা যায় 'শ্রমিকেরা সাধারণত আর্থিক মজুরি হ্রাস করাকে বাধা দেয় কিন্তু জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িলেই তাহারা চাকুরি ছাড়িয়া দেয় না।* এইরূপ 'টাকার ভ্রান্তির' (Money illusion) আরও কারণ আছে। শ্রমিকেরা নিশ্চয় বোঝে যে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িলে তাহাদের আসল আয় কমে, তবুও তাহারা মনে করে উহা সামগ্রিক ব্যাপার, অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদেরও একই অবস্থা। অন্যান্যদের সঙ্গে তুলনায় নিজেদের অবস্থাতে কোনরূপ পরিবর্তন আসিল না, তাই তাহারা ইহাতে ততটা তীব্র আপত্তি করে না। তাহারা ইহাও জানে যে, বিশেষ কোন শিল্পে আর্থিক মজুরি কমাইলে ধর্মঘট, আন্দোলন প্রভৃতির সাহায্যে উহা ঠেকান যায়, কারণ সেখানে স্পষ্টভাবে মালিকপক্ষই প্রধান বিরোধী শক্তি। কিন্তু আসল মজুরি হ্রাস পাইলে এইরূপ কোন প্রত্যক্ষ বিরোধীপক্ষ পাওয়া যায় না, শ্রমিকেরা মনে করে যে, উহা সামগ্রিক ভাবে অর্থনৈতিক নিয়মের কার্যকারিতার ফল।

তাই কেইন্‌স বলেন দাম বাড়াইয়া আসল মজুরি কমাও

তাহা ছাড়া, আর্থিক মজুরি হ্রাস করিলে বেকারি কমিবে, এই ধারণা একান্তই আংশিক ভারসাম্যের বিশ্লেষণ। চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি থাকিলে দাম কমে এবং এই নূতন কম দামে চাহিদা বাড়িয়া যোগানের সঙ্গে সমান হইয়া পড়ে, এইরূপ বিশ্লেষণ পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের বাজারে সম্ভবপর। কিন্তু সামগ্রিক বা সমষ্টিগত দৃষ্টিতে ইহা সঠিক হইতে পারে না। যাঁহারা এইরূপ পথ অবলম্বনের কথা বলেন, তাঁহারা কার্যকরী চাহিদার উপর দেশের সামগ্রিক মজুরি-হ্রাসের কি প্রভাব পড়িতে পারে, সেই কথা চিন্তা করেন না। দেশের সকল শিল্পে একসঙ্গে মজুরি হ্রাস করিলে লোকের হাতে ক্রয়শক্তি হ্রাস পাওয়ায় সকল দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা কমিয়া গেল, জিনিসপত্র অবিক্রীত রহিয়া গেল, সকল

সকলে একত্রে আর্থিক মজুরি কমাইলে প্রত্যেকেরই সংকট দেখা দিবে

* "Whilst workers will usually resist a reduction of money wages, it is not their practice to withdraw their labour whenever there is a rise in the price of wage-goods." Keynes, *General Theory.* P. 9.

শিল্পেই কর্মনিয়োগ নিশ্চয় হ্রাস পাইবে। মজুরি হ্রাসের ফলে কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় আয় ও কর্মসংস্থান স্তর নিচুতে নামিয়া যাইবে।

সুতরাং দেখা গেল যে, মজুরি হ্রাসের ফল কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব বিস্তার করে কার্যকরী চাহিদাকে প্রভাবিত করিয়া। কার্যকরী চাহিদা প্রভাবিত হয় তিনটি বিষয়ে পরিবর্তনের দ্বারা—ভোগপ্রবণতা, সুদের হার এবং মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা। মজুরি-হ্রাসের ফল এই সকল শক্তিগুলিকে কিরূপ প্রভাবিত করিবে আলোচনা করিলে তবেই বলা চলে ইহা কার্যকরী চাহিদার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপর কতটা ও কোন্‌দিকে প্রভাব বিস্তার করিবে।

কার্যকরী চাহিদার পরিবর্তনই আসল কথা

ইহাদের প্রথমটি আলোচনা করা যাউক। আর্থিক মজুরি কমাইলে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের ব্যয় কিছুটা কমিবে (কতটা কমিবে তাহা নির্ভর করে মোট উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে মোট মজুরির অনুপাত এবং যোগানের অবস্থার উপর); ফলে জিনিসপত্রের দাম কিছুটা কমিতে পারে। এই অবস্থায় যাহাদের আর্থিক আয় কমে নাই, সেই শ্রেণীর হাতে তুলনামূলকভাবে আসল আয় বেশি চলিয়া গেল। ব্যবসায়ী বা ধনিকশ্রেণীর হাতে দেশের আসল আয় যদি একটু বেশি যায়, তবে গড় ভোগপ্রবণতা হ্রাস পাইবে, কারণ ধনীব্যক্তিরা আয়ের বেশি অংশ ভোগ-ব্যয় করে না।

ভোগ প্রবণতা হ্রাস পাইবে

দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তারা যদি মনে করে, বর্তমানে আর্থিক মজুরি কমিলেও ভবিষ্যতে শীঘ্রই উহা বাড়িবে তবে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে এবং কর্মসংস্থান বাড়িয়া যাইবে। তাহা ছাড়া, ভবিষ্যতে মজুরি, ব্যয়, দাম সকল কিছু বাড়িবে, এইরূপ ধারণা প্রবল হওয়ায় লোকে এখনই বেশি জিনিসপত্র কিনিতে থাকিবে, ভোগপ্রবণতাও কিছুটা বাড়িতে পারে। অপরপক্ষে, যদি আর্থিক মজুরির হ্রাস দেখিয়া উদ্যোক্তারা মনে করে ভবিষ্যতে ইহা আরও কমিবে, তবে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বর্তমানে বৃদ্ধি না পাওয়ারই সম্ভাবনা।

মূলধনের প্রান্তিক কার্য-কারিতার উপর প্রভাব অনিশ্চিত

তৃতীয়ত, দেশে সাধারণ মজুরি-হ্রাসের ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য

অনেকের আয় কম হইবে, তাহারা লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে হাতে কম টাকা রাখিবে। ইহাতে সুদের হার কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা, ফলে বিনিয়োগ বাড়িতে পারে। কিন্তু সুদের হার কমাইবার জন্য 'নমনীয় আর্থিক নীতি' গ্রহণ করাই ভাল, এইরূপ 'নমনীয় মজুরি নীতি' গ্রহণ করা উচিত নয়। ইহার তিনটি কারণ আছে। (ক) শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপুল অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। (খ) সামাজিক ন্যায়বিচারের দিকে তাকাইয়া ইহা বলা চলে যে, মজুরি হ্রাস করা উচিত হয়। কারণ ইহাতে তুলনামূলক ভাবে অপরাপর শ্রেণীর সহিত শ্রমিক-শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানে ব্যবধান ও বৈষম্য আরও বাড়াইয়া তুলিবে। (গ) সুদের হার কমিলে, পূর্বের সরকারী ঋণগুলির ভার (burden of public debt) বৃদ্ধি পায়, ইহা আমরা জানি। মজুরি-হ্রাস করিয়া অধিকাংশ লোকের আয় কমাইয়া তাহাদেরই উপর হইতে কর আদায় করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করা সুবিবেচনার কাজ বলা চলে না। টাকার যোগান বৃদ্ধির নীতি ইহার তুলনায় অধিকতর গ্রহণ-যোগ্য, কারণ তাহাতে জনসাধারণের উপর চাপ কম পড়িবার সম্ভাবনা।

সুদের হার কমাইলেও এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়

পূর্ণ কর্মসংস্থান (Full Employment) :

আধুনিক কালে প্রায় সকল রাষ্ট্রেরই অর্থনৈতিক লক্ষ্য হইল বেকারি দূর করা এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সমগ্র পৃথিবীতে শিল্পোন্নত সকল দেশেই অর্থনৈতিক সংকট ও বেকারি দেখা দিয়াছিল, ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব এই সংকটের কারণ ও উৎস খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে অগ্রসর হইয়াছে। "কল্যাণ রাষ্ট্রের" ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বেকারি দূর করিয়া সমাজকে পূর্ণসংস্থান স্তরে পৌঁছান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইতেছে।

পূর্ণ কর্মসংস্থান বলিলে দেশের আপামর সকল জনসাধারণের কর্মে নিযুক্ত থাকা বুঝায় না। স্বেচ্ছামূলক বেকারি; সংঘাতজনিত বেকারি; দেশের সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাজনিত বেকারি (স্ত্রীলোকদের চাকুরী সংক্রান্ত প্রথা প্রভৃতি); দেশের সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ম-কানুন জনিত বেকারি (দৈনিক শ্রমের সময়, চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের নিয়ম, নিম্নতম শিক্ষার বয়স প্রভৃতি); নিয়োগের অযোগ্যতাজনিত বেকারি (বৃদ্ধ, শিশু, রুগ্ন বা অসুস্থ প্রভৃতি)—এই সকল কারণে কিছু লোক সর্বদাই দেশে বেকার থাকিবে। পূর্ণ কর্মসংস্থান

পূর্ণ কর্মসংস্থান কাহাকে বলে

বলিলে বোঝা যায় যে, অনিচ্ছামূলক বেকারি নাই, প্রচলিত মজুরির হারে যাঁহারা কর্মে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা মোটামুটিভাবে সকলই কর্মে নিযুক্ত আছেন।*

উনবিংশ শতাব্দীর ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞান মোটামুটি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, সমাজে সর্বদাই পূর্ণ কর্মসংস্থান রহিয়াছে। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে আপনা আপনি পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ক্লাসিকাল ধারণা

ধনবিজ্ঞানী শ্যে (Say) বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী যোগান নিজেই নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে: শ্রমিকের যোগান বাড়িলে মজুরির হার কমিয়া শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবেই। তাঁহাদের মতে বেকারি তখনই থাকা সম্ভব যদি শ্রমিক তাহার উৎপাদন ক্ষমতা বা বাজারে প্রচলিত মজুরির হার হইতে বেশি মজুরি দাবি করে। একচেটিয়ামূলক শ্রমিক সংঘের চাপে মজুরি হার অধিক থাকিলে, তাই বেকারি অধিক হইবার সম্ভাবনা।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণের, বিশেষ করিয়া কেইন্‌স্ ও তাঁহার অনুগামীগণের মতে, সমাজ সাধারণত পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে সর্বদা অবস্থান করে না; বা এই

আধুনিক ধারণা

ধরনের সময় ছাড়া সকল দেশেই অনিচ্ছামূলক বেকারি আছে, সকল দেশই অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে রহিয়াছে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে পৌঁছান এবং সেই স্তরে ইহাকে রক্ষা করা—ইহাই রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক নীতির লক্ষ্য।

কি কারণে সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থানের ভারসাম্যাবস্থায় (Full Employment Equilibrium) নাই ; পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তর হইতে বিচ্যুতির (Lapses from Full Employment) কারণ কি? ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানের যুক্তি হইল যে,

পূর্ণ কর্মসংস্থান হইতে বিচ্যুতির কারণ

শ্রমিকগণ কর্তৃক কৃত্রিমভাবে বাড়াইয়া রাখা মজুরির স্তর-ই ইহার কারণ। আধুনিক ধনবিজ্ঞান তাহা স্বীকার করে না। কেইন্‌সের মতে ইহার কারণ হইল, সমাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণ এত বেশি নহে যাহাতে সকল শ্রমিককে কর্মে নিযুক্ত রাখা

* পূর্ণ কর্মসংস্থান লক্ষ্যের মধ্যে নিছক পরিমাণগতভাবে কর্মনিয়োগের আদর্শ আছে তাহা নহে, জীবন যাত্রার মান উন্নত করা, বর্ধিত আয়স্তরে স্বাধীন সুখী জীবন নিরাপত্তার সহিত যাপন করার ধারণাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন কালের দাস-সমাজেও পূর্ণকর্মসংস্থান ছিল ; আধুনিক কালের ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রেও অপ্রচুর পারিশ্রমিকে পূর্ণ কর্মনিয়োগ দেখা গিয়াছে। অভাব ও উপবাস হইতে মুক্তি, ভবিষ্যতের গভীর অনিশ্চয়তা হইতে মুক্তি নিজের ঝোঁক অনুযায়ী যোগ্যতা ও দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা পাওয়া—এই সকল মিলিয়া পূর্ণ কর্মসংস্থানকে নিছক অর্থনৈতিক লক্ষ্য হইতে উন্নততর এক সামাজিক আদর্শে পরিণত করিয়াছে।

যায়। দেশের কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ কম, তাই শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণও কম। এই কার্যকরী চাহিদা নির্ভর করে সমাজে মোট ব্যয়ের উপর। সমাজের মোট ব্যয়কে দুই ভাবে ভাগ করা চলে, ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়। সমাজের ও আয়স্তরের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভোগ ব্যয়ের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় না, সুতরাং যদি বিনিয়োগ-ব্যয় বৃদ্ধি করা না হয়, তবে সমাজের মোট আয়, ব্যয় এবং কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাইবে।

কি ভাবে সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌঁছিতে পারে? শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়াইতে পারিলে তাহাদের কর্মনিয়োগ বাড়িবে। ইহার জন্য সমাজে মোট ব্যয় বাড়াইতে হইবে, অর্থাৎ ভোগ্য দ্রব্যের দরুণ ব্যয় এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যয়, এই উভয় প্রকার ব্যয়ের পরিমাণই বাড়ান দরকার। সমাজে বিনিয়োগ করে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাগণ এবং সরকার। সুতরাং, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছিবার তিনটি পথ: ভোগব্যয় বাড়ানো, ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ানো, এবং সরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়ানো।

পূর্ণ কর্ম সংস্থানে পৌঁছিবার তিনটি পথ

ভোগদ্রব্যের উপর ব্যয় বাড়াইবার প্রধান উপায় হইল কম ভোগ প্রবণতা-সম্পন্ন ধনী শ্রেণীর উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপ করিয়া বা প্রত্যক্ষ করসমূহের হার বৃদ্ধি করিয়া রাজস্ব বাড়াইয়া বেকার ভাতা, সামাজিক বীমা, অসুস্থতার বীমা, বার্ধক্যে পেনসন প্রভৃতির মাধ্যমে সেই অর্থ গরীব শ্রেণীর হাতে তুলিয়া দেওয়া—কারণ তাহাদের ভোগপ্রবণতা বেশি। একই সঙ্গে, এই উদ্দেশ্যে, পরোক্ষহারের পরিমাণ ও হার কমাইয়া দিলে ভোগব্যয় বাড়িয়া যাইতে পারে। এই পদ্ধতি গ্রহণের সময়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে প্রত্যক্ষ করের হার বাড়াইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমে কি না। তাই প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি করিয়া আয়ের পুনর্বণ্টন করিবার সময়ে যাহাতে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের উৎসাহ ও প্রেরণা না কমে এইজন্য বিশেষ ধরনের সুবিধা দেওয়ার বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে, যেমন ব্যবসায়-লব্ধ আয় পুনর্বিনিয়োগ হইলে কর দিতে হইবে না, অথবা করের হার কম হইবে, মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে আয়ের অধিক অংশ জমা রাখিতে পারিবে।

ভোগব্যয় বৃদ্ধির উপায় সমূহ

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-বৃদ্ধির প্রধান পদ্ধতি হইল সুদের হার কমাইয়া রাখা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে আয়কর বা অন্যান্য প্রত্যক্ষ কর হইতে উদ্যোক্তাদের কিছুটা রেহাই দেওয়া। কিন্তু এই পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অসুবিধা হইল ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীরা এরূপ নিরুৎসাহী অবস্থায় থাকিতে পারে যে, কম সুদের হার বা

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপায়সমূহ

কম আয়করের হার কিছুতেই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধিতে তাহাদের উৎসাহিত করিতেছে না।

সুতরাং, প্রধান পদ্ধতি হইল সরকারী ব্যয় বাড়ান। রাষ্ট্র বা জনপ্রতিষ্ঠান-সমূহ যদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অর্থাৎ রাস্তা ঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করে তাহা হইলে সমাজের মোট বিনিয়োগব্যয় বৃদ্ধি হইবে, কর্মসংস্থানও বাড়িয়া যাইবে। সরকারী বিনিয়োগের বৃদ্ধি যাহাতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পরিমাণ সংকুচিত করিতে না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সরকার দুই উপায়ে টাকা সংগ্রহ করিতে পারে: (ক) কর বৃদ্ধি এবং (খ) ঋণবৃদ্ধি। প্রত্যক্ষকরের যতখানি বৃদ্ধি ব্যক্তিগতকে বিনিয়োগ নিরুৎসাহ করিবে না সেই পরিমাণ টাকা করবৃদ্ধি দ্বারা উঠানো হইবে; আরও অধিক টাকার প্রয়োজনে সরকার ঋণ করিবে। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ করিলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের জন্য অর্থ কমিয়া যাইবে, ভোগব্যয়ও কিছুটা সংকুচিত হইতে চাহিবে। সুতরাং তাহা না করিয়া রাষ্ট্র প্রধানত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে নূতন টাকা সৃষ্টি করিয়া (Deficit Financing) বাজেট-ঘাটতি পদ্ধতির দ্বারা সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া দিবে। নূতন টাকা সৃষ্টি করিয়া সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করাকে বিনা সুদে টাকা সংগ্রহের পদ্ধতি (Interest-free financing) বলে, কারণ এই টাকার জন্য রাষ্ট্রকে কোন সুদ দিতে হয় না।

সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপায়সমূহ

ঘাটতি ব্যয়

ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা টাকা সংগ্রহ করিয়া বিনিয়োগ করিলে যাহাতে দ্রুত কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে, এই জন্য, (ক) শ্রমিকের চলনশীলতা বাড়াইতে হইবে. ইহাতে শ্রমিকগণ দ্রুত কর্মে নিযুক্ত হইতে পারে (খ) নূতন শিল্পের স্থান নির্বাচন (Location) সঠিকভাবে করিতে হইবে। (গ) পরিকল্পিতরূপে সরকারী উন্নয়নমূলক নির্মাণ-কার্য (Public Works) সুরু করিতে হইবে।

ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতির আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

ঘাটতি ব্যয়ের নীতির বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য হইল, (ক) ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা প্রবল, কারণ কার্যকরী চাহিদার বৃদ্ধি শ্রম ও উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করিতে পারে। অনুন্নত দেশসমূহে ঘাটতিব্যয়ের বৃদ্ধি সমাজে অধিক আয় সৃষ্টি করিবে, কিন্তু মূলধনী দ্রব্যের অভাবের দরুণ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ানো যায় না বলিয়া টাকার পরিমাণ বাড়াইলে দামস্তর বাড়াইয়া দিবে। সুতরাং সকল দেশেই শিল্পপ্রসারের প্রথম দিকে পূর্ণকর্মসংস্থান

অর্থনৈতিক নীতি ও পরিকল্পনার লক্ষ্য হইতে পারে না। প্রথমে দ্রুত শিল্প-সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতে হইবে, মূলধনী দ্রব্যাদি প্রস্তুতের হার খুবই বাড়াইয়া দিতে হইবে, (যেমন ভারতের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা)। (খ) তাহা ছাড়া,

ঘাটতি ব্যয়ের অসুবিধা

ঘাট্তি ব্যয়ের বৃদ্ধি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের মনে নিরুৎসাহ সঞ্চার করিতে পারে, তাহারা ভবিষ্যৎ করের ভয়ে মুদ্রাস্ফীতির ভয়ে বা সংকটের ভয়েভীত হইয়া পড়িতে পারে. (গ) সরকারী ঋণের পরিমাণবৃদ্ধির বহু প্রকার বিপদ আছে, সুদ প্রদান, আসল পরিশোধ, বিশেষত ক্রমবর্ধমান ঋণ-ব্যবস্থার সঠিক পরিচালনা সকল বিষয়েই ইহা অনেক প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করে।

অনুন্নত দেশ ও পূর্ণকর্মসংস্থান তত্ত্ব (Underdeveloped countries Full Employment Theory):

অনুন্নত দেশসমূহ প্রধানত কৃষি-প্রধান, মূলধনী সামগ্রীর পরিমাণ কম, যন্ত্র সম্পর্কীয় জ্ঞানের স্তর খুবই নিচুতে। দ্বিতীয়ত, মালিকের নিকট মজুরির বিনিময়ে

অনুন্নত দেশের কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

চাকুরি করে এইরূপ শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম, অধিকাংশ জনসাধারণই স্বয়ং-নিযুক্ত, নিজেই নিজের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করে। তৃতীয়ত, জাতীয় উৎপন্নের একটি বিশেষ বড় অংশ বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয় না, উৎপাদকগণ নিজেরা ভোগের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন করে। এইরূপ অবস্থায় গুণকের নীতি উন্নত দেশ-সমূহের ন্যায় সহজে কার্যকরী হয় না।

বিনিয়োগের বৃদ্ধি প্রথমে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ায়, তাহার পরবর্তী স্তরে সেই আয় ভোগব্যয়ের মারফৎ নুতন আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াইয়া দেয়। দ্বিতীয় স্তরের আয় পুরাতন ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয়িত হয় এবং এইভাবে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়িয়া প্রথম বারের বর্ধিত আয় ও কর্মসংস্থান × গুণকের আয়তন—এই পর্যন্ত বাড়িবে। কিন্তু অনুন্নত দেশে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা পরবর্তী স্তরসমূহের ভোগব্যয় বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরবর্তী স্তরসমূহে উহাদের আরও বৃদ্ধির পথে বহু বাধা থাকে। যদিও এইরূপ দেশে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা থাকে খুব বেশি এবং তত্ত্বানুযায়ী গুণকের আয়তন খুবই বড় হওয়া উচিত, কিন্তু

গুণক ও ত্বরক উভয়ই কেন কম হয়

বাস্তবে তাহা হয় না। ইহার প্রধান কারণ হইল এইরূপ দেশে আয়-বৃদ্ধি প্রধান ভোগ্যদ্রব্য হিসাবে খাদ্যশস্যের চাহিদা-ই প্রথমে বাড়ায়। কৃষি দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক আর অনুন্নত দেশগুলিতে প্রধানত প্রকৃতির খেয়ালেই

কৃষির উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। তাহা ছাড়া উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি না থাকায় ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতে পারে। আর কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বাড়িলে কৃষকের অলসতা বাড়িয়া যাওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাইতেও পারে।

খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে (কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন সমান থাকায়) দাম বাড়িবে এবং ফলে কৃষক শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীকে বেশি দাম দিয়া খাদ্যাদি ক্রয় করিতে হইবে ; কিন্তু কৃষকের সঞ্চয়-প্রবণতা বেশি থাকায়, অন্যান্য ক্ষেত্রে (sector) আয় বৃদ্ধির সুবিধা পাইবে খুবই কম। কৃষকেরা শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিলেও শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো এইরূপ দেশে সহজ নহে, তাই আয় বৃদ্ধি হইলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান না বাড়িতেও পারে।

প্রচ্ছন্ন বেকারি (Disguised unemployment) থাকাতেও গুণক ও ত্বরকের প্রভাবের গতি ভিন্নরূপ দাঁড়ায়। অনিচ্ছাকৃত বেকারির বদলে প্রচ্ছন্ন বেকারি থাকায় বিনিয়োগে প্রাথমিক বৃদ্ধি প্রচ্ছন্ন বেকারদের আয় বাড়াইলে উহা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্তী স্তরের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়াইতে পারে না। তাহা ছাড়া এইরূপ চলতি মজুরির হারে অন্যত্র চাকুরি করিবার কোন প্রেরণা তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। দেশ এক ধরনের "তথাকথিত" পূর্ণ কর্মসংস্থান-এর স্তরে থাকে ; বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রধানত, মুদ্রাস্ফীতি-ই ঘটায়।

অনুশীলনী

1. Discuss the principal types of unemployment in modern society and suggest some remedies for the mitigation of unemployment.

2. Analyse the different types of unemployment and what are their causes ?

3. How is the level of Employment determined in a country ?

4. What factors determine the volume of Employment in a country ?

5. What is full Employment ? What are the causes of lapses from Full Employment and how to achieve full employment in a free society ?

6. Discuss the implications of Keynesian theories in underdeveloped countries.

১০

আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ত্ব

Theory of Income and Employment

1930 সাল পর্যন্ত অধিকাংশ ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, দেশে সাধারণ বেকারি থাকিতে পারে না। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, সমাজে সর্বদা পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে। এই কারণেই 'ক্লাসিকাল' ধনবিজ্ঞানীরা কর্মসংস্থানের সাধারণ স্তর নির্ধারণকারী বিষয়গুলিকে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেন নাই। তাঁহাদের এই চিন্তা প্রকৃষ্টভাবে রূপ পাইয়াছিল 'বাজার সম্বন্ধীয় স্অে-র নিয়ম'-এর মধ্যে (Say's Law of Markets)। এই 'নিয়ম' হইতেই ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। স্অে বলিয়াছিলেন যে, 'যোগানই নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে' (Supply creates its own demand)। ইহার অর্থ হইল সমাজে সাধারণ উৎপাদনাধিক্য বা বাড়্‌তি উৎপাদন (General over-production) সম্ভব নয়। কোন একটি বিশেষ শিল্পদ্রব্যের জন্য চাহিদা হঠাৎ কম হইতে পারে, বা চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ও যোগান বেশি হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই।

ক্লাসিকাল ধারণা: সামগ্রিক অধিকোৎপাদন সম্ভব নয়;

কিন্তু সাধারণভাবে বা সামগ্রিকভাবে সকল দ্রব্য সামগ্রীর জন্য চাহিদা নাই বা উহাদের বাড়্‌তি উৎপাদন হইয়াছে ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? জেম্‌স্‌ মিল (James Mill) বলিয়াছেন 'উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই ভোগের প্রসার ঘটে' (consumption is coextensive with production); তাঁহার মতে 'চাহিদার একমাত্র কারণই হইল উৎপাদন, একই সময়ে এবং সমান পরিমাণ চাহিদা সৃষ্টি না করিয়া ইহা কখনও যোগানের ব্যবস্থা করে না'; * 'বাৎসরিক উৎপন্নের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, ইহা বাৎসরিক চাহিদার পরিমাণকে কখনই ছাড়াইয়া যাইতে পারে না।'† রিকার্ডোও বলিয়াছেন,

* 'Production is the cause, and the sole cause of demand. It never furnishes supply without furnishing demand, both at the same time and both to an equal extent'

† 'Whatever the amount of annual produce it can never exceed the amount of the annual demand.'

'একটি জাতির দিক হইতে দেখিতে গেলে, যোগান কখনই চাহিদাকে ছাপাইয়া যাইতে পারে না' (**'in reference to a nation, supply can never exceed demand'**)।

1848 সালে প্রকাশিত জন স্টুয়ার্ট মিলের **Principles of Political Economy** গ্রন্থেও আমরা ইহা দেখিতে পাই। দেশের সমগ্র চাহিদা হঠাৎ কমিয়া গিয়া উৎপাদনের আধিক্য এবং বেকারি ঘটাইতে পারে। এই ধারণার বিরুদ্ধে মিল বহুপ্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, "লেনদেনের মাধ্যমের অভাবের দরুণ সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদার ঘাটতি দেখা দিয়াছে ইহা কি সম্ভব? যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা বিচার করেন নাই যে, দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেনের মাধ্যম কি লইয়া গঠিত হয়। এই মাধ্যম হইল দ্রব্যসামগ্রী। প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই অন্য ব্যক্তির উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য দাম দিবার মাধ্যম হইল তাহার নিজস্ব দ্রব্যসামগ্রী। সকল বিক্রেতা নিশ্চয়ই ক্রেতা, শব্দগত বা সংজ্ঞাগত দিক হইতেও ইহারা একই। যদি দেশটির উৎপাদন ক্ষমতা আমরা দ্বিগুণ করিতে চাই তবে সকল বাজারেই জিনিসপত্রের পরিমাণ আমাদের দ্বিগুণ করিয়া তুলিতে হইবে, অর্থাৎ ইহার ফলে একই সঙ্গে ক্রয় শক্তির পরিমাণও আমরা দ্বিগুণ করিয়া ফেলিতেছি। দ্বিগুণ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই দ্বিগুণ যোগান বাজারে লইয়া আসিবে; প্রত্যেকেই পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ কিনিতে পারিবে, কারণ বিনিময়ে দিবার মত প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ জিনিসপত্র আছে।..... ইহা সম্পূর্ণ অকল্পনীয় যে, সকল দ্রব্যেরই মূল্য হ্রাস পাইয়াছে এবং ফলে সকল উৎপাদক উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক পাইতেছে না।"*

কেন তাহাদের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল

---

* "is it... possible that there should be a deficiency of demand for all commodities, for want of the means of payment? Those who think so cannot have considered what it is which constitutes the means of payment for commodities. It is simply commodies. Each person's means of paying for the productions of other people consists of those which he himself possesses. All sellers are inevitably and *ex vi termini* buyers. Could we suddenly double the productive powers of the country we should double the supply of commodities in every market, but we should by the same stroke double the purchasing power. Every one would bring or double demand as well as double supply: everybody would be able to buy twice as much because everybody would have twice as much to offer in exchange...... It is a sheer absurdity that all things should fall in value and that all producers should, in consequence, be insufficiently remunerated."

—Book III, Section 2 Chapter XIV.

অবশ্য সেই যুগেও ক্লাসিকাল লেখকদের এই মতের বিরুদ্ধে কোন কোন ধনবিজ্ঞানী সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের আধিক্যের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ম্যালথাস্ রিকার্ডোকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, দেশে চাহিদা কম থাকার দরুণ বেকারি ঘটিতে পারে। কিন্তু তাঁহার এই মত তখন গৃহীত হয় নাই। কেইন্‌স্ বলিতেছেন, "রিকার্ডোর এই মতবাদ যে, দেশে কার্যকরী চাহিদার (Effective demand) ঘাটতি হওয়া অসম্ভব, ইহাকে ম্যাল্‌থাস তীব্র ভাবে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। ইহার কারণ হইল ম্যাল্‌থাস্ স্পষ্টভাবে বুঝাইতে পারেন নাই কিরূপে ও কেন কার্যকরী চাহিদার ঘাটতি বা বাড়্‌তি দেখা দেয়, ফলে তিনি বিকল্প কোন কাঠামো দাঁড় করাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন ; এবং পবিত্র খৃষ্টধর্ম যেমন স্পেন জয় করিয়াছিল, রিকার্ডোও তেমনি ইংলণ্ডে নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সহরের লোকজন, রাজনীতিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা সকলে তাঁহার মত কেবল মাত্র গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। বিরোধের অবসান হইল ; অপর দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল ; কোন আলোচনার মধ্যেও ইহা আর প্রবেশ করিল না। কার্যকরী চাহিদার এই গুরুত্বপূর্ণ জটিল ধাঁধাঁ, ম্যাল্‌থাস্ যাহা লইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র হইতে অবলুপ্ত হইয়া গেল।"*

ম্যালথাস ও রিকার্ডোর মধ্যে মতবিরোধ ছিল

সামগ্রিক যোগান ও সামগ্রিক চাহিদা (Aggregate Supply and Aggregate Demand)

কোন ফার্মের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে তাহা নির্ভর করে কতজন মজুর খাটাইলে ফার্মটি সর্বাধিক মুনাফা করিতে পারে। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে, একত্রভাবে বিচার করিলে সকল উদ্যোক্তার এইরূপ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ফলে সমষ্টিগত মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ পাওয়া যায়। যে প্রধান শক্তিগুলির কার্যকারিতার দরুণ দেশের মোট কর্মসংস্থানের

* "Malthus indeed had vehemently opposed Ricardo's doctrine, that it was impossible for effective demand to be deficient ; but, vainly. For since Malthus was unable to explain clearly (apart from an appeal to the facts of common observation) how and why effective demand could be deficient or excessive, he failed to furnish an alternative construction : and Ricardo conquered England as completely as the Holy Inquisition conquered Spain. Not only was his theory accepted by the City, by statesmen and by the academic world. But controversy ceased ; the other point of view completely disappeared ; it ceased to be discussed. The great puzzle of Effective Demand with which Malthus has wrestled vanished from economic literature." J. M. Keynes, *General theory*, P. 32

পরিমাণ স্থির হয়, তাহাদের সামগ্রিক যোগান (aggregate supply) এবং সামগ্রিক চাহিদা (aggregate demand) বলে।

সামগ্রিক যোগান দাম ও সামগ্রিক চাহিদা দাম কাহাকে বলে

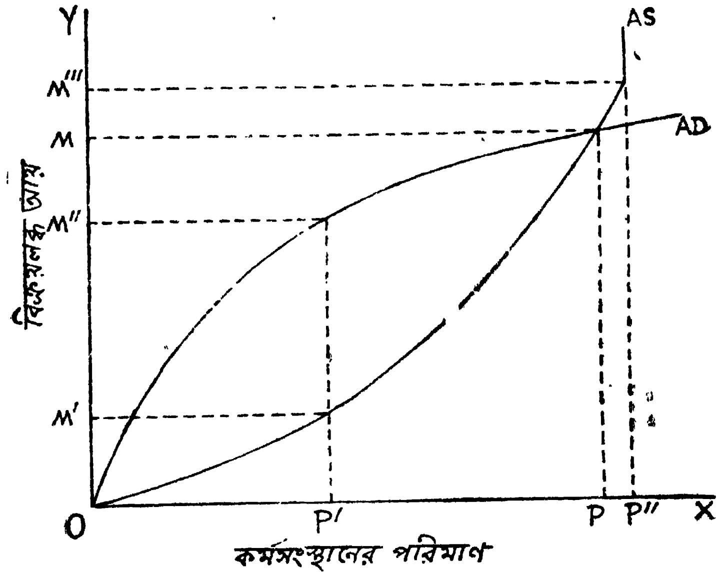
মনে কর, সমাজে কিছু সংখ্যক শ্রমিক কাজে নিযুক্ত আছে। এই পরিমাণ কর্মসংস্থান বজায় রাখিতে গেলে সকল উদ্যোক্তারা মিলিয়া জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া কমপক্ষে যে পরিমাণ টাকা নিশ্চয়ই পাইতে চান (must expect to receive), তাহাকে বলে সামগ্রিক যোগান দাম। অর্থাৎ, কিছুসংখ্যক শ্রমিক মিলিয়া মোট যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করেন, তাহার মোট ব্যয়কে সামগ্রিক যোগান দাম বলা চলে। যদি উদ্যোক্তারা মনে করেন যে, দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া এই খরচা তুলিয়া আনা যাইবে না তবে তাহারা কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমাইয়া দিবেন। অপরপক্ষে, সামগ্রিক চাহিদা দাম বলিলে বোঝা যায় কিছুসংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত থাকিলে সকল উদ্যোক্তারা মিলিয়া দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া যত পরিমাণ টাকা পাইবেন বলিয়া আশা করেন (really do expect)। কিছু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের স্তরে উদ্যোক্তাদের প্রত্যাশিত রেভিনিউর মোট পরিমাণকে তাই সামগ্রিক চাহিদা দাম বলা চলে।

বিভিন্ন পরিমাণ কর্মনিয়োগের স্তরের বিভিন্ন পরিমাণ সামগ্রিক যোগান দাম ও সামগ্রিক চাহিদা দাম থাকে ; তাই কর্মনিয়োগের বিভিন্ন স্তরের সামগ্রিক যোগান-দামের তালিকা ও সামগ্রিক চাহিদা দামের তালিকা (schedule) প্রস্তুত করা যায়। যদি উভয়ের মধ্যে সামগ্রিক চাহিদা দাম বেশি থাকে, অর্থাৎ

যে পরিমাণ কর্মসংস্থান সমাজে উপস্থিত থাকিলে উভয়ে মিলিত হয়, তাহাই কর্মসংস্থানের ভারসাম্য স্তর

উদ্যোক্তাগণ মিলিয়া যে পরিমাণ বিক্রয়লব্ধ টাকা নিশ্চয়ই পাইতে চাহেন সেই নিম্নতম প্রয়োজনীয় টাকার পরিমাণ অপেক্ষা যদি বিক্রয়লব্ধ টাকার পরিমাণ অধিক হইবে বলিয়া আশা করেন, তাহা হইলে সকল উদ্যোক্তারা মিলিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করিবে, ফলে কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিবে। অবশেষে যদি এমন এক অবস্থায় পৌছান যায় যখন সামগ্রিক চাহিদা দাম ও সামগ্রিক যোগান দাম সমান, তখন সেই কর্মনিয়োগের পরিমাণে হ্রাস বা বৃদ্ধির ঝোঁক থাকে না ; কর্মসংস্থানের ভারসাম্য স্তর (Equilibrium Level of Employment) স্থাপিত হয়। এই স্তরে সমাজের সকল অনিয়োগ বা বেকারি দূর হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ণ কর্ম-নিয়োগের স্তরে সমাজ উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে ; অপূর্ণ কর্মসংস্থান-স্তরেও

এইরূপ ভারসাম্য থাকা সম্ভব (underemployment equilibrium) । এইরূপ অবস্থায় এই কর্মসংস্থানের স্তরে ভারসাম্য স্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ উহার বাড়িবার বা কমিবার দিকে কোন ঝোঁক নাই। নিচের রেখাচিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে :



OX অক্ষে বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তর পরিমাপ করা হইতেছে এবং OY অক্ষে শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া বিভিন্ন পরিমাণ বিক্রয়লব্ধ আয় পরিমাপ করা হইতেছে। সামগ্রিক চাহিদা রেখা হইল AS এবং সামগ্রিক যোগান রেখা হইল AD. AS রেখা হইতে আমরা জানিতে পারি বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তরে সকল উদ্যোক্তারা মিলিয়া কিরূপ বিভিন্ন পরিমাণ টাকা নিশ্চয়ই পাইতে চান। যেমন, উদ্যোক্তারা যদি OP′ সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করেন তবে কমপক্ষে তাঁহাদের OM′ পরিমাণ টাকা পাইতেই হইবে, এই টাকা তাঁহারা নিশ্চয়ই পাইবেন বলিয়া মনে করেন। AD রেখা হইতে আমরা জানিতে পারি বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তরে সকল উদ্যোক্তারা মিলিয়া কিরূপ বিভিন্ন পরিমাণ টাকা পাইবেন বলিয়া আশা করেন। যেমন OP′ সংখ্যক শ্রমিক-নিয়োগের স্তরে তাঁহারা মনে করেন ঐ শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী

ইহাদের তালিকা এবং রেখার আকৃতি কিরূপ

বিক্রয় করিয়া OM" পরিমাণ টাকা তাঁহারা পাইবেন। প্রত্যাশা বেশি বলিয়া তাঁহারা কর্মসংস্থান বাড়াইতে থাকেন। কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে AS রেখা প্রথমে ধীরে ধীরে বাড়ে, তাহার পর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, AD রেখা প্রথমে দ্রুত বাড়ে, পরে বৃদ্ধির গতি হ্রাস পায়।

সামগ্রিক যোগান দামের রেখা ও সামগ্রিক চাহিদা রেখা উভয়ে মিলিয়া দেশে কর্মসংস্থানের স্তর বা পরিমাণ স্থির করে। যতক্ষণ উদ্যোক্তাদের মনে প্রত্যাশিত আদায়ের পরিমাণ (AD) নিম্নতম প্রয়োজনীয় পরিমাণ (AS) হইতে বেশি, ততক্ষণ উদ্যোক্তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিবে। যতদূর পর্যন্ত AD রেখা AS রেখার উপরে, ততক্ষণ কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। একমাত্র OP পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তরে পৌঁছিয়া উভয় রেখা মিলিত হইতেছে। আমরা তাই বলিতে পারি যে, সমাজে OP পরিমাণ কর্মসংস্থান আছে তাহার কারণ হইল ঐ স্তরেই AS রেখা ও AD রেখা মিলিত হইতেছে। AS রেখা ও AD রেখা কোন বিন্দুতে মিলিত হইবে তাহা নির্ভর করে সমাজের সকল ক্রেতারা মিলিয়া কত টাকা ব্যয় করিতে চান, অর্থাৎ তাহাদের মোট ব্যয়ের উপর। যদি তাহারা OM পরিমাণ মোট ব্যয় করিতে রাজি থাকে তবে OP পরিমাণ কর্মসংস্থান হইবে, ইহাই আমরা জানিতে পারি।

দেশে কর্মসংস্থানের স্তর নির্ভর করে এই দুই রেখার মিলনবিন্দুতে

সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগানের এই মিলনবিন্দুকে কার্যকরী-চাহিদার (Effective Demand) বিন্দু বলা হয়। কোন এক দেশে কর্মসংস্থানের স্তর এই বিন্দুতে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ এই পরিমাণ কার্যকরী চাহিদা থাকাতেই সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থান বজায় আছে। ঐ বিন্দুতে সামগ্রিক চাহিদা দাম, সামগ্রিক যোগান দাম এবং কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ সমান। যদি কার্যকরী চাহিদায় বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে কর্মনিয়োগের স্তর উর্ধ্বে উঠিবে, কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িবে; যদি কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যায়, তাহা হইলে কর্মনিয়োগের স্তর নামিয়া যাইবে, কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমিবে। প্রতি মুহূর্তে বা স্বল্পকালের মধ্যে কোন একটি দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ঠিক যে স্তরে আছে সেই স্তরেই সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান সেই সময়টুকুর মধ্যে ভারসাম্যে পৌঁছিয়াছে। ইহাদের ভারসাম্যের বিন্দুতে কার্যকরী চাহিদা পাওয়া যাইতেছে, আমরা তাই বলিতে পারি, এই কার্যকরী চাহিদা থাকার দরুণ-ই কর্মসংস্থান এই স্তরে আছে।

সেই বিন্দুতে কার্যকরী চাহিদা প্রকাশ পায়

আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে (Factors determining the level of Income and Employment)

কার্যকরী চাহিদা বলিলে টাকার হিসাবে, কোন বিশেষ স্তরে কর্মনিয়োগ-পরিমাণের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যকে বুঝা যায়।

জাতীয় আয়, জাতীয় ব্যয় ও কার্যকরী চাহিদা

দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যই চারিটি উপাদানের আয়ে বিভক্ত হইয়া যায় ; অথবা বলা চলে যে, চারিটি উপাদানের সকল প্রকার আয় যোগ দিয়াই দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য গঠিত হয়। সুতরাং কার্যকরী চাহিদা = মোট জাতীয় আয় = মোট দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য।*

সাধারণভাবে দ্রব্যসামগ্রীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, ভোগ্যদ্রব্য এবং বিনিয়োগ-দ্রব্য ; সুতরাং কার্যকরী চাহিদা (বা মোট ব্যয়) হইল মোট ভোগ্যদ্রব্যে

* প্রথম পরিচ্ছেদে জাতীয় আয়ের পরিমাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, কোন দেশে বিনিময়যোগ্য সকল প্রকার সম্পূর্ণোৎপন্ন (Final Product) দ্রব্য সামগ্রীর মোট মূল্যকে মোট জাতীয় আয় বলা হয়। সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর বিক্রয়মূল্য হইতেই সকলের আয়, সুতরাং জাতীয় আয় আর সামগ্রিক চাহিদা সমান।

সামগ্রিক চাহিদা (Aggregate Demand) চারি ধরনের বিষয় লইয়া গঠিত হয় (ক) ব্যক্তিগত ভোগ-ব্যয়, (খ) ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-ব্যয়, (গ) রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ-ব্যয় এবং (ঘ) বিদেশী দ্রব্যকার্যাদির উপর দেশীয় জনসাধারণের ব্যয় অপেক্ষা দেশীয় কার্যাদির উপর বিদেশী জনসাধারণের ব্যয়ে আধিক্য (বা ঘাট্‌তি)। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্য কার্যাদি বা মোট উৎপাদনের উপর আর্থিক ব্যয়ের স্রোতকেই আমরা সামগ্রিক চাহিদা বলিতে পারি।

সংখ্যাতত্ত্বানুযায়ী হিসাব করিলে দেখা যায়, এই সামগ্রিক চাহিদা এবং মোট জাতীয় উৎপন্ন (Gross National Product) একই বিষয়। ইহারা একই, কারণ কোন আর্থিক লেনদেনকে দুইদিকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখা চলে : আয় ও ব্যয়। বিক্রেতার যাহা আয়, ক্রেতার তাহাই ব্যয় : কম-ও নহে, বেশি-ও নহে। সুতরাং বলা যায়, মোট জাতীয় উৎপন্ন হইল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য বা চল্‌তি সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উপর মোট আর্থিক ব্যয়। যেমন, যদি কোন বৎসরে মোট সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য হয় 500 কোটি টাকা, তাহা হইলে ইহা হইতে বুঝা যায় ওই সময়ের মধ্যে দেশের মোট ব্যয় হইল 500 কোটি টাকা অথবা ওই সময়ের মধ্যে দেশের সামগ্রিক চাহিদা-ও 500 কোটি টাকা।

মোট জাতীয় উৎপন্নকে বিভক্ত করিলে আমরা $Y = C + I$ এই কেইন্‌সীয় সূত্র পাইতে পারি। এখানে Y হইল মোট জাতীয় উৎপন্ন (বা মোট জাতীয় আয়) ; C হইল ভোগ এবং I হইল বিনিয়োগ। I-এর মধ্যে ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয় বা বৈদেশিক সকল প্রকার বিনিয়োগ নিহিত আছে।

ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয়ের সমষ্টি। আর মোট ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় =মোট ভোগ্যদ্রব্য হইতে বিক্রয়লব্ধ আয়; এবং মোট বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয় =মোট বিনিয়োগ দ্রব্য হইতে বিক্রয়লব্ধ আয়। সুতরাং,

কার্যকরী চাহিদা=মোট জাতীয় আয়=জাতীয় উৎপাদনের মোট মূল্য,
=ভোগদ্রব্যের উপর ব্যয়+বিনিয়োগ দ্রব্যের উপর ব্যয়,
=ভোগদ্রব্য হইতে বিক্রয় লব্ধ আয়+বিনিয়োগ দ্রব্য হইতে বিক্রয় লব্ধ আয়।

দেশে কার্যকরী চাহিদার উপর মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে; অর্থাৎ (ক) ভোগব্যয় এবং (খ) বিনিয়োগ ব্যয়, এই উভয় ব্যয়ের দ্বারা কর্ম-নিয়োগের পরিমাণ স্থির হয়। যদি ভোগব্যয় বা বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া মোট ব্যয় বা কার্যকরী চাহিদা বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে কর্মসংস্থান বাড়ে; যদি ভোগব্যয় বা বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস পাইয়া মোট ব্যয় বা কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যায়, তাহা হইলে কর্মসংস্থান কমে। ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ ব্যয় কিসের উপর নির্ভরশীল? কোন্ কোন্ শক্তির দ্বারা ইহারা নির্ধারিত হয়?

ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়

(ক) সমাজে ভোগব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে মোট আয়ের কি অংশ ব্যক্তিরা মিলিয়া ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে, অর্থাৎ মোট আয় এবং সমাজের গড় ভোগ-প্রবণতার উপর। আয়-বৃদ্ধি হইলে ভোগের পরিমাণ বাড়ে বটে, কিন্তু যে হারে

"সম্পূর্ণোৎপন্ন" কথার অর্থ হইল যে হিসাবের সময় আধা-উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর বা উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের দাম গ্রহণ করা হয় না, পাছে ডবল হিসাব হইয়া যায়। "মোট" কথাটিতে বোঝা যায় মূলধনী দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতির বাবদ কোন অর্থ পৃথক করিয়া হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইতেছে না। মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পূরণ বাবদ অর্থ মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়। এই নীট জাতীয় উৎপাদনের মোট বিক্রয় মূল্য হইতে বিক্রয়কর বা অন্যান্য ব্যবসায়-কর প্রভৃতি বাদ দিলে আমরা "জাতীয় আয়" পাইতে পারি। কারণ, সকল দ্রব্য সামগ্রীর মোট বিক্রয় মূল্য হইতে পরোক্ষ কর আদায় প্রভৃতির পরিমাণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সকল উৎপাদনের জন্য ব্যয় বা সকল উপাদানের আয় (খাজনা, মজুরি, সুদ এবং অবণ্টিত মুনাফা)।

সুতরাং বলিতে পারা যায়, স্থূল জাতীয় উৎপাদন—মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ=নীট জাতীয় উৎপাদন।

নীট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য—পরোক্ষকর=জাতীয় আয়। নীট জাতীয় আয়ের সাহায্যে দেশের আয়স্তর ও কর্মনিয়োগের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয় না; বিশ্লেষণের জন্য মোট জাতীয় উৎপাদন এবং মোট আয় ব্যবহার করা হয়; কারণ পরোক্ষ কর বা মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ যথাক্রমে রাষ্ট্র বা ফার্ম কর্তৃক ব্যয়িত হয়, এবং ফলে উহা দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা সৃষ্টি করে।

আয় বৃদ্ধি হয়, ব্যক্তির ভোগের পরিমাণে সেই হারে বৃদ্ধি হয় না। আয়ের বৃদ্ধি ও ভোগের বৃদ্ধির অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বলে।

ভোগ-প্রবণতা নির্ভর করে প্রধানত আয়ের স্তরের উপর। তাহা ছাড়া, সমাজে জাতীয় আয় কি ভাবে বন্টিত থাকে তাহার দ্বারাও ভোগপ্রবণতা স্থির হয়। যদি জাতীয় আয়ের বেশি অংশ কমসংখ্যক ধনী-ব্যক্তির হাতে থাকে তাহা হইলে সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা কম; অপরপক্ষে যদি জাতীয় আয়ের বেশি অংশ অধিকসংখ্যক গরীব লোকের হাতে থাকে, তাহা হইলে সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা বেশি। সঞ্চয় ও ব্যয় সম্বন্ধে জনসাধারণের প্রচলন রীতি-নীতি, চিন্তা ও অভ্যাস প্রভৃতি ভোগপ্রবণতার আয়তন নির্ণয় করে। ব্যক্তিদের হাতে সঞ্চিত তরল সম্পত্তির (Liquid Assets) পরিমাণের উপর ভোগপ্রবণতা নির্ভরশীল; কারণ অধিক পরিমাণ তরল সম্পত্তি (যেমন সরকারী ঋণপত্র, নগদ টাকা, বা সঞ্চয়ী আমানত প্রভৃতি) হাতে থাকিলে নিরাপত্তার মনোভাব বেশি হওয়ার জন্য এবং ভবিষ্যতে ইহা হইতে আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকায় বর্তমান-আয় হইতে সঞ্চয়ের ইচ্ছা কম থাকে অর্থাৎ ভোগপ্রবণতা বেশি থাকিতে পারে। কর-কাঠামোর উপরও ভোগপ্রবণতা কিছুটা নির্ভর করে, অর্থাৎ করসমূহের প্রকৃতি এবং হার উভয়ই ভোগপ্রবণতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘকালে ভোগপ্রবণতা নির্ধারণকারী এই সকল বিষয়সমূহে পরিবর্তন হইয়া সমাজের গড় ভোগপ্রবণতার পরিবর্তন ঘটিলেও স্বল্পকালে ইহা মোটামুটি স্থায়ী বিষয়।

ভোগপ্রবণতা নির্ভর করে মোট আয়; আয়-বৈষম্যের হার, প্রচলিত অভ্যাস ও রীতি; সঞ্চিত তরল সম্পত্তির পরিমাণ, কর কাঠামো প্রভৃতির উপর

স্বল্পকালে ইহা মোটামুটি স্থির

(খ) সমাজের মোট বিনিয়োগ-ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর: (১) মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা (Marginal Efficiency of Capital) ও (২) সুদের হার। এক ইউনিট মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করিয়া তাহা হইতে ব্যয়ের ঊর্ধ্বে যে নীট আয় হইবার সম্ভাবনা, অর্থাৎ নূতন মূলধনী দ্রব্যোৎপাদন হইতে সম্ভাব্য আয়ের হার—ইহাকে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বলা হয়। বাজারে প্রচলিত সুদের হার হইতে যদি সম্ভাব্য আয়ের হার বেশি হয়, তাহা হইলে সমাজে বিনিয়োগ-ব্যয় বৃদ্ধি হইবে; মূলধনের প্রান্তিক

বিনিয়োগ-ব্যয় নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও সুদের হারের উপর

কার্যকারিতা বা সম্ভাব্য আয়ের হার সুদের হার হইতে কম হইলে সমাজে বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়া যাইবে। এই উভয় বিষয় মিলিয়া স্থির করে বিনিয়োগ-প্রবণতা (**Propensity to Invest**)।

মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কিসের উপর নির্ভর করে

(১) মূলধনের প্রান্তিক-কার্যকারিতা বা বিনিয়োগ-প্রবণতা বহু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। (ক) যেমন, ভবিষ্যতে দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে কি না। চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বাড়ে; চাহিদা হ্রাসের সম্ভাবনা থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কমে। (খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশি থাকে। (গ) সেই বিশেষ প্রকার মূলধনী দ্রব্যে বর্তমান উৎপাদন ও যোগানের পরিমাণের উপর ইহা অনেকটা নির্ভর করে, পরিমাণ বেশি হইলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কম, পরিমাণ কম হইলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বেশি। (ঘ) বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও নূতন যন্ত্র-প্রচলনের হার অধিক থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কম ; এই হার কম থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বেশি। (ঙ) মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে বর্তমান নিয়োগ-হার কিরূপ তাহাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইহা বেশি থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম, ইহা কম থাকিলে প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশি। (চ) বর্তমান কর-কাঠামোর প্রকৃতি ও হার এবং তাহাতে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রভাবও কম নয়। করহার অধিক হইলে প্রান্তিক কার্যকারিতা কম, করহার কম হইলে ইহা অধিক। (ছ) ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশানিরাশার অবস্থা ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভবিষ্যতে লাভের আশা বা ক্ষতির ভয়, অর্থাৎ ব্যবসায় জগতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা দুই ধরনের : আশাবাদী মনোভাব প্রবল থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশি, নিরাশাবাদী মনোভাব প্রবল থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা দুই প্রকার : স্বল্পকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা ও দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা। বর্তমানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বল্প-কালীন ধারণা ও দীর্ঘকালীন ধারণা

স্বল্পকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা স্থির হয়; অপরপক্ষে, স্থায়ী ধরনের আশা ও ভয়ের ভিত্তিতে দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা গড়িয়া উঠে। কাল যত স্বল্প, পরিচিত বর্তমান অবস্থা চলিতে থাকার সম্ভাবনা তত বেশি, নিশ্চয়তার অনুভূতি তত প্রবল ; কাল যত দীর্ঘ, বর্তমান ও পরিচিত অবস্থা চলিতে থাকার

সম্ভাবনা তত কম, অনিশ্চিয়তার অনুভূতি তত প্রবল। (ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চিত অসম্পূর্ণ জ্ঞান, পরিকল্পনাহীন বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির উদ্ভব, ব্যবসায়-বিশ্বাসে (**business confidence**) বিপুল উঠানামা, বাণিজ্যচক্রের তীব্রতা ও গভীরতা বৃদ্ধির কারণও বটে)।

সুদের হার নির্ভর করে টাকার পরিমাণ ও নগদ-পছন্দের উপর

(২) সুদের হার নির্ভর করে (ক) টাকার পরিমাণ, ও (খ) নগদ-পছন্দের তালিকার উপর। টাকার পরিমাণ কমিয়া গেলে অথবা নগদ-পছন্দের হার বাড়িয়া গেলে সুদের হার বৃদ্ধি পায়; টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গেলে অথবা নগদ-পছন্দের হার কমিয়া গেলে সুদের হার হ্রাস পায়।

সুতরাং কর্মসংস্থানের স্তর নির্ধারণী শক্তিসমূহকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজান যায়:

- মোট কর্মসংস্থান
  - কার্যকরী চাহিদা
    - মোট ব্যয়
      - ভোগ ব্যয়
        - আয়স্তর
        - সঞ্চয় প্রবণতা
      - ব্যক্তি উদ্যোগী বিনিয়োগ ব্যয়
        - সুদের হার
          - টাকার যোগান
          - তারল্য পছন্দ
        - মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা
          - মূলধনের দাম
          - সম্ভাব্য আয়
      - সরকারী ব্যয়

ভোগ-ব্যয় ও আয় (Consumption and Income : The consumption Function)

সমাজে মোট ভোগের পরিমাণ নির্ভর করে সকল ব্যক্তির ভোগের পরিমাণের সমষ্টির উপর। প্রত্যেক ব্যক্তি ভোগদ্রব্য ক্রয়ে যে পরিমাণ ব্যয় করে তাহা যোগ করিলে সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট ভোগ পরিমাণ জানা যায়।

ব্যক্তির ভোগের পরিমাণ প্রধানত কিসের উপর নির্ভরশীল? কেইন্‌সের মতে, অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে (যেমন, দাম) প্রধানত ইহা নির্ভর করে ব্যক্তির আয়ের উপর। দ্রব্যের দামের সঙ্গে উহার জন্য চাহিদার

যেরূপ কার্যকারণ সম্পর্কে আছে, ঠিক সেইরূপ ব্যক্তির ভোগপরিমাণ তাহার আয়ের উপর নির্ভরশীল।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরূপ সমষ্টির ক্ষেত্রেও তাই। দেশে মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে প্রধানত আয়স্তরের উপর। তালিকার আকারে বা রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহাদের এই সম্পর্ক আমরা প্রকাশ করিতে পারি। বিভিন্ন আয়ের পরিমাণে (Y) সমাজে কি বিভিন্ন পরিমাণ ভোগব্যয় (C) হইতেছে তাহা একটি তালিকাতে সাজান চলে :

ভোগ-ব্যয়ের তালিকা

Consumption Schedule

(কোটি টাকার হিসাব)

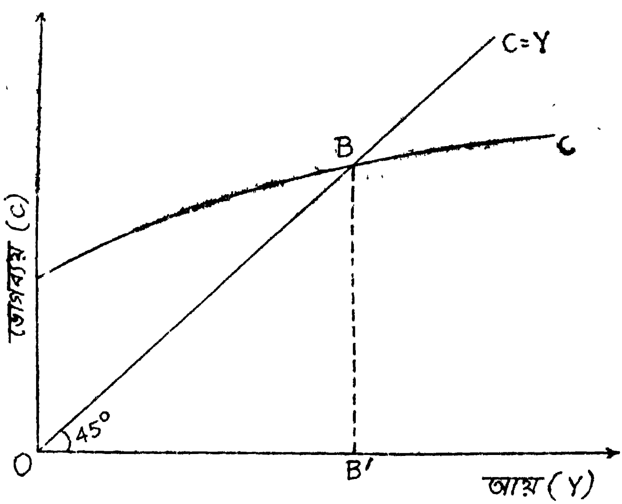
Y	C
0	20
50	65
100	100
150	130
200	155
250	175
300	185

বিভিন্ন আয়স্তরে ভোগব্যয়ের এই তালিকাকে ভোগ-প্রবণতা (Propensity to consume) বা ভোগ-অপেক্ষক বা ভোগ-নির্ভরক (consumption function) বলা হয়। আয়ের পরিমাণের সহিত ভোগব্যয়ের পরিমাণের এই সম্পর্ককে অপেক্ষক-সম্পর্ক (Functional relationship) বলা হয়, অর্থাৎ ঐ আয়স্তর আছে বলিয়া ঐরূপ ভোগের পরিমাণ হইতেছে, অর্থাৎ $C=f(Y)$. ইহাকে আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে প্রকাশ করিতে পারি।

ভূ-সমান্তরাল অক্ষে আমরা সমাজের মোট বিভিন্ন আয়স্তর প্রকাশ করিতেছি এবং লম্বমুখী অক্ষে ঐ প্রতিটি আয়স্তরে মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ দেখাইতেছি। 45° রেখাটিতে আয় ও ভোগের পরিমাণ সমান, মোট আয় যে পরিমাণ, ভোগের পরিমাণও ততখানি। ঐ রেখাটিকে আমরা তাই সঞ্চয়-শূন্যতার রেখা (Zero-savings line) বলিয়াও অভিহিত করিতে

পারি, কারণ ভোগকারীরা বা ক্রেতারা ঐ রেখার উপর সঞ্চরণ করিলে আয়ের সমস্তটাই ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় করিয়া ফেলে। C রেখাটি ধীরে ধীরে বাঁকিয়া যাইতেছে, অর্থাৎ আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোগব্যয় বাড়ে বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধির পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া আসে। পূর্বের তালিকার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া এই রেখাটি আঁকা হইয়াছে। C রেখা উৎসবিন্দু 0 হইতে সুরু হয় না কারণ আয় যখন শূন্য তখনও ভোগব্যয় শূন্য

আয়স্তর ও ভোগের সম্পর্ক



নয়, অর্থাৎ যখন Y=0 তখনও C=20 কোটি টাকা। C রেখাটি উপরে উঠিতেছে অর্থাৎ দেখা যাইতেছে আয়স্তর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভোগব্যয় বাড়িতে থাকে (an increasing function of income)। উভয় রেখার ছেদবিন্দু B হইল এমন একটি স্থান যেখানে C=Y. B′ বিন্দুর বাঁ দিকে অর্থাৎ OB′ পরিমাণের কম আয়স্তরে আয়ের তুলনায় ভোগব্যয় বেশি, ঋণাত্মক সঞ্চয় (negative savings) হইতেছে ; B′ বিন্দুর ডানদিকে অর্থাৎ OB′ পরিমাণের বেশি আয়স্তরে ভোগব্যয় কম, ধনাত্মক সঞ্চয় (positive savings) হইতেছে তালিকার উদাহরণ হইতে বলা চলে যে, এই ছেদ-বিন্দু বা B এমন স্তর প্রকাশ করে যেখানে 100 কোটি আয় এবং 100 কোটি ব্যয়। 45° রেখাটি হইতে C রেখাটির দূরত্ব বিভিন্ন আয়স্তরে (ঋণাত্মক বা ধনাত্মক) সঞ্চয়ের পরিমাণ পরিমাপ করিতেছে।

সুতরাং, যে অপেক্ষক বা নির্ভরক (Function) ভোগ ও আয়ের মধ্যে

পরস্পর-নির্ভরশীলতা বা সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তাহাকেই আমরা ভোগপ্রবণতা (Propensity to consume) বলিতে পারি। আমাদের চিত্রের C রেখাটিই হইল এই ভোগপ্রবণতা, ইহার এক ধরনের অবস্থান ও ঢাল (position and slope) আমরা দেখাইয়াছি। এই প্রবণতার দুইটি টেকনিকাল ধর্ম (technical attributes) আমাদের আলোচনা করা দরকার : প্রথমত গড় ভোগপ্রবণতা, ও দ্বিতীয়ত, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা। বিশেষ কোন আয়স্তরের সহিত ভোগব্যয়ের যে অনুপাত অর্থাৎ C/Y, ইহাকেই গড় ভোগপ্রবণতা বলা হয়। যেমন, যদি 100 টাকা আয়ের মধ্যে 80 টাকা ভোগব্যয় হয় তবে গড় ভোগ-প্রবণতা হইল $\frac{80}{100}$ অর্থাৎ 80% বা 0·8। এই গড় ভোগপ্রবণতা বাহির হইলে ইহা হইতেই গড় সঞ্চয়প্রবণতা জানা যায়, উপরের উদাহরণে গড় সঞ্চয়প্রবণতা হইল 20% বা 0·2। আয়স্তর যত বাড়ে এই গড় সঞ্চয়প্রবণতা তত বৃদ্ধি পায় এবং গড় ভোগপ্রবণতা তত কমে। অর্থাৎ S/Y বৃদ্ধি পায় এবং C/Y হ্রাস পায়। আমাদের চিত্রের ভাষায় বলিতে গেলে গড় ভোগপ্রবণতা হইল C রেখার উপর অবস্থিত যে কোন একটি বিন্দু, সেই বিন্দুতেই জানা যায় আয়ের কত অংশ ভোগব্যয় বা সঞ্চয় হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, এই গড় ভোগপ্রবণতা সাধারণ অবস্থায় 1 হইতে কম কোন এক ভগ্নাংশ হইবে।*

আয় বৃদ্ধি হইলে ভোগব্যয় বাড়িবে। আয়ের বৃদ্ধি ও ভোগের বৃদ্ধি এই অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (Marginal Propensity to consume)

* এই গড় ভোগপ্রবণতার অর্থনৈতিক তাৎপর্য কম নয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তরে যে পরিমাণ দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতেছে তাহাদের মোট ব্যয়ের কত অংশ কেবল ভোগ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া তুলিয়া আনা যাইতে পারে, আমরা তাহা ইহার সাহায্যে জানিতে পারি। ভোগব্যয় হইল ভোগ্যদ্রব্যের জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্য বিক্রয়জাত আয়ের পরিমাণ, সুতরাং ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ও যোগান হইতে জাতীয় আয়ের কত অংশ আসিল, তাহা আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি। অপরপক্ষে সকল দ্রব্যসামগ্রীর মোট ব্যয়ের কত অংশ মূলধনী দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তোলা যাইবে, অর্থাৎ মূলধনী দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান হইতে জাতীয় আয়ের কত অংশ আসিল, তাহাও আমরা গড় সঞ্চয়প্রবণতা হইতে জানিতে পারিব। তাই অন্যান্য বিষয় সমান থাকিলে দেশে ভোগ্যদ্রব্যের এবং মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনের পারস্পরিক অনুপাত নির্ভর করে C/Y এবং S/Y এর উপর। পূর্ণ শিল্পোন্নত দেশগুলিতে গড় ভোগপ্রবণতা কম থাকে এবং গড় সঞ্চয় প্রবণতা বেশি থাকে। সুতরাং দীর্ঘকালীন উন্নয়ন বা স্থায়িত্ব (stability) বজায় রাখার শর্ত আলোচনার জন্য গড় ভোগ ও সঞ্চয়-প্রবণতা ধারণা দুইটি খুবই প্রয়োজনীয়।

বলে। যদি δ-কে অতি অল্প পরিবর্তনের প্রতীক ধরা হয়, তাহা হইলে এই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাকে $\delta C/\delta Y$ বলা চলে। ইহাতে বোঝা যায় যে, আয়ের অতি অল্প পরিবর্তন ভোগে অতি অল্প পরিবর্তন আনিবে এবং এই দুই পরিবর্তনের অনুপাত কিরূপ। কিন্তু আমরা জানি, আয়ে পরিবর্তন অপেক্ষা (অর্থাৎ δY) ভোগে পরিবর্তন (অর্থাৎ δC) কম হইবে। সুতরাং $\delta C/\partial Y$ ধনাত্মক হইলেও উহা 1 হইতে কম। আয় ও ভোগের বৃদ্ধির পরিমাণ সমান হইলে উহা হইত 1 ; আয়-বৃদ্ধির তুলনায় ভোগবৃদ্ধি বেশি হইলে উহা হইত 1-এর বেশি ; আয় বৃদ্ধির তুলনায় ভোগের বৃদ্ধি কম বলিয়া উহা 1 হইতে কম। তাই আমরা বলিতে পারি $O<\frac{\delta C}{\partial Y}<1$, অথবা $1>\frac{\sigma C}{\partial Y}>O$.*

ভোগপ্রবণতা কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল (Determinants of C Function)

কেইন্‌স ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, ভোগ প্রবণতা বা ভোগকারক স্বল্পকালে মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে : তাই আয়স্তর নির্ধারণে বিনিয়োগব্যয়ের গুরুত্ব বেশি বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। ভোগপ্রবণতা শুধুমাত্র আয়ের উপর নির্ভরশীল বলিলে আমরা ধরিয়া লই যে, মনোগত বিষয়গুলিতে (subjective factors) পরিবর্তন আসে না, এবং বাস্তব বিষয়গুলির মধ্যে আয় ছাড়া অন্য কিছুতে পরিবর্তন হইতেছে না। ভোগ প্রবণতা অপরিবর্তিত থাকে কি না জানিতে হইলে, তাই এই বাস্তব ও মনোগত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। ভোগপ্রবণতা নির্ধারণকারী এই সকল বিষয় আলোচনার সময়ে আমাদের দুইটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, কি সময়ের মধ্যে আমরা

* এই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার অর্থনৈতিক তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে আয়স্তরে যতটুকু বৃদ্ধি হয় তাহার কিছু অংশ ভোগ ব্যয় হইবে এবং কিছু অংশ সঞ্চয় হইবে। ইহা জানা থাকিলে কোন এক বিশেষ আয়স্তর বজায় রাখার জন্য কতখানি বিনিয়োগ ব্যয় করা দরকার তাহা আমরা পূর্বেই জানিতে পারি (planning of investment to maintain the desired level of income)। যেমন ধরা যাউক, (100 কোটি টাকার স্তর হইতে) 50 কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইল এবং ভোগব্যয় বাড়িল 30 কোটি ; অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইল 60% বা 0·6। সকল উৎপাদক মিলিয়া উৎপাদন বাড়াইল 50 কোটি টাকার, কিন্তু ভোগব্যয় 30 কোটি হওয়ায় (50—30) 20 কোটি টাকার বিনিয়োগ ব্যয় হওয়া দরকার। তাহা না হইলে আয়স্তর 150 কোটি টাকায় বজায় রাখা যাইবে না।

এই বিশ্লেষণ করিতেছি, অর্থাৎ সেই সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবগুলি বিচার করা দরকার। দ্বিতীয়ত, আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে আমরা পূর্ণ শিল্পোন্নত দেশের ক্রেতাদের আচরণ বিশ্লেষণ করিতেছি। এই দুইটি অনুমানের ভিত্তিতে প্রথমে বাস্তব বিষয়গুলি আলোচনা করা যাউক।

সর্বপ্রথমে বলা দরকার যে, দেশের আয়বণ্টনকাঠামোর উপর ভোগপ্রবণতা বা ভোগকারক নির্ভর করে।* দেশের আয়বণ্টন অধিকতর বৈষম্যমূলক হইলে অল্প কয়েকজন ব্যক্তির হাতে আয় বেশি থাকে এবং অধিক সংখ্যক ব্যক্তির হাতে আয় কম থাকে। আমরা জানি আয় বেশি থাকিলে ভোগপ্রবণতা কম এবং যাহাদের আয় কম তাহাদের ভোগপ্রবণতা বেশি। তাই আয়-বৈষম্য অধিক হওয়ায় দেশে গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা কম থাকে, অর্থাৎ সঞ্চয়-প্রবণতা বেশি থাকে। আয়বণ্টন যত কম বৈষম্যমূলক হইবে, অর্থাৎ ক্রেতাদের মধ্যে আয়ের বণ্টন-সাম্য যত বেশি হইবে, তাহাদের গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা তত বেশি অর্থাৎ সঞ্চয় প্রবণতা তত কম। রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণে আয়বণ্টনে বিপুল পরিবর্তন আসিলে ক্রেতাদের অভ্যাসেই এমন পরিবর্তন আসিতে পারে যে, ভোগপ্রবণতায় গুরুত্বপূর্ণ বদল হয়। প্রগতিশীল করব্যবস্থার সাহায্যে তাই অনেক সময় সমাজের আয়বণ্টনে পরিবর্তন আনিয়া ভোগপ্রবণতাকে বদলাইয়া দিয়া পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছিবার চেষ্টা করা হয়।

আয়-বণ্টন কাঠামো

দেশের কর-কাঠামোতে পরিবর্তন (changes in the tax structure) ভোগপ্রবণতায় পরিবর্তন আনিতে পারে। প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বেশি থাকিলে ভোগপ্রবণতা বেশি থাকে, পরোক্ষ কর বেশি থাকিলে ভোগের পরিমাণ হ্রাস পায়। ইহার কারণ হইল প্রত্যক্ষ কর সাধারণত সঞ্চয়ের উপর বেশি চাপ দেয়, ভোগব্যয়ের উপর ততটা নয়। পরোক্ষ করের পরিমাণ বাড়াইলে সাধারণত ভোগব্যয় কমে।

কর কাঠামো

কোন দেশে কি পরিমাণ ভোগব্যয় হইবে তাহা কিছু পরিমাণ নির্ভর করে যৌথমূলধনী কোম্পানীসমূহের বিভিন্নরূপ রীতিনীতির উপর (corporate

* 'The most important influence on the demand for consumption goods is the distribution of income.' Mrs. Robinson, *The Problem of Full Employment*, P. 3.

financial policies)। লাভের কত অংশ তাহারা নিজেদের নিকট রাখিয়া দিয়া কত অংশ লভ্যাংশ হিসাবে দিবে, তাহা ভোগপ্রবণতাকে প্রভাবিত করে। কোম্পানীরা নিজেরা টাকা সঞ্চয় করিলে ক্রেতাদের হাতে ভোগব্যয়ে খরচার উদ্দেশ্যে কম টাকা যায়, তাই ভোগব্যয় কমে। কোম্পানীর লাভ হওয়া এবং লভ্যাংশ বণ্টন করা, ইহাদের মধ্যে যত বেশি সময়ক্ষেপ হইবে আয় প্রসারের বেগ তত মন্দীভূত হইবে, তাহাও মনে রাখা দরকার।

যৌথমূলধনী কোম্পানীগুলির আর্থিক নীতি

তাহা ছাড়া, ক্রেতাদের হাতে তরল নগদ সম্পত্তির পরিমাণ দ্বারা (consumer's Liquid Assets) ভোগপ্রবণতা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। যেমন ক্রেতাদের হাতে রক্ষিত নগদ টাকা, চলতি ও সঞ্চয়ী আমানত এবং সরকারী বণ্ড—এই সকল তরল সম্পত্তির পরিমাণ জানা না থাকিলে ভবিষ্যৎ ভোগব্যয় ও নূতন সঞ্চয়ের পরিমাণ জানা যায় না।

তরলসম্পত্তির পরিমাণ

পরোক্ষভাবে হইলেও, সুদের হার দ্বারা ভোগপ্রবণতা প্রভাবিত হয়। সুদের হার বাড়িয়া গেলে বীমাকোম্পানীগুলির নিজের লগ্নী হইতে বেশি আয় হয়, তাই তাহারা প্রিমিয়ামের হার কমাইয়া দিতে পারে। সুদের হার বাড়িলে বণ্ডগুলির দাম কমিয়া যায়, অর্থাৎ ভোগ হ্রাস পাইয়া বণ্ডের চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে। স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যগুলির (গাড়ি, বাড়ি প্রভৃতি) চাহিদার সঙ্গে বণ্ডের চাহিদা প্রতিযোগিতা করে, সুদের হার বাড়িলে এক ধরনের সম্পত্তির পরিবর্তে ব্যক্তি অপর ধরনের সম্পত্তি ক্রয় করিতে থাকে, ভোগব্যয় হ্রাস পাইতে পারে। আবার সুদের হার কমিলে ক্রেতাদের বণ্ডের জন্য চাহিদা কমাইয়া দিয়া স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যগুলির জন্য চাহিদা বাড়াইয়া দিতে পারে।

সুদের হার

এই সকল "বাস্তব" বিষয়গুলি দ্বারা ব্যক্তির ভোগপ্রবণতা প্রভাবিত হয়, তাই সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা ইহাদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ইহাদের মধ্যে যে শক্তি ব্যক্তির ভোগপ্রবণতার উপর অধিকতর প্রভাবশীল, ঠিক সেইটিই সমাজের গড় ভোগপ্রবণতার উপর অধিক প্রভাবশীল না-ও হইতে পারে। ভোগপ্রবণতা স্থিতিশীল—ইহা ধরিয়া লইবার জন্য আমরা তাই এই সকল বিষয়ে পরিবর্তন ঘটিতেছে না বলিয়া মনে করিয়া লই: নির্দিষ্ট 'অবস্থা-কাঠামো' বজায় আছে স্বীকার করিয়া আলোচনা করি ('in a given situation')।

ইহারা বদলায় না বলিয়া আমরা ধরিয়া লই

যে সকল মনোগত বিষয়ের (subjective factors) উপর ভোগপ্রবণতা নির্ভর করে, তাহাদেরও আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, বর্তমান সমাজের ব্যক্তি ও পরিবারসমূহ সাধারণত বেশির ভাগ চিন্তা করে নিরাপত্তা সম্পর্কে: বার্ধক্য, অসুস্থতা ও অন্যান্য বিপদ আপদের জন্য সঞ্চয় করাই তাহাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি সামাজিক নিরাপত্তার (Social security measures) ব্যবস্থা উন্নত হয়, তবে ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভোগপ্রবণতা অধিকাংশ নির্ভর করে, সমাজে কিরূপ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহাদের বিক্রয় ব্যবস্থা ভাল কি খারাপ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া তাহাদের অপেক্ষা জীবনযাত্রার মান বাড়াইয়া চলার ইচ্ছা প্রভৃতির উপর। তৃতীয়ত, ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ইচ্ছায় ব্যক্তি বর্তমানে ভোগ কমাইয়া বেশি সঞ্চয় করিতে পারে, এই ইচ্ছা যত শক্তিশালী বর্তমানে ব্যক্তি তত বেশি সঞ্চয় করিতে চাহিবে। বর্তমানে জীবনযাত্রার মান খুব নিচু থাকিলে সঞ্চয় বাড়াইয়া মূলধন গঠনের চেষ্টা চলিতে থাকিবে যাহাতে ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার মান বাড়ান যায়। চতুর্থত, আর্থিক ব্যাপারে বিজ্ঞতা ও বিবেচনা (Financial prudence) সাধারণত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয়-প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, বর্তমান যন্ত্রপাতির পরিমাণ ও উৎকর্ষ, বাজারে প্রতিযোগিতার তীব্রতা ও সম্ভাবনা, দরকারমত অন্য কোন সূত্র হইতে টাকা পাওয়ার সুযোগ সুবিধা, যন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ-এর প্রয়োজন—এই প্রকার বিষয় মিলিয়া তাহাদের সঞ্চয় প্রভাবিত হয়। তবে সাধারণত বলা হয় যে, স্বল্পকালে ভোগপ্রবণতা মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে।

মনোগত বিষয়গুলি—স্বল্পকালে ইহারা মোটামুটি স্থির

বিনিয়োগ ও আয় (Investment and Income: The Investment Function)

বিনিয়োগ বলিলে বোঝা যায় নূতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে টাকা লগ্নী করা। সমাজে পুরাতন কোন বণ্ড, ডিবেঞ্চার বা শেয়ারে টাকা খাটাইলে তাহাকে বিনিয়োগ বলা চলে না, কারণ এইরূপ টাকার লগ্নীতে নূতন কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি হইতেছে না। যে টাকা খাটান হইল, তাহাতে নূতন কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উদ্ভব হইলে অর্থাৎ বর্তমানের তুলনায় আয় ও

বিনিয়োগ ও অবিনিয়োগ কাহাকে বলে

কর্মসংস্থানের স্তর বাড়িলে, তবেই তাহাকে বিনিয়োগ বলা চলে। আবার উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যাইতেছে, এইরূপ ভাবে সমাজে টাকা খাটান বন্ধ করিলে তাহাকে অবিনিয়োগ (Disinvestment) বলা চলে।

কোন নির্দিষ্ট সময়ে, সমাজের সকল উদ্যোক্তারা মিলিয়া নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে যে টাকা খাটায়, তাহাই মোট বিনিয়োগ ব্যয়। এই বিনিয়োগ ব্যয় বহু বিচিত্র প্রকার শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। উহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটিকে পৃথক করিয়া ফেলা দরকার, তাহা না হইলে এই জটিলতা খণ্ডন করা যাইবে না। যেমন, আমরা ধরিয়া লইব সমাজে উদ্যোক্তাদের সম্মুখে বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধার নির্দিষ্ট একটি ধরন আছে, উহা ঐতিহাসিক দিক হইতে মোটামুটি নির্দিষ্ট (investment opportunities historically given)। আমরা স্বল্পকালের অবস্থা বিচার করিতেছি, তাই ইহাও ধরিয়া লইতে হইবে যে, সমাজে মূলধন-সঞ্চয়ের পরিমাণ পর্যাপ্ত আছে।* এই সকল বিষয় মোটামুটি স্থির ধরিয়া লইয়া আমরা দুইটি প্রধান শক্তি বাছিয়া লইব। বর্তমান কালে, অতিদীর্ঘকালীন প্রভাবগুলিকে হিসাবের মধ্যে না আনিয়া আমরা বলিতে পারি যে, সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে আয়স্তর, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা এবং সুদের হারের উপর।

বিনিয়োগ নির্ভর করে অনেক বিষয়ের উপর: উহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান

(ক) আয়স্তরের উপর বিনিয়োগ কিরূপভাবে নির্ভর করে, তাহা বুঝিতে হইলে বিনিয়োগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা দরকার: স্বয়ংভূত বিনিগোগ ও উদ্ভূত বিনিয়োগ (Autonomous Investment and Induced Investment)। সমাজে কিছু পরিমাণ বিনিয়োগ থাকে, যাহা আয়-স্তরের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল নয়। বিভিন্ন আয়স্তরে এইরূপ বিনিয়োগ সমান থাকে, আবার আয়স্তর সমান থাকিলেও এইরূপ বিনিয়োগে পরিবর্তন হইতে পারে—এই ধরনের বিনিয়োগ

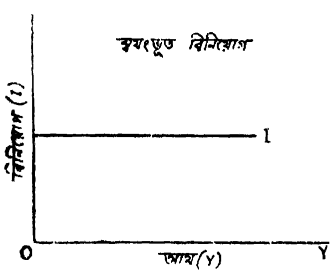
আয়স্তরের উপর বিনিয়োগের নিভরশীলতা

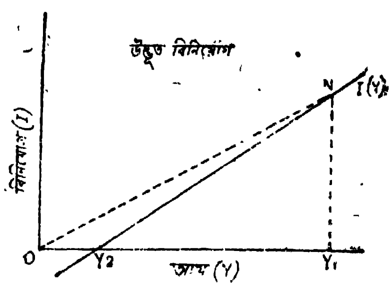
* সুদীর্ঘকালের বিশ্লেষণে কেইন্‌স্ বলিয়াছেন যে বিনিয়োগের উপর অন্যান্য প্রভাব ছাড়াও, মূলধন সঞ্চয়ের পরিমাণ (capital accumulation) প্রধানত প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘকালে তাই একদিকে বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধার অভাব এবং অপরদিকে প্রভূত মূলধন দেখা দিলে মূলধনের অতিদীর্ঘকালীন জড়ত্ব (secular stagnation of capital) দেখা দেয়। আবার হ্যারড্ বলেন, দীর্ঘকাল, সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রধানত নির্ভরশীল আয়বৃদ্ধির হারের উপর (rate of income growth.)

আয়স্তর নিরপেক্ষ। সরকার নূতন স্কুল কলেজ, রাস্তাঘাট, গৃহনির্মান, সামরিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে যে সকল টাকা খাটায়—উহারা স্বয়ংভূত বিনিয়োগ, ইহাদের পরিমাণ সমাজের আয়স্তরের উপর নির্ভর করে না। যুদ্ধের সময়ে বা পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বিনিয়োগকে স্বয়ংভূত বিনিয়োগ বলা চলে, কারণ ব্যবসায়ীদের লাভ-লোকসানের উপর ইহা নির্ভর করে না। অধ্যাপক টিন্‌বারগেন-এর ভাষায় বলা চলে যে 'if public investments are used as a political means to influence employment, it is justified to consider investment activity as an independent variable.' অপরপক্ষে, বিভিন্ন আয়স্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন, আয়স্তর বৃদ্ধির ফলে এবং সেই বর্ধিত আয়স্তর রক্ষা করার জন্য যে বিনিয়োগ ঘটে, তাহাই উদ্ভূত বিনিয়োগ। সংক্ষেপে বলা চলে,

স্বয়ংভূত বিনিয়োগ ও উদ্ভূত বিনিয়োগ

যে বিনিয়োগের আয়গত স্থিতিস্থাপকতা নাই (Income-inelastic investment function), তাহা স্বয়ংভূত বিনিয়োগ; আবার, যে বিনিয়োগের আয়গত স্থিতিস্থাপকতা আছে, (Income-elastic Investment function), তাহা উদ্ভূত বিনিয়োগ। নিচের ছবিতে ইহাদের দেখান হইতেছে। বাঁ দিকের ছবিতে স্বয়ংভূত বিনিয়োগের রেখাটি আয়স্তর রেখা অর্থাৎ Y অক্ষরে সমান্তরাল, আয়স্তর বাড়িলেও ইহা সমান থাকে।





ডানদিকের চিত্রটিতে I(Y) রেখাটি উদ্ভূত বিনিয়োগের রেখা। সাধারণত ধরিয়া লওয়া হয় যে, আয়স্তর বাড়িলে মুনাফা বাড়ে তাই ব্যবসায়ীদের মনে বিনিয়োগের ইচ্ছা দেখা দেয়। বিভিন্ন আয়স্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের বিভিন্ন পরিমাণ কিভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক দ্বারা যুক্ত (Functionally related), এই রেখা তাহা প্রকাশ করিতেছে। I(Y) রেখাটি তলার দিক দিয়া Y রেখাটিকে ভেদ করিয়া উপরে উঠিতেছে। অর্থাৎ OY_2 পরিমাণ আয় থাকিলে কোনরূপ বিনিয়োগের উদ্ভব হয় না, OY_2 পরিমাণের কম থাকিলে ঋণাত্মক বিনিয়োগ

বা অবিনিয়োগ ঘটে। OY_1 আয়স্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ হইল OY_1.

পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রের I(Y) রেখা হইতে আমরা দুইটি বিষয় জানিতে পারি : ইহারা হইল গড় বিনিয়োগ প্রবণতা এবং প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা (average propensity to invest and marginal propensity to invest)। মোট আয় ও ঐ স্তরে মোট বিনিয়োগের অনুপাতকে বলা হয় গড় বিনিয়োগ-প্রবণতা ; ইহাকে আমরা I/Y রূপে প্রকাশ করিতে পারি। আর আয় বৃদ্ধির হার এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার—এই দুই-এর অনুপাতকে বলা হয় প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা। ইহাকে আমরা $\delta I/\delta y$ রূপে প্রকাশ করিতে পারি। এই দুইটি ধারণার অর্থনৈতিক তাৎপর্য খুব কম নয়।

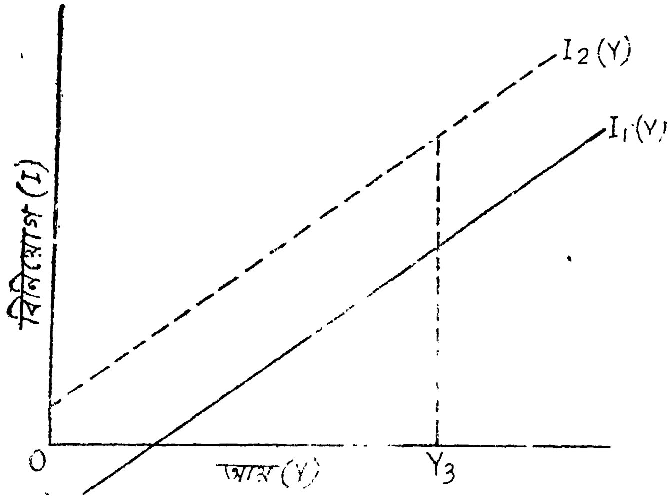
গড় ও প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা এবং ইহাদের তাৎপর্য

মোট আয়ের কত অংশ মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করিয়া পাওয়া যাইতেছে অথবা মোট আয়ের কত অংশ মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে নিযুক্ত হইতেছে প্রতিটি আয়স্তরের ক্ষেত্রেই আমরা তাহা জানিতে পারি এই গড় বিনিয়োগপ্রবণতা দ্বারা। আবার, জাতীয় আয়ে সামান্য পরিবর্তন হইলে বেসরকারী বিনিয়োগ কতখানি উঠানামা (Fluctuate) করিবে তাহা আমরা জানিতে পারি এই প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতার সাহায্যে।

বিনিয়োগপ্রবণতার রেখা বা I(Y) রেখা সম্পর্কে আমাদের আর একটি কথা জানা প্রয়োজন। পরপৃষ্ঠার চিত্রের মত এই রেখাটি যদি সম্পূর্ণ উপরে উঠিয়া যায়, তবে বোঝা যাইতেছে যে, সকল আয়ের স্তরেই উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে। সকল আয়স্তরেই বিনিয়োগের পরিমাণ সমানভাবে বাড়িবে এমন কোন কথা বলা যায় না। তবুও সহজে বুঝিবার জন্য ইহা আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা সকল আয়স্তরেই সমান, তাই $I_2(Y)$ রেখা $I_1(Y)$ রেখাটির সমান্তরাল।*

* বাস্তবে অবশ্য এইরূপ না হওয়ারই সম্ভাবনা। আয়স্তর কম থাকিলে প্রান্তিক বিনিয়োগ-প্রবণতা কম থাকিতে পারে, কারণ, এই অবস্থায় দেশে কিছু পরিমাণ মজুত করা দ্রব্য ও উপকরণ এবং যন্ত্রপাতির ক্ষমতা অব্যবহৃত অবস্থায় থাকিতে পারে (idle capacity in the form of unused inventories and fixed equipment)। আয়স্তর বৃদ্ধি পাইলে এই অব্যবহৃত ক্ষমতা দূর হয়, তাই উচ্চ আয়স্তরে প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা বেশি থাকারই সম্ভাবনা। এইরূপ অবস্থায় প্রতিটি আয়স্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন থাকিবে, দুইটি উদ্ভূত বিনিয়োগের রেখা সমান্তরালে অবস্থিত থাকিবে না। সংক্ষেপে বলা হয় যে, বিনিয়োগ-অপেক্ষক ? ... হইবে ('non-linear' investment function)।

সমগ্র বিনিয়োগের রেখাটি উপরে উঠিয়াছে, অনেক কারণে এইরূপ ঘটিতে পারে। যেমন দেশে সাধারণভাবে, সকল আয়স্তরেই, সুদের হার হ্রাস পাইয়াছে,



তখন এইরূপ সম্ভব। মজুরি হ্রাস, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি বা টেকনোলজির উন্নতি—যে সকল কারণে সমগ্র অর্থনৈতিক দেহে ব্যয়ের কাঠামোতে পরিবর্তন আসে, তাহারাই বিনিয়োগের রেখাটির অপসরণের পরিসীমা (shift parameter)।

মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও সুদের হার

(খ) মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও সুদের হার উভয়ে মিলিয়া কিরূপে বিনিয়োগের পরিমাণ স্থির করে, এখন তাহা আলোচনা করা দরকার। মূলধনী দ্রব্যের চাহিদার উপর বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে তাহা আমরা জানি। এই চাহিদা বা বিনিয়োগপ্রবণতা দুইটি বিষয়ের কার্যফল, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও সুদের হার।*

কোন বিনিয়োগকারী (investor) ব্যক্তি বা ফার্ম বিনিয়োগ করে কেন? ইহার কারণ হইল, এই বিনিয়োগ হইতে সে কিছু প্রতিদান (return) পায়।

* এই আলোচনার সময়ে আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, সুদের হার স্বাধীনভাবে নিরূপিত হইতেছে (Independently given)। এই অবস্থায় বিভিন্ন সুদের হারে যে বিভিন্ন পরিমাণ বিনিয়োগ ঘটিবে তাহার তালিকাকে বলা হয় মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার তালিকা (Schedule of the Marginal efficiency of capital)।

কোন ব্যক্তির হাতে কিছু পরিমাণ টাকা আছে, সে এই টাকা নূতন মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে অর্থাৎ বিনিয়োগে না খাটাইয়া উহা দিয়া যে-কোন প্রকার বণ্ড কিনিতে পারে। মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে ঝুঁকি কম নয়, সাফল্য-অসাফল্যের কথা কিছু বলা যায় না। তবুও সে বণ্ডের বাজারে টাকা না খাটাইয়া একমাত্র তখনই বিনিয়োগ করিবে যখন বণ্ড হইতে তাহার আয়ের তুলনায় বিনিয়োগ হইতে আয় বেশি হয়। অর্থাৎ বিনিয়োগ হইতে পাওয়া আয় বাজারে চলিত সুদের হার হইতে বেশি; অন্ততপক্ষে কম নয়। আর একটি অবস্থার কথা চিন্তা করা যায়। যদি ব্যবসাদার ব্যক্তিটি নিজের টাকা না খাটান, অপরের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া আনেন, তবে তাহাকে নজর রাখিতে হইবে যেন তিনি যে-সুদ দেন তাহার তুলনায় সেই টাকা খাটাইয়া তিনি বেশি প্রতিদান পাইতে পারেন। তিনি নির্দিষ্ট সুদের বণ্ড বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই টাকা দিয়া তিনি যে নূতন মূলধনী দ্রব্য তৈয়ারীর ব্যবসায় করিবেন, তাহা হইতে কিরূপ লাভ বা প্রতিদান তিনি আশা করেন, এই কথা তাঁহাকে সর্বদাই ভাবিতে হইবে। ইহার অর্থ হইল মূলধনী দ্রব্যের নূতন ইউনিট হইতে প্রতিদান, অর্থাৎ মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা চল্‌তি সুদের হারের তুলনায় কম হইলে সেই বিনিয়োগ হইতে পারে না। বিনিয়োগপ্রবণতা তাই নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও সুদের হারের মধ্যে এই সম্পর্কের উপর।

প্রান্তিক কার্যকারিতা সুদের হারের কম হইলে চলিবে না

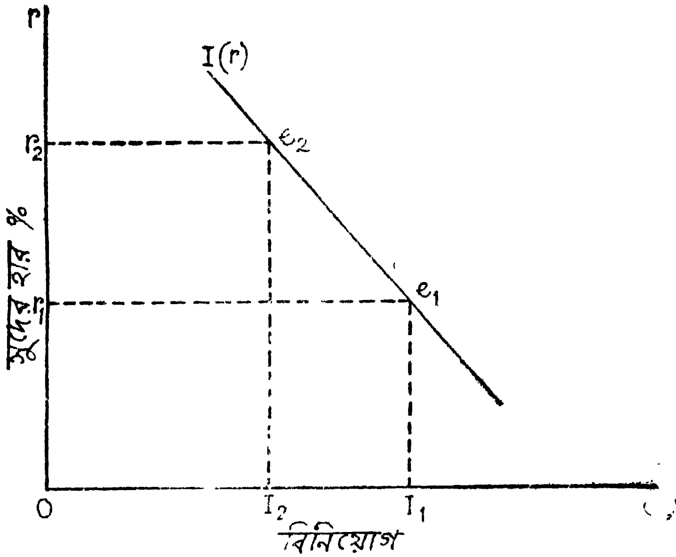
সুদের হারের সহিত সমাজে বিনিয়োগের এই সম্পর্ককে আমরা একটি তালিকার (schedule) আকারে প্রকাশ করিতে পারি। পর পৃষ্ঠার চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

চিত্রটিতে আমরা ভূসমান্তরাল অক্ষে বিনিয়োগের পরিমাণ এবং লম্বমুখী অক্ষে সুদের হার পরিমাপ করিতেছি। $I(r)$ হইল বিভিন্ন সুদের হারে বিভিন্ন পরিমাণ বিনিয়োগের রেখা। সুদের হার Or_1 হইতে বাড়িয়া Or_2 হইলে বিনিয়োগ OI_1 হইতে হ্রাস পাইয়া OI_2 হইতেছে। সুদের হার কমিলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। বিশেষ ধরনের কোন একটি মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে থাকিলে উহার প্রান্তিক কার্যকারিতা কমিয়া যাইতে থাকে। ইহার কারণ হইল সেই ধরনের যন্ত্রের যোগান যত

বৃদ্ধি পাইবে, উহা হইতে সম্ভাব্য প্রতিদানের পরিমাণও তত হ্রাস পাইবে। এই ধরনের যন্ত্র বেশি থাকিলে বাজারে উহার বিক্রয়জাত দ্রব্যের দাম কমিবার সম্ভাবনা, ফলে সেই যন্ত্রটি হইতে সম্ভাব্য আয় (prospective yield) কম। আবার যন্ত্রটি বেশি উৎপন্ন হইতে থাকিলে উহার উৎপাদন ব্যয় বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিবে, তাই যোগান দাম বাড়িতে থাকিবে। সম্ভাব্য আয়ে হ্রাস অথচ যোগান-দামে বৃদ্ধি উভয়ের ফলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা হ্রাস পাইবে। ইহা সকল

মূলধনী দ্রব্যের পরিমাণ ও প্রান্তিক কার্য-কারিতার সম্পর্ক



মূলধনী দ্রব্যের ক্ষেত্রেই সত্য। উপরের চিত্রের I (r) রেখার প্রতিটি বিন্দু MEC পরিমাপ করে, ইহা আমরা বলিতে পারি। বিনিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে MEC হ্রাস পাইতেছে।

বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা (Interest-Elasticity of Investment)

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করিলাম যে, সুদের হারে উঠানামার উপর বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে। কিন্তু এই নির্ভরশীলতা কতদূর তাহা দেখা দরকার।

বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা বলিলে বোঝা যায় সুদের হারে অল্প পরিবর্তন হইলে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ কতখানি পরিবর্তিত হয়। এই দুই পরিবর্তনের হারের অনুপাতকে বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা বলে। পূর্বের ছবিতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা যত কম (more inelastic) I (Y) রেখাটি তত অধিকতর খাড়া (steeper)। ইহার সুদগত স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি (more elastic), এই রেখাটি তত বেশি চেটাল (flatter)। ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছি। কথা হইল শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, যেমন ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় মূলধনী যন্ত্রপাতির চাহিদা সুদের হারের উপর কতখানি নির্ভর করে। সাধারণভাবে আজকাল মনে করা হয়, এই সকল দেশে বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা কম। এই স্থিতিস্থাপকতা কম হইবার সম্ভাব্য কারণ কি কি?

বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা কাহাকে বলে

যত কম সময়ের মধ্যে যন্ত্রপাতির আয় হইতে উহার যোগান দাম ফেরৎ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সুদের হারের প্রভাব তত কম হয়। যন্ত্রের জীবনকাল যত দীর্ঘ, উহা হইতে সম্ভাব্য আয়ের পরিমাণে উঠানামার সম্ভাবনা তত প্রবল, কারণ বহুবিচিত্র ঘটনা ও শক্তির প্রভাব ইহার উপর পড়িতে পারে। তাই সুদের হারের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি।

উদ্যোক্তার পরিকল্পনা কাল

যখন ফার্মগুলি নিজের সঞ্চিত টাকা বা রিজার্ভ হইতে বেশি পরিমাণ বিনিয়োগ করে তখন মূলধনী দ্রব্যের জন্য চাহিদার সুদগত স্থিতিস্থাপকতা কম হইবে। ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইহার কারণ হইল যে, সাধারণত উদ্যোক্তারা নিজস্ব টাকা খাটাইলে তাহার উপর সুদ হিসাব করেন না। মনে কর, ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ঋণ করিয়া আনিলে যে সুদ দিতে হয়, তাহা মোট ব্যয়ের এক পঞ্চমাংশ। যন্ত্রটি বিক্রয় করিয়া যে রেভিনিউ পাওয়া যায় তাহা হইতে এই সুদ বাদ দিয়াই নীট রেভিনিউ হিসাব করা দরকার। কোন ফার্মের মালিক, যথেষ্ট হিসাবী হইলে নিজের টাকা খাটাইলেও যে-সুদ (Imputed interest) তাহাকে অন্যত্র দিতে হইত উহা বাদ দিয়া নীট রেভিনিউর হিসাব করিবেন। কিন্তু বাস্তবে অনেকে ইহা করেন না। ফলে সুদের হার পরিবর্তনের উপর বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন ততটা নির্ভর করে না; বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা কম হয়।

এই কারণেই, মজুরির হারে পরিবর্তন মুনাফা কমাইয়া দেয় বলিয়া উদ্যোক্তারা বিচলিত হন, কিন্তু সুদের হারে পরিবর্তনে ততটা বিচলিত হন না।*

তবুও আমরা মনে করিতে পারি যে, সিকিউরিটিতে টাকা খাটাইলে যে সুদ পাইতে পারিত, উদ্যোক্তারা তাহার কিছুটা অন্তত হিসাব করিয়া নিজের ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন।

বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা আলোচনার বাস্তব তাৎপর্য (practical significance) কম নয়। যদি সত্য সত্যই ইহা অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে সুদের হারে পরিবর্তন আনিয়া চল্‌তি বিনিয়োগের হারে পরিবর্তন ঘটানোর সম্ভাবনা কমিয়া যায়। সুদের হারের নীতি বা সুলভ টাকার নীতি (Interest policy or cheap money policy) প্রয়োগ করিয়া বিনিয়োগ, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনাও আর ততটা থাকে না। এই অবস্থায় সুদের হার ব্যতীত আরও যে-সকল বিষয় বিনিয়োগের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নীতি নির্ধারণের সময়ে (policy consideration) তাই, অন্যান্য যে-সকল শক্তি মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার সমগ্র তালিকাকে অপসারণ (shift) করিতে পারে তাহাদেরও বিচার করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

ইহার বাস্তব তাৎপর্য

সুদ ব্যতীত বিনিয়োগ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ (Shift factors affecting Investment Schedule— other than the Interest rate)

সুদের হার ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের উপর মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা (MEC) বা বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন নির্ভর করে এই সকল বিষয়ে পরিবর্তন হইলে সম্ভাব্য সকল সুদের হারেই বিনিয়োগ বাড়িতে পারে বা কমিতে পারে। হঠাৎ ও বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগে পরিবর্তন আসা সাধারণত এই সকল গতিশীল শক্তির (dynamic forces) উপরই নির্ভর করে, সুদের হারে পরিবর্তনের উপর নয়।

ব্যবসায়ীদের আস্থার উপর যে সকল বিষয় প্রভাব বিস্তার করে তাহাদের সকলকেই আমরা এইরূপ গতিশীল শক্তি বলিয়া গণ্য করিতে পারি। কেইন্‌সের ভাষায় বলা চলে যে, উদ্যোক্তাদের মনে মূলধনী সম্পত্তি হইতে

* আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। সমাজে একচেটিয়া শক্তির প্রসার হওয়ায় নির্দিষ্ট একই ব্যক্তি ব্যাঙ্ক ও ফার্মের মালিক থাকে। ফলে সুদের হার বাড়িলে ফার্মের মালিক হিসাবে তাহাদের লোকসান ব্যাঙ্কের মালিক হিসাবে পূরণ হইয়া যায়। তাই সুদের হার বাড়িলে তাঁহারা ততটা বিচলিত হন না।

সম্ভাব্য প্রতিদান সম্পর্কে দীর্ঘকালীন প্রত্যাশায় (Long term expectation) পরিবর্তন আসিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় পরিবর্তন আসিতে পারে। ব্যবসায়ীদের ভাষায় বলা চলে যে, 'মুনাফার আশা' বা 'লোকসানের ভয়' বেসরকারী বিনিয়োগপ্রবণতায় উঠানামা ঘটায়। নিচের তালিকাতে আমরা এইরূপ প্রধান শক্তিগুলিকে তালিকাবদ্ধ করিতেছি।

আভ্যন্তরীণ (Endogenous)	বহিরাগত (Exogenous)
আয়ের স্তর বা আয়ে পরিবর্তনের হার; ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদার স্তর এবং উহার গতিধারা (trend); মূলধনের বর্তমান পরিমাণ, বিশেষত স্থির মূলধনের : আর্থিক মজুরির হার এবং অন্যান্য উপাদানের দাম; শেয়ার বাজারে কার্যকলাপ, শেয়ারের দামে উঠানামার মাধ্যমে প্রকাশিত।	আবিষ্কার ও উহার প্রয়োগ; জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও উহার গড়ন (Composition); প্রাকৃতিক সম্পদ; ক্রেতা-গোষ্ঠীর মনস্তত্ত্ব; সরকারী আর্থিক ও করনীতি; রাজনৈতিক আবহাওয়া; শ্রমিকদের চলনশীলতা (Labour Movements); সামাজিক ও আইনগত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বৈদেশিক বাণিজ্য; যুদ্ধ, বিপ্লব এবং মনুষ্যসৃষ্ট অন্যান্য প্রকার পরিস্থিতি; আবহাওয়া ও অপ্রত্যাশিত অন্য কোনরূপ অবস্থা।

উপরের তালিকাতে বিষয়গুলিকে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার সুবিধাও কম নয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় আমূল পরিবর্তন অংশত আভ্যন্তরীণ কারণে ঘটে, ইহারা অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্য হইতে উদ্ভূত এবং; অংশত ইহা বাহ্য নানা প্রকার কারণের ফল। এই পার্থক্যের আরও উপকারিতা হইল নিয়ন্ত্রণের নীতি স্থির করা সম্ভব হয় এবং কিছুটা ভবিষ্যদ্বাণী করাও চলে। স্বল্পকালীন ভবিষ্যদ্বাণী করার সময়ে মোটামুটি ধরিয়া লওয়া চলে যে, বহিরাগত বিষয়গুলির সমান থাকিবে, এই উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির আলোচনাই মূলত গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যায় যে, বিনিয়োগের হার স্থির রাখিতে হইলে (to stabilize the rate of investment) আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করাই অধিকার সুবিধাজনক। এই সকল বিষয় ছাড়াও, কেইন্‌স্ বলেন, আমাদের আরও বহু বিষয়ের কথা মনে রাখা দরকার, যেমন, উদ্যোক্তাদের 'নার্ভ ও হিস্টিরিয়া', এমন কি তাহাদের

'হজমশক্তি এবং আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া'। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার এইরূপ বিপুল পরিবর্তন হইতে বুঝা যায় কেন বাণিজ্য-চক্রের সমৃদ্ধি ও সংকট উভয়ই তীব্রতর, কেন উভয় দিকেই উঠানামা অস্বাভাবিক। শুধু তাহাই নয়। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, "মোটামুটি স্বাভাবিক ধরনের ব্যবসায়ীদের উপযোগী বা অনুকূল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপরই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে" (কেইন্‌স)। সর্বোপরি, আমরা সাধারণভাবে এই শিক্ষা পাই যে, ভোগ্যদ্রব্যের জন্য চাহিদার তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের জন্য চাহিদা অনেক বেশি অনুভূতিপ্রবণ এবং বিপদজনক, ইহার উপর কখনই পূর্ণ আস্থা রাখা চলে না।

তারল্যপছন্দ ও সুদের হার (Liquidity Preference and the rate of interest)

আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর নির্ধারণ করিতে হইলে আর একটি বিষয় আলোচনা করিতে হইবে, ইহা হইল সুদের হার, বা তারল্যপছন্দের তত্ত্ব। আয় ও কর্মসংস্থান নির্ভর করে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর, ইহাদের দুইটিই প্রভাবিত হয় সুদের হার দ্বারা। সমাজে টাকার পরিমাণ জানা থাকিলে সুদের হার নিরূপিত হয় তারল্য-পছন্দের তালিকার দ্বারা। সুতরাং এই তারল্যপছন্দ কিসের উপর নির্ভর করে (Liquidity Function), তাহা আমাদের বিশ্লেষণ করিতে হইবে। বিভিন্ন সুদের হারে সমাজে এই তারল্যপছন্দের তালিকা এবং টাকার যোগান উভয়ে মিলিয়া দেশে সুদের সাধারণ হার (general rate) স্থির করে। তাহা ছাড়া ইহারা আরও ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন সময়ের জন্য ঋণের দাম, অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে ফলপ্রসূ হইবে এইরূপ সিকিউরিটিগুলির দাম ও ইহাদের উপর সুদের হার। সমাজে তরল সম্পত্তি-গুলির (liquid assets) চাহিদা, উহার সহিত সুদের হারের সম্পর্ক, তারল্যহীন সম্পত্তিগুলির দাম (prices of non-liquid assets), প্রত্যাশিত মুনাফার হার, বিনিয়োগ, আয়স্তর ও কর্মসংস্থান, সকল কিছু ব্যাখ্যা করার জন্য এই তারল্যপছন্দের তত্ত্ব আমরা ব্যবহার করিতে পারি।

বিনিয়োগের উপর সুদের হারের অন্যান্য প্রভাব জানিতে হইলে তারল্যের বিচার দরকার

তারল্যপছন্দ কাহাকে বলে—"মজুত-প্রবণতা" (Liquidity Preference—the "Propensity to Hoard")

তারল্যপছন্দ কাহাকে বলে বুঝিতে গেলে প্রথমে সঞ্চয় করা (saving) ও মজুত করার (hoarding) মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করিয়া বোঝা প্রয়োজন।

সঞ্চয় হইল, ব্যক্তির বা সমষ্টির, যে-কোন ক্ষেত্রে, আয় হইতে ভোগব্যয়ের পার্থক্য, অর্থাৎ ইহাদের বিয়োগ ফল। আয়ের যে-অংশ, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, ভোগ হইতে পারিল না, তাহাই সঞ্চয়; অর্থাৎ ভোগব্যয় ও সঞ্চয় উভয়ে মিলিয়াই সেই নির্দিষ্ট স্তরের আয়ের সমান। যেমন কোন ব্যক্তির আয় 100 টাকা, ভোগব্যয় 80 টাকা, ফলে সঞ্চয় 20 টাকা। সঞ্চয় সম্পর্কে ধারণাতে আমাদের আর কিছু চিন্তা করার কারণ নাই। এই 20 টাকা ব্যক্তি কোথায় রাখিল, আলমারীতে কিম্বা মাদুরের তলায়, ব্যাঙ্কে বা শেয়ার কিনিয়া তাহা এই ক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য নয়। আয় এবং ভোগের পার্থক্যই সঞ্চয়।

সঞ্চয় কাহাকে বলে

অপরপক্ষে, এই সঞ্চয় ব্যক্তি কি-ভাবে রক্ষা করিবে, তাহারই উপর, মজুদ হইল কি না তাহা বোঝা যাইবে। "মজুত" হইল, নগদ টাকার রূপে ব্যক্তি সঞ্চয়ের যে-অংশ জমাইয়া রাখিতে চায়। মজুত করা বলিলে আমরা বুঝিব ব্যক্তি অতরল সম্পত্তিগুলিতে (on non-liquid assets) টাকা খাটাইল না নগদ টাকারূপে হাতে ধরিয়া রাখিল। আয়ের কিছু অংশ ভোগে ব্যয় না করার অর্থ হইল সঞ্চয় করা; আর সেই সঞ্চয় ধার না দেওয়া বা বিনিয়োগ না করার অর্থ হইল মজুত করা। সঞ্চয় করিলে উহা ভোগ করা যায় না, ইহা এক ধরনের ত্যাগ স্বীকার; আর মজুত করিলে সেই সঞ্চয় হইতে সুদ পাওয়া যায় না, ইহাও এক ধরনের ত্যাগ স্বীকার। মজুত করার অর্থই হইল ব্যক্তি ধার না দিয়া এবং বিনিয়োগ না করিয়া কিছু আয় (সুদ বা মুনাফা) হইতে বঞ্চিত হইতেছে। মজুত করার এই ধারণা একান্ত মনস্তাত্ত্বিক।

মজুত কাহাকে বলে

মজুত না করিয়া সেই টাকা খাটাইলে সুদ পাওয়া যায়, তাই সুদের হারের উপর ব্যক্তির এবং সমাজের সামগ্রিক মজুতের পরিমাণ নির্ভর করে। বিভিন্ন সুদের হারে সমাজে বিভিন্ন পরিমাণ নগদ বা তরল টাকা লোকে হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়; সুদের হার বাড়িলে তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছা কম, আর সুদের হার কম থাকিলে তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছা বেশি। ইহাকেই কেইন্‌স্‌ বলিয়াছেন 'টাকার চাহিদা' (demand for money) এবং বিভিন্ন সুদের হারে টাকার চাহিদাকে আমরা একটি তালিকার আকারে অর্থাৎ নগদ-পছন্দের তালিকার রূপে প্রকাশ করিতে পারি (schedule of liquidity preference)। নগদ টাকার জন্য অর্থাৎ তারল্যের জন্য চাহিদা এবং টাকার

যোগান—এই দুইয়ে মিলিয়া সুদের হারে উঠানামা ঘটায়, ফলে সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আসে।

এই প্রসঙ্গে মজুত (hoarding) এবং টাকার প্রচলনবেগ (velocity of money), এই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করিলে ভাল হয়। সাধারণভাবে, কেইন্‌সের পূর্বে ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, মজুত করার অর্থ হইল টাকার প্রচলনবেগ কমিয়া যাওয়া, ফলে দামস্তর হ্রাস পাওয়া। সুতরাং চিরাচরিত ধারণায় মজুত করার অর্থ হইল প্রচলন বেগ কমিয়া যাওয়া। কিন্তু মজুত করিলে প্রচলনবেগ কমিয়া উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য হ্রাস পাইবে কিনা তাহা নিভর করে লোকে কি বিশেষ ধরনে তাহাদের একাংশ মজুত করিতে চায় তাহার উপর। কেউ যদি মাদুরের তলায় জমানো টাকা মজুত করিয়া রাখিতে চায়, তবে সে অবশ্যই চলন্ত টাকাকে প্রচলনধারা হইতে অপসারণ করিয়া আনিতেছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ধরনের মজুত করাকেই লোকে উৎপাদন আয় ও কর্মসংস্থান হ্রাসের কারণ বলিয়া মনে করেন। এইজন্যই রবার্টসন বলিতেছেন যে, সঞ্চয়কে কখনও সঞ্চিত করিয়া রাখা চলে না। আবার, অপরপক্ষে, এই মজুত যদি ব্যাঙ্ক-আমানতের রূপ নেয়, অর্থাৎ নগদ তরল টাকা লোকে ব্যাঙ্কে জমা রাখে, তবে উহার ফল খারাপ না-ও হইতে পারে। কারণ ব্যাঙ্কে রক্ষিত তাহার এই টাকা অচল থাকিতেছে না, অপর কোন ব্যবসায়ীরা ধার লইয়া উহাকে সচল রাখিতেছে, কেইন্‌সের ভাষায় বলিতে গেলে এই ধরনের মজুত "provides the offsetting facilities for some other party". যুক্তির দিক দিয়া অবশ্য বলা চলে যে, ব্যাঙ্কগুলি এই টাকা বসাইয়া না রাখিয়া সুদের বিনিময়ে খাটাইতে পারে বটে, কিন্তু ধার লইতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীরা আগাইয়া না আসিলে ব্যাঙ্কগুলি ইহাতে সক্ষম হইবে না। আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলা চলে যে, ঋণগ্রহীতা পাওয়া গেলেও তাহারা সকল ঋণ উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে খাটাইবার সুযোগ পাইতেছে না. ইহাও সম্ভবপর। এই সকল বিরূপ সম্ভাবনার কথা বাদ দিলে আমরা সোজাসুজি বলিতে পারি যে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে বা এই ধরনে টাকা মজুত করিলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।*

মজুতের বিভিন্ন রূপ

* তাহা ছাড়া নিজেদের হাতে জমানো টাকা অনেক আছে, এইরূপ ধারণা লোকের মনে থাকিলে উহার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ভালই হয়, কারণ চলতি আয় হইতে বেশি অংশ ভোগ-ব্যয় করার ইচ্ছা জাগিতে পারে।

সুতরাং লোকেরা মজুত টাকা কোন্‌রূপে আবদ্ধ রাখিতে চাহে, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আয়স্তরের উপর ইহার প্রভাব কি তাহা জানিতে হইলে ইহার আলোচনা দরকার। কেইন্‌সই সর্বপ্রথম মজুতের ধারণা লইয়া সুদের আর্থিক তত্ত্ব (monetary theory of interest) গড়িয়া তুলিলেন এবং ইহাকে আয়স্তর ও কর্মসংস্থান তত্ত্বের সহিত মিলিত করিলেন। তাঁহার মতে, দামস্তরের উপর মজুতের প্রভাব পড়ে সুদের হারের মাধ্যমে। কেইন্‌সের ধারণায় লোকের মনে টাকা ধরিয়া রাখার ইচ্ছায় কিরূপ পরিবর্তন আসিতেছে উহাই মূল কথা, টাকার প্রচলনবেগ নয়। মজুতের পরিমাণ লইয়া কেইন্‌সের ততটা কিছু বলার নাই, কিন্তু মজুত প্রবণতায় পরিবর্তন হইলে সুদের হারে পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রভাবিত হয়, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। আমাদের তাই এখন আলোচ্য বিষয় হইবে 'মজুত-প্রবণতা' বা 'নগদ-পছন্দের' তালিকার সহিত সুদের হার, টাকার যোগান, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান-এর যোগাযোগ।

মজুতের পরিমাণ সুদের হারে পরিবর্তন আনিয়া বিনিয়োগকে প্রভাবিত করে

নগদপছন্দের অভিপ্রায় (Motives for Liquidity)

নগদ টাকা লোকে হাতে ধরিয়া রাখিতে চায় কেন, অর্থাৎ কেন তাহারা তরলরূপে তাহাদের সম্পত্তি রাখিতে চায়, তাহা কেইন্‌স বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নির্দিষ্ট কোন একটি সুদের হারে টাকার জন্য মোট চাহিদাকে বলা হয় মিশ্রিত চাহিদা (composite demand for money)। এই মিশ্রিত চাহিদা দুই ধরনের চাহিদা লইয়া গঠিত: (ক) বিনিময়ের মাধ্যমরূপে টাকার চাহিদা, ইহাকে বলে সক্রিয় ব্যালান্স (active balance), এবং (খ) মূল্যের ভাণ্ডাররূপে টাকার চাহিদা, ইহাকে বলে নিষ্ক্রিয় ব্যালান্স (Inactive balance)। বিনিময়ের মাধ্যমরূপে টাকার চাহিদা হয় দুইটি অভিপ্রায়ে, লেনদেন ও সাবধানতা (transactions and precaution); আবার মূল্যের ভাণ্ডাররূপে টাকার চাহিদা হয় ফাটকাবাজির (speculation) অভিপ্রায়ে। এই তারল্যের অভিপ্রায়গুলি আলোচনা করা যাউক।

মিশ্রিত চাহিদার মধ্যে বিভিন্নরূপ চাহিদা থাকে

প্রথমত, লেনদেনের অভিপ্রায়। কোন একটি বিশেষ সময়ে, সমগ্র দেশের সকল অধিবাসী একত্রে, দেশের টাকার এক অংশ নিজেদের দৈনন্দিন লেনদেনের

কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে হাতে ধরিয়া রাখিতে চান। ব্যক্তি বা পরিবারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে; ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও টাকা লগ্নী করা এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা হাতে পাওয়া ইহাদের মধ্যে এইরূপ সময়ের ব্যবধান (time lag) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে লেনদেনের কাজ চালাইবার জন্য নগদ টাকার দরকার হয়। সময়ের এই ব্যবধান যত কম, এই উদ্দেশ্যে নগদ টাকা হাতে রাখার প্রয়োজনও তত কম হইবে। মাসের শেষে যে ব্যক্তি মাহিনা পায়, তাহার তুলনায় সপ্তাহের শেষে যে মাহিনা পায় তাহাকে নগদ টাকা কম হাতে রাখিতে হয়। ঠিক এইরূপ, কোন ফার্ম নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যদি মনে করে যে, টাকার লগ্নী করা ও বিক্রয়লব্ধ মূল্য হাতে পাওয়া ইহাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম হইবে, তবে সে কম নগদ টাকা হাতে রাখিবে; এইরূপ সময়ের ব্যবধান বেশি থাকিবে মনে করিলে তাহার তারল্যপছন্দ তুলনামূলকভাবে বেশি হইবে। এই প্রসঙ্গে যাহা লক্ষ্য রাখা দরকার তাহা হইল এই যে, লেনদেনের উদ্দেশ্যে টাকার এই চাহিদার তীব্রতা বা শক্তি নির্ভর করে আয়স্তরের উপর। ইহাকে আমরা প্রকাশ করিতে পারি এইভাবে যে, $L_t = f(Y)$; L_t হইল লেনদেনের অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা এবং Y হইল আয়স্তর।

লেনদেনের অভিপ্রায় কাহাকে বলে ও কিসের উপর নির্ভরশীল

আমাদের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা জানি যে, দেশে যখন তুলনামূলকভাবে আয়স্তর, কর্মসংস্থান স্তর এবং দামস্তর উঁচুতে আছে সেই অবস্থায় ব্যক্তি ও ফার্ম সকলেরই লেনদেনের উদ্দেশ্যে অধিক টাকা হাতে রাখা দরকার। আয়স্তরই প্রধান শক্তি, যাহা সামগ্রিক চাহিদাকে এবং ফলে সাধারণ দামস্তরকে প্রভাবিত করে। সুতরাং আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি লেনদেনের জন্য রক্ষিত টাকা আয়স্তরের উপরই নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, লেনদেনের অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকার চাহিদায় পরিবর্তন আসে অনেক কারণে, যেমন ব্যক্তির মনে ভবিষ্যৎ আয়স্তর সম্পর্কে প্রত্যাশায় পরিবর্তনের ফলে, আয় ও খরচার মধ্যে প্রচলিত সময়ের ব্যবধান পাল্টাইয়া গেলে, ধারে জিনিসপত্র কেনার সুবিধা বাড়িল কি কমিল তাহার উপরে এবং ব্যক্তিগত গড় আয়ে পরিবর্তনের উপরে।

এই L_t বা লেনদেনের অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকাতে কখন পরিবর্তন আসে

দ্বিতীয়ত, নগদ-পছন্দের আর একটি কারণ হইল যে, অধিবাসীদের সর্বদা আকস্মিক ও অচিন্ত্যপূর্ব ব্যয় মিটাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

ইহাকে বলে সাবধানতার অভিপ্রায়। ব্যক্তিরা বা ফার্মগুলি সাধারণত ব্যাঙ্কে তৎক্ষণাৎ চেক কাটিয়া তোলা যায় এইরূপ আমানতে সর্বদা কিছু পরিমাণ তরল টাকা রাখে; কারণ হঠাৎ কোন না কোন প্রয়োজনে কিছু টাকা সকলেরই দরকার হইতে পারে। হঠাৎ কোন বন্ধুর বিবাহে উপহার দিতে হইতে পারে; সস্তায় সুলভ মূল্যে বা নীলামে জিনিসপত্র কেনার দরকার হইতে পারে, অচিন্ত্যনীয় কোন বিপদ আপদ আসিয়া পড়িতে পারে; ফার্মগুলিও হঠাৎ সস্তায় কাঁচামাল কেনার সুযোগ পাইতে পারে, যন্ত্রটি অসময়ে বিকল হইতে পারে। সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ নির্ভর করে আয়স্তরের উপর—কারণ এই সকল আনুষঙ্গিক ব্যয়গুলি (incidental expenses) আয়স্তর বাড়িলে বৃদ্ধি পায় এবং আয়স্তর কমিলে হ্রাস পায়। এই নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে আমরা এইরূপে প্রকাশ করিতে পারি যে, $L_p = f(Y)$; L_p হইল সমাজে সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকার চাহিদায় পরিবর্তন আসে অধিবাসীদের মনে ভবিষ্যৎ ব্যবসায় বাণিজ্যের গতি সম্পর্কে ধারণা বদলাইলে, তরল সম্পত্তি পাওয়ার সুবিধা ও তরল টাকা হাতে রাখার খরচা (ব্যাঙ্কের পাওনা) প্রভৃতিতে পরিবর্তন আসিলে।

সাবধানতার অভিপ্রায় কাহাকে বলে ও কিসের উপর নির্ভরশীল

লেনদেনের এবং সাবধানতার জন্য রক্ষিত টাকাকে কেইন্‌স্ একই শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রধানত দুইটি কারণ আছে। প্রথমত, ইহাদের জন্য চাহিদা মোটামুটি স্থির, স্থিতিশীল সমাজে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা জানা আছে এবং ইহাদের সম্পর্কে সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে। তাই ইহাদের ক্ষেত্রে, টাকাকে নিছক বিনিময়ের মাধ্যমরূপে গণ্য করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা সুদের হার সম্পর্কে সচেতন নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতেই ইহা আমরা দেখিতে পাই। সুদের হার বাড়িলে বা বণ্ডের দাম কমিলে এই দুই উদ্দেশ্যে রক্ষিত টাকার পরিমাণ সাধারণত বদলায় না, মোটামুটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু টাকা এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তি ও ফার্মগুলি হাতে রাখে। সুদের হার $\frac{1}{2}\%$ বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে এই দুই উদ্দেশ্যে লোকে কম টাকা হাতে রাখিয়া বেশি বণ্ড কিনিতে শুরু করিল তাহা দেখা যায় না; আবার সুদের হার $\frac{1}{2}\%$ কমিলে বণ্ড বিক্রয় করিয়া এই উদ্দেশ্যে টাকা বেশি হাতে রাখিতে আরম্ভ করিল, ইহাও ঘটে না। কিন্তু এই দুইটি অভিপ্রায়ে রক্ষিত

ইহাদের একই শ্রেণীতে ধরা হইয়াছে কেন

টাকাকে আমরা আলোচনা হইতে বাদ দিতে পারি না। কারণ লোকের মনে নিষ্ক্রিয় তহবিল হইতে টাকা সরাইয়া আনিয়া সক্রিয় তহবিলে রাখার ইচ্ছা যদি বাড়ে, তবে সুদের হার প্রভাবিত হইবে। তাই টাকার মিশ্রিত চাহিদার (composite demand) মধ্যে ইহাদের গণ্য করা নিশ্চয় দরকার।

তৃতীয়ত, গতিশীল সমাজে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, তাই টাকার সকল কাজের মধ্যে মূল্যের সঞ্চয়রূপে কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টাকার এই ধর্ম বা গুণের দরুনই লোকে ফাটকাদারির অভিপ্রায়ে নগদ কিছু টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়। ইহাকে ফাটকাদারির অভিপ্রায় বলে, কারণ, অর্থনৈতিক জগতের অনিশ্চয় গতিপ্রকৃতির মধ্যে নিহিত মুনাফার আশা এবং লোকসানের ভয় ইহাকে প্রভাবিত করে। বিশেষত, সুদের হারে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনায় টাকার এইরূপ চাহিদা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন ধনী ব্যক্তিরা এবং বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী প্রভৃতি) যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে সুদের হার চড়িবে, তবে তাহারা বর্তমানে দীর্ঘকালীন বণ্ড কিনিয়া টাকা আবদ্ধ করিতে চাহিবে না। যেমন, বাজারে সুদের হার 4%, এক ব্যক্তির নিকট 1000 টাকা আছে। সে এই টাকা দিয়া কিছু বণ্ড কিনিয়া রাখিতে পারে, বছরের শেষে তাহার 40 টাকা আয় হইবে। কিন্তু ইহা না করিয়া সে এই 1000 টাকা অলস অবস্থায় হাতে ধরিয়া রাখিতে পারে; ইহাতে সে সুদ হইতে বঞ্চিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার তারল্য বজায় আছে, এই অবস্থাকেই সে তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক মনে করিতেছে। মনে কর, টাকার বাজারে সকলের মনে ধারণা যে, সুদের হার শীঘ্রই 5% হইবে। ইহার অর্থ হইল 1000 টাকার বণ্ড হইতে 40 টাকার স্থায়ী বাৎসরিক আয় পাইতে হইলে বণ্ডের দাম হইবে 800 টাকা (40/0·05)। ইহার ফলে ব্যক্তির 200 টাকা মূলধন বাঁচিয়া গেল, টাকাটা আবদ্ধ না রাখায় তাহার পক্ষে এই অবস্থার সুযোগ লওয়া সম্ভব হইল। এইরূপে ফাট্‌কা নিয়োগের অভিপ্রায়ে লোকে নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়। উপরের উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, ফাটকা নিয়োগের উদ্দেশ্যে রক্ষিত টাকার পরিমাণে পরিবর্তন আসে সুদের হারে পরিবর্তন আসিলে, ইহাকে তাই সুদের অপেক্ষক (function of rate of interest) বলা চলে। আমরা ইহা প্রকাশ করিতে পারি এইভাবে যে, $L_s = f(r)$. কেইন্‌স টাকার এইরূপ চাহিদার উপর বিশেষ

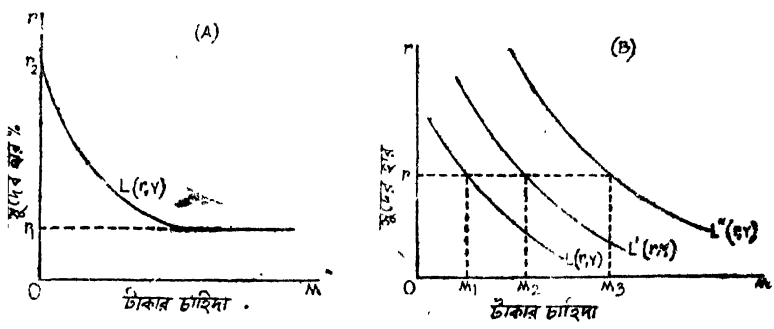
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন কারণ ইহা স্থদের হারে পরিবর্তন সম্পর্কে খুবই অনুভূতিশীল।

নগদপছন্দের তালিকা (Schedule of Liquidity Preference or the Liquidity Function)

বিভিন্ন স্থদের হারে লোকে যে-বিভিন্ন পরিমাণ টাকার চাহিদা করে, অর্থাৎ নগদ ও তরলরূপে যে সকল বিভিন্ন পরিমাণ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়, তাহাদের তালিকাকে বলে নগদপছন্দের তালিকা (schedule of Liquidity Preference)। আয়স্তর সমান ধরিয়া লইলে টাকার চাহিদা স্থদের হারের বিপরীত দিকে উঠানামা করে **(inversely varies with the interest rate)**। স্থতরাং নগদ পছন্দ হইল স্থদের হারের অপেক্ষক অর্থাৎ ইহা স্থদের হারের উপর নির্ভরশীল (is a function of the interest rate), স্থদের হার বাড়িলে ইহার পরিমাণ কমে, এবং স্থদের হার কমিলে ইহার পরিমাণ বাড়ে। ইহার কারণ হইল স্থদের হার কম থাকিলে নগদ বা তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখায় লোকসান কম, তাই লোকে বেশি টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে কাতর হয় না। স্থদের হার যত বেশি বাড়িবে, টাকা হাতে রাখিলে লোকসান তত বেশি। তাই লোকেরা বেশি টাকা ধার দিতে চাহিবে, অর্থাৎ অতরল সম্পত্তিগুলিতে টাকা খাটাইবার দ্বিধা জয় করিতে পারিবে।

নগদ-পছন্দ স্থদের হারের অপেক্ষক

কোন এক বিশেষ আয়স্তরে এই নগদপছন্দের তালিকাকে, অর্থাৎ স্থদের হারের সহিত নগদপছন্দের অপেক্ষক-সম্পর্ককে (Functional relationship) আমরা নিচের রেখা-চিত্রে প্রকাশ করিতে পারি :



উপরের (A) চিত্রে দেখা যাইতেছে, নগদপছন্দ হইল স্থদের হারের হ্রাসমান

অপেক্ষক (a decreasing function of the rate of interest or $\partial L/\partial r < O$)। কম সুদের হারে লোকের নগদপছন্দ বেশি। বেশি সুদের হারে তাহাদের এই নগদপছন্দ কম। খুব বেশি সুদের হারে, যেমন, r_2 তে লোকেরা তরল সম্পত্তি (অর্থাৎ নগদ টাকা) মোটেই হাতে রাখিতে চাহে না, তাই তারল্যপছন্দের রেখা লম্বমুখী অক্ষের সহিত মিশিয়াছে, যেখানে $L(r,Y)=O$. বাস্তবে অবশ্য দৈনন্দিন লেনদেন ইত্যাদির জন্য লোকেরা নিশ্চয় কিছু টাকা হাতে রাখিবে, যদিও উহার উপর সুদ না পাওয়ায় তাহাদের কিছুটা লোকসান হইতে থাকে। লক্ষ্য রাখা দরকার যে, খুব কম সুদের হারে, যেমন r_1-এ টাকার চাহিদারেখা ভূসমান্তরাল হইয়া উঠে। অর্থাৎ, খুব কম সুদের হারে তারল্য পছন্দের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা অসীম (demand for money is infinitely elastic with respect to interest)। ইহার তাৎপর্য এই যে, যখন সুদের হার খুব কম তখন লোকে নিজেদের পূর্ণ তারল্য বজায় রাখিতে চায়; সুদ-প্রদানকারী সম্পত্তির তুলনায় নগদ টাকা হাতে জমাইয়া রাখার সুবিধা অনেক বেশি।

নগদ পছন্দ রেখার আকৃতি কিরূপ ও কেন

উপরের (B) চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে, একই সুদের হারে নগদপছন্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে—OM_1, হইতে OM_2, OM_3 হইতেছে। নগদপছন্দের সমগ্ররেখাটি (অর্থাৎ সমগ্র নগদপছন্দের অপেক্ষক বা the entire liquidity function) উপরে উঠিয়া যাইতেছে। সুদের হার সমান থাকা অবস্থাতেও এইরূপ ঘটিতে পারে, যদি আয়স্তর বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত আয়স্তরে লোকেরা সকলে মিলিয়া পুরাণো স্থির সুদের হারেই পূর্বাপেক্ষা বেশি টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে চায়, তাই সমগ্র রেখাটি উপরে উঠিয়া যাইতেছে।*

কেইন্‌সের মতে, এই নগদপছন্দের তালিকা বা $L(r,Y)$ রেখা এবং সমাজে টাকার যোগান উভয়ে মিলিয়া সুদের হার নিরূপণ করে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে M রেখা দেখা যাইতেছে, ইহা প্রকাশ করে টাকার যোগান। আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, দেশে টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হয় স্বাধীনভাবে; আর্থিক

* কেবলমাত্র আয়স্তর নহে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যাশায় পরিবর্তন আসিলে, আর্থিক মজুরি, কর হার, প্রভৃতি বদলাইলেও এইরূপ ঘটিতে পারে। তবে ইহাদের পরিবর্তন আয়স্তরে প্রত্যাশিত পরিবর্তনের মাধ্যমেই নগদ পছন্দে পরিবর্তন আনে।

কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা, তাহাদের নিজস্ব কোন নীতি অনুযায়ী। ইহা সুদের হারের অপেক্ষা রাখে না, তাই লম্বমুখী অক্ষের সমান্তরাল। টাকার যোগান বা M রেখা ডাহিনে সরিলে টাকার যোগানে বৃদ্ধি প্রকাশ করে; উহা বামে সরিলে টাকার যোগানে হ্রাস বোঝা যায়। M রেখার অপসরণ (shift), অর্থাৎ টাকার যোগানে পরিবর্তন অনেক কারণে ঘটিতে পারে, যেমন, খোলা বাজারে কার্যকলাপ, ডিসকাউণ্ট নীতি বা ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য নীতিসমূহ।* পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে r_o হইল ভারসাম্য-সুদের হার; টাকার চাহিদা রেখা $L(r,Y)$ এবং স্বনির্ভরশীল টাকার যোগান রেখা M—এই উভয়ের ছেদবিন্দুতে এই সুদের হার পাওয়া যাইতেছে। এই সুদের হারে টাকার চাহিদা এবং যোগান উভয়েই OM. যদি বিভিন্ন সুদের হারে লোকে কম নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায় তবে তারল্যপছন্দের রেখা বামদিকে সরিয়া আসিবে, নূতন রেখা $L_1(r,Y)$ দেখা দেয়। এই অবস্থায় সুদের হার কমিয়া আসে, নূতন ভারসাম্যের সুদ r_1 পাওয়া যায়। টাকার পরিমাণ সমান থাকিলেও তাই, নগদ পছন্দ বদলাইলে সুদের হারে পরিবর্তন আসিতে পারে। আবার নগদপছন্দ সমান অবস্থায় টাকার পরিমাণ কমিলে সুদের হার বাড়িবে এবং বাড়িলে ইহা কমিবে। আমরা মোটামুটি ধরিয়া লইতেছি যে, স্থিতিশীল এই ভারসাম্য স্থাপিত হয় সময়ের গতিপথে (static equilibria have been dynamically established through time)।† ভারসাম্য সুদের হারে টাকার চাহিদা ও যোগান সমান বলিলে বোঝা যায় যে, লোকের আর নিজেদের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়াইবার বা কমাইবার কোন ঝোঁক নাই। বণ্ড বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা হাতে রাখা বা হাত হইতে নগদ টাকা ছাড়িয়া দিয়া বণ্ড হাতে রাখা—লোকেরা এখন এইরূপ কিছুই করিতেছে না, তরল ও অতরল সম্পত্তির কোনটির পরিমাণেই এখন কোনরূপ পরিবর্তন আসিতেছে না।

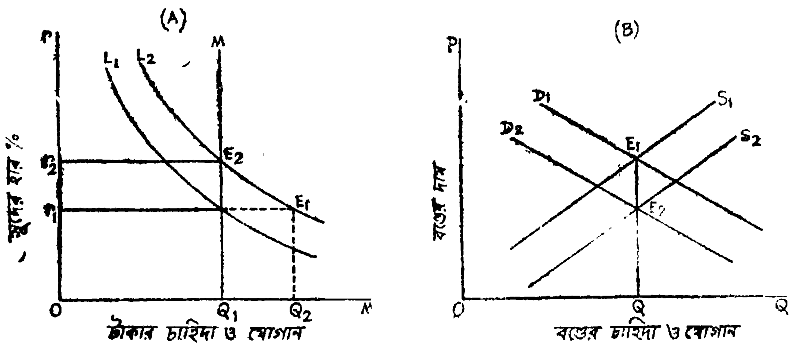
L ও M-এর ঘাত প্রতিঘাতে সুদের হার স্থির হয়

---

* 'Actually, of course, the fiscal monetary authorities and the private banking system exercise their due influence on the availabilities of money and credit. Since the motives underlying the supply of money are highly complex and often non-economic, shifts in the M function might simply be considered a matter of central bank decisions If this procedure is accepted then it will be rather easy to show the determination of the equilibrium market rate of interest."

† ইহাদের সামঞ্জস্যসাধনকারী শক্তি হইল $dr/dt=(L-m)$। ইহাদের মধ্যে dr/dt হইল সুদের হারে পরিবর্তন এবং $L-m$ হইল টাকার চাহিদা ও যোগানে পার্থক্যের পরিমাণ। ভারসাম্যের স্তরে $L(r, Y)-M=O$, অর্থাৎ যেখানে আয়হীন তরল টাকা বা নগদ-পছন্দের পরিমাণ এবং আয়শীল অতরল সম্পত্তি (যেমন, ষ্টক ও বণ্ড)—উভয়ের কাহারও কোনরূপ পরিবর্তনের দিকে ঝোঁক নাই।

নগদ পছন্দ ও সুদের হারের সম্পর্কটি আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করা চলে। আমরা জানি, টাকার যোগান সমান থাকা অবস্থায়, নগদপছন্দ বাড়িয়া গেলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে, কারণ লোকের এই নগদপছন্দ বা মজুতের ইচ্ছা জয় করিয়া তাহাকে ধার দিতে রাজি করাইতে হইলে পূর্বাপেক্ষা বেশি সুদের লোভ দেখাইতে হইবে। অপরপক্ষে টাকার যোগান সমান থাকা অবস্থায় নগদ-পছন্দ কমিয়া গেলে সুদের হার কমিয়া যাইবে, কারণ এই অবস্থায় পূর্বাপেক্ষা কম সুদেই সে ধার দিতে রাজি থাকিবে, বণ্ড বা সিকিউরিটিতে টাকা খাটাইতে তাহার আপত্তি আর ততটা তীব্র নয়। নিচের ছবিতে ইহা দেখানো হইতেছে। টাকার যোগান M নির্দিষ্ট আছে, নগদ পছন্দ L_1 হইতে L_2-তে বৃদ্ধি পাইলে সুদের হার



r_1 হইতে r_2 হইয়াছে। লোকে বেশি টাকা হাতে রাখিতে চায়, কিন্তু আর্থিক কর্তৃপক্ষ টাকা বাড়াইল না, নগদ টাকা হাতে রাখার সাধ মিটিতেছে না, এই অবস্থায় একটু বেশি সুদ দিলে তবেই প্রান্তিক মজুতকারীরা (marginal hoarders নগদ টাকার উপর অধিকার কিছুটা ছাড়িয়া দিবে, অতরল সম্পত্তি ক্রয় করিতে রাজি হইবে (অর্থাৎ, বণ্ডের দাম না কমিলে সে উহা কিনিবে না)। r_1 সুদের হারে টাকার নূতন চাহিদা উহার যোগান অপেক্ষা Q_1 Q_2 বেশি। এই সুদের হার r_2-তে টাকার নূতন চাহিদা E_2 বিন্দুতে টাকার যোগানের সমান। তাই r_2, অর্থাৎ Q_1 E_2 হইল ভারসাম্যের সুদের হার। বিপরীত পক্ষে, নগদ পছন্দ L_2 হইতে L_1-এ কমিয়া গেলে সুদের হার r_2 হইতে r_1 হইবে।

(B) চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে, কিরূপে বণ্ডের দামে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া সুদের হারে পরিবর্তন প্রকাশ পাইতেছে। মনে কর, নগদ পছন্দ বাড়িয়

যাওয়ায় বণ্ডের জন্য চাহিদা D_1 হইতে কমিয়া D_2 হইল, অর্থাৎ লোকে নগদ টাকা হাতে রাখা সুবিধাজনক মনে করিতেছে। ফলে তাহারা S_1 হইতে S_2 পরিমাণ বণ্ড (যোগান বৃদ্ধি) বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনিয়াছে। বণ্ডের চাহিদা হ্রাস এবং যোগান বৃদ্ধির দরুন উহাদের দাম কমিয়া QE_2 হইয়াছে। বণ্ডের দাম হ্রাসের অর্থই হইল সুদের হারে বৃদ্ধি। এইরূপে টাকার চাহিদা ও যোগানে পরিবর্তন কিরূপে সুদের হারে পরিবর্তন আনে তাহা বণ্ডের দামে পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই জানিতে পারা যায়। বস্তুত বণ্ডের দামে পরিবর্তনই সুদের হারে পরিবর্তনের সূচক।

সুদের হারে পরিবর্তন প্রকাশ পায় বণ্ডের বাজারে

সুতরাং কেইন্‌সের মতে, ভারসাম্য সুদের হারের শর্ত হইল $M = M_1 + M_2 = L_1(Y) + L_2(r)$. টাকার যোগানের দিকে, M হইল নগদ টাকা ও চলতি ব্যাঙ্ক-আমানত, M_1 হইল লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা ($L_t + L_p$); M_2 হইল ফাটকাদারির অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা। টাকার চাহিদার দিকে, $L_1(Y)$ হইল লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার পরিমাণ, ইহা আয়স্তরের উপর নির্ভরশীল; এবং $L_2(r)$ হইল ফাটকাদারির অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার পরিমাণ, ইহা সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। তারল্যের এই সমীকরণ (Liquidity equation) হইতে আমরা জানিতে পারি কিরূপে নির্দিষ্ট কোন আয়ের স্তরে টাকার যোগান ও চাহিদার সমতার বিন্দুতে সুদের হার নির্ধারিত হয়।

টাকার যোগান ও চাহিদা যেখানে সমান

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ : ক্লাসিকাল ও নয়াক্লাসিকাল ধারণা (Savings and Investment : Classical and Neo-Classical doctrines) :

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিশ্লেষণের কাজ ছিল সুদের হার নিরূপণ করা, আর আধুনিক কালে বলা হয় যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়ের মিলিত প্রভাবে উৎপাদন, আয়স্তর ও কর্মসংস্থানের স্তর নির্ধারিত হয়। দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে যেমন দ্রব্যের দাম নিরূপিত হয়, ঠিক সেইরূপ ক্লাসিকাল মতে সঞ্চয়ের যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে সুদের হার স্থির হয়। চলতি সুদের হারে পরিবর্তন ঘটিলে সমাজে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আসে, ঠিক যেমন ভারসাম্যের বাজারদরে পরিবর্তন আসিলে

ক্লাসিকাল ধারণা কিরূপ ছিল

বোঝা যায় যে, দ্রব্যটির যোগান ও চাহিদায় ঠিকমত ব্যালান্স নাই। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আসার পথে দেশের আয়স্তর স্থির থাকে, অথবা আয়স্তরে পরিবর্তন না ঘটাইয়াই সুদের হার সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পরিবর্তন আনে ও ইহাদের ভারসাম্য স্থাপন করে।

স্ে-র নিয়ম (Say's Law) আলোচনা করিলেই এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে। যোগান নিজেই নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে, এই কথা বলিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সর্বদা আপনাআপনি সমান থাকিবে এই কথা মানিয়া লইতে হয়, কিন্তু কিরূপে ও কোন্ পথে ইহাদের ভারসাম্য আসে তাহা আমরা জানিতে পারি না। ক্লাসিকাল তত্ত্ব ধরিয়া লয় যে, চল্‌তি সুদের হারে যত খুশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা চলে, বিনিয়োগের সুযোগের কোন অভাব নাই, এবং সুদের হারে পরিবর্তনের ফলে সঞ্চয়ে বিপুল পরিবর্তন আসে।

স্ে-র বাজারের নিয়ম হইতেই আমরা ইহা জানিতে পারি

সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয় বাড়ে, এবং ইহাকে লগ্নী করার অফুরন্ত সুযোগ থাকায় সবটাই বিনিয়োগে চলিয়া যায়। এই তত্ত্বের নিহিত ধারণা (implied idea) হইল, সঞ্চয়াধিক্য (over-saving) বা বিনিয়োগাধিক্য (over-investment) বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না।

অপরপক্ষে, সঞ্চয় যদি নির্ভর করে আয়স্তরের উপর, তবে সুদের হারের সহিত সঞ্চয়ের সম্পর্ক ভিন্নরূপ হইয়া পড়ে। ঠিক সেইরূপ, চল্‌তি সুদের হারে বিনিয়োগের সুযোগ (investment opportunities) যদি সীমাবদ্ধ হয়, তবে বিনিয়োগের সুদগত নির্ভরশীলতা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। যদি আমরা মানিয়া লই যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়ই আয়স্তরের উপর নির্ভর করে, সুদের হারের উপর নয়, তবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে তারতম্য ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়। যেমন উচ্চ আয়-সম্পন্ন দেশগুলিতে আয় এত বেশি যে সকল সঞ্চয় বিনিয়োগের উপযুক্ত সুযোগের অভাব দেখা যাইতেছে। এই আয়স্তরে সুদের হার যত কমই হউক না কেন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আনিতে পারিতেছে না।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ নির্ভর করে আয়স্তরের উপর, সুদের হারের উপর নয়

নয়া ক্লাসিকাল একদল লেখক, যেমন, উইক্‌সেল, মাইসেস্ হায়েক প্রভৃতি, এই সম্পর্কে একটু নূতন ধরনের আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মতে

সমাজে অর্থনৈতিক সংকটের কারণ হইল ভোগাধিক্য (over consumption বা সঞ্চয়ের ঘাটতি (under saving)। এই কথা বুঝাইবার জন্য তাঁহারা সুদের 'স্বাভাবিক হার' (Natural rate) এবং 'বাজারের-হার' (Market rate) সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। সুদের 'স্বাভাবিক হার' বলিলে বোঝা যায় এমন হার যাহাতে দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান থাকে, ফলে দাম-স্তর পরিবর্তিত হয় না। আবার বাজারী সুদের হার হইল দেশে চলতি সুদের হার, টাকার বাজারের অবস্থার উপর এই হার নির্ভর করে। যখন দেশে এই বাজার হার ও স্বাভাবিক হার সমান থাকে তখন সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হয়, দামস্তর অর্থাৎ টাকার মূল্য অপরিবর্তিত থাকে, দেশে আর্থিক ভারসাম্য বজায় থাকে। "স্বাভাবিক সুদের হার" ব্যাখ্যা করা বিশেষ অসুবিধাজনক, কারণ বিভিন্ন লেখক এই ধারণাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে মোটামুটি ভাবে, মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ক্ষমতার ভিত্তিতে মুনাফার যে হার (rate of profit determined by the productivity of capital), তাহাকেই সুদের 'স্বাভাবিক হার' বলা হইয়া থাকে। 'স্বাভাবিক' বিশেষণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'বাজার' হার ইহা হইতে পৃথক হইলে অস্বাভাবিক কোন ঘটনা দেখা দিবে, দামস্তর স্থির থাকিবে না এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য বিচ্যুত হইবে।

উইকসেলের তত্ত্ব: "স্বাভাবিক" সুদের হার

"সুদের স্বাভাবিক হার" কাহাকে বলে

উভয়ের তারতম্যের ফলে আর্থিক ভারসাম্য হইতে কিরূপে বিচ্যুতি ঘটে তাহা আমরা আলোচনা করিতে পারি। সুদের 'বাজার-হার' যখন উহার 'স্বাভাবিক-হার' হইতে কম থাকে, তখন উৎপাদন বৃদ্ধি করা লাভজনক হইয়া উঠে, কারণ ঋণের দাম অপেক্ষা যন্ত্রপাতির প্রতিদান বেশি। এই অবস্থায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং সমৃদ্ধি দেখা যায়। এই সমৃদ্ধির গতি থামিয়া যাইতে পারে, যদি ভুল ব্যাঙ্কিং নীতির ফলে সুদের বাজার-হার চড়িয়া যায় এবং লোকে ভোগ কমাইয়া সঞ্চয় করিতে না থাকে। সঞ্চয়ের ঘাটতি (under-saving) দেখা দিলেই সংকট দেখা দিবে। অর্থাৎ লোকেরা যদি বর্তমানের ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া ব্যাঙ্ক বা মূলধন-বাজারের মাধ্যমে উৎপাদকদের মূলধন-যোগান অব্যাহত না রাখে, তবে নিশ্চয় সংকট দেখা দিবে। ভোগবিলাসী জনসাধারণই তাই সংকটের জন্য দায়ী, বিনিয়োগকারীরা তো বিনিয়োগের জন্য সর্বদা প্রস্তুত হইয়াই আছে। বাজারে

দামস্তরে উঠানামা কেন হয়

সুদের হার কম থাকিলে বিনিয়োগ সুযোগের কোন অভাব নাই, ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, তাই আর কোন অসুবিধা নাই।

এই ধারণা কেইন্‌সীয় তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহা আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব। এই তত্ত্বের প্রণেতারা ইহা চোখে দেখিতে পান নাই যে, সুদের 'স্বাভাবিক হার'ই খুব কম হইতে পারে। উহা অপেক্ষা বাজার-হার আর কমানো চলে না, তাই বিনিয়োগ বাড়ানো মোটেই সম্ভব হইতেছে না। যেমন মনে কর, বর্তমান অবস্থায় 'সুদের স্বাভাবিক হার' শতকরা 3 টাকা; নূতন বিনিয়োগ হইতে গেলে বাজারী সুদের হার ইহা অপেক্ষা অনেক কম হওয়া দরকার। কিন্তু বর্তমানের মনস্তাত্ত্বিক ও প্রতিষ্ঠানগত জটিলতার দরুণ সুদের বাজার-হার শতকরা $2\frac{1}{2}$-এর কম কখনই নামানো চলে না। এই অবস্থায় নূতন বিনিয়োগ বাড়াইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

এই তত্ত্বের ত্রুটি

এই কারণেই, 'সুদের স্বাভাবিক হার' কিসের উপর নির্ভর করে তাহার আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক ভারসাম্যহীনতা (**Monetary disequilibrium**) ব্যাখ্যা করার কাজে সুদের স্বাভাবিক হার ও বাজার হারে পার্থক্য বলিলে এই বিষয়ে সকল কিছু বলা শেষ হয় না, বিশ্লেষণও নিছক অবাস্তব হইয়া পড়ে। দেশে মূলধন-গঠনের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া লোকেরা প্রভূত পরিমাণে সঞ্চয় করিতেছে, ফলে সুদের হারও কম আছে—এইরূপ অবস্থাতেও 'সুদের স্বাভাবিক হার' ততটা উঁচু না থাকিতে পারে যাহাতে দেশের সকল সঞ্চয় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করিবে; বাজারী সুদের হার কম থাকিলেও করিবে না। কেইন্‌স্-ই প্রথমে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এই বিষয়ে স্পষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন। নূতন বিনিয়োগের ব্যয় অপেক্ষা উহা হইতে সম্ভাব্য ও প্রত্যাশিত আয়ের পরিমাণ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করিতে পারিলে, 'স্বাভাবিক হার'কে কিরূপে বাড়ানো যায় বা 'বাজারী হার'কে কিরূপে কমানো যায় সেই সকল সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার কথা আমরা আলোচনা করিতে পারি।

কেইন্‌সীয় তত্ত্বের গুরুত্ব

কেইন্‌সীয় সঞ্চয়-বিনিয়োগ তত্ত্ব সুরু করার পূর্বে আমরা আর একটি তত্ত্ব আলোচনা করিব, ইহা হইল সঞ্চয়াধিক্য তত্ত্ব বা ভোগ-ঘাটতির তত্ত্ব (**Theory of over-saving or under-consumption**)। এই তত্ত্বের প্রচারক ছিলেন হব্‌সন (**Hobson**)। ম্যাল্‌থাস,

সিস্‌মণ্ডি ও মার্কসের ধারণার সহিত এই তত্ত্বের কিছুটা মিল আছে, কারণ হব্‌সনের মতে ধনতান্ত্রিক সমাজের আয়বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার মধ্যেই সঞ্চয়াধিক্য ঘটিবার বীজ লুকানো আছে। আয়-বৈষম্যের দরুণ বেশির ভাগ লোকের আয় কম, ফলে দেশে ভোগব্যয় বাড়িতে পারে না, অথচ সঞ্চয় বৃদ্ধির অভ্যাসের দরুণ ক্রমাগত মূলধন-সঞ্চয় বাড়িয়া চলে, ভোগের স্তর রক্ষা করার তুলনায় দেশে অনেক বেশি পরিমাণ বিনিয়োগ ঘটিতে থাকে, সামগ্রিক উৎপাদনাধিক্য দেখা দেয় এবং দেশময় বেকারি সৃষ্টি হয়।

সঞ্চয়াধিক্যের বা ভোগ-ঘাট্‌তির তত্ত্ব

আধুনিক কালের ধারণা, অর্থাৎ কেইন্‌সের তত্ত্বকে গড়িয়া তুলিতে হব্‌সনের তত্ত্ব কয়েকটি দিক হইতে সাহায্য করিয়াছে। (ক) জাতির সমৃদ্ধি নির্ভর করে ভোগব্যয় বৃদ্ধির উপর, (খ) দেশের মূলধন গঠন সঞ্চয়ের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা প্রকৃত ও প্রত্যাশিত ভোগব্যয়ের উপর নির্ভর করে, এবং (গ) আর্থিক ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে আয়-বণ্টন করাই মূল প্রয়োজন—এই সকল ধারণা হব্‌সনের তত্ত্বে পাওয়া যায়।

এই তত্ত্বের গুরুত্ব

কিন্তু এই তত্ত্বের মূল গলদ হইল, ইহা ধরিয়া লয় যে, যাহা সঞ্চিত হয় উহার সবটাই প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ হইতেছে। অর্থাৎ ইহার ভুল হইল বাড়্‌তি সঞ্চয়কে বাড়্‌তি বিনিয়োগ বলিয়া মনে করা, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য না রাখা। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের বহুবিধ সমালোচনা করিলেও হব্‌সন্ মনে করিতেন যে, সুদের হার সর্বদাই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আনিতেছে, ফলে তাঁহার নিকট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারা একই বলিয়া মনে হইত। প্রকৃতপক্ষে হব্‌সন্ চিন্তিত ছিলেন অধিক সঞ্চয়ের জন্য নয়, অধিক বিনিয়োগের জন্য, কারণ উহারই ফলে মূলধনী দ্রব্যের বাজারে উৎপাদনাধিক্য দেখা দেয়। মূলধনী দ্রব্যের অধিকোৎপাদন ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ায়, ফলে উভয় প্রকার দ্রব্যের বাজারেই অধিকোৎপাদন দেখা দেয়। কিন্তু সঞ্চয়ের আধিক্য আপনা-আপনি অধিক বিনিয়োগে পরিণত হয় কি করিয়া সেই বিষয়ে এই তত্ত্ব কোনরূপ আলোকপাত করে না। আমরা দেখিতে পাই, পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে দেশে যে-সঞ্চয় হয়, তাহা বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজিয়া পাওয়াই ভার, অন্তত সহজে উহার বিনিয়োগ হয় না। আধুনিক কালের ধনতন্ত্রের মূল সমস্যাই হইল অতিরিক্ত সঞ্চয়কে বিনিয়োগের পথে চালিত করার সুযোগ খুঁজিয়া পাওয়া।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে কেইন্‌সীয় তত্ত্ব (Keynesian doctrine of Savings and Investment)

যেমন, বিভিন্ন দামে ক্রয়ের পরিমাণ ও বিক্রয়ের পরিমাণ উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে কোন দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্যের দাম নির্দিষ্ট করে, ঠিক সেইরূপ কেইন্‌সের মতে বিভিন্ন আয়স্তরে সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং বিনিয়োগের পরিমাণ উভয়ের মিলিত প্রভাব সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভারসাম্যের আয়স্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। দামে উঠানামার মাধ্যমে যেমন দ্রব্যের যোগান ও চাহিদায় ভারসাম্য থাকে, ঠিক সেইরূপ আয়স্তরে উঠানামার মাধ্যমেই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য গড়িয়া উঠে। প্রতিটি সময়ের ক্ষণ-বিন্দুতে যেমন বিশেষ একটি দামে কোন দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য রহিয়াছে, ঠিক সেইরূপ কোন এক বিশেষ ক্ষণে সমাজের মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগও সমান আছে। ইহারা ক্ষণ-বিন্দুতে সমান, কিন্তু আয়স্তরে পরিবর্তনের প্রভাবে সদানিয়তই পরিবর্তিত হইতেছে, নূতন আয়স্তরে ইহাদের পুনরায় ভারসাম্য স্থাপিত হইতেছে। ইহারা তাই সর্বদা সমান, কিন্তু একবার অসমান হইলে আয়স্তরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আবার পরস্পরের সমান হইয়া পড়ে। আমরা তাই ইহাদের দুই দিক হইতেই আলোচনা করিব, হিসাবগত দিক হইতে ইহারা সমান (accounting equality) এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দিক হইতেও ইহারা সমান (Functional equality)।

আয়স্তরে পরিবর্তন ইহাদের ভারসাম্যে লইয়া আসে

হিসাবের দিক হইতে দেখিতে গেলে সমাজের মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগ সর্বদা সমান। যে-কোন আয়স্তরে ইহা সত্য এবং যদিও সঞ্চয়ের সিদ্ধান্ত ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সমাজে পৃথক ব্যক্তিরা গ্রহণ করে তবুও ইহাতে কোন ভুল নাই। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহাদের সমান বলিলে ঠিক বলা হয় না, ইহারা অভেদ (Identity), একই বিষয়কে দুই দিক হইতে দেখা হইতেছে মাত্র। সঞ্চয় ও বিনিয়োগে এই অভেদরূপের কারণ হইল সমাজের মোট আয় এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ সমান, ইহারা একই, দুই দিক হইতে একই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত। ভোগব্যয় ছাড়া সমাজে যে-ব্যয় হয় তাহাকেই আমরা বিনিয়োগ-ব্যয় বা বিনিয়োগ বলি, অর্থাৎ $I = Y - C$. আবার আয় হইতে ভোগ-ব্যয়

হিসাবের দিক হইতে ইহারা অভেদ

বাদ দিলেই পাওয়া যায় সঞ্চয়, অর্থাৎ $S = Y - C$. সুতরাং S নিশ্চয় I-এর সমান। এই অভেদটিকে এই ভাবে লেখা চলে :

$$Y = C + I \quad \text{অথবা,} \quad 1000 = 800 + 200$$
$$S = Y - C \qquad 200 = 1000 - 800$$
$$\therefore \; S = I \qquad \therefore \; 200 = 200$$

উপরের হিসাবে দেখা যায়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান। ইহারা হইল আয়—ভোগব্যয়, তাই সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান। ইহারা সংজ্ঞাগত ভাবেই সমান (ex definitione) ঠিক যেমন, MV ও PT পরস্পর সমান। এমনভাবে ইহাদের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে যাহাতে ইহারা সমান হয়। মোট ব্যয়ের (Y) মধ্যে আছে ভোগব্যয় (C) ও বিনিয়োগব্যয় (I) : আবার আয়ের (Y) একাংশ দিয়া ভোগব্যয় করা হইয়াছে, তাই নিশ্চয় বিনিয়োগ ব্যয় (I) করা হইয়াছে সঞ্চয়ের অংশ (S) হইতে।

একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই হিসাবগত অভেদরূপ সামগ্রিক (aggregate) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইহারা পরস্পর সমান—এই কথা চিন্তা করা বা ধারণায় আনা অসুবিধাজনক, যদি আমরা ভুল করিয়া কোন একটি ব্যক্তির দিক হইতে এই কথা চিন্তা করি। যেমন, সমাজে কোন এক ব্যক্তি যে-পরিমাণ বিনিয়োগ করে উহা অপেক্ষা বেশি সঞ্চয় করিতে পারে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজের সকল ব্যক্তি মিলিয়া একত্রে যে-পরিমাণ বিনিয়োগ করে উহা অপেক্ষা বেশি সঞ্চয় করিতে পারে না। ইহার কারণ একজন ব্যক্তি নিজের সঞ্চয় বাড়াইলে তাহার নিজস্ব ব্যয় কমাইয়া দেয়, ফলে অন্যের আয় ও সঞ্চয় উভয়ই কম হয়। তাই নিজে সঞ্চয় করিয়া সে সমাজের মোট সঞ্চয় বাড়াইয়া তুলিতে পারে না। যেমন, কোন এক ব্যক্তি নিজের বিনিয়োগ অপেক্ষা আরও 10 টাকা বেশি সঞ্চয় করিল। ভোগ না কমাইলে সঞ্চয় বাড়ানো যায় না, তাই ব্যক্তির ভোগব্যয় 10 টাকা কমিয়া গেল। যে-সকল জিনিস সে কিনিতেছিল, সেইগুলির মালিকদের হাতে 10 টাকা কম আয় হইল। কিন্তু তাহাদের ভোগব্যয় কমে নাই, তাই তাহাদের এই 10 টাকা কম সঞ্চয় হইল। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান রহিল, শুধু আয়স্তর হ্রাস পাইল।

সামগ্রিক দৃষ্টিতেই ইহাদের সমতা সম্ভব

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই সমতা হইতে আমরা একটি বিষয় জানিতে

পারি। ক্লাসিকাল লেখকদের মনে ধারণা ছিল, কোন ব্যক্তির সঞ্চয় বাড়িলে দেশের মোট সঞ্চয় বাড়ে। তাই তাঁহারা সঞ্চয় বাড়ানোকে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় দিক হইতেই কল্যাণকর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু কেইন্‌স্‌ দেখাইলেন যে, ব্যক্তির পক্ষে যাহা কল্যাণকর সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে তাহা রীতিমত অকল্যাণকর হইতে পারে। পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের পূর্বে লোকের সঞ্চয়-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইলে দেশের সামগ্রিক আয় ও কর্মসংস্থানস্তর হ্রাস পায়।

ব্যক্তিগত গুণ কিন্তু সামাজিক দোষ

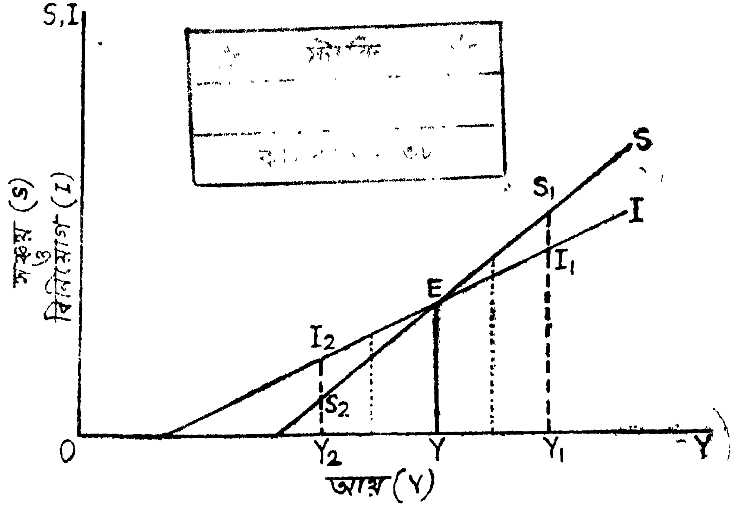
তবে মনে রাখা দরকার যে, ইহার বিশ্লেষণগত উপযোগিতা খুবই সীমাবদ্ধ। সঞ্চয় ও বিনিয়োগে কিরূপে সামঞ্জস্য আসে, সেই পথ বা ধারার (adjusting mechanism) বিশ্লেষণ না থাকিলে এই অভেদটিকে আমরা ব্যবহার করিতে পারি না। ইহা সামঞ্জস্য সাধনের গতি-পথ ব্যাখ্যা করে না, তাই এই অভেদটি স্থিতিশীল বিশ্লেষণের হাতিয়ার (tool of static analysis)। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত কিরূপে গতিশীল ধারার সামঞ্জস্যে পৌঁছে সেই ধারার ব্যাখ্যা না করিলে ইহার বিশ্লেষণযোগ্যতা কমিয়া যাইবে। তাই আধুনিক কালের আয়তত্ত্বে ইহাদের গতিশীল (dynamize) করিয়া তোলা হইয়াছে। নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় ধারণাগুলিতে প্রাণদান করিয়া সচল ও সক্রিয় করিয়া তোলা হইয়াছে।

সমান ধরিলেও ইহাদের গুরুত্ব কমে না

সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পারস্পরিক গতিশীল সম্পর্ক (dynamic relationship) বিশ্লেষণের সময় আমরা ইহাদের তালিকা হিসাবে মনে করি (in the schedule sense)। যেমন, দ্রব্যের বাজারে উহার যোগান ও চাহিদা সমান হয় একমাত্র ভারসাম্যের দাম বজায় থাকিলে, ঠিক সেইরূপ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হইবে ভারসাম্যের আয়স্তরে (at the equilibrium level of income)। যেমন, ভারসাম্যের দাম না থাকিলে যোগান ও চাহিদা অসমান হইতে পারে, ঠিক সেইরূপ ভারসাম্যের আয়স্তর বজায় না থাকিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য আনয়নকারী শক্তি হইল দাম, সেইরূপ এইক্ষেত্রে উহা হইল আয়স্তর। পরপৃষ্ঠার ছবিতে সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও আয়স্তরের এই গতিশীল সম্পর্ক দেখা যাইতেছে। ভূসমান্তরাল অক্ষে আয় এবং লম্বমুখী অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়কে পরিমাপ করা হইতেছে।

ইহাদের মধ্যে গতিশীল সম্পর্ক কি

S ও I হইল সঞ্চয় ও বিনিয়োগের রেখা। বিনিয়োগের রেখা I-কে সঞ্চয়-রেখা S নিচের দিক হইতে কাটিয়া উঠিতেছে। আয়স্তর Y_2 থাকিলে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ I_2S_2 বেশি। বিনিয়োগ বেশি হইলে ব্যবসায়ীদের মুনাফা বেশি,



কারণ সঞ্চয় কম, আয়ের বেশি অংশ ব্যয় হয়। জিনিসপত্র বিক্রয়ের সম্ভাবনা বেশি। সমাজের আয়-পরিমাণ পরবর্তী স্তরে ক্রমাগত উঠিতে থাকে, যতক্ষণ না এইরূপে OY স্তরে পৌঁছে। এই স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান থাকে। আয়স্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস পাইতে থাকে, অবশেষে ইহারা পরস্পর সমান হইয়া পড়ে। আয়স্তর OY_1 থাকিলে বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয় বেশি। ক্রমে আয়স্তর কমিয়া আসিয়া OY স্তরে উভয়ের ভারসাম্য ঘটে।

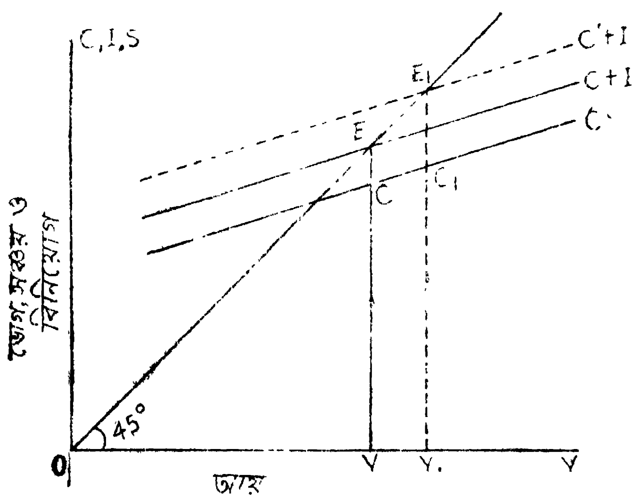
সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে এইরূপ তালিকার ধারণায় গ্রহণ করিলে (in the schedule sense) ইহারা পরস্পরের সমান হয় নিজেদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতে। এই ধারায় কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়া দরকার (over time), এবং ভারসাম্য সাধনকারী পদ্ধতির ধারাপথ বা কৌশল হইল আয় (equilibrating mechanism of income)। আয়স্তরে পরিবর্তনের হার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সঙ্গে এমন ভাবে যুক্ত যে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বাড়িলে আয়স্তর বাড়ে এবং বিনিয়োগ কমিলে আয়স্তর কমে। সঞ্চয় ও

আয়স্তরে পরিবর্তন কিরূপে ইহাদের সামঞ্জস্য ঘটায়

বিনিয়োগ সমান একমাত্র ভারসাম্য-আয়ের স্তরে, যেখানে আয় বাড়িতেছে না বা কমিতেছে না। আয়স্তরে পরিবর্তনই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পরিবর্তনের পথ মসৃণ করিয়া রাখিয়াছে, ইহাদের পরস্পরকে সমান করার অবস্থা প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে প্রভাবিত করিতে গিয়া, সেই কাজের মধ্য দিয়া সমাজের আয়স্তর নিজেও ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া চলিযাছে। কিরূপে ভোগপ্রবণতা (অথবা ইহার বিপরীত সঞ্চয়প্রবণতা) এবং বিনিয়োগ-প্রবণতা উভয় শক্তি মিলিয়া আয়স্তর নির্ধারণ করিতেছে? ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে যে, সমাজের ভোগ ও বিনিয়োগকে স্বপ্রভাবিত পরিবর্তনীয় শক্তি (independent variable) এবং আয়স্তরকে অপরপ্রভাবিত বা নির্ভরশীল পরিবর্তনীয় শক্তি (dependent variable) হিসাবে গণ্য করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কেইন্‌সের মত অনুসারে আমরা স্বল্পকালে ভোগপ্রবণতাকে অপরিবর্তিত ধরিয়া লইতেছি : এই অবস্থায় বিনিয়োগপ্রবণতায় পরিবর্তন কিরূপে আয়স্তরে পরিবর্তন ঘটায় ; নিচের ছবিটি হইতে ইহা বোঝা যাইতেছে।

আবার সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয় মিলিয়া কিরূপে আয়স্তর নির্ধারণ করে



লম্বমুখী অক্ষে ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং ভূসমান্তরাল অক্ষে আয় পরিমাপ করা হইতেছে। C রেখা হইল ভোগরেখা, উহার উপরে C+I রেখা হইল ভোগ ও বিনিয়োগের সম্মিলিত রেখা। প্রতিটি আয়স্তরে

সেই স্তরের ভোগের পরিমাণের সহিত বিনিয়োগের পরিমাণ যোগ করিয়া এই দুইটি রেখার লম্বমুখী দূরত্ব জানা যাইবে।

C রেখা হইতে C+I রেখাটির দূরত্ব অনুযায়ী বুঝা যাইবে নির্দিষ্ট আয়স্তরে বিনিয়োগের পরিমাণ কতখানি। উপরের ছবিতে C রেখা ও C+I রেখার দূরত্ব সকল আয়স্তরেই সমান, অর্থাৎ ইহারা পরস্পর সমান্তরাল, তাহা দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ বিনিয়োগ হইল স্বয়ংভূত ধরণের, আয়স্তরে পরিবর্তন ইহাতে পরিবর্তন আনে না, ইহা স্বপ্রভাবিত পরিবর্তনীয় বিষয় (Independent variable), অপর কিছু দ্বারা বর্তমানে প্রভাবিত হইতেছে না। এই C+I রেখাটি 45° রেখাটির সহিত E বিন্দুতে মিলিত হইয়েছে, OY হইল ভারসাম্যের আয়স্তর। অর্থাৎ লোকেরা কি পরিমাণ ভোগ-ব্যয় করিতে চায় এবং ব্যবসায়ীরা কি পরিমাণ বিনিয়োগ ব্যয় করিতে চায়, এই দুই-এ মিলিয়া স্থির করে ভারসাম্যের আয়—যে আয়স্তরে লোকেদের ভোগব্যয় করিয়া যাহা বাকি থাকে অর্থাৎ সঞ্চয় হয় উহার সম্পূর্ণ অংশ তাহারা বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয় করে। অর্থাৎ এই দুই বিন্দুতে মোট ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয়ের পর অবশিষ্ট আয়ের অংশ (অর্থাৎ সঞ্চয়) নিশ্চয় বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয়ের সমান। CE পরিমাণ সঞ্চয়, আবার CE পরিমাণই বিনিয়োগ। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ যতক্ষণ পৃথক থাকে ততক্ষণ ভারসাম্যের আয় দেখা দেয় নাই, যখন ইহারা সমান হইল, সেই বিন্দুতে ভারসাম্যের আয় পাওয়া গেল। ভারসাম্য আয়ের স্তরে YC+CE = YE ; অর্থাৎ ভোগব্যয়+সঞ্চয় (বা বিনিয়োগ) = মোট আয়।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়ের সমতার বিন্দুতে ভারসাম্যের আয় দেখা দেয়

এই অবস্থায় 'স্বয়ংভূত' কোন কারণে যদি C+I রেখাটি উপরে উঠে, তবে আমরা দেখি যে, নূতন C^1+I^1 রেখাটি 45° রেখাকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করে এবং এই বিন্দুতে নূতন বর্ধিত আয়স্তর OY_1 পাওয়া যায়। এই নূতন স্তরে ভোগ ও বিনিয়োগ নূতন আয়ের সমান এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান। অপসরণশীল ভারসাম্যের (shifting equilibrium) এক একটি বিন্দু হইল E এবং E^1, ইহারাই আয়স্তরে পরিবর্তন প্রকাশ করিতেছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, আমরা যদি ভোগের পরিমাণ স্বল্পকালে স্থির ধরিয়া লই, তবে আয়ে এই পরিবর্তন নিশ্চয় বিনিয়োগে পরিবর্তনের ফল। তাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে আয়স্তরের উপর বিনিয়োগে পরিবর্তনের ফল কি।

বিনিয়োগের পরিবর্তনই আয়ে পরিবর্তন ঘটায়

বিনিয়োগ-বৃদ্ধি ও আয়স্তরে বৃদ্ধির সম্পর্ক : গুণক তত্ত্ব (Relation between increase in Investment and Increase in Income-level : the Multiplier) :

বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে সমাজে কর্মসংস্থান ও আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায় ; বিনিয়োগে প্রাথমিক বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান ও আয়ে মোট বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে গুণকের উপর। প্রাথমিক আয়ের যতগুণ মোট আয় বাড়ে তাহা আয়ের গুণক (Income Multiplier) ; আবার প্রাথমিক কর্মসংস্থানে যতগুণ মোট কর্মসংস্থান বাড়ে তাহা কর্মসংস্থানের গুণক (Employment Multiplier)। অনেক সময় ইহাকে বিনিয়োগের গুণক (Investment Multiplier) বলা হয়।

গুণক কাহাকে বলে ? উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাউক যে, সমাজে চল্‌তি বিনিয়োগ-পরিমাণের অধিক নূতন ভাবে 1 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হইল। যেমন, কোন কারখানা স্থাপনের এই জন্য 1 লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইল। কারখানা স্থাপন এবং চালু করার জন্য বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী, মজুর, প্রভৃতি উপকরণ ক্রয়ের জন্য এই টাকা খরচ করা হইল। অর্থাৎ বিনিয়োগের ফলে পূর্বে বেকার ছিল এইরূপ শ্রমিকের কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি হইল এবং অন্যান্য উপকরণের মালিকদেরও আয় কিছুটা বৃদ্ধি পাইল। 1 লক্ষ টাকা বিনিয়োগের ফলে প্রথমেই জাতীয় আয় 1 লক্ষ টাকা বাড়িয়া গেল।

গুণক কাহাকে বলে : বিনিয়োগের পরিমাণে বৃদ্ধি উহার কতগুণ মোট আয় বাড়াইয়া তোলে

কিন্তু আয়-প্রসারের ধারা এই স্তর ক্ষান্ত থাকে, তাহা নহে। কারণ, যাহাদের আয় হইল তাহারা সেই আয় মোটেই ব্যয় না করিয়া সবটা সঞ্চয় করে, তাহা হইতে পারে না। যদি বর্ধিত আয়ের সমস্তটাই সঞ্চিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সমাজে ওই 1 লক্ষ টাকার-অধিক মোট আয় সৃষ্টি হইতে পারিল না ; আয়-প্রসারের ধারা স্তব্ধ হইয়া গেল। ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে, যদি সমাজের গড় প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 0 হয় (অর্থাৎ আয় বৃদ্ধির ফলে ভোগের পরিমাণ মোটেই না বাড়ে), তাহা হইলে গুণক হইল 1 (K=1), অর্থাৎ নূতন বিনিয়োগের পরিমাণ পর্যন্ত মাত্র মোট আয় বৃদ্ধি পাইবে, ইহার বেশি নহে।

গুণক নির্ভর করে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার উপর

যদি এইরূপ হয় যে, বিনিয়োগের দরুন যাহারা একলক্ষ টাকা নূতন আয়

হিসাবে পাইবে, তাহারা সবটাই ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় করে, তাহা হইলে ওই এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া ভোগদ্রব্য বিক্রেতাদের নূতন আয় সৃষ্টি করিল। ভোগ্যদ্রব্যের বিক্রেতাগণ সেই নূতন আয় যদি সবটা ব্যয় করেন তাহা হইলে তাঁহারা যে সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিলেন, উহাদের বিক্রেতাদের 1 লক্ষ টাকা নূতন আয় হইল। রামের ব্যয় হইতে শ্যামের আয় হয়, শ্যামের ব্যয়ই যদুর আয়, যদুর ব্যয়ই মধুর আয়—এইভাবে সমাজের ব্যয় ও আয় পরস্পরসংযুক্ত। যদি মোটেই সঞ্চয় না হয়, তাহা হইলে এই একলক্ষ টাকার সম্পূর্ণটাই অনবরত ব্যয় ও আয় সৃষ্টি করিতে থাকিবে, এই ধারা কোথাও থামিবে না। ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে, যদি সমাজের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 1 হয়, অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হইয়া যায়, তবে গুণক হইল অসীম ($K=\infty$)।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 0 হইতে বেশি (অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের সমস্তটা সঞ্চিত হয় না), অথচ ইহা 1 হইতে কম (অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের সমস্তটা ব্যয়িত হয় না)। প্রথমে বিনিয়োগের ফলে 1 লক্ষ টাকা যাহাদের আয় হিসাবে আসিয়াছিল, তাঁহারা কিছুটা সঞ্চয় করিয়া বাকি অংশ ব্যয় করিল, এই ব্যয় আবার অন্যের আয় সৃষ্টি করিবে ; তাঁহারা আবার তাঁহাদের বর্ধিত আয়ের কিছু অংশ ব্যয় করিবে, সেই ব্যয় হইতে আরও নূতন আয়, ফলে আরও নূতন ব্যয় ও আয় ক্রমাগত সৃষ্টি হইতে থাকিবে। প্রত্যেক স্তরে সঞ্চয় হইতে থাকায়, প্রতিবারে নূতন আয় সৃষ্টির পরিমাণ এইরূপে কমিতে থাকিবে, অবশেষে বর্ধিত আয়ের পরিমাণ যখন খুব কম, ব্যয়ের দ্বারা আর নূতন আয় সৃষ্টি হইতে পারিতেছে না, সেই স্তর পর্যন্ত এই ধারা চলিয়া অবশেষে ক্ষান্ত হইবে। নূতন বিনিয়োগ হইতে সৃষ্ট প্রাথমিক আয় এইরূপে নিজের বহুগুণ বেশি আয় সৃষ্টি করিবে। পুকুরের ঠিক মধ্যখানে ঢিল ছুঁড়িলে জলে চক্রাকৃতির ঢেউ-এর সৃষ্টি হয়, ঢেউগুলির পরিধি যত প্রসারিত হইতে থাকে উহাদের উচ্চতা তত কমিতে থাকে, তীরের দিকে সেই উচ্চতা মিলাইয়া যায়, কিন্তু সমগ্র জলস্তরে উত্তালতার সৃষ্টি করে সমাজের অর্থনৈতিক দেহে নূতন বিনিয়োগের ফলও তাই : আয় ও কর্মসংস্থানে প্রাথমিক বৃদ্ধি নূতন আয় ও কর্মসংস্থানের ঢেউ সৃষ্টি করিয়া সমগ্র সমাজ-দেহে সঞ্চারিত হইয়া অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তরে উত্তালতা আনে। প্রথম দিকে আয় ও কর্মসংস্থানের ঢেউগুলি উচ্চতায় বেশ বড়, কিন্তু প্রতিটি পরবর্তী বারে উহার আয়তন কমে, ক্রমে ইহা কমিয়া অবশেষে মিলাইয়া যায়।

সুতরাং, বিনিয়োগ-বৃদ্ধির ফলে সমাজের মোট আয় কত গুণ বাড়িল তাহাকে গুণক বলে, অর্থাৎ $K=\frac{\delta Y}{\delta I}$, অথবা $\delta Y=K\delta I$. গুণকের এই আয়তনে (Size of the Multiplier) নির্ভর করে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার আয়তনের উপর। প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বেশি হইলে গুণকের আয়তনও বড়, কারণ প্রত্যেক স্তরের আয় হইতেই বেশি পরিমাণে ভোগব্যয় হইলে উহা পরবর্তী স্তরে বেশি পরিমাণে আয় সৃষ্টি করে। প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা কম হইলে গুণকের আয়তনও ছোট, কারণ প্রত্যেক স্তরের আয় হইতেই কম পরিমাণ ব্যয় পরবর্তীস্তরে কম পরিমাণ আয় সৃষ্টি করে। যদি প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{1}{2}$ হয়, তাহা হইলে গুণক হইল 2 : প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{2}{3}$ হইলে গুণকের আয়তন 3 ; প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{3}{4}$ হইলে গুণকের আয়তন 4।

গুণকের আয়তন কিভাবে পরিমাপ করা হয়? ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা (Marginal Propensity to Save) হইল প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতারই ঠিক অপর দিক। নূতন 100 টাকা আয়ের 80 টাকা যদি ব্যয় হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় 20 টাকা সঞ্চয় হইতেছে ; অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা $\frac{4}{5}$ হইলে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা $\frac{1}{5}$. গুণককে এইভাবে প্রকাশ করা চলে যে, $K=1/S$; K হইল গুণকের আয়তন এবং S হইল প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা ; উপরের উদাহরণে $K=1/\frac{1}{5}$; $\therefore$ $K=5$.

প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার দিক হইতেও আমরা গুণকের আয়তন পরিমাপ করিতে পারি। মনে করা যাউক, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার নাম হইল m. আমরা জানি প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ও সঞ্চয়-প্রবণতা যোগ করিলে 1 এর সমান হয়। যেমন প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা $\frac{1}{5}$ হইলে ভোগপ্রবণতা $\frac{4}{5}$; উভয়ে মিলিয়া পূর্ণসংখ্যা 1। এই অবস্থায় $K=1/S=1/1-m$; এবং প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (m) হইল $=1-S=1-1/K$. উপরের উদাহরণে আমরা m ধরিয়াছি $\frac{4}{5}$ এবং S ধরিয়াছি $\frac{1}{5}$. এই অবস্থায় $K=1/S=1/1-m$, $K=1/1-\frac{4}{5}$, $K=1/\frac{1}{5}$, অর্থাৎ $K=5$. আমরা তাই m বা S জানা থাকিলে K বাহির করিতে পারি, অথবা K জানা থাকিলে m বা S জানিতে পারি।

এইরূপে গুণকের আয়তন বাহির করিয়া উহার সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, দেশে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধির কতগুণ আয় বাড়িল। যেমন যদি 1000 টাকার নূতন বিনিয়োগ হয়, এবং K যদি হয় 5, তবে আয়স্তর বৃদ্ধি পাইল 5000. অর্থাৎ, $\delta Y=K\delta I$.

বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে গুণকের আয়তন অনুযায়ী যখন আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ে তখন ইহাকে ধনাত্মক গুণক (Positive Multiplier) বলা হয়; বিনিয়োগ কমিলে গুণকের আয়তন অনুযায়ীই আয় ও কর্মসংস্থান কমে, সেই অবস্থায় ইহাকে ঋণাত্মক গুণক (Negative Multiplier) বলা হয়। গুণক 5 হইলে 1 লক্ষ টাকার বিনিয়োগে বৃদ্ধি সমাজে 5 লক্ষ টাকার মোট আয় বৃদ্ধি করে; ঠিক সেইরূপ 1 লক্ষ টাকার বিনিয়োগ কমিয়া গেলে সমাজে মোট 5 লক্ষ টাকার আয় হ্রাস পায়।

ধনাত্মক গুণক ও ঋণাত্মক গুণক

মনে রাখা দরকার যে, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (যাহার ভিত্তিতে গুণকের আয়তন হিসাবে করা হয়) আয়ের সকল স্তরে সমান থাকে না। আয়স্তর বাড়তে থাকিলে প্রত্যেক আয়স্তরের বৃদ্ধিই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাকে কমাইয়া দেয়; সুতরাং আয়স্তরে প্রত্যেকবার বৃদ্ধির সঙ্গে গুণকের আয়তন পূর্বাপেক্ষা কমিতে থাকে। আবার ঋণাত্মক গুণকের কার্যকারিতার সময়ে আয়স্তরে প্রত্যেক বারের হ্রাস প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতাকে পূর্বাপেক্ষা বাড়াইয়া গুণকের আয়তন বাড়াইতে থাকে।

আয়ে পরিবর্তন ঘটাইবার কালে গুণকের নিজেরই পরিবর্তন হয়

গুণকের উপর সময়েরও বিশেষ প্রভাব থাকে। কারণ, বিনিয়োগের পরিবর্তন সমগ্র সমাজদেহে সঞ্চারিত হইয়া আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণে পরিবর্তন আনিতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। 1 লক্ষ টাকার বিনিয়োগ প্রথমে 1 লক্ষ টাকার আয় সৃষ্টি করিলে এবং পরবর্তীবারে ($\frac{4}{5}$ প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা থাকিলে) 80 হাজার টাকার নূতন আয় সৃষ্টি করিবে, ইহার পরবর্তীস্তরে 65 হাজার টাকার নূতন আয় সৃষ্টি করিবে। কিন্তু প্রথম বারের ভোগ-ব্যয় এবং দ্বিতীয় বারের ভোগ-ব্যয় একই সময়ে ঘটিতেছে না। আয় সৃষ্টির প্রত্যেক স্তরেই এইরূপ সময় অতিবাহিত হয়; ইতিমধ্যে অন্যান্য বিনিয়োগের ফলাফল বা প্রভাব আয়ের উপর পড়িতে পারে। কোন বিশেষ বিনিয়োগের বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলাফল সম্পূর্ণ হইতে যে সময় প্রয়োজন তাহাকে গুণককাল বা প্রসারকাল (Multiplier or Propagation Period) বলা হয়।

গুণক কাল বা প্রসার কাল

গুণকের আয়তন বিভিন্ন বিষয় দ্বারা কমিয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রকার "ছিদ্রসমূহ" (Leakages) গুণকের আয়তন কমাইয়া বিনিয়োগে পরিবর্তনের

দরুণ আয়ে পরিবর্তনের হার কমাইয়া দিতে পারে। (ক) নূতন আয় যাহাদের হাতে আসিল তাহারা উহার সাহায্যে পুরানো ঋণ পরিশোধ করিতে পারে, (খ) আয় বৃদ্ধির ফলে নগদ টাকা বেশি পরিমাণে হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে, বা তারল্য-পছন্দ বাড়িয়া যাইতে পারে, (গ) বিদেশী আমদানি-দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে।* (ঘ) দামবৃদ্ধি হইতে পারে। যেমন, পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় বিনিয়োগে বৃদ্ধি ভোগদ্রব্যের উৎপাদনক্ষেত্র হইতে শ্রমিক ও উপকরণ সরাইয়া আনিবে, ফলে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন কমিবে। উপাদানের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইবে, যথেষ্ট পরিমাণে আয়-বৃদ্ধি সম্ভব হইবে না।

ছিদ্রসমূহ

অনুন্নত দেশে, এই গুণকের আয়তন বা প্রভাব আরও তিনটি বিষয়ের দ্বারা বিশেষ রূপে প্রভাবিত হয়। প্রথমত, দেশে আর্থিক মূলধনের পরিমাণ কম থাকায় রাষ্ট্র কর্তৃক বিনিয়োগ ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে কমাইয়া দিতে পারে, কারণ মূলধনের বাজার হইতে রাষ্ট্র নিজেই বিনিয়োগের জন্য মূলধন তুলিয়া লইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ হ্রাস পাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, দেশে আসল মূলধন অর্থাৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতির পরিমাণ কম থাকায় আয় বৃদ্ধি হইলেই ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ান সম্ভব না-ও হইতে পারে। তৃতীয়ত, আয় বাড়িলে খাদ্যদ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে, ফলে উহাদের দাম বৃদ্ধি হয়, অধিক আয় সৃষ্টি করিতে পারে না।

অনুন্নত দেশ ও গুণক প্রভাব

ত্বরণ তত্ত্ব (Acceleration Theory):

সমাজের ভোগব্যয়ে বৃদ্ধির ফলে যে পরিমাণে নূতন বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয় তাহাদের অনুপাতকে ত্বরণ (Acceleration) বলা হয়।

সমাজে সাধারণত দুই প্রকারের বিনিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়: স্বয়ম্ভূত

* রপ্তানি হইতে প্রাপ্ত নীট আয় দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ-বৃদ্ধির ন্যায় কাজ করে, এবং দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের উপর ইহার প্রভাব আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগেরই ন্যায়। রপ্তানির উপর বিদেশীদের ব্যয় রপ্তানি-দ্রব্যে নিযুক্ত শ্রমিক ও উপকরণের মালিকদের আয় বাড়ায়, তাহাদের সেই আয় পুনরায় ব্যয়িত হইয়া দেশে নূতন আয় সৃষ্টি করে, মোট আয়-সৃষ্টির পরিমাণ গুণকের আয়তনের উপর নির্ভর করে। আমদানীকে "ছিদ্র" হিসাবে, আভ্যন্তরীণ প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতার (S) মধ্যে একই সঙ্গে ধরিয়া লইয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক পরিমাপ করা চলে। অর্থাৎ দেশের আয়স্তরের উপর রপ্তানির মোট ফল নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা হিসাব করা যায়:

$$\text{আভ্যন্তরীণ আয়ে পরিবর্তন} = \text{রপ্তানিতে পরিবর্তন} \times \frac{1}{\text{সঞ্চয়} + \text{আমদানি প্রবণতা}}$$

বিনিয়োগ (Autonomous Investment) এবং উদ্ভূত বিনিয়োগ (Derived of Induced Investment)। রাষ্ট্র বা অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ রাজনৈতিক, স্বাস্থ্যরক্ষা বা অন্যান্য কারণে যে সকল বিনিয়োগ করিয়া থাকেন, যেমন পার্ক, সরোবর প্রভৃতি ; অথবা নূতন আবিষ্কৃত দ্রব্য বা যন্ত্র প্রভৃতিতে বিনিয়োগ ; অথবা অনেক কাল পরে উহা হইতে আয় পাওয়া যাইবে এরূপ কার্যে বিনিয়োগ প্রভৃতিকে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বলা চলে, কারণ বর্তমানের কোন আর্থিক বিষয় (যেমন আয়স্তর বা মুনাফার হার প্রভৃতি) এই বিনিয়োগের পিছনে কারণ হিসাবে কাজ করে না। ইহারা তাই স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ। কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের জন্য চাহিদা থাকায় সেই ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে হয় ; আবার ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রপাতি-উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতিও দরকার। ইহাদের উপর বিনিয়োগের কারণ ভোগ্যদ্রব্যের জন্য চাহিদা : ইহাদের তাই, উদ্ভূত বিনিয়োগ বলা হইয়া থাকে। সমাজের ভোগব্যয় বাড়িলে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদকগণ আরও যন্ত্রপাতি কিনিতে চায়, ফলে এই ধরনের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সমাজের ভোগব্যয়ে পরিবর্তন এবং উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন—এই দুই-এর অনুপাতকে ত্বরণসহগ (Acceleration Coefficient) বা ত্বরক (Accelerator) বলে। যেমন যদি সমাজের ভোগব্যয়ের পরিমাণ 2 কোটি টাকা বাড়িয়া যায়, ফলে যদি ইহার দরুণ উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ 4 কোটি টাকা বাড়ে, তাহা হইলে ত্বরণসহগ বা ত্বরক হইল 2। যদি উদ্ভূত বিনিয়োগ ৮ কোটি টাকা হয়, তাহা হইলে ত্বরণসহগ বা ত্বরক হইল 4।

দুই প্রকার বিনিয়োগ

ত্বরণসহগ বা ত্বরক কাহাকে বলে

যদি ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে কোন মূলধনী যন্ত্রপাতির ব্যবহারই না হয় (যেমন অতি প্রাচীন পদ্ধতিতে উৎপাদন যেমন, হাত দিয়া ফল পাড়িয়া আনা—এইরূপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে) তাহা হইলে ত্বরণ সহগ o, কারণ ভোগব্যয়ে বৃদ্ধি হইলেও বিনিয়োগ মোটেই বাড়িতেছে না। আরও কয়েকটি কারণে এইরূপ ঘটিতে পারে যেমন, (ক) বর্তমানে যন্ত্রপাতির উৎপাদনী শক্তি অব্যবহৃত অবস্থায় থাকিলে (excess capacity), (খ) ভোগব্যয়ে বৃদ্ধি বা নূতন যন্ত্রপাতির জন্য চাহিদা খুবই সাময়িক ও অস্থায়ী ধরনের হইলে, এবং (গ) স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ঘটিলে, কারণ ইহা বিভিন্ন অনার্থিক ও বাহ্য কারণের দ্বারা নির্ধারিত। এইরূপ কোন কোন ক্ষেত্রে,

কি অবস্থায় ত্বরণ-সহগ o বা খুবই কম

ত্বরণসহগ 0 হইতে পারে বা খুবই কম (অর্থাৎ 1 হইতেও অনেক কম, যেমন, $\frac{1}{10}$ বা $\frac{1}{20}$) হইতে পারে।

কি অবস্থায় ত্বরণ-সহগ বেশি

যদি ভোগব্যয়ে পরিবর্তন অধিক হয়, এবং সেই ভোগদ্রব্য উৎপাদনের জন্য এমন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় যাহার ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় খুবই বেশি, তাহা হইলে ত্বরণ-সহগ বেশি হইয়া থাকে।

ত্বরণনীতি কি ভাবে কাজ করে

ত্বরণনীতি (Acceleration Principle) কিরূপে কাষ করে, বা ভোগব্যয় বৃদ্ধি হইলে কিরূপে বিনিয়োগ বাড়িয়া যায়? ধরা যাউক, দেশে এক বিশেষ ধরনের 1000টি যন্ত্র ভোগদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত আছে: প্রত্যেকটি যন্ত্রের স্থায়িত্ব 10 বৎসর। সুতরাং প্রত্যেক বৎসর 100টি যন্ত্র অকেজো হইয়া যায়, ফলে পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে (for replacement) 100টি নূতন যন্ত্র প্রতি বৎসর প্রস্তুত হয়। ফলে এই যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পে 100টি যন্ত্র উৎপাদনের উপযোগী কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ আছে। যদি এই অবস্থায় ভোগদ্রব্যের চাহিদা বা ভোগব্যয় শতকরা 10% বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে আরও 100টি নূতন যন্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজন হইবে, পুনঃস্থাপনের জন্য বাৎসরিক 100টি যন্ত্রের উৎপাদন তো চলিতে থাকিবেই। সুতরাং যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পে বৎসরে 100টি যন্ত্রের স্থলে 200টি যন্ত্রের উৎপাদন সুরু করিতে হইবে, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। ভোগব্যয়ে মাত্র 10% পরিবর্তন বিনিয়োগে 100% পরিবর্তন আনিতে পারে। কিন্তু পরের বৎসর যখন উৎপাদন শেষ হইয়া গেল, তখন আর 200টি যন্ত্রের চাহিদা থাকিবে না। আবার পুনরায় 100টি যন্ত্র (পুনঃস্থাপনের জন্য যাহা প্রয়োজন) উৎপন্ন হইতে থাকিবে। অর্থাৎ বিনিয়োগ 50% কমিয়া যাইবে; 200টির উৎপাদন হইতে কমিয়া 100টির উৎপাদন হইবে। ঠিক এই কারণে বাণিজ্য চক্রের সময়ে দেখা যায় যে, মূলধনী যন্ত্রপাতির উৎপাদন ভয়ানক অস্থায়ী এবং ইহাতে হঠাৎ বিপুল পরিমাণে উঠানামা ঘটে।

গুণক ও ত্বরণের পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত এবং মিলিত প্রভাব (Interactions of Multiplier and Acceleration and their combined effect):

বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে মোট আয়ে বৃদ্ধি, গুণক ও ত্বরণ এই দুই-এর সম্মিলিত ফলাফল। মোট ব্যয় বাড়িয়া গেলে সমাজে আয় বাড়িয়া যায়, কি পরিমাণ মোট আয় বাড়িবে, তাহা গুণকের উপর নির্ভর করে। বর্ধিত আয়

বর্ধিত হইবার ফলে ভোগব্যয়ের বৃদ্ধির দরুণ উদ্ভূত বিনিয়োগও বাড়িবে, ইহা নির্ভর করিবে ত্বরকের উপর। এই উদ্ভূত বিনিয়োগে বৃদ্ধি গুণকের ফলে পুনরায় আয় বাড়াইবে এবং সেই আয় ব্যয়কে বাড়াইয়া ত্বরণের ফলে পুনরায় বিনিয়োগ বাড়াইবে। উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতায়, উহাদের সম্মিলিত প্রভাবের ফলে বিনিয়োগের বৃদ্ধি মোট আয়, ব্যয় ও কর্মসংস্থান সকল কিছুকেই বাড়াইয়া দিবে। ঋণাত্মক গুণক ও ত্বরণের প্রভাবে বিপরীত পক্ষে, ইহাদের সম্মিলিত ফলে জাতীয় আয় কমাইয়া দিতেও পারে। এই দুই-এর মিলিত ফলকে লিভারেজ্ প্রভাব (Leverage effect) বলে; অর্থাৎ প্রাথমিক বিনিয়োগে বৃদ্ধি এবং উভয়ের মিলিত ফলে মোট আয়ে বৃদ্ধি— এই দুই-এর অনুপা‍‍তিক লিভারেজ্ সহগ (Leverage Coefficient) বলা হয়। অনেকে উভয়ের মি‍লিত প্রভাবকে একত্র করিয়া উহাকে অতিগুণক (Super-multiplier নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

মিলিত ফলাফল

পরিশিষ্ট

উইক্‌সেলের স্বাভাবিক সুদের হার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা (A short note on Wicksell's Natural Rate of Interest):

অষ্ট্রিয়ার ধনবিজ্ঞানী উইক্‌সেল (Knut Wicksell) সুদের বাজার-হার (a loan market rate of interest) এবং উহার 'আসল' বা 'স্বাভাবিক হারের' (a rea or natural rate of interest) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। ঋণের দাম হিসাবে টাকার বাজারে যে সকল বিভিন্ন হারে সুদ দেওয়া হয়, তাহাদের গড় হিসাব করিলে এই ঋণ-হার অথবা বাজার হার পাওয়া যায়। আর 'আসল' বা 'স্বাভাবিক হার' বলিলে তিনি বুঝিয়াছেন: (ক) যে হারে ঋণপুঁজির চাহিদা এবং সঞ্চয়ের যোগান পরস্পর সমান হয়; (২) যে হার মোটামুটিভাবে নূতন উৎপন্ন মূলধনী দ্রব্য হইতে প্রত্যাশিত আয়ের বা প্রতিদানের সমান; (৩) যে হার বজায় থাকিলে দ্রব্যসামগ্রীর দামের সাধারণ স্তরে উঠানামার ঝোঁক থাকে না; (৪) টাকার লেনদেন বিনা আসল মূলধনী দ্রব্যকে উহার নিজস্ব আকৃতিতে ঋণ দিলেও যে হার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত।*

স্বাভাবিক হার অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে

* (1) At which the demand for loan capital and the supply of savings exactly agree; (2) which more or less corresponds to the expected yield of the newly created capital; (3) at which the general level of commodity prices has no tendency to move upward or downward; (4) which would be established if one would not make use of monetary transactions but real capital would be loaned *in natura*.

উইক্‌সেলের মূল বক্তব্য হইল এই যে, সুদের স্বাভাবিক হার হইতে বাজার-হার পৃথক হইলে দেশের অর্থনীতিতে প্রসার বা সংকোচনের গতিবেগ দেখা দিবে। বাজার-হার যতক্ষণ স্বাভাবিক হারের কম, ততক্ষণ নানা কারণে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথমত, সঞ্চয় হ্রাস পায় এবং ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়, এদিকে উদ্যোক্তারা (স্বাভাবিক হার বেশি থাকিলে যে মুনাফা হইতে পারিত উহাপেক্ষা) বিনিয়োগ হইতে অধিক মুনাফা পাইবার প্রত্যাশা করেন। নূতন-সৃষ্ট ব্যাঙ্ক-ঋণের সাহায্যে উদ্যোক্তারা উপকরণের জন্য চাহিদা বাড়াইয়া দেয়, মজুরি ও অন্যান্য উপাদানের দাম বাড়ে, ফলে ভোগদ্রব্যের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঠিক এই সময়ে মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনের উদ্দেশ্যে বেশি দাম দিয়া উপকরণ ক্রয় করা হয় বলিয়া ভোগ্য-দ্রব্যের উৎপাদন কমে। এই সকল কিছুর প্রভাবে দাম বাড়িতে থাকে—যতক্ষণ সুদের বাজার-হার উহার স্বাভাবিক হার অপেক্ষা কম, ততদিন এই ধারা চলিতে থাকে। স্বাভাবিক হার বজায় থাকিলে ঋণপুঁজির চাহিদা ও সঞ্চয়ের যোগান সমান হইত। বাজার হার উহা হইতে কম থাকায় ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের পরিমাণ কেবলমাত্র সমাজের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় দ্বারা ভরান যায় না, স্ফীতিমূলক পদ্ধতিতে (out of inflationary sources) ইহার যোগান বাড়াইতে হয়। এই কারণে দ্রব্যসামগ্রীর দামের সাধারণ স্তর বাড়িতে থাকে। অপর পক্ষে, সুদের স্বাভাবিক হারের তুলনায় উহার বাজার-হারকে কৃত্রিমভাবে বাড়াইয়া রাখিলে সংকোচনের ধারা সুরু হয়, সাধারণ দামস্তর হ্রাস পায়। স্বাভাবিক-হার ও বাজার-হার সমান থাকিলে, অর্থনৈতিক কাঠামো ভারসাম্যে থাকিবে, কেবলমাত্র স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় হইতেই ঋণপুঁজির যোগান হইবে, দামস্তর স্থির থাকিবে এবং টাকার অংকে প্রকাশিত সুদের হার মূলধনী দ্রব্যের প্রান্তিক প্রতিদানের সমান হইবে। এইরূপেই দেশে আর্থিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে (conditions of monetary equlibrium)।

সুদের স্বাভাবিকহার ও বাজার-হারে পার্থক্যই

আর্থিক ভারসাম্য-হীনতার কারণ

ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই বিশ্লেষণের সময় উইক্‌সেল দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান ধরিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ণ কর্মসংস্থানের অনুমান ত্যাগ করিয়া আমরা যদি ধরিয়া লই যে, দেশে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের অব্যবহৃত শ্রম ও উপকরণ আছে, তবে মূলধনী দ্রব্যের প্রসারকালে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন কমাইতে হয় না,

উভয়কে একই সঙ্গে বাড়ান যায়, এমন কি ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেশি রাখাও চলে। এই অবস্থায় দাম বৃদ্ধির ঝোঁক স্থগিত রাখা যায়, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য তো বটেই। ইহার তাৎপর্য হইল যে, দেশে দুইটি স্বাভাবিক সুদের হার আছে। একটিতে দেশের দামস্তর অপরিবর্তিত থাকে, আর অন্যটিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হয়। ইহাদের এই পার্থক্যের কারণ আছে। স্ফীতিমূলক উৎস হইতে কৃত্রিমভাবে সংগৃহীত ঋণপুঁজির যোগান বাড়িবার ফলে সমানহারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণও বাড়িতে পারে। তাহা ছাড়া, বলা চলে যে, ইহা এমন অবস্থা যেখানে সম্ভাব্য বিনিয়োগের (investment potential) তুলনায় সঞ্চয়ের যোগান কম থাকে।

এই তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা কোথায়

উইকসেলের পূর্বের লেখকেরা সুদের হারকে মোটেই টাকা বা অর্থসংক্রান্ত বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, সুদ হইল মূলধন-নিয়োগের ফলে পাওয়া অতিরিক্ত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য, যাহাকে বলে মূলধনের আসল প্রতিদান (real return of capital)।

এই শতাব্দীর শুরুতে উইকসেলের তত্ত্ব প্রচারিত হয়, এবং এই তত্ত্বের গুরুত্বই হইল অর্থ ও মূলধনের তত্ত্বকে একত্রে মেলানো (to integrate the theories of money and capital)। কেইন্‌স আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন এবং সুদের হার নিরূপণে একমাত্র আর্থিক কারণ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। কেইন্‌সের মতে "সুদের হার এক ধরণের 'দাম' নয় যাহাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে উপকরণের চাহিদার সঙ্গে বর্তমানের ভোগ হইতে বিরত থাকার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা এমন ধরনের 'দাম' যাহা নগদ টাকার রূপে সম্পদ ধরিয়া রাখার ইচ্ছার সঙ্গে নগদ টাকার পরিমাণে সমতা আনে···সুদের হার হইল তারল্য ছাড়িয়া দেওয়ার পুরস্কার।"*

উইক্‌সেল ও কেইনস্

* "The rate of interest is not the 'price' which brings into equilibrium the demand for resources to invest with the readiness to abstain from present consumption. It is the 'price' which equilibrates the desire to hold wealth in the form of cash with the available quantity of cash ..The rate of interest is the reward for parting with liquidity." Keynes, *General Theory*, P 167. তিনি আরও বলিতেছেন যে, "The theory of interest might be expressed by saying that the rate of interest serves to equate the demand and supply of hoards—*i.e* it must be sufficiently high to offset an increased propensity to hoard relatively to the supply of idle balances." Keynes, *Economic Journal*, vol XLVII (1937) P.250.

অনুশীলনী

1. 'Classical theory tended to explain unemployment as either Frictional or Voluntary.' Explain.

2 "The classical postulates do not admit of the possibility of the third category, which I shall define below as 'involuntary' unemployment." (Keynes : *General theory*. P. 6). Explain.

3. What is Effective Demand ? Why is it unstable ?

4. Discuss the determinants of the level of income and Employment.
5. Explain the Income equation Y = C + I
6. Discuss the consumption function and illustrate it graphically.

7. What is Propensity to Consume ? Distinguish between Average and Marginal Propensity to Consume and show the importance of such distinction in the theory of Income and Output.

8. "The fundamental psychological law, upon which we are entitled to depend with great confidence both *a priori* from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience, is that men are disposed, as a rule and on the average, to increase their consumption as their income increases, but not by as much as the increase in their income " (Keynes *General theory*, P. 96) Explain.

9. Compare Classical theory and Keynesian theory as to their attitudes towards the process of equalisation of Saving and Investment.

10. If Saving equals Investment at a given income level, how can an increase in investment be financed ?

11. Explain why S = I.
12. Distinguish between savings *ex ante* and saving *ex post*
13 Define Knut Wicksell's 'real,' or natural rate of interest '
14. "It was Wicksell's contention that any deviation of the market rate of interest from the natural rate would cause a cumulative process of expansion or contraction." Explain.

15. "An equilibrium level of income is only possible if planned saving equals planned investment." Critically examine the statement.

16. Discuss the subjective and objective factors determining the propensity to consume.

17. Distinguish between Autonomous and Induced Investment. Why such distinction is important ?

18. Discuss the factors determining the volume of Investment in an economy at a particular Income level.
19. Explain the determinants of the I Function.

20. Define Marginal Efficiency of capital. Why this concept is useful in Income theory ?
21 Discuss the inter-relationship between Rate of Interest, Saving and Investment.

21. Discuss the importance of the shape of Liquidity demand curve.
23. Distinguish between "Hoarding" and "Saving," and show the importance of such distinction in the theory of Income and Employment.
24. Explain the motives to Liquidity-Preference

25. Define the so-called "multiplier." Compare it with the income-velocity of circulation of money.

26. Explain how an increase in investment will change the level of national income. Why is the marginal propensity to consume important in this process ?
27. Explain the Acceleration Principle.
28. Discuss the interactions of Multiplier and Acceleration.

১১

আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানামা ঃ বাণিজ্য চক্র

Fluctuations in Income and Employment : the Trade Cycle

পৃথিবীর যে সকল দেশ শিল্পবিপ্লবের ফলে পুরাণো সামন্ততান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা হইতে ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণ করে তাহাদের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির প্রধান রূপ হইল দ্রুত মূলধন-সঞ্চয় (Rapid Capital Accumulation) এবং উৎপাদন ধারায় ক্রমাগত মূলধন নিয়োগের অনুপাত বাড়াইয়া দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি। ঊনবিংশ শতাব্দীর সুরু হইতে সেই সকল ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির এই ধারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, এই সকল দেশে সুদীর্ঘকালীন ক্রমপ্রসার (Secular Expansion) ঘটিলেও স্বল্পকালে আয়স্তর, দামস্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান প্রভৃতিতে নিয়মিত-ভাবে, প্রায় নির্দিষ্টকাল অন্তর, তীব্র উঠানামা হয়।* ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জোয়ারের পরেই ব্যবসায় বাণিজ্যের সংকটের ভাঁটা দেখা দেয়। সমৃদ্ধির যুগে আয়স্তর, দামস্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সকলই অধিক, ব্যবসায়জগৎ আশায় উদ্বেল ; তাহার পরেই সংকটের যুগে আয়স্তর, দামস্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

সুদীর্ঘকালীন ক্রমপ্রসার কিন্তু আয়স্তর ও কর্মসংস্থানে স্বল্পকালীন উঠানামা

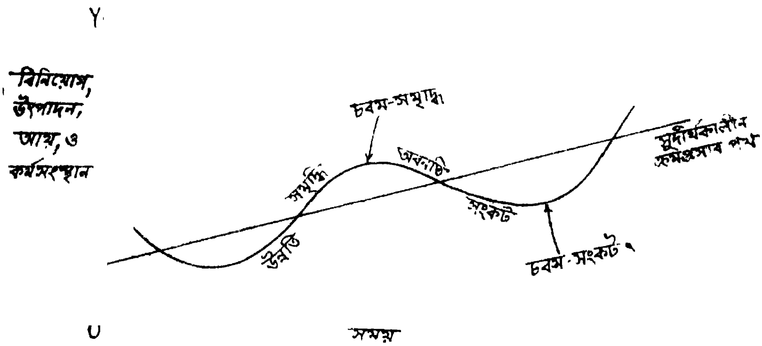
---

* ঢেউ-এর মত এই উঠানামা বা চক্র সাধারণতঃ তিন প্রকারের দেখা গিয়াছে : (ক) দীর্ঘ ঢেউ অথবা কনড্রাতিয়েফ চক্র : ৫০ হইতে ৬০ বছরের মধ্যে ব্যবসায়বাণিজ্যের উঠানামা — এইরূপ দুইটি চক্রের আলোচনা হইয়াছে (১৭৮৫ ১৮১৪ ; ১৮১৪-১৮৯৬,) ; তৃতীয়টি বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শুরু হইয়াছে, তাহার আলোচনা চলিতেছে। শুম্পিটারের মতে, প্রথম চক্রের কারণ হইল শিল্পবিপ্লবের নূতন আবিষ্কার : দ্বিতীয় চক্রের কারণ হইল বাষ্প ও ইস্পাত প্রচলন, তৃতীয় চক্রের কারণ বিদ্যুৎ, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতির ব্যবহার। বর্তমানে পারমাণবিক শক্তির দ্বারা যন্ত্র চালনা ও অ্যাটমের ব্যবহার নূতন চক্রের অবতারণা করিতেছে। (খ) স্বল্পকালীন ঢেউ অথবা জাগলার চক্র : ৮ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে এইরূপ উঠানামাকেই বাণিজ্য-চক্র বলা হয়। (গ) স্বল্পতর ঢেউ বা অত্যল্পকালীন ঢেউ অথবা কিচিন্ চক্র : প্রত্যেক জাগলার বাণিজ্য চক্রের মধ্যে তিনটি ছোট ছোট চক্র দেখা যায়, প্রত্যেকটির স্থায়িত্ব মোটামুটি ৪০ মাস। ইহা ব্যতীত আমেরিকার ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেষ করিয়া আমেরিকায়, ১৮—২০ বৎসর লইয়া গৃহনির্মাণশিল্পের চক্র লক্ষ্য করিয়াছেন।

খুবই কম, ব্যবসায়জগৎ নিরাশায় আচ্ছন্ন। অর্থনৈতিক কাজকর্মে এইরূপ উঠানামাকে বাণিজ্য চক্র (Trade Cycle) বলা হয়।*

সাধারণভাবে বাণিজ্যচক্রকে উর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি (Upswing and downswing) এই দুই দিকে ভাগ করা হয়। উঠার দিকে বা তেজীর দিকে দুইটি স্তর : উন্নতি (Recovery) ও সমৃদ্ধি (Prosperity) ; নামার দিকে বা মন্দার দিকে দুইটি স্তর : অবনতি (Recession) ও সংকট (crisis)। উঠার দিকে সর্বাধিক সমৃদ্ধির বিন্দু হইল চরম সমৃদ্ধি (Boom) ; নামার দিকে সর্বাধিক সংকটের বিন্দু হইল চরম-সংকট (Slump)। নিচের চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

চক্রের বিভিন্ন স্তর



আয়স্তর ও কর্মসংস্থানের ঢেউ-এর এইরূপ উঠানামাকে 'চক্র' বলা হয় কারণ, এক দিকের অতিরিক্ত গতি অপরদিকের অতিরিক্ত গতি সৃষ্টি করে, একদিকের প্রাবল্য ও আতিশয্য শুধু নিজের অবস্থার সংশোধন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, অপরদিকের প্রাবল্য ও আতিশয্য সৃষ্টি করে। ঘড়ির দোলকের ন্যায় কোনদিকের গতিই আপনা-আপনি অন্য দিকে যাইবার বেগ সৃষ্টি করে ; সমৃদ্ধির মধ্যেই সংকটের বীজ উপ্ত থাকে, আবার সংকটই সমৃদ্ধির দিকে উন্নতির পথ প্রশস্ত

ইহাকে চক্র কেন বলা হয়

* "What we have to study,...is not fluctuation as such, but fluctuation about a rising trend. Historically, the cycle began to appear, with the Industrial Revolution—just at the stage, that is, when expansion in the social output became a leading characteristic of the economic system. The cycles which have been experienced have all of them taken place against a background of secular expansion." Hicks, *Trade Cycle* P. 8.

করে। ইহাকে চক্র বলার আরও কারণ হইল, এই উঠা-নামা ঘটে নিয়মিত ভাবে (Regularity), এবং ইহার কিছুটা নির্দিষ্ট কালব্যবধান (Periodicity) দেখা যায় ; 7 হইতে 10 বৎসরের মধ্যে মোটামুটি একটি চক্রের গতিধারা প্রবাহিত হয়।*

বাণিজ্য চক্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রথম হইল যে, সকল শিল্পে ও ব্যবসায়ে উন্নতি বা অবনতি মোটামুটি একই সময়ে আসে। কোন বিশেষ শিল্পের উন্নতি অন্য শিল্পের উন্নতির সহায়ক ; কোন বিশেষ শিল্পের অবনতি অন্য শিল্পের অবনতি ডাকিয়া আনে ; ইহারা তাই একত্র-সংক্রামক (Synchronic)। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যচক্রগুলি মোটামুটি আন্তর্জাতিক প্রকৃতির। আমদানি রপ্তানির উপর দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির প্রভাব যত বেশি, ততই অন্য দেশের উন্নতি বা অবনতি (বৈদেশিক-বাণিজ্যের গুণক স্বরূপের পরিমাপে) দেশীয় শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি বা অবনতি সৃষ্টি করিবার সুযোগ পায়। তৃতীয়ত, বাণিজ্য চক্রের প্রভাব সকল শিল্পেই অনুভূত হয় বটে, কিন্তু এই উঠানামা সকল শিল্পে সমান হারে দেখা যায় না। ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে এই উঠানামা তীব্রতর হইয়া থাকে (ত্বরণ-প্রভাবের দরুণ)। চতুর্থত, সকল বাণিজ্যচক্র একই প্রকারের হইলেও প্রত্যেকটি চক্র অন্য চক্র হইতে কিছুটা পৃথক, প্রত্যেকটি চক্রেরই নিজস্ব রূপ বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পিগু তাই বলিয়াছেন যে, ইহারা একই পরিবারের সন্তান হইলেও ইহাদের মধ্যে যমজ দেখা যায় না।

বাণিজ্যচক্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ
(১) একত্র-সংক্রামক
(২) আন্তর্জাতিক
(৩) মূলধনী শিল্পে প্রভাব তীব্রতর
(৪) প্রত্যেক চক্রের নিজস্ব রূপ

বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন স্তরসমূহ (Different Phases of a Trade cycle) :

উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং অবনতি ও সংকট—এই চারিটি স্তর লইয়া একটি বাণিজ্য চক্র গঠিত, ইহাদের প্রত্যেক স্তরেরই নিজস্ব রূপ ও বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়।

* "By a *cyclical* movement we mean that as the system progresses in the upward direction, the forces propelling it upwards at first gather force and have a cumulative effect on one another but gradually lose their strength until at a certain point they tend to be replaced by forces operating in the opposite direction ; which in turn gather force for a time and accentuate one another until they too, having reached their maximum development, wane and give place to their opposite." Keynes, *General Theory* P. 314.

(ক) উন্নতি (Revial or Recovery)

সংকটের কাল অতিবাহিত হইলে দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা ক্রমশ বাড়িতে সুরু করে, বিশেষ করিয়া যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণের জন্য বা অকেজো যন্ত্রপাতি বাদ দিয়া নূতন যন্ত্রপাতি সংস্থাপনের জন্য তাগিদ দেখা দেয়। সেই সময় হইতে উন্নতির সুরু। দেশে প্রচুর বেকার, মজুরির হার কম, উদ্যোক্তা ও ব্যাঙ্কগুলির হাতে বিনিয়োগ-যোগ্য টাকার অভাব নাই। এই পরিবেশই উন্নতির সহায়ক। কিছুকাল ধরিয়া ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় ও ভোগের উদ্দেশ্যে দরকারী জিনিসপত্র কেনে নাই। কিন্তু স্থায়ী ও অর্ধস্থায়ী দ্রব্যসামগ্রী (durable and semi durable goods) বদলান দরকার, আর উহাদের না কিনিলে চলে না। ফলে এইরূপ দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা সুরু হয়, বিক্রেতাদের নিকট হইতে উৎপাদকগণ অর্ডার পাইতে সুরু করে। শিল্পের উদ্যোক্তা উৎপাদন সুরু করিবার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে কম সুদে ঋণ পাইতে থাকে ; অধিক কাঁচামাল ক্রয় করে ও নূতন শ্রমিকদের কর্মে নিয়োগ করিতে থাকে। ইহাদের হাতে আয় সৃষ্টি হওয়ায় তাহা ব্যয়ের ফলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ক্রমেই বাড়িতে থাকে ; গুণক ও ত্বরণের নীতি কার্যকরী হইতে থাকে। একে অন্যের ঘাত প্রতিঘাতে আগাইয়া চলে (cumulative expansion process), বিনিয়োগের বৃদ্ধি আয় ও কর্মসংস্থানকে ক্রমে বাড়াইয়া দিতে থাকে, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা অধিক থাকে। মুনাফা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, মুনাফার আশা অপেক্ষাকৃত দ্রুত বাড়ে। যদিও সকল দ্রব্যের দাম সমান হারে বাড়ে না, তাহা হইলেও সাধারণভাবে দামস্তর বাড়িতে থাকে, ব্যবসায় সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

পরস্পর সংশ্লিষ্ট বৃদ্ধির ঘূর্ণাবর্তন বা আয় ও বিনিয়োগে উদ্‌ঘূর্ণমান বৃদ্ধি

(খ) সমৃদ্ধি (Prosperity) : বিনিয়োগ ও আয়বৃদ্ধির এই ধারা অগ্রসর হইয়া অর্থ নৈতিক দেহে সমৃদ্ধির সঞ্চার করে। কাঁচামালের দাম ও সুদের হার বাড়িলেও মজুরির হার পিছনে পড়িয়া থাকে ; সংকটকালীন শক্তিগুলি চলিতে থাকায় স্থির ব্যয় ততটা বাড়িতে পারে না। তাই দামস্তর বাড়িলেও উৎপাদন ব্যয় সেই হারে বাড়ে না, মুনাফা অধিক হয়—আশার প্রাবল্যে উদ্যোক্তাদের মনে ভবিষ্যৎ মুনাফার হার আরও বেশি থাকে ; উৎপাদনের পরিমাণ, উপাদান নিয়োগের পরিমাণ, আয় ব্যয় সকল কিছুর বৃদ্ধি পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়া দামস্তর বাড়াইতে থাকে। সমগ্র ব্যবসায়ী সমাজে এক অস্বাভাবিক

ঘূর্ণাবর্তনের অতিবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির শীর্ষবিন্দু

অস্থিরতা ও চাপল্য শুরু হয়, যে কোন ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করাটাই উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য থাকে। দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য ও শেয়ারের মূল্য দ্রুত বাড়িতে থাকে। ইহার ফলে দ্রব্যের বাজারে বা শেয়ারের বাজারে ফাট্‌কা শুরু হয়, ফলে দাম ও মুনাফার বৃদ্ধি স্বাভাবিকতার সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যায়।

সমৃদ্ধির মধ্যেই আগামী সংকটের বীজ অংকুরিত হইতে থাকে : কাঁচামাল ও উপকরণসমূহের জন্য চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়, ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা কমিয়া আসায় ব্যাঙ্কসমূহ ঋণের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হয়, সুদের হার বাড়ে। উৎপাদন-ব্যয়ে বৃদ্ধি, সুদের হারে বৃদ্ধি এবং দ্রব্যসামগ্রীর অধিক উৎপাদন সকল কিছু মিলিয়া মুনাফার হার কমাইয়া দেয়, দামবৃদ্ধির তুলনায় গরীব জনসাধারণের আয় না বাড়ায় ক্রয়ক্ষমতাও সংকুচিত হইয়া আসে, এবং এইরূপে অবনতির পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে।

(গ) অবনতি (Recession) :

চরম সমৃদ্ধির যুগে হঠাৎ আশাভঙ্গের ফলে ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ কমাইয়া দেয়, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে (a sudden collapse in the marginal efficiency of capital), চরমসমৃদ্ধির বুদ্‌বুদ ফাটিয়া গিয়া ব্যবসায়ে হঠাৎ তীব্র অবনতি দেখা দেয়। বিক্রেতাগণ অর্ডার দেন না, উদ্যোক্তা উৎপাদন করে না, ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য ঋণদাতাগণ ঋণপরিশোধের জন্য চাপ দিতে থাকে। উদ্যোক্তাগণ ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না, কারণ দ্রব্য অবিক্রীত থাকে। সমাজে এমনই ভয়ের আবহাওয়া দেখা যায় যে আমানতকারীরা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইতে চাহে কিন্তু নগদ পরিশোধ করিতে না পারায় ব্যাঙ্কে "দৌড়" (run) হইতে থাকে, জনসাধারণের সঞ্চয়ের সর্বনাশ করিয়া ব্যাঙ্ক সমূহ ফেল পড়িতে বাধ্য হয়।*

পারম্পরিকভাবে সংশ্লিষ্ট হ্রাসের পুনরাবর্তন
বা
আয় ও কর্মসংস্থানে অধোঘূর্ণমান হ্রাস

(ঘ) সংকট (Depression or Crisis)

এইরূপে অর্থনৈতিক সংকট সকল শিল্প বা ব্যবসায়কে আচ্ছন্ন করে, দেশের বিনিয়োগ আয়স্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ ভীষণ কমিয়া যায়

* "prosperity ultimately brings on conditions which start a liquidation of the huge credits which it has piled up. And in this course of liquidation, prosperity merges into crisis." Mitchel.

(ঋণাত্মক গুণক ও ঋণাত্মক ত্বরণের ফলে)। দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্যের মধ্যে ভয়াবহ দারিদ্র্য দেখা দেয়, দামস্তর কম থাকিলেও দ্রব্য বিক্রয় করা সম্ভব হয় না : কারণ লোকের হাতে ক্রয় করিবার মত আয় থাকে না। ঋণের ভিত্তিতে গঠিত ব্যবসায়ী সমাজ ঝাঁকুনি খাইতে থাকে, অনেকের "সম্পত্তি" (assets) মূল্যহীন হইয়া পড়ে, বহু দুর্বল প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যায়। অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রচুর পরিবর্তন আসে, পুরাতন উদ্যোক্তারা ব্যবসায় ছাড়িয়া দেয়, বহু উদ্যোক্তা দেউলিয়া ঘোষিত হয়। কিছুকাল পরে ব্যাংকসমূহ ক্রমে পুনরায় সুস্থ হইয়া উঠে, ধীরে ধীরে পুনরায় উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মজুত ফুরাইয়া যায়, যন্ত্রপাতিসমূহ অকেজো হইয়া পড়ে, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ অনুভব করা যায় না। যন্ত্রপাতির স্থায়িত্বকাল ও ভোগদ্রব্য মজুতের খরচার উপর সংকটকাল নির্ভর করে। ক্রমে উন্নতি সুরু হইবার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়।*

ঘূর্ণাবর্তনের গতিরোধ, সংকটের নিম্নবিন্দু

বাণিজ্যচক্র কেন ঘটে (Causes or Models of Trade Cycles)

ক্লাসিকাল যুগ হইতে সুরু করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত কোন ধনবিজ্ঞানী বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য কোন তত্ত্ব বা মডেল গঠন করিতে পারেন নাই। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে নিয়মিত এইরূপ ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটে কেন, তাহা লইয়া এখনও পর্যন্ত আলোচনা চলিতেছে। অনেকে বহু বাহ্য বিষয়ের উপর জোর দিয়া আলোচনা করিয়াছেন ; আবহাওয়া, যুদ্ধবিগ্রহ এবং বড় কোন কিছুর আবিষ্কার, ইহার কোনটিই বাদ যায় নাই। এইগুলির দ্বারা ভারসাম্যের বিচ্যুতি এবং পরবর্তীকালীন সামঞ্জস্য অনেকক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা চলে বটে, কিন্তু ঢেউ-এর স্বতস্বয়ংগতিসম্পন্ন এই উঠানামার রূপ ফুটাইয়া তোলা যায় না। বিচ্যুতির কারণ হিসাবে ইহাদের গণ্য করিলে সমাধান খুবই সহজ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কেন এই বিচ্যুতি ঘটিলেও অর্থনৈতিক দেহে স্বয়ংশোধনশীল শক্তিগুলি দেখা দেয় ; নিয়মিতভাবে, নির্দিষ্ট কাল-ব্যবধানে এবং

বাহ্যকারণগুলি অসম্পূর্ণ

* "The explanation of the *time element* in the trade cycle, of the fact that an interval of time of a particular order of magnitude must usually elapse before recovery begins, is to be sought in the influences which govern the recovery of the marginal efficiency of capital. There are reasons given firstly by the length of life of durable assets in relation to the normal rate of growth in a given epoch, and secondly by the carrying costs surplus stocks". Keynes. *General theory*, P 317.

কেবলমাত্র ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতেই এই উঠানামা ঘটে তাহার পূর্ণ ব্যাখ্যা ইহাদের দ্বারা পাওয়া যায় না। তাই মনে করা হয় যে, দোলন্ত চেয়ার ও পেণ্ডুলামের মত (rocking chair and the pendulum) এই দোলনের কারণ আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর অভ্যন্তরেই নিহিত আছে। বহিরাগত কোন শক্তি ধাক্কা দিলে এই দেহ উহা আত্মস্থ করিয়া লয়, অনিয়মিত এই চাপ সে নিজের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলে। সকল তত্ত্ব বা বাণিজ্যচক্রের সকল মডেল আমরা আলোচনা করিব না ; ... (Real), মনস্তাত্ত্বিক (Psychological), আর্থিক (Monetary) এবং সঞ্চয়-বিনিয়োগ (Saving Investment)—এই কয়টি মাত্র আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে। আসল কারণ বলিলে বোঝা যায়, শিল্পোৎপাদনের অবস্থায় প্রকৃত পরিবর্তন, যেমন নূতন কোন উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ বা ক্রেতাদের রুচিতে পরিবর্তন। মনস্তাত্ত্বিক কারণ হইল বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে লোকের মনে ধারণার পরিবর্তন। আর্থিক কারণের মধ্যে আছে টাকার যোগান বা দামে (অর্থাৎ সুদের হারে) পরিবর্তন। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কারণাবলী লইয়াই আজকালকার মডেলগুলি গঠিত হইতেছে।

আমরা কয়েকটি মডেল আলোচনা করিব

স্যুমপিটারের নূতন-প্রচলন তত্ত্ব (Schumpeter's Theory of Innovation)

অধ্যাপক স্যুটপিটারের মতে, বাণিজ্যচক্রের কারণ নূতন প্রচলন, যন্ত্র-কৌশলের কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। স্থিতিশীল সমাজে উৎপাদন পদ্ধতি বা অন্য কোন শক্তির পরিবর্তন ঘটে না, বাণিজ্যচক্রও দেখা দেয় না। কিন্তু অর্থনৈতিক দেহ গতিশীল ; উদ্যোক্তাদের কাজকর্ম এই কাঠামোতে সর্বদা পরিবর্তন সঞ্চারিত করিতেছে। তাহাদের কাজই হইল নূতন উৎপাদনপদ্ধতি যন্ত্রপাতি, দ্রব্য, বাজার খুঁজিয়া বাহির করা। সমাজের স্থিতিশীল ভারসাম্য ছাপাইয়া এই নূতন প্রচলন নিজের প্রভাব বিস্তার করে। এই নূতন প্রচলনের ফলে সমাজ পুরানো উৎপাদন-কাঠামো হইতে নূতন স্তরে উন্নীত হয়, মূলধনের চাহিদা বাড়ে। ইহার দরুণ যে গতির সঞ্চার হয়, তাহারই মধ্যে সেই গতির বিরোধী শক্তি কাজ করিতে থাকে। কালক্রমে এই নূতন-প্রচলনের ফলে ভোগ্যদ্রব্যের যোগান বাড়ে, উহার দাম কমে। কিন্তু উপকরণের চাহিদা বাড়ে বলিয়া

নূতন প্রচলন সমাজে গতিশীলতা আনে

উহাদের দাম বাড়িতে থাকে, মুনাফা হ্রাস পায়, অধিকতর প্রসারের ইচ্ছা কমিয়া যায়। উদ্যোক্তারা নিজেদের কাজের পরিধি সংকুচিত করে; ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করা হয়; স্যুমপিটারের ভাষায় বলা চলে যে 'আত্ম-সংকোচন' (Auto-deflation) ঘটে।

স্যুমপিটারের মতে বাণিজ্য চক্র এই নূতন-প্রচলনেরই ফল। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে "If there be a purely economic cycle at all, it can only come from the way in which new things are, in the institutional conditions of capitalist society, inserted into the economic process and absorbed by it." নূতন প্রচলন প্রবর্তনকালে প্রসার ঘটে, আবার এই প্রবর্তন শেষ হইলে সংকোচন দেখা দেয়। আবিষ্কার (inventions) ও নূতন-প্রচলনের (innovations) মধ্যে পার্থক্য আছে। আবিষ্কারের ধারা অবিচ্ছিন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু নূতন প্রচলন ঘটে আকস্মিক-ভাবে, কারণ ইহা নির্ভর করে উদ্যোক্তাদের উৎসাহের উপর। কোন একজন উদ্যোক্তা নেতৃত্ব লইলে অপর সকলে তাহাকে অনুসরণ করে—এই কারণেই অনেক দিকে অনেক পরিমাণে নূতন-প্রচলন একসঙ্গে ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়া থাকে (innovations come in bunches)। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক অগ্রগতি মসৃণ ও অচঞ্চল রেখায় অগ্রসর হয় না, আকস্মিক কতকগুলি ঝাঁকুনি ও কাঁপুনির মধ্য দিয়া তরঙ্গভঙ্গীতে চলে।

মনে কর, কোন একটি দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান, বেকারি নাই, এই অবস্থায় কোন উদ্যোক্তা কোন বিষয়ে নূতন-প্রচলন সুরু করিল। ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে ঋণ লইয়া এই বিনিয়োগ ঘটিতে থাকে, আরও

উন্নতি ও সমৃদ্ধি

অনেক উদ্যোক্তা ইহার অনুসরণ করে, মুনাফার লোভে সকলে মিলিয়া বিনিয়োগ বাড়াইয়া দেয়। এই পরিবর্তনের সম্মুখে অনেক পুরানো ফার্ম উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এক দিকের উন্নতি দ্বিতীয় স্তরের উন্নতি ঘটায় (secondary waves)। এই দ্বিতীয় তরঙ্গ দেশের সমগ্র ব্যবসায় জগতে পরিব্যাপ্ত হয়।

এই নূতন-প্রচলনের উপযোগী যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ি প্রভৃতি তৈয়ার হওয়া পর্যন্ত প্রসারকাল চলিতে থাকে, তাহার পরে অবনতি দেখা দেয়, সমৃদ্ধির

কারণ নিজেকে নিঃশেষ করিলে অবনতির শুরু। নূতন-প্রচলনের চাপ সমাজদেহ আত্মস্থ করিয়া লয়, এই নূতন অবস্থার সঙ্গে সে নিজের গতির সামঞ্জস্য আনে। অনেক পুরানো ফার্ম এই পরিবর্তনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে না, ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ হয় না, ঋণ-সংকোচন শুরু হয় (credit deflation)।

অবনতি ও কংকট

অবনতি-কালের মধ্যে সমাজ এই পরিবর্তন মানিয়া লইয়া নূতন ভারসাম্যের আশেপাশে ("neighbourhood of equilibrium") পৌঁছে, অবনতি-কালের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে এই সামঞ্জস্য সাধনে কিরূপ সময় লয় তাহার উপর (length of depression depends on the length of the period necessary for adaptation)। গতিশীল ও অগ্রসরমান সমাজ বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগতির সঙ্গে যেভাবে খাপ খাওয়াইয়া লয়, তাহাই বাণিজ্যচক্রের রূপ গ্রহণ করে, ইহাই স্যুমপিটারের অভিমত।

এই তত্ত্বকে বহুভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, আধুনিক সমাজে যৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রসারের ফলে উদ্যোক্তার রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বে অর্থনীতি অপেক্ষা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবল। তৃতীয়ত, উদ্যোক্তার উপর এতটা গুরুত্ব দেওয়ায় শিল্পোন্নয়নের কাঠামো অনেকখানি

এই তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা

অবৈজ্ঞানিক এবং ব্যক্তি ভিত্তিক হইয়া উঠে (strong personal element)। সর্বোপরি, স্যুমপিটার অন্যান্য বহু বিষয়কে তত্ত্বের মধ্যে আনেন নাই, যেমন গুণক, ত্বরণ, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা, সামগ্রিক ব্যয় ও কার্যকরী চাহিদার স্তর প্রভৃতি। একমাত্র নূতন-প্রচলনের ধারার সাহায্যে বাণিজ্যচক্রের পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় না।

মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব (Psychological theory)

অধ্যাপক পিগু (Pigou) এবং তাঁহার অনুগামীগণ বলেন যে, সমাজের কোন 'আসল' কারণের (real cause) ফলে বাণিজ্যচক্র দেখা দেয় না; ইহার

আসল নয় মনস্তাত্ত্বিক

মূল কারণ হইল মনস্তাত্ত্বিক। বাস্তব অবস্থাতে কোন কিছু পরিবর্তনকে বলা হয় 'আসল' কারণ, আর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে লোকের মনে ধারণার পরিবর্তনকে বলা চলে 'মনস্তাত্ত্বিক' কারণ। বাস্তব অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন না আসিলেও মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলিতে পরিবর্তন আসিতে পারে। অধ্যাপক পিগুর মতে, বাণিজ্যচক্রের পিছনে

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবই প্রধান, কারণ অর্থনৈতিক কাজকর্মে প্রত্যাশার ভূমিকা (role of expectation) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যাহা ঘটিয়াছে এইরূপ ঘটনার তুলনায় যাহা ঘটিতে পারে তাহাদের প্রাধান্যই বেশি, ইহারাই মানুষকে কাজে প্রেরণা দেয়।

পিগুর মতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক বিচারের অভাব, অর্থাৎ সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করিতে না পারার মধ্যেই বাণিজ্যচক্রের কারণ লুকানো আছে। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে "expected facts are substituted for accomplished facts as the impulse to action. This brings into play variations in the tone of mind of persons whose action controls industry, emerging in errors of undue optimism or undue pessimism in their business forecasts". বর্তমান শিল্প-জগতের দুইটি বৈশিষ্ট্যের দরুন ভবিষ্যদ্বাণীর এই ত্রুটি দেখা দেয়, (ক) ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ধারা দীর্ঘ ও চক্রাকৃতি (round-about process), ও (খ) উৎপাদন কাঠামোর ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন, যেখানে কয়েকজন ব্যক্তি সমাজের দ্রব্যসামগ্রীর অভাব মিটাইতে নিযুক্ত, অর্থাৎ কোনরূপ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা না থাকা। চক্রাকৃতি উৎপাদন-ধারার দরুন উৎপাদন শুরু করার সিদ্ধান্ত এবং উৎপন্ন দ্রব্য বাহির হওয়ার মধ্যে বেশ কিছুকাল সময়ের ব্যবধান থাকে। ভবিষ্যৎ চাহিদা সম্পর্কে প্রত্যাশার ভিত্তিতেই বর্তমানে উৎপাদন শুরু হয়। সময়ের ব্যবধান যত বেশি থাকে ভুলের সম্ভাবনাও তত বাড়ে, অসামঞ্জস্যের গভীরতাও তত বেশি। মূলধনী দ্রব্যে সময়ের এই ব্যবধান বেশি বলিয়া প্রত্যাশার উঠানামাও বেশি, সমাজ যত গতিশীল, উহার মধ্যে সামঞ্জস্য হইতে বিচ্যুতির সম্ভাবনা তত প্রখর। এই কারণে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্যচক্রের তীব্রতা অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক।

আশা ও নিরাশার প্রাবল্য দেখা দেয় কেন

ভবিষ্যদ্বাণীর এই ত্রুটিবিচ্যুতির আরও অনেক কারণ আছে। অত্যন্ত জটিল এই শিল্পপ্রধান অর্থনৈতিক কাঠামোতে ক্রেতাদের পছন্দ সর্বদা পরিবর্তনশীল, আর তাহা ছাড়া, উৎপাদকেরা বহু দূরের বাজারে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন করে। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল প্রকৃতির মধ্যেই ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর সম্ভাবনা নিহিত, কারণ এই অবস্থায় মোট উৎপাদন হইল বহু সংখ্যক 'স্বাধীন' উৎপাদকের অপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের কার্যফল,

প্রত্যেকেই আশা করে যে অপরের তুলনায় বাজারের বেশি অংশ সে হস্তগত করিবে। দেশে যখন আর্থিক আয় বাড়িতেছে কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের যোগান ততটা বাড়ে নাই, ফলে দাম বাড়িতেছে—এই অবস্থাতেই আশাধিক্যের ভুল ঘটে (errors of over-optimism)। দাম যতদিন বাড়িতেছে, ততদিন ব্যবসায়ীদের মনে উহা বৃদ্ধির প্রত্যাশা প্রবলতর হইতেছে। ফাট্‌কাদারদের কাজের দরুণ প্রসারের ধারা মাত্রাতিরিক্ত অগ্রসর হইতেছে। এই গতির পূর্ণতাকাল (gestation period) শেষ হইলে বাজারে ভোগদ্রব্যের যোগানে আধিক্য দেখা দেয়, চাহিদার তুলনায় বর্তমান দামে বিক্রয়যোগ্য জিনিসের পরিমাণ বেশি হওয়ায় ব্যবসায়ীদের মুনাফার প্রত্যাশা তীব্র আঘাত পায়। অবনতির সময়ে ফাট্‌কদারদের কার্যকলাপ এই অবনতির তীব্রতা বাড়াইয়া তোলে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আশা ও নিরাশা উভয়ই সংক্রামক, তাই এক ব্যবসায়ীর মানসিক প্রবণতা অন্য ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হইতে থাকে, ঢেউ-এর মত ইহাদের উঠানামা এবং দলবদ্ধ জনতার মতামত—এই সকল মিলিয়া বাণিজ্যচক্র সৃষ্টি করে।

কখন ও কিরূপে ইহা ঘটে

বিশুদ্ধ আর্থিক তত্ত্ব (Purly monetary theory of the Trade cycle)

টাকার আচরণ বা প্রকৃতির মধ্যেই বাণিজ্যচক্রের বীজ নিহিত আছে, এইরূপ ধারণা এককালে অনেক ধনবিজ্ঞানীর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইত। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হট্রে (Hawtrey), তিনিই প্রথমে কেবলমাত্র আর্থিক কারণের উপর ভিত্তি করিয়া এইরূপ বাণিজ্যচক্রের তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন।

তাঁহার মতে বাণিজ্যচক্রের প্রকৃতি হইল দেশের কার্যকরী চাহিদায় উঠানামা। আধুনিক সমাজে চাহিদা বলিলে বোঝা যায় টাকার সাহায্যে জিনিসপত্র কেনার ইচ্ছা, টাকার জন্য চাহিদাই প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী চাহিদার রূপ লয়। দেশের লোকেরা কত টাকা খরচ করিতে রাজি আছে, তাহাই দ্রব্যসামগ্রীর জন্য কার্যকরী চাহিদা। ক্রেতাদের হাতে আর্থিক আয় বাড়িলে এই কার্যকরী চাহিদা বাড়ে, কারণ তাহারা তখন বেশি টাকা খরচ করিতে

রাজি থাকে। ভারসাম্যের অবস্থায়, ক্রেতাদের ব্যয় তাহাদের আয়ের সমান।

টাকার গতিস্রোতে উঠানামাই বাণিজ্যচক্র

বাস্তব জগতে অবশ্য এই ভারসাম্য বজায় থাকে না, ক্রেতাদের হাতে হয় বেশি টাকা অথবা কম টাকা আসিয়া পড়ে। এই টাকা ক্রেতারা পায় দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থার মাধ্যমে, ব্যাঙ্কগুলি ঋণপ্রসারের সাহায্যে লোকের হাতে টাকা ঢালিয়া দেয়, অথবা ঋণসংকোচন করিয়া টাকা ছাঁকিয়া তুলিয়া লয়। এই মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচনের নিয়মিত আসা-যাওয়াই বাণিজ্যচক্রের বহিঃপ্রকাশ, ইহা সম্পূর্ণ-অর্থসংক্রান্ত ঘটনা (**'purely a monetary phenomenon'**)।

যদিও দেশের ব্যাঙ্কিংব্যবস্থা বাণিজ্যচক্রের জন্য মূলত দায়ী, তবুও এই পতন-অভ্যুদয়ের সূত্রধার হইল দেশের ব্যবসায়ীরা। তাহারা যখন দ্রব্যসামগ্রীর মজুত বাড়াইতে চায়, তখন ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের জন্য চাপ দেয়। ব্যাঙ্কের হাতে ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা আছে, সকল ব্যাঙ্ক সম্মিলিতভাবে ঋণপ্রসার ঘটাইতে থাকে। ব্যাঙ্ক-ঋণের ভরসায় ব্যবসায়ীরা উৎপাদকের নিকট বেশি অর্ডার দিতে থাকে,

কিরূপে সমৃদ্ধি দেখা দেয়

উৎপাদকেরাও উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়াইতে থাকে। চাষী, মজুর ও উপকরণের মালিকদের হাতে এই টাকা পৌঁছায়, দেশের ব্যাঙ্কঋণ লোকের হাতে আয় হিসাবে টাকার রূপে অবস্থান করিতে শুরু করে। এই টাকা নিশ্চয়ই ব্যয় হইবে, তাই দেশে টাকাকড়ির ব্যয় বাড়িতে থাকে। এইরূপে কম সুদ থাকার দরুন ব্যবসায়ীরা দ্রব্যসামগ্রী মজুত করার যে প্রচেষ্টা করে তাহারই মধ্য দিয়া কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ তাহারা বাড়াইয়া তুলিতে পারে। মজুত করার মধ্য দিয়াই কার্যকরী চাহিদা বাড়ে এবং এইরূপে লোকের ক্রয়শক্তি বাড়াইয়া তাহারা মজুতদ্রব্য বিক্রয়ের সুযোগ গড়িয়া তোলে। এইরূপে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়, পরস্পর প্রভাবিত উন্নয়নের ধারা (**cumulative process of expansion**) কাজ করিতে থাকে ; টাকার প্রচলন-বেগ বাড়িয়া যায় ; দ্রব্যমজুত, ব্যাঙ্কঋণ, কার্যকরী চাহিদা ও টাকার আয়ব্যয় পরস্পরকে তাড়া করিয়া ঘূর্ণিবেগে যেন উহাদের বাড়াইয়া তোলে।

কিন্তু এই সুসময় চিরকাল চলে না, ইহারই মধ্যে অবনতির বীজ অংকুরিত হইতে থাকে। ব্যাঙ্কের ঋণসৃষ্টির ক্ষমতার সীমা আছে, একটি স্তরে পৌঁছিয়া তাহারা ঋণপ্রসার কমাইয়া দিতে চায়, সুদের হার বাড়াইয়া দেয়। স্বর্ণমান

অবস্থায় দেশে স্বর্ণ-রিজার্ভের অনুপাতই ঋণপ্রসারের এই সীমা নির্দিষ্ট করে। সুদের হার বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীরা মজুতের পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করে, উৎপাদকদের নিকট অর্ডার কমাইয়া দেয়, উৎপাদন কমিয়া যায়, উপকরণের মালিকদের হাতে আয় হ্রাস পায়। কার্যকরী চাহিদাও কমে, ফলে অবনতির গতি তীব্রতর হইয়া উঠে। ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ কমিয়া আসে, লোকের হাতে টাকা কমিয়া গিয়া ব্যাঙ্কের আলমারিতে আবদ্ধ হইতে থাকে। কিছুদিন সংকট চলার পরে কোন কোন ব্যবসায়ীর মজুত করার ইচ্ছা আবার দেখা দেয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি প্রয়োগ করিতে থাকে। ব্যাঙ্কের হাতে টাকা বাড়ে। অলস টাকা হাতে রাখিলে মুনাফা নাই, সুদের হার কমাইলে ব্যবসায়ীরা ঋণ লইতে পারে এই আশায় তাহারা ঋণ বাড়াইবার চেষ্টা শুরু করে। উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়।

অবনতি ও উন্নতি

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হট্রের এই মডেল বিশ্লেষণ করিলে আমরা কতকগুলি বিষয় দেখিতে পাই। যেমন টাকার যোগান স্থিতিস্থাপক না হইলে বাণিজ্য চক্র ঘটে না; যে-দেশে আধুনিক ব্যাঙ্কব্যবস্থা আছে সেখানকার টাকার যোগান নিশ্চয় স্থিতিস্থাপক হইবে; ব্যাঙ্কব্যবসায়ের সাধারণ নিয়মই হইল টাকার মোট যোগান কমানো ও বাড়ানো। টাকার যোগানে এই হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারাই বাণিজ্যচক্র ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর; এই বাণিজ্যচক্র ব্যাঙ্কঋণের হ্রাসবৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়।

হট্রে মডেলের মূলকথা

হট্রের তত্ত্বকে বহু বিভিন্ন দিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। বাণিজ্য চক্রের সকল ঘটনার নেতা হিসাবে পাইকারী ব্যবসায়ীদের গণ্য করা চলে না, উহাদের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, এই ব্যবসায়ীরা সুদের হার সম্পর্কে এতটা অনুভূতি-শীল বলিয়া মনে হয় না। সুদের হার কমিলেই ব্যবসায়ীরা মজুত করিবার জন্য উৎপাদকের নিকট অর্ডার দিল—সংকট হইতে উন্নতির পথ এতটা সরল নয়। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বাড়িলে তবেই বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির ধারা শুরু হইতে পারে, তাহার পূর্বে নয়। উপরন্তু, বাণিজ্যচক্রকে আমরা কেবলমাত্র টাকার ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে পারি না। দেশের উৎপাদনপদ্ধতি, আবিষ্কার, যন্ত্রকৌশল, বিক্রয়ব্যবস্থা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার সমস্ত কিছু ইহার সহিত জড়িত। বিনিয়োগের বৃদ্ধিই ব্যাঙ্কঋণ ও টাকার পরিমাণ বাড়ায়,

এই তত্ত্বের বহুবিধ সমালোচনা

কিন্তু টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি বিনিয়োগ বাড়াইয়া তোলে, এমন কথা মানিয়া লওয়া চলে না। সর্বোপরি, হট্রের ধারণা যে, ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণে উঠানামাই বাণিজ্যচক্রের কারণ। ইহা আধুনিক জগতে আর সত্য নয়। আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সর্বদাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, অনেক সময় তাহারা সফলও হয়। তাহা সত্ত্বেও বাণিজ্যচক্র ঘটে। আধুনিককালের বাণিজ্যচক্রের তত্ত্বে তাই আর্থিক বিষয়ের প্রভাবগুলিকে (যেমন সুদের হার বা ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ পূর্বের ন্যায় ততটা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয় না।*

হায়েকের তত্ত্ব (Hayek's theory)

বাণিজ্যচক্রের একটি প্রধান লক্ষণ হইল ভোগদ্রব্যের শিল্পের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে অধিকতর উঠানামা। অস্ট্রীয়ান মতবাদে বলা হয় যে, এই দুই শ্রেণীর শিল্পে তুলনামূলক উঠানামার কারণ ব্যাঙ্কিংব্যবস্থার মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। লোকের ইচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ ছাপাইয়া ব্যাঙ্কঋণের প্রসার ঘটে বলিয়া সংকট দেখা দেয়। তাই ইহাকে আর্থিক অতিবিনিয়োগতত্ত্ব (Monetary over-investment theory) বলা হয়। একটু গভীরভাবে এই তত্ত্বটি আলোচনা করা যাউক।

নির্দিষ্ট কোন এক সময়ে সমাজের সকল উপকরণ যতপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত আছে, তাহাদের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা চলে। ভোগকারী হিসাবে কতকগুলি দ্রব্য লোকের সদাসর্বদা দরকার হয়, সেইগুলির

* "Recent theory has also tended to minimize the importance of such factor as the rate of interest and the operations of the banking system in explaining the trade cycle. Here again there is a contrast with the theory of a generation or more ago, and here again it probably reflects a contrast between the experience of this century and that of the nineteenth century. In appropriate monetary policies and banking collapse can exaggerate cycles, even in modern conditions ; conversely wise monetary policy can be used as one weapon for helping to control cycles......Nevertheless, it is probably correct to avoid laying emphasis on the purely monetary matters in explaining the core of the cyclical process under twentieth century conditions ; they can be introduced later as important embellishments that help explain the great differences in detail between individual cycles." A. C. L. Day, *Outline of Monetary Economics*, P. 322.

উৎপাদন ক্রেতাদের নিকট-স্তরের। আবার, কতকগুলি দ্রব্যসামগ্রী ক্রেতাদের সদাসর্বদা দরকার হয় না, সেইগুলির উৎপাদন ক্রেতাদের দূরবর্তী-স্তরের। ক্রেতাদের কাছের জিনিসপত্রকে বলে নিম্নস্তরের উৎপাদন (lower stages of production), আর দূরের জিনিসপত্রকে বলে উচ্চস্তরের উৎপাদন (higher stages of production)। এই সকল বিভিন্ন স্তর লইয়া গঠিত থাকে দেশের উৎপাদন-কাঠামো (structure of production)। যেমন জামা, জুতা, প্রভৃতির উৎপাদন নিম্নস্তরের, আবার ব্লাস্টফার্নেস বা ইঞ্জিন তৈয়ারী উচ্চস্তরের উৎপাদন।

মূলধনী ও ভোগদ্রব্যের শিল্প লইয়া দেশের উৎপাদন কাঠামো গঠিত

সমাজের মোট আয়কে লোকেরা দুইটি ধারায় প্রবাহিত করে, একটি ব্যয় অপরটি সঞ্চয়। যে অংশ ব্যয় হয় তাহা সরাসরি ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে চলিয়া যায়। কিন্তু যে অংশ সঞ্চয় হয় তাহা প্রত্যক্ষভাবে মূলধনী দ্রব্যের ক্রয়ে প্রবেশ করে না। লোকের হাত হইতে সঞ্চয় যায় ব্যাঙ্কের হাতে, বীমা কোম্পানী বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভাণ্ডারে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সঞ্চয় উদ্যোক্তাদের হাতে পড়ে, তাহা বিনিয়োগের পথ ধরে। দেশের মোট সঞ্চয় মোট বিনিয়োগের মূল্যের সমান হয় যদি দেশে 'ভারসাম্য সুদের হার' বজায় থাকে। এই 'ভারসাম্য সুদের হার' হইতে দেশের বাজার-হার বেশি থাকিলে সঞ্চয় বেশি হয় কিন্তু বিনিয়োগ কমে; আবার ইহার তুলনায় দেশের বাজার-হার কম থাকিলে সঞ্চয় কম হয় কিন্তু বিনিয়োগ বাড়ে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান

বাজার-সুদের হার যদি ভারসাম্য-সুদের হারের তুলনায় কম থাকে, তবে লোকের সঞ্চয় কম, কিন্তু বিনিয়োগ বেশি হইবে। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? লোকের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় যদি কম হয়, তবে উদ্যোক্তারা বেশি বিনিয়োগ করার টাকা পায় কোথা হইতে? সঞ্চয় ও বিনিয়োগে এই পার্থক্য সম্ভব হয় এই কারণে যে, দেশের ব্যাঙ্কগুলি ঋণসৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং বাজার-সুদের হার কম থাকিলে অধিক বিনিয়োগ ঘটে কিছুটা স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় হইতে, আর কিছুটা ব্যাঙ্কঋণের সাহায্যে। বাজার-সুদের হারে হ্রাস মূলধনী দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া দেয়, উদ্যোক্তারাও মূলধনী দ্রব্যে বেশি টাকা খাটাইতে থাকে। নিম্নস্তরের

কিন্তু ব্যাঙ্কঋণের প্রসার দ্বারা সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিয়োগ বেশি হইতে পারে

উৎপাদন হইতে উপকরণগুলি সরিয়া আসিয়া উচ্চস্তরের উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে থাকে। দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন দরকার হইয়া পড়ে।

মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন এইরূপ প্রসারিত হইতে থাকায় লোকের হাতে আয় বাড়ে, তাহারা ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করায় উহাদের দাম বাড়ে। তাহা ছাড়া মূলধনী দ্রব্যোৎপাদন বাড়াইবার জন্যও উপকরণগুলিকে পূর্বাপেক্ষা বেশি দাম দিতে হয়, তাই ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনব্যয়ও বৃদ্ধি পায়, এবং উহাদের দাম বাড়ে। ভোগদ্রব্যের দাম বাড়িলে জনসাধারণের বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হয় (forced saving), কারণ অনেকে বেশি দামে জিনিসপত্র কিনিতে পারে না। ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়িতে থাকিলে দেশের উদ্যোক্তারা ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে চেষ্টা করে, সমাজের উপকরণগুলি আবার 'উচ্চস্তর' হইতে 'নিম্নস্তরে' চলিয়া আসিতে চায়। আবার দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন আনা দরকার হইয়া পড়ে। দেশের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুযায়ী উৎপাদন-কাঠামোর সামঞ্জস্য সাধন প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

তখন বাধ্যতামূলক সঞ্চয় দেখা দেয়

সুতরাং হায়েকের মতে, ভারসাম্য-সুদের হার অপেক্ষা বাজার-সুদের হার কম থাকিলে অতি-বিনিয়োগ দেখা দেয় ; চরমসমৃদ্ধি (Boom) ইহারই ফল। কিন্তু বিনিয়োগের এই 'আধিক্য' চিরকাল চলিতে পারে না, কারণ উহার পিছনে স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় নাই, ব্যাঙ্কঋণের ভিত্তিতে ইহা আর কতদূর চলিতে পারে? 'সমৃদ্ধির' এই বুদ্‌বুদ্‌ ফাটিয়া যায় কারণ লোকের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় কম। আবার অবনতি হইল এমন সময় যখন দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটানো হইতেছে—স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুযায়ী ঐ মাপে উহাকে ছোট করা হইতেছে। উৎপাদন-কাঠামোর কাটছাঁট করার সময়ে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি করা হইলে এই অবনতি-কাল দীর্ঘদিন ধরিয়া চলে, বেকারি ও সংকট অধিকতর ঘনীভূত হয়।

কেন সমৃদ্ধি ও সংকট দেখা দেয়

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। মূলধনী দ্রব্যের শিল্প-প্রসারের ধারা কেন বন্ধ হইয়া যায় সেই সম্পর্কে হায়েক আর একটি মন্তব্য করিয়াছেন। ইহাকে বলে রিকার্ডো-প্রভাব (Ricardo-effect) রিকার্ডো বলিয়াছিলেন যে, মজুরি বাড়িলে উদ্যোক্তারা শ্রমিকের বদলে যন্ত্র-নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে, আবার মজুরি কমিলে যন্ত্রের পরিবর্তে অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করিতে

হায়েকের দ্বিতীয় মত : রিকার্ডো প্রভাব

থাকিবে। হায়েকের যুক্তি হইল যে, ক্রমপ্রসারের ঘূর্ণাবর্তন (cumulative process of expansion) ভোগ্যদ্রব্যের জন্য চাহিদা বাড়ায় অথচ ইহাদের উৎপাদন না বাড়িয়া মূলধনী দ্রব্যের প্রসার হয়, তাই ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়ে, অর্থাৎ আসল মজুরি (real wages) কমিয়া যায়। আসল মজুরি কমিলে উদ্যোক্তারা মূলধন-নিয়োগ কমাইয়া শ্রমিক-নিয়োগ বাড়াইয়া দেয়, অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা বিনিয়োগ কমায়। এই বিনিয়োগের হ্রাসই অবনতির পথ উন্মুক্ত করে। মূলধন-নিয়োগের পরিমাণ কমানোর অর্থই হইল উৎপাদনধারাকে হ্রস্বতর করা বা কম চক্রাকৃতি করিয়া তোলা (to shorten the production-process or to make it less round about)। তাই দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে গুরুতর পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অবনতির সূত্রপাত হয়। আবার সংকটকালে দেখা যায় ভোগ্য-দ্রব্যসামগ্রীর দাম কম, অর্থাৎ আসল মজুরি বেশি। উদ্যোক্তারা আবার কখনও 'রিকার্ডো-প্রভাব' প্রয়োগ করে, অর্থাৎ শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্রের নিয়োগ বাড়াইতে চেষ্টা করে। উৎপাদনপদ্ধতিতে মূলধনের নিয়োগ বাড়ে, উৎপাদনধারাকে দীর্ঘতর করা হয় বা আরও অধিক চক্রাকৃতি করিয়া তোলা হয়। এইরূপে উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়।

রিকার্ডো প্রভাব কিরূপে কাজ করে

এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহুপ্রকার সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমত, বলা হয় যে, উদ্যোক্তারা 'আসল' মজুরি অনুযায়ী তাহাদের কাজকর্মের রূপ ও নীতি নির্ধারণ করে না। দ্বিতীয়ত উৎপাদনপদ্ধতি বা ধারাকে দীর্ঘ হইতে হ্রস্ব করা মোটেই সহজসাধ্য নয়, আর স্বল্পকালে এইরূপ ঘটে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, বিনিয়োগের ধারা একবার শুরু করিলে আসল-মজুরির পরিবর্তন ঘটিলেও কমানো যায় না, উহাকে সম্পূর্ণ করিতে হয়, তাহা না হইলে সবটাই লোকসান। চতুর্থত, ভোগ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক মজুরি বৃদ্ধি পাইলে আসল-মজুরি সমান স্তরে থাকিয়া যাইতে পারে।

এই তত্ত্বের সমালোচনা

কেইন্‌সীয় তত্ত্ব (Keynsian (Theory) :

কেইন্‌সের মতে কর্মসংস্থান, আয় ও উৎপাদনের পরিমাণে নির্দিষ্ট সময় অন্তর উঠানামাকে বাণিজ্যচক্র বলা হয়। তাঁহার অভিমতে মূলধনের প্রান্তিক

কার্যকারিতাকে উঠানামার দরুন বিনিয়োগের হারে পরিবর্তন এইরূপ বাণিজ্য-চক্র ঘটাইয়া থাকে। দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ মোট আয় ও উৎপাদন স্থির করে এবং এই কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে সামগ্রিক ব্যয়ের উপর। এই মোট ব্যয় তিনটি পরিবর্তনীয় বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত: মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা, সুদের হার এবং ভোগ-প্রবণতা। সাধারণত, স্বল্পকালে সুদের হার ও ভোগ প্রবণতা পরিবর্তিত হয় না, সুতরাং আয় ও কর্মসংস্থানের উঠানামার পিছনে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতাই হইল প্রধান সক্রিয় শক্তি। নূতন বিনিয়োগ হইতে প্রত্যাশিত মুনাফার হারকে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বলা হয়।

মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় জোয়ার ভাঁটা।

ব্যবসায়-উন্নতির গোড়ায় দিকে মুনাফা সম্বন্ধে আশার প্রাবল্য দেখা যায়, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িতে থাকে, আয়স্তর বাড়িয়া যায়, বিনিয়োগের বৃদ্ধি বহু পরিমাণে আয়ের বৃদ্ধি ঘটায়, গুণকের প্রভাবের ফলে ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে বিনিয়োগ ও আয় বাড়াইয়া সমৃদ্ধির প্রসার করে। কিন্তু এই সমৃদ্ধির সীমা আছে। প্রথমত, ক্রমশ নূতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়, কারণ কাঁচামাল, শ্রমিক বা অন্যান্য উপকরণের ঘাটতি শুরু হইতে থাকে, এবং ফলে তাহাদের দাম বাড়িতে থাকে। দ্বিতীয়ত, মূলধনী দ্রব্যের যোগান বাড়িয়া যাওয়ায় প্রত্যাশিত মুনাফার হার কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়িলেও বিক্রয় সেই অনুপাতে বাড়ে না; কারণ আয় বৃদ্ধি হইলেও ভোগপ্রবণতা সেই অনুপাতে বাড়িতে না থাকায় ভোগব্যয়ে অধিক বৃদ্ধি হয় না। এই সকল কারণে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা দ্রুত হ্রাস পায়। অবস্থার চাপে সুদের হার সেই সময়ে বেশি থাকে, উহাকে কমানো সম্ভব হয় না। কারণ (ক) ব্যাঙ্ক-ঋণের জন্য চাহিদা থাকে খুবই বেশি, এবং (খ) বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিশেষ করিয়া ফাটকা ব্যবসায়ে নিয়োগের জন্য নগদ পছন্দ বাড়িয়া যাওয়ায় লোকে নগদ টাকা বেশি পরিমাণে হাতে রাখিতে চায়। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় দ্রুত হ্রাস অথচ সুদের হারে বৃদ্ধি—এই উভয়ের ফলে বিনিয়োগ একসঙ্গে হঠাৎ কমিয়া যাইতে চায়। 'হঠাৎ' কমিয়া যাওয়ার কারণ হইল ব্যবসায়িগণের সম্মিলিত দলমতের

উন্নতি

সমৃদ্ধি

অবনতি

প্রভাবে ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কীয় আশা-নিরাশা নির্ধারিত হয়, এই দলবদ্ধ বাজারী মতামত সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল।

অবনতি শুরু হইলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়স্তর সবই কমিতে থাকে ; গুণকের প্রভাবে অবস্থার নিম্নগতি ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে বাড়ে। সমগ্র সমাজ দ্রুত-গতিতে চরম-সংকটের স্তরে পৌঁছায়। এই অবস্থায় মূলধনের প্রান্তিক কার্য-কারিতায় বৃদ্ধির সূচনা হইলেই পুনরায় উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। কতকাল পরে এই উন্নতি শুরু হইবে তাহা নির্ভর করে, (ক) মজুত করা বা উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রপাতির স্থায়িত্ব কালের (durability) উপর এবং (খ) গুদামজাত অবস্থায় যন্ত্র বা দ্রব্যাদি মজুত রাখার ব্যয়ের উপর (carrying costs)। তাহা ছাড়া, (গ) মজুত করা ভোগ্য-দ্রব্যের যোগান কিছু পরিমাণে কমিয়া যাওয়ার উপর। মূলধনী ও ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইলেই উৎপাদন হইতে মুনাফা এবং মুনাফার প্রত্যাশা উভয়ই বৃদ্ধি পায় ; মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বাড়িতে থাকে · উৎপাদনের বৃদ্ধি হয় ও এইরূপে ক্রমশ সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইতে থাকে।

সংকট

হিক্‌সের তত্ত্ব (Hicks' Theory) :

হিক্‌সের মতে, অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে শিল্প-বিপ্লবের পর হইতেই বিভিন্ন দেশে দ্রুত শিল্পোন্নতি শুরু হইয়াছে এবং সেই সময় হইতেই বাণিজ্য চক্রের উদ্ভব ঘটিতেছে। অর্থাৎ ইহা ক্রমপ্রসারমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশেষ সমস্যা ; ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ধারার দুইপার্শ্বে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের এইরূপ নিয়মিত উঠানামা ঘটিয়া চলিয়াছে। বলা যায় যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের এইরূপ পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থার মধ্য দিয়াই দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির ঊর্ধ্বমুখী ধারা প্রবাহিত ; ক্রমপ্রসারশীল অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতেই চক্রাকৃতি সংকট এবং সমৃদ্ধির প্রকৃতি ও কারণ বিশ্লেষণ করা দরকার।

বাণিজ্য-চক্র হইল সমাজের উৎপাদন ও আয়স্তরের নিয়মিত উঠানামা : তাই ইহাদের উপর ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রভাব পরিমাপকারী গুণক ও ত্বরক তত্ত্বের সাহায্যেই এই উঠানামার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এই দুই পদ্ধতির মিলিত ফলাফলে কি ভাবে কি কারণে বাণিজ্য-চক্রের উদ্ভব ঘটে, হিক্‌স্ তাহাই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, উৎপাদন বা আয়ে পরিবর্তন

বিনিয়োগে, বিশেষ করিয়া উদ্ভুত বিনিয়োগে, কিরূপ পরিবর্তন আনে, তাহারই উপর বাণিজ্য-চক্র প্রধানত নির্ভর করে।*

তাঁহার মতে কোন সমাজে বিনিয়োগ প্রধানত দুই ধরনের: স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ এবং উদ্ভুত বিনিয়োগ (Autonomous Investment and Induced Investment)। সমাজে কোন ধরনের বিনিয়োগ-ব্যয় দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্র কর্তৃক স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বা আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি বা নূতন দ্রব্য উৎপাদন, এবং যাহা হইতে দীর্ঘকালে আয় সৃষ্টি হইতে পারে এইরূপ বিনিয়োগ, ইহারা সকলে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ—ইহা অপরাপর দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল নহে। ক্রম-প্রসারমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এইরূপ বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে। অপরপক্ষে, বিশেষ কোন দ্রব্যের উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে কোন ধরনের যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়াইতে হয় (যেমন, বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে মাকু-র উৎপাদন বাড়ানো দরকার);

দুই শ্রেণীর বিনিয়োগ

* কেইন্‌সীয় কর্মসংস্থানতত্ত্বে গুণকতত্ত্ব প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার মতে মোট আয় হইল মোট বিনিয়োগ × গুণক; গুণককে সমান ধরিয়া লইলে আয়ে পরিবর্তনের হার = মোট বিনিয়োগের পরিবর্তনের হার × গুণক। সুতরাং, বাণিজ্যচক্র বা আয়স্তরে পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করিতে তিনি এই গুণকতত্ত্বের উপর বিশেষ নির্ভর করিয়াছেন।

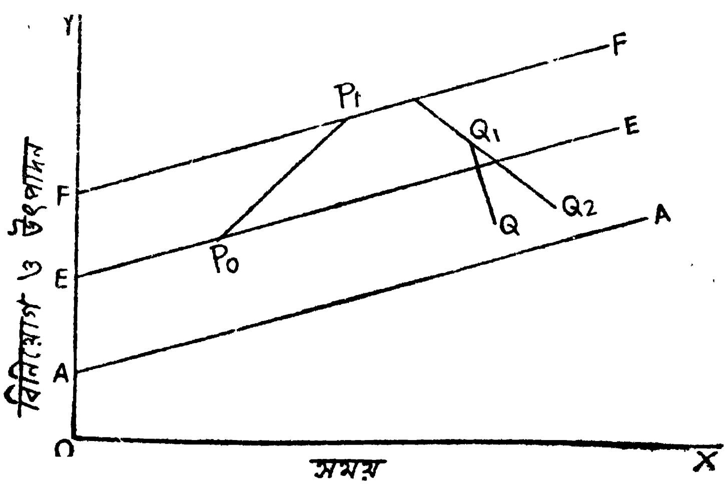
হিক্‌স এই তত্ত্বকে কার্যত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কেইন্‌সীয় গুণকতত্ত্বকে বাদ দিয়াই বাণিজ্যচক্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছে। কেইন্‌সীয় গুণককে তিনি বলিয়াছেন ক্ষণোৎভব গুণক (Intantaneous Multiplier)। গুণক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কেইন্‌সের ভোগপ্রবণতা তত্ত্বের প্রকৃতি মনে রাখা দরকার। তাঁহার মতে, চলতি ভোগব্যয় চলতি আয় হইতেই করা হয়, এবং চলতি ভোগব্যয় সঙ্গে সঙ্গে কি পরিমাণ মোট আয় সৃষ্টি করিতেছে তাহা ভোগপ্রবণতার উপর নির্ভর করে এবং সেই নির্দিষ্ট বা স্থায়ী গুণকের দ্বারা পরিমাপ করা যায়।

হিক্‌স্ কিন্তু ভোগপ্রবণতাকে অন্যভাবে দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে গুণকের পরিমাণকে নির্দিষ্ট ও স্থায়ী বলিয়া ধরা চলে না। আয় প্রসারের ধারার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গুণকের আয়তন বদলাইয়া যাইতে থাকে, ইহা তাই সর্বদাই পরিবর্তনশীল; ইহার সাহায্যে মোট আয় ও মোট কর্মসংস্থানের পরিমাপ করা চলে না। তিনি বলিয়াছেন যে, চলতি ভোগব্যয় নির্ভর করে 'গত কালের' আয়ের উপর, সকল 'গত কালের' মিলিত আয়ের উপর, কেইন্‌সের মত চলতি আয়ের উপর নির্ভর করে না। আয় এবং ভোগ-ব্যয়ে সময়ের ব্যবধান (time-lag) স্বীকার করিয়া লইলেই এবং সেই ব্যবধানের পরিমাণ সকল ক্ষেত্রে সমান নহে ইহা ধরিয়া লইলেই কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাবে হিসাব করা প্রয়োজন হয়। সেই অবস্থায়, গুণকের আয়তন স্থায়ী ধরিয়া লইলে বিনিয়োগ পরিবর্তনের ফলে নূতন সাম্যাবস্থার আয় পাওয়া যাইবে অসীম এক-কেন্দ্রাভিমুখী শ্রেণীর শেষে (at the end of the infinitive convergence series)। সুতরাং বিশেষত, স্বল্পকালীন বিষয়ের বিশ্লেষণে, গুণকতত্ত্বের প্রয়োগ ঠিক হইবে বলিয়া তিনি মনে করে না।

মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে এইরূপ বিনিয়োগকে উদ্ভূত বিনিয়োগ বলা হয়। মনে রাখা দরকার যে, দ্রব্যোৎপাদন ও যন্ত্রোৎপাদন ইহাদের মধ্যে পরিমাণগত সম্পর্ক আছে এবং তাহা দ্রব্যের ও যন্ত্রের প্রকৃতি এবং যান্ত্রিক কলাকৌশলের দ্বারা নির্দিষ্ট (যেমন বৎসরে 10000 কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে 50টি মাকুর উৎপাদন প্রয়োজন)। ইহাই ত্বরণনীতির ভিত্তি অর্থাৎ উৎপাদনে বৃদ্ধি কি অনুপাতে বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটায় তাহারই উপর ত্বরণের প্রভাব নির্ভর করে।

বিনিয়োগ ও আয়স্তর

কোন দেশে যে আয়স্তর আছে তাহা সাধারণভাবে তিনটি বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত : স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ, উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং ভোগব্যয়ের পরিমাণ। নিচের চিত্রে দেখা যাইতেছে, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের রেখা ক্রমে উর্ধ্বে উঠিতেছে, কারণ সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র ক্রমেই এইরূপ বিনিয়োগ বাড়াইতে থাকে। উৎপাদনের ও আয়ের রেখা উহার উর্ধ্বে অবস্থিত থাকে কারণ উপরোক্ত তিনটি বিষয় লইয়াই মোট আয় গঠিত। নিচের চিত্রে এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হইতেছে :



চিত্রে AA রেখা স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং EE রেখা উৎপাদনস্তর ও আয়স্তরের নির্দেশক উভয়ের মধ্যে দূরত্ব গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফল

এই উভয়ের মিলিত ফলকে অতিগুণকের (Super multiplier) ফলাফল বলিয়া মনে হয়।

ধরা যাক, P_0 বিন্দুতে আয় ও উৎপাদন হইতেছে এবং সেই সময়ে কোন স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ঘটিল: কোন আবিষ্কৃত দ্রব্যের উৎপাদন বা সরকারী ব্যয়, প্রভৃতির ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইল। স্বাভাবিক স্তর হইতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় বাড়িতে লাগিল। গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফলে, উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে, P_0P_1 রেখা অবলম্বন করিয়া উৎপাদন ও আয় বাড়িতে থাকে। ব্যবসায়সমৃদ্ধির যুগে মুনাফার প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ আরও বাড়িয়া যাইতে পারে এবং গুণক ও ত্বরণের ফলে তাহাও অধিক আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করিতে থাকিবে। উৎপাদক-বৃদ্ধির স্তর নির্ভর করিবে (ক) প্রাথমিক স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ, (খ) গুণক, (গ) ত্বরণ, (ঘ) ব্যবসায়ীদের মনে ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার সৃষ্টি, ফলে বর্ধিত বিনিয়োগ—এই সকল বিষয়ের শক্তি কিরূপ তাহার উপরে।

কেন সমৃদ্ধির শুরু হয়

যদি ইহারা মিলিয়া বিশেষ শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে এমন এক অবস্থায় পৌঁছিবে যেখানে আর উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, পূর্ণকর্মসংস্থানের 'ছাদে' (Full Employment ceiling) ঠেকিয়া উৎপাদন আর বাড়িতে পারিতেছে না। পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের উৎপাদন FF রেখায় দেখানো হইয়াছে। নিয়োগযোগ্য উপকরণের অভাবে উৎপাদন ছাদে ঠেকিবার পর আর বাড়িতে পারে না। নূতন আবিষ্কৃত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য সরকারী ব্যয় অর্থাৎ প্রথম স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ শেষ হইয়া যাইবার পর, ইহা নিজে আর বৃদ্ধি পায় না; পুরানো রেখায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। কিন্তু উদ্ভূত বিনিয়োগ নিজে শেষ হয় না; নূতন আয় সৃষ্টি ও উৎপাদন বাড়াইয়া নিজেই নিজেকে বাড়াইয়া চলে; এইরূপে পূর্ণ-সংস্থান স্তরে পৌঁছায়। উহার পরে উৎপাদন আর বাড়িতে পারে না, ওই রেখার উপরেই গড়াইতে থাকে (এবং ডান দিকেই গড়াইবে কারণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয়স্তর প্রভৃতি বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজ এখন রেখার একটু ডান দিকেই অবস্থিত)। কিন্তু উৎপাদনের রেখাকে নিম্নে নামিতেই হইবে, কারণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ আর নাই, কেবলমাত্র উদ্ভূত বিনিয়োগ এত

সমৃদ্ধির স্তর নির্ণয়

ঊর্ধ্বতম সীমা নির্দিষ্ট-কারী বিষয়সমূহ

উচ্চস্তরে উৎপাদনকে রক্ষা করিতে পারে না। রাষ্ট্র যদি সময় বুঝিয়া আবার স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ না করে বা ক্রমাগত করিতে না থাকে অথবা সমাজে পুনরায় এইরূপ বিনিয়োগ না ঘটে তাহা হইলে উৎপাদন ও আয়ের স্তর কমিয়া আসিবে। উৎপাদন কমিলে (ঋণাত্মক ত্বরণের ফলে) অবিনিয়োগ (Disinvestment) ঘটিতে থাকে। যদি ঠিক যে হারে বিনিয়োগ উদ্ভূত হইয়াছিল ঠিক সেই হারেই উহা হ্রাস পাইতে থাকে, তাহা হইলে উৎপাদন Q_{1a} রেখায় কমিবে। কিন্তু সাধারণত তাহা ঘটে না। স্থায়ী মূলধনে অবিনিয়োগ ধীরে ধীরে ঘটিতে থাকে, স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি ঘটিতে বেশি সময় লাগে। সুতরাং Q_1Q_2 রেখায় উৎপাদন নামিয়া আসে।

হিক্‌সের মতে, প্রধানত দুইটি কারণে উৎপাদনের নিম্নগতি ত্বরান্বিত হইবে। প্রথমত আর্থিক কারণের ফলে। এইরূপ অবস্থায় সাধারণত আর্থিক কর্তৃপক্ষ

নিম্নগতি কি কারণে ত্বরান্বিত হইয়া থাকে

ঋণসৃষ্টি কমাইয়া দিতে চেষ্টা করে, ফলে সুদের হার বাড়িয়া যাইতে থাকে ; তাহা ছাড়া তারল্য পছন্দ বাড়িয়া যাওয়াতে সুদের হার বাড়িবে। এই সকল বিষয় ঋণাত্মক গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফলাফলকে তীব্রতর করিয়া তুলিবে ; উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান নামিয়া আসার গতি দ্রুততর হইবে। দ্বিতীয়ত, এই অবস্থায় ব্যবসায়ীদের আশাভঙ্গের ফলে বিশেষ তীব্র হয়। অনেক অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী সমৃদ্ধি বেশি দিন চলিতে থাকিলেই ভয় পাইয়া উৎপাদন সংকুচিত করিতে থাকেন ; তাঁহাদের বাণিজ্য-চক্রের সচেতনতাই (Cycle-consciousness) উৎপাদন ও বিনিয়োগ কমাইবার ঝোঁক সৃষ্টি করে। তাহা ছাড়া, শেয়ার বাজারের 'দলবদ্ধ জনতার মতামত' বিশেষ অস্থির প্রকৃতির।

উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান প্রভৃতি নামিয়া আসারও কিন্তু সীমা আছে ; সেই মেঝেতে (floor) ঠেকিয়া উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান আর নামিতে পারে না। তিনটি বিষয়ের দ্বারা এই নিম্নতম সীমার স্তর নির্দিষ্ট হয়।

নিম্নতম সীমা নির্ধারণকারী বিষয়-সমূহ

প্রথমত, সংকট যতই গভীর হউক না কেন, কিছু পরিমাণ ভোগব্যয় সমাজে সর্বদা হইবেই, আয় না থাকিলেও ঋণ করিয়া, সঞ্চয় ভাঙাইয়া যে-কোন উপায়ে ব্যক্তিরা নিম্নতম দৈহিক প্রয়োজন মিটাইতে থাকিবে।

দ্বিতীয়ত, সংকট কালে সরকারী ব্যয় সাধারণত কমে না, সুতরাং তাহা চলিতে থাকিবে ; এমন কি দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য কিছুটা বাড়িতেও পারে।

তৃতীয়ত, কিছু পরিমাণ স্বয়ংভূত বিনিয়োগ, যেমন স্কুল, কলেজ, গৃহনির্মাণ প্রভৃতির জন্য ব্যয় সমাজে চলিবেই ; ইহারা চলতি অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না। এই তিনটি বিষয়ের উপর মোট ব্যয় সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার নিম্নতম সীমা এবং সেই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের উপযোগী অর্থনৈতিক কাজকর্ম চরম-সংকটের সময়েও চলিতে থাকিবে ; ইহারা বেকারির ঊর্ধ্বতম সীমার পরিমাণ (Upper limit of Unemployment) নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

মজুত মূলধনী দ্রব্যাদির অবিনিয়োগ (Disinvestment), এবং তাহাদের ক্ষয়ক্ষতির বা অকেজো হইয়া যাইবার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংকটকাল স্থায়ী হইবে ; কারণ তাহার পর উহাদের পুনঃসংস্থানের জন্য কিছু নূতন বিনিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। ফলে, আবার সেই গুণক ত্বরণের সম্মিলিত ফলাফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দৌড় শুরু হইবে, সমাজের সংকট ত্রাণ ঘটাইয়া উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে।

উন্নতির শুরু

বাণিজ্য-চক্র নিয়ন্ত্রণ বা অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সাধন (Control of Business cycles or Economic stabilization)

বাণিজ্য চক্র নিয়ন্ত্রণ করিয়া অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সাধনের উদ্দেশ্যে বহু প্রকার নীতি আলোচিত হইয়াছে। এই সকল নীতিকে সাধারণভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, আর্থিক নীতি (Monetary policies) ও ফিস্‌কাল নীতি (Fiscal policies)। বহুপূর্বকাল হইতেই ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, উপযুক্ত ধরনের আর্থিক নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করিলে বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ করা চলে। যেমন, হট্রে (Hawtrey) মনে করিতেন যে, এই উদ্দেশ্যে দেশের ব্যাঙ্কগুলিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার যাহাতে উহারা ঋণপ্রসারের পরিমাণ নিজেদের খুশিমত বাড়াইতে বা কমাইতে না পারে। হায়েক (Hayek) বলিতেন যে, দেশে এমন সুদের হার বজায় রাখিতে হইবে যাহাতে সমাজের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় দেশে বিনিয়োগের মোট মূল্যের সমান হয়। উইক্‌সেলের (Wicksell) মতে অর্থনৈতিক এই স্থায়িত্ব তখনই সম্ভব হয় যখন দেশে সুদের স্বাভাবিক হার ও বাজার-হার সমান থাকে।

উপযুক্ত আর্থিক নীতি কার্যকরী করা

আমরা জানি দেশের কার্যকরী চাহিদায় উঠানামাকে বাণিজ্যচক্র বলে। এই কার্যকরী চাহিদা নির্ভর করে মোট ব্যয়ের উপর, অর্থাৎ মোট ভোগব্যয় ও মোট বিনিয়োগ ব্যয়ের উপর। আর্থিক নীতির কাজ হইল দেশের বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয়ের উঠানামার পরিধি সংকুচিত করা। দেশে ব্যাঙ্কঋণের প্রসার কমান ও বাড়ান এবং সুদের হার কমান ও বাড়ান—ইহারাই আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য। (ক) ব্যাঙ্ক ঋণের প্রসার কমান বা বাড়ান-র উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারী নীতি প্রয়োগ করিতে পারে, অথবা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নগদজমার অনুপাতে পরিবর্তন আনিতে পারে। উন্নতিকালের শেষে সমাজ যখন সমৃদ্ধির পথ ধরিয়া দ্রুতবেগে অবনতির দিকে ছুটিয়া চলে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক ও ব্যক্তির হাত হইতে টাকা তুলিয়া লইতে চেষ্টা করে এবং ব্যাঙ্কের নগদ জমার অনুপাত বাড়াইয়া দেয়। আবার সংকটকালে সমাজকে যখন উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া দরকার তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই ঋণপত্রগুলি কিনিয়া লয়, ব্যাঙ্ক ও ব্যক্তিদের হাতে প্রভূত পরিমাণে টাকা ঢালিয়া দেয় এবং ব্যাঙ্কের নগদ জমার অনুপাত কমাইয়া দেয়। এইরূপে চরম সমৃদ্ধি বিন্দুর (Boom) পূর্বে সমাজে বেসরকারী বিনিয়োগের মাত্রাতিরিক্ততা রোধ করার চেষ্টা করে; আবার চরমসংকটবিন্দু (slump) হইতে সমাজকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে বেসরকারী বিনিয়োগের মাত্রাধিক ঘাটতি দূর করার চেষ্টা করে।

খোলাবাজারী নীতি ও নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন

কিন্তু টাকার যোগান বাড়াইবার এই আর্থিক নীতিসমূহ সর্বদা সফল হয় বলিয়া মনে করা চলে না। অতিরিক্ত মাত্রায় সমৃদ্ধি ঠেকাইবার চেষ্টা সফল হয় না, কারণ আজকালকার রাষ্ট্রেরা সর্বদা প্রভূত পরিমাণে ঋণ করে বলিয়া বাজারে অজস্র ঋণপত্র থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকা তুলিয়া লইবার জন্য যদি আরও কিছু ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া দেয়, তবে ব্যাঙ্কগুলি বা ব্যক্তিরা পুরাণো ঋণপত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করিয়া বা জমা রাখিয়া আবার নিজেদের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়াইতে পারে। উপরন্তু এই সময়ে নগদ-পছন্দ ভয়ানক কমিয়া যাইতে পারে। তীব্র মুদ্রাস্ফীতির দরুণ টাকার মূল্য দ্রুত কমিতেছে, জিনিসপত্র কিনিয়া রাখাই ভাল, এইরূপ মনে করিয়া লোকে বেশি টাকা বাজারে ছাড়িয়া দিতে পারে। আবার সংকটকালে, টাকার পরিমাণ বাড়াইলেই উন্নতি দেখা দেয় না, কেহ ধার নিতে চাহে না, বিনিয়োগ করার ইচ্ছা না থাকিলে ব্যাঙ্কঋণের প্রসার

কিন্তু এই নীতিগুলি বাণিজ্য চক্র রোধ করিতে পারে না

সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, এই সময়ে ব্যবসায় মন্দা বলিয়া লোকের নগদ পছন্দ বেশি হইতে পারে, ভবিষ্যতের উন্নতি আশা করিয়া বর্তমানে বেশি টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে। (খ) আর্থিক নীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হইল সুদ-নীতি। চরমসমৃদ্ধির বিন্দুতে পৌঁছাইলে এই সমৃদ্ধির বুদ্বুদ্ ফাটিয়া যাইবে, তাই তাহার পূর্বে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের অস্বাভাবিক প্রসার রোধ করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে অনেকে বলেন যে সুদের হার বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। বেশি সুদের হারে উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ কমাইয়া দেয়। আবার সংকটকাল হইতে উন্নতি ঘটাইতে হইলে সুদের হার কমাইয়া দেওয়া দরকার, কারণ তবেই বিনিয়োগ বাড়িতে পারে।

সুদের হার পরিবর্তন

সুদের হারে পরিবর্তন ঘটানর এই নীতির কত প্রকার সীমাবদ্ধতা আছে তাহা আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। সেই সকল সীমাবদ্ধতা ছাড়াও এই নীতির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলার আছে। বিনিয়োগের আতিশয্য বন্ধ করিয়াই সংকট ঠেকান যায়, তাই সুদের হার বাড়াইয়া বিনিয়োগ বন্ধ করা দরকার, এই বক্তব্যে ত্রুটি আছে। কেইন্‌স বলেন যে, সুদের হার বাড়াইয়া চরম সমৃদ্ধির বিন্দুতে পৌঁছান রোধ করার এই নীতি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা চরম-সমৃদ্ধিতে পৌঁছাইতে চাই এবং সেই স্তরেই অর্থনৈতিক কাঠামোকে রক্ষা করিতে চাই (Stabilisation at full employment point), ইহা মনে রাখা দরকার। সুদের হার বাড়াইলে সমাজের পক্ষে দরকারী অনেক বিনিয়োগ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে, লোকের ভোগপ্রবণতা কমিয়া যাইতে পারে, দেশের মোট ব্যয় ও কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ অবনতি ও সংকট শুরু হইয়া যাইতে পারে, সমৃদ্ধির যুগে সুদের হার বাড়ান তাই আত্মঘাতী নীতি। এই সময় আপ্রাণ চেষ্টা করা দরকার যাহাতে আয়বণ্টনে পরিবর্তন আনিয়া বা অন্য যে কোন পদ্ধতিতে দেশের ভোগপ্রবণতা বাড়াইয়া তোলা যায়, কিছুতেই যেন কার্যকরী চাহিদা কমিয়া না যায়।* তাই কেইন্‌সের মতে চরমসমৃদ্ধির বুদ্বুদ্ ঠেকাইতে হইলে

কিন্তু কেইন্‌স্ বলেন উহা সম্পূর্ণ ভুল নীতি

* 'The remedy would not lie in the clapping on a high rate of interest which would probably deter some useful investments and might further diminish the propensity to consume, but in taking drastic steps, by redistributing incomes or otherwise, to stimulate propensity to consume." Keynes, *General theory*, P. 321.

কিছুতেই উচ্চসুদের হার ধার্য না করিয়া নিম্নসুদের হারের নীতি অনুসরণ করা দরকার। সমৃদ্ধির বিলোপ করিয়া আমাদের আধা-সংকটের স্তরে ফেলিয়া রাখা বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধের সঠিক পথ নয়, ইহার নির্ভুল পন্থা হইল সংকটের বিলোপ সাধন এবং প্রায়-সমৃদ্ধির স্তরে আমাদের স্থায়ীভাবে রক্ষা করা। তাই সুদের হার বাড়াইবার নীতি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, ইহা রোগীকে মারিয়া অসুখ সারানোর নীতির মতই বিপজ্জনক।* এইসকল বিচার করিয়া কেইনস্ বলিয়াছেন, "The remedy would lie in various measures designed to increase the propensity to consume by the redistribution of incomes or otherwise". এই উদ্দেশ্যে, তাই তিনি আর্থিক নীতি অপেক্ষা ফিস্‌কাল নীতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

আমরা জানি যে, কার্যকরী চাহিদার তীব্র উঠানামাকেই বাণিজ্যচক্র বলে তাই সমাজের সামগ্রিক ব্যয়ে হঠাৎ হ্রাসবৃদ্ধি ঠেকান দরকার। সামগ্রিক ব্যয়ের মধ্যে আছে ভোগব্যয়, বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারী ব্যয়; সংক্ষেপে আমরা বলিতে পারি যে $Y=C+I+G$. আর্থিক নীতিগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হইল I-এর পরিমাণে অস্থিরতা রোধ করা; আর ফিস্‌কাল নীতির প্রধান লক্ষ্য হইল C এবং G এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে Y-তে তীব্র উঠানামা না হইতে পারে। সরকারী কর আদায়, ব্যয়, বাজেট গঠন এই সকল মিলিয়া ফিস্‌কাল নীতি গঠিত; বাণিজ্যচক্ররোধের কাজে নিযুক্ত হইলে ইহাকে চক্র-বিরোধী ফিস্‌কাল নীতি বলে (contra-cyclical Fiscal Policy)। বেসরকারী ভোগব্যয় ও বিনিয়োগের হঠাৎ কমিয়া যাওয়াই সংকটের কারণ, এই অবস্থায় পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে থাকিতে গেলে সমাজে যতটা সামগ্রিক ব্যয় দরকার হইত ততটা হইতেছে না, ফাঁক থাকিয়া যাইতেছে। এই ফাঁক বা ব্যবধান পূরণ করাই তখন ফিস্‌কাল নীতির লক্ষ্য। ইহাকে তাই পূরণমূলক ফিস্‌কাল নীতিও বলা

ফিস্‌কাল নীতির গুরুত্ব ও বিভিন্ন অংশ

* "Thus the remedy for the boom is not a higher rate of interest but a lower rate of interest! For that may enable the so-called boom to last. The right remedy for the trade cycle is not to be found in abolishing booms and thus keeping us permanently in a semi-slump; but in abolishing slumps and thus keeping us permanently in a quasi boom .....Thus an increase in the rate of interest, as a remedy for the state of affairs arising out of a prolonged period of abnormally heavy new investment, belongs to the species of remedy which cures the disease by killing the patient." Keynes *General theory*, P. 322-323.

হইয়া থাকে (Compensatory Fiscal Policy)। ইহার দুইটি দিক: (ক) পূরণমূলক ব্যয়ের নীতি (Compensatory Spending Policy) এবং পূরণমূলক করনীতি (Compensatory tax policy)।

সরকারী ব্যয়ের নীতি বা পূরণমূলক ব্যয়ের নীতি আলোচনা করা দরকার। সরকারী ব্যয়কে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে: (১) সাধারণ পরিচালনামূলক ব্যয় (ordinary operating expenses of Government) (২) হস্তান্তর ব্যয় (Transfer payments), এবং (৩) উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় বা সরকারী বিনিয়োগ (outlay on public works or public investment)। বাণিজ্য-চক্র নিয়ন্ত্রণের উপযোগী করিয়া সরকারের সাধারণ পরিচালনামূলক ব্যয় নির্বাহ করা চলে না। হস্তান্তর ব্যয়সমূহ বাণিজ্যচক্রের প্রকোপ রোধ করিতে পারে, যেমন সংকটকালে অধিকতর বার্ধক্য পেনসন, বেকারভাতা প্রভৃতি দিয়া সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়াইবার চেষ্টা করা চলে। সরকারী নির্মাণ কার্য বা বিনিয়োগ এমনভাবে কমান বাড়ান চলে যাহাতে বাণিজ্যচক্রের উঠানামার ব্যাপ্তি কিছুটা হ্রাস পায়। এইরূপে সরকারী ব্যয়-নীতির দ্বারা সমাজের ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয় উভয়ের উপরই কিছুটা প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা যায়।

পূরণমূলক ব্যয়ের নীতি কিরূপে কাজ করে

পূরণমূলক করনীতির গুরুত্ব খুবই বেশি, কারণ আমরা উপরে দেখিয়াছি, মোট সরকারী ব্যয়ের মধ্যে মাত্র অল্প একটু অংশকে বাণিজ্যচক্র রোধের কাজে কমান বা বাড়ান চলে। করনীতিকে দুইটি উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা চলে। যেমন, করের সাহায্যে দেশের আয়-বৈষম্য হ্রাস করা যায়, ফলে সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়িতে পারে। ধনীদের ভোগ প্রবণতা কম, তাহাদের নিকট হইতে আরও বেশি কর আদায় করিলে সমাজের মোট ভোগব্যয় বিশেষ হ্রাস পায় না। সেই টাকা দরিদ্রদের হাতে দিলে সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়ে, কারণ তাহাদের ভোগ-প্রবণতা বেশি। তাহা ছাড়া, বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়াইবার কাজেও করনীতিকে প্রয়োগ করা যায়। করের প্রকৃতি ও কর-হার সেইরূপ হওয়া দরকার যাহাতে সংকটকালে বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়ে, আবার স্ফীতি-কালে বেসরকারী বিনিয়োগ কমে। কর-কাঠামো এরূপ নমনীয় থাকা দরকার যাহাতে বাণিজ্যচক্রের গতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি করের হার ও দিক পরিবর্তন করা সম্ভব। দেশের কর-কাঠামোর মধ্যে এইরূপ করের ব্যবস্থা রাখিতে পারিলে সমৃদ্ধির যুগে

পূরণমূলক করনীতির কাজ কিরূপ

আপনা-আপনি উহা হইতে আদায় বেশি হয়। আবার সংকটকালে আপনা-আপনি আদায় কম হয়। বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন স্তরে এই করগুলি হইতে আদায় নিজ হইতে পরিবর্তিত হইয়া চক্রের প্রকোপ উভয় দিকেই কমাইতে পারে। ইহাদের তাই বলে স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্বসাধনকারী শক্তি (Automatic Stabilisers)।

ফিস্‌ক্যাল নীতির এই দুই অঙ্গ—সরকারী ব্যয় নীতি ও করনীতি—বাস্তবে কাজ করে বাজেটের (budget) মধ্য দিয়া। প্রতি বৎসর বাজেটে সরকারী আয় ও ব্যয় সমান রাখিবার ক্লাসিকাল নীতি পরিত্যাগ না করিলে বাণিজ্যচক্র বিরোধী ফিসকাল নীতি কার্যকরী করা চলে না। বাজেটে প্রতি বৎসর সমতাবিধান করা একান্ত গোঁড়ামি. বাণিজ্যচক্র রোধ করিবার উদ্দেশ্যেই চক্রকালীন বাজেট রচনা করা দরকার (cyclical budgeting)। যেমন, সমৃদ্ধির প্রাবল্যকে বাধা দিতে পারিলে আসন্ন সংকট রোধ করা যায়, তাই এই যুগে ব্যয় কমাইয়া আয় বাড়াইয়া বাজেটে উদ্বৃত্ত রাখা প্রয়োজন। সমৃদ্ধি যুগের বাজেট রচনায় সমতা রাখিলে চলে না। অপর পক্ষে সংকটকালে ব্যয় বাড়াইয়া আয় কমাইয়া বাজেটে ঘাটতি রাখা দরকার। সেই সময়েও বাজেটে সমতার নীতি গ্রহণীয় নয়। উদ্বৃত্ত বাজেটের সময় যে অর্থ ছাঁকিয়া তোলা হইয়াছিল, ঘাটতি বাজেটের সময়ে তাহা ঢালিয়া দেওয়া দরকার। এইরূপে সমগ্র চক্রকাল লইয়া একটি বাজেট রচনা করা চলে, এই চক্রকালের উভয় দিক লইয়া মিলিতভাবে বাজেটে পূর্ণ-চক্রকালীন সমতা থাকিলেই চলিবে।

চক্রকালীন বাজেট রচনার নীতি

সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার যে, বাণিজ্যচক্র শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোর অঙ্গ, এই পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থাতেই ধনতান্ত্রিক দেশে সুদীর্ঘকালীন ক্রমপ্রসার ঘটে; নিয়মিত ঝাঁকুনি, উঠানামা ও অস্থিরতা এই প্রকার সমাজের আভ্যন্তরীণ গতি-প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এইরূপ সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের হাতে, তাঁহারা সমাজের প্রয়োজনের কথা না ভাবিয়া নিজ মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন করেন। বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন এই উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের পিছনে সারা দেশব্যাপী কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা নাই। বাণিজ্যচক্র রোধ করার পন্থা হিসাবে কেইন্‌সের মত সমর্থন করিয়া বেশির ভাগ ধনবিজ্ঞানীই আজকাল বলেন যে, বিনিয়োগের সামাজিক

কিন্তু বিনিয়োগের সামাজিক নিয়ন্ত্রণই একমাত্র পথ

নিয়ন্ত্রণই বাণিজ্যচক্র রোধ করার অন্যতম প্রধান পথ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার অবস্থা অনুযায়ী বিনিয়োগের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন রূপ লইতে পারে, কিন্তু ইহাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

অনুন্নত দেশ ও বাণিজ্যচক্র:

অনুন্নত দেশসমূহে বাণিজ্যচক্র দেশের অভ্যন্তরে কৃষি-উৎপাদনে উঠানামার উপরেই প্রধানত নির্ভর করে; শিল্পের সংখ্যা, পরিমাণ ও শিল্পে বিনিয়োগ এইরূপ দেশে কম। তবে, অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশসমূহের সহিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে যোগসূত্র থাকায় অপর দেশের সমৃদ্ধি ও সংকট উভয়ই অনুন্নত দেশসমূহে প্রবেশ করে।

আধুনিক কালে আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হওয়ায় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান প্রদান বাড়িয়া যাওয়ায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চল আর বিশেষ নাই; বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পরস্পর নির্ভরশীল ও সংযুক্ত। সুতরাং কোন উৎপত্তি-কেন্দ্র (Epicentre) হইতে সুরু হইয়া ভূমিকম্প যেরূপ বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে, অর্থনৈতিক জগতেও কোন দেশের সংকট বা সমৃদ্ধি এইরূপে বিভিন্ন দেশে ছড়াইতে থাকে; ইহারা কিরূপ ছড়াইবে তাহা নির্ভর করে প্রতিবেশী দেশসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক ও ত্বরকের আয়তনের উপর।

যদি কোন অনুন্নত দেশ প্রধানত কৃষিজাত কাঁচামাল রপ্তানি করে তাহা হইলে অধিক রপ্তানি এবং বাণিজ্য হারে আনুকূল্যের মাধ্যমে সে আমদানিকারী উন্নত দেশের সমৃদ্ধির অংশ লাভ করে। সংকটের সময়ে তাহার দুরবস্থা দুই প্রকারের:
(ক) কৃষিজাত কাঁচামালের চাহিদা কমিয়া যাইয়া রপ্তানির উদ্বৃত্ত থাকে না।
(খ) সংকটে বিপন্ন উন্নত দেশগুলি হইতে অবিক্রীত দ্রব্যসমূহ আসিয়া তাহার দেশের শিশু শিল্পসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করে।

* "In conditions of *laissez faire* the avoidance of wide fluctuations in employment may, therefore, prove impossible without a far-reaching change in the psychology of investment markets such as there is no reason to expect. I conclude that the duty of ordering the current volume of investment cannot safely be left in private hands." Keynes, *General theory*, P. 320.

তবে যদি কোন অনুন্নত দেশ প্রধানত কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানিকারক হয়, তাহা হইলে সংকটের সময়ে তাহার সর্বাধিক সুবিধা, কারণ উন্নত দেশে সংকট আসিলেও সে খাদ্য ক্রয় করিবেই, সুতরাং অনুন্নত দেশের রপ্তানি বিশেষ কমিবে না, অথচ সংকটকালীন সস্তা দামে নিজের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য সে ক্রয় করিতে পারিবে ; বাণিজ্যহার তাহারই অনুকূলে আসিবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে তাহার লাভ বেশি হইতে থাকিবে। উন্নত দেশে সমৃদ্ধি আসিলে অবশ্য তাহার সুবিধা বিশেষ নাই, কারণ সমৃদ্ধির ফলে খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। ঠিক সেই সময়ে শিল্পজাত আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িবার ফলে বাণিজ্যহার তাহার প্রতিকূলে যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ কম হইতে থাকে।

কৃষিজাত কাঁচামাল অথবা খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানি-কারক

অনুশীলনী

1. Explain what is meant by trade cycle and describe the different phases of a trade cycle.

2. Describe the characteristics and phases of a typical business cycle.

3. Discuss Sehumpeters' theory of Business cycles.

4. Discuss the role of Psychological factors in the determination of Business cycles.

5. Examine critically the monetary theory of Trade Fluctuations.

6. In what respects the upper and lower turning points of a trade cycle are dissimilar ?

7. Why Fluctuations are relatively more pronounced in capital goods industries ?

8. Critically examine Hayek's monetary over-investment theory.

9. Critically examine Hayek's Ricardo-effect.

10. "Keynes's-equilibrium theory provides us with the theoritical framework for a theory of stagnation." Explain.

11. Discuss how trade cycle can only be explained through the interaction of multiplier and acceleration.

12. "The Trade cycle is best regarded, I think, as being occasioned by a cyclical change in the marginal efficiency of Capital." (Keynes) Explain.

13. Discuss the role of monetary factors in aggravating the course of Business Fluctuations.

14. Discuss the methods of controlling the Trade Cycles.

15. Compare and evaluate the role of monetary and Fiscal policies in controlling Trade Fluctuations.

১২

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

International Trade

উৎপাদনের উপাদানসমূহ পৃথিবীর সকল অঞ্চলে সমানভাবে বন্টিত নাই; কোন অঞ্চলে কোন উপাদানের পরিমাণ বেশি, কোথাও বা উহার পরিমাণ কম। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে বিভিন্ন উপাদানসমূহ কম বা বেশি পরিমাণে নিয়োগ করা হয়। একটি দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ কোন অঞ্চলে অধিক পরিমাণে ও কম দামে পাওয়া গেলে উহার উৎপাদন-ব্যয় সেখানে কম পড়ে; উপাদানসমূহের যোগান কম হইলে ও দাম বেশি হইলে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় অধিক হয়। সুতরাং কোন বিশেষ অঞ্চলের উপাদান-লভ্যতা

আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ

(Availability of factors) অনুযায়ী সেই অঞ্চল বিশেষ ধরনের দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়; ব্যক্তি যেমন নিজের শক্তি, সামর্থ্য অনুসারে বিশেষ প্রকার কর্মে বা জীবিকাতে নিযুক্ত থাকে, সেইরূপ কোন অঞ্চলও এমন দ্রব্য উৎপাদনে উহার সকল উপাদানসমূহ নিয়োগ করে যাহাতে তুলনামূলক ভাবে, উহার উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাধিক বা উৎপাদন-ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম।

কিন্তু পৃথিবীতে সকল অঞ্চলসমূহ রাজনৈতিক ভাবে এক রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত নহে, বলা যায় যে রাজনৈতিকভাবে পৃথিবী বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারিত আছে। এক রাষ্ট্রের

এই বিষয়ে পৃথক তত্ত্বের দরকার কি?

অধিবাসী ও ব্যবসায়ীদের সহিত অন্য রাষ্ট্রের অধিবাসী ও ব্যবসাদারদের পরস্পরের নিকট হইতে ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন-কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে পৃথক ভাবে আলোচনা করার কারণ কি? কেন এই বিষয়ে পৃথক তত্ত্ব রচিত হইয়াছে ইহার অনেক কারণ আছে। রাজনৈতিক ভাবে রাষ্ট্রবিভাগ রাজনৈতিক কাজ-

কর্মের ক্ষেত্রে বহু প্রকার ও বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রথমত, উপাদানসমূহ একটি দেশের মধ্যে যতখানি চলনশীল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তাহাদের চলনশীলতা তুলনামূলকভাবে আরও কম। দেশের অভ্যন্তরে কোন অঞ্চলে কোন উৎপাদনের দাম বেশি হইলে অন্যান্য অঞ্চল হইতে উপাদানসমূহ সেই অঞ্চলে ধাবিত হয়, ফলে মোটামুটি ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উপাদানের পারিশ্রমিকে অধিক পার্থক্য থাকে না। কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিক, মূলধন বা উদ্যোগ ক্ষমতার চলনশীলতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম; অন্য রাষ্ট্রে মজুরি, সুদ বা মুনাফা অধিক হইলেও উপাদানসমূহ নিজের রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া অন্য রাষ্ট্রে যাইতে চাহে না। ফলে সকল রাষ্ট্রে উপাদানসমূহের পারিশ্রমিকের হার সমান নহে; বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের উপর ইহার বিশেষ প্রভাব দেখা দেয়।

কারণ ইহা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে পৃথক

তুলনামূলক চলনশীলতা

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থা আছে, এক রাষ্ট্রের টাকা অপর রাষ্ট্রে লেনদেনের কার্যে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক দেশের টাকাকে অন্য দেশের টাকায় রূপান্তরিত করিতে হয়, উপরন্তু এক দেশের টাকার বিনিময়ে অপর দেশের যে পরিমাণ টাকা পাওয়া যায় সেই বৈদেশিক বিনিময় হার বা টাকার বৈদেশিক মূল্যও সকল সময় স্থির থাকে না, তাহার উঠানামা ঘটে।

নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থা

তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক কাজকর্ম, উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়, প্রভৃতিনিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ ধরনের আইন-কানুন বা রীতি-নীতি, প্রথা প্রভৃতি প্রচলিত থাকে, তাহাও সেই দেশের উৎপাদন-ব্যয়কে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। প্রত্যেকটি দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পৃথক ধরনের, তাহাদের রীতি-নীতি ও যোগাযোগ পৃথক। সুতরাং বিভিন্ন দেশের উৎপাদন স্বতন্ত্র পরিবেশে পরিচালিত হয়।

পৃথক অর্থনৈতিক সংগঠন ও পরিবেশ

সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক জগতে রাষ্ট্রসমূহ প্রত্যেকে নিজস্ব বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে এবং অপর রাষ্ট্র হইতে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি-রপ্তানিতে বিভিন্ন ধরনের বাধা নিষেধ আরোপ করে। দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের মাল চলাচলের উপর সাধারণত এইরূপ কোন বাধা নিষেধ থাকে না। এই সকল কারণে আন্তর্জাতিক

পৃথক বাণিজ্য নীতি

বাণিজ্যের তত্ত্বকে পৃথক করিয়া আলোচনা করা হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি, রীতিনীতি ও সমস্যার বিশ্লেষণ এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি : উৎপাদন ব্যয়সমূহের অনুপাতে পার্থক্য (The basis of International trade : Difference in cost-ratios) :

কেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব হয় বা কেন এক দেশে বিশেষ ধরনের দ্রব্যাদি আমদানি বা রপ্তানি করে তাহা বিশ্লেষণের জন্ম ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা উৎপাদনব্যয়ের পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, প্রত্যেকটি দেশ

কোন্ ধরনের দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি

সেই সকল দ্রব্যই উৎপাদন করিবে যাহাদের উৎপাদনে তাহার স্বাভাবিক দক্ষতা বা সুবিধা তুলনামূলকভাবে অধিক। সেই জমি, খনিজ ও কৃষিসম্পদ, লোকের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতির দরুণ যে সকল দ্রব্যের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, সেই দেশ সেই সকল দ্রব্যই উৎপন্ন করিবে। নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া সেই উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি হিসাবে অন্য দেশে প্রেরণ করিবে এবং অন্য দেশ হইতে এমন দ্রব্য আমদানি করিবে যাহার উৎপাদনে তাহার স্বাভাবিক সুবিধার পরিমাণ অপর দেশের তুলনায় কম।*

কি কি ধরনের পণ্য উৎপাদনে কোন দেশের কিরূপ স্বাভাবিক সুবিধা আছে তাহা এই সকল দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয়ের দ্বারা প্রকাশ পায়। একটি দ্রব্য অন্য দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিলে বুঝা

* "To the question which goods a country will import and which it will export, the classical theory gives the following answer. Each country will produce those goods for the production of which it is especially suited on account of its climate, of the qualities of its soil, of its other natural resources, of the innate and acquired capacities of its people, and—this must be given special emphasis—of the real capital which it possesses as a heritage from its past, such as buildings, plant and equipment, and means of transport. It will concentrate upon the production of such goods, producing more of them than it requires for its own needs and exchanging the surplus with other countries against goods which it is less suited to produce or which it cannot produce at all." Haberler, *International Trade* P. 125

যাইবে যে এই দ্রব্য উৎপাদনে স্বাভাবিক সুবিধা বেশি বলিয়া ব্যয় কম পড়িতেছে। এই ব্যয়-পার্থক্য তিন প্রকারের হইতে পারে: সমান ব্যয় পার্থক্য, চরম ব্যয়-পার্থক্য এবং তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য।

(ক) সমান ব্যয় পার্থক্য (Equal difference in costs) :

যদি উভয় দেশের মধ্যে উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে সমান পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে সেই অবস্থায় উহাদের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে না। যেমন, ধরা যাউক—

A দেশে,	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	20 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	30 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়,
আবার, B দেশে,	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	30 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	45 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়।

এমতাবস্থায়, A দেশে 1 ইউনিট ধানের বিনিময়ে $1\frac{1}{2}$ ইউনিট কাপড় পাওয়া যায়, কারণ উভয়ের উৎপাদন-ব্যয় সমান। B দেশে উভয় দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ বিনিময় হার হইল 1 ধান : $1\frac{1}{2}$ কাপড়। এই অবস্থায় উভয় দেশে দ্রব্যের মধ্যে ব্যয়ের অনুপাত সমান হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হইতে পারে না, কারণ কেহ কোন দ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়া নিজের দেশে যাহা পাওয়া যায় তাহার অধিক অন্য দ্রব্য পাইতে পারে না। অবশ্য এই অবস্থাতেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হইয়া গেলে উপাদানের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন ঘটিলে, উৎপাদন ব্যয়ে পরিবর্তন আসিবে, ব্যয়-পার্থক্যের অনুপাত সমান থাকিবে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্ভাবনা উন্মুক্ত হইবে।

(খ) চরম ব্যয় পার্থক্য (Absolute difference in costs) :

যদি উভয় দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে চরম পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য হওয়া সম্ভবপর। যেমন, ধরা যাউক—

A দেশে,	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	20 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	10 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়।
B দেশে,	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	10 ইউনিট ধান, এবং
	20 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	20 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়।

A দেশের মধ্যে 1 ইউনিউ ধানের বদলে $\frac{1}{2}$ ইউনিউ কাপড় পাওয়া যায়, B দেশের মধ্যে 1 ইউনিট ধানের বদলে 2 ইউনিট কাপড় পাওয়া যায়। A দেশের

ধান উৎপাদনে চরম সুবিধা এবং B দেশের কাপড় উৎপাদনে চরম সুবিধা। উৎপাদন ব্যয়েও চরম পার্থক্য ; A দেশ ধান উৎপাদনে, B দেশ কাপড় উৎপাদনে তাহাদের সকল উপাদান নিয়োগ করিবে। এইরূপে উভয় দেশের নিজস্ব স্বাভাবিক সুবিধা অনুযায়ী উপাদান নিয়োগের ফলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণই বৃদ্ধি পাইবে। পূর্বে যে-ব্যয়ে 20+10=30 ইউনিট ধান এবং 10+20=30 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হইতেছিল, বাণিজ্যের দরুণ আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের ফলে সেই একই ব্যয়ে 20+20=40 ইউনিট ধান এবং 20+20=40 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বহুলাংশ এইরূপ চরম ব্যয়-পার্থক্যের উপর নির্ভর করে; পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশের ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে বিনিময় ও বাণিজ্যের দিকে লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যায়।*

(গ) তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য (Comparative difference in costs) :

উৎপাদন ব্যয়ে চরম পার্থক্য না থাকিয়া তুলনামূলক পার্থক্য থাকিলেও উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে। যেমন, ধরা যাউক—

A দেশে,	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	20 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	20 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়,
B দেশে,	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	20 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	30 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়।

A দেশে উভয় দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাত হইল 1 : 1 এবং এই হারেই দেশের মধ্যে উহাদের বিনিময় হইতে থাকিবে। কিন্তু B দেশে উভয় দ্রব্যেই উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাত হইল 1 : $1\frac{1}{2}$, দেশের অভ্যন্তরে উহাদের এই হারেই বিনিময় হয়। কোন দেশেরই কোন দ্রব্য উৎপাদনে চরম সুবিধা নাই, তুলনামূলক ভাবে B দেশের কাপড় উৎপাদনে সুবিধা বেশি। যেহেতু

* "The classical doctrine assumes that labour is completely mobile within a country and therefore distributes itself among the different branches of production in such a way that its marginal productivity is everywhere equal to its wage. This rule does not apply to international trade, since labour is not mobile between countries. This immobility of factors between two countries clearly will not matter if the distribution of labour between them happens to be the same as that which would come about under complete mobility. In such circumstances an exchange of goods will take place only if each of the two countries can produce one commodity at an *absolutely lower production cost* than the other country... ..A large part of world trade rests upon absolute differences in cost. One thinks at once of the trade between the temperate zones and the tropics......The same applies to the exchange of goods between agricultural countries with fertile land and industrial countries with deposits of coal and iron." Haberler, *International Trade* P. 127-28.

দুই দেশের মধ্যে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে ব্যয়-পার্থক্য আছে, সেইজন্য উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারিবে।

তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্যের নীতি

A দেশের ব্যবসায়ীগণ 1 ইউনিট ধানের বদলে নিজের দেশে 1 ইউনিট কাপড় পায়, তাহারা B দেশ হইতে 1 ইউনিট কাপড়ের কিছু বেশি পাইয়া 1 ইউনিট ধান রপ্তানি করিবে। অপরদিকে, B দেশের ব্যবসায়ীগণকে 1 ইউনিট ধান পাইতে হইলে নিজের দেশে 1½ ইউনিট কাপড় দিতে হয়, তাহারা 1½ ইউনিট কাপড়ের কিছু কম বিদেশে রপ্তানি করিয়া 1 ইউনিট ধান আমদানি করিবে। সুতরাং A দেশের উৎপাদকগণ ধানের রপ্তানিতে ও কাপড়ের আমদানিতে আত্মনিয়োগ করিবে; অপরপক্ষে B দেশের উৎপাদকগণ কাপড়ের রপ্তানি ও ধানের আমদানি করিতে থাকিবে। ধরা যাউক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হইবার পরে উভয় দ্রব্যের বিনিময়ের অনুপাত হইয়াছে 1 ইউনিট ধান=1¼ ইউনিট কাপড়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে A দেশ প্রতি ইউনিট ধান রপ্তানি করিয়া ¼ ইউনিট লাভ (gain) করিতেছে; B দেশেও প্রতি 1 ইউনিট ধানের আমদানিতে ¼ ইউনিট কাপড়লাভ (gain) হইতেছে। উভয় দেশেই উপাদান-সমূহের নিয়োগে পুনর্বিন্যাস হইতেছে, A দেশের উৎপাদকগণ কাপড়ের উৎপাদন হইতে উপাদানসমূহ অপসারণ করিয়া উহাদের ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিতেছে; B দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদন হইতে উৎপাদনসমূহ অপসারণ করিয়া উহাদের কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করিতেছে। উভয়ের স্বাভাবিক সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদন হওয়ায় এবং আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হওয়ায় উভয় দেশের শ্রমিক-দক্ষতা ও উভয় দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ফলে, উভয় দেশের জনসাধারণের আয়স্তর ও জীবন-যাত্রার মান উন্নত হইতেছে।*

---

* "The theorem can be expressed algebraically. Let us call the labour-cost of goods A in the country I a_1 and in country II a_2, and the labour cost of goods B in country I b_1 and in country II b_2, Then there is an absolute difference in costs if $\frac{a^1}{a_2} < I < \frac{b^1}{b_2}$. Country I has an absolute advantage over country II in A, and country II has an absolute advantage over country I in B. Here is a comparative difference in costs if $\frac{a^1}{a_2} < \frac{b^1}{b_2} < I$. This means that country I has absolute superiority over country II in both goods but that its superiority is greater in A than B." Haberler, *International Trade*, P. 129.

সমালোচনা :—অনেকে বলেন যে এই তত্ত্ব আলোচনার সময় এমন সব বিষয় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে (Assumptions) যাহাদের কোন সত্যতা নাই। কিন্তু যদি স্বীকার্য বিষয়সমূহ একে একে অপসারণ করা যায়, তাহা হইলেও তুলনামূলকব্যয়ের নীতি বা এই নিয়ম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ ব্যাখ্যার পক্ষে সঠিক বিশ্লেষণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। (১) দ্রব্যের বা দেশের সংখ্যা বাড়াইলেও ইহা লক্ষ্য করা যায় যে কোন দেশের মধ্যে যে সকল দ্রব্যসমূহের ব্যয় তুলনামূলকভাবে অন্য দেশগুলির ব্যয় হইতে কম, সেগুলি রপ্তানি হয়, এবং যে সকল দেশের ব্যয়ের তুলনায় কম সেই সকল দেশেই উহাদের রপ্তানি হইয়া থাকে। (২) শ্রমশক্তির হিসাবে উৎপাদন-ব্যয় হিসাব না করিয়া টাকার হিসাবে দ্রব্যের প্রান্তিক ও গড় ব্যয়ের হিসাব করিলেও তুলনামূলক ব্যয়ের নীতির মূলকেন্দ্র সঠিক বলিয়া ধরা যায়। কারণ, টাকার সাহায্যে হিসাব করিলেও ইহা ভুল নয় যে, যে সকল দ্রব্যসামগ্রী অধিক ব্যয়ে নিজের দেশে উৎপন্ন করিতে হয় আমরা তাহা বিদেশ হইতে আমদানি করার চেষ্টা করি এবং উহার বিনিময়ে আমাদের দেশ হইতে সেই দ্রব্যই রপ্তানি করি যেগুলির উৎপাদন-ব্যয় কম। দেশের পক্ষে এই নীতি যে লাভজনক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। (৩) ক্লাসিকাল তত্ত্ব ধরিয়া লইতেছে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হইবার পরেও দেশে উপাদান-নিয়োগে পুনর্বিন্যাস সমান থাকে, এবং কোন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাসের দরুণ ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয়ে কোনও রূপ পরিবর্তন হয় না। বাস্তব জীবনে কিন্তু ইহা সত্য নয়, উৎপাদন ব্যয় বাড়িতে পারে বা কমিতেও পারে। কিন্তু তাহাতেও নীতি হিসাবে তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয় না। উভয় দ্রব্যেরই উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকিলে অবশ্য এমন এক সময় আসিবে যখন ব্যয়-পার্থক্য বিলুপ্ত হইবে, বাণিজ্যে লাভ না থাকায় উভয় দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানিই বন্ধ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ সেই সময়ে তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য না থাকায় বাণিজ্য চলিবে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বহুদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য চলে, কাহারও উৎপাদন-ব্যয় বাড়ে বা কাহারও কমে, উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ হইয়া গেলে উৎপাদন আর বাড়ান যায় না, উৎপাদন-ব্যয়েও বিশেষ পরিবর্তন আসে না, সুতরাং এক দেশের সহিত অন্য দেশের বাণিজ্য সর্বদাই চলিতে পারে এবং তুলনামূলক ব্যয়-

সমালোচনা ও তাহার উত্তর

প্রতিদানের নিয়ম ও তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের নীতি

পার্থক্যই তাহার কারণ। উৎপাদন-ব্যয়ে হ্রাস বৃদ্ধি ব্যয়-পার্থক্যের পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ বাড়ায় বা কমায়। (৪) বলা হয় যে, ক্লাসিকাল তত্ত্ব পরিবহন-ব্যয়ের হিসাব করে না, সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ বাস্তব অবস্থাবিচ্যুত ধারণা। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, আলোচনার সুবিধার জন্যই পরিবহন-ব্যয়ের হিসাব এই তত্ত্বের মধ্যে নাই। পরিবহন-ব্যয় ধরিয়া লইলে এই নীতিকে এইরূপ বলা যায় যে, দ্রব্যের পরিবহন-ব্যয় হইতে উভয় দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যটুকু অধিক হইলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব। অবশ্য পরিবহন-ব্যয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও উহা হইতে লাভের আয়তন কমাইয়া দেয়, ইহা অবশ্যই বলা চলে।

পরিবহন ব্যয় ও তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের নীতি

এই তত্ত্বের কয়েকটি দিক (Certain aspects of this doctrine)

(ক) প্রতিদানের নিয়ম ও তুলনামূলক ব্যয়ের তত্ত্ব (Laws of Returns and the doctrine of comparative costs):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা সমহার প্রতিদানের নিয়ম ধরিয়া লইয়া এই তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। উপরের উদাহরণে আমরা দেখিয়াছি যে, A দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদনে সকল উপকরণ নিয়োগ করিতে থাকিবে এবং কাপড়ের উৎপাদন হইতে উপকরণ সরাইয়া আনিতে থাকিবে। অপরপক্ষে, B দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদন হইতে উপকরণ সরাইয়া কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করিতে থাকিবে। তাহাদের উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ে কোন দেশে কোনরূপ পরিবর্তন আসে না, অর্থাৎ সমব্যয়ের নীতি কার্যকরী হইতে থাকিবে। এইরূপ ঘটিলে ব্যয়ের অনুপাতে প্রথমে যে পার্থক্য ছিল, অর্থাৎ যে পার্থক্যের দরুণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হইতে পারিয়াছিল, সে পার্থক্য অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে। A দেশ ধানের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াইলে এবং কাপড়ের উৎপাদন ক্রমাগত কমাইলে ব্যয়ের অনুপাতে কোন পার্থক্য আসে না, B-র ক্ষেত্রেও সেইরূপ। উভয় দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার চলিতেই থাকিবে, কারণ ব্যয়পার্থক্য কখনই মিলাইয়া যাইতেছে না।

সমহার প্রতিদানের নিয়ম ও এই তত্ত্ব

কিন্তু এইরূপ অবস্থা ধরিয়া লওয়া চলে না, ইহা অতি অবাস্তব ব্যাপার।

সাধারণভাবে আমরা মনে করিতে পারি যে, দ্রব্যের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াইলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Diminishing Returns) দেখা দেয়। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ক্রমাগত A দেশে ধানের প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে ও কাপড়ের প্রান্তিক ব্যয় কমিবে; আবার B দেশে কাপড়ের প্রান্তিক ব্যয় বাড়িবে ও ধানের প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পাইবে। কিছুদিন পরে দেখা যাইবে উভয় দেশেই উভয় দ্রব্যের ব্যয়-পার্থক্যের অনুপাত সংকুচিত হইয়া আসিয়াছে, ক্রমে পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। A দেশে ধানের উৎপাদন ব্যয় বাড়িতেছে, কিছুদিন পরে A দেখিবে আর ধান রপ্তানিতে লাভ (gain) নাই, এদিকে নিজের দেশে কাপড়ের ব্যয় কমিয়াছে, B হইতে আর কাপড় আমদানি না করিয়া (B-তে ব্যয় বাড়িতেছে) নিজের দেশে কিছু কাপড় উৎপাদন করাই সুবিধাজনক। ঠিক এইরূপ, B দেশে ধান উৎপাদন কমাইয়া দেওয়ায় উহার উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে, কাপড়ের উৎপাদনব্যয় বাড়িয়াছে, A-র সহিত তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য কমিয়া আসিয়াছে। যতদিন না উভয় দেশে উভয় দ্রব্যের ব্যয় পার্থক্যের অনুপাত সমান হয়, ততদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিতে থাকিবে। কিন্তু উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধির নিয়ম কার্যকরী হওয়ায় বিশেষায়ণ সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না, দুইটি দ্রব্যই দুই দেশে কিছুটা পরিমাণে অন্তত উৎপন্ন হইতে থাকিবে।*

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম ও এই তত্ত্ব

কখন বিশেষায়ণ সম্পূর্ণ হয় না

ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইলে, অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় কমিতে থাকিলে বিষয়টি একটু জটিল হইয়া পড়ে। অনেকে আছেন যাঁহারা ক্রমবর্ধমান প্রতিদান ঘটিতেই পারে না বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া চলে না। কোন কোন ক্ষেত্রে, সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হইলেও এই নিয়ম কার্যকরী হয় বলিয়া দেখা যায়, এবং সেই সকল ক্ষেত্রের আলোচনাও আমরা একেবারে বাদ দিতে পারি না। গ্রাহাম (Graham)

* আরও দুইটি কারণে বিশেষায়ণ সম্পূর্ণ না হইতে পারে। (ক) যদি ধান বা কাপড়ের মধ্যে কিছু অংশ বিশেষ গুণসম্পন্ন বা অত্যন্ত ভাল ধরনের হয়, তবে বেশি ব্যয় ও দাম থাকিলেও বাহিরের বাজারে উহা কিছুটা বিক্রয় হইতে পারে, তাই দেশের মধ্যে উহার উৎপাদন চলিতে থাকিতে পারে। (খ) শুল্ক বা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে রাষ্ট্র তেমন দ্রব্যের উৎপাদন চালাইতে পারে যাহা সাধারণ অবস্থায় এই নীতি অনুযায়ী উৎপন্ন হইত না। শিশুশিল্প বা জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্পের ক্ষেত্রে এইরূপ দেখা যায়।

বলিয়াছেন যে, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইলে ক্লাসিকাল এই তত্ত্ব অর্থাৎ তুলনামূলক ব্যয়ের এই নীতি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়—ইহা আর মানিয়া লওয়া চলে না। তিনি গণিতের একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, দুইটি দেশের মধ্যে তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি অনুযায়ী বাণিজ্য সুরু হইলে উহার মধ্যে একটি দেশকে হয়তো এমন শিল্পের উৎপাদন ছাড়িয়া দিতে হইল যেখানে ক্রমবর্ধমান প্রতিদান কার্যকরী হইতেছিল এবং উপকরণগুলিকে এমন শিল্পে লইয়া আসিতে হইল যেখানে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান ঘটিবে। তাঁহার মতে, কৃষিপ্রধান দেশগুলিরই এই অবস্থা। যেমন, ভারত যদি তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি সম্পূর্ণ মানিয়া চলে, তবে হয়তো তাহাকে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান-শীল চা-শিল্পের প্রসার ঘটাইতে হইবে কিন্তু ক্রমবর্ধমান প্রতিদানশীল কোন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন কমাইতে হইবে। শিল্পপ্রধান দেশগুলির অবস্থা এই বিষয়ে খুবই সুবিধাজনক—যে সকল শিল্পে ব্যয় হ্রাস পায়, তাহারা সেই শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা বা প্রসার করিতে থাকিবে।

ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম ও এই তত্ত্ব

গ্রাহামের এই বক্তব্য আমরা মানিয়া লইতে পারি না। দীর্ঘকালে কোন শিল্পে ক্রমবর্ধমান প্রতিদান চলিতে পারে না; কিছুকাল পরেই অবশ্যম্ভাবী নিয়ম অনুসারে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান শুরু হয়। এই নিয়মের কার্যকারিতা ধরিয়া লইলেও আমরা জানি যে, সেই অবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হয় এবং একচেটিয়া দেখা দেয়। কোন শিল্পে একচেটিয়া দেখা দিলে উহা নিশ্চয়ই উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করিবে এবং দাম বাড়াইয়া রাখিবে, ও সেই দামে চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিতে থাকিবে।

কিন্তু আমরা পূর্ণ প্রতিযোগিতা ধরিয়া লইতে পারি না

একটি কথা মনে রাখা দরকার। যদি ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাইতেছে এইরূপ কোন শিল্প অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের অধীন কোন শিল্প বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়া পড়ে, প্রতিযোগিতায় হটিয়া গিয়া উৎপাদন কমাইতে বাধ্য হয় ও ফলে উহার ব্যয় বাড়ে, তখন তাহাকে সাময়িকভাবে সংরক্ষণী শুল্ক দিয়া রক্ষা করা দরকার। এইরূপ শুল্কের সাহায্যে উহাকে বাঁচাইয়া

বাহ্য ব্যয়সংকোচ ও শুল্ক

প্রসারের সুযোগ দিলে নিশ্চয় সে বাহ্য ব্যয়সংকোচের সুবিধা কিছুটা লাভ করিতে পারিবে।*

আন্তর্জাতিক মূল্যের তত্ত্ব : বাণিজ্য হার (Theory of International values : The terms of Trade) :

আন্তর্জাতিক মূল্যতত্ত্ব ও বাণিজ্যহার (Terms of trade) সম্পর্কীয় আলোচনা করেন জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল এবং তাহার এই আলোচনাকে ক্লাসিকাল তুলনামূলক ব্যয় তত্ত্বের উপসিদ্ধান্ত (Corollary) হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উভয় দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে তুলনামূলক পার্থক্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি। যে দেশ যে দ্রব্য অন্য দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিবে, সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদনে সকল উপাদান নিয়োগ করিবে এবং উৎপন্ন দ্রব্য অন্য দেশে রপ্তানি করিবে : নিজের দেশে অন্য দেশের তুলনায় যে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বেশি তাহা সে আমদানি করিবে। রপ্তানি দ্রব্যের বিনিময়ে যে হারে সে আমদানি পাইবে, অর্থাৎ রপ্তানি ও আমদানির বিনিময়ের অনুপাতই হইল বাণিজ্য-হার। তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের মধ্যে যে কোন বিন্দুতে বাণিজ্যহার নির্ধারিত হইতে পারে। যেমন, A দেশে ধান ও কাপড়ের ব্যয়ের অনুপাত হইল 1 ধান : 1 কাপড়, B দেশে উহাদের ব্যয়ের অনুপাত হইল 1 ধান : $1\frac{1}{2}$ কাপড়। 1 ইউনিট ধান রপ্তানি করিয়া কি পরিমাণ কাপড় আমদানি করা হইল (যেমন, $1\frac{1}{12}$, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$ ইত্যাদি) রপ্তানি ও আমদানির এই অনুপাতকেই বাণিজ্য-হার বলা হয়। এই বাণিজ্যহার হইতেই অন্য দেশের দ্রব্যের হিসাবে নিজের দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বিনিময়-মূল্য বোঝা যায়।

বাণিজ্যহার কাহাকে বলে

---

* "It follows that decreasing costs due to internal economies are consistent, in the long run, with free competition. This important fact removes the foundations of Graham's argument, for his theory rests upon the assumption of free competition...It may happen that an industry is already benefiting from external economies, and could obtain increased benefit by a further expansion which is impeded by competition......The vicious circle described by Graham makes its appearance. But the industry could survive, and could obtain further benefits from external economies by expanding, if it were temporarily protected by a tariff." Haberler, *International Trade*, P. 204-207.

দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্য বা বাণিজ্য-হার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদার শক্তির উপর। A-এর দ্রব্যের জন্য B-এর চাহিদা যদি B-এর দ্রব্যের জন্য A-এর চাহিদা হইতে অধিক শক্তিশালী হয় তাহা হইলে বাণিজ্যহার B-এর প্রতিকূলে যাইবে (রপ্তানি বিনিময়ে B দেশ আমদানির পরিমাণ কম পাইবে); এবং A-এর অনুকূলে আসিবে (রপ্তানির বিনিময়ে A দেশ আমদানির পরিমাণ বেশি পাইবে)। আবার A-এর দ্রব্যের জন্য B-এর চাহিদা যদি B-এর দ্রব্যের জন্য A-এর চাহিদা হইতে কম শক্তিশালী হয় তাহা হইলে বাণিজ্যহার B-এর অনুকূলে আসিবে এবং A-এর অনুকূলে যাইবে। অন্যের দ্রব্যের জন্য নিজের দেশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং নিজের দ্রব্যের জন্য অন্য দেশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—এই দুই বিষয়ের উপর বাণিজ্য-হার নির্ভর করে। বাণিজ্য-হার A-এর প্রতিকূলে আসিলে সে 1 ইউনিট ধানের বদলে, ধরা যাউক, $1\frac{1}{4}$ ইউনিট কাপড় পাইবে; বাণিজ্যহার A-এর প্রতিকূলে আসিলে সে 1 ইউনিট ধানের বদলে, ধরা যাউক, $1\frac{1}{12}$ ইউনিট কাপড় পাইবে।

বাণিজ্যহার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদার উপর

বাণিজ্য হারকে নিম্নলিখিত সমীকরণের আকারে প্রকাশ করা যায়:

$$\text{বাণিজ্য-হার} = \frac{\text{আমদানির মূল্য}}{\text{রপ্তানির মূল্য}}$$

$$= \frac{\text{আমদানির দাম} \times \text{আমদানির পরিমাণ}}{\text{রপ্তানির দাম} \times \text{রপ্তানির পরিমাণ}}।$$

আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ সমান থাকিলে,

$$\text{বাণিজ্য হার} = \frac{\text{আমদানির দাম}}{\text{রপ্তানির দাম}}।$$

সুতরাং বাণিজ্যহার জানিতে হইলে রপ্তানি দ্রব্যের দাম ও আমদানি দ্রব্যের দাম তুলনা করা দরকার হয়। ইহা কিরূপে করা যায়? কাছাকাছি কোন একটি বৎসরকে মূল বৎসর ধরিয়া লইয়া রপ্তানি-দামের সূচক ও আমদানি-দামের সূচক তৈয়ার করিতে হয় (Index of export prices and Import-prices)। ইহার পরে এই দুইটিতে প্রতিবৎসর কতখানি পরিবর্তন আসিয়াছে তাহার হিসাব করিয়া (আমদানি দামের সূচক ÷ রপ্তানি-দামের সূচক) একটি তৃতীয় সূচক সংখ্যা

বাণিজ্যহারের সূচক গঠন করে কিরূপে

গঠন করা হইল। এই তৃতীয় সূচক সংখ্যাটির সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, আমদানির দামস্তরের তুলনায় রপ্তানির দামস্তরে কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে। ইহাকেই বলে বাণিজ্যহারের সূচক (Index number of the Terms of the Trade)।

কোন একটি দেশের দিক হইতে দেখিতে গেলে বাণিজ্যহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাণিজ্যহারের কোন বিরূপ পরিবর্তন বাণিজ্য হইতে সেই দেশের লাভ (gains from trade) কমাইয়া দেয়, ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। যেমন, মনে কর, পৃথিবীর বাজারে যদি চা-এর চাহিদা হ্রাস পায় ও দাম কমে, তবে ভারতের দিক হইতে দেখিতে গেলে, পূর্বের পরিমাণ আমদানি আনিতে হইলে বেশি পরিমাণে চা পাঠাইতে হইবে। চা-এর উৎপাদকের আয় হ্রাস পাইবে, এই শিল্পে মজুরি ও মাহিনার হার কমিয়া আসিবে, ফলে অন্যান্য শিল্পের আয়ও কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে, বাণিজ্যহার ভারতের অনুকূল হইলে আয় ও কর্মসংস্থান স্তর উপরে উঠিবে। বেনৃহামের ভাষায় বলিতে গেলে "The real income per head of a country depends mainly on its output per head and partly on its terms of trade."

বাণিজ্যহারের গুরুত্ব, জাতীয় আয়ের উপর প্রভাব

কয়েকজন ধনবিজ্ঞানীদের মতে (যেমন, Graham) আন্তর্জাতিক মূল্য সম্পর্কীয় এই ক্লাসিকাল তত্ত্ব কেবলমাত্র প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন দেশসমূহের পারস্পরিক বাণিজ্যহারের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে। বৃহৎ দেশে এবং ক্ষুদ্র দেশের মধ্যে বাণিজ্যহার পারস্পরিক চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, কারণ ক্ষুদ্র দেশের মোট উৎপাদন বৃহৎ দেশের চাহিদার অতি অল্প অংশ অথবা ক্ষুদ্র দেশের মোট চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই বৃহৎ দেশ উৎপাদন চালাইতে পারে।

সমালোচনা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ (The gains from Foreign Trade):

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে পৃথিবীর সকল দেশ সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, এবং সকল দেশই রপ্তানি দ্বারা অপর দেশ হইতে কম দামে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করে। নিজের দেশে

উৎপাদন করিতে হইলে যে ব্যয় করিতে হইত এবং ফলে যে দাম দিতে হইত, তাহা অপেক্ষা অনেক কম দামে সে দ্রব্যসামগ্রী পাইতে পারে। সুতরাং ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইবে, সকল দেশের মোট লাভ তত বাড়িবে। পরিবহন-ব্যয় ও বাণিজ্য-শুল্ক হ্রাসের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণও বাড়িবে।*

মোট লাভ নির্ভর করে : বাণিজ্যের মোট পরিমাণের উপর

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে প্রত্যেকটি দেশ স্বতন্ত্রভাবে কিরূপ লাভ করে, অর্থাৎ মোট লাভ কিরূপে বাণিজ্যকারী দেশগুলির মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়? কোন্ দেশ কি পরিমাণ লাভ করিতে পারিবে তাহা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

প্রথমত, ইহা নির্ভর করে দুই দেশের দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয়ের মধ্যে তুলনামূলক-পার্থক্যের পরিমাণের উপর। যদি দুইটি দেশের তুলনামূলক ব্যয়ের অনুপাতে অধিক পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেকেরই লাভের পরিমাণ বেশি হইবার সম্ভাবনা ; উৎপাদন-ব্যয় সমূহের মধ্যে পার্থক্য যত বেশি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভও তত অধিক। উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাতে এই পার্থক্য নির্ভর করে প্রধানত উভয় দেশে শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদনক্ষমতা ও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণের উপর। আমাদের আমদানি দ্রব্যগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত বিদেশী শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে আমাদের লাভ অধিক হইতে থাকিবে (কারণ আমরা একই পরিমাণ রপ্তানি করিয়া বিদেশী দ্রব্য বেশি পরিমাণে আমদানি করিতে পারিব) ; আমাদের রপ্তানি দ্রব্যগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত দেশীয় শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে বিদেশ অধিকতর লাভ করিতে পারিবে (কারণ বিদেশ হইতে একই আমদানির বিনিময়ে আমরা অধিকতর দ্রব্য রপ্তানি করিব)।

উৎপাদন ব্যয়ে তুলনামূলক পার্থক্যের পরিমাণের উপর

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ নির্ভর করে বাণিজ্য-হারের উপর। যে হারে এক দেশ নিজের রপ্তানি দ্রব্যের পরিবর্তে বিদেশ হইতে

* মনে রাখা দরকার যে, জার্মানীর ঐতিহাসিক মতবাদ এই তত্ত্বের বিরোধিতা করিতেন। তাঁহাদের মতে বর্তমানে অবাধ বাণিজ্যের দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি অপেক্ষা বর্তমানে বাণিজ্য শুল্কের দ্বারা দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইয়া তোলা দেশের পক্ষে অধিকতর লাভজনক হইতে পারে।

আমদানি দ্রব্য পায়, তাহাকে বাণিজ্যহার বলা হয়। নিজের দেশের কম দ্রব্যের বিনিময়ে অপর দেশের কত অধিক দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাই লাভের নির্ধারক।

এই বাণিজ্যহার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদার উপর। নিজের দ্রব্যের জন্ম অপর দেশের চাহিদার তুলনায় অপর দেশের দ্রব্যের জন্ম নিজের চাহিদা অধিকতর শক্তিশালী হইলে বাণিজ্যহার সেই দেশের প্রতিকূলে যাইবে এবং অপর দেশের অনুকূলে আসিবে। সুতরাং এই পারস্পরিক চাহিদা নির্ভর করে আমদানি ও রপ্তানির পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার উপর। যে দেশের রপ্তানির জন্ম বৈদেশিক চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইবে (অর্থাৎ দাম বাড়িলেও চাহিদা বেশি কমিবে না, মোট রেভিনিউ বৃদ্ধি পাইবে) এবং ইহারই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী আমদানির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবে (অর্থাৎ দাম বাড়িলে চাহিদা অধিক কমিয়া যাইবে, মোট রেভিনিউ হ্রাস পাইবে), সেই দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে বেশি লাভ করিতে পারিবে, কারণ বাণিজ্য-হার তাহারই অনুকূলে আসিবে।

বাণিজ্যহারের উপর

টাকা হিসাবে বাণিজ্যহারকে অনেক সময় আমদানি-দাম ও রপ্তানি-দামের অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হয় (Ratio of Import Prices and Export Prices)। রপ্তানি-দামের তুলনায় যদি আমদানি-দাম কমিয়া যায় তবে বাণিজ্য-হার অনুকূলে আসিবে, লাভও অধিক হইবে।

তৃতীয়ত, অন্যান্য দেশের তুলনায় একটি দেশের আয়তন যত ছোট হইবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে তাহার লাভ তত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ, বিদেশী দ্রব্যের জন্ম তাহার চাহিদা খুবই কম এবং ফলে বিদেশী দ্রব্যের দামও তাহার চাহিদার দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হয় না। কিন্তু তাহার রপ্তানি-দ্রব্যের জন্ম বিদেশী বৃহৎ রাষ্ট্রের চাহিদার পরিমাণ বেশি এবং ফলে সে অধিক দামে ঐ দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা পাইতে পারে।

দেশের আয়তনের উপর

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের এই তত্ত্ব ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা রচিত, প্রধানত রিকার্ডো ও মিল এই তত্ত্বের কাঠামো গঠন করিয়া গিয়াছিলেন। অধ্যাপক হাবারলার এই তত্ত্বের দুইটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা

দূর করিবার জন্য উৎপাদন সম্ভাবনার রেখার (production substitution curve) সাহায্য লইয়াছেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণের সাহায্যে দুইটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ সম্মিলন উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইতেই এই উৎপাদন সম্ভাবনার বা রূপান্তরণের রেখা (Transformation Curve) জানা যায়। এই পদ্ধতিতে, তাঁহার মতে, শ্রম ব্যয়ের তত্ত্ব বাদ দেওয়া চলে, এবং একই সঙ্গে বহু বিভিন্ন সংখ্যক উৎপাদনের উপাদান দেখান চলে। এই বিকল্পতত্ত্ব একটু পরেই বিশদভাবে আলোচিত হইতেছে।

হাবারলারের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে মার্শাল ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বের সাহায্য লইয়াছেন। তাঁহার মতে দেশের ক্রেতাগণ কোন দ্রব্যের জন্য যে পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তুত আছেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দরুণ বিদেশ হইতে উহা অপেক্ষা কম দামে তাঁহারা জিনিসটি পাইবেন; চাহিদার দর ও বাজার-দরের পার্থক্যই ভোগোদ্বৃত্তরূপে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে একটি দেশের লাভের পরিমাপ।

লাভের পরিমাপ: (১) ভোগোদ্বৃত্তের দ্বারা

টাউসিগ্ বলিয়াছেন, একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পায় দেশের মধ্যে বর্ধিত মজুরির হারের স্তরের ও আয়স্তরের মাধ্যমে এবং ইহাদের দ্বারাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করা যায়। যে দেশ অধিক পরিমাণে রপ্তানি করিতেছে, সেই দেশের রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পে মজুরের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে। এবং মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ায় মজুরির হার বৃদ্ধি পাইবে। রপ্তানি-শিল্পে বর্ধিত মজুরির হার (প্রতিযোগিতার দরুণ) দেশের অন্যান্য শিল্পে মজুরির হার বাড়াইয়া দিবে, ফলে দেশে সাধারণ আয়স্তর বৃদ্ধি পাইবে।

(২) মজুরি ও আয়-স্তরের দ্বারা

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ গুণক তত্ত্বের (Concept of Multiplier) সাহায্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করেন। রপ্তানি-বৃদ্ধির ফল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলের ন্যায়, ইহার ফলে দেশে নূতন আয় সৃষ্টি হয়, ভোগ্যদ্রব্যের ও মূলধনী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দেশে আরও বেশি পরিমাণ কর্মসংস্থান, নূতন আয়, নূতন বিনিয়োগের ধারা প্রসারিত হইতে

থাকে। কিন্তু নূতন আয় সৃষ্টি বা আয়স্তরে বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা (Marginal propensity of Import) বাড়িয়া যায়, আমদানির পরিমাণও বৃদ্ধি হয়। এই আমদানির পরিমাণে বৃদ্ধি অপর দেশের আয়স্তরে বৃদ্ধি ঘটাইলে তাহাদের আমদানি বাড়িতে পারে এবং ফলে প্রথম দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি হইতে পারে। আমদানি-প্রবণতার বৃদ্ধি ছিদ্ররূপে (leakage) কাজ করে এবং গুণকের পরিমাণ কমাইয়া দেয়, দেশের আয়স্তর ও কর্মসংস্থানে পূর্ণমাত্রায় প্রসার ঘটিতে দেয় না। কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাবের ফলে জাতীয় আয়ের হ্রাস বা বৃদ্ধি পরিমাপ করা যায় বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের সাহায্যে (Foreign Trade Multiplier)।

(৩) বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের দ্বারা

বিকল্প বিশ্লেষণ পদ্ধতি (An Alternative method of analysis):

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে ক্লাসিকাল তত্ত্ব প্রধানত রিকার্ডোর হাতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। শ্রমশক্তিকে একমাত্র ব্যয় হিসাবে গণ্য করিয়া উহার ভিত্তিতে তিনি এই তত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন। মিল্ এই তত্ত্বকে অগ্রসর করাইয়াছিলেন পারস্পরিক চাহিদার নীতির (Doctrine of Reciprocal demand) সাহায্য। তাঁহাদের সম্মুখে প্রধান প্রশ্ন ছিল: (১) একটি দেশ কোন্ দ্রব্যগুলিকে ক্রয় করিবে এবং কোন্‌গুলিকে বিক্রয় করিবে? (২) কি হারে এই বিনিময় চলিতে থাকিবে, অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে বাণিজ্য হার কি হইবে? এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থিত করা চলে, তাহা হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ কতটা হয় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই মোট লাভ কিরূপে বন্টিত হইয়া যায়? ইহাদের সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

রিকার্ডো ও মিল

অধ্যাপক হাবারলার (Haberler) প্রমুখ ধনবিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বকে আর এক স্তর আগাইয়া দিয়াছেন। তিনি এক ধরনের উৎপাদন-পরিবর্ততার রেখা (production substitution curve) প্রয়োগ করিয়াছেন। দেশে উৎপাদনের উপাদান স্থির ধরিয়া লইয়া উহাদের সাহায্যে দুইটি দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সম্মিলন কি ভাবে উৎপাদন করা যায়—তাহা দেখান এই রেখার উদ্দেশ্যে। এই রেখাটিকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে ইহার যে কোন বিন্দুর ঢাল

হাবারলারের উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা

(slope) উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ের অনুপাতের সমান। অধ্যাপক হাবারলার দেখাইয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করিতে না পারিলেও, ইহা কিরূপে সৃষ্টি হইতেছে তাহা এই উৎপাদনপরিবর্ততার রেখার সাহায্যে দেখান যায়। পরবর্তীকালে অধ্যাপক লিয়নটিয়েফ্ (Leontieff এই উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখার সহিত নিরপেক্ষ রেখা পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া এই তত্ত্বকে আরও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

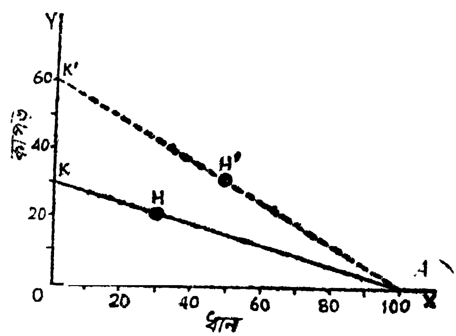
এই উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা বা রূপান্তরণ রেখা (Transformation curve) কাহাকে বলে? প্রথমে একটি তালিকার (schedule) রূপে আমরা ইহা আলোচনা করিতে পারি। মনে কর, কোন দেশে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ যেমন, শ্রম বা মূলধন আছে: ইহার সাহায্যে হয় ধান অথবা কাপড় অথবা উভয়ের দ্রব্যেরই কিছু পরিমাণ উৎপাদন করা চলে। সেই উপকরণগুলিকে সম্পূর্ণ ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে অনেকখানি ধান পাওয়া যায়, আবার উহাদের (যন্ত্রের সাহায্য লইয়া) সম্পূর্ণ কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে অনেকটা কাপড় তৈয়ার হইতে পারে। অথবা সেই উপকরণগুলির সাহায্যে দুইটি দ্রব্যই কিছু পরিমাণে উৎপাদন করা যায়। ইহাদের কোন একটি দ্রব্যকে অপর দ্রব্যটিতে রূপান্তরিত করা চলে শারীরিকভাবে নয়। একের উৎপাদন হইতে উপকরণ অপসারণ করিয়া অপরের উৎপাদনে নিয়োগ করা সম্ভব, অর্থাৎ একটির উৎপাদন কমাইয়া অপরটির উৎপাদন বাড়ান চলে। যেমন ধরা যাউক, ভারতবর্ষে ধানকে সর্বদা কাপড়ে রূপান্তরিত করা যায় 10 : 3 এই নির্দিষ্ট অনুপাতে। ইহার অর্থ হইল 10 ইউনিট ধান ছাড়িয়া দিলে তবেই 3 ইউনিট কাপড় তৈয়ার করা চলে। আমরা আরও ধরিয়া লইতেছি যে, সকল উপকরণ ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে 100 ইউনিট ধান এবং 0 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে (অর্থাৎ ইহাদের রূপান্তরণের অনুপাত 10 : 3 হইলে) ভারতে 90 ধান : কাপড়, 80 ধান : 6 কাপড়, 0 ধান : 30 কাপড়—প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাই উৎপাদন-সম্ভাবনার বা রূপান্তরণের তালিকা*, পরপৃষ্ঠায় ইহা দেখান হইয়াছে।

রূপান্তরণ রেখা কাহাকে বলে

* এই তালিকা, রেখাচিত্র Samuelson-এর Economics গ্রন্থটি হইতে লওয়া হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু ছাত্রেরা Haberler-এর International Trade-এর Chapter XII, এবং Kindelberger-এর International Economics-এর Chapter V-ও দেখিতে পারেন।

সম্ভাবনা	ধান	কাপড়
A	100	0
B	90	3
C	80	6
D	70	9
E	60	12
F	50	15
G	40	18
H	30	21
I	20	24
J	10	27
K	0	30

এই তালিকাটিকে রেখাচিত্রে প্রকাশ করিলে আমরা উৎপাদন সম্ভাবনার বা রূপান্তরণের রেখা পাইতে পারি। নিচের চিত্রে, X অক্ষে ধান উৎপাদনের



পরিমাণ এবং Y অক্ষে কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ আমরা পরিমাপ করিতে পারি। AK হইল উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা। ধান ও কাপড়ের ব্যয়ের অনুপাত নির্দিষ্ট ধরা হইয়াছে বলিয়া ইহা সরলরেখার আকার লইয়াছে। (ক্রমহ্রাসমান বা ক্রমবর্ধমান ব্যয় ঘটিলে উহার আকৃতি ভিন্নরূপ হইবে, তাহা পরে আলোচিত হইবে)। আলোচনার সুবিধার জন্য উভয়ের ব্যয়ের অনুপাতে নির্দিষ্টতা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই রেখার মধ্যে ভারতবর্ষ ঠিক

কোন বিন্দুতে উৎপাদন করিতে থাকিবে? অর্থাৎ কত পরিমাণ ধান ও কত পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন করিবে? ধরা যাউক ভারত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার H বিন্দুতে উৎপাদন করে, 30 ইউনিট ধান এবং 21 ইউনিট কাপড়ের উৎপাদনে তাহার সকল উপকরণ নিয়োগ করে।*

এই অবস্থায় যদি কাপড়ের উৎপাদনে কোন নূতন যন্ত্রপাতির বা পদ্ধতির আবিষ্কার হয়, তবে উহার ফলাফল কি হইবে? মনে কর, যে উপকরণে 10 ইউনিট ধান হয় তাহাতে 3 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন না হইয়া এখন 6 ইউনিট কাপড় তৈয়ার হইতে পারে, তবে উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা উপরে উঠিয়া যায়। উপরের চিত্রে AK′ রেখা দ্বারা ইহা দেখান হইতেছে। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতবর্ষ H বিন্দু হইতে H′ বিন্দুতে উঠিতে পারে, উহাতে দুইটি দ্রব্যই সে পরিমাণে বেশি পাইতেছে।

আবিষ্কারের ফল কি

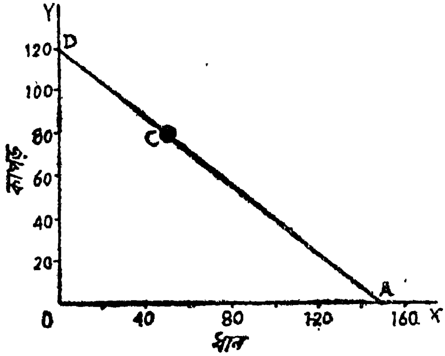
এতক্ষণ আমরা ভারতের কথা আলোচনা করিয়াছি, এখন ইংলণ্ডের কথা আলোচনা করা দরকার। ইংলণ্ডে শ্রমিক বেশি অথচ জমি কম, তাই সেই দেশে ধান ও কাপড়ের ব্যয় অনুপাত পৃথক। এদেশে তুলনামূলকভাবে ধানের উৎপাদন ব্যয় বেশি, কিন্তু কাপড়ের উৎপাদন ব্যয় কম। তাই, আমরা মনে করিতে পারি যে, ইংলণ্ডে প্রতি 10 ইউনিট ধান তৈয়ারীর উপকরণ দিয়া 8 ইউনিট কাপড় তৈয়ারী করা যায়। ইহাই ইংলণ্ডের উৎপাদন-সম্ভাবনার বা রূপান্তরণের অনুপাত। ভারতের ন্যায় ইংলণ্ডেরও এইরূপ একটি রূপান্তরণের তালিকা আছে, যেমন:

সম্ভাবনা	ধান	কাপড়
A	150	0
B	100	40
C	50	80
D	0	120

10 : 8 নির্দিষ্ট অনুপাতের হারে ইংলণ্ডের এই উৎপাদন সম্ভাবনার তালিকা

* কেন ভারতবর্ষ ঠিক 30 ইউনিট ও 21 ইউনিট কাপড় উৎপাদন করিতেছে? এই প্রশ্ন এখানে আলোচ্য নয়। তবুও সংক্ষেপে বলিয়া রাখা দরকার। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পরিকল্পনা কমিশন; কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ইহা নির্ভর করে এই দ্রব্যগুলির যোগান, চাহিদা এবং দামের উপর। অনিয়ন্ত্রিত দাম-ব্যবস্থাই বিভিন্ন দ্রব্যোৎপাদনে দেশের উপকরণগুলির নিয়োগ-বিন্যাস নির্ধারণ করে।

বা রূপান্তরণের তালিকাকে আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। নিচে ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে এই রেখা দেখান হইয়াছে। এই চিত্র হইতে আমরা



আরও দেখিতে পাইতেছি যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হওয়ার পূর্বে ইংলণ্ড 50 ধান ও 80 কাপড় উৎপাদনে তাহার সকল উপকরণ নিয়োজিত রাখিয়াছে।

এই অবস্থায় মনে কর উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সুরু হইবে। কি হারে ধান ও কাপড় পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইতে পারে? ভারত রপ্তানি করিবে ধান এবং ইংলণ্ড রপ্তানি করিবে কাপড় ইহা বোঝা যাইতেছে। 10 : 3 ও 10 : 8-এর মধ্যে 10 : 5 ; 10 : 7 প্রভৃতির যে কোন একটি হার স্থির হইবে, ইহাও আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। যে হারে এই বিনিময় ঘটিবে তাহাই বাণিজ্যহার (Terms of Trade), বা দামের অনুপাত (price ratio) একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, উভয় দেশের নির্দিষ্ট ব্যয়ানুপাতের

বাণিজ্য সুরু হইবার সম্ভাবনা কোথায়

বাহিরের দিকে (10 : 3 ও 10 : 8-এর বাহিরে) কোন বাণিজ্যহার থাকিতে পারে না। যেমন, 10 : 1 বা 10 : 12 এই দুইটি অনুপাত লইয়া দেখা যাউক। ভারত যদি নিজের দেশে ধান উৎপাদন না করিয়া সেই উপকরণ কাপড় উৎপাদনে নিয়োগ করে, তবে সে 3 ইউনিট কাপড় পায়, বিদেশ হইতে সে কেন ধানের বিনিময়ে 1 ইউনিট নিতে রাজি হইবে? শুধু তাহাই নহে। যদি 10 : 1 অনুপাতে জোর করিয়া চাপান যায় তবে ভারত কেবল কাপড় উৎপাদনে উপকরণসমূহ নিয়োগ করিবে, ধানের উৎপাদন ছাড়িয়া দিবে। ইহার কারণ কি? ভারত নিজের দেশে 1 ইউনিট কাপড়ের বদলে 10/3 অর্থাৎ 3·33

ইউনিট ধান উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু বাহির হইতে সে যদি 10 ইউনিট ধান পায় তবে কেন নিজের দেশে ধান উৎপাদন করিবে ?

এইবার ইংলণ্ডের দিকটি আলোচনা করা যাউক। যদি বিনিময়ের অনুপাত 10 : 1 রাখা হয়, তবে সে-ও কাপড় বিক্রয় করিয়া ধান কিনিতে চাহিবে। নিজের দেশে ইংলণ্ড এক ইউনিট কাপড়ের বিনিময়ে 10/8 অর্থাৎ 1·25 ইউনিট ধান পায়। বিনিময় করিলে 1 ইউনিটের বদলে সে 10 ইউনিট ধান পাইতে পারে। ভারত ও ইংলণ্ড উভয়েই যদি কাপড় বিক্রয় করিতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্যে ধানের উৎপাদন হইতে সকল উপকরণ সরাইয়া আনিয়া কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করে, তবে উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে না। এইরূপে আমরা দেখিতে পারি যে, উভয় দ্রব্যের বাণিজ্য-হার 10 : 8-এর উপরেও উঠিতে পারে না, যেমন 10 : 12 হয় না, কারণ তাহা হইলে উভয়েই কেবলমাত্র ধান উৎপাদন সুরু করিবে, কেহ কাপড় উৎপাদন করিবে না।

ব্যয় পার্থক্যে অনুপাতের গুরুত্ব

সুতরাং এইরূপে আমরা এই সিদ্ধান্তে নিশ্চয় পৌঁছিতে পারি যে 10 : 3 এবং 10 : 8 এই দুইটি চরম-সীমার মধ্যবর্তী কোন অনুপাতে যেমন 10 : 6 হারে উভয় দ্রব্যের বিনিময় হইতে থাকিবে। উভয় দেশই নিজ নিজ তুলনামূলক সুবিধা অনুযায়ী বাণিজ্য করিবে, ভারত ধান উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য লাভ করিবে এবং ইংলণ্ড কাপড় উৎপাদনে বিশেষত্ব লাভ করিবে। উভয় দেশই পূর্বোপেক্ষা উন্নততর জীবনযাত্রার মান লাভ করিবে। ভারত নিজের দেশে 10 ইউনিট ধানকে 3 ইউনিট কাপড়ে রূপান্তরিত করিতে পারে, কিন্তু বাণিজ্যের ফলে সে একই পরিমাণ ধানকে 6 ইউনিট কাপড়ে রূপান্তরিত করিতেছে। ইংলণ্ড নিজের দেশে 8 ইউনিট কাপড়কে 10 ইউনিট ধানে রূপান্তরিত করিতে পারে ; কিন্তু বাণিজ্যের ফলে সে 6 ইউনিট কাপড়কেই 10 ইউনিট ধানে পরিণত করিতে পারিতেছে। উভয় দেশের উপকরণসমূহ তুলনামূলকভাবে দক্ষতর ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইতেছে। তাহাদের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। বাণিজ্যের ফলে তাই সম-পরিমাণ উপকরণের সাহায্যে উভয় দ্রব্যই বেশি পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে তাই পরোক্ষ উৎপাদন (indirect production) বলা চলে।

কেন বাণিজ্যে দুই দেশেরই বেশি লাভ হইবে

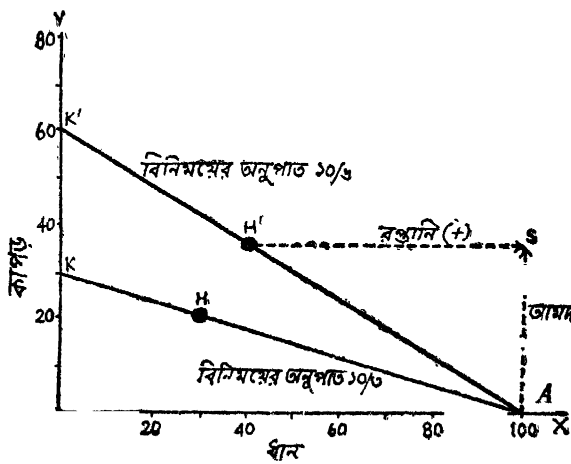
ঠিক কোন্ বিন্দুতে, উভয় দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতের অন্তবর্তী

কোন স্তরে বাণিজ্যহার স্থির হইবে? সাধারণ বুদ্ধিতে আমাদের প্রথমেই মনে হইতে পারে যে, বাণিজ্যহার 10 : 5½ হইবে, অর্থাৎ উভয়ের পার্থক্যের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় ইহা স্থাপিত হইবে, মোট পার্থক্য সমানভাবে ভাগ করিয়া উভয়ে সমান লাভ করিতে থাকিবে। ইহা কিন্তু সত্য নয়। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল

ভারসাম্যের বাণিজ্য-হার : পারস্পরিক চাহিদার তত্ত্ব

দেখাইয়াছেন যে, দুইটি ব্যয়ের অনুপাতের মধ্যে বাণিজ্যহার নির্দিষ্ট হইবে ওই দ্রব্য দুইটির প্রত্যেকটির যোগান ও চাহিদার ঘাতপ্রতিঘাতে। ইহাকেই তিনি নাম দিয়াছেন পারস্পরিক চাহিদার তত্ত্ব (Theory of Reciprocal Demand)। সমগ্র পৃথিবীময় সেই দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক চাপে এমন স্তরে এই বাণিজ্যহার নির্ধারিত হইবে যেখানে দ্রব্য দুইটির চাহিদা ও যোগান ভারসাম্যে পৌঁছিয়াছে। এই ভারসাম্যের অবস্থা হইতে বিচ্যুতি আসিতে পারে, যদি (ক) লোকের রুচি ও পছন্দ, এবং (খ) যন্ত্র কৌশল প্রভৃতিতে কোনরূপ পরিবর্তন আসে।

এই 10 : 6 অনুপাতের বাণিজ্যহারের প্রভাব উভয় দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা বা রূপান্তরণের রেখা পরিবর্তিত হয়, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছি। যেমন, ভারতের ক্ষেত্রে ইহার আকৃতি কিরূপ হয়, আমরা তাহা নিচের চিত্রে দেখিতেছি।



আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পূর্বে ভারতের উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা ছিল 10 : 3 বিনিময়ের অনুপাত অনুযায়ী AK রেখা। বাণিজ্যের পর, যখন 10 : 6

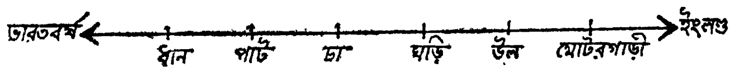
বিনিময়ের অনুপাত নির্দিষ্ট হইল তখন তাহার এই রূপান্তরণ রেখাটি ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। ইহা হইল AK′. ঠিক যেরূপ কোন আবিষ্কার বা যন্ত্রকৌশলের উন্নতি ঘটিলে রূপান্তরণ রেখা উপরে উঠে, এই ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিয়াছে। ভারত পূর্বাপেক্ষা উন্নত স্তরে উন্নীত হইয়াছে। এই AK′ রেখার কোন বিন্দুতে সে দুইটি দ্রব্যের উৎপাদন করিতে থাকিবে, অর্থাৎ তাহার উপকরণবিন্যাস কি হইবে, তাহা নির্ভর করিবে দেশের মধ্যে দামব্যবস্থার উপরে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে দেশের মধ্যে দ্রব্যের ও উপকরণের দামে পরিবর্তন আসিবে, ধরা যাউক সে তাহার নূতন রেখার H′ বিন্দুতে উৎপাদন ও ভোগ করিতে থাকে। এই রেখাটিকে ভোগ-সম্ভাবনার রেখা বলিয়াও গণ্য করা চলে, ইহার H″ বিন্দুতে ভারত 40 ইউনিট ধান এবং 36 ইউনিট কাপড় ভোগ করিতে থাকিবে। ভাঙা রেখা-দুইটির সাহায্যে ভারতের রপ্তানি (+) এবং আমদানি (—) দেখান হইতেছে। এইরূপে ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে দেখান চলে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে তাহার ভোগ ও উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে। বাণিজ্যের ফলে দুইটি দেশেরই উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়া—ইহা কোন ম্যাজিকের ফল নয়, বিশেষায়ণের ফলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনই বাড়িয়া গিয়াছে।

উৎপাদন ও ভোগ-সম্ভাবনার উপর বাণিজ্যের ফলাফল কিরূপ ?

যদি একাধিক দ্রব্য থাকে, তবে অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা আলোচনার সময় এখন আসিয়াছে। এই তত্ত্বের মূল সিদ্ধান্ত তাহাতে কিছু পাল্টায় না, এমন কি খুঁটিনাটিতে অল্প কিছু পরিবর্তন আনাও বিশেষ শক্ত নয়। এতক্ষণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, ধান ও কাপড় এই দুইটি দ্রব্যেরই উৎপাদন, ভোগ ও বাণিজ্য চলিতেছে। কিন্তু বাস্তব জগতে ধান ছাড়া গম, পাট, আখ প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের কোন অভাব নাই, আর বহু প্রকারের কাপড় ও বহু প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যও আছে। এত বেশি দ্রব্যসামগ্রী থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ কমিবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রসঙ্গে হাবারলার (Haberler) দেখাইয়াছেন যে, যখন দুইটি দেশে সমহার ব্যয়ের নীতিতে অনেক দ্রব্য উৎপন্ন করা যায়, তখন উহাদের আপেক্ষিক সুবিধা বা তুলনামূলক ব্যয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্তরক্রমে সাজান চলে।

হাবারলার বলিয়াছেন যে,

যেমন, আমাদের তুলনামূলক সুবিধার স্তরক্রম অনুসারে আমরা নিচের জিনিসগুলিকে সাজাইয়া রাখিয়াছি :



এই স্তর অনুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যয় তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম, ভারতে ধানের ব্যয় সবচেয়ে কম, তাহার পর পাট··· ইত্যাদি। ইংলণ্ডের তুলনামূলক সুবিধা হইল মোটর গাড়িতে সবচেয়ে বেশি, তাহার পরে উল, তাহার পরে ঘড়ি, এইরূপ। এই অবস্থায় একটি বিষয় আমরা সঠিক বলিতে পারি, বাণিজ্যের ফলে ভারতে ধান উৎপন্ন হইবেই এবং ইংলণ্ডে মোটর গাড়ি প্রস্তুত হইবেই, কারণ ইহাতে তাহারা প্রত্যেকে দক্ষতম। কিন্তু কোন্ কোন্ দ্রব্য রপ্তানি ও আমদানি হইবে তাহার সীমানারেখা (dividing line) কোথায় পড়িবে? পাট ও চা-এর মধ্যে? অথবা ভারত চা পর্যন্ত উৎপাদন করিবে এবং ঘড়ি হইতে ডান দিকের দ্রব্যগুলি ইংলণ্ডের হাতে ছাড়িয়া দিবে? আবার এই সীমানারেখা দুইটি দ্রব্যের মধ্য দিয়া না গিয়া একটি দ্রব্যের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে; সেই অবস্থার সেই দ্রব্যটি দুইটি দেশেই কিছু কিছু উৎপাদন হইতে থাকিবে। এই অবস্থায় কি ঘটিতে পারে?

দুইটি দ্রব্যের বেশি থাকিলেও এই তত্ত্ব মূলত সঠিক

ইহা প্রধানত নির্ভর করে বিভিন্ন দ্রব্যের আন্তর্জাতিক চাহিদার তুলনামূলক শক্তির উপর। অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক চাপ অনুযায়ী এই সীমারেখার সঞ্চার-পথ নির্ধারিত হইবে। ধান ও পাট এর জন্য আন্তর্জাতিক চাহিদা বাড়িয়া গেলে ভারতের অনুকূলে বাণিজ্যহার সরিয়া আসিয়া আমাদের এমন সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে পারে যে, আমরা সকল উপকরণ উহাতে নিযুক্ত করিয়া চা উৎপাদন ত্যাগ করিতেও পারি; উহার উৎপাদন আর ততটা লাভজনক না-ও থাকিতে পারে। আবার রাজস্থানের মরুভূমিতে সহজে চা তৈয়ারী করা যায় এইরূপ কোন আবিষ্কার হইলে বিভিন্ন দ্রব্যের তুলনামূলক সুবিধার স্তরক্রম সম্পূর্ণ নূতনভাবে পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে এবং বিশেষায়ণ ও বাণিজ্যের ধরন বদলাইয়া যাইতে পারে।*

* "So long as our assumptions continue to cover only the cost-data, we cannot determine the exact position of this dividing line. We can say only that it must be drawn in such a manner that country I enjoys a comparative advantage in every commodity it exports relatively to every commodity it imports. If we wish to determine its exact position—whether between B and C or between C and D and so on—we must introduce the further condition that the credit side and the debit side of the balance of payments must be equal." Haberler, *International Trade*, P. 137.

সংখ্যায় দুইটি বেশি দেশ থাকিলেও এই তত্ত্বটির মূলকথা অপরিবর্তিত থাকে। কোন বিশেষ দেশের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তাকাইয়া দেখিলে বাহিরের অন্যান্য সকল দেশকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া 'পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ' (rest of the world) বলিয়া গণ্য করিতে হয়। রাষ্ট্রের সীমানারেখার সহিত বাণিজ্যের সুবিধার কোনরূপ যোগসূত্র নাই। এই তত্ত্ব সর্বত্র প্রযোজ্য, বিভিন্ন দেশের মধ্যে অথবা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে।

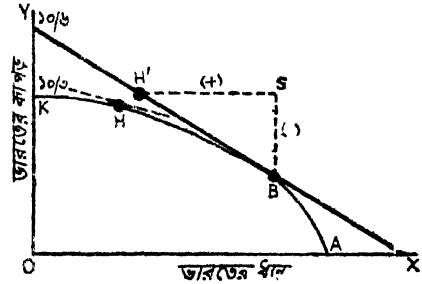
দুইটি বেশি দেশ থাকিলেও ইহা কম সত্য নয়

এতক্ষণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, উৎপাদন বাড়িলে বা কমিলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় সমান থাকে। তাই রূপান্তরণরেখা সরল রেখার রূপ লয়। কিন্তু বাস্তবে সকল শিল্পেই উৎপাদন বাড়াইতে গেলে ব্যয় বাড়ে; এই রেখাটি তাই উৎস বিন্দুর দিকে অবতল (concave to the origin)। সাধারণভাবে ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষ ধান উৎপাদনে অনেক বেশি যোগ্য হইলেও, ভারতে ধানের উৎপাদন বাড়িলে এমন একটা স্তর আসে যখন উৎপাদন আর একটু বাড়াইবার চেষ্টা করিতে থাকিলে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ভারতে প্রতিযোগিতার দরুন ইংলণ্ডে ধানের দাম কমিয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু তবুও কোন কোন অতিরিক্ত উর্বর জমিখণ্ড আছে যেখানে কিছু কিছু ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঠিক এইরূপ ইংলণ্ডে কাপড়ের উৎপাদন-ব্যয় বাড়ে বলিয়া ভারতেও কোন কোন দক্ষতর কলকারখানায় কাপড়ের উৎপাদন কিছু কিছু চলিতে থাকে। সুতরাং, ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম বা ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের নীতি কার্যকরী হয় বলিয়া বিশেষায়ণের ধারা সম্পূর্ণ হইতে পারে না; উভয় দ্রব্যেরই কিছু কিছু পরিমাণ উভয় দেশে উৎপাদন হইতে থাকে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান ও উৎপাদন-ব্যয়ে বৃদ্ধির ফলাফল

এই ছবিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হওয়ার পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা আমরা দেখিতে পাইতেছি। এই ছবিতে ক্রমবর্ধমান ব্যয় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে; AK রেখা তাই উৎসবিন্দুর দিকে অবতল। বাণিজ্য শুরু হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষ H বিন্দুতে উৎপাদন ও ভোগ করিতেছিল। দ্রব্য দুইটির আভ্যন্তরীণ দামের

অনুপাত (10 : 3) ; উহাদের ব্যয়ের অনুপাতের সমান ; **H** বিন্দুতে **AK** রেখার ঢাল ইহা প্রকাশ করিতেছে।



বাণিজ্যের পরে, উভয় দেশের সাধারণ বাণিজ্যহার দাঁড়াইল 10 : 6 ; এই অবস্থায় ভারতের উৎপাদন B বিন্দুতে সরিয়া আসে। কাপড়ের উৎপাদন কমিয়া আসে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হয় না, নূতন উৎপাদন বিন্দু B-তে পেঁছায়। প্রতিযোগিতার দরুন ঐখানে রেখাটির ঢাল হইল 10 : 6, অর্থাৎ অল্প কিছু ধান উৎপাদনের জন্য কিছুটা কাপড়ের ব্যয় এবং এই দুইটি দ্রব্যের আন্তর্জাতিক দামের অনুপাত সমান। B বিন্দুতে এবং একমাত্র ঐ বিন্দুতেই ভারতের জাতীয় উৎপাদনের মূল্য (10 : 6 দাম অনুপাতের হিসাবে) সর্বাধিক। সরল রেখাটি হইল ভারতের নূতন ভোগ-সম্ভাবনার রেখা, বাণিজ্যের ফলে ভারত যাহা পাইয়াছে। যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে ভোগের এই স্তর নির্ধারিত হয়, H' বিন্দুতে উহা প্রকাশ পাইতেছে। পূর্বের ন্যায়, ভাংগা রেখাগুলি রপ্তানি (+) এবং আমদানি (−) নির্দেশ করিতেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভও হইতেছে, তবে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান ও ব্যয়বৃদ্ধির দরুন লাভ ততটা বেশি নয়, বিশেষায়ণও ততদূর প্রসারিত হয় নাই। ভারসাম্যের বিন্দুতে উভয় দেশে উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় দ্রব্য দুইটির বাণিজ্য-হারের, অর্থাৎ 10 : 6-এর সমান।

উপকরণ আদানপ্রদানের পরিবর্তে দ্রব্যের আদানপ্রদান

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হওয়ার পরে ইংলণ্ডের উপকরণ ধান হইতে সরিয়া গিয়া কাপড়ের উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে থাকে। এই ধরনের উৎপাদনে জমির দরকার কম কিন্তু শ্রমিকের দরকার বেশি, ফলে ইংলণ্ডের সীমাবদ্ধ জমির উপর জনসংখ্যার চাপ অনেকটা হ্রাস পায়। জমির জন্য অতিরিক্ত চাহিদা কমে, মজুরির তুলনায় জমির খাজনা হ্রাস পায়। অপরদিকে, ভারতে বিপরীত ধরনের প্রভাব কার্যকরী হয়,

ধানের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য জমির উপর চাপ বাড়ে, মজুরির তুলনায় খাজনা বৃদ্ধি পায়।

উভয় ক্ষেত্রেই দ্রব্যের অবাধ আদানপ্রদান বা বাণিজ্যের ফল হইল অনেকটা বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধে উপকরণগুলির যাতায়াতের সমান। ঠিক যেমন, ইংলণ্ড হইতে ভারতে লোক চলিয়া আসিলে এখানকার শ্রমের দুষ্প্রাপ্যতা কমিত, খাজনার তুলায় মজুরির হার হ্রাস পাইত, দ্রব্য আদানপ্রদানের ফলেও তাহাই ঘটিতেছে। এইরূপে উভয় দেশেই অতি-সুপ্রাপ্য (superabundant) উপকরণের সহজলভ্যতা দূর হয় এবং দুষ্প্রাপ্য উপকরণের দুর্লভতার লাঘব ঘটে। ইহাই হেক্সার-ও'লীন তত্ত্ব (Heeksher-Ohlin theory) নামে বিখ্যাত। এই তত্ত্বের মূল কথাই হইল, দ্রব্যসামগ্রীর আদানপ্রদানের ফলে সকল দেশে উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা কিছুটা হ্রাস হয়। ও'লীন ক্লাসিকাল তত্ত্বকে এইভাবে কিছুটা উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রম ও মূলধনের অবাধ যাতায়াত থাকিলে উহা মজুরির হার ও উপকরণের দামে মোটামুটি সমতা আনিবে। কিন্তু নিজ নিজ দেশের সীমানা ছাড়াইয়া উপকরণগুলির যাতায়াত না ঘটিলেও অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে, আংশিকভাবে হইলেও দ্রব্যবিনিময়ের দরুন উপকরণের দামে এইরূপ সমতা দেখা দিবে। এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার। দেখা যাইতেছে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ইংলণ্ডের জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু এই জাতীয় আয়ের বণ্টন এমনভাবে বদলাইয়া যাইতে পারে যাহাতে দেশের অধিবাসীদের সামগ্রিক কল্যাণ হ্রাস পায়।

হেক্সার-ও'লীন তত্ত্ব

ইহার গুরুত্ব

এতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দুইটি কারণ দেখানো হইয়াছে: (ক) বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনামূলক ব্যয়ে পার্থক্য এবং (খ) ক্রমহ্রাসমান ব্যয়। কিন্তু এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ করার জন্য বাণিজ্যের তৃতীয় কারণটি বলা প্রয়োজন। উভয় দেশের ব্যয় সম্পূর্ণ সমান হইলেও এবং তাহা বাড়িতে থাকিলেও রুচি ও পছন্দের তারতম্যের দরুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভবপর। যেমন নরওয়ে ও সুইডেন মোটামুটি একই হারে মাছ ও মাংস উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু সুইডেনের অধিবাসীরা মাংস পাইলে খুশী, আবার নরওয়ের অধিবাসীরা তুলনায় মাছ পছন্দ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তৃতীয় কারণ: রুচি বা চাহিদার পার্থক্য

করে বেশি। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উভয় দেশই লাভবান হয়; সুইডেন হইতে মাছ রপ্তানি হইয়া নরওয়ে হইতে মাংস আমদানি চলিতে থাকে। উভয় দেশেরই তৃপ্তি, জীবনযাত্রার মান ও সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

নূতন বিকল্প তত্ত্বের মূল্যায়ণ (Evaluation of this Alternative Doctrine):

এই নূতন তত্ত্বের পক্ষে অধ্যাপক Haberler বলেন যে, ইহা পুরাতনতত্ত্ব হইতে উন্নত, কারণ আমাদের এখানে দুইটি সংকোচক অনুমান (restrictive assumption) না মানিলেও চলে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, শ্রমব্যয়ের তত্ত্ব বাদ দিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব গঠন করা সম্ভব। তদুপরি, এই নূতন ব্যাখ্যায় একই সঙ্গে বহু বিভিন্ন সংখ্যক উৎপাদনের উপাদান দেখানো চলে।

অধ্যাপক Viner অবশ্য এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে নূতন পদ্ধতির এই সুবিধাগুলি কাল্পনিক মাত্র, ইহাদের ভুয়া বলিলেও ভুল হয় না। তিনি বলেন যে, উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে আড়াল করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। উৎপাদন-পরিবর্তিতার এই রেখা ধরিয়া লয় যে, দেশে উপকরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট (fixed factor supply)। Viner বলেন যে, ইহা সঠিক নয়। টেকনলজির দ্বারা নির্দিষ্ট এই রেখাটিকে স্থির বলিয়া ধরা যায় না, কারণ উৎপাদনের কোন উপাদানের পরিমাণই নির্দিষ্ট নয়, ইহা নির্ভর করে উপাদানটির দামের উপর। আর উপাদানের দাম নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর। সংক্ষেপে তাঁহার মতে, উৎপাদনের উপাদানগুলির যোগান যদি পরিবর্তন করা যায়, তাহা হইলে লাভ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে দ্রব্যসমূহের উপযোগিতা ছাড়াও এই সকল উপাদানের যোগানের 'আসল ব্যয়' হিসাব করা দরকার। নিরপেক্ষ রেখা পদ্ধতির প্রয়োগের বিরুদ্ধেও সমালোচনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তির কল্যাণ পরিমাপ করার সময়ে আমরা সহজেই বলিতে পারি উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় উন্নীত হইলে ব্যক্তির কল্যাণ বাড়িল। কিন্তু জাতির বা দেশের ক্ষেত্রে ইহা বলা চলে না। 5 ধান ও 2 কাপড় হইতে দেশে যদি 6 ধান ও 2 কাপড় তৈয়ারি হয়, তবে দেশের সমষ্টিগত নিরপেক্ষ রেখা (Community Indifference curve)

ভাইনারের সমালোচনা

উপরে উঠিল বটে, কিন্তু আয়-বণ্টনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে মোট সামাজিক কল্যাণ হ্রাস পাইতে পারে।

নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণের এই অনুমান যদি বাদ দিতে হয় এবং সমগ্র দেশের উপযোগী সমষ্টিমূলক নিরপেক্ষ রেখা গঠন করা যদি কোন মতে সম্ভব না হয় তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কল্যাণ বাড়ায় কি না এই তত্ত্ব গঠন করার কোন উপায় থাকে কি? স্যামুয়েলসন্ (Samuelson) বলেন যে, ক্লাসিকাল লেখকদের এই সংকোচক অনুমানসমূহ বাদ দিলেও দেখা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যকারী দেশগুলি সম্ভাব্য ও প্রকৃত লাভ (potential and actual gain) পাইয়া থাকে। তাঁহার মতে, বাণিজ্য শুরু হইলে প্রতিটি দেশই সকল উপকরণ কম পরিমাণে ব্যবহার করিয়া প্রতিটি দ্রব্য পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে পাইতে পারে। মোট লাভের কোন বাস্তব পরিমাপক পাওয়া যায় না ইহা ঠিকই: কিন্তু সকল উপকরণ কম ব্যবহার করিয়া প্রতিটি দ্রব্য বেশি পাইলে জাতির কল্যাণ নিশ্চয় বৃদ্ধি পায়। এই দিক দিয়া দেখিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দরুন সকল দেশেরই কল্যাণ হয়। তাই তিনি বলেন যে, "some degree of trade, however restricted or unrestricted it may be, is necessarily better for all countries than no trade at all."

স্যামুয়েলসন্ বলেন যে, লাভ পরিমাপ করা না গেলেও কল্যাণ বাড়ে

বাণিজ্য ব্যালান্স ও জাতীয় আয় (Balance of Trade and the National Income):

কোন একটি দেশের আয়স্তর এবং বাণিজ্য ব্যালান্সের মধ্যে পরস্পর প্রভাবশীল সম্পর্ক (reciprocal-relationship) আছে; বাণিজ্য ব্যালান্সে পরিবর্তন দেশের আয়স্তরকে প্রভাবিত করে, আবার আয়স্তরে পরিবর্তন বাণিজ্য ব্যালান্সের অবস্থায় পরিবর্তন আনে।

এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার জন্য কয়েকটি বিষয় আমাদের ধরিয়া লওয়া দরকার (assumptions)। আমরা মনে করি যে, প্রতিটি দেশে দামস্তর, সুদের হার এবং স্থায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ সমান আছে, উপরন্তু প্রতিটি দেশেই কিছু পরিমাণ বেকারি আছে। এই অনুমানটির কারণ হইল যে, আমাদের ধরিয়া লওয়া দরকার কোন দেশের দ্রব্যের জন্য চাহিদা বাড়িলে দেশের মধ্যে উহার উৎপাদনই বাড়িবে, দাম

বিশ্লেষণের অনুমানসমূহ

বাড়িবে না। সর্বোপরি, আমরা আরও ধরিয়া লইব যে, দুইটি দেশের টাকার বিনিময় হার (exchange rate of two currencies) স্থির আছে।*

আয়স্তরের প্রভাব বাণিজ্যব্যালান্সের উপর কিরূপে পড়িতে পারে? আয়স্তরে কোন পরিবর্তন বাণিজ্য ব্যালান্সের উপর প্রভাব বিস্তার করে আমদানি ও রপ্তানির মাধ্যমে। ঠিক যেরূপ বর্তমান আয়ের ভিত্তিতে আমরা ভবিষ্যতে ভোগের কল্পনা করি, সেইরূপ দেশে বর্তমানের আয়স্তর অনুযায়ী ভবিষ্যৎ আমদানির পরিকল্পনা করা হয়। বর্তমানে আয়স্তর বাড়িলে আমাদের আমদানি বৃদ্ধি পায়, আয়স্তর কমিলে আমদানি হ্রাস পায়। যেমন, আয় পরিবর্তিত হইলে ভোগ পরিবর্তিত হয়—ইহাদের এই সম্পর্ক প্রকাশ করিবার জন্য আমরা 'প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা' ব্যবহার করি; ঠিক সেইরূপ, আয়ের সহিত আমদানির সম্পর্ককে আমরা বলি 'প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা' (Marginal Propensity to import)। আয়স্তর পরিবর্তিত হইলে আমদানির পরিমাণে যে পরিবর্তন হয়, এই দুই পরিবর্তনের অনুপাতকে প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা বলে। যেমন, আয়স্তর 100 বাড়িলে লোকেরা যদি 10 টাকার আমদানি বাড়াইয়া দেয় তবে জাতির প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা হইল $\frac{10}{100}$ অর্থাৎ 0·1.

আয়স্তর ও আমদানি: প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা

এই সম্পর্কটির গুরুত্ব দুই দিক হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত, প্রান্তিক আমদানিপ্রবণতা সাধারণত শূন্য (০) হইতে বেশি হয়, অর্থাৎ দেশে আয়স্তর বাড়িলে নিশ্চয় আমদানি পূর্বাপেক্ষা কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ, দেশের মধ্যে আয়স্তর বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফল হইল বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল করার দিকে ঝোঁক সৃষ্টি করা; কারণ আয়স্তর বাড়িলে রপ্তানি বাড়িবেই এরূপ কোন কথা নাই। আবার, বিদেশের আয়স্তর বাড়িলে তাহাদের আমদানি বৃদ্ধি পাইবে, ফলে আমাদের বাণিজ্য ব্যালান্স অনুকূল করার চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয়ত, আয়স্তর ও আমদানির মধ্যে সম্পর্কের আর একটি দিক আছে। আমদানির উপর আমাদের ব্যয়ের ফল অনেকটা সঞ্চয়ের মত, কারণ এই ব্যয়

আয়স্তর বাড়িলে আমদানি বাড়িবে

* "This, together with the assumption of constant prices within each country, means that prices of imported goods in term of home currency in each country do not vary."

দেশের মধ্যে নূতন আয় সৃষ্টি করে না। দেশের জিনিস কিনিয়া টাকা খরচ করিলে উহা দেশীয় দ্রব্যোৎপাদনকারী ও বিক্রেতার আয় সরাসরি বাড়াইয়া তোলে, বিদেশী জিনিস কিনিলেও এই আয় বাড়ে বটে, তবে ইহা বিদেশী উৎপাদকদের আয় বৃদ্ধি করে। আমাদের দেশের লোকের আয় ও কর্মসংস্থান ইহাতে বাড়ে না। যেমন, বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশের আয়স্তর বাড়িল। বর্ধিত আয়ের কিছুটা দেশী জিনিস ক্রয়ে ব্যয়িত হইল, আর কিছু অংশ বিদেশী জিনিসে খরচ হইল। যদি কোন অংশ দেশীয় জিনিসপত্রে ব্যয়িত হয়, তবে উহারফলে দেশের লোকের আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ে, আয় প্রসারের ধারা এইরূপে ক্রমে প্রসারিত হইতে থাকে। অপরপক্ষে বর্ধিত আয়ের যে অংশ আমদানি-বৃদ্ধিতে ব্যয়িত হইল তাহার প্রভাবে দেশের মধ্যে কোনরূপ আয়-বৃদ্ধি দেখা দিল না; সঞ্চয়ের মতনই উহা দেশের আভ্যন্তরীণ আয়-প্রসার স্রোতের ধারা হইতে বাহিরে রহিল।

আমদানি বৃদ্ধির ফল সঞ্চয়ের মতন

এইরূপ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তুলনা উল্লেখ করা দরকার। রপ্তানির ফল হইল দেশে আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের মতই। আয়-নির্ধারণের তত্ত্ব হইতে আমরা জানি যে, দেশে নূতন বিনিয়োগ আয়স্তরের উপর নির্ভরশীল নয়, বর্তমান আয়স্তর হইতে স্বাধীন বা নিরপেক্ষ ধরনের কোনরূপ কারণে বিনিয়োগ নির্ধারিত হয় (যেমন ইহা অনেকাংশ নির্ভরশীল শিল্পের-টেকনিকের উপর)। ঠিক সেইরূপ দেশের রপ্তানি-স্তর উহার আয়স্তরের উপর নির্ভরশীল নয়; বহিরাগত অনেক শক্তির প্রভাবে ইহা স্থির হয়, যেমন বিদেশী আয়স্তর দ্বারা। অর্থাৎ বিনিয়োগের ন্যায়ই কোন দেশের রপ্তানি-স্তর সেই দেশের আয়স্তরের উপর নির্ভর করে না।

রপ্তানি আয়স্তরের উপর নির্ভর করে না

শুধু তাহাই নহে। রপ্তানি-স্তরে পরিবর্তন আসিলে (অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে) বিনিয়োগের স্তরে পরিবর্তনের ন্যায় প্রভাব হয়। ইহা দেশের মধ্যে উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে বহুগুণ পরিবর্তনের সূচনা করে। রপ্তানি বাড়িলে দেশের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পায়; ইহাতে উৎপাদক ও বিক্রেতাদের আয় বাড়ে, তাহাদের এই বর্ধিত আয় দেশের মধ্যে ব্যয়িত হইয়া গুণক প্রসারের ধারা (**multiplier expansion**) শুরু করে।

রপ্তানিতে হ্রাসবৃদ্ধির ফল বিনিয়োগের হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায়

সুতরাং আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি যে, রপ্তানি-বৃদ্ধি বা আমদানি-হ্রাসের দরুন বাণিজ্য ব্যালান্সে কোনরূপ উন্নতির ফলে আভ্যন্তরীণ দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে, এইরূপে দেশে আয়ের গুণক-প্রসার শুরু হয়। আবার বিপরীত দিকে, বাণিজ্য ব্যালান্সে কোনরূপ অবনতির ফলে অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে আয়ে গুণক-সংকোচনের ধারা দেখা দেয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক (The Foreign Trade Multiplier)

জাতীয় আয়ের উপর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাব কতটা, তাহা পরিমাপের জন্য আমরা বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক আলোচনা করি। যেমন কোন এক বৎসরে ভারত হইতে 10 কোটি টাকা মূল্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইল। এই রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে 10 কোটি টাকার অনেক বেশি পরিমাণে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। যে পরিমাণ রপ্তানি বাড়িল, তাহার কতগুণ আয়স্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহাই বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক।

যেমন, মনে কর, একটি দেশ হইতে যে পরিমাণ রপ্তানি বাড়িল তাহাকে আমরা E বলিতেছি। তাহার অর্থ হইল এই যে, সেই দেশের রপ্তানি শিল্পের লোকজন পূর্বাপেক্ষা E পরিমাণ টাকা বেশি আয় করিতে পারিল। মালিকদের মুনাফা এবং শ্রমিকদের মজুরিরূপে এই টাকা উহাদের আয় বাড়াইয়া দিল। জাতীয় আয় E পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। বর্ধিত এই আয়কে তিনটি উপায়ে ব্যবহার করা চলে: (ক) দেশীয় জিনিসপত্রে ভোগব্যয়, (খ) বিদেশী বা আমদানি দ্রব্যাদিতে ভোগব্যয় এবং (গ) সঞ্চয়। কিছুটা আভ্যন্তরীণ ভোগব্যয়, কিছুটা বিদেশী ভোগব্যয়, ও কিছুটা সঞ্চয়—এই তিন উপায়ে বর্ধিত আয়কে লোকে ব্যবহার করিবে।

মনে কর, দেশের মধ্যে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইল C. অর্থাৎ, যদি আমরা মনে করি লোকে বর্ধিত আয়ের $\frac{1}{4}$ অংশ আভ্যন্তরীণ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিবে, তবে $c=\frac{1}{4}$। 10 কোটি টাকা নূতন আয় সৃষ্টি হইলে লোকে 10 কোটি $\times \frac{1}{4} = 2\frac{1}{2}$ কোটি টাকা আভ্যন্তরীণ ভোগব্যয় করিবে। সাধারণত মনে করা হয় যে, স্বল্পকালে এই c, বা আভ্যন্তরীণ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা সমান থাকে।

প্রথম স্তরে, E পরিমাণ রপ্তানি বাড়িলে জাতীয় আয় E পরিমাণ বাড়ে। বর্ধিত এই E পরিমাণ আয় হইতে লোকে $E \times c$ পরিমাণ টাকা আভ্যন্তরীণ

ভোগব্যয়ে খরচ করে। ফলে এই সকল দ্রব্যের উৎপাদক ও বিক্রেতাদের আয় Ec পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, দ্বিতীয় স্তরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় Ec পরিমাণ। তৃতীয় স্তরে লোকে এই Ec হইতে $Ec \times c = Ec^2$ পরিমাণ টাকা খরচ করে। জাতীয় আয় Ec^2 বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী স্তরে জাতীয় আয় বাড়ে $Ec^2 \times c = Ec^3$ পরিমাণ। জাতীয় আয়ে এই বৃদ্ধির ধারা ততদূর চলিতে থাকে যতদূরে বর্ধিত আয়ের পরিমাণ এত কম যে, উহা ভোগ হইয়া আর নূতন আয় সৃষ্টি করিতে পারে না। অর্থাৎ E পরিমাণ রপ্তানি বাড়িলে শেষ পর্যন্ত জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি কত হইল তাহা পাওয়া যায় নিচের অংকটি হইতে :

$$E + E_c + E_c{}^2 + E_c{}^3 + E_c{}^4 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots O$$

ইহা যোগ করার সূত্র হইল $E \times 1/1-c$. এইরূপে E পরিমাণ রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় উহার কতগুণ বাড়িবে তাহা আমরা জানিতে পারি E-কে $1/1-c$ দিয়া গুণ করিয়া। সুতরাং এই $1/1-c$ কে আমরা বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক বলিতে পারি। যেমন c হইল $\frac{1}{4}$, এই অবস্থায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে $10 \times 1/1-c$ কোটি টাকা। অর্থাৎ, $10 \times 1/1-\frac{1}{4} = 10 \times 1/\frac{3}{4} = 10 \times 4/3 = 13{\cdot}3$ কোটি টাকা।*

রপ্তানি হ্রাস পাইলেও উহার প্রভাব আমরা এই বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক হইতে পরিমাপ করিতে পারি। রপ্তানি হ্রাসের পরিমাণ যদি হয় F, তবে জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে $F \times 1/1-c$ পরিমাণ।

বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণককে ব্যাখ্যা করার সময়ে 'প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা' ও 'প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা' এই দুইটি ধারণার কথা মনে রাখা দরকার। যদি প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা হয় m এবং প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা হয় s, তবে $c+m+s=1$, কারণ বর্ধিত আয়ের কিছুটা অংশ আভ্যন্তরীণ ভোগে ব্যয় হয়, কিছু অংশ আমদানি দ্রব্যে ব্যয় হয় এবং কিছুটা সঞ্চয় হয়। উপরের সমীকরণ হইতে আমরা লিখিতে পারি যে, $1-c=m+s$, সুতরাং বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণককে $1/1-c$ না লিখিয়া আমরা, $1/m+s$ লিখিতে পারি। অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক $= \dfrac{1}{\text{প্রাঃ আঃ প্র} + \text{প্রাঃ সঃ প্র}}$;

(অর্থাৎ, 1/প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা+প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা)।

* Sum = 1st Term × 1/1—Common Ratio.

অনুশীলনী

1. Why should there be a separate theory for International trade ?

2. Show how the comparative cost of producing different commodities in different countries determine international specialisation of production as well as trade.

3. "The fact that a commodity can be produced at a lower cost by one country than by another is no guarantee that it will pay the first country to produce it and not to import it from the second." Explain and illustrate.

4. Explain the basis of International trade and examine the possibility of trade between two highly industrialised countries.

5. Do you think that if there are more than two commodities and two countries, the whole theory of comparative advantage has to be scrapped ?

6. "Although trade does not equalise the earnings of the factors of production in different countries, it does tend to level out differences." Comment.

7. Explain what is meant by 'terms and trade', and point out the factors on which it depends.

8. What is Reciprocal demand and how does it help to determine the International Values.

9. Examine the meaning of the concept "terms of trade" and point out the repercussions of a change in the terms of trade on the economy of a country.

10. What are the gains from foreign trade ? How these gains can be measured ? On what factors these gains depend ?

11. Write a short note on the concept of Foreign Trade Multiplier.

১৩

বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি

Foreign Exchange and Trade Policy

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষ সমস্যা হইল এক দেশের অর্থকে অপর দেশের অর্থে রূপান্তরণ (conversion) করা। পৃথিবীর সকল দেশে সমান ধরনের অর্থ নাই, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রচলিত। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে উদ্ভূত দেনা-পাওনা মিটাইতে হইলে ক্রেতার অর্থকে বিক্রেতার অর্থে রূপান্তরিত করিতে হয়। এক দেশের অর্থকে অপর দেশের অর্থে রূপান্তরণের পদ্ধতি, রীতিনীতি ও কাজকর্মকে বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange) বলা হয়।

বৈদেশিক বিনিময় কাহাকে বলে

অর্থের এই রূপান্তরণ কিরূপে ঘটে? মনে করা যাউক, ভারতের মিঃ সেন, ইংলণ্ডের মিঃ টমের নিকট 5000 টাকা মূল্যের চা বিক্রয় করিয়াছে (বা রপ্তানি করিয়াছে)। মিঃ টম ক্রেতা, সুতরাং বিক্রেতাকে এই মূল্য বা ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে পাউণ্ডকে ভারতীয় টাকায় রূপান্তরিত করিতে হইবে।

মিঃ সেন চা রপ্তানির সময় একখানা হুণ্ডি বা বিনিময়-বিল তৈয়ার করিয়া মিঃ টমের নিকট পাঠাইয়াছিলেন ; ধরা যাউক, মিঃ টম্‌ 90 দিন পরে পাউণ্ড দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া ওই বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। 90 দিন শেষ হইবার পূর্বে বা পরে মিঃ সেন ভারতে অবস্থিত কোন বিনিময়-ব্যাঙ্কের (Exchange Bank) নিকট উপস্থিত হইয়া ওই বিল ভাঙাইয়া টাকা পাইয়া গেলেন, প্রাপ্তি-সময়ের পূর্বে ভাঙানো হইল বলিয়া ব্যাঙ্ক বাট্টা লইল। বিনিময়-ব্যাঙ্কের ইংলণ্ডে যে অফিস আছে, বিল বা হুণ্ডি সেখানে চলিয়া গেল, প্রতিশ্রুত 90 দিন উত্তীর্ণ হইলে মিঃ টমের নিকট উহা উপস্থিত হইল এবং ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কটি তাঁহার নিকট হইতে পাউণ্ড পাইয়া গেল। 'আমদানি হইলে এইরূপ পদ্ধতিতেই মূল্য পরিশোধ করা চলে।

কিরূপে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দামমিটানো হয় : বিনিময়বিল ও ব্যাঙ্কের ড্রাফট

আধুনিক কালে মূল্য পরিশোধের জন্য বা অর্থের রূপান্তরণের জন্য সাধারণত ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ ব্যবহৃত হয়। যেমন, মিঃ সেন মিঃ টমের নিকট হইতে 600 পাউণ্ড মূল্যের যন্ত্র আমদানি করিয়াছেন। তিনি ভারতে অবস্থিত কোন বিনিময় ব্যাঙ্কে গিয়া টাকার বদলে পাউণ্ড কিনিতে চাহিলেন। ব্যাঙ্ক তাঁহাকে বিনিময়-হার জানাইয়া দিল, অর্থাৎ সে 1 টাকায় কি পরিমাণ ব্রিটিশ অর্থ বিক্রয় করিতে রাজি আছে তাহা জানাইল। সেই হারে 600 পাউণ্ড ক্রয় করিতে যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন তাহা জমা দিয়া মিঃ সেন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 600 পাউণ্ডের একখানি ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ পাইলেন, তিনি উহা মিঃ টমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মিঃ টম্ ড্রাফট্ প্রদানকারী ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখা বা অফিস হইতে পাউণ্ড পাইয়া গেলেন।

দেশী টাকার বৈদেশিক চাহিদা ও যোগান

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষ রপ্তানি করিলে ভারতীয় টাকায় উহার মূল্য পরিশোধের উদ্দেশ্যে বিদেশে বিদেশী অর্থ বিনিময়-ব্যাঙ্কে জমা পড়ে এবং বিদেশের ব্যবসায়ীগণ ভারতীয় টাকা ক্রয় করিতে চাহে। এইরূপেই বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে ভারতীয় টাকার চাহিদা সৃষ্টি হয়। আবার, ভারতবর্ষ আমদানি করিলে উহার মূল্য পরিশোধের জন্য বিনিময় ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমরা বিদেশী অর্থ ক্রয় করিতে চাহি; বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে ভারতীয় টাকার যোগান হয়, এবং বিদেশী অর্থের চাহিদা সৃষ্টি হয়। শুধু দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইতেই দেশীয় টাকার বা বিদেশী অর্থের এইরূপ যোগান ও চাহিদা দেখা দেয়, তাহা নহে। আরও অনেক কারণে ইহা ঘটে। যেমন কোন ছাত্র লণ্ডনে পড়িতে যাইবে সে এখানকার ব্যাঙ্কে দেশীয় টাকা জমা দিয়া ইংলণ্ডের পাউণ্ড কিনিতে চাহে। ইহাতে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে আমাদের টাকার যোগান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বাজারে বিদেশী অর্থের জন্য চাহিদা সৃষ্টি হয়। ঠিক এইরূপ, ইংলণ্ডের কোন ব্যবসায়ী আমাদের দেশে কোন কোম্পানির শেয়ার কিনিতে চায় বা সেখানকার কোন ব্যক্তি তাজমহল দেখিতে চায়। সে নিজের দেশের কোন ব্যাঙ্কে পাউণ্ড জমা দিয়া ভারতীয় টাকার চাহিদা সৃষ্টি করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তিনটি উদ্দেশ্যে

ইহা লইয়াই লেনদেন-ব্যালান্স গঠিত

দেশের মধ্যে বিদেশী অর্থের এবং বিদেশের বাজারে দেশীয় টাকার চাহিদা দেখা যায়, লেনদেন, বিনিয়োগ ও ফাটকা নিয়োগের উদ্দেশ্যে (Transaction, investment and specula-

tion)। ইহাদের একত্র হিসাবকে বলে লেনদেন-ব্যালান্স। কোন দেশের টাকার যোগান ও চাহিদার সকল কারণ লইয়া সেই দেশের লেনদেন-ব্যালান্স গঠিত হয়।

বাণিজ্য ব্যালান্স ও লেনদেন ব্যালান্স (Balance of trade and Balance of Payments)

কোন দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি হইলে তাহার জন্য বিদেশী অর্থে দাম পাওয়া যায় এবং বিদেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করিতে হইলে তাহার জন্য দেশীয় টাকায় দাম দিতে হয়। রপ্তানি-দ্রব্যাদির মূল্য ও আমদানি দ্রব্যাদির মূল্যের একত্র হিসাবকে বাণিজ্য ব্যালান্স (Balance of trade) বলা হয়।

বাণিজ্য ব্যালান্স

বাণিজ্য ব্যালান্সে সমতা অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির দামের সমতা থাকিবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। এইরূপ সমতা থাকিলে বোঝা যায় দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির দরুন বিদেশের বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদা সমান। যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কোন দেশের আমদানির মূল্য রপ্তানির মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে সেই দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল (unfavourable)। অপর পক্ষে রপ্তানির মূল্য আমদানির মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে সেই দেশের বাণিজ্য-ব্যালান্স অনুকূল (favourable)।

কিন্তু দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় ছাড়াও অন্যান্য বহু বিষয়ের জন্য বিদেশে অর্থ প্রেরণ করিতে হয় বা বিদেশ হইতে অর্থ পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের

লেনদেন ব্যালান্স

ক্ষেত্রে দ্রব্যসামগ্রী ছাড়াও বহু বিষয়ে বিদেশের সহিত লেনদেন করিতে হয়; কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দেশের সহিত পৃথিবীর সকল দেশের যে লেনদেন হয়, তাহার হিসাবকে সেই দেশের লেনদেন ব্যালান্স (Balance of payment) বলা হয়।

যে সকল বিষয় লইয়া দেশের লেনদেন ব্যালান্স গঠিত হয় তাহাদের নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়:

I. চলতি ব্যালান্স (Current Balance)

(ক) দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেন, আমদানি ও রপ্তানির দ্রব্যাদি বা 'দৃশ্য' (Visible) বিষয়সমূহ। (খ) 'অদৃশ্য' (Invisible) বিষয়সমূহ, যেমন জাহাজের ভাড়া বা পরিবহন ব্যয়, ভ্রমণকারীদের ব্যয়, বিদেশী কোম্পানিসমূহের মুনাফা, সরকারী অর্থ প্রেরণ প্রভৃতি।

লেনদেনের উদ্দেশ্য

II. পুঁজির ব্যালান্স (Capital balance) :

দেশ হইতে বিদেশে পুঁজির রপ্তানি বা বিদেশ হইতে দেশে পুঁজির আমদানি অথবা স্বর্ণের আগমন ও বহির্গমন।

পুঁজির হিসাবকে (Capital Account) দুইভাগে বিভক্ত করা যায় : (ক) দীর্ঘকালীন পুঁজির হিসাব, (খ) স্বল্পকালীন পুঁজির হিসাব। স্থায়ী বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে দেশ হইতে যে মূলধন বিদেশে চলিয়া যায় বা বিদেশ হইতে দেশে আসে তাহাদের এই খাতে হিসাব করা হয়। ইহাকে বলা যায় লেনদেন ব্যালান্সের বিনিয়োগ-ক্ষেত্র (Investment sector)। দীর্ঘকালের জন্য দেশীয় মূলধনের বিদেশে বিনিয়োগ বা দেশের অভ্যন্তরে বৈদেশিক মূলধনের বিনিয়োগ এই খাতে হিসাবের জন্য ধরা হয়। তাহা ছাড়া ফাট্‌কা নিয়োগের অভিপ্রায়ে (যেমন দেশে সুদের হার বাড়িলে বা কমিলে) স্বল্পকালীন পুঁজি দেশ হইতে বাহির হইয়া যায় বা দেশের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাকে বলে ফাট্‌কা-নিয়োগের ক্ষেত্র (Speculative sector)। স্বল্পকালীন পুঁজির হিসাবে প্রথমেই ধরা হয় স্বর্ণের আগমন বা বহির্গমনের পরিমাণকে। ইহা ছাড়া বিদেশের ব্যাঙ্ক বা ব্যবসায়ীদের নিকট দেশীয় ব্যবসায়ীদের নিকট বিদেশী ব্যবসায়ীদের জমা বা পাওনাসমূহকে এবং দেশের ব্যাঙ্ক বা দেশীয় ব্যবসায়ীদের জমা বা পাওনাসমূহকে এই স্বল্পকালীন পুঁজির হিসাবে ধরা হয়।

বিনিয়োগ ও ফাটকা নিয়োগের উদ্দেশ্যে টাকার বৈদেশিক চাহিদা ও যোগান

লেনদেন-ব্যালান্সে সমতা ও ভারসাম্য (Equality and Equilibrium in the Balance of Payments) :

হিসাব-পদ্ধতি (accounting procedure) অনুযায়ী কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সের দেনা ও পাওনার দুইটি দিক সর্বদা সমান থাকিবে। নিছক হিসাবের ক্ষেত্রে দেনা-পাওনার উভয় দিক নিশ্চয় সমান থাকে। দেশ হইতে প্রেরিত সকল অর্থ ইহার দেনা (debt)। যদি কোন দেশ অন্য দেশের তুলনায় অধিক দ্রব্য, শেয়ার ইত্যাদি বিক্রয় করে বা মাল বহন প্রভৃতি কার্যাদির দ্বারা অধিক আয় করে তাহা হইলে এই সকল মিলিয়া তাহার পাওনার দিক (credit) গঠিত হইল, ইহা সে অন্যের নিকট হইতে পাইবে। যদি এই মূল্যের স্বর্ণ বিদেশীরা দেশের মধ্যে পাঠাইয়া দেয়, তবে সেই লেনদেন

লেনদেন ব্যালান্সের দেনা-পাওনার উভয় দিক সর্বদা সমান

দেনার দিকে (debit side) লিখিয়া রাখা হইল (কারণ বিদেশ হইতে উহা পাওয়া যাইতেছে)। যদি স্বর্ণ পাঠাইয়া না দেয়, তাহা হইলে বিদেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীদের নিকট স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন পুঁজি হিসাবে ইহা রক্ষিত আছে। এমন ভাবেই হিসাব লিখিয়া রাখা হইল যেন অন্যকে ঋণ হিসাবে ইহা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ দেশের বৈদেশিক ঋণদানের পরিমাণ (foreign lending) বৃদ্ধি পাইয়াছে, লেনদেন ব্যালান্সে ইহাই ধরা পড়িবে। সুতরাং, লেনদেন ব্যালান্সে দেনা-পাওনার উভয় দিক সর্বদা সমানই থাকিবে, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ বলা চলে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রপ্তানির দ্বারাই আমদানির মূল্য পরিশোধ করা হয় (Export pay for Imports)। কারণ, যে দ্রব্য আমদানি করা হইল উহার বিনিময়ে হয় দ্রব্য-রপ্তানি অথবা মূলধন-রপ্তানি করিয়া উহার মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করিলে তাহার মূল্য মিটানো হয়; দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর বা পুঁজির রপ্তানি করিয়া লেনদেন ব্যালান্সে উভয় দিকের সমতা হইতে ইহা বোঝা যায়।

রপ্তানী দ্বারাই আমদানির মূল্য পরিশোধ

লেনদেন-ব্যালান্সের উভয় দিকে এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ সমতা নিছক যান্ত্রিক সমতামাত্র (mechanical equality); ইহাকে লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য (equilibrium) বলা উচিত নয়। ভারসাম্য বলিলে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আছে বা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় আছে এরূপ বোঝা যায়। কিন্তু লেনদেন ব্যালান্সে নিছক হিসাবগত সমতা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য অথবা দেশের আর্থিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলে না, দেশের ঘোর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও লেনদেন ব্যালান্সে তথাকথিত সমতা থাকিবেই। দীর্ঘকালের হিসাবে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের জন্য চাহিদা ও যোগান সমান আছে, প্রভূত পরিমাণ মূলধন দেশ হইতে রপ্তানি হয় না বা দেশে আমদানি হয় না, দেশীয় অর্থের বৈদেশিক মূল্য বা বৈদেশিক বিনিময়-হার (Rate of Foreign Exchange) মোটামুটি স্থায়ী ও বিশেষ উঠানামা হয় না—এইরূপ অবস্থাকেই লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য (Equilibrium

সমতা ও ভারসাম্যে পার্থক্য : লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য এবং ভারসাম্য-বিহীনতা কাহাকে বলে

in the balance of Payments) বলা হইয়া থাকে। যদি এইরূপ অবস্থা না থাকে, অর্থাৎ দীর্ঘকাল যাবৎ দেশ হইতে পুঁজি বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকে বা বাহির হইতে দেশের মধ্যে আসিতে থাকে, বৈদেশিক বাণিজ্য-হারে ঘন ঘন এবং প্রচুর পরিমাণে উঠানামা (fluctuations) ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে বলা হয় যে, লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যবিহীনতা (disequilibrium) সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং সমতা ও ভারসাম্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যবিহীনতা আসিতে পারে যদি (ক) দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ, অথবা (খ) স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পুঁজির আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। দ্রব্যাদি আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ পরিবর্তিত হয়, যদি (১) চাহিদার পরিবর্তন ঘটে, (২) যোগানের পরিবর্তন ঘটে, (৩) দ্রব্যসামগ্রীর সংখ্যাতে ও উৎকর্ষে পরিবর্তন ঘটে, (৪) দেশের বা বিদেশের উৎপাদন-ক্ষমতা বিধ্বস্ত হয় বা ভিন্নরূপ হইয়া যায় (যেমন যুদ্ধের ফলে), (৫) জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে (যাহাতে দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়ে বা কমে), (৬) ঋণগ্রহণ, ঋণদান, ক্ষতিপূরণ দান বা গ্রহণ করা হয়, এবং (৭) বিনিময়-হারে পরিবর্তনের দরুন আমদানি-রপ্তানির দামে পরিবর্তন হইয়া উহাদের চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। পুঁজির আমদানি ও রপ্তানিতে পরিবর্তন আসে, যদি (১) নূতন বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে, (২) ঋণ পরিশোধ বা সুদ প্রদান শুরু হয়, এবং (৩) মুনাফা বা নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ফাটকাদারী লেনদেনে পরিবর্তন আসে।

ভারসাম্য সাধনের পদ্ধতি (Theories of Balancing Process):

কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যহীনতা আসিলে বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে লেনদেন ব্যালান্সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় ভারসাম্য ফিরিয়া আসে। ভারসাম্যে পৌঁছিবার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি (self equilibrating mechanism) সম্বন্ধে ক্লাসিকাল ও আধুনিক এই দুই প্রকার মতামত প্রচলিত আছে।

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণের অভিমতে আর্থিক পদ্ধতির মাধ্যমেই (monetary mechanism) লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। যদি কোন একটি দেশে রপ্তানির মূল্য উহার আমদানির মূল্য হইতে অধিক হয়, তবে সেই দেশ অপর দেশ হইতে স্বর্ণ পাইবে এবং

যে-দেশের লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল, সে স্বর্ণ পাঠাইয়া দিবে। অনুকূল লেনদেন ব্যালান্স থাকার দরুণ দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিবে, ফলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, দামস্তরও বাড়িয়া যাইবে। অপরদিকে, প্রতিকূল লেনদেন ব্যালান্সের দরুণ অপর দেশটি হইতে স্বর্ণ চলিয়া আসিবে, এবং ফলে উহার অর্থের পরিমাণ কমিয়া যাইবে, দামস্তরও কমিয়া আসিবে। কালক্রমে, যে-দেশের আয়স্তর বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার রপ্তানি কমিবে এবং অপর দেশের দামস্তর কমিয়া যাওয়ায় সেই দেশ হইতে আমদানি বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে সমতা সাধিত হইবে। যে দেশের দামস্তর কমিয়া গিয়াছে সেই দেশ অধিক রপ্তানি করিতে পারিবে এবং বিদেশী দামস্তর অধিক থাকায় উহার আমদানি কমিয়া যাইবে; আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে সমতা ফিরিয়া আসিবে, লেনদেন ব্যালান্সে প্রতিকূলতা থাকিবে না। এইরূপে দুই দেশের লেনদেন ব্যালান্সই পুনরায় ভারসাম্যাবস্থায় পৌঁছিবে। স্বর্ণ যাতায়াতের ফলে দামস্তরে উত্থান-পতনের মাধ্যমে লেনদেন ব্যালান্সে সমতাসাধনের এই ক্লাসিকাল তত্ত্বের নাম হইল 'স্বর্ণের গতিবিধি সংক্রান্ত রিকার্ডোর তত্ত্ব' (Ricardian theory of Gold Movements)।

ক্লাসিকাল তত্ত্ব: স্বর্ণের গতিবিধি ও দামস্তরে পরিবর্তনের দ্বারা

আধুনিককালে ভারসাম্য-বিধানের এই ক্লাসিকাল স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু সমালোচনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, এই তত্ত্ব অর্থমূল্য সম্পর্কীয় পরিমাণতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ ইহা ধরিয়া লয় যে, স্বর্ণের পরিমাণে পরিবর্তন দেশে অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আনিবেই, এবং অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আসিলে দামস্তরও পরিবর্তিত হইবে (অর্থাৎ সমাজে পূর্ণকর্মনিয়োগ স্তর ধরিয়া লওয়া হইতেছে)।* কিন্তু পৃথিবীতে স্বর্ণমান প্রচলিত নাই, আর অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন হইলেই দেশের দামস্তর পরিবর্তিত হয় না, কারণ সাধারণত দেশগুলিতে অপূর্ণ কর্মসংস্থান রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সুদের হার কমিয়া বিনিয়োগ, কর্মনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়িতে পারে; প্রথমেই দামস্তরে বৃদ্ধি হয় না।

ক্লাসিকাল তত্ত্বের সমালোচনা

* "The classical theory contains an explicit acceptance of the quantity theory of money as well as an implied assumption that output and employment are unaffected by international monetary disturbances...The Keynesian revolution cast doubt upon both of these crucial assumptions." Metzler, *A survey of contemporary Economics*, P 212.

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে স্বর্ণের যাতায়াত এবং দামস্তরে পরিবর্তন ছাড়াও লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য ফিরিয়া আসিতে পারে। মনে করা যাউক, A দেশের লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল হইয়াছে এবং B দেশের লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল অবস্থায় আছে। A দেশ হইতে অধিক রপ্তানি হওয়ার ফলে সেই দেশে রপ্তানি-দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, কর্মসংস্থান ও আয়স্তরও বর্ধিত হইয়াছে। অপরদিকে B দেশে অধিক পরিমাণ আমদানি হওয়ায় এবং কম রপ্তানি হওয়ায় আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও আয়স্তর কমিয়া গিয়াছে। A দেশের আয়স্তর বৃদ্ধি হওয়ায় সেখানে আমদানি-প্রবণতা (propensity to import) বাড়িয়া গিয়াছে, ফলে A দেশে আমদানির পরিমাণ বাড়িবে। অপরপক্ষে, B দেশে আয়স্তর কমিয়া যাওয়ায় আমদানি-প্রবণতা হ্রাস পাইয়াছে, ফলে A দেশ হইতে তাহার আমদানি কমিবে। এইরূপে উভয়দেশে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণে পরিবর্তন হইয়া উভয়ের সমতা-সাধন হইবে, লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যাবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

আধুনিক তত্ত্ব : আয়-স্তরে ও কর্মসংস্থান স্তরে পরিবর্তনের দ্বারা

ক্লাসিকাল তত্ত্ব ও আধুনিক তত্ত্বের মিল হইল, উভয়েই বলিতেছেন ভারসাম্যাবস্থায় ফিরিয়া আসিবার জন্য স্বয়ংক্রিয় ধরনের পদ্ধতি আছে। কিন্তু মিল অপেক্ষা ইহাদের পার্থক্যই গভীর। ক্লাসিকাল মতে দামস্তরে পরিবর্তনের দ্বারা সমতাসাধন হয়, কিন্তু আধুনিক মতে দামস্তরে পরিবর্তনের মাধ্যমেই ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার ঘটে।

দুই তত্ত্বের মিল ও পার্থক্য

মনে রাখা দরকার যে, ফাটকাদারি মূলধনের আমদানি বা রপ্তানির ফলে ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটিলে এই পদ্ধতিতে ভারসাম্যে পুনরাগমন করা চলে না, কারণ ফাটকাদারি পুঁজির লেনদেন উভয় দেশের আয়স্তরকে পরিবর্তিত করিয়া আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না।*

*"Like the classical theory of the balance of payments, the theory which has emerged in the last ten years envisages a more or less automatic balancing mechanism. Unlike the classical theory, however, the new explanation normally accounts for only a part of the adjustment and thus constitutes a theory of disequilibrium as well as a theory of equilibrium. Moreover, the cumulative movement of income at home and abroad which is the essence of modern theory will not occur unless the disturbing influence affects the circular flow of income as well as the balance of payments." Meztler. P. 2?0.

লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়া না-ও আসিতে পারে।

স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি বিফল হইলে কি করা হয়

এরূপ ঘটিতে পারে যে, আয়স্তরে পরিবর্তনের পরিমাণ এত বেশি হইল না যাহাতে আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে পুনরায় সমতা ফিরিয়া আসিল। এরূপ অবস্থায় যদি ভারসাম্য-বিহীনতা (ধরা যাউক, প্রতিকূলতা) চলিতেই থাকে তাহা হইলে এইরূপ প্রতিকূলতা দূর করিয়া সাম্যাবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যাইতে পারে :

(ক) **রপ্তানি বৃদ্ধি :** উন্নত ধরনের বিক্রয়-ব্যবস্থার সাহায্যে বা আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচের দ্বারা রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করা।

(খ) **আমদানি হ্রাস :** প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (direct controls) দ্বারা আমদানির পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করা।

(গ) **অর্থের বহির্মূল্য হ্রাস :** সরকারীভাবে বিদেশী অর্থের হিসাবে দেশীয় অর্থের বিনিময়-মূল্য কমাইয়া দেওয়া। ইহার ফলে দেশীয় দ্রব্যাদি বিদেশের বাজারে সস্তা হইবে এবং বিদেশী দ্রব্যের দাম দেশের বাজারে বৃদ্ধি পাইবে। ফলে, রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস একই সঙ্গে ঘটিবে, লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে।

বৈদেশিক বিনিময়-হার কিরূপে নিরূপিত হয় (How the Rate of Foreign Exchange is Determined ?)

দুই দেশের অর্থ যে-হারে পরস্পরের সহিত বিনিময় হয়, তাহাকে উভয় দেশের বৈদেশিক বিনিময়-হার (Rate of Foreign Exchange) বলে।

বৈদেশিক বিনিময়-হার কাহাকে বলে

কোন দেশের অর্থের বিনিময়ে অপর দেশের অর্থ যে পরিমাণ পাওয়া যায়, অর্থাৎ অপর দেশের অর্থের হিসাবে নিজ-দেশের অর্থের মূল্য—ইহাকেই বৈদেশিক বিনিময়-হার বলে। ইহাকে অর্থের বহির্মূল্যও (External Value) বলা চলে।

কোন দেশের অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার কোন নির্দিষ্ট ও স্থির অনুপাত নহে, প্রায় সর্বদাই ইহার উঠা-নামা ঘটে। যে-ভাবে এবং যে-শক্তিসমূহের দ্বারা বৈদেশিক বিনিময়-হার নিরূপিত হয় তাহাদের দুইটি পৃথক অবস্থা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন : (১) যখন উভয় দেশের মধ্যে স্বর্ণমান

* যেমন ভারতের অর্থ 1 টাকার বিনিময়ে ব্রিটেনের অর্থ 1 শিঃ 6 পেঃ পাওয়া যায়।

প্রচলিত আছে, এবং (২) যখন উভয় দেশে বা অন্তত একটি দেশে অরূপান্তরনীয় কাগজী অর্থ (Inconvertible Paper Currency) প্রচলিত।

(১) স্বর্ণমান প্রচলিত থাকাকালীন বিনিময়-হার নিরূপণ ঃ

যদি স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে তাহা হইলে দেশে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকিতে পারে অথবা দেশীয় কাগজী টাকা ও স্বর্ণের মধ্যে বিনিময়ের অনুপাত নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে। এইরূপ অবস্থায়, উভয় দেশের অর্থের মধ্যে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় নিজ নিজ অর্থের সহিত স্বর্ণের পরিমাণগত সম্পর্কের দ্বারা। ধরা যাক্ A দেশের 1 মুদ্রার মধ্যে যে-পরিমাণ স্বর্ণ আছে সেই সমপরিমাণ স্বর্ণ B দেশের তিনটি মুদ্রার মধ্যে রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় স্বর্ণের হিসাবে 1 A মুদ্রা 3 B মুদ্রার সমান মূল্যের ; সুতরাং 1 A মুদ্রার বিনিময়ে 3 B মুদ্রা পাওয়া যাইবে (1A = 3B) ; ইহাই পরস্পরের বিনিময়-হার। ইহাকে বলা হয় মুদ্রণজনিত বিনিময়ের সমহার (Mint Par of Exchange)। স্বাভাবিক অবস্থায়, লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য বজায় থাকিলে, উভয় দেশের মধ্যে এই হারই নির্ধারিত থাকিবে এবং এই হারেই আমদানি ও রপ্তানি হইবে। কিন্তু লেনদেন-ব্যালান্সে ভারসমতা নষ্ট হইলে উভয় দেশের বৈদেশিক বিনিময়-হারেও উঠানামা (Fluctuations) হইবে , তবে এই উঠানামার নিদিষ্ট সীমা থাকে, ভারসাম্যে বিচ্যুতির পরিমাণ অনুযায়ী সেই নিদিষ্ট সীমার মধ্যে বিনিময়-হার নির্ধারিত থাকিবে। বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানামার সীমা (Limit) বা পরিধি নির্ভর করে এক দেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার ব্যয়ের উপর।

স্বর্ণমান ব্যবস্থায়

বৈদেশিক লেনদেন খাতে কোন দেশের আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি হইলে বিনিময় হার তাহার অনুকূলে যাইবে, রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হইতে থাকিলে বিনিময়-হার তাহার প্রতিকূলে আসিবে। প্রথমক্ষেত্রে যদি লেনদেন-ব্যালান্স A-এর অনুকূলে হয় তাহা হইলে A-এর 1 মুদ্রা B দেশের 3 মুদ্রা + স্বর্ণ প্রেরণের ব্যয়ের সমান হইবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, লেনদেন ব্যালান্স A-এর প্রতিকূল হইলে বিনিময়-হারও তাহার প্রতিকূলে যাইবে, অর্থাৎ 1 A মুদ্রা = 3 B মুদ্রা — স্বর্ণ প্রেরণের ব্যয়। বিনিময়-হারের উঠানামা এই দুই হারকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে, B-এর ব্যবসায়ীরা

বিনিময়-হারে বিচ্যুতির সীমা : উচ্চ ও নিম্ন স্বর্ণবিন্দু

উহা হইতে অধিক মূল্য দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে A মুদ্রা কিনিবে না, ব্যাঙ্ক উহা অপেক্ষা অধিক দাম চাহিলে স্বর্ণ ক্রয় করিয়া A-এর ব্যবসায়ীদের নিকট পাঠাইয়া দিবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, A এর ব্যবসায়ীরা ওই দামেই B মুদ্রা কিনিতে বাধ্য হইবে, স্বর্ণ ক্রয় করা ও প্রেরণ করার ব্যয় তাহাদের বহন করিতেই হইবে। বিনিময়-হারের উঠানামার এই দুই সীমাকে উচ্চ স্বর্ণবিন্দু (Upper gold point) এবং নিম্ন স্বর্ণবিন্দু (Lower gold point) বলে।

(২) অরূপান্তরনীয় কাগজী অর্থ থাকাকালীন বিনিময়-হার নির্ধারণ ঃ

স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে ধাতুবিন্দুগুলির (Specie points) দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে বিনিময়-হার উঠানামা করিতে পারে না। কিন্তু যখন অরূপান্তরনীয় কাগজী অর্থ প্রচলিত থাকে তখন বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানামার কোন সীমা-পরিসীমা নাই, ইহার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। সেইরূপ অবস্থায় কি ভাবে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় তাহার সম্বন্ধে দুইটি প্রচলিত তত্ত্ব আছে ঃ (ক) ক্রয়শক্তির সমতা তত্ত্ব (Purchasing Power Parity theory), এবং (খ) আধুনিক কালের চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (Demand and Supply theory)।

অরূপান্তরনীয় কাগজী মানব্যবস্থায়

(ক) **ক্রয়শক্তির সমতা তত্ত্ব ঃ** সুইডেনের ধনবিজ্ঞানী গুস্তাভ্ ক্যাসেল (Gustav Cassel) বৈদেশিক বিনিময়-হার নিধারণ সম্পর্কে ক্রয়শক্তির সমতা তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, সাধারণ অবস্থায়, উভয় দেশের অর্থের বিনিময়-হার নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরে অর্থের ক্রয়শক্তির সম্পর্ক প্রকাশ করে। নিজের দেশে নিজ অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তি এবং অন্য দেশে অপর অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তি—এই উভয় দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির সমতার বিন্দুতে ইহাদের মধ্যে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয়। যেমন, ইংলণ্ডে কিছু পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী যদি 1 পাউণ্ডে পাওয়া যায় এবং ভারতে সেই একই ধরণের ও সমপরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর দাম (similar assortment) যদি 15 টাকা হয়, তাহা হইলে 1 পাউণ্ডের এবং 15 টাকার ক্রয়ক্ষমতা সমান। সুতরাং বিনিময়-হার হইবে 1 পাউণ্ড=15 টাকা।

দুই দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ মূল্যের সমতা

এই তত্ত্বটিকে আর একভাবে বলা চলে। কোন একটি দেশের মধ্যে অর্থের ক্রয়শক্তি আভ্যন্তরীণ দামস্তরের বিপরীত দিকে উঠানামা করে, তাহা

আমরা জানি। সুতরাং দুই দেশের অর্থের ক্রয়শক্তির অনুপাত উহাদের দামস্তরের অনুপাতের বিপরীত হইবে। অর্থাৎ,

$$\frac{\text{1 পাঃ (£)}}{\text{1 টাঃ (Rs.)}} = \frac{\text{£-এর ক্রয়শক্তি}}{\text{Rs.-এর ক্রয়শক্তি}} = \frac{\text{ভারতের দামস্তর}}{\text{ইংলণ্ডের দামস্তর}}\text{।}$$

নিজ দেশে অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির পরিবর্তন ঘটিলে বৈদেশিক বিনিময়-হারেরও পরিবর্তন ঘটিবে। আভ্যন্তরীণ মূল্য কমিলে বহির্মূল্যও কমিবে, আভ্যন্তরীণ মূল্য বাড়িলে বহির্মূল্যও বাড়িবে। সুতরাং ক্রয়শক্তির সমতার বিন্দু স্থিরবিন্দু নহে, ইহা চলনশীল বা পরিবর্তনশীল বিন্দু, দেশের অভ্যন্তরে দামস্তরে পরিবর্তন অনুযায়ী ইহা পরিবর্তিত হয়। ভারসাম্যের বিনিময়-হারকে উভয় দেশের দামস্তরে পরিবর্তনের হার দিয়া গুণ করিলে এই পরিবর্তিত বিনিময়-হার পাওয়া যায়। Cassel বলিতেছেন যে, "it is only when we know the exchange rate which represents a certain equilibrium that we can calculate the rate which represents the same equilibrium at an altered value of the monetary units of the two countries."

বিনিময়হারে উঠানামা ও তাহার কারণ

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝা যাইতে পারে। ভারত ও ইংলণ্ডের অর্থের মধ্যে 1 পাঃ = 15 টাকা বিনিময়-হার স্থির ছিল। কিছুদিন পরে উভয় দেশেই দামস্তরে পরিবর্তন হইল, সূচকসংখ্যা অনুযায়ী ইংলণ্ডের দামস্তর হইল 300 এবং ভারতের দামস্তর হইল 200। এরূপ অবস্থায় নতন বিনিময়-হার হইবে 1 পাঃ = টাকা $\frac{15 \times 200}{300} = 10$, অর্থাৎ 1 পাঃ = 10 টাকা। ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ দামস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় পাউণ্ডের বহির্মূল্যও কমিয়া গিয়াছে; পাউণ্ডের বিনিময়ে পূর্বের তুলনায় কম ভারতীয় টাকা পাওয়া যাইতেছে।

ক্যাসেল বর্ণিত এই ক্রয়শক্তির সমতাতত্ত্ব আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কারণের জন্য গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। (ক) যে সূচক-সংখ্যার সাহায্যে দেশীয় অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় করা হয়, সেই সূচক সংখ্যার নির্মাণকালে আভ্যন্তরীণ ও আন্তজাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে এইরূপ সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী যদি হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে এই তত্ত্ব নির্ভুল থাকিতে পারে না। কারণ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের দ্রব্যসামগ্রীর দামে পরিবর্তন লেনদেন ব্যালান্সে প্রভাব বিস্তার করে না, বিদেশী বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদাকেও প্রভাবিত করে না। আর, শুধু যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে এইরূপ

সমালোচনা

দ্রব্যের সাহায্যে সূচক-সংখ্যা গঠিত হয়, তবে এই তত্ত্ব নিছক স্বতঃসিদ্ধ, কারণ ইহাদের দামস্তর সকল দেশে স্বভাবতই সমান। (খ) মূলধনের আগমন বা নির্গমনের ফলে বৈদেশিক বিনিময় হারের পরিবর্তন এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না। (গ) বিদেশে রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে বা কমিলে, অথবা দেশে আমদানি দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে বা কমিলে (দেশে ও বিদেশে উৎপাদন ব্যয়ে পরিবর্তন হইলে) আভ্যন্তরীণ দামস্তরে পরিবর্তন না হইয়াও বিনিময়-হারে পরিবর্তন আসিতে পারে। Metzler তাই বলেন যে, "The inability of the Parity theory to allow for shift in international demand for capital movements, for technological changes, or for any other events altering the terms of trade soon made it apparent that the theory was not a *general* explanation of exchange rates, but was applicable only under *special* conditions".

সুতরাং উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, ক্রয়শক্তির সমতা তত্ত্ব কেবল মাত্র বিশেষ অবস্থাতেই সত্য হইতে পারে—যখন কোন মূলধনের বা ঋণের লেনদেন হইতেছে না অথবা উৎপাদনের যন্ত্রকৌশলগত অবস্থায় বা বাণিজ্য-হারে কোনরূপ পরিবর্তন আসিতেছে না। বিনিময়-হারে যে-সকল শক্তি পরিবর্তন আনে টাকার আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তিতে পরিবর্তন তাহার মধ্যে একটি মাত্র। তবুও আমরা এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত গভীর সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারি না। দীর্ঘকালে বিভিন্ন দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তি বিনিময়-হারকে নিশ্চয় কিছুটা প্রভাবিত করে। বিনিময়-হার নির্ধারণের তত্ত্ব হিসাবে আধুনিক কালে ইহাকে আর গ্রহণ করা হয় না বটে, কিন্তু কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সের উপর সেই দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তিরও প্রভাব আছে, এই তত্ত্বের সাহায্যে এই সত্য উদ্ঘাটিত হয়।

এই তত্ত্বের আংশিক সত্যতা

(খ) আধুনিক তত্ত্ব : কি ভাবে বিনিময় হার নির্ধারিত হয় :

আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ বিনিময়-হারকে দাম বলিয়া মনে করেন। ইহা হইল বৈদেশিক অর্থের হিসাবে প্রকাশিত নিজ দেশের অর্থের দাম। সকল দ্রব্যসামগ্রীর দাম যেরূপ উহার যোগান ও চাহিদার দ্বারা ভারসাম্যের বিন্দুতে নিরূপিত হয়, সেইরূপ অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার থাকিলে অর্থের বহির্মূল্যও বৈদেশিক বাজারে উহার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

বৈদেশিক বাজারে অর্থের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা

বৈদেশিক বাজারে অর্থের চাহিদা ও যোগান কোথা হইতে উদ্ভূত হয়

বৈদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের চাহিদা নির্ভর করে রপ্তানির মূল্যের উপর এবং বিদেশীরা বিভিন্ন কারণে কি-পরিমাণ অর্থ সেই দেশে পাঠাইতে চাহে তাহার উপর (অর্থাৎ লেনদেন-ব্যালান্সের পাওনার দিকের উপর)। বৈদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের যোগান নির্ভর করে আমদানির মূল্যের উপর এবং দেশ হইতে কি-পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতে চাহে তাহার উপর (অর্থাৎ লেনদেন-ব্যালান্সের দেনার দিকের উপর)।

চাহিদা বা যোগানে পরিবর্তন বিনিময়হারকে পরিবর্তিত করে

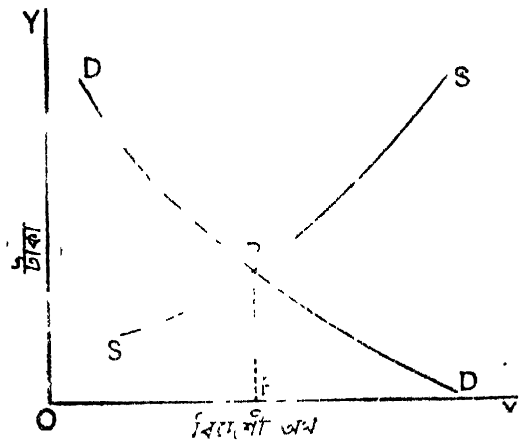
বৈদেশিক বাজারে অর্থের চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ যদি লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল হয় তাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা অধিক পরিমাণে দেশীয় অর্থ কিনিতে চাহিবে, বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের বিক্রেতাগণ অর্থের দাম বাড়াইয়া দিবে, অধিক বৈদেশিক অর্থ দিয়া দেশীয় অর্থ ক্রয় করিতে হইবে, অর্থাৎ বৈদেশিক বাজারে বিনিময় হার দেশের অনুকূলে আসিবে। অপর পক্ষে, বৈদেশিক বাজারে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে, অর্থাৎ যদি লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা অধিক পরিমাণে দেশীয় অর্থের চাহিদা করিবে না, বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের বিক্রেতাগণ অর্থের দাম কমাইয়া দিবে, কম বৈদেশিক অর্থ দিয়া দেশীয় অর্থ ক্রয় করিবে, বৈদেশিক বিনিময়-হারও দেশের প্রতিকূলে যাইবে।

লেনদেন ব্যালান্স গঠনকারী বিষয়-সমূহই বিনিময়-হার নির্ধারণ করে

সুতরাং লেনদেন-ব্যালান্সের উঠানামার উপরই বিনিময়ের হারের উঠানামা নির্ভর করে, লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য থাকিলে বিনিময়-হারও ভারসাম্যে থাকে। অর্থাৎ লেনদেন ব্যালান্সের উপরই বিনিময়হার নির্ভর করে। লেনদেন-ব্যালান্স গঠনকারী বিষয়সমূহ বিনিময়-হার নির্ধারণ করে। লেনদেন ব্যালান্স গঠিত হয়, (ক) আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ এবং (খ) মূলধনের গমনাগমন বা বিদেশে ঋণদানের পরিমাণের (Foreign lending) দ্বারা।

এই তত্ত্বটিকে আমরা একটি রেখা-চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। বিদেশী অর্থের চাহিদা-রেখা (DD) ডাহিনে নিচের দিকে নামিতেছে। ইহার কারণ হইল, যখন টাকার হিসাবে বিদেশী অর্থের দাম কমে তখন উহার

চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বিদেশী অর্থের দাম কমিলে বিদেশী দ্রব্য আমাদের দেশে সস্তা হয়, উহাদের চাহিদা বা আমদানি বাড়ে, তাই বিদেশী অর্থের চাহিদা



বাড়ে। অপরপক্ষে, বিদেশী অর্থের যোগান-রেখা (SS) উপর দিকে উঠার পথে ডান দিকে হেলিয়া থাকে। ইহার কারণ হইল বিদেশী অর্থের দাম বাড়িলে উহার যোগান বৃদ্ধি পায়। বিদেশী অর্থের দাম বাড়িলে দেশীয় দ্রব্য বিদেশের বাজারে সস্তা হয়, ফলে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বাড়ে, বিদেশী অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়। DD ও SS রেখা R বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। এই বিন্দুতে বিনিময়-হার নির্ধারণ হইতেছে RF : OF, অর্থাৎ RF টাকার বিনিময়ে OF বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইতেছে। এই বিনিময়-হার বজায় থাকিলে বিদেশের বাজারে টাকার যোগান ও চাহিদা, অথবা দেশের মধ্যে বিদেশী অর্থের যোগান ও চাহিদা সমান হয়।

আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ বা DD ও SS রেখার আকৃতি নির্ভর করে চারিটি বিষয়ের স্থিতিস্থাপকতার উপর: (ক) দেশীয় রপ্তানির জন্য বৈদেশিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, (খ) নিজ দেশে রপ্তানির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, (গ) বিদেশী আমদানির জন্য আমাদের দেশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, এবং (ঘ) বিদেশী আমদানি দ্রব্যগুলির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা। এই সকল প্রভাবকে একত্রে বলা হয় "বাণিজ্যাবস্থা" (Trade Conditions)। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত

ভাবে চলিতে থাকিলে দেশীয় টাকার ও বিদেশী অর্থের যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে, প্রতি মুহূর্তে বিনিময়-হারে এই ভারসাম্য স্থাপিত হইতেছে। আবার দেশীয় ও বিদেশী অর্থের যোগান ও চাহিদায় পরিবর্তন আসিলে এই ভারসাম্যের বিনিময়-হারও পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। মিসেস্ রবিন্সনের ভাষায় বলিতে গেলে "Any change in the conditions of demand or of supply reflects itself in a change in the exchange-rate and at the ruling rate the balance of payments balances from day to day or from moment to moment"

আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ কিসের উপর নির্ভর করে

বিদেশী অর্থ বা দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদা কেবলমাত্র দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি হইতেই দেখা দেয় না, বৈদেশিক ঋণদানের পরিমাণের উপরও ইহা নির্ভর করে। আবার বৈদেশিক ঋণদান (Foreign lending) তিন প্রকার প্রভাবের দ্বারা নির্ধারিত হয়: (ক) শেয়ার বাজারের প্রভাবসমূহ (Stock Exchange Influences): আন্তর্জাতিক ঋণদান, সুদ প্রদান, ঋণপরিশোধ, দেশীয় লোক কর্তৃক বৈদেশিক শেয়ারের ক্রয়বিক্রয় বা বিদেশী কর্তৃক দেশীয় শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি। (খ) ব্যাঙ্কিং প্রভাবসমূহ (Banking Influences): বিনিময়-বিল, ব্যাঙ্কের ড্রাফ্‌ট্ ক্রয়-বিক্রয়, ভ্রমণকারীদের অর্থ প্রেরণ বা আনয়ন প্রভৃতি। (গ) কারেন্সী অবস্থা (Currency Conditions): দেশের মুদ্রাব্যবস্থার উপর বিশ্বাস ও আস্থা থাকিলে বিদেশ হইতে দেশে অর্থ আসে, মূলধনের আগমন (Inflow) ঘটে। অপর পক্ষে, মুদ্রাব্যবস্থার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিলে দেশ হইতে অর্থ বাহির হইয়া যায়, মূলধনের বহির্গমন (out flow) ঘটে।

বৈদেশিক ঋণদান কিসের উপর নির্ভর করে

লেনদেন ব্যালান্স গঠনকারী এই সকল বিষয়সমূহের দ্বারা বৈদেশিক বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় এবং উহাদের পরিবর্তনের ফলে লেনদেন ব্যালান্সে পরিবর্তন ঘটে, বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদার পরিবর্তন আসে, বিনিময়-হারে উঠানামা (fluctuations) ঘটিয়া থাকে।

বিনিময়-হারে উঠানামা

ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার (Equilibrium Rate of Foreign Exchange) :

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় মুদ্রণজনিত বিনিময়ের সমহার (Mint Par of Exchange) অনুযায়ী প্রত্যেক দেশের বিনিময়-হার স্থির হয়; এবং স্বর্ণ-প্রেরণের ব্যয় পর্যন্ত এই হারের উপরে ও নীচে বিনিময়-হার উঠানামা করিতে পারে। সুতরাং, স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে মুদ্রণজনিত বিনিময়ের সমহারই উভয় দেশের মধ্যে ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার।

স্বর্ণমান ব্যবস্থার

কাগজী মান প্রচলিত থাকিলে, ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব গ্রহণ করিলে, উভয় দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতই ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে বিনিময়-হার স্থির থাকে না, আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন বিনিময়-হারকে নির্ধারণ করে না, লেনদেন ব্যালান্সের দেনা ও পাওনার উপর, অর্থাৎ বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদার দ্বারা বিনিময়-হার স্থির হয়।

কাগজী মান ব্যবস্থায় ক্রয়ক্ষমতার তত্ত্বানুযায়ী

আধুনিক লেনদেন ব্যালান্সের তত্ত্ব (Balance of Payments theory) অনুযায়ী, কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিনিময়-হার এইরূপ হইবে যাহাতে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদা সমান থাকে। অর্থাৎ বিনিময়-হার স্থির থাকে যদি এই যোগান ও এই চাহিদা সমান থাকে। বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদা নির্ভর করে বাণিজ্য-ব্যালান্স (Balance of Trade) ও 'ঋণদান-ব্যালান্সে'র উপর (Balance of Lending)। বাণিজ্য-ব্যালান্স নির্ভর করে যোগান বা চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণকারী চারি প্রকার স্থিতিস্থাপকতার উপর এবং ঋণদান-ব্যালান্স নির্ভর করে শেয়ার বাজারের প্রভাবসমূহ, ব্যাঙ্কের প্রভাবসমূহ ও কারেন্সীর অবস্থার উপর। যে বিনিময়-হার বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদাকে এমন ভাবে সমান রাখে যাহাতে লেনদেন ব্যালান্সে স্থায়িত্ব থাকে, ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতি-সাধনকারী প্রভাবসমূহের ক্রিয়া শুরু না হয়, সেই হারকেই ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার (Equilibrium Rate of Exchange) বলা চলে।

লেনদেন ব্যালান্স তত্ত্ব বা আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী

বাস্তবক্ষেত্রে, নীতিনির্ধারণ ও প্রয়োগের ব্যাপারে, এই তত্ত্বগত ধারণা বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারে না। ইহার কারণ হইল যে, প্রচলিত বিনিময়-হারের দরুন লেনদেন ব্যালান্স গঠনকারী বিষয়সমূহে (যেমন বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতাগুলিতে) স্থায়িত্ব আছে কি না, অথবা কতখানি অস্থায়িত্ব (Instabilty) সৃষ্টি হইতেছে তাহা সঠিকভাবে পরিমাপ-যোগ্য নহে। তবুও মিশরের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালক রাগ্‌নার নার্কসে (Ragnar Nurkse) বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের ও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে,

নার্কসের সংজ্ঞা

ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার হইল "সেই হার যাহা কিছুদিন ধরিয়া লেনদেন-ব্যালান্সকে ভারসাম্যাবস্থায় রাখে" ("that rate which, over a certain period of time, keeps the balance of payments in equilibrium")।

'কিছুদিন ধরিয়া' বলিলে বুঝা যায় যে খুব অল্প সময় হিসাব করিলে চলিবে না, কারণ লেনদেন ব্যালান্সে সাময়িক উঠানামা ও বিচ্যুতি ঘটিবেই বা বাণিজ্যচক্রজনিত উঠানামাও স্বাভাবিক। এই সব স্বল্পকালীন উঠানামা বা ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঠেকাইবার জন্য প্রত্যেক দেশই প্রায় কোন বন্দোবস্ত রাখে, সাধারণত বৈদেশিক অর্থ মজুত করিয়া কোন কেন্দ্রীয় তহবিল—স্বর্ণ, বৈদেশিক মুদ্রা ও বিভিন্ন দেশ হইতে ঋণ পাইবার সুযোগ, সুবিধা ও ব্যবস্থা প্রভৃতি লইয়া এই কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হয়। লেনদেন ব্যালান্স স্থির থাকিলে বৈদেশিক অর্থের এই কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ থাকে, এই ভাণ্ডারে বৈদেশিক অর্থের পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং বলা চলে "যে হার বজায় থাকিলে কিছুদিনের মধ্যে দেশের বৈদেশিক অর্থভাণ্ডারে মজুতের পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটে না, তাহাই ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার।"

সংজ্ঞার ব্যাখ্যা

'লেনদেন ব্যালান্স' বলিলে এক্ষেত্রে দেনাপাওনার সকল বিষয় ধরিলে চলিবে না, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বাদ দিয়া হিসাব করিতে হইবে। (ক) ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে ব্যয়িত বৈদেশিক অর্থ। (খ) মূলধনের স্বল্পকালীন আদানপ্রদান। এই স্বল্পকালীন মূলধন দুই প্রকৃতির: (১) ভারসাম্য আনয়নকারী ধরনের, যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কহার বাড়াইলে স্বল্পকালীন মূলধনের দেশে আগমন—যে-কোন মুহূর্তে

বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে বলিয়া ইহাদের প্রকৃতপক্ষে দেনার দিকেই ধরা উচিত। (২) ভারসাম্য বিচ্যুতিকারী ধরনের, যেমন মূলধনের বহির্গমন, "উত্তপ্ত অর্থের" আনাগোনা প্রভৃতি—ওই সকল অস্বাভাবিক বিষয়কে নিয়ন্ত্রণে আনাই উচিত।

'ভারসাম্যাবস্থায়' বলিলে এক্ষেত্রে বোঝা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাধানিষেধ আরোপ না করিয়া দেনা ও পাওনার পরিমাণ সমান থাকা। আমদানি কমাইয়া বা দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া দেনা-পাওনাকে সমান করা হইলে তাহাকে ভারসাম্য বলা চলে না।

মিসেস রবিনসনের অভিমত

মিসেস্ জোয়ান রবিনসন্ বলেন যে, কোন দেশের পক্ষে চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট কোন ভারসাম্যের বিনিময়-হার নাই। দেশীয় টাকার বা বিদেশী টাকার যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে সদা সর্বদাই লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য থাকে; এই যোগান ও চাহিদায় কোনরূপ পরিবর্তন নিজেকে প্রকাশ করে বিনিময়-হারে পরিবর্তন আনিয়া। নির্দিষ্ট অবস্থা-কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন সুদের হারে ও কার্যকরী চাহিদার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভারসাম্যের বিনিময়-হার দেখা দেয়। এমন কি কোন বিনিময়-হার লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যের অবস্থা সাময়িকভাবে বজায় না রাখিলে সুদের হারে উপযুক্ত পরিবর্তন আনিয়া দেশের বিনিয়োগ ও আয়স্তর বদলাইয়া ফেলিয়া সেই বিনিময়-হারকেই ভারসাম্যের হারে পরিণত করা চলে। সুতরাং, তাঁহার মতে "The notion of the equilibrium exchange rate is a chimera. The rate of exchange, the rate of interest, the level of effective demand and the level of money wages react upon each other like the balls in Marshall's bowl, and no one is determined unless all the rest are given."*

অগ্র-বিনিময় (Forward Exchange)

যখন কোন দেশের বিনিময়-হার সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট থাকে না (স্বর্ণমান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে), তখন ব্যবসায় বাণিজ্যে ঝুঁকি আসিয়া পড়ে, কারণ বিনিময়-হারে অনিশ্চিত উঠানামার ফলে ব্যবসায়ীদের অপ্রত্যাশিত লাভ বা লোকসান

* Mrs. Joan Robinson. "The Foreign Exchanges," *Readings in the Theory of International Trade.*

ঘটিতে পারে। বিনিময়-হারে উত্থান-পতনজনিত লোকসানের ঝুঁকি এড়াইবার জন্য অনেক ব্যবসায়ী কিছুদিন পূর্বেই ভবিষ্যতে বৈদেশিক অর্থ ক্রয়ের জন্য চুক্তি করিয়া রাখিতে পারেন। যেমন ভারতবর্ষের মিঃ সেন ইংলণ্ডের মিঃ টমের নিকট হইতে 1000 পাউণ্ডের জিনিস ক্রয় করিয়াছেন, তিন মাস পরে এই দাম দিতে হইবে স্থির হইয়াছে। মিঃ সেন যদি মনে করেন, তিন মাস পরে বিনিময়-হার ভারতের প্রতিকূলে যাইবে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে পাউণ্ড ক্রয় করিতে হইলে বর্তমানের তুলনায় বেশি টাকা দিতে হইবে, তাহা হইলে তিনি লোকসানের ঝুঁকি এড়াইবার জন্য বর্তমানেই হার নির্দিষ্ট করিয়া তিনমাস পরে পাউণ্ড ক্রয়ের জন্য ব্যাঙ্কের সহিত চুক্তি করিয়া রাখিতে পারেন।

বিনিময় হারে উঠা-নামার ঝুঁকি কমাইবার উদ্দেশ্যে

সুতরাং দেখা যায়, বৈদেশিক টাকার বাজারে কোন নির্দিষ্ট সময়ে দুই প্রকার বিনিময়-হার থাকে, বর্তমান লেনদেনের জন্য তৎকালীন হার (Spot-rate) এবং ভবিষ্যৎ লেনদেনের জন্য অগ্রহার (Forward rate)। চুক্তির সময়ে এই তৎকালীন হারের হিসাবে অগ্রহার উল্লিখিত (quoted) হয়। অগ্রহার বাট্টাযুক্ত হইলে বোঝা যায় দেশীয় টাকার বদলে ভবিষ্যতে অধিক বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইবে; অগ্রহার প্রিমিয়ামযুক্ত হইলে বোঝা যায় যে, দেশীয় টাকার বদলে ভবিষ্যতে কম বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইবে।

অগ্রহার কাহাকে বলে

তৎকালীন হার ও অগ্রহারে কি-পরিমাণ পার্থক্য থাকিবে তাহা প্রধানত, দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) দুই দেশে প্রচলিত সুদের হার এবং (২) ভবিষ্যৎ বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে বর্তমানের ধারণা। যদি দেশের তুলনায় বিদেশে সুদের হার অধিক থাকে তাহা হইলে অগ্রহার বাট্টাযুক্ত হইবে। অর্থাৎ, বর্তমানের তুলনায় দেশীয় টাকার বিনিময়ে অধিক বৈদেশিক অর্থ দিতে ব্যাঙ্ক রাজি হইবে। ভবিষ্যতে যে-পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ বিক্রয়ের জন্য সে চুক্তি করিয়াছে ব্যাঙ্ক নিজে ঝুঁকি এড়াইবার জন্য এখনই তাহা বিদেশে প্রেরণ করিবে; বিদেশে সুদের হার বেশি থাকায় ওই প্রেরিত অর্থ হইতে তাহার যে অধিক আয় হইবে উহারই দরুন সে বাট্টা দিতে পারিবে। অপর পক্ষে, যদি সুদের হার দেশে অধিক থাকে তাহা হইলে ব্যাঙ্ক এখনই বিদেশে অর্থ

দুইটি বিষয়ের উপর ইহা নির্ভর করে

করিবে না, তাহাতে সুদ হইতে আয় কম হইবে। সুতরাং সে বর্তমানে প্রিমিয়াম সহকারে বৈদেশিক অর্থ বিক্রয় করিবে অর্থাৎ দেশীয় টাকার বিনিময়ে কম পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ দিতে চাহিবে। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে বৈদেশিক অর্থের মূল্যে উঠানামার সম্ভাবনা, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা প্রভৃতির দ্বারাও অগ্রহার নির্ধারিত হইবে।

বহির্মূল্যপাতন (Devaluation):

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় দেশের লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্যে বিচ্যুতি ঘটিলে দেশের আভ্যন্তরীণ টাকার পরিমাণ সংকুচিত করিয়া দামস্তর, কর্মসংস্থান ও আয়ের পরিমাণ কমাইয়া রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাসের চেষ্টা করা হইত। কাগজী মান ব্যবস্থায় সেরূপ করা সম্ভব হইলেও আধুনিক কালে জাতীয় অর্থনীতির স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির জন্য দেশের উৎপাদন, আয়স্তর, ও কর্মসংস্থান কমাইবার নীতি কোন আর্থিক কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে চাহেন না। বিভিন্ন উপায়ে যদি আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে আর্থিক কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার মূল্য কমাইয়া দেন।

লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যবিহীনতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে

বৈদেশিক মুদ্রার বা স্বর্ণের তুলনায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-মূল্য কমাইয়া দেওয়া হইলে তাহাকে বহির্মূল্যপাতন (Devaluation) বলে। যেমন, 1949 সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন ডলারের (এবং স্বর্ণের) তুলনায় ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য 1 টাকা = 30 সেণ্ট হইতে 1 টাকা = 21 সেণ্টে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

কাহাকে বলে

বহির্মূল্যপাতনের ফল হইল, মূল্যহ্রাসকারী দেশের বাজারে বিদেশী আমদানি দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যাওয়া এবং বিদেশের বাজারে মূল্যহ্রাসকারী দেশের রপ্তানি-দ্রব্যাদির দাম কমিয়া যাওয়া। যেমন 1949 সালের সেপ্টেম্বরের পূর্বে 1 টাকার বদলে আমেরিকা হইতে সেখানকার 30 সেণ্ট দামের জিনিস পাওয়া যাইত, কিন্তু বহির্মূল্য-হ্রাসের ফলে 1 টাকার বদলে পূর্বের তুলনায় কম, মাত্র 21 সেণ্ট দামের দ্রব্য পাওয়া যাইবে ; পূর্বের পরিমাণ বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে বেশি টাকা দিতে হইবে অর্থাৎ আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িবে। অপরপক্ষে,

কেন ভারসাম্য ফিরাইয়া আনে

রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস

বহির্মূল্যপাতনের পূর্বে ভারতবর্ষের 1টাকা দামের দ্রব্য আমেরিকাতে 30 সেণ্ট দামে বিক্রয় হইত, কিন্তু বহির্মূল্য-হ্রাসের পরে মাত্র 21 সেণ্ট দিয়াই আমেরিকার ব্যবসায়ীরা তাহা ক্রয় করিতে পারে। ফলে বিদেশের বাজারে বিদেশীরা তাহাদের অর্থে কম দাম দিয়া ভারতীয় রপ্তানি-দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে। সুতরাং বিদেশী বাজারে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশীয় বাজারে বিদেশ হইতে আমদানি কমিয়া যাইবে। লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যের বিচ্যুতি দূর হইয়া পুনরায় ভারসাম্য স্থাপনের ঝোঁক দেখা দিবে।

বহির্মূল্যপাতনের প্রভাব দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল

বহির্মূল্যপাতনের ফলে রপ্তানি কি পরিমাণ বাড়িবে ও আমদানি কি পরিমাণ কমিবে তাহা নির্ভর করে (১) মূল্যপাতনের পরিমাণ (degree) ও স্থিতিকালের (duration) উপর, এবং (২) আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যাদির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। যদি মূল্যপাতনের পরিমাণ নিতান্ত কম হয় অথবা বহির্মূল্য হ্রাসের স্থিতিকাল খুব কমই হয় তাহা হইলে আমদানি রপ্তানির পরিমাণের উপর ইহা কোন প্রভাব বিস্তার না করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, যদি বিদেশ হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যের জন্য দেশের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তবে আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িলে দেশীয় চাহিদা উপযুক্ত পরিমাণে না কমার দরুণ বৈদেশিক খাতে দেনার পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। ঠিক সেইরূপ যদি দেশের রপ্তানি দ্রব্যাদির জন্য বিদেশের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে রপ্তানি দ্রব্য বিদেশে সস্তা হওয়ার ফলেও চাহিদা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে না, ফলে বৈদেশিক খাতে পাওনা হ্রাস পাইবে।

বহির্মূল্যপাতনের পরিমাণও দুইটি বিষয় অনুযায়ী স্থির করা হয়

অপর পক্ষে, উভয় ক্ষেত্রেই চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে মূল্য-হ্রাসের ফলে অধিক পরিমাণে আমদানি কমিবে ও রপ্তানি বাড়িবে। সুতরাং বহির্মূল্যপাতনের ফলে মোট প্রভাব কি দাঁড়াইবে সেই অনুযায়ী বহির্মূল্যপাতনের পরিমাণ বা হার স্থির করা হয়। ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতির পরিমাণ ও মূল্য হ্রাসের মোট ফলাফলের সম্ভাবনা—ইহাদের বিচার করিয়া বহির্মূল্যপাতনের পরিমাণ স্থির করা হইবে।

রপ্তানি বাণিজ্যে অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিকতর সুবিধা পাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলেও বহির্মূল্যপাতন প্রকৃতপক্ষে বিপজ্জনক কৌশল। প্রথমত,

ইহার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-ব্যয় ও দামস্তর বাড়িয়া যাইতে পারে (মজুরির হার বৃদ্ধির দরুণ এবং আমদানি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির দরুণ)। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য দেশও এই পদ্ধতির প্রয়োগ করিতে পারে, পৃথিবীতে প্রতিযোগিতামূলক বহির্মূল্যপাতন ঘটিতে পারে। অথবা, এইরূপে রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে অন্যান্য দেশ সাধারণত উচ্চহারে আমদানি-শুল্ক বসাইয়া থাকে।

ইহার বিপদও কম নয়

কিন্তু এত বিপদ সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব (Internal economic stability) বজায় রাখিতে হইলে এবং লেনদেন-ব্যালান্সে ভারসাম্যের বিচ্যুতি দূর করিতে হইলে এই নীতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না। তবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বহির্মূল্যপাতন নীতি প্রয়োগ করা উচিত। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (International Monetary Fund) এক ধারায় তাই বলা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র লেনদেন ব্যালান্সে কোন "মৌলিক বা কাঠামোগত ভারসাম্য "বিচ্যুতি" (Fundamental or structural dis-equilibrium) সংশোধন করিবার জন্যই বিনিময়-হারে এইরূপ পরিবর্তন করা চলিবে।*

প্রয়োজনীয়তা

বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (Exchange Control):

রপ্তানির পরিবর্তে দেশের পাওনা এবং আমদানির দরুণ দেশের দেনা—অর্থাৎ বৈদেশিক খাতে দেনা ও পাওনার পরিমাণ, বিনিময়-হার এবং দেনা-পাওনার দিক নির্ণয়, সবই যদি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত হয় তবে তাহাকে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বলে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ ভাগ হইতে আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ও স্বর্ণমান পরিত্যাগের দরুন বৈদেশিক

বিনিময় নিয়ন্ত্রণ কাহাকে বলে

* "One special formula for secular dis-equilibrium can be found into which exchange depreciation fits not too badly. Suppose that in this developed country A, technological progress is taking place faster in all commodities than in country B. which is less developed, and that this is reflected in a progressive reduction of prices in A as compared with B...... The decline in A's prices relative to B's tends to produce an export surplus in A and import surplus in B. If the elasticities of demand and supply are high enough, the way to restore balance of payments equilibrium due to this secular cause may be exchange depreciation in B and appreciation in A."

লেনদেনে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র বৈদেশিক লেনদেনের খাতে সকল দেনা-পাওনাকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য (Objectives of exchange Control) :

বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেমন, (১) বিনিময় হারে স্থায়িত্ব (Stability) রক্ষার জন্য, রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য, কৃত্রিম বিনিময়-হার রক্ষা করিয়া টাকার বহির্মূল্য কমাইবার উদ্দেশ্যে অথবা, সস্তায় আমদানি করিবার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বিনিময়-হার রক্ষা করিয়া টাকার বহির্মূল্য বৃদ্ধির জন্য ; (২) মূলধন, স্বর্ণ বা অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির রপ্তানিতে বাধা দিবার জন্য ; (৩) অত্যাবশ্যক আমদানির যোগান নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ; (৪) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিজ দেশের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য ; (৫) লেনদেন-ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষার জন্য ; (৬) দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শিল্পের হাত হইতে সংরক্ষণের (Protection) উদ্দেশ্য ; (৭) রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে (যেমন চিলি) , (৮) কোন বিশেষ দেশ বা দেশসমূহকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য , (৯) রাজনৈতিক কারণে কোন বিশেষ দেশের বিরুদ্ধে ব্যবসায় বাণিজ্যের মারফত আক্রমণ চালাইবার জন্য ; (১০) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি ; কাঁচামালের রপ্তানি বন্ধ করা, বা প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মূলধন সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (Methods of exchange control) :

বিনিময়হার এবং বৈদেশিক খাতে দেনা-পাওনার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন রাষ্ট্র বহুবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে বিভিন্ন দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বহুপ্রকার নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান তিনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

(১) হস্তক্ষেপ পদ্ধতি (Intervention) : রাষ্ট্র যদি মনে করে যে সাধারণ অবস্থায় চাহিদা ও যোগানের শক্তির দ্বারা বিনিময় হার যেরূপ হইতে পারে তাহা অপেক্ষা ভিন্ন রূপ হওয়া দরকার, তবে সে নিজে সরাসরি বিনিময় হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে টাকার (বহির্মূল্যে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটাইবার জন্য) হস্তক্ষেপ করিতে পারে। ইহার জন্য সে নিজস্ব তহবিল হইতে বৈদেশিক অর্থ বিক্রয় করিতে পারে বা বাজার হইতে

হস্তক্ষেপ পদ্ধতির উপায়

উহা ক্রয় করিয়া লইতেও পারে। হস্তক্ষেপের দ্বারা বিনিময়-হার প্রভাবিত করার ক্ষমতা প্রধানত নির্ভর করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বৈদেশিক টাকা মজুত করিবার ক্ষমতার উপর। তাহা ছাড়া, হস্তক্ষেপের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ-নীতি সাময়িকভাবে চলিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালে স্থায়িভাবে চলিতে পারে না।

(২) **অবরোধ পদ্ধতি (Restriction)**ঃ সাধারণভাবে সকল বৈদেশিক অর্থসংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষমতা রাষ্ট্র বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা কোন কর্তৃপক্ষ নিজেদের হাতে তুলিয়া লয়। এই বিনিময়-নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নিজের লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে বাজারের অবাধ কাজকর্মের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে বা কেন্দ্রীয় ভাবে সকল বৈদেশিক অর্থসংক্রান্ত ব্যবসায় নিজেই পরিচালনা করে। অনেক রকমের নিয়মকানুন সৃষ্টি করিয়া এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করিয়া তুলিতে হয়। যেমন, (ক) বিদেশে টাকা পাঠাইতে হইলে

অবরোধ পদ্ধতির বিভিন্ন উপায়

কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইতে হইবে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন কারণেই মাত্র অর্থ প্রেরণ করা চলিবে, কোন দেশে পাঠাইতে পারা যায় তাহাও বাঁধা স্থির করিয়া দিবে। বিদেশ হইতে টাকা আসিলেও তাহা নির্দিষ্ট হারে আসিতে হইবে, সেই সকল বৈদেশিক টাকা কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে এইরূপ নিয়ম থাকিতে পারে। (খ) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ না করিয়া কোন আমদানি-রপ্তানি করা চলিবে না, এরূপ নিয়ম থাকিতে পারে। প্রত্যেক লাইসেন্সে আমদানি রপ্তানির পরিমাণ এবং কোন্ দেশ বা কোন মুদ্রাঞ্চল (currency area) হইতে আমদানি-রপ্তানি করা চলিবে তাহা নির্দিষ্ট থাকে। (গ) বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ 'জমান পদ্ধতি' বা 'আটক-হিসাব' পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে (freezing or blocking of accounts)। আটক-হিসাব পদ্ধতিতে বিদেশী পাওনাদারদের নামে রক্ষিত হিসাবে তাহাদের সকল পাওনা জমা দিবার জন্য দেশীয় দেনাদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়। বৈদেশিক পাওনাদারগণ এই অর্থকে নিজেদের দেশীয় মুদ্রায় ব্যয় করিতে পারেন না। আটককারী দেশ হইতেই দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে উহা ব্যয় করিতে হয় অর্থাৎ সেই দেশ হইতেই দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা বাধ্যতামূলক। অনেক সময়, (যেমন জার্মানীতে) ঐ আটক অর্থের দ্বারা বিদেশী পাওনাদার দেশ হইতে কি জিনিস এবং কত পরিমাণ ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। অনেক সময় বহু কম হারে, লোকসান দিয়া বিদেশী পাওনাদারকে এই আটক অর্থ বা

উহার বিনিময়ে দ্রব্যাদি পাইবার সুযোগ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডে রক্ষিত দ্বিতীয় অ্যাকাউন্টে ভারতের পাওনা স্টার্লিং অর্থ ইহার প্রকৃষ্ট নমুনা।

(৩) **চুক্তি** (Agreement) ঃ নিয়ন্ত্রণকারী দেশ অন্যান্য দেশের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য বা বৈদেশিক অর্থসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার চুক্তি করিয়া বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এইরূপ চুক্তি সাধারণত তিন প্রকারের হইতে পারে।

বিভিন্ন প্রকার চুক্তি

(ক) **পণ্যবিনিময় চুক্তিসমূহ** (Barter Agreements) ঃ অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃপক্ষ দুই দেশের ব্যবসায়ীগণকে নিজেদের দ্রব্যাদি বিনিময়ের চুক্তি করিবার অধিকার দেন। এইরূপ ক্ষেত্রে, কোন দ্রব্য আমদানি করিয়া তাহার বদলে কোন দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। টাকা লেনদেনের কোন প্রয়োজন ঘটে না। সাধারণভাবে, আধুনিক জগতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত বা অন্য রাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের সহিত এইরূপ চুক্তি দ্বারা আমদানি ও রপ্তানি চালাইয়া থাকেন। (খ) **ক্লিয়ারিং চুক্তিসমূহ** (Clearing Agreements) ঃ উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি দ্বারা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়বিক্রয়ের জন্য বিনিময়-হার স্থির করা হয় এবং উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দেনাপাওনা মিটাইবার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দ্রব্য ক্রয় করিয়া ক্রেতা নিজের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট নিজেদের দেশের টাকাই জমা দেয়, পরে দুই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই দেনাপাওনা মিটাইয়া লন। (গ) **লেনদেন চুক্তিসমূহ** (Payments Agreements) ঃ নির্দিষ্ট সময়ের শেষে দেনাপাওনার কিছু বাকি থাকিলে স্বর্ণের দ্বারা বা অপর কোন তৃতীয় দেশের টাকার দ্বারা উহা মিটানো হইবে এইরূপ চুক্তি করা যাইতে পারে। অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ওই টাকা জমা থাকে, এবং পাওনাদারগণ আগামী বৎসরের বাণিজ্যে দেনদারদের অধিক দ্রব্য ক্রয় করিয়া ওই অবশিষ্ট পাওনা টাকা ব্যয় করিয়া ফেলেন, এইরূপও হইতে পারে। অনেক সময় দুই-এর বেশি কয়েকটি দেশের মধ্যে একত্রে দেনাপাওনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ চুক্তি থাকে (Multiple clearing), যেমন ইউরোপীয় অর্থ নৈতিক সহযোগিতার সংগঠন (Organisation for European Economic co-operation) এবং ইউরোপীয় লেনদেনের সঙ্ঘ (European Payments Union), প্রভৃতি।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দোষগুণ (Merits and Demerits of Exchange Control) :

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের প্রধান সুবিধা বা গুণ হইল, সঠিকভাবে ব্যবহার করিলে এই পদ্ধতির সাহায্যে রপ্তানি বৃদ্ধি করা বা অপ্রয়োজনীয় আমদানি কমানো সম্ভব। দ্বিতীয়ত, বিনিময় হারে তীব্র উঠানামা বন্ধ হয় বলিয়া দেশে বৈদেশিক অর্থ লইয়া ফাটকা ব্যবসায় চালানো সম্ভব হয় না এবং বিনিময় হারে উঠানামার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা না থাকায় ব্যবসায়ীদের দুশ্চিন্তার কারণ থাকে না। তৃতীয়ত, গত সুবৃহৎ অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে দেখা গিয়াছে, ক্ষুদ্র দেশগুলি নিজেদের মধ্যে এইরূপ চুক্তি করিয়া বা শক্তিশালী দেশগুলির সহিত চুক্তি দ্বারা ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতে সক্ষম হইয়াছে, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে বৃহৎ রাষ্ট্রের চাপে তাহারা ব্যবসায় চালাইতে পারিত না। চতুর্থত, অনুন্নত দেশসমূহ দেশের শিল্পসম্প্রসারণ করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে এবং উন্নয়নের যুগে ইহা খুবই কার্যকরী।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের চারি প্রকার সুবিধা

ইহার প্রধান ত্রুটি হইল, ইহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণ কমাইয়া দেয়, সুতরাং সকলের পক্ষেই ক্ষতিকারক। দ্বিতীয়ত, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে পৃথিবীতে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি দ্বারা (Bilateral Trade Agreements) ব্যবসায় চালানো হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পক্ষে ইহা বিশেষ ক্ষতিকারক। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক রেষারেষির ও অন্যকে ভীতি-প্রদর্শনের দ্বারা সুবিধালাভের চেষ্টা—সমগ্র পৃথিবীতে এইরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য যে উন্মুক্ত অবাধ পরিবেশ ও সদিচ্ছার আবহাওয়া থাকা প্রয়োজন তাহা সম্ভব হয় না। চতুর্থত, সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ, দীর্ঘসূত্রতা, অযোগ্যতা, অক্ষমতা প্রভৃতি থাকার দরুন ব্যবসায় বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

চারি প্রকার দোষ বা অসুবিধা

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর সকল দেশ শিল্পোন্নয়নের সমান স্তরে উপনীত হয় নাই এবং বিভিন্ন স্তরে প্রত্যেকটি দেশ বিভিন্ন অর্থনৈতিক লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া দ্রুত শিল্পোন্নয়নের চেষ্টা করিতেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-সমূহের সার্থক রূপায়নের জন্য আমদানি রপ্তানির পরিমাণ, দিক ও দ্রব্যাদি

আধুনিক জগতে ইহার প্রয়োজনীয়তা

নিয়ন্ত্রণ করা খুবই স্বাভাবিক, সুতরাং দোষত্রুটি ও রেষারেষি সত্ত্বেও এই সকল পদ্ধতির ব্যবহার বর্তমান পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা চলে।

বহুধা বিনিময় হার (Multiple Exchange Rates)

সরকারী-হার ও বাজার-হার

লেনদেন ব্যালান্সের স্বল্পকালীন উঠানামার ফলে বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানামা ঘটিয়া থাকে, বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদার পরিবর্তন সর্বদাই বিনিময়-হারে পরিবর্তন আনে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট বিনিময়-হারে রাষ্ট্রের আর্থিক লেনদেন হয়, কিন্তু বাজারের বিনিময়-হার (Market Rate of Exchange) সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল, একেবারে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নহে।

সময়ের পার্থক্যে বাজার হারে পার্থক্য

সেইরূপ বিভিন্ন সময়ের মধ্যে বিচার করিলে দেখা যায় যে, বিনিময়-হারে তারতম্য আছে। যেমন, বাজারে ভারতের টাকার বদলে ব্রিটিশ পাউণ্ড কি পরিমাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহার অনেক বিনিময়-হার রহিয়াছে। বর্তমানেই ক্রয় করিলে যে দামে পাউণ্ড পাওয়া যায়, 30 দিন, 60 দিন বা 90 দিন পরে ক্রয়ের জন্য চুক্তি করিলে পাউণ্ডের জন্য অন্য দাম দিতে হইতে পারে। সুতরাং বর্তমানেই বিভিন্ন প্রকার সময় অনুযায়ী অগ্রবিনিময়ের (Forward Exchange) দরুন বহুসংখ্যক বিনিময়-হার দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সরকারী-ভাবেই বিভিন্ন বিনিময়-হার ধার্য থাকিতে পারে। উহাকে বহুধা বিনিময় হার বলে

কিন্তু অনেক সময়ে, রাষ্ট্রের নির্দেশেই দুই দেশের টাকার মধ্যে বিভিন্নপ্রকার বিনিময়ের হার রক্ষা করা হয়, একই সময়ে দুই দেশের টাকার মধ্যে বহুসংখ্যক বিনিময়-হার চালু রাখা হইলে তাহাকে বহুধা বিনিময়-হার (Multiple Exchange Rates) বলে। সরকার এইরূপ নির্দেশ দেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য বিনিময়-হার পৃথক হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে কৃত্রিম ভাবে (বাজারের যোগান ও চাহিদার প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া) বিভিন্ন প্রকার বিনিময় হারের কার্যকরী করিয়া তোলেন। যেমন বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে, বা রপ্তানি করিতে হইলে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বৈদেশিক অর্থ ক্রয় করিতে হইলে দেশীয় টাকার হিসাবে বিভিন্ন দাম নির্দিষ্ট থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন বিনিময়-হার থাকে। 1930 সালের পর হইতে প্রথমে লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ ও পরে জার্মানী

এইরূপ বহুধা বিনিময়-হার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে এবং বিশেষ নিন্দার্হ হইলেও বর্তমানে অনেক দেশ বহুধা বিনিময়-হার বজায় রাখিয়াছে। যেমন, হিটলারের আমলে জার্মানীর টাকা মার্ক ক্রয় করিতে হইলে উদ্দেশ্য অনুযায়ী উহার দাম নির্দিষ্ট হইত। ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মার্ক কিনিলে এক দাম, কোন দ্রব্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে অন্য দাম, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ দাম, এইরূপে বিভিন্ন হারে বিদেশীদের নিকট মার্ক বিক্রয় করা হইত। এই সকল হারের সহিত জার্মান অধিবাসীগণ মার্কের বিনিময়ে অন্য দেশের অর্থ যে হারে ক্রয় করিতেন তাহারও কোনরূপ সমতা ছিল না। যেমন, বর্তমানে লাতিন আমেরিকার দেশসমূহের মধ্যে চিলি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ডলার ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন দাম (চিলির টাকা পেসোর হিসাবে) স্থির করিয়া রাখিয়াছে। মূলধনী দ্রব্য আমদানির উদ্দেশ্যে সাধারণত কম পরিমাণ দেশীয় টাকা দিয়াই বৈদেশিক অর্থ ক্রয় করা যায়, কিন্তু বিলাস দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে অধিক পরিমাণে দেশীয় টাকা দিয়া বৈদেশিক অর্থ পাইতে হয়, সরকারী অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য আবার ভিন্নরূপ বিনিময়-হার নির্দিষ্ট আছে।

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হয়

এইরূপ বহুধা বিনিময় হার থাকিলে বেআইনী মুনাফার সম্ভাবনা খুবই বাড়িয়া যায়, কারণ কম দামে বৈদেশিক টাকা ক্রয় করিয়া বেশি দামে বিক্রয়ের সুযোগ ও সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। সুতরাং, বহুধা বিনিময় হার প্রথা কার্যকরী করিতে হইলে শক্তিশালী ও দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে হয়, বস্তুত আন্তর্জাতিক লেনদেনের সকল দিকই নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন হয়। বহির্মূল্যাপচয়ন (Devaluation) বা বহির্মূল্যবর্ধনের (Appreciation) তুলনায় এইরূপ বহুধা বিনিময়-হার প্রথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-বৃদ্ধির পক্ষে এবং অবাধ দ্রব্যচলাচলের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিজনক। এই কারণে আন্তর্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডার বহুধা বিনিময়-হার প্রথা নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

এই পদ্ধতির ত্রুটি

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ (**Free Trade and Protection**)

ইংলণ্ডের ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণ অবাধবাণিজ্যনীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিপুল সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিক (Liberalism) মনোভাব এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ-বাণিজ্যের সমর্থন ইংলণ্ডে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর কোনরূপ বাধা নিষেধ আরোপ না করার নীতিকে অবাধ বাণিজ্য নীতি বলা হয়। এই নীতির স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহার ফলে সকল দেশ আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের সুফল ভোগ করিবার সুযোগ পায়। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ফলে প্রত্যেক দেশ সর্বাধিক সুবিধার সহিত যে দ্রব্য উৎপাদন করিতে সর্বাপেক্ষা উপযোগী, সেই সকল দ্রব্য উৎপাদনেই সকল উপকরণ নিয়োগ করিবে। ফলে সকল দেশেরই উপাদানসমূহের নৈপুণ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, সমগ্র পৃথিবীতে দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাড়িয়া যায়, দ্রব্যসামগ্রীর ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয়ও কমিয়া যায়। উপাদানসমূহের আয় বাড়িয়া যায়, কারণ সর্বাধিক সুবিধার সহিত উৎপাদন করিলে তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ক্রেতা হিসাবে সকলেই উন্নত ধরনের দ্রব্য কম দামে পাইতে পারে। অবাধ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করিয়া আমদানি শুল্ক আরোপণের ফলে দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পায়, উৎপাদকের স্বার্থে ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তিসমূহ : দক্ষতা বৃদ্ধি উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যয়হ্রাস, আয় বৃদ্ধি, ভোগ বৃদ্ধি

সংরক্ষণের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, অবাধ বাণিজ্য আপনাআপনি উপাদানসমূহকে প্রত্যেক দেশে সর্বাধিক সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগ করে তাহা দেখা যায় না। যেহেতু কোন দেশ অন্য দেশের তুলনায় কিছুকাল পূর্বে শিল্পসম্প্রসারণ শুরু করিয়াছিল, সেই জন্য তাহার অনেক পূর্বলব্ধ সুবিধা থাকিতে পারে। পূর্বে শুরু করার এই সকল সুবিধার ফলে তাহার তুলনায় অন্য দেশগুলির উৎপাদন-ব্যয় বেশি থাকায় তাহারা প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়।

সুতরাং, সংরক্ষণের সাহায্যে উভয়ের সুবিধা প্রথমে সমান করিয়া লইয়া তাহার পরেই অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে পারে। অসমান শক্তিধারীদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতায় দুর্বলের পরাজয় নিশ্চিত, উহা সবলের একাধিপত্য বজায় রাখিবার এবং দুর্বলকে শক্তিশালী না হইতে দিবার ছল মাত্র। সংরক্ষণের সাহায্যে বর্তমানে দেশের সম্পদবৃদ্ধির ক্ষমতা বাড়াইয়া তোলাই বর্তমানে সম্পদপ্রাপ্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক কারণে অবাধ বাণিজ্য উন্নততর নীতি হইলেও অপরাপর বহু কারণে, যেমন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে, সংরক্ষণনীতি অধিকতর গ্রহণ-যোগ্য হইতে পারে। যেমন, অস্ত্রোৎপাদন বা আত্মরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয়

শিল্প স্থাপন করা, উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইলেও অবশ্য-প্রয়োজনীয়। ইহাও মনে রাখা দরকার যে দেশের স্বাস্থ্য বা চরিত্রহানিকর দ্রব্যের আমদানি অবশ্যই জাতীয় স্বার্থে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। অপর দেশ ডাম্পিং করিয়া দেশীয় শিল্পকে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে, তাহাও ঠিক নয়; সেই ডাম্পিং রোধ করার প্রচেষ্টা সর্বদাই করা দরকার। অথবা, অপর দেশের শিল্পগুলি সরকারী সাহায্যপুষ্ট হইয়া রপ্তানি বাড়াইয়া আমাদের দেশের শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে—তাহাও চলিতে দেওয়া জাতীয়স্বার্থের অনুকূল নহে। তাহা ছাড়া আধুনিক জগতে দেশীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নতি, জীবনযাত্রার মান বাড়ানো প্রভৃতি উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশ নিজস্ব নীতি স্থির করিতেছে, এরূপ অবস্থায়, বিশেষত, অনুন্নত দেশসমূহ দেশের বাহিরের শক্তিগুলির হাত হইতে স্বাভাবিকভাবে নিজেদের রক্ষার প্রচেষ্টা করিবে। বাণিজ্য চক্রের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণনীতি প্রয়োগ করা খুবই দরকার। চরম সংকটের কালে আমদানি শুল্ক দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, অপর কোন দেশের বাণিজ্য-সংকট যাহাতে আমাদের দেশে প্রসারিত হইতে না পারে, তাহার উদ্দেশ্যেও সংরক্ষণ নীতিকে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি সমূহ: দুর্বলের শক্তিশালীদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, অন্যায্য ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণ বা বাণিজ্যচক্র রোধের উপায় প্রভৃতি

সুতরাং, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে সাধারণভাবে অবাধ বাণিজ্যের নীতি সুফলদায়ী হইলেও, কোন বিশেষ দেশের নিজ-স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাকে কখনই গ্রহণযোগ্য মনে করা চলে না, এবং বলা চলে যে সংরক্ষণনীতি সাধারণ ভাবে জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিসমূহ (Arguments in favour of Protection):

১। দেশের টাকা দেশে রাখা (Keeping money at home):

অনেকে বলিতে চাহেন যে, বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিলে লোকে দ্রব্য পাইলেও টাকা পায় বিদেশীরা, কিন্তু দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিলে দেশের লোক দ্রব্যও পায় আবার টাকাও পায়। ইহার সমর্থকদের বক্তব্য হইল, যাহাতে দেশের টাকা বাহিরে যাইতে না পারে সেইজন্য বিদেশী দ্রব্য ক্রয় না করাই উচিত।

যুক্তি

কিন্তু এই যুক্তি একেবারেই ভুল, কারণ আমদানি না করিলে রপ্তানি বন্ধ হইয়া যাইবে, বিদেশীদের দ্রব্য ক্রয় না করিলে বিদেশীরাই বা কি করিয়া আমাদের দেশের রপ্তানি ক্রয় করিবে? দ্রব্য ক্রয় না করিয়া জাতীয় আয় বাড়ানো যায় না, কারণ তাহা হইলে রপ্তানি হইতে আয়ও কমিয়া যায়। আর, সকল দেশই এইরূপ নীতি গ্রহণ করিলে অবশেষে কাহারও উপকার হয় না; সকলেরই বৈদেশিক ব্যবসায় ও বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়; বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি কেহই লাভ করিতে পারে না।

বিরুদ্ধে যুক্তি

২। দেশের বাজার সৃষ্টি করা (Home Market Argument):

সংরক্ষণের ফলে বিদেশী দ্রব্য দেশে না আসিলে দেশীয় শিল্প স্থাপিত হইবে, দেশে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, ফলে দেশীয় দ্রব্যাদির আভ্যন্তরীণ বাজার বিস্তৃত হইবে, দেশের সকল শিল্পেরই লাভ হইবে—ইহাই এই যুক্তির রূপ।

যুক্তি

কিন্তু এই যুক্তির সমর্থকগণ ভুলিয়া যান যে, সংরক্ষণের দ্বারা আমদানি কমাইলে উহার ফলে রপ্তানিও কমিয়া যায়। সুতরাং আমদানি বন্ধ করিয়া সেই দ্রব্য দেশে উৎপাদন শুরু করিলে আয় ও ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি হইয়া দেশীয় বাজার বিস্তৃত করে বটে, কিন্তু, রপ্তানি হ্রাস পাইবার দরুন রপ্তানি-শিল্পে বেকারির ফলে আয় ও ক্রয় ক্ষমতা সংকুচিত হইয়া দেশীয় বাজারকে অপর দিক হইতে সংকুচিত করিয়া ফেলে।

বিরুদ্ধ যুক্তি

কিন্তু যদি আমদানি-হ্রাসের ফলে দেশে যে পরিমাণ নূতন আয় সৃষ্টি হইল, তাহা রপ্তানি কমিবার ফলে আয় হ্রাসের পরিমাণ হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে দেশের মোট আয়ে নীট বৃদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং উভয় দেশের আমদানি ও রপ্তানির পারস্পরিক চাহিদার শক্তির উপর এই যুক্তির সত্যতা নির্ভর করে; বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ অবস্থায় এই যুক্তি সত্য হইতে পারে।

সত্যতা

৩। বাণিজ্য ব্যালান্স অনুকূল রাখা (Balance of Trade Argument):

প্রাচীন মার্কেন্টাইলিস্ট ধনবিজ্ঞানিগণ বলিতেন যে, বিদেশ হইতে স্বর্ণ

আনিতে পারিলেই দেশ সম্পদশালী হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যে সর্বদা রপ্তানি-আধিক্যের (export-surplus) নীতি গ্রহণ করা উচিত। রপ্তানি আধিক্যের দ্বারা সর্বদা বাণিজ্য-ব্যালান্স অনুকূল রাখিতে পারিলেই দেশের মধ্যে স্বর্ণ আসিতে পারে।

যুক্তি

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণ এই মার্কেন্টাইলিস্ট ধারণা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, স্বর্ণই একমাত্র সম্পদ নহে। আর অনুকূল বাণিজ্য-ব্যালান্সের দরুন দেশে ক্রমাগত স্বর্ণের আগমন আভ্যন্তরীণ অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া দামস্তর বাড়াইয়া দিবে এবং ফলে ভবিষ্যতে রপ্তানি কমিয়া স্বর্ণ পুনরায় বাহির হইয়া যাইবে (স্বর্ণের গতিবিধি সংক্রান্ত রিকার্ডীয় তত্ত্ব)। আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণও মনে করেন যে, অনুকূল বাণিজ্য-ব্যালান্সের ফলে দেশের আয়স্তর বর্ধিত হইবে, সুতরাং প্রান্তিক আমদানি প্রবণতার বৃদ্ধির দরুণ আমদানির পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, বাণিজ্য-ব্যালান্সের আনুকূল্য হ্রাস পাইবে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাণিজ্য ব্যালান্স অনুকূল রাখার নীতি গ্রহণ করা নাই কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নহে। যদিও কেইনসের মতে রপ্তানি-আধিক্যের ফল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুরূপ—ইহার ফলে আয়স্তর ও কর্মসংস্থান বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও মনে রাখা দরকার যে সকল দেশই একসঙ্গে এই নীতি গ্রহণ করিতে শুরু করিলে অবশেষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপুল বিশৃংখলা সৃষ্টি হইবে। প্রত্যেক দেশই অপর দেশের স্বার্থের বিনিময়ে নিজের স্বার্থবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া প্রতিবেশীকে দরিদ্র-করার-নীতি (Beggar-my-neighbour-policy) গ্রহণ করিলে পৃথিবীতে মোট ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া গিয়া সকলকেই দরিদ্র করিয়া তুলিবে।

বিরুদ্ধ যুক্তি

(৪) উচ্চ মজুরি বজায় রাখা (To maintain high Wages):

অনেক সময় বলা হয়, নিম্ন মজুরির হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানির বিরুদ্ধে শুল্ক না বসাইলে সেই দেশ হইতে সস্তা আমদানি-দ্রব্য দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেশের উচ্চ মজুরির হারকে নামাইয়া দিবে। কারণ, অপর দেশে নিম্ন মজুরি-হারের ফলে তাহাদের উৎপাদন-ব্যয় কম, কিন্তু নিজ দেশে উচ্চ মজুরি-হারের ফলে উৎপাদন-ব্যয় বেশি। সুতরাং আভ্যন্তরীণ উচ্চ মজুরির হার বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিম্ন-মজুরির হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানির বিরুদ্ধে শুল্ক বসানো উচিত।

যুক্তি

এই যুক্তি গ্রহণ করা চলে না, কারণ উচ্চ মজুরির ফলে উৎপাদন-ব্যয় সর্বদাই অধিক হইবে বা নিম্ন মজুরির ফলে উৎপাদন-ব্যয় কম হইবে—ইহা ঠিক নহে। উচ্চ মজুরির হার অধিক উৎপাদন-ক্ষমতার দরুন বা উন্নত সাংগঠনিক নৈপুণ্যের দরুন বা প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের দরুন হইতে পারে। ফলে প্রকৃতপক্ষে সেই দেশে ইউনিট-প্রতি ব্যয় কম, এইরূপ ঘটিতে পারে।

বিকল্প যুক্তি

এইরূপ অবস্থায় সংরক্ষণের নীতি দেশের উচ্চ মজুরিকে রক্ষা না করিয়া কমাইয়া দিতেও পারে। কারণ সংরক্ষণের ফলে সর্বাধিক সুবিধাজনক ক্ষেত্রে নিযুক্ত না হইয়া কম উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পে শ্রমিক নিযুক্ত হইতে শুরু করিবে, সুতরাং জাতীয় সম্পদ এবং মজুরির হার সম্ভবত কমিবে। তাহা ছাড়া, সংরক্ষণী শুল্কের ফলে দ্রব্যের দাম বাড়িবার দরুণ আসল মজুরি কমিয়া যাইবে।

কিন্তু, সাধারণভাবে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যকারী উভয় দেশের উপাদানের দামে সমতা আসে। এরূপ অবস্থায় নিম্ন মজুরিসম্পন্ন দেশের পক্ষে অবাধ বাণিজ্য সুবিধাজনক, এবং উচ্চ মজুরিসম্পন্ন দেশের পক্ষে অসুবিধাজনক। কারণ, উচ্চ মজুরি কিছুটা নামিয়া এবং নিম্ন মজুরি কিছুটা উঠিয়া উপাদানের দামে এই সমতাসাধন ঘটে।

(৫) বেকারি দূর করা (To Cure Unemployment) :

কিরূপে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় ও ক্লাসিক্যাল যুক্তি : কেন বৃদ্ধি পায় না

অনেক সময় বলা হয়, সংরক্ষণের ফলে দেশে বেকারি দূর হইয়া কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিদের মতে সংরক্ষণের দ্বারা আমদানি হ্রাস পাইলে সেই সকল দ্রব্যের শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়িলেও রপ্তানি কমিয়া যাওয়ার ফলে রপ্তানি দ্রব্যের শিল্পে বেকারি বাড়িবে; সুতরাং দেশের মোট কর্মসংস্থানে নীট বৃদ্ধি হইবে না।

আধুনিক যুক্তি কিরূপে আমদানি স্থির রাখিয়া রপ্তানি বাড়ান যায়, ১। অর্থ সাহায্য

তবে, যদি আমদানি শুল্কের দ্বারা আমদানি কমাইয়া দেশে কর্মসংস্থান বাড়ানো হয়, অথচ রপ্তানির পরিমাণ যাহাতে না কমে সেই ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে মোট কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। যদি অপর দেশও প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন করিয়া তাহাদের আমদানির উপর শুল্ক বসায় তাহা হইলে রপ্তানি কমিয়া কর্মসংস্থান কমাইয়া দিবে। রপ্তানি-হ্রাস বন্ধ করার জন্য দেশটি দুই প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথমত, আমদানি

শুল্ক হইতে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা রপ্তানি-শিল্পকে অর্থ সাহায্য (Bounty) করা—যাহাতে বিদেশে কম দামে বিক্রয় করিয়া পূর্বের পরিমাণ রপ্তানি বজায় রাখিতে পারে। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় বিদেশও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

দ্বিতীয়ত, যদি সংরক্ষণকারী দেশ রপ্তানি-আধিক্যের দরুন পাওনা বিদেশী টাকা দেশে আনিতে না চাহে এবং বিদেশেই ঋণ বা বিনিয়োগ অথবা সাহায্য হিসাবে খাটায়, তাহা হইলে এই রপ্তানি-আধিক্য বজায় রাখা সম্ভবপর হইবে। যেমন, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আমেরিকা সর্বাধিক রপ্তানি করে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নিজ দেশে সংরক্ষণের দ্বারা আমদানিতে বিপুল বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। রপ্তানির ফলে আমেরিকার পাওনা অর্থ বিদেশী দ্রব্যের আমদানি দ্বারা পরিশোধ লইলে পাছে দেশে আয় ও কর্মসংস্থান কমিয়া যায় এইজন্য উচ্চ সংরক্ষণী প্রাচীরের আড়ালে থাকিয়া সে ব্যবসায়-যুদ্ধ চালায়। যাহাতে বিদেশ হইতে তাহাকে দ্রব্যের আমদানি করিতে না হয়, এইজন্য সে পাওনা-অর্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ঋণ দেয়, দান করে, ইউরোপীয় পুনর্গঠনের দরুন ব্যয় করে বা বিদেশে সৈন্যবাহিনী রক্ষা করে।

২। বিদেশে ঋণ বৃদ্ধি

কিন্তু এই নীতি নিতান্ত স্বল্পকালীন, কারণ অনির্দিষ্ট কালের জন্য কেহ মূলধনের রপ্তানি চালাইয়া যাইতে পারে না। এমন সময় আসে যখন আসল পরিশোধ লইতেই হইবে বা সুদ লইতেই হইবে, এবং একপ অবস্থায় আমদানি বৃদ্ধি না করিলে চলিবে না। তাহা ছাড়া, এই নীতির ফলে দেশে মূলধনের পরিমাণ কমিয়া আভ্যন্তরীণ বিনিময় ও কর্মসংস্থান হ্রাস পাইতেও পারে।

এই পদ্ধতির অসুবিধা

(৬) শিশু শিল্পকে রক্ষা করা (To Protect Infant Industires) :

পৃথিবীর সকল দেশে শিল্পোন্নয়নের স্তর সমান নহে, সকলেই শিল্পবিপ্লবের সুবিধা সমান পরিমাণ গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রথমে যাহারা শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারাই অধিকতর সুযোগ, সুবিধা, শিল্পজ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হইয়াছে। সুতরাং শিল্পে অনুন্নত দেশগুলি শিল্পোন্নয়নের কাজ শুরু করিয়া অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করিলে প্রতিযোগিতায় উন্নততর দেশগুলির নিকট পরাজিত হইবে। অনুন্নত দেশগুলি উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে সংরক্ষণের দ্বারা নিজেদের শিল্প-বাণিজ্যে ব্যাপারে শিশু দেশকে বিদেশী

অনুন্নত দেশ ও অনুন্নত শিল্প

প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচাইবে, শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক জ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা ও সাংগঠনিক প্রস্তুতির স্তর বিদেশীদের হাত হইতে রক্ষা করিবে। জার্মান ধনবিজ্ঞানী ফ্রেডারিক্ লিস্ট এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; তাঁহার মতে, কৃষি-উৎপাদনের স্তর হইতে কোন দেশে শিল্প সম্প্রসারণ করিতে হইলে এইরূপ সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

লিস্ট এই নীতি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন "অনুন্নত দেশ" সম্বন্ধে, কিন্তু আধুনিককালে দেশের শিশু "শিল্পকে" বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন—এই যুক্তিতে সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন করা হইয়া থাকে। "সত্মোজাতকে সেবা কর, শিশুকে রক্ষা কর এবং বয়স্ককে মুক্ত কর"—ইহাই এই যুক্তির মূল কথা।

যুক্তি সঠিক হইলেও এই নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচুর অসুবিধা আসিয়া পড়ে। এই নীতি অনুযায়ী যে সকল "শিশু" ভবিষ্যতে এমনভাবে উন্নত হইয়া উঠিবে যে সংরক্ষণ তুলিয়া লইলেও উন্নত দেশের শিল্পসমূহের সহিত প্রতিযোগিতা দ্বারা সে নিজেকে বাঁচাইতে পারিবে, তাহাদের রক্ষা করা অর্থাৎ সেই দ্রব্য আমদানির উপর শুল্ক বসানো দরকার। কিন্তু পূর্ব হইতেই সঠিকভাবে জানা যায় না কোন্ শিল্প এরূপ বাড়িতে পারে। তাহা ছাড়া একবার শুল্ক বসাইলে সংরক্ষণের আড়ালে বাড়িয়া উঠিবার পরেও সেই শিল্প চিরকাল "সংরক্ষিত" থাকিতেই চায়, নিজের পায়ে স্বাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইবার বাসনা ও মনোভাব কখনও গড়িয়া উঠে না; শিশুর আর বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটিতে চাহে না।

প্রয়োগ গত অসুবিধা

(৭) শিল্পের বৈচিত্র্যসাধন (To Diversify the Industries) :

সংরক্ষণের সাহায্যে দেশে সকল প্রকার শিল্প গড়িয়া তোলা উচিত। কারণ দেশে বহুপ্রকার ব্যক্তি থাকেন, প্রত্যেকের প্রতিভা সমান নয়। যাহাতে সকল ব্যক্তি নিজেদের ঝোঁক, প্রবণতা বা নৈপুণ্য অনুযায়ী নিজেকে উন্নত করিতে পারে সেইজন্য দেশে সকল প্রকার শিল্প থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের শিল্প স্থাপিত হইলে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা (National Self-sufficiency) ঘটিবে, ইহাতে প্রয়োজনের সময় সকল দ্রব্যোৎপাদনেরই ব্যবস্থা থাকিবে। তাহা ছাড়া, সমরোপকরণ-শিল্প বা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে যে সকল শিল্প থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়—সেই সকল শিল্পের উন্নতির জন্য নিশ্চয়ই সংরক্ষণনীতি

শিল্পের বৈচিত্র্য সাধন

গ্রহণ করা উচিত। অ্যাডাম্ স্মিথ্ বলিয়া গিয়াছেন যে, দেশরক্ষার তুলনায় টাকার গুরুত্ব কম (opulence is less important than defence)

(৮) **ডাম্পিং-এর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া** (To protect from Foreign Dumping) :

বিদেশী ব্যবসায়ীরা নিজের দেশে চড়া দাম বজায় রাখিয়া অন্য দেশে উৎপাদন ব্যয় হইতে কম দামে বিক্রয় করিলে ইহাকে সাধারণত ডাম্পিং বলা হয়। এই ডাম্পিং-এর ফলে দেশীয় শিল্পপতিগণ প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারায় ক্রমে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হন, বিদেশী ব্যবসায়ীরা তখন বাজারের একচেটিয়া অবস্থার সুযোগ পাইবার জন্য দাম চড়াইয়া দেয়।

ডাম্পিং-এর বিরুদ্ধে

ডাম্পিং ঘটিতে থাকিলে অবশ্যই তাহার বিরুদ্ধে শুল্ক বসাইয়া দেশীয় শিল্পসমূহকে সংরক্ষিত করা উচিত, কিন্তু দেখা যায় যে, ডাম্পিং বন্ধ হইলেও শুল্ক চলিতে থাকে এবং কোন কারণে শুল্ক বসানো হইলে সেই শুল্ক অন্যান্য আইন কানুনের ন্যায় স্থায়িভাবে সরকারের নীতির অঙ্গ হিসাবে বাঁচিয়া থাকে।

অসুবিধা

সংরক্ষণ নীতির বিপদ (Positive Dangers of Protection) :

সংরক্ষণ নীতির কয়েকটি ত্রুটি ও বিপদ আছে। যেমন, প্রথমত, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা কমিয়া গেলে দেশীয় উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়িগণ অলস, নিরুৎসাহ বা উদ্যোগহীন হইয়া উঠিতে পারে, সকল প্রকার উন্নতি সাধনের প্রেরণা নষ্ট হইতে পারে, উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের কোন প্রচেষ্টা থাকে না; সাধারণত সংরক্ষিত শিল্পে যন্ত্রপাতির উন্নতি করা হয় না এবং অনেক সময় উচ্চ-হারে আমদানি শুল্ক স্থাপনের ফলে আমদানির পরিমাণ খুবই কমে, মোট রাজস্বের পরিমাণও কমিয়া যায়।

প্রতিযোগিতার হ্রাস, আমদানি হ্রাস, দামবৃদ্ধি একচেটিয়া শিল্পসংগঠন, রাজনৈতিক অসাধুতা, প্রভৃতি

ভোগকারিগণ দামবৃদ্ধির ভয় করেন, কারণ আমদানি শুল্কের ভার খুব কম ক্ষেত্রেই উদ্যোক্তার স্কন্ধে পড়ে, প্রধানত ভোগকারীর নিকট হইতে দাম বাড়াইয়া উহা আদায় করা হয়। গরীব ভোগকারীর উপর আরও চাপ পড়ে।

বলা যায় যে, শুল্কই একচেটিয়া সংগঠনের জন্মদাতা। বৈদেশিক প্রতিযোগিতা দূর হইলে দেশীয় উদ্যোক্তাগণ একত্রে জনসাধারণকে তীব্রতর ভাবে শোষণ করিবার জন্য একচেটিয়া সংগঠন গড়িয়া তোলেন।

তাহা ছাড়া, দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাধুতা ও অন্যায় বৃদ্ধি পায়; অনেক ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণের জন্য ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থানুযায়ী চলিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে টাকার সাহায্যে রাজনৈতিক নেতাদের ক্রয় করিয়া রাখেন, অন্তত বহু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা দেখা গিয়াছে।

সংরক্ষণের পদ্ধতি ও রূপ (Methods and forms of Protection):

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে বহুপ্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া আমদানি রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ও পদ্ধতিকে বিভিন্ন ধরনে শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছে, দেখা গিয়াছে যে সংরক্ষণ মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি রূপ গ্রহণ করিতে পারে।

(১) শুল্ক (Duties):

শুল্ককে দুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়: **রাজস্ব শুল্ক** (Revenue Duties) এবং **সংরক্ষণী শুল্ক** (Protective Duties)। প্রধানত সরকারী আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে প্রথম প্রকার শুল্ক বসান হয়, এবং সাধারণত দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় প্রকার শুল্ক বসে। অবশ্য এইরূপ বিভাগ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত নয় আইন প্রণয়নকারীদের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শুল্কের সঠিক শ্রেণীবিভাগ করা চলে না। তবুও এইরূপ বিভাগ করিলে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা থাকিতে পারে, অর্থাৎ রাজস্বের দিক হইতে যে শুল্ক বিশেষ আয়কারী তাহা সংরক্ষণের দিক হইতে পর্যাপ্ত নয়, আবার সংরক্ষণের দিক হইতে যাহা পর্যাপ্ত তাহাতে আমদানি বন্ধ হইয়া যায় ও রাজস্ব আদায় খুবই কমিয়া যাইতে পারে।*

শুল্ককে আবও দুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়: আমদানি শুল্ক ও রপ্তানি শুল্ক।

(ক) আমদানি শুল্ক: বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইলে তাহাকে আমদানি শুল্ক বলা হয়। এইরূপ আমদানি শুল্ক, প্রধানত, দুই প্রকারের হইতে পারে: বিনির্দিষ্ট শুল্ক (Specific duty) এবং মূল্যানুসারে শুল্ক (Advalorem Duty)। নির্দিষ্টানুসারে শুল্ক দ্রব্যের ওজন,

* অবশ্য দীর্ঘকালে, সংরক্ষণী শুল্কের ফলে দেশে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি হওয়ায় সরকারী রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে।

আয়তন বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শুল্কের হার স্থির করা হয়; মূল্যানুসার শুল্কে দ্রব্যের মূল্য অনুযায়ী শুল্কের হার নির্ধারিত হয়।

(খ) দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সেই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর **রপ্তানি শুল্ক** বসানো যাইতে পারে। রপ্তানি শুল্কের ফলে রপ্তানি কমিবে: আভ্যন্তরীণ বাজারে কাঁচামালের দাম কমিয়া যাইবে, বিদেশে ঐ কাঁচামাল দুষ্প্রাপ্য হইবে, উহার দাম বাড়িবে। এইরূপ করিলে দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থার ত্রুটি হইল, ইহা কার্যত কাঁচামাল উৎপাদকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া পণ্য উৎপাদকের স্বার্থ রক্ষা করে।

(২) অর্থসাহায্য (Bounties and Subsidies):

বিশেষ কোন একটি দেশীয় শিল্পের উৎপাদন-ব্যয় অধিক থাকিলে বা বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কম থাকিলে সরকার উহাকে অর্থসাহায্য করিতে পারেন। এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করার নীতিকে অর্থসাহায্য পদ্ধতি বলা হয়। অনেক সময় কম হারে আমদানি শুল্ক বসাইয়া দেশীয় শিল্পকে একই সঙ্গে কিছুটা অর্থ সাহায্যও করা হয়; আমদানি-শুল্ক হইতে প্রাপ্ত টাকা অর্থ সাহায্যে ব্যয়িত হইতেছে, এরূপও দেখা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (I.T.O) আমদানি শুল্ক স্থাপন পছন্দ না করিলেও অর্থ-সাহায্য সম্বন্ধে নীরব আছেন। সাধারণত উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়, কিন্তু অনেক সময়ে মোট কিছু অর্থও একত্রে (lump sum) সাহায্য রূপে দেওয়া চলিতে পারে।

কিরূপে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়

অর্থ সাহায্য পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা হয়, (ক) এই নীতি কার্যকরী করিতে হইলে উৎপাদনের উৎকর্ষ ও পরিমাণের উপর তীক্ষ্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন, বাস্তবে তাহা সম্ভব না-ও হইতে পারে। (খ) দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াইতে হইলে অত্যন্ত বেশি পরিমাণ অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে। (গ) জনসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া তাহা মুষ্টিমেয় শিল্পপতির স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যয় করা উচিত কিনা ইহা বিবেচনা সাপেক্ষ।

বিরুদ্ধে যুক্তিসমূহ

কিন্তু অর্থ-সাহায্য নীতির স্বপক্ষে বলা হয়, (ক) শুল্কের ফলে দামবৃদ্ধি

হইবে, কিন্তু অর্থ-সাহায্যে দাম বৃদ্ধি হইবে না, (খ) প্রদত্ত অর্থ দেশেই থাকিবে, (গ) দ্রব্যের বিভিন্ন গুণগত স্তরের (grade) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা ও সেই অনুযায়ী অর্থ সাহায্য করা সম্ভবপর, (ঘ) সকলেই সঠিকভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারে যে এই সংরক্ষণের জন্য ঠিক কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইতেছে।

স্বপক্ষে যুক্তি

(৩) পরিমাণগত বাধা নিষেধ (Quantitative restrictions)

এই পদ্ধতি অনুযায়ী কোন রাষ্ট্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ স্থির করিয়া দেয় এবং সাধারণত, (ক) **লাইসেন্স** প্রদান করিয়া আমদানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই পদ্ধতির বিশেষ সুবিধা আছে। অনেক সময় শুল্ক ধার্য করিলেও উৎপাদন-ব্যয়ে বা দামে পরিবর্তন ঘটিয়া শুল্কের কার্যকারিতা কমাইয়া দিতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে আমদানির পরিমাণ সংকুচিত করিয়া সংরক্ষণের উদ্দেশ্য সফল করিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহাতে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ খুবই বাড়িয়া যায়। শুল্কের দ্বারা সংরক্ষণ করিলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দামের মধ্যে কিছুটা সংযোগ রক্ষিত হয়, কিন্তু এই পদ্ধতিতে দুই দেশের দামে কোন সংযোগ থাকে না।

লাইসেন্স

আমদানি নিয়ন্ত্রণের ফলে দাম বৃদ্ধি পায়, এবং তাহার দরুন মুনাফা ব্যবসায়ীরাই লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু শুল্ক ধার্য করিলে আমদানিও নিয়ন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের আয়ও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিলে সাধারণত কোন আমদানিকারীকে কতটা আমদানির সুযোগ দেওয়া হইবে এবং কোন্ দেশ হইতে কতটা আমদানি করিতে পারিবে ইহাও ঠিক করিতে হয়। পক্ষপাতিত্ব ও অসাধুতার সুযোগ ইহার ফলে বাড়িয়া যায়। আমদানির পরিমাণ বেশি কমাইলে দেশীয় উৎপাদকগণ মিলিয়া একচেটিয়া সংগঠন স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে শোষণের সুযোগ পায়।

শুল্ক ও পরিমাণগত বাধা-নিষেধ, উভয়-পদ্ধতির তুলনামূলক বিচার

(খ) পরিমাণগত বাধা নিষেধের আর একটি রূপ হইল বিদেশী দ্রব্য আমদানি করিয়া **নির্দিষ্ট অনুপাতে দেশীয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া** তবেই বিক্রয় করা চলিবে এইরূপ নিয়ম করিয়া দেওয়া। সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই নিয়ম চলিতে পারে না, একই প্রকার ও একই ধরনের দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে

(standardised products) এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলে অবশ্য দেশীয় দ্রব্যের কিছু পরিমাণ বিক্রয় নিশ্চিত করা যায়।

(গ) পরিমাণগত বাধা-নিষেধের বিশিষ্ট উপায় হইল আমদানির আনুপাতিক অংশ বা **কোটা** নির্দিষ্ট করা।

যখন কোন দ্রব্য আমদানির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় কিন্তু তাহা পৃথিবীর যে কোন দেশ হইতে আমদানি করা চলে তখন তাহাকে বিশ্বব্যাপী (Global) কোটা বলে। তবে, ইহাতে বিভিন্ন রপ্তানিকারী দেশ অনেক ক্ষেত্রে আমদানিকারী দেশের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনিয়া থাকে। সুতরাং অনেকক্ষেত্রে, একই সঙ্গে কোন্ দেশ হইতে কতটা আমদানি হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

সর্বব্যাপী কোটা

যদি কোন দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত বিনা শুল্কে বা কম হারে আমদানি করিবার অনুমতি থাকে, কিন্তু উহার বেশি আমদানি করিতে হইলে শুল্ক বা অধিক হারে শুল্ক দিতে হয়, তবে তাহাকে শুল্ক-কোটা (Tariff Quota) বলে। অধিক হারে শুল্ক দিলে অবশ্য আমদানির কোন পরিমাণগত বাধা থাকে না।

শুল্ক কোটা

অপর কোন দেশের সহিত আলাপ আলোচনা না করিয়া নিজের স্বার্থে কোন সরকার কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমদানির উচ্চতর পরিমাণ স্থির করিয়া দিলে তাহাকে একপাক্ষিক কোটা (Unilateral Quota) বলে। উভয় দেশের সহিত আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে উভয়ের আমদানির পরিমাণ স্থির হইলে তাহাকে দ্বিপাক্ষিক কোটা (Bilateral Quota) বলে।

একপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক কোটা

(৪) **শাসনতান্ত্রিক সংরক্ষণ (Administrative Protection) :**

শাসনসংক্রান্ত বহু আইনকানুনের ফলে সংরক্ষণ নীতি কার্যকরী হইতে পারে। যেমন, (ক) শুল্ক কর্তৃপক্ষের আদেশ ও নির্দেশ, (খ) রেল ও জাহাজ কর্তৃপক্ষের আদেশ, নির্দেশ বা ভাড়ার স্বতন্ত্রীকরণ, (গ) সরকারী প্রযোজনে দ্রব্যাদি ক্রয়-সংক্রান্ত আদেশ নির্দেশ প্রভৃতি।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে যখন ব্যক্তির হাতে বাণিজ্যের কোন ক্ষমতা না রাখিয়া

একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্র নিজের হাতে তুলিয়া লয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল ব্যবসায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে, তাই বৈদেশিক বাণিজ্যও তাহা হইতে বাদ যাইতে পারে না। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবেই রাষ্ট্র আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য নিজের আয়ত্তে রাখে। প্রথমে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পরে জার্মানি এইরূপ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনা পদ্ধতির প্রসার করিয়াছে। অন্যান্য দেশের নিকট হইতে দর কষাকষির ক্ষেত্রে সর্বাধিক সুবিধা লাভ করা রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের অপরাপর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কাহাকে বলে

বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করিতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের দাম স্থির রাখা, অন্য রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলা মজুত করা প্রভৃতি বিভিন্ন লক্ষ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালিত হইতে পারে। সোভিয়েট ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ ও নয়া চীন ছাড়াও আর্জেন্টিনা; গমের ব্যবসাতে অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা; কাঁচা তুলা, চা, লৌহ সংক্রান্ত ব্যতীত অন্যান্য ধাতু এবং খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ে ইংলণ্ড এবং অনেক ক্ষেত্রে আমেরিকাও এইরূপ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালাইয়া থাকেন। ভারতেও রাষ্ট্রের তরফ হইতে বাণিজ্য চালাইবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যসমূহ

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সুবিধা হিসাবে বলা হয়, ইহার ফলে ক্রেতারা উপকৃত হইবেন, কারণ ব্যবসায়ীদের হাত হইতে আমদানি ও রপ্তানির বিপুল মুনাফা রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আসিলে রাষ্ট্র দ্রব্যাদির দাম কমাইয়া দিতে পারে বা উন্নয়নমূলক কার্যে ওই মুনাফা ব্যয় করিতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া সংগঠন ভাঙিয়া দেওয়াও সম্ভব হইবে। অপর রাষ্ট্রের সহিত দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, বাণিজ্যহার দেশের অনুকূলে আসিবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল করিবার উপযোগী দ্রব্যাদির আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সহজ হইবে।

সুবিধা

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, সরকারী কর্মচারিগণ বাণিজ্য সম্পর্কে একান্ত অনভিজ্ঞ এবং দেশের চাহিদা ও যোগানের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় তাহারা ভুল পরিমাণে এবং ভুল দামে আমদানি ও রপ্তানি করিবে। বাণিজ্যক্ষেত্রে

ত্রুটিসমূহ

রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মনান্তর ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকায় আন্তর্জাতিক কলহ, তিক্ততা ও সংঘর্ষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, প্রতিযোগিতা লোপ পাইয়া একচেটিয়া অধিকার সৃষ্টি হইবে এবং সরকারী কর্তৃত্বের অনবরত পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক দলগুলি এই ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিবে না। কোন সরকারের কোন নির্দেশ অপর দল সরকার গঠন করিয়া বাতিল করিয়া দিবে—এইরূপ বিশৃংখলার উদ্ভব হইবে। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, সরকারী সকল ব্যবসায়ের ন্যায় এক্ষেত্রেও উদ্যোগ ও উৎসাহ উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইবে। রাজনৈতিক ভাবে দুর্বল দেশগুলি রাজনৈতিক চাপে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে।

আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহ

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund) :

পৃথিবীতে যখন স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তখন বৈদেশিক বিনিময়হার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হইয়া পড়িত এবং স্বর্ণের আদান প্রদান দ্বারা আমদানি ও রপ্তানির মূল্য পরিশোধ করা হইত বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল প্রকার লেনদেন করা হইত। 1929-30 সালের মহা অর্থনৈতিক সংকটের ফলে স্বর্ণমানের পতন হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিনিময়-ব্যবস্থা (Exchange Mechanism) সম্পূর্ণ বানচাল হইয়া গেল। তাহার পর শুরু হইল দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, অস্থির ও সদাচঞ্চল বিনিময়হার, বহির্মূল্যপাতন, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, কোটা প্রভৃতির যুগ। আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া গেল, আভ্যন্তরীণ দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর সঠিক রাখাই প্রত্যেক দেশের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। এরূপ বিশৃংখল অবস্থায় এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার প্রয়োজন দেখা দিল যাহার দ্বারা আভ্যন্তরীণ আর্থিক নীতির স্বাধীনতা বজায় থাকে এবং একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন অবাধভাবে চলিতে পারে।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

ব্রেটনউডস্ চুক্তি দ্বারা স্থাপিত এই আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার পুরাতন স্বর্ণমানের স্থলে প্রতিষ্ঠিত এক নূতন ব্যবস্থা, স্বর্ণ ও কাগজীমান উভয়ের বৈশিষ্ট্য মিলাইয়া গৃহীত এক ধরনের মিশ্রমান। কেইন্‌সের ভাষায় বলিতে গেলে ইহা "উন্নত ধরনের আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা" স্থাপনের প্রচেষ্টা। বহু আলাপ আলোচনার পর আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা

আলোচনার প্রথমে ব্রিটেন এবং আমেরিকা উভয় দেশই নিজস্ব প্রস্তাব পেশ করেন; ইংলণ্ডের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাকে বলা হয় ব্যাঙ্কর পরিকল্পনা (Bancor Plan) এবং মার্কিন প্রস্তাবকে বলা হয় ইউনিটাস পরিকল্পনা (Unitas Scheme)।

কেইন্‌সের নেতৃত্বে ব্রিটেন যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিল তাহার মূল কথা ছিল আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে নূতন এক ধরনের মুদ্রা প্রচলন করা। এই পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, এক আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং সংস্থা স্থাপিত হইবে, পৃথিবীর সকল দেশই সেই সংস্থার সভ্য হইবে,

ব্রিটেন কর্তৃক উত্থাপিত কেইন্‌সীয় প্রস্তাব বা ব্যাঙ্কর পরিকল্পনা

ব্যাঙ্কে ব্যক্তি যেমন হিসাব রাখে জাতিসমূহও নিজ নিজ নামে ক্লিয়ারিং সংস্থায় সেইরূপ হিসাব রাখিবে, স্বর্ণের সহিত নির্দিষ্টহারে নির্ধারিত ব্যাঙ্কর (Bancor) নামে নূতন আন্তর্জাতিক অর্থে এই হিসাব রক্ষিত হইবে। আন্তর্জাতিক লেনদেন হইতে উদ্ভূত সকল দেনাপাওনা এই অর্থের হিসাবে ক্লিয়ারিং সংস্থার নিকট জাতির জমা বাড়াইয়া বা কমাইয়া মিটাইয়া ফেলা হইবে। সংস্থার সভ্য হইবে সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ইহাদের নামেই এই হিসাবে রক্ষিত জমার হিসাব বাড়িতে থাকিবে, লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হইতে থাকিলে সংস্থার নিকট রক্ষিত জমার হিসাব কমিতে থাকিবে। যাহাতে জমা ক্রমাগত বৃদ্ধি বা হ্রাস না পায় সেইজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে; এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহাতে লেনদেন ব্যালান্সের আনুকূল্য বা প্রতিকূলতা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই দূরীভূত হইয়া যাইতে পারে। প্রত্যেকটি সভ্য-রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধ করিলে সংস্থা হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ওভারড্রাফট্ লইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা থাকিবে, ইহার ফলে কোন একটি দেশ অপর কোন দেশের দেনা মিটাইবার জন্য কিছুটা সময়ও পাইবে।

আমেরিকার পরিকল্পনায় একটি আন্তর্জাতিক স্থায়িত্ব-সাধনকারী ভাণ্ডার (International Stabilization Fund) স্থাপনের কথা বলা হইয়াছিল। নিজ দেশের কিছু মুদ্রা সকল সদস্য রাষ্ট্রই এই ভাণ্ডার-কর্তৃপক্ষের হাতে জমা দিবে, অন্য রাষ্ট্রের নিকট বিক্রয়ের জন্য তাহা ব্যবহৃত হইবে। সকল লেনদেনের রূপই হইবে এক মুদ্রার দ্বারা অপর মুদ্রার ক্রয় ও বিক্রয়, ব্যাঙ্কর পরিকল্পনার ন্যায় কোন আন্তর্জাতিক মুদ্রা সৃষ্টি করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল না। লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল হইলে ভাণ্ডারের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মুদ্রা দ্রুত ফুরাইয়া আসিবে (অন্যান্য দেশ দেনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়া লইবে), লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হইলে ভাণ্ডারের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মুদ্রা মোটেই ফুরাইবে না, ভাণ্ডারের হাতেই থাকিয়া যাইবে (অন্যান্য দেশ ক্রয় করিবে না, কারণ দেনা মিটাইবার প্রয়োজন নাই)।

আমেরিকা কর্তৃক উত্থাপিত হোয়াইট প্রস্তাব বা ইউনিটাস্ পরিকল্পনা

ব্রিটেন ও আমেরিকার পরিকল্পনা লইয়া দুই দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ এবং ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পর নূতন এক পরিকল্পনার উদ্ভব হয় এবং 1944 সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উডস্ নামক স্থানে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনা সম্পর্কীয় চুক্তির দুই অংশ: প্রথম অংশ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার সংক্রান্ত এবং অপর অংশ আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত। 1956 সালের 27 ডিসেম্বর হইতে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের কার্য শুরু হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার স্থাপন

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সংগঠন ও কার্যাবলী (Organisation and Functions of the I. M. F.)

বৈদেশিক বিনিময় সহজতর করিবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। সকল সভ্যই নিজ দেশের মুদ্রা এবং স্বর্ণ বা ডলারের আকারে কিছু পরিমাণ অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা দেয় এবং প্রয়োজন হইলে ভাণ্ডার হইতে অপর দেশের অর্থ ক্রয় করিতে পারে।

প্রথমে 880 (আটশত আশি) কোটি ডলার লইয়া এই অর্থভাণ্ডার গঠিত হইয়াছিল, যাহারা এই ভাণ্ডারের সদস্য তাহারা নিজ নিজ কোটা (Quota)

জমাদিয়া এই তহবিল সৃষ্টিকরিয়াছিল। প্রত্যেক সদস্যের কোটার 25%, অথবা সরকারী ভাবে রক্ষিত বা ডলারের 10% (উভয়ের মধ্যে যেটির পরিমাণ কম) স্বর্ণ বা ডলারে জমা দিতে হইয়াছে। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অবশিষ্ট অংশ নিজ মুদ্রাতেই জমা দিয়াছে। ছোট ছোট কয়েকটি রাষ্ট্র নিজ কোটার সম্পূর্ণ অংশ জমা দিতে পারে নাই, সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অর্থ-ভাণ্ডারে যোগদান করে নাই। সকল সদস্য রাষ্ট্রই স্বর্ণ বা ডলারের সহিত নিজ মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত করিয়া সরকারীভাবে তাহা ঘোষণা করিয়াছে। সরকারীভাবে নির্দিষ্ট ও ঘোষিত এই বিনিময়হারের উভয় দিকে (ঊর্ধ্বে বা নিম্নে) সর্বাধিক 10% পর্যন্ত বিনিময় হারে পরিবর্তন সদস্যগণ প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেরাই করিতে পারেন; এবং ভাণ্ডার-কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া বৈদেশিক বিনিময়হারে আরও 10% পরিবর্তন করা চলে। কেবলমাত্র লেনদেন ব্যালান্সে "মৌলিক ভারসাম্যবিহীনতা" (Fundamental Disequilibrium) দেখা দিলেই সরকারী বৈদেশিক বিনিময়হারে এরূপ পরিবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু ভাণ্ডারের কোন নিয়মে বলা হয় নাই যে, কতবার বা কতদিন অন্তর এইরূপ পরিবর্তন করা নিয়মসঙ্গত। স্বর্ণের বা ডলারের সহিত বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময়-হার নির্দিষ্ট হওয়ায় সকল সদস্য-রাষ্ট্রের অর্থের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়-হার আপনা-আপনি স্থির হইয়া পড়িয়াছে।

ভাণ্ডারের সংগঠন ও কার্যকলাপ

লেনদেন ব্যালান্সে প্রতিকূলতা আসিলে বা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেনা হইলে কোন সদস্য রাষ্ট্র এই ভাণ্ডার হইতে অপর দেশের অর্থ ক্রয় করিতে পারিবে। সরকারী ভাবে নির্দিষ্ট দামের উপর ½% হইতে 1% অধিক দামে উহা ক্রয় করিতে হইবে, ভাণ্ডারের কাজকর্ম চালাইবার উপযোগী ব্যয় এইরূপে পাওয়া যাইবে। কোন সদস্য-রাষ্ট্র প্রতি বৎসর নিজের কোটার 25% পর্যন্ত অন্য দেশের অর্থ ক্রয় করিতে পারেন।* কোন সদস্য দেশ নিজের কোটার 200%-এর অধিক নিজদেশীয় অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা রাখিতে পারিবে। ভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে সুদ দিতে হইবে: দীর্ঘকালের জন্য এবং অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিলে সুদের হার বেশি; স্বল্পকালের জন্য এবং কম পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিলে সুদের হার কম। ভাণ্ডার কোন

* ভাণ্ডারের বিভিন্ন প্রকার বৈদেশিক মুদ্রা যাহাতে দ্রুত ফুরাইয়া না যায় এবং যাহাতে সদস্যরা ভারসাম্যহীনতা দূর করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন—সেই উদ্দেশ্যে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দেশের মুদ্রাকে "দুষ্প্রাপ্য" (Scarce) বলিয়া ঘোষণা করিয়া সেই সদস্য-দেশকে স্বর্ণের বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রয় করিতে বা ভাণ্ডারকে ঋণদান করিতে অনুরোধ জানাইতে পারে।

ভাণ্ডারের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করিবে 12 জন লইয়া গঠিত একটি কার্যকরী পরিচালকবৃন্দ (Executive Director); সর্বাধিক কোটাসম্পন্ন পাঁচটি দেশের (সোভিয়েত ইউনিয়ন যোগ না দেওয়ায় ভারতবর্ষ ইহার একজন স্থায়ী সদস্য) পাঁচজন প্রতিনিধি; যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত আমেরিকার অপরাপর দেশগুলি হইতে দুইজন, অন্যান্য দেশ হইতে পাঁচজন। কার্যকরী পরিচালকবৃন্দ একজন সভাপতি নির্বাচিত করিবে এবং তিনি কার্যকরী সংস্থার প্রধান হিসাবে ভাণ্ডারের কাজকর্ম পরিচালনা করিবেন।

পরিচালনা

সাধারণভাবে বলিতে গেলে ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হইল পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও পরিধি বিস্তৃতির জন্য বৈদেশিক লেনদেনের ব্যাপারে সকল প্রকার বাধানিষেধ অপসারিত করা, সংক্ষেপে বলিলে সকল দেশের অর্থের বহুমুখী রূপান্তরযোগ্যতা (Multilateral convertibility) প্রতিষ্ঠা করা। তাহা সত্ত্বেও বর্তমান অবস্থার প্রয়োজনীয়তা বিচার করিয়া বৈদেশিক বিনিময়ের বাধানিষেধসমূহ (Foreign exchange restrictions) সম্পূর্ণ দূর করার কথা ভাণ্ডারের নিয়মে বলা হয় নাই। পরিবর্তনের যুগে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের সকল পদ্ধতি, এমন কি বহুধা বিনিময় হারও (Multiple Exchange Rates) সচল রাখা যাইতে পারে, তবে সম্ভব হইলেই এবং লেনদেন ব্যালান্সে অবস্থার উন্নতি ঘটিলেই ইহাদের পরিহার করা কর্তব্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ভাণ্ডার হইতে ঋণগ্রহণ না করিয়াই অন্যান্য সকল দেশের দেনা মিটানো যায়—এইরূপ অবস্থায় আসিলেই বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাসমূহ পরিহার করা বাঞ্ছনীয় হইবে। 5 বৎসর পরেও এইরূপ ব্যবস্থাদি প্রয়োগ করিতে হইলে ভাণ্ডারের অনুমতি লইতে হইবে, ইহাই নিয়ম দ্বারা স্থির হইয়াছিল। এইরূপে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বিনিময়-কাঠিন্যের (Exchange rigidity) পরিবর্তে বিনিময়-স্থায়িত্ব (Exchange stability) বজায় রাখিতে চাহিয়াছেন এবং কিছু পরিমাণ বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ (Exchange control) বজায় রাখিয়া বিনিময়-নমনীয়তা (Exchange flexibility) আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার ও বৈদেশিক বিনিময়ের বাধানিষেধসমূহ

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কেইন্‌সের প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং সংস্থার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পবিবর্তন না আনিলেও ইহাব কতকগুলি বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। যুদ্ধোত্তর পরিবর্তনের যুগ শেষ হইলে অর্থের বহুমুখী রূপান্তর-যোগ্যতা ফিরিয়া আসিতে পারে, বহুমুখী বৈদেশিক বাণিজ্য(Multilareral Trading) শুরু হইতে পাবে, এরূপ আশাব সৃষ্টি হইযাছিল। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধোত্তব পরিবর্তনেব যুগে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণেব প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া এই সংস্থা সকল দেশকে যুদ্ধজনিত অবস্থা পাব হইয়া আসাব সুযোগ দিযাছে—ইহা সঠিক অবস্থা-বিচাব ও বুদ্ধির পরিচায়ক।

আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারেব সুবিধা

তৃতীয়ত, বিভিন্ন দেশেব কোটা একত্রে মিলাইযা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেব লেনদেন কিছুটা সহজ করিযাছে, কোটাব পবিমাণ অল্প হইলেও লেনদেন ব্যালান্সে সাময়িক ভাবসাম্যেব বিচ্যুতি দূর করিতে কিছুটা সাহায্য করিয়াছে। চতুর্থত, দেনদার দেশগুলিব ঋণভাব লাঘব করিতে পাওনাদার দেশগুলিবও যে কিছুটা কর্তব্য আছে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতাব ফলে সেই বোধ জাগ্রত হইয়াছে।

যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব বজায থাকিলে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার সাফল্য লাভ করিতে পাবে, তাহাব অভাবই ইহাব অসাফল্যের কাবণ সৃষ্টি করিযাছে। তাহা ছাড়া, বহু সদস্য রাষ্ট্র ভাণ্ডারের নিযম-বিরোধী কাজ কবিলেও সেই সকল বেআইনী কার্যাদি বন্ধ করা সম্ভব হয নাই। ভবিষ্যতেও ইহা সম্ভব না হইলে "উন্নত ধরনেব আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা" গড়িয়া তোলা যাইবে না। যেমন, সোভিযেট ইউনিয়ন এই ভাণ্ডারে যোগ দেয় নাই, ফ্রাঙ্ক বা লিরার বহির্মূল্যে নিয়মবিরুদ্ধ পরিবর্তন হইযাছে, ভাণ্ডাব কর্তৃক নির্দিষ্ট দামের ঊর্ধ্বে দক্ষিণ আফ্রিকা স্বর্ণ বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছে। তাহা সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে, বহু বাধা বিপত্তি ও পরস্পর-বিরোধী জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করার এই প্রচেষ্টা খুবই প্রয়োজনীয়, আর কেইন্‌সের ভাষায় বলিতে গেলে কোন ভাল কিছু গড়িয়া তুলিতে হইলে, কোথাও হইতে নিশ্চয় শুরু করা দরকার ("One must begin somewhere")।

আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের দোষাবলী বা কিছুটা অসাফল্যের কারণ

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (International Bank for Reconstruction and Development)

ব্রেটন্‌উড্‌স চুক্তিতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নতির উদ্দেশ্যে একটি

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক স্থাপনের কথাও বলা হইয়াছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং অনুন্নত দেশসমূহে অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধন, ইহাই এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। সদস্য-দেশগুলি হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া 1000 কোটি ডলার অনুমোদিত মূলধন লইয়া এই ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সকল সদস্য এই ব্যাঙ্কেরও সদস্য বটে।

উদ্দেশ্য

যে সকল ধনশালী দেশে উদ্বৃত্ত মূলধন রহিয়াছে তাহারা যদি স্বল্প-মূলধনশালী দেশে মূলধন প্রেরণ না করেন তাহা হইলে পৃথিবীর সকল দেশ অর্থ নৈতিক অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারে না, পৃথিবীর কোন অঞ্চলে দারিদ্র্য ধনীদেশের জীবন যাত্রার মানকেও নিচে টানিয়া রাখে। তাই এই ব্যাঙ্কের গুরুত্ব খুবই বেশি, অনুন্নত দেশসমূহে অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে এই ব্যাঙ্ক সাহায্য করিবে।

গুরুত্ব

এই ব্যাঙ্ক হইতে বিভিন্ন দেশের সরকার বা ব্যক্তিদের অর্থসাহায্য করা হয় এবং ব্যক্তি অর্থসাহায্য গ্রহণ করিলে সেই দেশের সরকার উহাতে নিশ্চয়তা বা গ্যারাণ্টি (Guarantee) প্রদান করেন। একমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা উৎপাদন-শীল কার্যের উদ্দেশ্যেই ঋণ দেওয়া হয়। কোন ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী বিদেশে বিনিয়োগ করিলে ব্যাঙ্ক তাঁহাকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন, নিজেরা ঋণগ্রহণ করিয়া অপরকে ঋণ দিতে সাহায্য করিতে পারেন।

কিরূপে সাহায্য করে

1947 সালের মে মাস হইতে ব্যাঙ্কের কার্য শুরু হইয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ন্যায় এই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয়, কার্যকরী পরিচালকমণ্ডলীর প্রধানকে প্রেসিডেণ্ট বলা হয়।

পরিচালনা

এই ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহা প্রধানত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশসমূহকে সাহায্যদান করিতেই ব্যস্ত এবং সেক্ষেত্রেও ইহার সাহায্যের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। তাহা ছাড়া, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার রাজনৈতিক দলভুক্ত দেশগুলিকেই সাধারণত অধিক সাহায্য করা হয়, অর্থাৎ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সহায়ক হিসাবে ইহাকে ব্যবহার করা হয়, এরূপও বলা হয়। অনুন্নত স্বল্প-মূলধনী দেশ-গুলি এখন পর্যন্ত বিশেষ সাহায্য ইহা হইতে পায় নাই। আরও বলা হয় যে

সমালোচনা

উদ্বৃত্ত মার্কিন মূলধনের বহির্নিয়োগ এবং মুনাফাশীল নিয়োগই ইহার প্রধান লক্ষ্য; ইহা হইল আভ্যন্তরীণ নিয়োগের ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ায় বিদেশী বাজারে মার্কিন বিনিয়োগ চালনা করার সংগঠন।

অনুশীলনী

1. "Our Imports are paid for our Exports"—Elucidate.

2. How is difference in the values of Exports and Imports corrected ?

3. On what factors the gains from International Trade depend ? How the gains can be measured ?

4. "There are limits to the fluctuations in Rate of Exchange." Explain with reference to (a) Countries on gold standard (b) Countries on Inconvertible paper money.

5. Explain how foreign exchange rates are determined between two countries with Inconvertible paper currencies.

6. Enumerate the influence that bring about fluctuations in the rate of Foreign Exchange.

7. Examine the effects of a Depreciating currency on Foreign Trade.

8. State the case for Free Trade.

9. Discuss the case for Production.

10. Examine the principal arguments for Free Trade and Protection.

11. Do you advocate Free Trade or Protection? Give reasons in support of your answer.

12. Examine the validity of the different arguments that have been advanced in favour of protection.

13. Compare Import duties and Quantitative restrictions as means of protecting home Industries.

14. Write brief explanatory note on the objects and mechanism of Exchange control.

15. Distinguish between Balance of Trade and Balance of payments. How can a continuous deficit in the balance of payments be corrected ?

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ঃ সরকারী ব্যয়

Government finance : Public Expenditure

ধনবিজ্ঞানের যে অংশ রাষ্ট্র ও অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠানসমূহের (মিউনিসিপ্যালিটি, করপোরেশন প্রভৃতির) আয়-ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রভৃতির নীতি ও পদ্ধতি আলোচনা করে তাহাকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (Public finance) বলে। এই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েরই অংশ।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি : ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

... আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ প্রভৃতি দেশের উৎপাদনের পরিমাণ ও ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করে; জাতীয় আয়ের পরিমাণে ও জীবন যাত্রার মানে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটায়। রাষ্ট্রীয় আয়ে হ্রাস সমাজের সামগ্রিক আয় কমাইয়া দেয়, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে বৃদ্ধি সামগ্রিক আয় বাড়ায়, দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর-নির্ধারণে রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন ও নীতি ব্যক্তির দৈনন্দিন কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। সুতরাং ইহা ধনবিজ্ঞানের অংশ-বিশেষ।

চিন্তাজগতে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারার প্রভাব এখন আর নাই, রাষ্ট্রের কাজকর্মের পরিমাণে ও ধরনে আধুনিককালে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কেবলমাত্র আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাই আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য নহে, ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নতি বা বিভিন্নমুখী অর্থনৈতিক কাজকর্ম রাষ্ট্রের কর্তব্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ কম হওয়াই মঙ্গল, ঊনবিংশ শতাব্দীর অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক এইরূপ ধারণা এমতাবস্থায় আর চলিতে পারে না। কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করা আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের আদর্শ, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার জয়যাত্রা আজিকার যুগে অব্যাহত। এরূপ অবস্থায় ক্রমে রাষ্ট্রের আয়, ব্যয় ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির আলোচনা তাই ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি

ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পার্থক্য (Distinction between Private Finance and Public Finance)

ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মধ্যে বহুক্ষেত্রে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম, ইহা লক্ষণীয় যে, সাধারণত ব্যক্তি নিজের আয় অনুযায়ী ব্যয় স্থির করেন, কিন্তু রাষ্ট্র প্রথমে ব্যয় স্থির করিয়া পরে সেই পরিমাণ আয়সংগ্রহের চেষ্টা করে। যদিও অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যয়সংকোচের চেষ্টা করে এবং আয় অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয়-বিভাগের ব্যবস্থা করে, তাহা হইতেও সাধারণত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী একটু পৃথক থাকে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র নিজের অভ্যন্তরে নাগরিকদের বা রাষ্ট্রের বাহিরে বিদেশীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। কোন ব্যক্তির দিক হইতে দেখিতে গেলে সকল ঋণই বাহ্য, কারণ ব্যক্তি কখনই নিজের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে না।

তৃতীয়ত প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র অর্থ সৃষ্টি করিয়া নিজের ব্যয় নির্বাহ করে কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ অর্থ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

চতুর্থত, কোন ব্যক্তি তাহার বর্তমান আয় হইতে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন, কিন্তু রাষ্ট্র সর্বদাই সেইরূপ উদ্বৃত্ত গঠন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করে না। ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারাও দ্রুত শিল্পোন্নয়ন বা পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছানো রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। তাহা ছাড়া দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব খুবই বেশি, সর্বদা ইহা মনে রাখিয়াই রাষ্ট্র বর্তমানের আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা করে।

পঞ্চমত, ব্যক্তির ব্যয় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে যেরূপে প্রভাবান্বিত করে তাহা হইতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাবের রূপ পৃথক ধরনের। তাহা ছাড়া, নিজের আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের ফলে সমাজ দেহে সামগ্রিকভাবে কি প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহা বিচার করিয়া ব্যক্তিগত অর্থনীতি পরিচালিত হয় না, কিন্তু রাষ্ট্র তাহার কাজকর্ম চালাইবার জন্য সর্বদাই সামগ্রিক প্রভাব ও ফলাফল বিচার করিয়া থাকে।

সর্বশেষে বলা চলে, ব্যক্তি যখন ব্যয় করে তখন সে ব্যয়ের প্রত্যেক দিক হইতে সমান প্রান্তিক উপযোগিতা পাইবার চেষ্টা করে। রাষ্ট্র কিন্তু চেষ্টা করিলেও সাধারণত উহাতে সক্ষম হয় না। কারণ, রাজনৈতিক, দলগত, শ্রেণীগত বা আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষার জন্য অনেক সময় অর্থনৈতিক হিসাবে

অযৌক্তিক ব্যয় করিতে হইতে পারে। ভবিষ্যতে সুফলদায়ী কিন্তু বর্তমানে প্রান্তিক উপযোগিতা খুবই কম, এরূপ ব্যয়ের প্রয়োজনও হইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য (The objects of Public Finance) :

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির লক্ষ্যই হইবে যথাসম্ভব কম কর আদায় ও ব্যয় করা। তাঁহাদের মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই একমাত্র গ্রহণযোগ্য রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য, সুতরাং অর্থনৈতিক কাজকর্ম ব্যক্তির হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া বিশেষ দরকার। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্র ব্যয় করিলে তাহা অনুৎপাদক হইবেই, অন্তত ব্যক্তিরা ব্যয় করিলে যতটা উৎপাদনশীল হইতে পারিত ততটা কিছুতেই হইবে না। সুতরাং গ্ল্যাডস্টোনের ভাষায় বলা চলে, ফলপ্রসূ হইবার জন্য অর্থকে ব্যক্তির পকেটেই ফেলিয়া রাখা দরকার (money should be left to fructify in the pockets of individual)।

সর্বনিম্ন পরিমাণ ব্যয়ের নীতি

কিন্তু এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়, এবং আধুনিককালে ইহা বর্জিত হইয়াছে। সাধারণভাবে সকল কর সর্বদাই খারাপ এরূপ বলা চলে না, যেমন নেশার উপর কর সরাসরিভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সাহায্য করিতে পারে। তাহা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ব্যক্তির তুলনায় রাষ্ট্র অধিক উৎপাদনশীল ভাবে ব্যয় করিতেছে, ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত বিলাসিতায় বা খেয়ালখুশিতে অযথা ব্যয় করিত, রাষ্ট্র তাহা আদায় করিয়া জনসাধারণের উপকারার্থে ব্যয় করিতেছে। অবশ্য, কর এরূপভাবে আরোপিত হওয়া দরকার যাহাতে ব্যক্তির কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়-স্পৃহা কমিয়া না যায় এবং ব্যয় এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে উহা অপব্যয়িত হইয়া না পড়ে।

এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় আর একটি নীতি হইল সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতার নীতি (the Principle of maximum social advantage)। ব্যক্তি যেরূপ আয় ও ব্যয়ের মাধ্যমে সর্বাধিক তৃপ্তি পাইতে চাহে, রাষ্ট্রও সেইরূপ এমনভাবে আয় ও ব্যয় করিবে যাহাতে সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজ সর্বাধিক উপকৃত হয়। রাষ্ট্রীয় আয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় উভয়ের ফলেই কাহারও

সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতার নীতি

হাত হইতে অর্থ সরিয়া আসিতেছে এবং কাহারও হাতে উহা চলিয়া যাইতেছে, সম্পদের হস্তান্তর (transfer of wealth) ঘটিতেছে এবং ইহার ফলে উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণ ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটিতেছে (changes take place in the amount and the nature of wealth which is produced)।

সম্পদের এইরূপ হস্তান্তরণের দ্বারা উহার পরিমাণ ও প্রকৃতিতে এমন পরিবর্তন আনিতে হইবে যাহাতে সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতা ঘটে, ইহাই হইল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির লক্ষ্য।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যকর্মের ফলে সর্বাধিক সামাজিক উপকারিতা পাওয়া যায় কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমতঃ, কর কাঠামোর প্রকৃতি (Nature of Tax-structure) ও কর-পদ্ধতি (Methods of taxation) সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার কর আছে এবং তাহাদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে আরোপ করিয়া রাজস্ব তোলা যাইতে পারে। কোনও ধরনের করের ক্ষেত্রে এবং পদ্ধতিতে করভার অধিক, কোথাও বা ইহা কম। সুতরাং করের প্রকৃতি ও পদ্ধতি এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহাতে করভার (burden of taxation) সর্বনিম্ন হয়। দ্বিতীয়ত, কর আরোপের সর্বশেষ ফলাফল বিচার করাও প্রয়োজন।

বিচার বিষয়সমূহ :
(ক) কর প্রকৃতি ও কর পদ্ধতি
(খ) রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতি ও দিক্ বিচার

যদি কর আরোপের ফলে কর্মোদ্যম ও সঞ্চয় স্পৃহা কমিয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে সমর্থন করা চলে না। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতি ও দিক্-বিচার (Nature and direction) বিশ্লেষণ করাও বিশেষ দরকার। যেমন বর্তমানে অধিক ভার বহন করিতে হইলেও যদি রাষ্ট্রীয় ব্যয় মূলধন-গঠনের কার্যে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক বিচারে উহা গ্রহণযোগ্য। পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কম হইলেও যদি অনেকক্ষেত্রে উহা অপ্রয়োজনীয় দিকে নিয়োজিত হয়, তবে অর্থনৈতিক বিচারে উহা পরিত্যাজ্য। রাজনৈতিক কারণে, দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলারক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যয় খাঁটি অর্থনৈতিক বিচারে গ্রহণযোগ্য না হইলেও সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থে উহা কল্যাণকর হইতে পারে।

আধুনিক কালে শিল্পপ্রধান দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছানোই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। রাষ্ট্র এরূপ হারে ও এমন প্রকার কর স্থাপন করিবে যাহাতে কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অনিয়োজিত উপকরণ-সমূহের নিয়োগ বাড়ে, আয়স্তর বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের উপযোগী ভারসাম্য বজায় থাকে।

শিল্পপ্রধান দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছান ও তাহা বজায় রাখা বা আর্থিক অসাম্য দূর করা

এমনভাবে কর আরোপিত হইবে যাহাতে কম ভোগপ্রবণতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরিয়া আসে, এবং এমনভাবে ব্যয় হইবে যাহাতে অধিক ভোগপ্রবণতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট সেই অর্থ চলিয়া যায়; সমাজের মোট বিনিয়োগ ব্যয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। অনেকক্ষেত্রে সমাজে আয়বৈষম্যের পরিধি কমানোও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির লক্ষ্য হিসাবে গণ্য হয়।

শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির লক্ষ্য হইবে দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণ বা অর্থনৈতিক প্রসারকে (economic expansion) ত্বরান্বিত করা। এমনভাবে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থা গঠন করা দরকার যাহাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি (growth) দ্রুততর হইবার উপযোগী মূলধন-গঠনের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উৎপাদন, জাতীয় আয়, বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও মূলধন-গঠন, সকল কিছুই যাহাতে একসঙ্গে বাড়িতে থাকে অথচ তীব্র মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে না পারে, ইহা লক্ষ্য রাখা দরকার। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে (Private Sector) আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় না কমাইয়া সরকারী ক্ষেত্রে (Public Sector) বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ক্রমশ অধিক পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইতে থাকে; ইহাই এই নীতির বাস্তব লক্ষ্য।

শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক প্রসারকে ত্বরান্বিত করা

লার্নারের ফাংশনাল ফিনান্স তত্ত্ব (Lerner's theory of Functional Finance) :

অধ্যাপক লার্নারের মতে, সরকারী অর্থনীতির একমাত্র লক্ষ্য হইবে দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের জাতীয় আয় উৎপন্ন করা। এই উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি ও কাজকর্ম পরিচালিত হইবে, ইহাকেই আমরা ফাংশনাল ফিনান্স বলিতে পারি। তিনি বলেন, "Taxing and spending, borrowing and lending and buying and selling constitute the six fiscal instruments of

ফাংশনাল ফিনান্স কাহাকে বলে

Functional Finance whose objective is the task of adjusting investment and consumption to give full employment."

তাঁহার মতে পূর্ণ-কর্মসংস্থানকে লক্ষ্য ধরিয়া লইলে যে সকল নীতি দ্বারা এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে, বাজেট রচনা ও সরকারী কাজকর্ম সম্পর্কে পুরাতন চিন্তা-ধারণা বা রীতিনীতি সম্পূর্ণ বর্জন করিতে হইবে। দেশের জনসাধারণের উন্নতির জন্যই সরকারের প্রতিষ্ঠা, তাই সরকারের নিজস্ব কোনরূপ নীতিকে বিচার করার একমাত্র মানদণ্ড হইল জনকল্যাণ ঘটিতেছে কিনা তাহা দেখা। সরকারের নিজের উপর সেই নীতির প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, 'যেকোন করের দুইটি প্রভাব : করের দরুন পূর্বের তুলনায় কর-দাতার হাতে টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়, এবং সরকারের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রথম প্রভাবটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যদি লোকের হাতে টাকা কম রাখা দরকার হয়, তবেই যেন সেই করটি বসানো হয়। সরকারের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য যেন কখনই কর আরোপ করা না হয়, কারণ সরকার যে কোনসময়ে ইচ্ছা করিলেই কোন করদাতাকে দরিদ্র না করিয়াও নিজের হাতে বেশি টাকা পাইতে পারে (নোট ছাপাইয়া বা ঋণ লইয়া)। সুতরাং, লার্ণারের মতে, সরকারের টাকা দরকার, এই যুক্তিতে যেন কখনই কর আরোপ করিয়া টাকা তোলা না হয়। সরকার যদি কোন অর্থনৈতিক লেনদেন বন্ধ করিতে চান, একমাত্র তবেই যেন উহার উপর কর আরোপ করেন। ধনীকে গরীব করা দরকার মনে হইলে একমাত্র তবেই যেন ব্যক্তিদের নিকট হইতে করের নাম করিয়া টাকা তুলিয়া লওয়া হয়, নচেৎ নহে।

করনীতির একমাত্র লক্ষ্য পূর্ণ কর্মসংস্থান

কর-আরোপ এবং সরকারী ঋণনীতি সম্পর্কে লার্নার একেবারে চরম ধরনের মত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় রাখিয়া সরকারী ঋণের পরিমাণ খুব বেশি পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিলেও কোনরূপ ক্ষতি নাই। তাঁহার মতে, জাতীয় ঋণের পরিমাণ যত বেশিই হউক না কেন, উহার কোনই কুফল নাই, যদি অবশ্য পূর্ণকর্মসংস্থান দেশে বজায় থাকে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট ইহা কোনরূপ ভার নয়, কারণ এই বংশধরগণ ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধের সময়ে নিজেদের টাকা নিজেদেরই নিকট হস্তান্তর করিতেছে। জাতীয় ঋণের

ঋণনীতির লক্ষ্যও তাই

সুদ দেওয়াও ভারশীল নয়, কারণ, দেশের নাগরিকেরা নিজেরাই নিজেদের টাকা পরিশোধ করিতেছে। প্রতিটি ঋণের পিছনেই কোন না কোন সম্পদ সৃষ্টি হইতেছে। একমাত্র বৈদেশিক ঋণ জাতির সম্পদ কমাইয়া দেয়। সুতরাং, প্রয়োজন হইলে সীমাহীন পরিমাণে আভ্যন্তরীণ ঋণ সৃষ্টি করিয়াও দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা সরকারী অর্থনীতির একমাত্র লক্ষ্য, ইহাই লার্নার বলিতে চাহেন।

রাষ্ট্রীয় ব্যয় (Public expenditure)

দেশের জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও আয়ের ক্ষেত্রে, তাহাদের জীবন যাত্রার মান প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাব রাষ্ট্রীয় আয় হইতে কিছুমাত্র কম নহে, এই তত্ত্ব আধুনিক যুগের ধনবিজ্ঞানীদের চিন্তা জগতে একটি বিশেষ দান। পূর্বে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণই ছিল খুব কম সুতরাং ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও ফলাফল ধনবিজ্ঞানীদের তত্ত্বালোচনায় অংশ গ্রহণ করে নাই। রাষ্ট্রের কর্তব্যের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায়, রাষ্ট্রীয় ব্যয় দ্রুতগতিতে ও ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িয়া যাওয়ায় এবং কেইন্সীয় মতবাদের প্রভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বা সমগ্রালোচন পদ্ধতি (Macro-analysis) প্রসার লাভ করায় ইহার আলোচনা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিতেছে।

পূর্বের তুলনায় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণে বৃদ্ধি

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ অনেক। প্রথমত, আধুনিক কালের রাষ্ট্র আর পূর্বের ন্যায় ক্ষুদ্রায়তন নাই, রাষ্ট্রের সীমানা বর্ধিত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে, ভৌগোলিক সীমানা বর্ধিত না হইলেও ইহার জনসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে; স্বভাবতই সরকারী ক্ষেত্রে (Public sector) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য অধিক অর্থব্যয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তৃতীয়ত, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে, মাথাপিছু ব্যক্তিগত আয় বাড়িতেছে, জীবন-যাত্রার মানও বৃদ্ধি পাইতেছে। রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় উভয়ই বাড়িতেছে। চতুর্থত, আধুনিককালে যুদ্ধ চালানো বা সমরোপকরণ সংগ্রহ করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধ-প্রস্তুতি, যুদ্ধ-পরিচালনা ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সকল কিছুই রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছে। পঞ্চমত, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসারের ফলে

সাধারণভাবে সর্বত্র আয়-ব্যয় বৃদ্ধির কারণ

রাষ্ট্র ক্রমশ অধিক পরিমাণে জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম করিতেছে, ফলে তাহার ব্যয়ও বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন ধরনের শিল্প বা ব্যবসায় রাষ্ট্রের হাতে থাকিলে উৎপাদন-ব্যয় কম পড়ে, উপকরণের অপচয় হয় না। এই সকল কারণে আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় ব্যয় বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ব্যয়ের পরিমাণ সম্পর্কীয় নীতি নির্ধারণ

রাষ্ট্রীয় ব্যয় কতটা কিরূপ হওয়া উচিত তাহার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই, অর্থনৈতিক নীতি এবং জনসাধারণের ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুযায়ী ইহার পরিমাণ ধার্য করা উচিত। তবে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, জাতীয় ও ব্যক্তিগত আয়ের উপর ইহার গভীর প্রভাব থাকায় এইসকল বিষয়কে আকাঙ্ক্ষিত স্তরে আনিবার উপযোগী পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা উচিত।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Public Expenditure)

বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে শ্রেণীবিভক্ত করা হইয়াছে। যেমন :

(১) প্রথমত, রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে (ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যয় বা কেন্দ্রীয় ব্যয়, (খ) রাজ্যের ব্যয় বা প্রাদেশিক ব্যয়, এবং (গ) স্থানীয় ব্যয় বা স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যয়—প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে।

(২) দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে দান (grants) বা ক্রয়মূল্য (Purchase Price)—এইরূপ ভাবে বিভক্ত করা চলে। যে সকল ব্যয়ের দরুন রাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ কোন দ্রব্য পায় না তাহাদের দান বলে, কিন্তু কোন দ্রব্য বা কার্যাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যে ব্যয় করে, তাহাকে ক্রয়মূল্য বলা হয়।

(৩) তৃতীয়ত, যে সকল ব্যয়ের ফলে দেশের সম্পদ-সম্ভার বৃদ্ধি পায় তাহাকে উৎপাদনশীল (Productive) ব্যয় বলা যায়, যাহাদের ফলে কোনরূপ সম্পদ সম্ভার বর্ধিত হয় না, তাহাদের অনুৎপাদক (Unproductive) ব্যয় বলা হয়।

(৪) চতুর্থত, ডাল্টনের মতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে দুইভাগে বিভক্ত করা যায় : (ক) বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার হাত হইতে দেশকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয়, এবং (খ) সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যয়।

(৫) পঞ্চমত, আসল-ব্যয় (Real-Expenditure) এবং হস্তান্তর-ব্যয়

(Transfer-Expenditure)—এই দুই শ্রেণীতেও ইহাকে বিভক্ত করা চলে। যে সকল ব্যয়ের ফলে সমাজের উপকরণ বা সম্পদসমূহের ব্যবহার হয়, তাহাদের আসল-ব্যয় বলে, যেমন যুদ্ধ বা দ্রব্যোৎপাদন প্রভৃতি। কিন্তু যে সকল ব্যয়ের ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বা ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ হস্তান্তরিত হয় মাত্র, যেমন আভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধ বা সুদ প্রদান প্রভৃতি—তাহাদের হস্তান্তর-ব্যয় বলা হয়।

(৬) ষষ্ঠত, প্লেহ্‌নের মতে জনসাধারণের পক্ষে কতটা কল্যাণকর, ইহা বিচার করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে চারি ভাগে ভাগ করা সম্ভব।

(ক) যে সকল ব্যয় সকল নাগরিকের পক্ষে সমান কল্যাণকর, যেমন পুলিস, সৈন্যবাহিনী, প্রভৃতি (খ) যাহা কোন কোন শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ কল্যাণকারী, কিন্তু সামগ্রিক ভাবেও কল্যাণকর বলিয়া বিবেচ্য, যেমন সমাজবীমা প্রভৃতির জন্য ব্যয়। (গ) যাহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকারী এবং সকলের পক্ষে কল্যাণকর, যেমন বিচার বিভাগের জন্য ব্যয়। (ঘ) যাহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর, যেমন সরকারী চাকরিতে বা সরকারী শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য ব্যয়।

সরকারী ব্যয় ও জাতীয় আয় (Public Expenditure and National Income):

সরকারী ব্যয় সম্পর্কে রাষ্ট্রের নীতি কি হওয়া উচিত তাহা সঠিক বিচার করিতে হইলে জাতীয় আয় নির্ধারণকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। জাতীয় আয় বলিতে আমরা কি বুঝি? ইহা হইল দেশের সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য অথবা সকল উপাদানের আয়ের সমান। এই দুইটির যোগফল পরস্পর সমান হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন 1 বৎসরের মধ্যে, দেশে সকল ভোগদ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের মূল্য যোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। এই সকল দ্রব্যের মূল্য পাওয়া যায় মোট বিক্রয় হইতে, অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে দেশের লোকের মোট ব্যয় যোগ করিলে জাতীয় আয়ের সমান হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাতীয় ব্যয় ও জাতীয় আয় সমান।

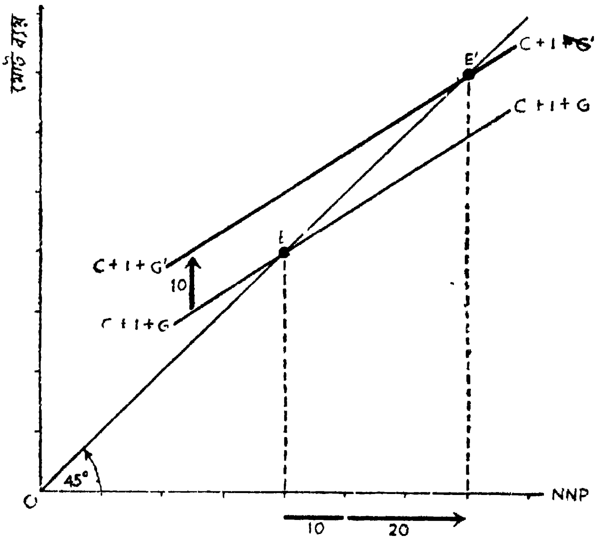
কি কি বিষয় লইয়া জাতীয় আয় গঠিত

জাতীয় ব্যয়ের তিনটি অংশ :—(১) ব্যক্তিগত ভোগব্যয় (C),(২) ব্যক্তিগত বিনিময় ব্যয় (I) এবং, (৩) সরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় (G)। দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিতে হইলে এই সামগ্রিক ব্যয় এত বেশি হইতে হইবে যাহাতে অনিয়োজিত উপকরণসমূহের পূর্ণ নিয়োগ ঘটিতে পারে। সাধারণত অপরিকল্পিত ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে এইরূপ কোন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি নাই যাহাতে সামগ্রিক ব্যয় সর্বদা আপনা-আপনি এই স্তরে বজায় থাকে।

ইহার মধ্যে সরকারী ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ

সামগ্রিক ব্যয়ের বিভিন্ন অংশ আলোচনা করা যাউক। ভোগব্যয় নির্ভর করে আয়স্তর ও ভোগপ্রবণতার উপরে। সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব ভোগপ্রবণতা পৃথক হইলেও সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে, আয় ও ভোগের মধ্যে কার্যকারণগত এক ধরনের সম্পর্ক আছে। ভোগ হইল আয়ের ক্রমবর্ধমান অপেক্ষক (increasing function of income), যদিও আয় বৃদ্ধির তুলনায় ইহাতে বৃদ্ধি হয় কম। আয়ের যে অংশ ব্যয় হইল না তাহা সঞ্চয় হয়। কিন্তু সঞ্চয় হইলেই উহার বিনিয়োগ হয় না, কারণ বিনিয়োগ নির্ভর করে উদ্যোক্তাদের মুনাফার প্রত্যাশার উপর। দেশে মোট সঞ্চয়ের একটি অংশ যদি বিনিয়োগ না হয়, তবে আয়স্তর কমিয়া যাইতে বাধ্য। কালক্রম বা ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণের (Period or Sequence analysis) সাহায্যে এই বিষয়টি আরও ভালভাবে বোঝা যাইতে পারে। মনে কর I কালস্তরে সমাজের মোট আয় হইল 10000 টাকা : এই সময়ের মধ্যেই 6000 টাকার ভোগব্যয় এবং 4000 টাকা সঞ্চয় হইতেছে। মনে কর, এই সময়ে দেশের সকল উদ্যোক্তা মিলিয়া 2000 টাকা বিনিয়োগ ব্যয় করিতেছে। ফলে পরবর্তী কালস্তরে অর্থাৎ II-তে, সমাজের আয় হইবে 8000 টাকা। পূর্ববর্তী কালস্তরে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ কম হওয়ায় পরবর্তী কালস্তরে সামগ্রিক আয় হ্রাস পাইল, কিছু পরিমাণ সঞ্চয় মজুত করার (hoarding) ফলে এই অবস্থা দেখা দিয়াছে। সুতরাং I কালস্তরের আয় হইতে যতটুকু ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় হইতেছে তাহাই সৃষ্টি করে II কালস্তরের আয়। I কালস্তরে সমাজের ব্যয়স্রোতে যদি নূতন টাকা ঢালিয়া দেওয়া হয় (injection of new money) বা মজুত-পরিত্যাগ (dishoarding) শুরু হয়, তবে II কালস্তরে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। এই বিশ্লেষণ হইতে

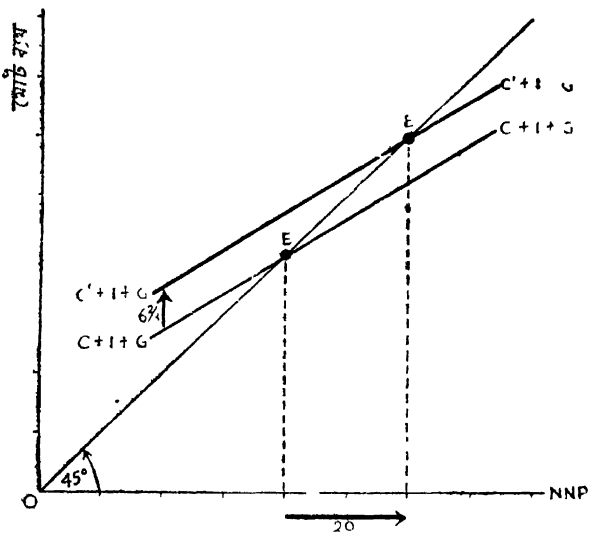
সহজেই বলিতে পারা যায় যে, সরকারী ব্যয়ের প্রভাবে সমাজের আয়-স্রোত প্রভাবিত হয়, মোট ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল এই সরকারী ব্যয় বা G। নিচের ছবিতে দেখা যাইতেছে যে C+I+G হইতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অর্থাৎ C+I+G′-এর ফলে জাতীয় আয়ের স্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে।



পূর্ণকর্মসংস্থানে পৌছিবার উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় G হইতে বাড়িয়া G′ হওয়ায় জাতীয় আয়ব্যয় ও কর্মসংস্থানের স্তর বাড়িয়া গিয়াছে, E হইতে E′ হইয়াছে। জাতীয় আয়ে এই বৃদ্ধি সম্ভবপর হইতে পারে যদি সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অথবা অন্য কোন কারণে এই সময়ে ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়, অর্থাৎ C এবং I কমিয়া না যায়।

এইরূপে জাতীয় আয়ের উপর কর-হ্রাসের ফলাফলও আমরা পর পৃষ্ঠার চিত্রে দেখিতে পাইতেছি। কর-হ্রাসের ফলে ক্রেতাদের হাতে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বেশি থাকে; ফলে C+I+G-র মধ্যে C বাড়িয়া যায়। নূতন C′+I+G-র ফলে সমাজের মোট ব্যয় এখন E হইতে E′ বিন্দুতে উঠিয়া গিয়াছে। এই চিত্র দুইটি হইতে দেখা যাইতেছে যে, সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফল কর-হ্রাসের ফলের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী।

ইহার কারণ হইল, কর-হ্রাসের ফলে যে আয় বাঁচিয়া যায়, তাহার কিছু অংশ ব্যক্তি সঞ্চয় করে।



যেমন প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা $\frac{2}{3}$ অবস্থায় 10 কর হ্রাস হইলে C বৃদ্ধি পাইবে $\frac{2}{3} \times 10 = 6\frac{2}{3}$। মনে রাখা দরকার, কর হ্রাসের ফলে সরকারী আয় কমিলেও তাহার ব্যয় সমান আছে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

তিনটি উৎস হইতে সরকার তাহার ব্যয় বাড়াইবার জন্য টাকা সংগ্রহ করিতে পারে: (১) চল্‌তি আয়, (২) পুরানো মজুত, (৩) টাকা তৈয়ারী করা। সরকার যদি চল্‌তি আয়ের উপর কর আরোপ করিয়া টাকা তোলে, তবে উহার ব্যয়ে জাতীয় আয় বাড়িবে কি না তাহা নির্ভর করে যাহারা ঐ কর দিল তাহারা সেই টাকা লইয়া কি করিত তাহার উপর। যদি সেই কর-উত্তোলন সমাজে ব্যক্তিগত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় সংকুচিত করে, তবে জাতীয় আয় পূর্বাপেক্ষা বাড়িতে পারে না। ঋণের সাহায্যেও যদি সরকার এইরূপ টাকা তুলিয়া লয়, তাহা হইলেও ইহার ফল একই দাঁড়াইবে। যদি অবশ্য জাতীয় আয়ের যে অংশ মজুত (hoarded) হইত, সেই অংশ হইতে সরকার টাকাটা তুলিয়া লয়, তবে সরকারী ব্যয় বাড়িলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। সর্বোপরি, যদি নূতন টাকা সৃষ্টির দ্বারা সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি

এই ব্যয়ের প্রভাব নির্ভর করে কিরূপে সরকারী আয় হইল তাহার উপর

ঘটানো হয়, তবে অন্যান্য সকল কিছু সমান অবস্থায়, জাতীয় আয় নিশ্চয় প্রসারিত হইবে।

সরকারী ব্যয়ের ফলে জাতীয় আয় কতখানি বাড়িবে তাহা নির্ভর করে গুণক ও ত্বরকের আয়তনের উপর। সরকারী ব্যয় একবার বাড়াইলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্তী স্তরসমূহে উহার প্রভাব ভোগব্যয় ও উদ্ভূত বিনিয়োগ ব্যয়ের মাধ্যমে প্রসারিত হইতে থাকে। শেষ স্তর পর্যন্ত জাতীয় আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের যে পূর্ণ প্রভাব দাঁড়াইবে তাহাকে বলে চাপ-লব্ধ বা ভার-লব্ধ প্রভাব (Leverage effect)।

গুণক ও ত্বরণের দরুন মোট চাপলব্ধ প্রভাব

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলাফল (Effects of Public Expenditure)

(ক) উৎপাদন (Production) :

ডালটনের মতে উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাব তিন দিক হইতে বিচার করা যাইতে পারে : কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা (Ability to work and save), কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা (Desire to work and save), এবং সম্পদ ও উপকরণসমূহের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন (Diversion of economic resources)। যে সকল ব্যয়ের ফলে জনসাধারণের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়া যায়, যেমন শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য ব্যয়, তাহারা লোকের কর্মোদ্যম বাড়াইতে সাহায্য করে। আয় বৃদ্ধি পায়, সঞ্চয়ের ক্ষমতাও বাড়ে। আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের একাংশ জনসাধারণকে সাহায্য, বেকারভাতা, বৃদ্ধ বয়সে পেন্‌শন্ ইত্যাদি হিসাবে দেওয়া হয়। ডালটনের মতে ইহার অর্থনৈতিক ফলাফল অশুভ, কারণ ইহা কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহাকে কমাইয়া দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র নিজেই শিল্প প্রতিষ্ঠা করে বা অর্থ-সাহায্য করিয়া বিশেষ ধরনের শিল্প স্থাপনে সহায়তা করে। এইরূপ ব্যয়ের ফলে উৎপাদন-উপকরণসমূহ এক ব্যবহার হইতে সরিয়া আসিয়া অপর ব্যবহারে নিযুক্ত হইতে থাকে, উহাদের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন ঘটে। এইরূপ দিক্-পরিবর্তনের ফলে যদি মোট উৎপাদন ও জাতীয় আয় এবং উপাদানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় ফল অর্থনৈতিক বিচারে সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর বলিয়া বিবেচ্য।

(ক) কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা
(খ) কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা
(গ) উপকরণের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন

(খ) বণ্টন (Distribution) :

এমনভাবে সরকারী ব্যয় করা সম্ভব যাহার ফলে সমাজে আয়বৈষম্য কমাইয়া ফেলা যায়। যেমন ধনীদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেকারভাতা, বৃদ্ধ বয়সে পেন্‌শন্, বিনাব্যয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ব্যয় করিলে আয়-বৈষম্য কিছুটা কমে। ডালটনের মতে, এইরূপ উদ্দেশ্যে ব্যয় প্রগতিমূলক (Progressive) নীতিতে করা দরকার অর্থাৎ ব্যক্তি যত অধিক গরীব হইবে তত অধিক হারে রাষ্ট্রের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইবে। সরকারী ব্যয়ের সাহায্যে আয়-বৈষম্য কমাইয়া মোটামুটি বণ্টন-সাম্য আনিবার এই নীতির উৎপাদনের উপর প্রভাব অর্থনৈতিক দিক হইতে শুভকর নাও হইতে পারে। ধনীদের উপর অধিকহারে কর বসাইলে তাহাদের কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিয়া যাওয়া, অপরদিকে গরীবদের মধ্যে আলস্য বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা কমিয়া যাওয়া—উভয় প্রকার প্রভাবই ঘটিতে পারে।

বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ধন-বণ্টন

(গ) কর্মসংস্থান ও আয় (Employment and Income) :

সমাজে মোট কর্মসংস্থান ও আয়ের স্তর মোট ব্যয়ের পরিমাণের দ্বারা স্থির হয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় মোট ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ। সমাজে ব্যক্তিদের মোটভোগ ব্যয় বা বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়া গেলে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা সুতরাং এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়াইয়া কর্মসংস্থান ও আয়স্তরে হ্রাস ঠেকানো যাইতে পারে। বাণিজ্য-চক্রের সমৃদ্ধির যুগে যখন অত্যধিক ব্যবসায়স্ফীতি ঘটে, তখন রাষ্ট্রীয় ব্যয় হ্রাস করিলে দামস্তরে ও বাণিজ্যে অস্বাভাবিক স্ফীতি কমিতে পারে, বাণিজ্য চক্রের সংকটের যুগে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে বৃদ্ধি দামস্তরে ও বাণিজ্যে উন্নতির সহায়ক হইতে পারে। সমাজে পূর্ণকর্মসংস্থান না থাকিলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়াইয়া অপূর্ণ-কর্মসংস্থান স্তর হইতে ক্রমোন্নতির পথ প্রশস্ত করা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে। উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রেই অবশ্য এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যয়-বৃদ্ধির ফলে যদি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে মোট কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বাড়িবে না, উপাদানসমূহের নিয়োগে দিক্-পরিবর্তন হইবে মাত্র।

অপূর্ণকর্মসংস্থান থাকিলে বণিজ্য চক্রের সংকট কালের বা সংকট প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ব্যবহার

ইহাও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে,রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে কি পরিমাণে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহা নির্ভর করে গুণক ও ত্বরকের (Multiplier and Acceleration) আয়তনের উপর।

পূরণকারী ব্যয় (Compensatory Spending) :

যখন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় তখন রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের দ্বারা সেই ফাঁক পূরণ করিতে পারিলে সমাজে সর্বাধিক জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বজায় রাখা চলে। বাণিজ্য সংকটের যুগে যখন ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় কম, তখন রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হয়; বাণিজ্যোন্নতি (recovery) শুরু হইলে ক্রমশ অধিক পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হয়, চরম-উন্নতির (doom) কাছাকাছি আসিয়া পড়িলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় খুবই কমাইয়া দিতে হয়। পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের পরে মুদ্রাস্ফীতির যুগে এমন কি ঋণাত্মক রাষ্ট্রীয়-ব্যয় (negative public spending) করিতে হয়, অর্থাৎ ব্যয় খুবই কম করিয়া ঋণ বা করের সাহায্যে অধিক আয় তুলিয়া বাজেটে উদ্বৃত্ত করিতে হয়।

দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান কমিতে থাকিলে এবং বাণিজ্যসংকট গভীরতর হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত ব্যয়ধারা সংকুচিত হইতে থাকে; রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজের ব্যয়স্রোতে অধিক টাকা সঞ্চালিত করা। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র অধিক ব্যয় করিতে থাকিবে। জনসাধারণের মজুত-প্রবণতা (propensity to hoard) বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংকোচনশীল (contractionary) প্রভাবসমূহকে দূর করিয়া প্রসারণশীল (expansionary) প্রভাবসমূহকে শক্তিশালী করাই এই প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের উদ্দেশ্য। এইরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ সাধারণত খুবই বেশি হওয়া দরকার, কারণ দেখা যায় যে, সংকটের সময়ে ব্যক্তির ভোগপ্রবণতা স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় আরও কম থাকে, ফলে সমাজের মোট ভোগব্যয়ও কম হয়।

দামস্তর, আয়স্তর ও কর্মসংস্থানের স্তর কমিতে থাকলে

পূরণমূলক ব্যয় সাধারণত ঘাটতি ব্যয়, কারণ কর-বৃদ্ধির দ্বারা অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে ব্যক্তির হাত হইতে আরও অর্থ সরাইয়া আনা হইবে, ব্যক্তিক্ষেত্রে ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয় আরও কমিয়া যাইবে। অবশ্য করের সাহায্যে লুকানো মজুত অর্থ আদায় করিতে পারিলে এরূপ কিছু ঘটিবে না। যে অর্থ ব্যক্তির হাতে থাকিলে ভোগে বা বিনিয়োগে নিযুক্ত হইতে পারিত তাহা

করের দ্বারা রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া আনিয়া ব্যয় করিলে উহার প্রসারশীল প্রভাব (expansionary effects) অনেক কম হইবে। শুধু তাহাই নহে। রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে সর্বাধিক প্রসারশীল প্রভাব পাইতে হইলে এরূপভাবে উহা ব্যয় করা দরকার যে, যাহাদের হাতে সেই ব্যয় ব্যক্তিগত আয় হিসাবে যাইবে তাহারা উহা মজুত না করিয়া পুনরায় ব্যয়ে প্রবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ, এরূপ ভাবেই রাষ্ট্রীয় ব্যয় হওয়া দরকার যে, সমাজে যে-শ্রেণীর লোকের ভোগপ্রবণতা সর্বাধিক তাহাদের হাতেই উহা আয় হিসাবে চলিয়া যায়।

দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিলে এবং সমাজ চরমসমৃদ্ধির (doom) দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত ব্যয়ধারা বিস্তৃত ও প্রশস্ত হইতে থাকে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজের ব্যয়স্রোত হইতে ক্রমশ অধিক পরিমাণে অর্থ তুলিয়া লওয়া। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ব্যয়-সংকোচন করিতে থাকিবে। ব্যক্তি-ক্ষেত্রে ব্যয় যত বাড়িতে থাকিবে, রাষ্ট্র নিজের ব্যয় তত কমাইবে। যে পর্যন্ত উপাদানের পূর্ণনিয়োগ না ঘটে সেই পর্যন্ত কিছু পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে থাকিবে। পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরের কিছু পূর্ব হইতেই এইরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের সংকোচন প্রয়োজন হইবে; যদি সেই স্তরের পরেও অর্থনৈতিক কাজকর্ম প্রসার লাভ করিতে থাকে তাহা হইলে ঋণাত্মক রাষ্ট্রীয় ব্যয় করিতে হইতে পারে অর্থাৎ করবৃদ্ধির দ্বারা ব্যয়ের তুলনায় আয়াধিক্য সৃষ্টি করার প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতিমূলক প্রসার রোধ করিবার উদ্দেশ্যে বাজেটে উদ্বৃত্ত করিতে হইবে।

দামস্তর, আয়স্তর ও কর্মসংস্থানের স্তর বাড়িতে থাকিলে

আধুনিককালের ধনবিজ্ঞানীরা পূরণমূলক ব্যয়ের সঙ্গে পাম্প-প্রাইমিং ব্যয়ের (Pump-priming expenditure) বা উত্তোলন-মূলক ব্যয়ে পার্থক্য করিয়া থাকেন। পূরণমূলক ব্যয় বলিলে বোঝা যায় পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের তুলনায় দেশের সামগ্রিক ব্যয় যতখানি কম থাকে সেই ফাঁকটুকু সরকারী ব্যয় দ্বারা পূরণ করা। আর, পাম্প-প্রাইমিং ব্যয় বলিলে বোঝা যায় অবনতি বা সংকটের সময়ে সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে এমন পরিমাণ টাকা একবার চালিয়া দেওয়া যাহার ফলে, আর কোন সরকারী ব্যয় না করিলেও, অবনতি বা সংকটের মোড় ঘুরিয়া দেশে উন্নতির যাত্রা শুরু হইতে পারে। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের নিরাশার মনোভাবে পরিবর্তন আনিয়া আশার সঞ্চার করাই প্রকৃতপক্ষে এই পাম্পিং-ব্যয়ের কাজ, কারণ একমাত্র তাহা হইলেই একবারের

সরকারী ব্যয় দেশে উন্নয়নের নিজস্ব গতিবেগ সৃষ্টি করিতে পারে। পূরণমূলক ব্যয়ের এইরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকে বলিয়া ধরা হয় না। অবশ্য ইহা ঠিক যে, প্রকৃতপক্ষে, পূরণমূলক ব্যয়ের পাম্প-প্রাইমিং প্রভাব দেখা যায়, আবার পাম্প-প্রাইমিং ব্যয় কিছুটা পূরণমূলক বটে। কিন্তু ইহাদের কার্যপদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বাস্তবে কখনই পাম্প-প্রাইমিং নীতি বিশেষ কার্যকরী হয় না; অবনতির গহ্বর হইতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে টানিয়া তুলিতে হইলে পূরণমূলক ব্যয়ের নীতিরই অধিকতর সাফল্য লাভের সম্ভাবনা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

অনুশীলনী

1. What is public finance? Is there any essential difference between private finance and public finance?

2. "The basic principles of public finance are the same as those of a family budget." Explain.

3. What are the objectives of public finance in a modern state?

4. What is Functional Finance?

5 What are the causes of increase in Public Expenditure in recent years?

6. Classify Public Expenditure.

7. Discuss how Public expenditure influences National income.

8. What are the effects of Public Expenditure on (*a*) Production, (*b*) Distribution, and (*c*) Employment and Income.

9. What is Compensatory Spending? What are its limitations?

10 Under what circumstances would it be desirable to resort to deficit financing? Can you suggest any safeguards to ensure that it does not produce any adverse effect?

11. What are the principles which should guide public expenditure?

* Pump-priming means a volume of public spending, for the purpose of setting the economy on the way towards full utilisation of resources on its own power without further aid from governmental spending......Pump. priming is intended to be a remedy for a temporary maladjustment which prevents the society from functioning in a normal manner so as to recover from depression when the economy needs to be shaved off from dead-centre...The concept of pump priming is different from 'compensation' in that the latter connotes no implications with respect to setting the system going on its own momentum. The latter concept, strictly conceived, implies merely that public expenditures may be used to compensate for the decline in private investment. It may be said to be successful even though it succeeds in achieving a rise in the national income no greaetr than the volume of expenditures made. Hansen, ***Fiscal policy and Business cycles,*** **ch. 12.**

১৫

সরকারী আয় ও করনীতি

Public Revenue and Taxation

রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎসসমূহ (Sources of Public Revenue) ঃ

আধুনিক যুগের রাষ্ট্রসমূহের ব্যয় বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা নিত্য নূতন আয়ের উৎস খুঁজিয়া বাহির করিতেছে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে রাষ্ট্রীয় আয়ের চারিপ্রকার উৎস আছে ঃ (ক) কর, (খ) দান ও সাহায্য, (গ) শাসন-তান্ত্রিক আদায়সমূহ, এবং (ঘ) বাণিজ্যিক আদায়সমূহ।

কোন প্রত্যক্ষ উপকারিতা আশা না করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে ব্যক্তি রাষ্ট্রকে যে অর্থ দিয়া থাকেন, তাহাকে কর বলে। আইনের দ্বারা বাধ্যতা-মূলকভাবে এই কর আদায় করা হয় এবং এই করের বিনিময়ে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে সমপরিমাণ কোন সুবিধা ব্যক্তি লাভ করে না।

অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অন্যান্য সূত্র হইতে সাহায্য পায় যেমন, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাদেশিক সরকারসমূহ আর্থিক সাহায্য পায়। কোন দাতা নির্দিষ্ট কোন কার্যে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে সরকারকে দান হিসাবে কিছু অর্থ দিয়া যাইতে পারেন, এরূপ ভাবেও রাষ্ট্রের আয় হইতে পারে। এইরূপ সাহায্য বা দান উভয়ই দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

শাসনতান্ত্রিক আদায়সমূহ বলিলে বোঝা যায় কী, লাইসেন্স প্রভৃতি পাইবার জন্য প্রদেয় অর্থ, জরিমানা, বাজেয়াপ্ত জমা, এবং বিশেষ আদায়সমূহ। সাধারণত এই সকল শাসনতান্ত্রিক আদায়গুলি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং ইহার বিনিময়ে কোন কোন উপকার পাওয়া যায়। অবশ্য উপকারের পরিমাণের সহিত প্রদেয় অর্থের পরিমাণের কোন সম্পর্ক থাকে না।

বাণিজ্যিক আদায়সমূহ বলিলে রাষ্ট্র যে সকল দ্রব্য বা কার্য বিক্রয় করে তাহাদের জন্য দানসমূহকে বোঝা যায়। নির্দিষ্ট দ্রব্য বা নির্দিষ্ট কার্যের বিনিময়ে রাষ্ট্র ব্যক্তিদের নিকট হইতে যে দাম পায় তাহাই বাণিজ্যিক আদায়। অবশ্য উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী ফার্মের ক্ষেত্রে যেরূপ গড় বা প্রান্তিক ব্যয় অনুযায়ী দাম নিরূপিত হয়, সরকারী দ্রব্যাদির দাম সেইরূপ হিসাবে নির্ধারিত

নাও হইতে পারে, রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়া দাম নির্ধারিত হইতে পারে। অথবা, উহাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একচেটিয় অধিকার থাকায় একচেটিয়াসুলভ মুনাফা দামের সহিত যুক্ত থাকিতে পারে।

মনে রাখা দরকার যে, এখন পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কর হইতে আদায়ের পরিমাণ অন্যান্য উৎস হইতে আদায়ের তুলনায় বেশি। কিন্তু ক্রমশ শাসনতান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক আদায়সমূহ হইতে রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইবার দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে। অবশ্য এইরূপে রাজস্বের সকল উৎসকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। যদি রাষ্ট্রীয় দ্রব্যের বা কার্যের দাম উহার উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হারে ধার্য করা হয়, তাহা হইলে কার্যত উহা করের পর্যায়ভুক্ত হইল। আবার অনেক রাষ্ট্রীয় কার্যের জন্য ব্যয় করা হয় কিছুটা দাম এবং কিছুটা কর হইতে, যেমন সরকারী কলেজের ছাত্রগণ মাহিনাও দেন এবং আদায়কৃত কর হইতেও তাহাদের জন্য ব্যয় করা হয়।

কর-কানুন (Canons of Taxation)

কর-কর্তৃপক্ষ যে সকল কানুন মানিয়া চলিয়া কর আরোপ করিবে ও আদায় করিবে, তাহাদের কর-কানুন বলা হয়। অ্যাডাম্ স্মিথ চারিটি কর-কানুনের কথা বলিয়াছেন।

প্রথমত, কর প্রদান-ক্ষমতা বা সমতার কানুন। প্রত্যেক দেশের প্রজাগণ সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য তাহাদের প্রত্যেকের কর-প্রদান-ক্ষমতা অনুযায়ী কর দিবে ইহাই প্রথম কানুন। অ্যাডম্ স্মিথের মতে,-প্রদান ক্ষমতা অনুযায়ী কর দিলেই সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে ত্যাগ-স্বীকারের সমতা সাধিত হইবে। এইরূপ ঘটিলে ব্যক্তিগত ভাবে সকল করদাতার আসল ভার (Real burden) এবং সমাজের সামগ্রিক কর-ভার সর্বাপেক্ষা কম থাকিবে।

সমতার কানুন

দ্বিতীয়ত, নিশ্চয়তার কানুন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে যে কর দিতে হইবে তাহার প্রদানকাল, পরিমাণ প্রভৃতি নিশ্চিত থাকা দরকার। অ্যাডাম্ স্মিথের মতে সমতার কানুন হইতেও নিশ্চয়তার কানুন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। করের পরিমাণ ও প্রদানকাল সম্পূর্ণ নিশ্চিত না থাকিলে করদাতাকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়,

নিশ্চয়তার কানুন

ঘুষ এবং অব্যবস্থা বৃদ্ধি পায়, সরকারী বাজেট-গঠনও বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

তৃতীয়ত, সুবিধার কানুন। প্রত্যেক কর এরূপভাবে ও এরূপ সময়ে আরোপিত হওয়া উচিত যাহাতে করদাতাদের বিশেষ সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। এই কানুনের অর্থ হইল করদাতাদের অসুবিধা যেন সর্বাপেক্ষা কম হয়; যখন

সুবিধার কানুন

যেভাবে কর দেওয়া তাহার পক্ষে সর্বাধিক সুবিধাজনক, যেন ঠিক সেই সময়ে ও সেই ভাবেই কর আদায় করা হয়। যেমন চাষীর নিকট হইতে কর আদায় ফসল উঠিবার পরে করা উচিত, তাহার পূর্বে নহে।

চতুর্থত, ব্যয়-সংকোচের কানুন। প্রত্যেক কর এরূপ হইবে যেন ইহা হইতে রাষ্ট্রের যে আয় হয় তাহার তুলনায় এই কর আদায়ের ব্যয় খুব কম

কম ব্যয়ে রাজস্ব-সংগ্রহের কানুন

পড়ে। যদি কর হইতে যে রাজস্ব আদায় হয় তাহা সম্পূর্ণ পরিমাণে উহা আদায় করিবার জন্যই ব্যয়িত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই কর অর্থনৈতিক বিচারে আরোপযোগ্য নহে। উপরন্তু ব্যয়সংকোচ কথাটিকে সংকীর্ণ শাসনতান্ত্রিক অর্থে গ্রহণ না করিলে বলা চলে যে, ইহা লক্ষ্য রাখা দরকার যেন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর কর-আরোপের ফলাফল সামগ্রিক ভাবে ক্ষতিকারক না হয়।

কর-কানুনসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রথম কানুন হইতে অন্যান্য তিনটি কানুন পৃথক, কারণ প্রথমটি করনীতি সংক্রান্ত এবং অপর তিনটি কর-আদায় পদ্ধতি সংক্রান্ত।

প্রথম কানুন অর্থাৎ করপ্রদান ক্ষমতা বা সমতার কানুন সম্বন্ধে বলা চলে, ইহা যথেষ্ট অস্পষ্ট ধরনের; কিছুটা নৈতিক এবং কিছুটা অর্থনৈতিক বিবেচনার

কানুনসমূহের সমালোচনা

উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই কানুনটির অস্পষ্টতার আরও কারণ হইল করপ্রদান-ক্ষমতা পরিমাপের কোন বাস্তব মানদণ্ডের উল্লেখ ইহাতে নাই। আরও অসুবিধা হইল, সমানুপাতিক হার বা ক্রমবর্ধমান হার, কোন নীতি গ্রহণ করা উচিত এবং কি পদ্ধতি অনুযায়ী সকলের ত্যাগ স্বীকার সমান করিতে পারা যায়, তাহার সুস্পষ্ট বিচার ইহা হইতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য কানুনগুলিও অত্যন্ত সাধারণ ধরনের; উহারা শাসনতান্ত্রিক সমস্যা মাত্র, অর্থনৈতিক আলোচনার দিক হইতে গুরুত্বহীন।

পরবর্তী কালের ধনবিজ্ঞানিগণ উপরোক্ত কানুনসমূহের সহিত আরও দুইটি নূতন কানুন যোগ করিয়াছেন, তাহারা হইল (ক) উৎপাদনশীলতা, ও (খ) স্থিতিস্থাপকতা। করসমূহ উৎপাদনশীল হইবে, অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কর হইতে অধিকতর রাজস্ব আদায় হইতে থাকিবে (যেমন দ্রব্যাদির উপর কর বসাইলে জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে অধিকতর রাজস্ব আদায় হইতে থাকে)। ইহাই উৎপাদনশীলতার কানুন। স্থিতিস্থাপকতার কানুন হইল, রাষ্ট্রের বা দেশের প্রয়োজনে সেই কর হইতে অধিক আয় করা চলে বা আয় কমাইয়া দেওয়া চলে। কর-কাঠামোর এই নমনীয়তা আধুনিক কালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ বাণিজ্যচক্রকালীন বা উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এইরূপ নমনীয়তা বিশেষ প্রয়োজন।

উৎপাদনশীলতা ও স্থিতিস্থাপকতার কানুন

করসংক্রান্ত নীতিসমূহ (Principles of Taxation) :

যে নীতিসমূহ মানিয়া লইয়া রাষ্ট্র জনসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় করে, অর্থাৎ কর-কাঠামো গঠন করার পিছনে যে নীতিসমূহ প্রচলিত থাকে, তাহাদের করসংক্রান্ত নীতি বলা হয়। প্রধান নীতিগুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

(ক) উপকারিতা তত্ত্ব (The Benefit theory) :

এই নীতি অনুযায়ী, রাষ্ট্রের আওতায় ব্যক্তি যতখানি সুবিধা লাভ করে তাহার করের পরিমাণ সেই অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রের নিকট হইতে ব্যক্তি যত বেশি সুবিধা লাভ করিবে তত বেশি কর তাহাকে দিতে হইবে।

কর আরোপ করার নীতি হিসাবে ইহা মোটেই গ্রহণ যোগ্য নহে। রাষ্ট্র যে সাধারণ সুবিধাগুলি সকলকে দেয়, তাহারই জন্য কর দেওয়া হয়, কোন বিশেষ সুবিধার জন্য নহে। তাহা ছাড়া, সৈন্য, পুলিস বা বিচারবিভাগ হইতে আমাদের প্রত্যেকের পৃথক সুবিধা পরিমাপের উপায় কি ? আরও বলা চলে, যদি গরীব ব্যক্তি ধনীর তুলনায় রাষ্ট্র হইতে বেশি সুবিধা পায় তাহা হইলে তাহাকে অধিক কর দিতে হইবে, ইহা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। তবে সামগ্রিক বিচারে এই তত্ত্ব গ্রহণীয়, অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে বা সকল নাগরিককে একত্রে বিচার করিলে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত মোট সুবিধা অনুযায়ী সামগ্রিক ভাবে সকলে মিলিয়া মোট কর-ভার বহন করা কর্তব্য।

(খ) কার্যের ব্যয় তত্ত্ব (The cost of service Theory) :

এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্ম বিভিন্ন প্রকার কার্যাদি সম্পন্ন করিতে রাষ্ট্রের যে ব্যয় করিতে হয়, ব্যক্তির নিকট সেই পরিমাণ কর আদায় করিয়া লওয়া উচিত।

কার্যের ব্যয় তত্ত্ব

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নীতির প্রয়োগ অবাস্তব। ডাক বিভাগের দ্রব্যাদির দাম, রেলের ভাড়া, সরকারী বাসের ভাড়া বা সরকারী কারখানা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে বটে; কিন্তু সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম রাষ্ট্রের কি-পরিমাণ ব্যয় হয় তাহার অংশ নিরূপণ করা সম্ভব নহে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বৃদ্ধ বয়সে পেনশনভোগিগণ প্রতি মাসের পেনশন তো ফেরত দিবেনই, উপরন্তু, সরকারী পেনশন দপ্তরের আংশিক ব্যয়ভারও তাঁহারা বহন করিবেন।

সমালোচনা

(গ) প্রদানক্ষমতা তত্ত্ব (Ability to Pay Theory) :

এই তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যক্তি তাহার কর প্রদানক্ষমতা অনুযায়ী রাষ্ট্রকে কর দিবেন। রাষ্ট্র সকলের স্বার্থরক্ষার জন্ম স্থাপিত সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান, সুতরাং সকলেই নিজের সাধ্যমত ইহাকে কর দিবেন—ইহাই প্রদানক্ষমতার তত্ত্ব। অ্যাডাম্ স্মিথও তাঁহার করকানুনসমূহের মধ্যে ইহাকে প্রথম স্থান দিয়াছেন। নৈতিক বা অর্থনৈতিক বিচারে ইহা সর্বোত্তম, ন্যায়সঙ্গতও বটে সুতরাং আধুনিক কালে এই তত্ত্বই গৃহীত হইয়াছে।

প্রদানক্ষমতা তত্ত্ব

কিন্তু এই তত্ত্বানুযায়ী বাস্তবে প্রয়োগগত নীতি নির্ধারণ করিবার সময়ে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়; কারণ করপ্রদান ক্ষমতা পরিমাপের কোন সঠিক ও উপযুক্ত মানদণ্ড পাওয়া যায় না।

প্রয়োগগত অসুবিধা

পূর্বে ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণকেই কর প্রদানক্ষমতার মানদণ্ড হিসাবে ধরা হইত। অধিক সম্পত্তি থাকিলে কর অধিক; সম্পত্তি কম থাকিলে কর কম। কিন্তু দেখা গেল যে, কর প্রদানক্ষমতা পরিমাপের আদর্শ মান হিসাবে সম্পত্তিকে গ্রহণ করা চলে না। অনেক ব্যক্তির প্রচুর আয় অথচ সম্পত্তি কম, তাঁহারা করের আওতায় পড়েন না; কর প্রদানক্ষমতা অধিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা কর হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

প্রদান-ক্ষমতা পরিমাপের মানদণ্ড: সম্পত্তি : সমালোচনা

এই ত্রুটি দূর করিবার জন্ত অনেকের মতে ব্যয়কে প্রদানক্ষমতার মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করা উচিত। এই মতানুসারে, যাঁহারা অধিক ব্যয় করেন, তাঁহাদের কর-প্রদানের ক্ষমতা বেশি, এইরূপ ধরিয়া লওয়া চলে। কিন্তু ইহা ঠিক নয়: কারণ ব্যক্তির পোষ্য বেশি থাকিলে বা অসুখ-বিসুখের জন্ত ব্যয় বেশি হইলে উহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে, তাহার কর-প্রদানক্ষমতা অধিক।*

ব্যক্তিগত আয়: সমালোচনা

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আধুনিক কালে আয়কেই কর-প্রদানক্ষমতা পরিমাপের সঠিক মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। সাধারণত, উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অধিক হারে কর এবং নিম্ন আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর স্বল্পহারে কর আরোপ করা হয়। বলা হয় যে, এইরূপেই সকল ব্যক্তির মধ্যে ত্যাগ স্বীকারে সমতা আনা যাইতে পারে।

ব্যক্তির আয়

কিন্তু আয়কেও সম্পূর্ণরূপে সঠিক ও নিখুঁত মানদণ্ড বলা চলে না। ব্যক্তির আর্থিক আয় তাহার কর-প্রদানক্ষমতার সঠিক পরিচায়ক নহে, কারণ, বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা পৃথক, ফলে দুই ব্যক্তির আর্থিক আয় সমান হইলেও উভয়ের কর-প্রদানক্ষমতা পৃথক হইতে পারে। তাহা ছাড়া, উভয়ের আর্থিক আয় সমান হইলেও উভয়ের প্রয়োজনীয় ব্যয়-পরিমাণে পার্থক্য থাকিতে পারে। উপরন্তু, উভয়ের ত্যাগস্বীকারে যথেষ্ট তারতম্য থাকা সম্ভব। সমান পরিমাণ আয় করিতে কাহারও অধিক পরিশ্রম করিতে হইতে পারে; কাহারও-বা কম পরিশ্রম করিতে হইতে পারে, বা কোন পরিশ্রমই না করিতে হইতে পারে।

সমালোচনা

সুতরাং ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা সঠিক নিরূপণ করিতে হইলে আয়ের সহিত আরও কয়েকটি বিষয় একত্রে বিচার ও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

* এতদ্‌সত্ত্বেও আধুনিক ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্যাল্ডরের মতে ব্যক্তিগত ব্যয়কর স্থাপন করা বৈজ্ঞানিক নীতিসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার মতে (ক) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আয় গোপন করিয়া কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে। (খ) তাহা ছাড়া, আয়ের উপর অধিক কর স্থাপন করিলে কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা কমিয়া যায়। ব্যয়ের উপর কর কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহাকে ব্যাহত করে না। (গ) তাহা ছাড়া বর্তমানের আয়-বৈষম্য কমাইতে হইলে বা সম্পদের পুনর্বণ্টন করিতে হইলে ব্যয়-কর অধিকতর উপযোগী। (ঘ) ধনীব্যক্তিগণ পুরানো মজুত সম্পদ, সম্পত্তি ও মূল্যবান অলঙ্কারাদি হইতে যথেষ্ট আয় অথবা সুখ-সুবিধা ভোগ করেন, তাহাদের কর-প্রদানক্ষমতা অধিক, অথচ ইহারা আয়করের আওতায় আসেন না। ব্যয়-কর স্থাপিত না হইলে তাঁহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে কর আদায় করা যায় না।

স্যার জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে আর্থিক আয়ের পরিমাণের সহিত আরও পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা নির্ধারণ করা দরকার। প্রথমত, কাল-বিচার (Time Test)। দেখা দরকার যে, কোন্ সময়ে ব্যক্তির আয় হইল। সাধারণত, পূর্ববর্তী বৎসরে আয়ের উপর বর্তমান কর লওয়া হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী বৎসরে লাভ হইলেও হয়তো বর্তমান বৎসরে প্রভূত লোকসান হইতেছে, সুতরাং কর দেওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। তাই যখন আয় হইল তখনই কর আরোপ করিয়া উহা আদায় করিয়া লওয়া দরকার। ইহাকেই 'আয়-করো-আর দিতে-থাকো' ব্যবস্থা (Pay-as-you earn) বলা হয়। শুধু তাহাই নহে, ইহাও দেখা দরকার ব্যক্তির ওই আয় নিয়মিত বা অনিয়মিত কি না। উপরন্তু ওই আয় পাইবার জন্য ব্যক্তি সারাবৎসর পরিশ্রম করিয়াছে, অথবা আংশিক পরিশ্রম করিয়া অবশিষ্ট কাল আলস্যে কাটাইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য রাখা দরকার। দ্বিতীয়ত, নীট-আয় বিচার (Pure-Income test); দেখা দরকার যে, সেই আয় পাইবার জন্য কিরূপ আনুষঙ্গিক ব্যয় বা যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। তৃতীয়ত, আয়ের উৎস বিচার (Income Source Test)। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সম্পত্তি বা পরিশ্রম কোন্‌টির মাধ্যমে আয় হইতেছে; সম্পত্তি হইতে আয় হইলে অধিক হারে এবং পরিশ্রম দ্বারা আয় হইলে কম হারে কর বসানো সঙ্গত। চতুর্থত, পারিবারিক অবস্থা বিচার (Domestic circumstances Test)। পরিবারে পোষ্যসংখ্যা অধিক হইলে কম হারে, এবং সংখ্যা কম হইলে অধিক হারে, কর আরোপ করা যুক্তিযুক্ত। পঞ্চমত, উদ্বৃত্ত-বিচার (Surplus-Test)। দেখিতে হইবে যে, আয়ের মধ্যে উদ্বৃত্তের অংশ কতখানি; ব্যয় করিয়া কিরূপ উদ্বৃত্ত থাকে। শুধু তাহাই নহে; নিম্নতম যোগান-দামের (Minimum Supply Price) তুলনায় ব্যক্তির আয় কত অধিক।

আয় অনুযায়ী সঠিক কর-প্রদানক্ষমতা নির্ধারণের পাঁচটি বিচার
১। কালবিচার
২। নীট-আয়বিচার
৩। আয়-উৎস বিচার
৪। পারিবারিক অবস্থা বিচার
৫। উদ্বৃত্ত-বিচার

(ঘ) অর্থ নৈতিক নীতির হাতিয়ার (Instrument of economic policy):

উপকারিতা, কার্যের ব্যয়, প্রদানক্ষমতা বা ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি বিচার না

করিয়া অনেকক্ষেত্রে ছোটখাট বহু নীতি অনুযায়ী কর ধার্য করা হয়। রাষ্ট্রের প্রধান অর্থনৈতিক নীতিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে অনেকক্ষেত্রে করনীতি রচিত হয়। যেমন, দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য, কোন দ্রব্যের ব্যবহার কমাইবার জন্য (যেমন নেশার দ্রব্যাদি), যুদ্ধের সময়ে সমরোপকরণ পাইবার জন্য, জনসাধারণের ভোগ কমাইবার উদ্দেশ্যে, প্রভৃতি নানারূপ কারণে কর আরোপ করা যাইতে পারে।

অবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী কর-নীতি নির্ধারণ

শিল্পোন্নত দেশসমূহের পূর্ণকর্মসংস্থান বা আয়-বৈষম্য কমানো

আধুনিক কালে শিল্পোন্নত দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌঁছানো, অথবা আয় বৈষম্য কমানো, ইহাই কর স্থাপনের পিছনের প্রধান নীতি। ব্যক্তির নিকট হইতে এরূপভাবে কর আদায় করিতে হইবে যাহাতে সমাজের মোট বিনিয়োগ ও সঞ্চয় না কমে এবং ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্য-চক্রের সংকটকালে কর-হার কমাইয়া অধিক অর্থ ব্যক্তিদের হাতে ভোগ বা বিনিয়োগ-ব্যয়ের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়, সমৃদ্ধির কালে কর-হার বাড়াইয়া ব্যক্তিদের হাতে ভোগ ও বিনিয়োগের জন্য অর্থ কম রাখা হয়। ভোগব্যয় বাড়াইবার জন্য ভোগ-প্রবণতা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বিক্রয় কর কমানো চলে, অথবা ধনীদের দ্বারা ব্যবহৃত দ্রব্যাদির উপর বিক্রয়-কর অধিক রাখিয়া গরীবদের দ্বারা ব্যবহৃত দ্রব্যাদির উপর বিক্রয়-কর কমাইয়া দেওয়াও সম্ভব।

অনুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক প্রসার

শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে করস্থাপনই হইল প্রধান নীতি। কিরূপভাবে করস্থাপন করিলে দ্রুত শিল্প-সম্প্রসারণ ঘটিবে বা অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি (economic growth) ত্বরান্বিত হইতে পারে তাহা বিচার করিয়া কর নিরূপণ করা হয়। অপ্রয়োজনীয় বিলাস-দ্রব্যের বা ভোগ্যদ্রব্যের ক্রয় কমাইয়া সঞ্চয়-স্পৃহা ও কর্মোদ্যম বাড়ানো, দেশে মূলধন-গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত মজুত (hoards) সরাইয়া আনিয়া সরকারী ক্ষেত্রে অধিকতর বিনিয়োগ—এই সকলই অনুন্নত দেশসমূহের কর-সংক্রান্ত প্রধান নীতিসমূহ।

করভার বণ্টন সংক্রান্ত আনুপাতিক হারের এবং ক্রমবর্ধনশীল হারের নীতি (Principles of Proportion and Progression)

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে করভারের বণ্টনসংক্রান্ত নীতি আলোচনা করিলে তিনপ্রকার নীতি দেখিতে পাওয়া যায়: আনুপাতিক, ক্রমবর্ধনশীল ও ক্রমহ্রাসমান।

আনুপাতিক, ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান

আয় যাহাই হউক না কেন, সকল আয় হইতে একটি নির্দিষ্ট হারে কর আদায় করিবার নীতি অনুসরণ করিলে তাহাকে (Proportional Tax) বলা হয়। উচ্চস্তরের আয় হইতে ক্রমশ অধিক হারে কর আদায় করিবার নীতি অনুসরণ করিলে তাহাকে ক্রমবর্ধমান কর (Progressive Tax) বলা হইয়া থাকে। অধিক আয়স্তরের ব্যক্তিদের নিকট হইতে ক্রমশ কম হারে কর আদায় করিবার নীতি অনুসৃত হইলে উহাকে বলা হয় ক্রমহ্রাসমান কর (Regressive Tax)। ইহা ক্রমবর্ধমান নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণভাবে আনুপাতিক ও ক্রমবর্ধমান-হারের নীতি দুইটিই প্রধান ও আলোচ্য।

আনুপাতিক নীতিঅনুযায়ী করস্থাপনের পদ্ধতি খুবই সরল এবং ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল আয়বণ্টনের বর্তমান ধরনে কোনরূপ পরিবর্তন না আনা। সকল ব্যক্তিই যদি তাঁহার আয় হইতে নির্দিষ্ট একই হারে কর দেন, তাহা হইলে কর আদায়ের পরেও বণ্টনের কাঠামোতে কোনরূপ পরিবর্তন আসে না। অ্যাডাম

আনুপাতিক নীতির গুণ ও দোষ

স্মিথের কর-সংক্রান্ত প্রথম কানুনে তাই এইরূপ করস্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। এই নীতির গুণ হইল ইহার সারল্য। কিন্তু নিছক প্রয়োগগত সরলতাই কর-নীতি নিরূপণের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইতে পারে না। তাহা ছাড়া ইহা সম-ত্যাগ নীতির বিরোধী। কারণ, উচ্চ আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা কম এবং নিম্ন আয়-শীল ব্যক্তির ক্ষেত্রে টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা অধিক। যেমন 100 টাকা আয়কারী ব্যক্তির নিকট 5 টাকা এবং 1000 টাকা আয়কারী ব্যক্তির নিকট 50 টাকা কর লইলে তুলনামূলকভাবে প্রথম ব্যক্তিকে অধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়।

ক্রমবর্ধনশীল কর (Progressive Taxation):

অ্যাডাম স্মিথের করকানুন সংক্রান্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার ক্ষমতা অনুযায়ী রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য কর

দিতে প্রস্তুত থাকিবে। ক্ষমতা অনুযায়ী কর দেওয়ার কথাতে স্মিথ প্রধানত সমানুপাতিক করের কথা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক কালে ক্ষমতার নীতি অনুযায়ী কর আরোপের কথা বলিতে প্রধানত ক্রমবর্ধনশীল করের কথাই বুঝায়। বর্তমান কালের সকল রাষ্ট্রই ক্রমবর্ধনশীল হারে করের নীতি মানিয়া লইয়াছেন। এই নীতির পক্ষে তত্ত্বগত দিক হইতে গুরুতর যুক্তি ততটা নাই, কিন্তু সকল দেশের জনমতের সমর্থনের উপর ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত। আয়-বৈষম্য দূর করা উচিত এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের মধ্যে দেখা যায়, আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ অধিকাংশ অধিবাসীদের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত হয় বলিয়া এই ক্রমবর্ধনশীল করনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তবুও বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিরা ইহার স্বপক্ষে যে-সকল তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে উহাদের মধ্যে কয়েকটি আলোচনা করিতে পারি।

স্বপক্ষে যুক্তি কি কি

ক্রমবর্ধনশীল করের স্বপক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির ভিত্তি হইল ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার নিয়ম। দ্রব্যসামগ্রীর মত টাকার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ব্যক্তির হাতে ইহার পরিমাণ যত বাড়িতে থাকে, টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা তত কমে। তাই কোন এক ব্যক্তির 100 টাকা আয় হইতে শেষ টাকাটি লইয়া আসিলে যে তৃপ্তি-হ্রাস হয়, উহাপেক্ষা কোন ব্যক্তির হাজার টাকা আয় হইতে শেষ টাকাটি সরাইয়া লইলে তৃপ্তি-হ্রাসের পরিমাণ কম। শুধু তাহাই নহে। 1000 টাকা আয় হইতে 10 টাকা লইলেও ত্যাগ স্বীকার সমান হয় না। 100 টাকার আয়ে 1 টাকার যেরূপ গুরুত্ব, 1000 টাকার আয়ে 10 টাকার গুরুত্ব উহাপেক্ষা কম। সুতরাং এই আয় হইতে 10 টাকার বেশি, যেমন, 50 টাকা তুলিয়া লইলে তবেই ত্যাগ-স্বীকারে সমতা দেখা দিতে পারে।

আয়ের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতা

দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক হব্‌সন একটু ভিন্নভাবে ক্রমবর্ধনশীল করনীতিকে সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের মধ্যে দুইটি অংশ দেখা যায়; ব্যয় এবং উদ্‌বৃত্ত। আয়ের মধ্যে ব্যয়ের অংশের উপর কর আরোপ করা ঠিক নয় কারণ উহাতে আয়ই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তাই সকল প্রকার করের উদ্দেশ্যই হইল আয়ের ঐ উদ্‌বৃত্ত

উদ্‌বৃত্ত

অংশটুকু হইতে কিছুটা পরিমাণ সরাইয়া আনা। হব্‌সনের মতে, আয় যত কম উহাতে ব্যয়ের অংশ বেশি; আবার আয় যত বেশি ততই তুলনা মূলকভাবে উহাতে উদ্বৃত্তের অংশ অধিক। সুতরাং ক্রমশ বেশি হারে কর আরোপ করিলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ উর্ধ্ব-আয় স্তরে আয়ের মধ্যে অধিকতর উদ্বৃত্তের অংশ হইতে সেই কর আদায় হইবে।

সামাজিক ন্যায়বিচার

তৃতীয়ত, অধ্যাপক মার্শাল ইহাকে সমর্থন করিয়াছেন বণ্টনের দিক হইতে। তাঁহার মতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সম্পদের বিপুল বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ধনীদের হাত হইতে সম্পদ সরাইয়া লইয়া দরিদ্রদের হাতে দিলে সামাজিক ন্যায় বিচার রক্ষিত হয়, রাষ্ট্রের হাতে এই ন্যায়বিচার সাধনের অন্যতম প্রধান অস্ত্র হইল ক্রমবর্ধনশীল কর।

নিম্নতম এবং সমান ত্যাগের নীতি

সর্বোপরি, অধ্যাপক পিগু এই করনীতিকে সমর্থন করিয়াছেন দুইটি তত্ত্বের সাহায্যে: সর্বনিম্ন সামগ্রিক ত্যাগের তত্ত্ব (**Least aggregate sacrifice theory**) এবং সম-ত্যাগের তত্ত্ব (**Equal sacrifice theory**)। প্রথম তত্ত্ব অনুযায়ী তিনি বলেন যে, বিশেষ একটি স্তরের উর্ধ্বে উচ্চ আয়ের সবটাই রাষ্ট্রের তুলিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু বণ্টনের দিক হইতে (**from distributional aspects**) ইহা ভাল হইলেও সঞ্চয়, কর্মোদ্যম বা উৎপাদনের দিক হইতে (**from announcemental aspects**) ইহা ক্ষতিকারক। তাই এই দুই বিরোধী অবস্থার চাপে, মধ্যপন্থা হিসাবে, ক্রমবর্ধনশীল করনীতি সমর্থনের যোগ্য। দ্বিতীয় তত্ত্ব, অর্থাৎ সমত্যাগের নীতি অনুযায়ী তিনি বলেন যে, কোন ব্যক্তির নিকট নিজের টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির হাতে আয়ের মোট পরিমাণ দ্বারা প্রভাবিত হয় না, অন্য লোকের হাতে আয়ের পরিমাণের উপরও তাহা অনেকটা নির্ভর করে। সুতরাং ক্রমবর্ধনশীল করের সাহায্যে মোটামুটি আয়ে সমতা আনার চেষ্টা করা দরকার।

এই সকল যুক্তির ত্রুটি কোথায়

উপরের এই সকল প্রতিটি যুক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনা করা সম্ভবপর। আজকালকার ধনবিজ্ঞানীরা টাকার ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার নীতি মানেন না। অনেকে বলেন যে, আয় বাড়িলে ব্যক্তির প্রয়োজনবোধ ও অভাববোধের পরিমাণ বাড়ে, উহা আরও তীব্র হয়। আন্তঃব্যক্তি উপযোগিতার তুলনা

(interpersonal comparisons of utility) এই নীতির মূল কথা ; তাহাও আর মানিয়া লওয়া চলে না। তাহা ছাড়া, আয় হইতে তৃপ্তি অনেকাংশে নির্ভর করে "প্রতিবেশীর আয়ের উপর" (Jones-factor)। সর্বোপরি, যদি-বা ইহা মানিয়াই লওয়া গেল, কিন্তু কি-হারে ব্যক্তির প্রান্তিক আয়গত উপযোগিতা (marginal income utility) হ্রাস পায় তাহার কোন বাস্তব (objective) মানদণ্ড নাই। সুতরাং ক্রমবর্ধনশীলতার যে-হার বিভিন্ন রাষ্ট্র স্থির করে উহা একান্ত অবৈজ্ঞানিক।

দ্বিতীয়ত, হব্‌সনের যুক্তির বিরুদ্ধে বলা চলে যে, আয়ের মধ্যে ব্যয় ও উদ্‌বৃত্তের যে দুইটি অংশের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন সেই পার্থক্য নিতান্ত মনস্তাত্ত্বিক (psychological), ব্যক্তির ভাবজগতের বিষয়। সর্বশেষ বিশ্লেষণে এই পার্থক্য করার মালিক সেই ব্যক্তি নিজেই। রাষ্ট্র নিজে এই পার্থক্য ধরিয়া লইতে পারে না, কারণ তাহার হাতে ইহা পরিমাপের কোনরূপ বাস্তব মানদণ্ড (objective criteria) নাই। তবে কিসের ভিত্তিতে ক্রমবর্ধনশীলতার হার স্থির করা সম্ভব ?

তৃতীয়ত, মার্শাল ও পিগুর বক্তব্য সম্পর্কে বলা যায় যে, তাঁহাদের যুক্তি ন্যায়-অন্যায়বোধ ও নিজস্ব মনগড়া নীতিবোধের সহিত অঙ্গাঙ্গভাবে জড়িত। ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, 'উচিত-অনুচিত' বলিয়া এই শাস্ত্র কোন কিছু বিশ্লেষণ করিতে পারে না।

অনেক ধনবিজ্ঞানীর মতে ক্রমবর্ধনশীল নীতির পরিবর্তে আমাদের সমানুপাতিক নীতি গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, কারণ ক্রমবর্ধনশীলতার হার নির্ভর করে, সম্পূর্ণভাবে, কর-আরোপকারীদের খেয়াল-খুশীর উপর। McCulloch বলিয়া গিয়াছেন, "The moment you abandon, in the framing of such taxes, the cardinal principle of exacting from all individuals the same propertion of their income or of their property, you are at sea without rudder or compass, and there is no amount of injustice and folly you may not commit." এই নীতির বিরুদ্ধে আরও বলা হয় যে, করের ক্রমবর্ধনশীলতার দরুন ব্যক্তির সঞ্চয় ও কর্মোদ্যম ব্যাহত হয়, বিনিয়োগের হার কমে, অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার হ্রাস পায়।

এই সকল সমালোচনা এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে

ক্রমবর্ধনশীল করনীতি গৃহীত হইয়াছে। কর-আরোপকারীর খেয়ালখুশি অনুযায়ী এই সকল দেশে ক্রমবর্ধনশীলতার হার স্থির হয়, তাহা নহে। সমাজের অধিকাংশ জনমত দেশের আয়-বৈষম্য সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে, তাহাদের সেই মূল্যবোধ ও সাম্যবোধের উপর মোটামুটি ভিত্তি করিয়া এই হার স্থির করা হয়। তাহা ছাড়া, ক্রমবর্ধনশীলতার দরুন দেশের মূলধন-গঠন ব্যাহত হইয়াছে, বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্তও বাস্তবে বিশেষ দেখা যায় না। সর্বোপরি, কেইন্‌সীয় তত্ত্ব ক্রমবর্ধনশীলতার স্বপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সমর্থন যোগাইয়াছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা অধিকাংশই কেইন্‌সীয় তত্ত্বের অনুগামী। তাঁহাদের মতে দেশে বেকারি ও অপূর্ণ কর্মসংস্থান দূর করিতে হইলে এইরূপ কর দরকার। ধনিকদের ভোগপ্রবণতা কম, দরিদ্রদের ক্ষেত্রে ইহা বেশি। আয় বাড়িলে ভোগপ্রবণতা ক্রমশ কমিতে থাকে, তাহাদের আয়ের ক্রমশ বেশি অংশ সঞ্চিত হইয়া জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি ঘটাইতে দেয় না। কার্যকরী চাহিদা বাড়িতে পারে না, কর্মসংস্থান পূর্ণস্তরে উঠিতে পারে না। ধনীদের উপর অধিক হারে কর বসাইয়া সেই টাকা বিভিন্ন উপায়ে দরিদ্রদের হাতে দিলে তবেই সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়ে এবং দেশ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌঁছাইতে পারে। তাই তিনি এই করের সমর্থক। কেইন্‌সের মতে, "**Since a policy of full employment requires a high marginal propensity to consume, progressive taxation is apparently necessary for transferring wealth from the rich who have a low marginal propensity, to the poor who have a high marginal propensity to consume.**"

এই বিষয়ে কেইন্‌স্ কি বলেন

করনীতিসমূহ সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা (A further discussion on the Principles of Taxation):

প্রত্যেক দেশের কতকগুলি অর্থনৈতিক লক্ষ্য (economic goals) আছে, সেই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সকল অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও নীতি গৃহীত হইয়া থাকে। রাষ্ট্র যে-ধরনের কর ও যে হার নির্বাচন করিবে তাহা এই অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনের উপযোগী হওয়া দরকার। সে এমনভাবে করের ভার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ছড়াইয়া দিবে যাহাতে এই লক্ষ্যসাধনের প্রচেষ্টা কোনমতেই ব্যাহত না হয়।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেশের করকাঠামো গড়িয়া তুলিতে হইলে যে-ধরনের মানদণ্ড অনুযায়ী আমরা করগুলির উপযুক্ততা বিচার করিব তাহাদের করনীতি (principles of taxation) বলে।

বহুদিন পূর্ব হইতে এই আলোচনার শুরু

সুপ্রাচীন কাল হইতে বিভিন্নভাবে এই আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। মার্কেন্টাইলিস্ট ও ফিজিয়োক্রাটগণ তাঁহাদের করনীতি প্রচার করিয়াছিলেন; অ্যাডাম স্মিথ তাঁহার বিখ্যাত করকানুন (canons of taxation) ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ক্লাসিকাল যুগের McCulloch, Say, John Stuart Mill সকলেই এই বিষয়ে বিশদ-আলোচনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালে Edgeworth, Dalton, Pigou-ও এই বিষয়ে কম আলোচনা করেন নাই। করনীতি সম্পর্কে আলোচনার প্রসার প্রধানত নির্ভর করে অর্থনৈতিক কল্যাণ সম্পর্কীয় তত্ত্বের বা কল্যাণমূলক ধনবিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতির উপর; এই শাস্ত্রের বর্তমান রূপের ভিত্তিতে অধ্যাপক Musgrave ইহার আলোচনা করিয়াছেন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্মুখে যে-ধরনের লক্ষ্য থাকে, তাহার উপযোগী ও অনুরূপ করনীতি সেই দেশে গৃহীত হয়। আধুনিক-কালে, মোটামুটি সকল দেশের সমাজে সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণের উপযোগী তিনটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়: (১) সকল ব্যক্তির কল্যাণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচন বা পছন্দের ব্যাপারে সর্বাধিক স্বাধীনতা দেওয়া; * (২) দেশের উপকরণ, উৎপাদনকৌশল, এবং ক্রেতা ও উপকরণ-মালিকদের পছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবনযাত্রার মান সর্বোত্তম করা; † (৩) তৎকালীন সামাজিক ন্যায়বোধের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আয়-বণ্টন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা। ‡ এই সকল অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী দেশের করকাঠামোর তিনটি বৈশিষ্ট্য বা প্রধান নীতি আজকাল গৃহীত হইয়াছে। ইহারা হইল:

তিনটি লক্ষ্য অনুযায়ী

(১) অর্থনৈতিক নিরপেক্ষতা (Economic neutrality): দেশের করকাঠামো এমনভাবে গঠিত হইবে যাহাতে উহা সকল উপকরণের সর্বোত্তম

* Maximum freedom of choice consistent with the welfare of others.

† Optimum standards of living, in terms of available resources and techniques and in the light of consumer and factor-owner preference.

‡ A distribution of income in conformity with the standards of equity currently accepted by society.

নিয়োগ-বিন্যাস ও ব্যবহারে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করিবে না ; এবং সম্ভব হইলেও এই সর্বোত্তম অবস্থায় পৌঁছিতে সাহায্য করিবে। (২) (Equity) : সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি যে আয়বণ্টনকে সর্বোত্তম বলিয়া মনে করে, করভারের বণ্টন যেন তাহার অনুরূপ হয়। (৩) করশাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ (Quality of Tax adminstration) : দেশের কর-কাঠামো এমন হইবে যেন কর-আদায়ের খরচ, কর-ফাঁকি এবং নাগরিকদের করদানে অসুবিধা সবচেয়ে কম থাকে। এখন একে একে ইহাদের আলোচনা করা যাউক।

তিনটি নীতি

প্রথম নীতি হইল যে, অর্থনৈতিক নিরপেক্ষতা (Economic neutrality) রক্ষার জন্য করসমূহ এরূপ ধরনের হওয়া দরকার যাহাতে সমাজে ব্যক্তির অর্থনৈতিক কাজকর্মের ধরনে গুরুতর পরিবর্তন না আনে। অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনের পক্ষে অপরিহার্য কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়া ব্যক্তির কাজকর্মে পরিবর্তন না-আনা করনীতির একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সাধারণত তিন দিক হইতে রাষ্ট্রের কর ব্যক্তির কাজকর্মে পরিবর্তন আনিতে পারে। প্রথমত, ইহা ক্রেতার পছন্দ বদলাইয়া দিতে পারে। যেমন, ধুতি কাপড়ের উপর কর বসিলে লোকে ইহার বদলে প্যাণ্ট ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে কারণ তুলনামূলক ভাবে প্যাণ্টের দাম এখন কম। দ্বিতীয়ত, করের ফলে কোন উপাদানের মালিক পূর্বাপেক্ষা কম বা বেশি তাহার উপাদান যোগান দিবার সিদ্ধান্ত করিতে পারে। যেমন, আয়কর বেশি হইলে পরিশ্রম কমাইয়া লোকে অধিক পরিমাণে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে পারে। তৃতীয়ত, করের ফলে উদ্যোক্তা উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হইতে পারে। ভোগ্যদ্রব্য এবং মূলধনীদ্রব্য উৎপাদনের অনুপাত বদলাইতে পারে। সুতরাং, এই সকল দিকে পরিবর্তন যাহাতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনে সাহায্য করে সেইরূপ করই আরোপ করা উচিত।

১। অর্থনৈতিক নিরপেক্ষতা

দ্বিতীয় নীতি হইল যে, যাহাতে ন্যায়ভাবে করভার বন্টিত হয় (Equity in the distribution of the burden) সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এখানে ন্যায্য বলিলে বোঝা যায় সমাজের সাধারণ জনমত বা সর্বজনীন ইচ্ছা যে-আয়বণ্টনকে ন্যায্য বলিয়া গণ্য করিতে চান, করভার যেন উহার অনুরূপ ভাবে বন্টিত হয়। ন্যায়নীতির দুইটি দিক আছে (two aspects) : একটি

২। ন্যায্যতা

হইল সমান অবস্থার সকল ব্যক্তির সহিত সমান আচরণ করা (equal treatment of equals) এবং দ্বিতীয়টি হইল পৃথক অবস্থার ব্যক্তিদের অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী আপেক্ষিক ধরনের আচরণ করা (relative treatment of persons in unlike circumstances)। প্রথম দিকটি লইয়া বিশেষ কোন সমস্যা নাই ; কিন্তু দ্বিতীয় দিকটি লইয়াই বহুপ্রকার সমস্যা দেখা দেয়। যাহারা অপরের তুলনায় একটু "ভাল অবস্থায়" (better off) আছে তাহারা একটু বেশি কর দিবে ইহা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু "ভাল অবস্থা" কাহাকে বলে এবং বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তিদের উপর আপেক্ষিক করভার কিরূপ হওয়া উচিত তাহা লইয়া যথেষ্ট মতবিরোধ আছে।

উপকারিতা ও প্রদানক্ষমতা

করভারের ন্যায়-সংগত বণ্টন সম্পর্কে সাধারণভাবে দুই ধরনের আলোচনা বা তত্ত্ব দেখা গিয়াছে : একটির ভিত্তি হইল উপকারিতা (benefit), আর অপরটির ভিত্তি হইল প্রদানক্ষমতা (ability to pay)। উপকারিতা তত্ত্বের মূল কথা হইল ব্যক্তি যেমন দাম দিয়া জিনিস কেনে, কারণ সেই জিনিসটি তাহার নিকট উপকারী, ঠিক সেইরূপ সরকারের কাজকর্ম হইতে উপকার পায় বলিয়াই সে কর দেয়। কোন না কোন উপায়ে এই দেয় করের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে উপকারিতা অনুযায়ী। এই তত্ত্বের সমর্থকেরা ইহাই ন্যায়সংগত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু দেখা যায়, সরকারের বেশির ভাগ কাজই জনকল্যাণমূলক হইয়া উঠিতেছে, দরিদ্র শ্রেণীর কল্যাণ বাড়াইবার উপযোগী সরকারী কাজকর্ম করা হইতেছে। এই সকল কাজের ব্যয় হিসাবে একমাত্র তাহাদের নিকট হইতেই কর আদায় করা উচিত, ইহা কখনই ন্যায়সংগত হইতে পারে না। তাই বর্তমানে ন্যায়নীতি অনুসারে প্রদান-ক্ষমতা অনুযায়ী করভার বণ্টনই মোটামুটি গৃহীত হইতেছে।*

* 'In tracing the development of thought on this matter, we find two distinct points of view. One may be referred to conveniently as the *benefit approach*.........The other may be referred to as the *ability-to-pay approach*.......In the benefit approach, the relation of the tax payer and Government is seen, as John Suart Mill puts it, in *quid-pro-quo* terms. Since the relation is one of exchange, the rules of the public household are taken to be more or less the same as those of the market. In the ability to pay approach, the proper contribution to public services is treated as an independent problem, quite separate from that of benefits received. Taxes are seen as compulsory payments, and the revenue-expenditure process is viewed as a planning problem not subject to solution by the automatic functioning of the market."

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রদান ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করার জন্ত ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকারের কথা আলোচিত হইতেছে। প্রদানক্ষমতা অনুযায়ী ত্যাগ স্বীকার করা সম্পর্কে মোটামুটি তিন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী দেখা গিয়াছে ; সমত্যাগনীতি (principle of equal sacrifice), আনুপাতিক ত্যাগনীতি (principle of proportional sacrifice) এবং নিম্নতম সামগ্রিক ত্যাগনীতি (principle of minimum or least aggregate sacrifice)। এই সকল তত্ত্বই মোটামুটি দুইটি অনুমানের ভিত্তিতে আলোচিত হইয়াছে, (ক) ক্রমহ্রাসমান আয়গত উপযোগিতার নিয়ম (law of diminishing income utility) এবং (খ) সমান আয় হইতে সকল ব্যক্তির তৃপ্তি লাভের ক্ষমতা সমান অর্থাৎ উপযোগিতার আন্তঃব্যক্তি তুলনা (interpersonal comparisons of utility)। বর্তমান কালের কল্যাণমূলক ধনবিজ্ঞান উপরের এই দুইটি অনুমানই মানিয়া লয় না। তাই ত্যাগ স্বীকারের এই সকল তত্ত্বগুলির সাহায্যে প্রদানক্ষমতা পরিমাপ করা বর্তমানে আর চলে না।

বিভিন্নরূপ ত্যাগের নীতি

তৃতীয় করনীতি হইল কর আদায়ের নিম্নতম ব্যয়ের নীতি—(Minimum costs of tax collection)। করের উদ্দেশ্য, হার, করদানের পদ্ধতি প্রভৃতি যত সুস্পষ্ট থাকে, কর-আদায়ের ব্যয় ও বিঘ্ন ততই কম হইবে। সরলতা ও স্পষ্টতাই করনীতির অন্যতম গুণ।

৩। নিম্নতম ব্যয়

কর-বহন যোগ্যতা (Taxable capacity) :

কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশের জনসাধারণ মোট যে-পরিমাণ কর দিতে প্রস্তুত আছে, তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা। কোন জাতির এই কর-বহন যোগ্যতাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। স্যার জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে, দেশের মোট উৎপাদন হইতে অস্তিত্ব রক্ষার স্তরে জনসাধারণকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যে টাকা প্রয়োজন তাহা বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা। কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার স্তর কোথায় নির্দিষ্ট করা হইবে বা সেই স্তর বজায় রাখিতে কি-পরিমাণ টাকা ব্যয় করা দরকার হইবে, তাহা স্থির করার কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নাই। তাহা ছাড়া, এই উদ্বৃত্তের সবটুকুই রাষ্ট্র লইয়া গেলে

কর-বহন যোগ্যতা কাহাকে বলে

মূলধন-গঠন হয় না, জাতির ভবিষ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ কর-বহন যোগ্যতা কমিয়া যায়।

সুতরাং জাতীয় আয় হইতে মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখা এবং জনসাধারণের দক্ষতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা, সাধারণত এইরূপেই ইহাকে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও বিশেষ অস্পষ্ট এবং অসুবিধাজনক। মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখা বা জনসাধারণের দক্ষতা বজায় রাখার জন্য কি-হারে টাকা নির্দিষ্ট করিতে হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। স্বাভাবিক সময়ে শুধু মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখিলে চলিবে না, আরও অধিক হারে টাকার সঞ্চয় করিতে হইবে, কারণ তাহা হইলেই জাতীয় আয় ক্রমশ বর্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং, এই ধারণার বিশ্লেষণে বিশেষ অসুবিধা আছে। ইহা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক; ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে, অপরিমাপযোগ্য বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

কর-বহন যোগ্যতা নির্ধারণের অসুবিধা

কর-বহন যোগ্যতাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না বটে কিন্তু যে-বিষয়গুলির দ্বারা ইহা নির্ধারিত, তাহাদের আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত. জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব। যেমন স্বাভাবিক সময়ে লোকে যে-কর দিতে রাজি থাকে, যুদ্ধের সময়ে তাহা অপেক্ষা তাহাদের কর-বহনযোগ্যতা অনেক বেশি, কারণ ওই সময়ে তাহাদের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। দ্বিতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় আয়ের বণ্টনের উপরও কর-বহন যোগ্যতা নির্ভর করে। আয়-বৈষম্য যত বেশি থাকে, কর-বহন যোগ্যতা তত বেশি। তৃতীয়ত, জাতীয় আয়ের অনুপাতে জনসংখ্যার পরিমাণের উপর ইহা নির্ভর করে। জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্রুততর বা অধিকহারে হইলে মাথাপিছু আয় কমিয়া যায়; জাতির কর-বহন যোগ্যতা হ্রাস পায়। চতুর্থত, দেশের সামগ্রিক শিল্প-সংগঠনের প্রকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে। যদি মূলধন-গঠনের হার অধিক রাখিতে হয় (যেমন অনুন্নত দেশে পরিকল্পনার সময়ে), তাহা হইলে সেই সময়ে দেশের কর-বহন যোগ্যতা কম। কিন্তু বর্তমানে মূলধন-গঠনের ফলে ভবিষ্যতে জাতীয় আয় বাড়িতে পারে, এমতাবস্থায় দেশের ভবিষ্যৎ কর-বহন যোগ্যতা বেশি হইবে। পঞ্চমত, ইহা নির্ভর করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের

নির্ধারণকারী বিষয়-সমূহ: মনস্তত্ত্ব, জাতীয় আয়ের বণ্টন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, দেশের শিল্প-সংগঠন, জীবন-যাত্রার মান, কর-ব্যবস্থার প্রকৃতি, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতি

উপর ; কারণ উহা দ্বারাই তাহাদের মনস্তত্ত্ব, দক্ষতা, কাজ করিবার ক্ষমতা ও স্পৃহা নির্ধারিত হয়। ষষ্ঠত, কর-ব্যবস্থার (Tax System) প্রকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে। কর-কাঠামোতে তুলনামূলকভাবে প্রত্যক্ষ কর অধিক থাকিলে কর-বহন যোগ্যতা বেশি : দেশের উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহাদের সাহায্যে অধিক পরিমাণ কর-রাজস্ব আদায় করা চলে। সর্বশেষে ইহাও লক্ষ্য রাখা দরকার যে, কর-বহন যোগ্যতা নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতির উপর। যদি বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপর ব্যয় অধিক হয়, তাহা হইলে দেশের কর-বহন যোগ্যতা বাড়িবে। কিন্তু বর্তমানে যদি সমরসম্ভার প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বা প্রতিযোগিতামূলক সমরপ্রস্তুতিতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে দেশের কর-বহন যোগ্যতা কমিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে করা চলে।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে ইহার স্থান

ডাল্টনের মতে এই ধারণা অত্যন্ত ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট, চূড়ান্ত কর-বহন যোগ্যতা বলিয়া কিছু নাই, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ইহাকে মোটেই স্থান দেওয়া উচিত নয়। অপরপক্ষে, ফিণ্ড্লে শিরাস্-এর মতে এই ধারণার কিছুটা বাস্তব কার্যকারিতা আছে ; স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক অবস্থায় কোন্ দেশ সর্বাধিক-কি-পরিমাণ কর দিতে রাজি আছে সেই সীমা, অস্পষ্টভাবে হইলেও, সরকারের জানিয়া রাখা সর্বদাই ভাল। আধুনিক কালে, কলিন ক্লার্ক জাতীয় আয়ের 25%-এর বেশি কর-আদায় উচিত নয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

করঘাত ও করপাত (Impact and Incidence of Taxes) :

কোন কর ধার্য করা হইলে যাহার নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ কর গ্রহণ করেন, তিনি করের প্রথম আঘাত বহন করেন, কিন্তু তিনি নিজে প্রকৃতপক্ষে করের আর্থিক ভার বহন না-ও করিতে পারেন। তাঁহার উপর কর আরোপিত হইল বটে, কিন্তু তিনি করের দরুন প্রদত্ত অর্থ অপর কাহারও নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারেন। অর্থাৎ তাঁহার উপর কর আরোপিত হইলেও সেই করের আর্থিক ভার অপর কেহ বহন করিল, এইরূপ ঘটিতে পারে। যাহার উপর কর আরোপিত হইয়াছিল তিনি কর-ঘাত (impact) বহন করেন ;

আর যিনি সত্যই আর্থিক ভার বহন করেন, অর্থাৎ নিজের আয় হইতে কর-প্রদান করিয়া যাঁহার আর্থিক আয় কমিয়া যায়, তিনি প্রকৃতপক্ষে কর-পাত (incidence) বহন করেন, এরূপ বলা হয়। কাহারও উপর কর আরোপিত হইলে তিনি কর-প্রদানের দায়িত্ব অপরের নিকট সরাইয়া দিতে পারেন। কর-প্রদানের দায়িত্ব অপরের নিকট অপসারণ করার এই ধারাকে করসরণ (Shifting) বলা হয়।

ফলাফল ও করপাত এক নয়

করের ফলাফল (Effects) এবং কর-পাত (Incidence) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন, কোন উদ্যোক্তা যদি দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া আরোপিত করকে সরাইয়া ভোগকারী ক্রেতাদের দিকে ঠেলিয়া দেয়, তাহা হইলে বিক্রয় কমিয়া তাহার নিজের, শ্রমিকদের বা কাঁচামালের বিক্রেতাদের আয়, ব্যয়, সঞ্চয় প্রভৃতি কমিবে, সমাজে সেই কর অরোপিত হইবার দরুণ বহু প্রকার ফলাফল দেখা দিবে। করপাত বলিলে এই সকল ফলাফল বুঝায় না; ইহার অর্থ হইল সর্বশেষ স্তরে করের আর্থিক ভার কাহার উপর পড়িতেছে, কে সত্যই কর প্রদান হইতে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

কর-সরণের রূপ

কর-সরণ অনেক রূপ লইতে পারে। কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হইলে উৎপাদক করের পরিমাণ অনুযায়ী দাম বৃদ্ধি করিয়া সেই কর ক্রেতার নিকট সরাইয়া দিতে পারে, অথবা দ্রব্যের গুণ বা উৎকর্ষ কমাইয়া দিয়া পূর্বাপেক্ষা খারাপ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আসল ভার ক্রেতার নিকট পাঠাইতে পারে।

কর-সরণের দিক্ নির্ণয়

কর-সরণ অগ্রমুখী (Forward) বা পশ্চাৎমুখী (Backward) হইতে পারে। যদি উৎপাদকের উপর কর আরোপ করা হয় তাহা হইলে উৎপাদক কর-প্রদানের দায়িত্ব ক্রেতাদের নিকট সরাইয়া দিলে তাহা অগ্রমুখী কর-সরণ: যদি সে কাঁচামালের বিক্রেতার উপর চাপ দিয়া কম দামে কাঁচামাল ক্রয় করিয়া কর-ভার তাহার নিকট সরাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে উহা পশ্চাৎমুখী কর-সরণ।

কর-পাতের পরিমাণ নির্ভর করে উৎপাদক ও ক্রেতার পারস্পরিক করাপসারণের ক্ষমতার উপর। সাধারণত, যিনি কর-ঘাত বহন করেন, তিনি

করের সম্পূর্ণ অংশ নিজেই বহন করেন না অথবা সম্পূর্ণ অংশই অন্যের উপর সরাইয়া দিতে পারেন না। করের পরিমাণ পর্যন্ত দামে বৃদ্ধি করিতে পারিলে কর-ভার সম্পূর্ণ অন্যের উপর সরাইয়া দেওয়া যায়; দাম মোটে বাড়াইতে না পারিলে করের পরিমাণ সম্পূর্ণ নিজে বহন করিতে হয়। সাধারণত এইরূপ অবস্থায় দাম অল্প কিছু বাড়িয়া যায়, বিক্রয় ও মুনাফা কমে এবং উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে কর-পাতের অংশ বিভক্ত হইয়া যায়।

করপাতের সাধারণ নীতি

দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে, কর-সরণের পরিমাপ কিরূপ হইবে তাহা সাধারণভাবে নির্ভর করে দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। করের আর্থিক ভার উৎপাদক ও ক্রেতাদের মধ্যে কিরূপে বিভক্ত হইবে, তাহা দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে। যদি দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়, তবে দাম বাড়ান বিশেষ চলিবে না, কারণ তাহাতে বিক্রয় খুবই কমিয়া যাইবে; এমতাবস্থায় উৎপাদক বা বিক্রেতাকেই করের অধিক অংশ বহন করিতে হইবে। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইলেও বিক্রয় বেশি কমিবে না, ক্রেতাদেরই করের অধিকাংশ বহন করিতে হইবে। যদি যোগান স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে করের অধিক অংশ ক্রেতাদের বহন করিতে হইবে; যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে করের অধিক অংশ বিক্রেতা বা উৎপাদককে বহন করিতে হয়। সুতরাং করের আর্থিক-ভার ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাইবে, এই বিভাগের পরিমাণ চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পারস্পরিক শক্তির উপর নির্ভর করিবে:

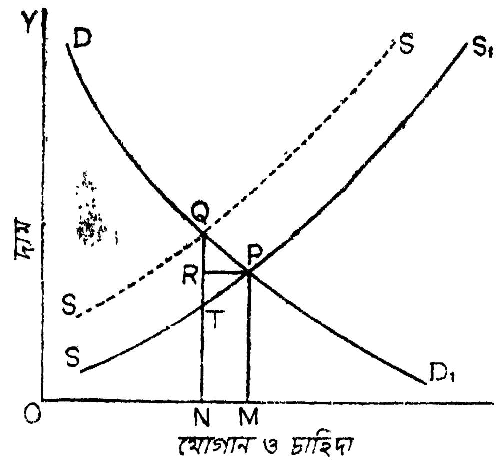
চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

সূত্রাকারে প্রকাশ করিলে বলা যায়:

$$\frac{\text{করভারের বিক্রেতার অংশ}}{\text{করভারের ক্রেতার অংশ}} = \frac{\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা}}{\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা}}$$ ।

কোন একটি পণ্যের উপর করপাত আমরা রেখা-চিত্রের সাহায্যেও প্রকাশ করিতে পারি। পরপৃষ্ঠায় চিত্রে DD_1 এবং SS_1 হইল যথাক্রমে দ্রব্যটির চাহিদারেখা ও যোগান রেখা। P বিন্দুতে ভারসাম্যের দাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। PM দামে OM পরিমাণ চাহিদা ও যোগান হইতেছে। কর-আরোপের ফলে বর্তমান দাম দাঁড়াইল QN; এই দামে বিক্রয় হইতেছে ON, দাম বাড়িয়াছে

QN − PM = QR এবং বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়াছে OM − ON = PR. মোট কর QT-র মধ্যে ক্রেতারা বহন করে QR এবং উৎপাদকেরা বহন করে RT.*



বিক্রেতা ও ক্রেতাদের উপর করভারের এইরূপ বণ্টন হয় দাম ও উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তনের মারফৎ এবং এই সকল পরিবর্তন কিছুটা সময়সাপেক্ষ।

সময়-বিচারের গুরুত্ব

সুতরাং দীর্ঘকালেই কর-পাত সম্পূর্ণ ঘটে ; স্বল্পকালে, করের প্রভাবে দাম বৃদ্ধি হয় এবং সাধারণত ভোগকারী বা ক্রেতাদেরই সম্পূর্ণ ভার বহন করিতে হয়।

দীর্ঘকালে, অপরাপর বহু প্রভাব দেখা দিতে পারে। সাধারণত, সমাজে সকল দ্রব্যাদির দাম পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত ; কোন দ্রব্যের উপর কর

দীর্ঘকালীন করপাত

আরোপ করিলে অন্যান্য দ্রব্যাদির (পরিবর্ত দ্রব্যাদি, সহযোগী দ্রব্যাদি, বা কাঁচামাল প্রভৃতি) দাম, উৎপাদন প্রভৃতি প্রভাবান্বিত হয়, যেমন কাঁচামালের উৎপাদক কম দাম গ্রহণ করিতে

* যদি করে খুব অল্পহারে পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি, তাহা হইলে P ও Q খুব কাছাকাছি অবস্থিত অর্থাৎ একেবারে পরস্পর নিকটতম বিন্দু বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সেই অবস্থায়,

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{MN}{OM} \div \frac{QR}{PM} = \frac{MN}{OM} \times \frac{PM}{QR}$$

$$\text{এবং যোগানের স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{MN}{OM} \div \frac{RT}{PM} = \frac{MN}{OM} \times \frac{PM}{RT}$$

$$\text{সুতরাং, } \frac{\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা}}{\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা}} = \frac{RT}{QR}$$

$$= \frac{\text{করভারের বিক্রেতার অংশ}}{\text{করভারের ক্রেতার অংশ}} \text{।}$$

বাধ্য করিতে পারে। এই সকল বিষয়ে সম্মিলিত প্রভাবে দীর্ঘকালীন কর-পাত নির্ধারিত হয়।

যদি দ্রব্যটি সমহার উৎপন্নের নিয়ম (Law of Constant Returns) অনুযায়ী উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সাধারণত আরোপিত করের সম্পূর্ণ পরিমাণ পর্যন্ত দামে বৃদ্ধি হইতে পারে। কর-আরোপের ফলে দাম বৃদ্ধি হইবে এবং চাহিদা কমিয়া যাইবে, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় সমানই থাকে সুতরাং করের পরিমাণের অধিক দাম বৃদ্ধি হইতে পারে না।

সমহার প্রতিদানের নিয়ম ও কর-পাত

দ্রব্যটি যদি ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের নিয়ম মানিয়া চলে অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অনুযায়ী উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে দামে বৃদ্ধি করের পরিমাণ হইতে কম হইবে। যেমন, ধরা যাক 1000 ইউনিট দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় 7 টাকা। ইউনিটপ্রতি 1 টাকা কর আরোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া 8 টাকা হইবে, ফলে চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদন কমিবে। কম উৎপন্ন হইলে, (ধরা যাক, 800) ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া $6\frac{1}{2}$ হইল; ইহার সহিত কর যোগ করিয়া দাম হইবে $7\frac{1}{2}$, অর্থাৎ করের পরিমাণের তুলনায় দামে বৃদ্ধি কম হইল।

ক্রমহ্রাসমান-প্রতিদানের নিয়ম ও করপাত

দ্রব্যটি যদি ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের নিয়ম মানিয়া চলে অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অনুযায়ী উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করের পরিমাণ হইতে বেশি হইতে পারে। যেমন, ধরা যাউক 1000 ইউনিট দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় 7 টাকা। কর আরোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া 8 টাকা হইবে, ফলে চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদন কমিবে। কম উৎপন্ন হইলে, ইউনিট-প্রতি ব্যয় বাড়িয়া $7\frac{1}{2}$ টাকা হইল; ইহার সহিত কর যোগ করিয়া দাম হইবে $8\frac{1}{2}$, টাকা অর্থাৎ করের পরিমাণের তুলনায় দাম বৃদ্ধি বেশি হইল।

ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম ও কর-পাত

একচেটিয়া দ্রব্যের উপর কর-পাত নির্ভর করে করের প্রকৃতির উপর। সাধারণত, যে পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে প্রান্তিক রেভিনিউ ও প্রান্তিক ব্যয় সমান,—একচেটিয়াদার সেই পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করে এবং সেই অনুযায়ী দাম স্থির করে। মুনাফার উপর কর আরোপিত হইলে, দামে

একচেটিয়া ব্যবসায়ে ও কর-পাত

কোন পরিবর্তন হইবে না—তাহার নিজের উপরই সম্পূর্ণ কর-পাত ঘটিবে।*

উৎপাদনের পরিমাণের উপর কর আরোপিত হইলে, সাধারণত দাম একটু বাড়িয়া যায় এবং ভোগকারী কর-পাতের অংশ বহন করে। করকে উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যেই ধরিয়া লইলে প্রান্তিক ব্যয় বেশি, সুতরাং দামও বাড়িয়া যায়। দাম কি পরিমাণে বাড়িবে বা একচেটিয়াদার ও ভোগকারী কর-পাতের কিরূপ অংশ কে বহন করিবেন, তাহা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে। চাহিদা যত বেশি স্থিতিস্থাপক হইবে একচেটিয়াদার তত অধিক অংশ বহন করিবেন। উৎপাদন যত বাড়িবে কর-হার ততই কমিবে—এইরূপ কর স্থাপিত হইলে একচেটিয়াদার দাম কমাইয়াও (অধিক চাহিদা সৃষ্টি করিয়া) উৎপাদন বাড়াইতে পারে; অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে তাহার কর-ভার এড়াইবার চেষ্টাতে ভোগকারীদের সুবিধা হইয়া যাইতে পারে।

মুনাফার উপর কর ও উৎপাদনের উপর কর

প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর (Direct and Indirect Taxes)

যে-ব্যক্তির উপর কর আরোপিত হয়, যদি সেই ব্যক্তিই সর্বশেষ স্তরে করের আর্থিক ভার বহন করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে এইরূপ করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। (যেমন, আয়কর প্রভৃতি)। যাহার উপর কর-আরোপিত হয় বা যাহার নিকট হইতে কর আদায় করা হয় যদি সেই ব্যক্তি কর-ভার অন্যের উপর সরাইয়া দিতে পারে বা অন্যের নিকট হইতে সেই টাকা তুলিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সেইরূপ করকে পরোক্ষ কর বলে (যেমন বিক্রয়কর, আমদানি শুল্ক প্রভৃতি)। অর্থাৎ, কর-ঘাত ও কর-পাত একই ব্যক্তির উপর হইলে তাহা প্রত্যক্ষ কর; কর-ঘাত ও কর-পাত পৃথক ব্যক্তির উপর হইলে তাহা পরোক্ষ কর।

প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর কাহাকে বলে

প্রত্যক্ষ করের সুবিধা হইল যে (১) ইহা ক্রমবর্ধমান হারে আরোপিত করা যায়, ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা অনুযায়ী তাহার নিকট হইতে কর আদায় করা

* মুনাফার উপর তিন প্রকার কর আরোপিত হইতে পারে, (ক) মুনাফা হইতে মোটামুটি কিছু পরিমাণ অর্থ, (খ) মুনাফার শতকরা কিছু অংশ, (গ) মুনাফার উপর ক্রমবর্ধমান হারে। সকল ক্ষেত্রেই সাধারণত কর-পাত একচেটিয়াদারের উপর। এই বিষয়টি আবার পরে আলোচিত হইতেছে।

সম্ভবপর। (২) প্রত্যক্ষ করের আর্থিক ভার সকলেই নিশ্চিতরূপে জানে। কখন, কি-পরিমাণ, কোথায়, কিভাবে কর দিতে হইবে তাহা নিশ্চিত ও স্পষ্ট ; ইহাতে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র উভয়েই নিজেদের ব্যয় ও আয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে। (৩) প্রত্যক্ষ কর আদায়ের ব্যয় খুবই কম ; ইহা ব্যয়সংকোচশীল। (৪) প্রত্যক্ষ কর খুবই প্রসারশীল (elastic) ; কর-হার অল্প একটু বাড়াইলে প্রত্যক্ষ কর হইতে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যাইতে পারে। (৫) প্রত্যক্ষ করদাতা রাষ্ট্রীয় ব্যয় সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে ; নিজেদের নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি দেখা যায়

প্রত্যক্ষ করের সুবিধা

প্রত্যক্ষ করের অসুবিধা হইল, (১) ইহা সাধারণত খুবই অপ্রিয়। সরাসরি পকেট হইতে এই কর দিতে হয় বলিয়া লোকে ইহা বিশেষ অপছন্দ করে। লোকে ব্যক্তিগত আয়ের উৎস প্রকাশ করিতে চাহে না, তাহাও ইহা অপছন্দের অন্যতম প্রধান কারণ। (২) প্রত্যক্ষ কর লোকের কর-ফাঁকি দেওয়ার বা অসাধুতা অবলম্বন করার প্রবণতা বাড়াইয়া দেয়। (৩) প্রত্যক্ষ করের ক্রমবর্ধমান হার সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ক্রমাগত উচ্চ আয়স্তরে যে হারে টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা কমিয়া যায়, তাহার সহিত ক্রমবর্ধমান কর-হারের যোগ থাকা উচিত, কিন্তু বাস্তবে উহা পরিমাপযোগ্য নহে। (৪) উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের উপর উচ্চহারে প্রত্যক্ষ কর আরোপ করিলে উহা সঞ্চয়-স্পৃহা বা কর্মোদ্যম কমাইয়া দিতে পারে।

প্রত্যক্ষ করের অসুবিধা

পরোক্ষ করের সুবিধা হইল (১) ধনী-গরীব সকলকেই সাধারণত এই কর দিতে হয়, ফলে কর-কাঠামো বিস্তৃতভিত্তিক (broad-based) হইতে পারে। (খ) এই ধরনের কর প্রদান করদাতাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক, কারণ ইহা প্রতিবারে খুব অল্প পরিমাণে দিতে হয়। (গ) দ্রব্যের দামের মধ্যে কর জড়িত থাকে বলিয়া ইহা বিশেষ অপ্রিয় বোধ হয় না। (ঘ) কতকগুলি দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় উহাদের উপর কর-স্থাপন করিলে প্রভূত রাজস্ব পাওয়া যাইতে পারে। (ঙ) পরোক্ষ করের সাহায্যে সামাজিক সংস্কারের কার্য কিছুদূর অগ্রসর করানো যাইতে পারে (যেমন, মদ প্রভৃতির উপর শুল্ক)।

পরোক্ষ করের সুবিধা

পরোক্ষ করের অসুবিধা হইল (১) ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ বিবেচনা না করিয়াই ইহা আদায় করা হয়, সুতরাং ইহাকে প্রগতিশীল বলা চলে না। তুলনামূলকভাবে গরীবদের উপর এই করের চাপ অধিক পড়ে, তাহাও বাঞ্ছনীয় নয়। (২) এই কর আদায় করার শাসনতান্ত্রিক ব্যয় অনেকক্ষেত্রে খুবই বেশি; সুতরাং ব্যয়-নির্বাহ করিয়া বিশেষ উদ্বৃত্ত রাজস্ব পাওয়া যায় না। (৩) সমাজের ভোগ-প্রবণতায় আঘাত দেওয়ায় এই কর মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে। (৪) পরোক্ষ কর প্রদান করিলে লোকের মনে রাজনৈতিক চেতনা ও সজাগ দৃষ্টি জাগ্রত হয় না, রাষ্ট্রের কাজকর্মের উপর অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রেরণা সৃষ্টি হয় না।

পরোক্ষ করের অসুবিধা

যদিও ন্যায়ের দিক হইতে বা কর-প্রদানক্ষমতা বিচার করিলে প্রত্যক্ষ কর তুলনামূলকভাবে অধিকতর কাম্য, কিন্তু বর্তমানকালে রাষ্ট্রসমূহের রাজস্বের প্রয়োজন এত বেশি যে, উভয় প্রকার করই কর-কাঠামোয় স্থান পায়। বরং দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্রমাগত পরোক্ষ করের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

উপসংহার

করের ফলাফল (Effects of Taxation)

ডাল্টনের অভিমতে উৎপাদনের উপর করের প্রভাব তিন দিক হইতে বিচার করা চলে: (১) কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর প্রভাব, (২) কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর প্রভাব, (৩) অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগের দিক্ পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাব।

যদি কর আরোপের ফলে ব্যক্তি তাহার ভোগব্যয় কমাইতে বাধ্য হয় (যেমন মজুরি বা খাদ্যের উপর কর) তাহা হইলে সেই করের ফলে তাহার কর্মোদ্যম ও ক্ষমতা কমিয়া যায়। যাহাদের আয় খুব কম, কিছুই সঞ্চিত থাকে না, তাহারা ব্যতীত অপর সকলেরই সঞ্চয়-ক্ষমতা কর আরোপের ফলে কমিয়া যায়। সাধারণত দেশের আয়-কর একটি নির্দিষ্ট আয়ের ঊর্ধ্ব হইতে ধার্য করা হয়; সেই নির্দিষ্ট আয়ের নিচে বা নিম্ন আয়কারী ব্যক্তিদের আয়কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সুতরাং আয়কর তাহাদের কর্মোদ্যম বা কর্মক্ষমতা সংকুচিত করে না।

কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর ফলাফল

কোন কর সম্বন্ধে যদি এরূপ ধারণা হয় যে, ইহা স্বল্পকাল স্থায়ী হইবে, তাহা

হইলে উহা কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু কোন স্থায়ী কর করদাতার আয়কে স্থায়ীভাবে কমাইয়া দেয়; সুতরাং তাহার কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের যে-শ্রেণীর আয় বেশি, সেই শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর উচ্চহারে কর আরোপণ তাহাদের কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা কমাইা দিবে। ডাল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অধিক (the elasticity of demand for income is large)। নিম্ন আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের উপর কর ধার্য করা হইলে আয় কমিয়া যাওয়ায় তাহা পূরণ করিবার জন্য কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা বাড়িয়া যাইতে পারে। যে-সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিক সংখ্যক পোষ্য আছে বা ব্যক্তি ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট আয় পাইবার জন্য বর্তমানে সঞ্চয় করিতেছে, সেখানে ইহা খুবই সত্য। ডাল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম (the elasticity of demand for income is small)।

কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উহার ফলাফল

যে-শিল্পের উপর অধিক কর আরোপ করা হইয়াছে সেখানে মুনাফার হার তুলনামূলকভাবে কমিয়া যাওয়ায় সেই শিল্প হইতে মূলধন সরিয়া অন্য শিল্পে (যেখানে তুলনায় কর অধিক নহে) চলিয়া যাইতে চাহিবে। অনেক সময়ে এইরূপ মূলধনের ক্ষেত্রান্তরে নিয়োগ সমাজের সামগ্রিক উৎপাদন বাড়াইতে পারে বা সামাজিক উপযোগিতার দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় (যেমন মদ, গাঁজা বা আফিমের উপর কর)। যেমন, আমদানি-শুল্কের ফলে দেশের শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। অনেকক্ষেত্রে এইরূপ কর আরোপনের ফলে মূলধন-নিয়োগের যেরূপ দিক্-পরিবর্তন ঘটে তাহা অবাঞ্ছনীয়, যেমন রপ্তানি-শুল্কের ফলে দেশের রপ্তানি শিল্প হইতে মূলধন সরিয়া আসিতে পারে। অনুপার্জিত মূল্য বৃদ্ধির উপর (Unearned Increment) এবং মূলধনের সকল ব্যবহারের উপর সমভাবে কর স্থাপিত হইলে (যেমন, আয়কর) উপাদানের ক্ষেত্রান্তরে নিয়োগ বা নিয়োগে দিক পরিবর্তন ঘটে না।

উপাদানসমূহের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন সংক্রান্ত ফলাফল

যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে স্থানীয় করের (Local Taxes) হার অধিক হয়, তাহা হইলে মূলধন অপর কোন অঞ্চলে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে।

সাধারণভাবে, কর-আরোপনের ফলে দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কিছুটা ব্যাহত হইবেই। যদি অবশ্য সেই আয় হইতে উপযুক্ত ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে থাকে, তবে সেই ব্যয়ের দরুণ সমাজে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রবণতা করের দরুণ উৎপাদন হ্রাসের প্রবণতা হইতে অধিক হইতে পারে।

উৎপাদন ও কর্ম-সংস্থানের উপর ফলাফল

কয়েকটি কর ও তাহাদের করপাত (Some taxes and their incidence)

১। **আয়কর (Income tax):** সাধারণত, আয়করকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ কর বলিয়া মনে করা হয়। তাহার কারণ হইল করদাতা ইহাকে অপর কাহারও নিকট অপসারণ করিতে পারে না। সুতরাং ইহার করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির উপর এইরূপ ধরিয়া লওয়া চলে। কল্‌উইন্‌ কমিটিও সাধারণভাবে এই মত সমর্থন করিয়াছেন।* এই বিষয়টি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাউক।

কেহ কেহ বলেন যে, ব্যবসায়ীরা তাহাদের উপর আরোপিত আয়করকে কিছুটা অপসারণ করিতে পারে ; দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য বাড়াইতে পারিলেই ক্রেতাদের নিকট অপসারণ করা অনেকাংশে সম্ভব হইল। "কোন ব্যবসায়ী দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করার সময়ে যখন তাহার ব্যয়ের হিসাব করে, তখন সে পরোক্ষভাবে হইলেও চিন্তা করিয়া থাকে যে তাহাকে কি পরিমাণ আয়কর দিতে হইবে, এবং বাজারের অবস্থা তাহার অনুকূল হইলে সে এমন স্তরে দাম স্থির করে যেখানে তাহার ইচ্ছা বা প্রয়োজন অনুযায়ী নিম্নতম নীট আয় সে পাইতে পারে।" †

ব্যবসায়ীদের যুক্তি কিছুটা অপসারণ সম্ভব

কিন্তু ব্যবসায়ীদের এই যুক্তি ধনবিজ্ঞানীরা মানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতে, বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্র ছাড়া, আয়করকে অপসারণ করা চলে না, দামের মধ্যেও ইহা প্রবেশ করে না। যেমন ডাল্টন্‌ (Dalton) বলেন যে, অন্যান্য স্থির ব্যয়ের মত আয়কর কোনরূপ নির্দিষ্ট বা স্থায়ী ধরনের ব্যয় নয় (not a

---

* *The colwyn committee Report on National Debt and Taxation.*

† "When a trader endeavours to ascertain his costs with a view to fix prices, he often takes into account, at least indirectly, the amount of income-tax he will have to pay, and if the market conditions permit, fixes his prices at such a level as would yield to him the minimum net income that he desires to obtain or actually needs." *Evidence of the Association of British Chambers of Commerce before Colwyn committee.*

true overhead charge)। ব্যবসায় হইতে আয়ের ক্ষেত্রে ইহা হইল নীট মুনাফার উপর কর, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যয় বাদ দিয়া যে উদ্বৃত্ত টাকা ফার্মটির হাতে রহিয়া গেল তাহার উপর কর। সুতরাং দামের মধ্যে ইহা প্রবেশ করে না। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ীরা দ্রব্যের জন্য বাজারে কি দাম পাইবেন, তাহা আয়কর দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যেমন, কোন একচেটিয়া ব্যবসাদার যে-বিন্দুতে উৎপাদন ও দাম স্থির করিলে একচেটিয়া রেভিনিউ সবচেয়ে বেশি পাইবে নিশ্চয় সে সেই স্তরেই দাম নির্ধারণ করিবে, কারণ অন্য কোন দামে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হইতে পারে না। তাহার উপর কর আরোপিত হইলেও সে বিন্দুতে দাম স্থির করিবে না, ফলে আয়কর তাহার দামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না।

কেন আয়কর দামের মধ্যে প্রবেশ করে না

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা আরও অসুবিধাজনক। তাহার ক্ষমতা তিন দিক হইতে সীমাবদ্ধ। (ক) প্রতিযোগীর দ্রব্য ও তাহার দ্রব্য আকার ও প্রকৃতিতে সমান; (খ) অন্যান্য প্রতিযোগীদের যোগান নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতা তাহার নাই, সুতরাং সে নিজদ্রব্যের দাম বাড়াইলে অন্যেরা যোগান বাড়াইয়া দিবে, এবং (গ) প্রতিযোগীরা উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইয়া তাহাদের উৎপাদন-ব্যয় কমাইয়া দিবে এবং তাহার চেয়ে কম দামে বাজারে বিক্রয় শুরু করিবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম হইল প্রান্তিক উদ্যোক্তার ব্যয়ের সমান; প্রান্তিক উদ্যোক্তার কোন উদ্বৃত্ত থাকে না, তাহার কর দিবার ক্ষমতা নাই। তাই আয়কর দামের মধ্যে প্রবেশ করে না। প্রান্তিক উদ্যোক্তাকে কর দিতে হইলে সে ব্যবসায় ছাড়িয়া উঠিয়া যাইত, দ্রব্যটির মোট যোগান হ্রাস পাইত, করের দরুণ দাম বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু প্রান্তিক উদ্যোক্তা কর দেয় না, তাই করও দামের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

যৌথমূলধনী কোম্পানীর আয়করের ক্ষেত্রেও (corporate income tax) দেখা যায় যে, ইহার অপসারণ ঘটে না। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ব্যক্তিগত মালিক নহেন, তাই তাঁহাদের মধ্যে অপসারণের চেষ্টা নাই। উপরন্তু, যদিও মুনাফার উৎসবিন্দুতে সমান হারে কর আরোপিত হয় (at a flat rate at the source) তবুও ধনিক শেয়ার-ক্রেতারা অধি-কর (surtax) দেন, আবার কম বিত্তবান শেয়ার ক্রেতারা রিবেট (rebate) ফেরৎ পান। বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি লইয়া

যৌথ কোম্পানীর আয়কর

শেয়ার ক্রেতাগোষ্ঠী গঠিত বলিয়া কোন কোম্পানী দ্রব্যের দাম বাড়াইতে ততটা উৎসুক হয় না। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত ফার্মগুলির উপর বিভিন্ন হারে ও পরিমাণে আয়কর আরোপিত হয়, প্রত্যেকটি ফার্ম উহা দামের সঙ্গে যোগ করিলে বাজারে প্রতিটি ফার্মের দাম পৃথক হইত। কোন কোন ফার্ম তাহাদের প্রতিযোগীদের হটাইয়া দিবার জন্য দাম কম বাড়াইত। দাম বাড়াইবার এইরূপ ঝুঁকি তাই সহসা কোন ফার্ম লইতে পারে না। বিদেশী প্রতিযোগিতার ভয়েও দেশের মধ্যে এইরূপ দাম বাড়ান সম্ভব নহে।

সর্বশেষে, আর একটি কথা বলা দরকার। আয়করের অপসারণ সম্ভব হয় না কারণ যাহাদের উপর কর আরোপিত হইল তাহাদের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা খুব কম, একেবারে নাই বলিলেও চলে। অর্থাৎ আয়কর দিতে হইবে বলিয়া লোকে আয়-করা বন্ধ করিয়া দেয় না, কাজের যোগান দিতেই থাকে। তাহা ছাড়া, আয়কর হইল সাধারণ বা সার্বিক ধরনের (general); ফলে এক ধরনের জীবিকা হইতে সরিয়া গিয়া অপর ধরনে আয় করিলেও তাহাকে কর দিতে হয়; কর-আরোপিত-ব্যক্তি নিজের যোগান কোন দিকে সংকুচিত করিতে পারে না। আয়ের জন্য ব্যক্তির চাহিদাও সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক অর্থৎ আয়ের উপর কর হইলেও সে আয়-করা স্থগিত রাখে না। এই কারণেই আয়-কর এড়ান সম্ভবপর নয়।

ব্যক্তির যোগান ও আয়ের জন্য চাহিদা উভয়ই অস্থিতিস্থাপক

অধ্যাপক সেলিগ্‌ম্যান (Seligman) অবশ্য দুইটি বিশেষ অবস্থার কথা বলিয়াছেন যখন আয়কর দ্রব্যের দামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। প্রথমত, দ্রুত দাম-বৃদ্ধির আবহাওয়ায় উদ্যোক্তারা করের সমান পরিমাণ দাম বাড়াইয়া দিতে পারে। স্বল্পকালে ইহা সম্ভবপর। কিন্তু দীর্ঘকালে, এই শিল্পে বেশি দাম পাওয়া যায় এই প্রলোভনে আরও অনেক ফার্ম প্রবেশ করিবে, তাই দাম কমিয়া আসিবে, করাপসরণ লোপ পাইবে। দ্বিতীয়ত, কোন বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে, অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা সৃষ্টি করিয়া কোন খুচরা দোকানদার যখন কাজকারবার চালায়, তখন এই অবস্থায় সে নিজের উপর আরোপিত করের কিছু অংশ বর্ধিত দামের মাধ্যমে ক্রেতার উপর চাপাইয়া দিতে পারে।

সেলিগ্‌ম্যান কি বলেন

অধ্যাপক রবার্টসনও (Robertson) মনে করেন যে, আয়কর কিছুটা পরিমাণে অপসারণ করা সম্ভবপর। তাঁহার মতে, দ্রব্যটির দাম যদি প্রতিনিধি-

স্থানীয় ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়, তবে দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে অন্তত ধরিয়া লইতে হইবে যে, ঐ ধরনের ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা পাইতেছে। দীর্ঘকালীন এই স্বাভাবিক মুনাফা তাহার প্রান্তিক ব্যয়েরই অন্তর্ভুক্ত। এই স্বাভাবিক মুনাফাই উদ্যোক্তার আয় এবং ইহারই উপর আয়কর লওয়া হয়। আয়কর বাড়িলে এই ধরনের ফার্ম উৎপাদন কমাইবেন, এমন কি একটু উন্নত ধরনের ফার্মগুলিও উৎপাদন হ্রাস করিবে, ইহার ফলে দাম বৃদ্ধি পাইবে। রবার্টসন তাই মনে করেন যে, যদি আয়করের হারে বৃদ্ধি বেশি হয় এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া লইয়া বিশ্লেষণ করা হয়, তবে আয়করের অপসরণ একেবারে সম্ভবপর নয়, এমন কথা বলা চলে না।

রবার্টসন কি বলেন

মাসগ্রেভ্ (Musgrave) প্রমুখ আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরাও মনে করেন যে, কোম্পানীসমূহের উপর নির্ধারিত আয়কর বা মুনাফাকর বহুক্ষেত্রেই দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে। স্বল্পকালে ফার্মের চল্‌তি মূলধন (working capital) হইতে প্রতিদান বা আয়ের ভিত্তিতেই এই কর দেওয়া হয়, তাই উৎপাদন-ব্যয় প্রভাবিত হয়। তাহা ছাড়া, পরিচালনার পরিশ্রমিককে মোটামুটির মুনাফার অংশ বলিয়াই মনে করা চলে ; আয়করের ফলে এই পারিশ্রমিকের অংশ কমিয়া যায়, উচ্চপদস্থ পরিচালকবৃন্দ দাম বাড়াইতে সচেষ্ট হয়। একচেটীয় ও অলিগোপলীয় ব্যবসায়ীরা আয়করের প্রভাবে নিজের উৎপাদন ও দামনীতিতে (output and price policy) পরিবর্তন আনে। সংঘবদ্ধ দর-কষাকষির ক্ষেত্রে ফার্মের মজুরি দিবার ক্ষমতা যখন বিচার করা হয়, তখন আয়কর বাদ দিয়া হিসাব করা হয়। মালিকপক্ষ শক্তিশালী হইলে এই অবস্থায় আয়করের কিছু অংশ শ্রমিকদের উপর অপসারণ করিতে পারেন। দীর্ঘ-কালে আয়করের ফল দেখা যায় দেশে মূলধনের ও উদ্যোগক্ষমতার যোগানের মাধ্যমে।*

মাস্‌গ্রেভ্ কি বলেন

* "The traditional rule that a profits tax cannot give rise to short-run adjustments in price remains a good point of departure, but hardly more. Without falling back upon the 'practical' argument that businessmen do not act in this way, we find a variety of situations where the tax may lead to adjustments in price and output. These include the return to working capital, monopoly pricing under restraint, oligopoly pricing, and situations of collective bargaining where the firm's ability to pay is taken into consideration. Possibilities, such as these throw considerable doubt on the conventional position that price policy remains unaffected in the short tun. In addition, there are the longrun considerations where the tax may act upon the supply of capital and entrepreneurship. On balance, the theoretical argument lead more support to the moderate conclusions that short run adjustments in price (1) play a significant role, and (2) that a part of the tax is passed on, than it lends to the extreme position that no such adjustments occur." Musgrave, *The theory of Public Finance*. P. 286.

একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপর কর (A tax on Monopoly)

একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপর কর দুই উপায়ে আরোপিত হইতে পারে : (১) উৎপাদন-পরিমাণ সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে (independent of monopoly output) অথবা, (২) উৎপাদন-পরিমাণের উপর।

উৎপাদন-পরিমাণ সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে আরোপিত কর দুইটি রূপ লইতে পারে : (ক) মোটমাট কিছু পরিমাণ কর (lumpsum tax) ; অথবা, (খ) একচেটিয়া মুনাফার উপর শতকরা কিছু হারে। এই উভয় ক্ষেত্রেই করপাত হইল একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপর, কারণ ভোগকারী বা ক্রেতাদের উপর দাম-বৃদ্ধির মাধ্যমে করভার অপসারণ করা সম্ভব নয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ী এমন পরিমাণ উৎপাদন করে এবং এমন দাম বাঁধিয়া রাখে যেখানে তাহার নীট একচেটিয়া মুনাফা সবচেয়ে বেশি। এই দাম হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে, অন্য কোন দাম নির্ধারণ করিলে তাহার লাভ কমিয়া যাইবে, সর্বাধিক পরিমাণ থাকিবে না। তাই, (ক) মোটামুটি-কিছু-পরিমাণ কর ধার্য হইলে সে দাম বাড়াইতে চাহিবে না, প্রান্তিক রেভিনিউ (MR) এবং প্রান্তিক ব্যয়ের (MC) সমতার বিন্দুতে উৎপাদন ও বিক্রয় কার্য চালাইতে থাকিবে। সমস্ত করপাত তখন সে নিজেই বহন করিবে, কারণ করের পূর্বে যে দামে তাহার সর্বাধিক রেভিনিউ হইত, করের পরেও সেই দামেই রেভিনিউ সবচেয়ে বেশি। (খ) যদি আমার একচেটিয়া মুনাফার উপর শতকরা কিছু হারে কর আরোপিত হয়, যেমন 15% হারে ; তাহা হইলেও দাম পাল্টাইবার কোন কথা উঠে না। করদানের পরে তাহার নীট রেভিনিউ হইবে সর্বাধিক পরিমাণে (85%)। সুতরাং একচেটিয়ার উপর সমানুপাতিক আয়কর (proportional income tax) বসাইলে উহার করপাত একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপরই পড়িবে।

[ক] মোটামুটি-কিছু-পরিমাণ কর এবং [খ] মুনাফার উপর শতকরা হারে কর

যখন একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উৎপাদন পরিমাণের উপর কর আরোপিত হয়, এবং উৎপাদনে পরিবর্তন আসিলে কর-হারও পরিবর্তিত হয়, তখন এই করের করপাত নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। দ্রব্যটির চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে একচেটিয়া ব্যবসায়ী দাম বাড়াইয়া ক্রেতাদের উপর কর অপসারণ করিতে পারিবে, করপাত তখন ক্রেতাদের

উপর। অপরপক্ষে, দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে, একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে অন্তত কিছুটা করপাত বহন করিতে হইবে, কারণ পূর্ণ কর-পরিমাণে দাম বাড়াইলে চাহিদা বেশি কমিয়া যায়। যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে সে কতটা কর অপসরণ করিতে পারে। যোগান যতটা স্থিতিস্থাপক হইবে, ততই করের বেশি-অংশ ক্রেতাদের নিকট অপসারণ করা সম্ভবপর হইবে। ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইলে করের ফলে দামবৃদ্ধি হইলেও এই দাম পূর্বাপেক্ষা কম হয়, কারণ উৎপাদন কমিয়া যাওয়ার গড় ও প্রান্তিক ব্যয় কমে, এবং এই কম ব্যয়ের সহিত কর-পরিমাণ যুক্ত হয়। আবার ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী থাকিলে উৎপাদন কমিলে গড় ও প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়, ফলে উহার সহিত করের পূর্ণ পরিমাণ যুক্ত হইলে কর-পরবর্তীকালের দাম পূর্ববর্তী দাম অপেক্ষা বেশি হইয়া পড়ে। সুতরাং, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী থাকিলে, হ্রাসমান প্রতিদানের তুলনায়, ক্রেতাদের উপর করের ভার অধিকতর।

উৎপাদন পরিমাণের উপর কর

আমদানি-রপ্তানি-শুল্কের করপাত (Incidence of Import-Export duties)

সাধারণত দেখা যায়, বহির্বাণিজ্যের উপর শুল্ক আরোপ করিলে উহার আর্থিক ভার আমদানিকারী ও রপ্তানিকারী দুইটি দেশের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। করপাতের কতটা অংশ কোন্ দেশ বহন করিবে তাহা নির্ভর করে, চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। চাহিদার তীব্রতা যাহার যত বেশি করপাতের তত বেশি অংশ তাহাকে বহন করিতে হইবে।

যেমন, কোন দেশ আমদানি শুল্ক আরোপ করিলে আমদানিকারী ব্যবসায়ী দামের সহিত উহাকে যুক্ত করিয়া, অর্থাৎ দাম বাড়াইয়া, ক্রেতাদের নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তবে দাম একটু বাড়াইলে চাহিদা অধিক হ্রাসের সম্ভাবনা। এই অবস্থায় আমদানিকারী নিজে করপাত বহন করিতে বাধ্য হইবে। যদি আমরা ধরিয়া লই যে, এই আমদানিকারীরা স্বাভাবিক মুনাফার বেশি পাইতেছে না; তবে তাহারা অন্য ব্যবসায়ে চলিয়া যাইতে থাকিবে। এই

আমদানি-শুল্কের ভার: চাহিদার দিক হইতে

অবস্থায় যোগান কমিবে ও দাম বাড়িবে, উহা ক্রেতাদেরই বহন করার সম্ভাবনা। যদি অবশ্য বিদেশী উৎপাদকের যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়, (অর্থাৎ সে দাম কম পাইলেও উৎপাদন কমাইতে পারে না), এবং তাহার সম্মুখে আর অপর কোন বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে, তবে এই করপাত অনেকটা (বা কিছুটা) বিদেশী উৎপাদকের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া চলে।

আরও একদিক হইতে বিষয়টি বিচার করা চলে : যে দেশ আমদানি শুল্ক আরোপ করিল, সেই দেশে ঐ দ্রব্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কিরূপ। নিজদেশে দ্রব্যটির যোগান যত বেশি স্থিতিস্থাপক ততই দাম বৃদ্ধি কম হইবে, ফলে আমদানি শুল্কের বেশি অংশ বহন করিবে বিদেশীরা। আমদানি শুল্কের ফলে দাম একটু বাড়িলেই দেশের মধ্যে উহার উৎপাদন যদি খুব বাড়ে, তবে স্বভাবতই এই করভারের বেশি অংশ বিদেশী উৎপাদকের দিকে অপসারণ করা চলে। ঠিক এইরূপে বলা চলে যে, বিদেশী যোগান যত কম স্থিতিস্থাপক এবং দেশীয় যোগানের তুলনায় যত কম, তাহাকে শুল্কের তত বেশি অংশের ভার বহন করিতে হইবে।

যোগানের দিক হইতে

রপ্তানি-শুল্কের ভার সাধারণত রপ্তানিকারী নিজেই বহন করে, কারণ কোন একজন রপ্তানিকারী একা বিশ্বের বাজারে একটি দ্রব্যের দাম প্রভাবিত করিতে পারে না। তবে (ক) কোন রপ্তানিকারী যদি একটি দ্রব্যের যোগানে একচেটিয়া অধিকার পায়, অথবা (খ) বিদেশে দ্রব্যটির জন্য চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, (গ) রপ্তানিকারীর সম্মুখে দ্রব্যটির জন্য বিকল্প বাজার থাকে, তবে রপ্তানি-শুল্কের পূর্ণ পরিমাণে দাম বাড়াইয়া উহা বিদেশী ক্রেতার নিকট অপসারণ করা সম্ভবপর।

রপ্তানি-শুল্কের ভার

যদি কোন দেশ প্রধানত কাঁচামাল রপ্তানি করে তবে এই সকল দ্রব্যের জন্য চাহিদা সাধারণত অস্থিতিস্থাপক ; অথচ তাহার আমদানি হইল শিল্পজাত দ্রব্য, উহাদের চাহিদা সাধারণত স্থিতিস্থাপক। এই অবস্থায় সেই দেশের আমদানি-রপ্তানি শুল্কের কিছুটা বিদেশীরা বহন করিবে। কিন্তু যদি বিদেশীদের হাতে এই কাঁচামালের অপর কোন উৎস থাকে, অথবা মাল বিক্রয়ের বিকল্প বাজার থাকে, তবে তাঁহারা মোটেই করভার বহন করিবে না। সুতরাং, দেখা যায় যে, খুব কম ক্ষেত্রেই এই সকল শুল্কের ভার বিদেশীদের নিকট অপসারণ সম্ভবপর।

উপসংহারে আমরা ডাল্‌টনের ভাষায় আমদানি-রপ্তানি শুল্কের করপাত সম্পর্কে মূলনীতি উল্লেখ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন, **"Taxes on imports and exports may be regarded as obstacles to exchange. The direct money burden of any such obstacle is divided between the two parties to exchange in inverse proportion to the elasticities of their respective demands. In other words, it is divided in direct proportion to the urgencies of their respective needs, which are satisfied by the exchange."**

জমি ও বাড়ির পর কর (A tax on land and buildings)

যদি দেশের সকল জমির অর্থনৈতিক খাজনার (economic rent) উপর কর আরোপিত হয়, তবে তাহার করপাত জমির মালিকের উপর পড়ে।

সকল জমির অর্থনৈতিক খাজনার উপর

আমরা জানি খাজনা হইল উৎপাদন—ব্যয়ের উপরে উদ্বৃত্ত (surplus), ইহা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়, সুতরাং দাম বাড়াইয়া জমির ব্যবহারকারীর উপর ইহাকে অপসারণ করা চলে না। এই উদ্বৃত্ত বা খাজনা হইতেই কর দিতে হয়, জমির মালিক তাই এই কর বহন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু যদি মালিকেরা উদ্বৃত্তের সবটুকুই ইতিমধ্যে খাজনা হিসাবে তুলিয়া লইতে না থাকেন, তবে খাজনা বাড়াইয়া করের কিছু অংশ জমির ব্যবহারকারীর উপর অপসারণ করিতে পারেন।

যদি দেশের সকল জমির উপর একসঙ্গে কর আরোপিত না হইয়া কোন একটি বিশেষ শস্য-উৎপাদনকারী জমির উপর আরোপ করা হয়, তবে কিছুটা কর-অপসারণ সম্ভবপর।

কোন বিশেষ শস্য উৎপাদনের ব্যবহারের উপর

যেমন, কেবল চা-উৎপাদনকারী জমির উপর কর আরোপিত হইলে, এই কর এড়াইবার জন্য ঐ জমিতে চা ব্যতীত অন্যান্য শস্য উৎপাদন সুরু হইতে পারে। ফলে চা-এর উৎপাদন হ্রাস পাইবে, ইহার দাম বাড়িবে, ক্রেতারা বর্ধিত দাম দিতে রাজি থাকিলে করের ভার তাহাদের উপর পড়িবে।

আবার, জমি হইতে উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী করহার ধার্য করা

* Dalton, *Public Finance*. P. 57.

হইলে করপাত নির্ভর করিবে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। এই করের দরুণ শস্যের উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, উহাদের দাম বাড়িবে। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে করের পূর্ণ পরিমাণে দাম বাড়িয়া যাইবে, ফলে ক্রেতাদের উপর করপাত হইবে, খাজনা সমানই থাকিবে, জমির মালিক এইরূপ অবস্থায় করাহত হইবে না। অপরপক্ষে, চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে, শস্যের দাম বাড়িলে উহার চাহিদা বিশেষভাবে কমিয়া যায়, উৎপাদন হ্রাস পায়, প্রান্তিক জমিতে উৎপাদন বন্ধ হয়, খাজনা কমে, জমির মালিক কর বহন করে।

উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী করের ভার

বাড়ির উপর কর বসাইলে উহার সর্বশেষ ভার কে বহন করে? ইহার করপাত অন্তত চারিটি শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে: বাড়ির মালিক, বাড়ির ভাড়াটিয়া, বাড়ির নির্মাতা ও বাড়িতে যে দ্রব্যটির ব্যবসায় চলিতেছে তাহার ক্রেতারা। ইহাদের মধ্যে প্রধান দুই শ্রেণীর, অর্থাৎ মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে, সাধারণত করভার বহন করে ভাড়াটিয়ারা, কারণ বাড়ির জন্য চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। তবে করের পূর্ণ পরিমাণ বাড়িভাড়া বাড়াইলে ভাড়াটিয়ারা যদি অন্যত্র চলিয়া যাইতে শুরু করেন, তবে বাড়ির মালিক বাধ্য হইয়া করভার কিছুটা বহন করিয়া থাকেন। বাড়ির উপর উচ্চহারে কর বসাইলে বাড়ি-তৈয়ারীর পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া যায়, নির্মাণকারীরা কম পারিশ্রমিক লইতে রাজি হইলে করের কিছুটা অংশ তাহাদের উপর ঠেলিয়া দেওয়া চলে। বাড়ির উপর উচ্চহারে কর বসাইলে কম বাড়ি তৈয়ারী হইতে পারে, ফলে বাড়িভাড়া বাড়িয়া যাইবে: এই অবস্থায় ভাড়াটিয়া করভার বহন করিবে। কিন্তু ভাড়াটিয়া যদি দোকানদার হয়, তবে সে তাহার জিনিসপত্রের দাম অল্প একটু বাড়াইয়া বর্ধিত ভাড়া ঐ দ্রব্যের ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারে, অর্থাৎ এই কর সে ক্রেতাদের উপর অপসারণ করিতে পারে।

বাড়ির উপর করের ভার চারিটি শ্রেণীর উপর পড়িতে পারে

করের মূলধনীকরণ (Capitalisation of Taxes):

করভার এড়াইবার আইনসঙ্গত উপায় বলিতে গেলে একটিই, ইহা হইল করের মূলধনীকরণ (capitalisation or amortisation of tax)। কোন

ব্যক্তি কোন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করার সময়ে লক্ষ্য করে যে, এই সম্পত্তি হইতে আয়ের উপর কোনরূপ কর আরোপিত আছে কি না। স্থায়ী সম্পত্তির উপর কর আরোপিত থাকিলে উহা হইতে নীট আয় কমিয়া যায়, ফলে নূতন ক্রেতারা এই সম্পত্তির জন্য কম দাম দেয়। ইহাকে বলে করের মূলধনীকরণ। করের পরিমাণকে প্রচলিত সুদের হারে মূলধনে রূপান্তরিত করিয়া সেই হিসাব অনুযায়ী ক্রেতারা সম্পত্তির জন্য কম দাম দিতে প্রস্তুত হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝা যাইবে। মনে কর, একটি বাড়ি হইতে বছরে 100 টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। বাজারে প্রচলিত সুদের হার হইল বাৎসরিক 5%। এই অবস্থায় ঐ বাড়িটির দাম হইবে 2000 টাকা। মনে কর, বাড়ি ভাড়ার উপর 10% হারে নূতন কর বসান হইল। কর দিবার পরে ঐ বাড়ির নীট আয় দাঁড়াইবে 90 টাকা। বাজারে 5% সুদের হার অনুযায়ী এই 90 টাকাকে মূলধনে পরিণত করিয়া দেখা যায় বাড়িটির দাম হইবে 100 টাকা। বাড়ির ভবিষ্যৎ ক্রেতারা জানে যে, উহার আয়ের উপর কর আরোপিত হইয়াছে, তাহারা এই করকে মূলধনে রূপান্তরিত করিয়া, বাড়ির পূর্ব-মূল্য হইতে উহা বাদ দিয়া কম দামে বাড়িটি কিনিবে, এইরূপে ভবিষ্যতে চিরকালের জন্য কর-ভার এড়াইয়া যাইবে। এই ক্রেতা ভবিষ্যতে 10 টাকা কর দিবে, কিন্তু সে যে 200 টাকা কম দাম দিয়াছে, সেই 200 টাকার মূলধন হইতেই 5% সুদের হারে তাহার 10 টাকা আয় হইবে, তাই প্রকৃতপক্ষে কম দামের মাধ্যমে সে কর এড়াইতে পারিয়াছে। আর বাড়ির বর্তমান বিক্রেতা বা মালিক কম দাম পাইয়া এই করভার বহন করিয়াছে।

করের মূলধনীকরণ কাহাকে বলে

এরূপ করভার এড়ান সম্ভব

বাড়ির বর্তমান মালিক দুই দিক দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। করের দরুণ তাহার বর্তমান আয় কমিয়া গেল; আর যদি সে এই আয়-হ্রাস এড়াইবার জন্য বাড়িটি বিক্রয় করিতে চায় তবে তাহাকে কম দামে বিক্রয় করিতে হইবে। কর-আরোপণের পরবর্তীকালের ক্রেতারা কম দামে সম্পত্তি কিনিয়া করের ভার এড়াইতে পারিবে। এইজন্যই একটি কথা চলিত আছে যে "পুরানো করের কোন কর-ভার নাই" ("an old tax is no tax")।

করের এইরূপ মূলধনীকরণ সম্ভব হয় যদি ইহার অনুকূল পরিবেশ থাকে, অর্থাৎ কয়েকটি শর্ত বজায় থাকে। প্রথমত, যে সম্পত্তির আয়ের উপর কর আরোপিত হইতেছে উহা দীর্ঘস্থায়ী ধরনের হওয়া দরকার স্থায়ী না হইলে

করের ফলে উহা হইতে আয় কমিবে, ফলে যোগান হ্রাস পাইবে। তখন উহার দাম বাড়িবে। এইরূপে করভার ক্রেতাদের উপর অপসৃত হইবে। দ্বিতীয়ত, করটি এমন হইবে যে, সকল ধরনের সম্পত্তির উপর ইহা আরোপিত হয় না, কেবল বিশেষ কোন এক ধরনের স্থায়ী সম্পত্তির উপর ইহা আরোপিত হইতেছে। সকল ধরনের সম্পত্তির উপর এই কর বসান হইলে লগ্নীকারীরা সর্বত্রই এই কর দিতে বাধ্য, অপর কোথাও গেলে এই কর এড়ান চলে না। তৃতীয়ত, করটি এমন হইবে যাহাতে ক্রেতাদের নিকট অপসারণ করা সম্ভব হয় না। করের মূলধনীকরণ বলিলে বোঝা যায় সম্পত্তির মূলধনীমূল্য হ্রাস পাওয়া (a reduction in the capital value of the asset); ইহা তখনই সম্ভব যদি এই করের অপসারণ সম্ভব না হয়; চতুর্থত, করের পরেও সম্পত্তির যোগান ও চাহিদার সাধারণ সম্পর্কগুলিতে কোনরূপ পরিবর্তন আসিলে চলিবে না, উহারা মোটামুটি সমানই থাকিবে। যেমন বাড়ির আয়ের উপর কর বসান-র পরে যদি হঠাৎ বাড়ির চাহিদা খুব বাড়িয়া যায়, তবে বাড়ির দাম বাড়িয়া যাইবে, করের মূলধনীকরণ না-ও ঘটিতে পারে।

মূলধনীকরণের শর্তসমূহ

আর একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। এইরূপ সম্পত্তির উপর কর-হার হ্রাস পাইলে বা ইহাদের বিশেষ কোন সুবিধা দেওয়া হইলেও একধরনের মূলধনীকরণ ঘটিতে পারে। কোন সম্পত্তির উপর কর-হার হ্রাস বা কোনরূপ বিশেষ সুবিধাদানের ফলে ওই সম্পত্তির মূলধনী মূল্য বৃদ্ধি পায়। মনে কর, বাড়ি ছাড়া অন্য সকল প্রকার সম্পত্তির উপর কর আরোপিত হইল। এই বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্য, এই সুবিধার আর্থিক পরিমাণকে ক্রেতারা মূলধনে রূপান্তরিত করিবে, এবং বাড়ির জন্য পূর্বাপেক্ষা বেশি দাম দিতে রাজি হইবে।

বিপরীত দিকেও মূলধনীকরণ দেখা দিতে পারে

অনেক ধনবিজ্ঞানী বলিতে চান যে করের মূলধনীকরণ একপ্রকার পশ্চাৎমুখী অপসারণ (backward shifting)। তাঁহাদের মতে নূতন ক্রেতা সম্পত্তির জন্য কম দাম দিয়া করের ভার পুরাতন মালিকদের নিকট ঠেলিয়া দিতেছে, তাই ইহা একপ্রকার অপসারণ। কিন্তু, করের অপসারণ ও মূলধনীকরণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। বিশেষ কোন কর অপসারণের তাৎপর্য হইল প্রতিবার বিক্রয়ের সময়ে এই করের দরুণ দ্রব্যটির মূল্য কর-পরিমাণ পর্যন্ত কমিয়া যাইতেছে, বিক্রেতার নিকট হইতে

কর-অপসারণ ও কর-মূলধনীকরণ এক নয়

কম দামে ক্রেতা দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারিতেছে। কিন্তু মূলধনীকরণ হইলে করের ফলে ভবিষ্যতে কম আয় হওয়া, বাৎসরিক কম আয়গুলিকে বাজারের সুদের হারে মূলধনে রূপান্তরণ, তাহার ফলে সম্পত্তির মূলধনী-মূল্য (Capital Value) হ্রাস পাওয়া, একসঙ্গে অনেক বছরের করের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া। অধ্যাপক সেলিগ্‌ম্যান এইজন্য বলিয়াছেন "If a tax is shifted, it cannot be capitalised ; if a tax is capitalised, it cannot be shifted."

কয়েকটি করের প্রকৃতি ও ফলাফল : আয় কর (Nature and effects of few taxes : Income-tax)

আজকাল পৃথিবীর সকল দেশে কর ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে আয়-কর। সকল প্রত্যক্ষ করের মধ্যে ইহা সর্বপ্রধান। সকল উৎসের মধ্যে আয়-করের স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশি। ক্রমবর্ধনশীল নীতি অনুযায়ী ব্যক্তির প্রদান ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহার হার সাজান চলে। এই কর আদায়ের খরচা কম, তাই ইহা খুবই উৎপাদনশীল (productive)। আয়-কর হইতে সরকারের কত আদায় হইতে পারে তাহা মোটামুটি সঠিক পরিমাণে হিসাব করা সম্ভবপর। আয়-করের আরও একটি সুবিধা এই যে ইহাকে অপসরণ করা চলে না, মোটামুটি ইহার প্রত্যক্ষতা (directness) অপরের তুলনায় বেশি।

আয়করের গুরুত্ব কি

আয়-কর সম্পর্কে আলোচনার সময়ে আরও দুই ধরনের কর সম্পর্কে জানা থাকা দরকার। অতি-কর (super-tax) বলিলে বুঝা যায় ঊর্ধ্ব আয়স্তরে সাধারণ হারের তুলনায় বেশি হারে কর আরোপ করা। অনেক সময় সাধারণ আয় করের সহিত এইরূপ অতি-কর আরোপ করা হয়। ইহাতে ধরিয়া লওয়া হয় যে, কোন এক নির্দিষ্ট স্তরের পরে টাকার বা আয়ের প্রান্তিক উপযোগিতা খুবই কম। যৌথ-কর (corporate-tax) বলিলে বুঝা যায় যৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহের মোট মুনাফা বা আয়ের উপর কর। শেয়ার-ক্রেতার মধ্যে বন্টিত হওয়ার পূর্বে কোম্পানীর আয়ের উপর এই কর আরোপ করা হয়। কর-আদায়ের ব্যাপারে কোম্পানীকেই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করিয়া এই কর আদায় করা হয়।

অতি-কর ও কোম্পানী কর

কথা হইল কর আরোপের দিক হইতে দেখিতে গেলে 'আয়' কাহাকে বলে? ধনবিজ্ঞানে 'আয়' বলিলে ইহার দুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে আসে: প্রথমত, কিছু সময়ের মধ্যে ব্যক্তি ইহা পাইতেছে (flow of receipts during a period of time) এবং দ্বিতীয়ত, তাহার এই পাওয়া নিয়মিত-ভাবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অন্তর বারবার ঘটিতেছে (regularity or recurrence)।

আয়কে আবার তিনভাবেও দেখা চলে: আসল আয়, মানসিক আয় এবং আর্থিক আয়। মূলধন বা শ্রমশক্তি হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়মিতভাবে দ্রব্যসামগ্রীর যে স্রোত পাওয়া যায় তাহাই আসল আয় (Real Income)। এই দ্রব্য সামগ্রী হইতে ব্যক্তি যে তৃপ্তি পায়, তাহার সেই সকল উপযোগিতার স্রোতই ব্যক্তির মানসিক আয় (Psychic Income)। আর আর্থিক আয় (Money Income) হইল মূলধন বা শ্রমশক্তির ভাণ্ডার হইতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত কিরূপ টাকা সে পাইতেছে। কর-আরোপণের দিক হইতে মানসিক আয়ের ধারণা গ্রহণ করা চলে না, কারণ ইহা নিতান্ত অনুভূতির বিষয় এবং সমান আয় পাইতেছে এইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুভূতির মাত্রায় বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। নিখুঁতভাবে কোন ব্যক্তির আসল আয় জানিতে পারা অসুবিধাজনক; ইহার হিসাবও শক্ত। তাই আর্থিক আয়কেই করের ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু ব্যক্তির কর প্রদান ক্ষমতা হিসাব করার ব্যাপারে আর্থিক আয় সম্পূর্ণ নিখুঁত মাপকাঠি হইতে পারে না। অর্থাৎ আর্থিক আয় সমান হইলেও বিভিন্ন ব্যক্তির আসল আয় পৃথক হইতে পারে। তাই অনেক দেশেই, কর আরোপের সময় ব্যক্তির আয় হিসাব করার সময়ে টাকা ছাড়াও "অন্যান্য সুবিধাগুলি" হিসাব করা হয়। নিজের বাড়ীতে থাকা, বেতনের অংশ হিসাবে কোম্পানী হইতে বিনা ভাড়ায় বাড়ি পাওয়া—এই সকল সুবিধা যোগ করিয়া ব্যক্তির মোট আয় হিসাব করা হয়।

আয় বলিলে কি বুঝা যায়

ব্যক্তির আয় হিসাব করার সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার। মূলধন হইতে যাহা পাওয়া যায় সেই আয় হইতে কর দিতে হইবে কিন্তু মূলধন কাটিয়া যেন কর দেওয়া না হয়। কারণ তাহাতে দেশের মূলধন হ্রাস পাইবে। সুতরাং আয়ের সংজ্ঞা নির্ণয়ের সময়ে মনে রাখা দরকার যেন উহার মধ্যে মূলধনকে ধরা না হয়। মূলধনকে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে স্থূল আয় হইতে ক্ষয়-ক্ষতিপূরণ

বাবদ কিছুটা সরাইয়া রাখিয়া তবেই কর-আরোপণযোগ্য নীট আয় হিসাব করা দরকার। অন্তত বাস্তব ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার উপযোগী এমন কোন মানদণ্ড বা সংজ্ঞা চাই যাহাতে স্থূল আয়ের মধ্য হইতে মূলধন ও আয়ের অংশ স্পষ্টভাবে চিনিতে পারা যায়। Value and Capital গ্রন্থে অধ্যাপক হিক্স্ 'আয়' কাহাকে বলে সেই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্যক্তির আয় হইল সেই সপ্তাহে তাহার মোট ভোগব্যয়, যাহার পরেও সে সপ্তাহ-শুরুর অবস্থার মত সমান স্তরে থাকিতে পাবে ("a person's income is what he can consume during the week and still expects to be as well off at the end of the week as he was at the beginning.)। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ব্যক্তি যদি তাহার পূর্ণ আয় ভোগে ব্যয় করে তাহা হইলেও ভবিষ্যতে ঐ পরিমাণ আয় পাইতে তাহার কোন অসুবিধা হয় না। ইহা তখনই সম্ভব হয় যদি তাহার মূলধন অক্ষুণ্ণ থাকে।

মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখা

কর-কাঠামোকে মোটামুটি ন্যায়সংগত করিয়া তুলিতে হইলে নিম্নতম একটি সীমা পর্যন্ত আয়কে করের আওতা হইতে বাদ দিতে হইবে। করমুক্ত এই নিম্নতম আয়-সীমা স্থির করার সময়ে করদাতার জীবনযাত্রার মান এবং তাহার আর্থিক দায়িত্বের কথা স্মরণ রাখা দরকার। উচ্চ আয়স্তরসমূহে আয়করের হার খুব বেশি রাখা হয়, এই সময়ে করদাতার আয়ের উপর নির্ভরশীল লোকজনের সংখ্যা হিসাব করা দরকার। স্যার জোশিয়া ষ্ট্যাম্প আরও অনেক কিছু বিচার করার কথা বলিয়াছেন। যেমন, তাঁহার মতে পরিশ্রম-লব্ধ আয় এবং পরিশ্রম-বিনা আয়ের মধ্যেও পার্থক্য করা দরকার (earned income and unearned income): প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির উপর কর-হার অনেক বেশি হওয়া উচিত।

ন্যায্যতার নীতি

সাধারণত এক বৎসরের মধ্যে আয় হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, অর্থাৎ সেই বৎসর কালীন আয়ের উপরই কর আরোপিত হইয়া থাকে। ক্যালেণ্ডারের হিসাব ধরিয়া বারো মাসের মধ্যে ঐ আয় তখন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। অর্থাৎ, আয় যখন হাতে আসে, তখনই আয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়। মজুরি মাহিনা সুদ প্রভৃতি আয়ের ক্ষেত্রে ইহা কিছুটা সত্য হইলেও মুনাফা বা রয়ালটির ক্ষেত্রে ইহা সত্য নয়। প্রতিষ্ঠি-

আয় কখন হাতে আসিল বা কতদিন ধরিয়া উহা সৃষ্টি হইল

ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, নূতন ব্যবসায় হইতে প্রথমে বেশি আয় হয় না। প্রথমদিকে লোকসান হয়, ক্রমে ব্যবসায়িক সুনাম সৃষ্টি হয়, কয়েক বৎসর পরে উহা হইতে নীট আয় হইতে থাকে। আয়ের পরিমাণ কর-যোগ্য স্তরে উঠিলে মনে হয় যেন উহা সেই চলতি বৎসরকালের মধ্যেই উদ্ভূত হইয়াছে। ফলে সেই করের ভার বেশি বলিয়া মনে হইতে পারে। ডাক্তার, উকিল, লেখক প্রভৃতির আয়ের কথাই ধরা যাউক না কেন। তাঁহারা উপযুক্ত পরিমাণে আয় পাওয়ার পূর্বে অনেক বছর তেমন বেশি কিছু আয় করিতে পারেন না, কিন্তু পরবর্তী কোন বৎসরে আয় বাড়িলে তাঁহারা নিয়মিত আয়শীল ব্যক্তির সহিত সমান হারে কর দেন। ইহা ন্যায়সংগত নয়। যেমন, কোন এক ব্যক্তি প্রথম পাঁচ বছরে খুব কম আয় করিয়া ষষ্ঠ বৎসর হইতে 10000 টাকা আয় করিতে লাগিল। অপর কোন এক ব্যক্তি প্রথম বৎসর হইতেই ঐ আয় পাইতেছিল। উভয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির তুলনায় দ্বিতীয় ব্যক্তির করবহনযোগ্যতা বেশি বলিয়া মনে করা উচিত।

অনেকে তাই কর বহনযোগ্যতার দিক হইতে বিচার করিয়া কয়েক বৎসরের আয়ের গড়কে বাৎসরিক আয় বলিয়া গণ্য করিতে বলেন। ইহার নাম গড়-বৎসর-পদ্ধতি (average-year method)। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ডে এই নীতি গৃহীত ছিল, পূর্ববর্তী তিন বৎসরের গড় আয়কে কর-যোগ্য আয় বলিয়া মনে করা হইত। আবার অনেকে ঠিক পূর্ববর্তী বৎসরের আয়কে করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করিতে বলেন, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ভারতে দেখা যায়। ইহাকে বলে পূর্ববর্তী-বৎসর-পদ্ধতি (Previous year method)। এই দুইটি পদ্ধতির পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধার কথাও সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়।

গড়-বৎসর পদ্ধতি ও পূর্ববর্তী বৎসর পদ্ধতি

পূর্ববর্তী-বৎসর পদ্ধতির পক্ষে প্রধান বক্তব্য হইল করদাতার নিকট ইহা সরল ও সুবিধাজনক (simple & convenient)। কিন্তু এই নীতির ত্রুটি হইল পূর্ববর্তী বৎসরটুকু মাত্র হিসাবে ধরিলে কর-ভিত্তি সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, ইহাতে করদাতার করদানযোগ্যতার সঠিক পরিমাপ হয় না। এই দোষ গড়-বৎসর পদ্ধতির নাই। কিন্তু গড়-বৎসর পদ্ধতির অসুবিধা হইল এই যে, লোকে পূর্বের ভাল বৎসরগুলির হইতে আয়ের কিছু অংশ সঞ্চিত রাখিলে তাহা বিশেষ দেখা যায় না, তাই পরবর্তী বৎসরে আয় কমিয়া গেলে গড় অনুযায়ী কর দিতে বেশ কষ্ট হয়। আয় এবং কর-হার প্রতি বৎসরই বদলাইবে এইরূপ ধারণা থাকায়

গড়-বৎসর পদ্ধতি লোকে আর ততটা পছন্দ করে না। ইংলণ্ডে এই নীতির সমর্থন আর বিশেষ পাওয়া যাইতেছে না। অর্থনৈতিক উঠানামা এবং করহারে প্রতি বৎসর পরিবর্তন, এই দুটি কারণের ফলে পূর্ববর্তী বৎসর পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে অবশ্য পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই বর্তমান-বৎসর পদ্ধতি (current year method) প্রয়োগ করা হইতেছে। এই পদ্ধতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে মাহিনা-ভোগী করদাতাদের উপর। তাঁহারা এই PAYE পদ্ধতিতে (Pay-as-you-earn, অর্থাৎ আয়-করো-আর-দিতে-থাকো) কর দেওয়া খুবই সুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু নীতির দিক হইতে ইহার গুরুত্বপূর্ণ একটি ত্রুটি হইল বর্তমানের চলতি আয় হিসাব করার অসুবিধা। এই পদ্ধতিতে তাই পরবর্তী বৎসরে টাকা ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থাও (refunds) রাখিতে হয়।

চলতি বৎসর পদ্ধতি

আয়করের ফলাফল লইয়া ধনবিজ্ঞানীরা প্রচুর বিতর্ক করিয়াছেন। আমরা উহার মাত্র কয়েকটি দিক লইয়া আলোচনা করিব। প্রথমেই দেখিতে হইবে ব্যক্তির সঞ্চয়ের ও কাজকর্মের ক্ষমতার উপর আয়করের প্রভাব কি (effects on peoples ability to work and save)। আযকরের হার যদি এত বেশি রাখা হয় যে ব্যক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনিতে না পারে তাহা হইলে কাজ ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা নিশ্চয়ই প্রভাবিত হইবে। সুতরাং আয়করের ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে আয়করের হার, কোন শ্রেণীর আযের উপর এই কর আরোপিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন আয়সম্পন্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রা বিচার করিয়া নিম্নতম করমুক্তির যে সীমারেখা টানা হইয়াছে—এই সকল বিষয়ের উপর। প্রতিটি করই লোকের হাত হইতে টাকা টানিয়া তুলিয়া লয়, তাই আযকরও নিশ্চয়ই তাহাদের সঞ্চয়ের ও কর্মোদ্যমের ক্ষমতা কিছুটা কমাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট সঞ্চয় ও কাজের ক্ষমতা কমায় কি না তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে কি পদ্ধতিতে কর হইতে পাওয়া টাকা সরকার ব্যয় করেন তাহার উপর। যদি সরকারী ঋণের উপর সুদ দিবার উদ্দেশ্যে কর-প্রাপ্ত এই টাকাকে ব্যয় করা হয় তবে বণ্ড-মালিকদের আয় বাড়িবে বা ক্রয়শক্তির হস্তান্তর ঘটিবে। সাধারণ করদাতার তুলনায় তাহাদের ভোগপ্রবণতা অনেক কম বলিয়া দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে।

আয়করের ফল কি

সঞ্চয় ও কর্মোদ্যমের ক্ষমতার উপর

লোকের কাজকর্মের এবং সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর আয়করের প্রভাব কিরূপ সেই সম্পর্কে বহু বিতর্ক হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা চলে যে, ইহার অনেকটাই নির্ভর করে করহারের উচ্চতা এবং জনসাধারণের মানসিক অবস্থার উপর। যদি লোকে টাকা চায় সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে বা পরিবারের সকলের নিরাপত্তার জন্য, তবে আয়কর আরোপের ফলে স্বভাবতই তাহাদের কাজের ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে। অধিবাসীদের মধ্যে বিচার-বিবেচনা, ভবিষ্যৎ চিন্তা প্রভৃতি থাকিলে আয়করের ফলে এই ইচ্ছা নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং এই বিষয়ে আমরা সাধারণভাবে বলিতে পারি যে, ব্যক্তির আয়গত স্থিতিস্থাপকতার উপর ইহা নিভর করে। অন্যান্য সকল কিছু সমান অবস্থায়, আয়ের জন্য চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে আয়করের প্রভাবে সঞ্চয় ও কর্মোদ্যমের ইচ্ছা কমিয়া যাইবে। আবার, আয়ের জন্য চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে সঞ্চয় ও কর্মোদ্যমের ইচ্ছা বাড়িয়া যাইবে।

সঞ্চয় ও কর্মোদ্যমের ইচ্ছার উপর

সঞ্চয়ের উপর আয়করের প্রভাব সম্পর্কে ধনবিজ্ঞানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তর্ক আছে। ব্যক্তি যখন আয় করিল তখন সেই সমগ্র আয়ের উপরই সে কর দেয়। কর দেওয়ার পরে অবশিষ্ট আয় হইতেই সে সঞ্চয় করে। সুতরাং এই সঞ্চয়-অংশের উপর একবার কর দেওয়া হইয়া গিয়াছে। পরে যখন আবার সেই সঞ্চয় হইতেই আয় সৃষ্টি হইতে থাকে তখন সেই পরবর্তী আয়ের উপর আবার কর আরোপ করা হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, আয়কর প্রকৃতপক্ষে সঞ্চয়ের উপর ডবল কর আরোপণ (Double Taxation)। মার্শাল পিগু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানীরা আয়করের এই ত্রুটির কথা বলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য স্যার জোশিয়া ষ্ট্যাম্প এই বিষয়ে একটু ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাতে ডবল কর আরোপণ ঘটে না। কারণ পরবর্তী বৎসরের কর ঠিক সঞ্চয়ের উপরই আরোপিত হইতেছে না, উহা আরোপ করা হইতেছে সেই সঞ্চয়-জাত আয়ের উপর। সঞ্চয় হইতে আয় হয় 'অপেক্ষা'-র দরুণ, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কর আরোপিত হইল এই 'অপেক্ষা'র উপর, সঞ্চয়ের উপর নয়। এই বিষয়ে আমরা জোশিয়া ষ্ট্যাম্পের কথা মানিয়া লইতে পারি, কারণ সঞ্চয় যদি পুনরায় আয়সৃষ্টির

ইহা সঞ্চয়ের উপর দুইবার কর-আরোপ করে কি না

কাজে মূলধন হিসাবে নিযুক্ত হয় তবেই আয়-করের আঁওতায় পড়ে ; কেহ সঞ্চয় জমাইয়া রাখিলে তাহাকে আর দ্বিতীয়বার কর দিতে হইবে না।

সর্বশেষে, আয়করের ভূমিকা সম্পর্কে আজকাল দৃষ্টিভংগী অনেকাংশ বদল হইয়া গিয়াছে। বাণিজ্যচক্র রোধের কাজে ইহার কার্যকারিতা (contra-cyclical role) সম্পর্কে আধুনিককালের ধনবিজ্ঞানীরা ইহার গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্ব সাধক (Automatic stabiliser) হিসাবে ইহাকে আজকাল বাজেটের মধ্যে অতি উচ্চ আসন দেওয়া হইতেছে। চক্র-বিরোধী করনীতির (counter-cyclical taxation) একটি প্রধান অস্ত্র হইল এই আয়কর। এইরূপ করনীতির উদ্দেশ্য হইল অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে বেসরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান এবং কর্মসংস্থান স্তরে এই ভোগ ও বিনিয়োগের বৃদ্ধিকে সীমার মধ্যে রাখা, কারণ তাহা না হইলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। অপূর্ণ কর্মনিয়োগেব স্তরে, যখন উৎপাদক ও ক্রেতাদের মধ্যে উপযুক্ত আশার সঞ্চার হইতেছে না, তখন ফিস্‌কাল নীতির প্রধান দিক হইল সরকারী ব্যয়। এই সময়ে করনীতি ততটা সাহায্য করিতে পারে না। এই স্তরের প্রধান কাজ ভোগব্যয় বাড়ান, যাহাতে বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়িতে পারে। কিন্তু আয়স্তর হ্রাস করিয়া ভোগব্যয় সাধারণত বাড়ান যায় না। নিম্ন আয়স্তরে করভার লাঘব করিলে এই বিষয়ে অল্প-কিছু ফল পাওয়া যাইতে পারে। উন্নতির কাল শেষ হইয়া সমৃদ্ধির যুগে সমাজ প্রবেশ করিলে আয়কর ধীরে ধীরে বাড়ান চলে, যাহাতে ফাট্‌কামূলক বিনিয়োগ ও আয় সমাজে ততটা বাড়িতে না পারে। সমাজ যত বাণিজ্যচক্রের শীর্ষদেশে পৌঁছিতে থাকিবে, নিম্ন আয়-শ্রেণীর উপর কর তত বাড়ান দরকার। এইরূপে আয়করকে চক্রবিরোধী কার্যে নিয়োগ করা চলে।

আয়করের চক্রবিরোধী ভূমিকা

আয়করের বিবিধ সমস্যা (Miscellaneous Problems of Income Taxation) :

(১) মূলধনী লাভের সমস্যা (The Problem of Capital Gains) আয়করের যত সমস্যা আছে উহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল মূলধনী লাভের উপর কর-আরোপ করার সমস্যা এবং মূলধনী-লোকসানকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া। কোন ব্যক্তির হাতে যে মূলধন আছে উহার বিক্রয়-মূল্য

যদি পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, তবে তাহার মালিকের মূলধনী লাভ হইল বলিয়া মনে করা হয়। মূলধনী দ্রব্য বা সম্পত্তিটির বিক্রয় করিয়া উহার ব্যয় বা ক্রয়মূল্য অপেক্ষা অধিক নগদ টাকা হাতে আসিলে এই মূলধনী-লাভ ঘটে। অপরপক্ষে বিক্রয় করিয়া ক্রয় মূল্য অপেক্ষা কম টাকা পাওয়া গেলে মূলধনী-ক্ষতি ঘটে। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মূলধনী-লাভ ঘটিলে ব্যক্তির কর প্রদান ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং মূলধনী-ক্ষতি হইলে তাহার করপ্রদান ক্ষমতা হ্রাস পায়। এইরূপ মূলধনী-লাভ কখনও নিয়মিত ঘটে না; ব্যক্তির আয় পাইবার যে সাধারণ চিরাচরিত পথ আছে, তাহার বাহিরে এই আয় বা ক্ষতি দেখা দেয়। মূলধনী লাভের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। (১) ইহাদের অনিয়মিত চরিত্র; (২) কর ভার এড়াইবার উদ্দেশ্যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে খুশিমত ইহাদের ঘটাইবার চেষ্টা করা; এবং (৩) উচ্চ আয়-গোষ্ঠীদের মধ্যেই ইহার অধিকতর প্রাদুর্ভাব। সাধারণ, বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধিকালে মূলধনী-লাভ ঘটিতে থাকে, আর অবনতিকালে মূলধনী দেখা দেয়।

মূলধনী-লাভ ও ক্ষতি কাহাকে বলে:

মূলধনী-লাভকে আয় বলিয়া গণ্য করা চলে বলিয়া অনেক ধনবিজ্ঞানী মনে করেন না। তাঁহাদের মতে আয় হইল মূলধন নামক কোন এক ভাণ্ডার বা সম্পত্তি হইতে নিয়মিত ধারায় যাহা পাওয়া যাইতে থাকে সেই স্রোত। মূলধন হইতে উহার আয়কে পৃথক করা সম্ভব নয়, ইহা অনিয়মিত, উহা মূলধনের বিক্রয় মূল্যের উঠানামা মাত্র; ইহাকে আমরা তাই আয় বলিয়া গণ্য করিতে পারি না।* অপরপক্ষে, ইহা স্পষ্টই যে, মূলধনী-লাভ ঘটিলে করপ্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, কারণ ক্রয় মূল্য অপেক্ষা বিক্রয়

ইহাকে আয় বলা চলে কি না

* "the value of the capital asset may change because of variations in earning prospects ; or it may change because of price variations, even though there be no difference in physical output of goods and services ; or it may change, regardless or any of the above variations, because of flunctuations in interest rates. In short : the capital value is the image in the mirror. It may be magnified by price increases or by a decline in the capitalization rate ; or it may be reduced to less than life size by changes of prices or interest rate in the respective contrary directions. It is mistaking the image for the reality to regard the changes that occur in the reflected and derived value of the capital asset as being in any sense income............The recognition of a realized capital gain as income implies that the gain is in someway severable, that it can be diverted to consumption or in payment of tax, without impairing the wealth of the owner". *Lutz, Public Finance* P. 110.

মূল্য বেশি বলিয়া ব্যক্তির হাতে টাকার পরিমাণ সরাসরি বাড়িয়া যায়। ইহা কর-আরোপ-যোগ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তবে ইহা ঠিক যে, মূলধনী-লাভকে আমরা আয় বলি বা না-বলি ইহাতে ব্যক্তির করপ্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে; এই টাকা তাহার নিকট এমনরূপে আসিতেছে যে তিনি উহা ভোগব্যয় বা সঞ্চয় যাহা কিছু করিতে পারেন। এই টাকা সম্পূর্ণ ব্যয় বা সঞ্চয় করিলেও তাহার ভবিষ্যৎ আয় পাইতে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। তাই উহা করযোগ্য। কিন্তু যদি উহাকে আমরা করযোগ্য বলিয়া মনে করি, তবে মূলধনী-ক্ষতিকেও করের সময় হিসাব হইতে বাদ দিতে হয়।

তবুও ইহা করযোগ্য কেন

কয়েক বৎসরকে হিসাব-কাল বলিয়া ধরিতে হয়, সেই সময়ের মধ্যে লাভ ও ক্ষতি পরস্পর মিটাইয়া নীট মূলধনী লাভ-ক্ষতি হিসাব করিতে পারা যায়। কিন্তু এই সম্ভাবনার সুযোগ থাকিলেই বৃহৎ ব্যবসায়ীরা উহার দৌলতে নিশ্চয় কিছু কর ফাঁকি দিবে। তাহা ছাড়া, বাণিজ্য চক্রের অবনতির যুগে যখন মূলধনী-ক্ষতি ক্রমশ দেখা দিতে থাকিবে, তখন সরকার কিছু কিছু মূলধনী ক্ষতিকে স্বীকার করিয়া লন বটে, কিন্তু ইহার সর্বত্র প্রয়োগ স্বীকার করেন না। ন্যায়-নীতির দিক হইতে ত্রুটি থাকিয়া গেলেও কর-শাসনের সুবিধা বিচার করিলে এই সকল রাষ্ট্র ঠিকই করেন বলিয়া মনে হয়।

আর একটি কথা আছে। সাধারণ আয়কর যে হারে আরোপিত হয়, মূলধনী লাভ-করের হারও সেইরূপ হইবে কিনা। বলা হইয়াছে যে, সাধারণ চলতি

ইহার হার কিরূপ হওয়া উচিত

আয়করের হারে মূলধনী-লাভ-কর আরোপ করিলে মূলধনের বাজারে বহুবিধ সংঘাত সৃষ্টি হয়, আস্থা ও বিশ্বাস ভাঙিয়া পড়ে, এবং মূলধনের বাজারে অস্বাভাবিক ধরনের কাজকর্ম দেখা দেয়। যেমন, অবনতি-কাল শুরু হওয়ার সময়ে সকল ব্যবসায়ীরা তাহাদের শেয়ার বা মূলধনী-সম্পত্তি একসঙ্গে বিক্রয় করিতে উদ্যত হইবে, লোকসান দেখাইতে পারিলে পূর্বের মূলধনী লাভের উপর করভার কিছুটা কম হইবে। সুতরাং উচ্চহারে মূলধনী-লাভের উপর কর আরোপ করার অসুবিধা আছে।

(খ) উপার্জিত আয় ও অনুপার্জিত আয় (Earned Income and Unearned Income)

আয়কে আরও দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; 'উপার্জিত' আয় ও 'অনুপার্জিত' আয়। সাধারণত মজুরি, মাহিনা এইরূপ পরিশ্রমসাধ্য কাজকর্ম হইতে যে

আয় হয় তাহা 'উপার্জিত' আয়: আবার শেয়ারের লভ্যাংশ সুদ প্রভৃতি অনায়াসলব্ধ যে আয় তাহাকে 'অনুপার্জিত' আয় বলে।

'অনুপার্জিত' আয়ের তুলনায় স্বল্পহারে 'উপার্জিত' আয়ের উপর কর বসান হউক এইরূপ কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। স্বল্প আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর বেশির ভাগ আয়ই 'উপার্জিত', জীবিকানির্বাহের উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের আয় ব্যয়িত হয়। উচ্চ আয়-বিশিষ্ট শ্রেণীর বেশির ভাগ আয়ই 'অনুপার্জিত', এইরূপ আয়ের অধিকাংশ বিলাসব্যসনে ব্যয়িত হয়। বিলাসে ব্যয়িত না হইলেও এই আয় আবার সুনিশ্চিত ভাবে এইরূপ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হয় যে, তাহা হইতে আবার 'অনুপার্জিত' আয় সৃষ্টি হইতে পারে।

এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে দুইটি কথা বলা হয়। প্রথমত, বিনিয়োগ হইতে আয় অনেক সময় 'উপার্জিত' মাহিনা ও মজুরির তুলনায় অনেক বেশি অনিশ্চিত। দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগ হইতে তথাকথিত 'অনুপার্জিত' আয়ের অনেকটাই তাহার বুদ্ধি, দক্ষতা ও ক্ষমতার দরুণ প্রাপ্য।

অসুবিধা হইল এই যে করের উদ্দেশ্যে এই দুই প্রকার আয়ের মধ্যে কার্যত পার্থক্য নিরূপণ করা বিশেষ অসুবিধাজনক। 'উপার্জিত' আয়ের তুলনামূলক ভাবে সুবিধা দেওয়ার একমাত্র পথ হইল নিম্নতম করমুক্তির সীমানা যথাসম্ভব উঁচুতে রাখা এবং ক্রমবর্ধনশীল হারে আয়কর আরোপ করা।

(গ) আকস্মিক আয় বা অচিন্ত্যপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি হইতে আয়ের উপর কর (Tax on windfalls or unearned increment)

আকস্মিক আয় (windfall income) বলিলে বুঝা যায় হঠাৎ কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির হাতে বিশেষ কিছু পরিমাণ আয় আসিয়া পড়া। এই আয় সে প্রত্যাশা করে নাই অথবা ইহার জন্য সে কোনরূপ চেষ্টা করে নাই। অধ্যাপক পিগু (Pigou) এই শব্দটিকে আর একটু সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহার মতে, বিনা চেষ্টায় বা বিনা পরিশ্রমে নিজের অজানিতে লোকের সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য বাড়িয়া যাওয়াকেই আমরা আকস্মিক আয় বলিয়া থাকি। সাধারণ ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা দুই ধরনের আয়কর দেখিতে পাই: প্রথমটি হইল জমির মূল্যবৃদ্ধির উপর কর (tax on increment value of land) এবং দ্বিতীয়টি হইল যুদ্ধকালীন অতি-মুনাফার উপর কর (tax on wartime excess profits)।

আকস্মিক আয় কাহাকে বলে: ইহার দুই রূপ

আকস্মিক আয় বা অচিন্ত্যপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির উপর কর আরোপ করার স্বপক্ষে বহু যুক্তি দেখান হইয়াছে। ব্যক্তির মোট আয় যাহাই হউক না কেন, নূতন কোন আয়প্রাপ্তি ঘটিতে পারে এইরূপ ধারণা তাহার মনে কখনই ছিল না, ইহার জন্য সে কোন পরিশ্রম করে নাই। বর্ধিত এই হঠাৎ-আয় হইতে কিছু পরিমাণ কর দিলেও তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় তুলনায় কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না। এই করের স্বপক্ষে আর একটি যুক্তি হইল যে, জমির ক্ষেত্রে অচিন্ত্যপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ঘটে একান্তভাবে সামাজিক কারণে। মালিকের বিনা চেষ্টায়, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, শিল্প-প্রসার, সহর ও গ্রাম ও জনপদের অর্থনৈতিক উন্নতি সব কিছু মিলিয়া জমির এইরূপ অচিন্ত্যপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ঘটে; তাই এই মূল্যবৃদ্ধির কিছু অংশ কর-রূপে রাষ্ট্রের নিকট যাওয়া দরকার।

১। জমির মূল্য-বৃদ্ধির উপর কর

যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত মুনাফা-করের স্বপক্ষেও অনেক যুক্তি দেখান হইয়াছে। স্যার জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে, রাষ্ট্র বহু বিভিন্ন পদ্ধতিতে অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিয়া ব্যবসায়ীদের বহুবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিতে দিয়াছে বলিয়াই তাহারা এই অতিরিক্ত মুনাফা করিতে পারিয়াছে। আর তাহা ছাড়া, যুদ্ধকালীন মুনাফা-বৃদ্ধির উপযোগী চাহিদা ও পরিবেশ সৃষ্টি করাও রাষ্ট্রের কাজের ফল। তাই অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর বসাইয়া উহার কিছু অংশ রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া লওয়া খুবই যুক্তিসংগত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

২। অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর

অতিরিক্ত বলিলেই কোন একটি নির্দিষ্ট মান-এর কথা প্রথমে মনে আসে। যাহার তুলনায় উহা অতিরিক্ত। কোন দেশে যুদ্ধ-পূর্ব দুই বৎসরের গড় মুনাফাকে এই মান হিসাবে ধরা হয়, আবার কোথাও বা তিন বৎসরের গড়কে এইরূপ স্বাভাবিক মান হিসাবে ধরিয়া লয়। এই মানের উর্ধ্বে সরাসরি একটি নির্দিষ্ট হারে (Flat rate) এই কর আরোপ করা হয়।

কিন্তু এই সকল করের আদায়গত বা শাসনগত অসুবিধা খুবই বেশি। যেমন জমির মূল্য যদি বাড়ে তবে প্রথমেই আমাদের জানিতে হইবে এই মূল্যবৃদ্ধি প্রকৃত বা অপ্রকৃত। দীর্ঘকালীন সুদের হার কমিলে বা সকল কিছু দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িলে জমির দাম বাড়িতে পারে। ইহা অপ্রকৃত মূল্যবৃদ্ধি, কর আরোপযোগ্য নহে, কারণ মালিকের বিনিয়োগের বা টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া,

এই সকল করের অসুবিধা

যদি কোন অঞ্চলে এইরূপ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে পারে কিছুকাল পূর্ব হইতেই এইরূপ আশা করা হইতে থাকে, তবে উহাকে আর সম্পূর্ণভাবে আকস্মিক বলা চলে না।

মৃত্যু-কর (Death Duty)

আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্রের করকাঠামোতেই মৃত্যুকর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেছে। এই করের গুরুত্ব বেশির ভাগই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ; ইহা হইতে রাষ্ট্রের রেভিনিউ আদায় হইবে, তাহা নহে। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তাহার সম্পত্তি যখন উত্তরাধিকারীর নিকট হস্তান্তরিত হয় তখন রাষ্ট্রকে এই কর দেওয়ার কথা উঠে। এইরূপ মৃত্যুকর সাধারণত দুই ধরনের : সম্পত্তি-কর (estate duty), উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হওয়ার পূর্বে সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী উহা হইতে এই কর আদায় করা হয়। কর আদায় হইবার পরে ঐ সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হয়। (২) অপরটি হইল উত্তরাধিকারী কর (inheritance tax)। ইহাতে মূল সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হইলে প্রত্যেকে যে-অংশ পাইত তাহাকে করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়।

মৃত্যুকর কাহাকে বলে : ইহার দুইটি রূপ

প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রথমে এইরূপ মৃত্যুকর আরোপ করিয়াছে, পরে শিক্ষিত জনমতের নিকট ইহাকে গ্রহণীয় করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে ধনবিজ্ঞানীরা ও রাজনীতিক পণ্ডিতেরা ইহার স্বপক্ষে বহুপ্রকার যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন। প্রথমত, উপকারিতা তত্ত্ব (benefit theory) অনুযায়ী বলা হইয়াছে যে, সমাজে সকল অধিকার সৃষ্টি করিয়াছে রাষ্ট্র। আমার ইচ্ছামত সম্পত্তি অপরকে দান করার অধিকার সম্ভব হইয়াছে রাষ্ট্রের ফলে, এই উপকারের বিনিময়ে সম্পত্তির কিছু অংশ কর হিসাবে রাষ্ট্রের প্রাপ্য। দ্বিতীয়ত, ধনতান্ত্রিক সমাজে আয় ও সম্পদবৈষম্য দেখা দিবেই। এই সমাজ-ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হইলে আয় ও সম্পদ-বৈষম্যের পরিধি সংকুচিত করা প্রয়োজন। তাই সম্পত্তি-কর বা উত্তরাধিকার-কর আরোপিত হওয়া দরকার। তৃতীয়ত, অনেক সময় ইহার সমর্থনে অতীত-করের তত্ত্ব (back-tax theory) প্রয়োগ করা হয়। অতীতে ব্যক্তির জীবদ্দশায় কর ফাঁকি দিয়া এই সম্পত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাই মৃত্যুকরের সাহায্যে একেবারে সেই সকল প্রাপ্য আদায় হইয়া

মৃত্যুকরের স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ

গেল—অনেকে এইরূপ বলিতে চাহেন। চতুর্থত, আজকাল ইহা সমর্থন করা হয় ব্যক্তির প্রদানক্ষমতার নীতি অনুসারে (ability to pay principle)। বলা হয় যে, যদিও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি একেবারে আকস্মিক (windfull) নয়, তবুও ইহার ফলে হঠাৎ ব্যক্তির হাতে করপ্রদানক্ষমতার উদ্ভব হয়। এইরূপ বিশেষ-যোগ্যতার নীতি (principle of special ability) অনুযায়ী আমরা বলিতে পারি যে মৃত্যুকর সমর্থনীয়। পঞ্চমত, করবহন-যোগ্যতার নীতি অনুযায়ী এই কর শুধু সমর্থনীয়ই নয়, ইহার ক্রমবৃদ্ধির হারও অবশ্য বাঞ্ছনীয়। সম্পত্তির পরিমাণ যত বেশি, করদানের ক্ষমতাও তত অধিক। তাই ক্রমবর্ধনশীল হারে এই কর আরোপ করা সম্ভবপর। উত্তরাধিকারের মধ্যে আকস্মিকতার উপাদান যত বেশি, ক্রমবর্ধনশীলতার মাত্রাও তত বাড়ান চলে। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক যত দূরবর্তী, আকস্মিকতার মাত্রা তত বেশি; করহারও বেশি রাখা সম্ভব। প্রদানক্ষমতার নীতি অনুযায়ী, তাই, মৃত্যুকরকে দুই দিক দিয়া ক্রমবর্ধনশীল করিয়া তোলা চলে: সম্পত্তির আয়তনের দিক হইতে, এবং, উত্তরাধিকারীর মৃত ব্যক্তির সহিত সম্পর্কের নিকটবর্তিতার দিক হইতে।

সম্পত্তি-কর ও উত্তরাধিকার-করের মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথম ধরণের করটি দ্বিতীয় ধরনের অপেক্ষা প্রয়োগের দিক হইতে অধিকতর সুবিধাজনক। প্রথম ধরনের করটিতে কেবল সম্পত্তির পরিমাণের দিকে তাকাইলেই চলে, কিন্তু উত্তরাধিকার-করটিতে আরও অনেক কিছু বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়। উত্তরাধিকার-করে ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা সম্পর্কে অধিকতর নজর রাখা যায়; সম্পত্তি-করে তাহা সম্ভব হয় না। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে একজন পাইলে কর হিসাবে যাহা দেওয়া উচিত আর পাঁচজন পাইলে কর হিসাবে যাহা দেওয়া উচিত—ইহাদের পরিমাণ সমান হইতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবে করভার বহন করে ব্যক্তি, সম্পত্তি নয়, তাই কেবল সম্পত্তির পরিমাণের দিকে তাকাইয়া উত্তরাধিকারীদের অংশের কথা বিচার না করিয়া কর আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে ইহাদের মধ্যে তুলনার সময়ে উত্তরাধিকার-করের বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলার আছে। যাহাতে কর কম দিতে হয় সেইজন্য মৃত ব্যক্তি এমনভাবে

সম্পত্তিকর ও উত্তরাধিকার করের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

সম্পত্তির বণ্টন নির্দিষ্ট করিয়া যাইতে পারেন যাহাতে কাহারও খুব কম আবার কাহারও খুব বেশি প্রাপ্য হইল। করদানের পর সকলে সমান পাইবে—এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে বেশি দূরবর্তী সম্পর্কের উত্তরাধিকারীকে বেশি কর দিতে হইবে বলিয়া তাহাদেরই সম্পত্তির বেশি অংশ দিয়া নিকটবর্তীদের করভার কম বলিয়া কম সম্পত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন। সুতরাং উত্তরাধিকার-কর ব্যক্তির মনে সম্পত্তি-বণ্টনের স্বাভাবিক ধরন বদলাইয়া দিতে পারে।

আধুনিক কালে কেইন্সীয় ধনবিজ্ঞান এইরূপ মৃত্যুকরের পক্ষে আর এক ধরনের সমর্থন তুলিয়া ধরিয়াছে। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা আয়-বণ্টন চাহিতেন নীতিগত (ethical) কারণে। কিন্তু কেইন্স ও তাঁহার অনুগামীরা ইহা পছন্দ করেন নিছক বৈজ্ঞানিক কারণে; তাঁহাদের মতে, অর্থ নৈতিক কারণে। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীদের মন ছিল দ্বিধা-বিভক্ত। দ্রুত শিল্পপ্রসার ও অর্থ নৈতিক অগ্রগতির প্রয়োজনে প্রভূত সঞ্চয় দরকার, এবং তাহা কয়েকটি হাতে কেন্দ্রীভূত থাকা প্রয়োজন, তাই আয়-বৈষম্য থাকা চাই। ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের নীতিবোধ বা কল্যাণাকাংখা এই আয়-বৈষম্য সহ্য করিতে পারিত না। দ্বিখণ্ডিত-বিবেকের যন্ত্রণা তাঁহাদের সহ্য করিতে হইত। কিন্তু কেইন্সের সময়ে ধনতন্ত্রের প্রসার-গতি শ্লথ হইয়া আসিয়াছে, ইহার অচলাবস্থা দেখা দিয়াছে।

কেইন্সীয় দৃষ্টিতে এই করকে দেখা

সংকট ও জড়ত্বের কারণ হিসাবে কেইন্স দেখাইলেন ভোগ ব্যয়ে ঘাটতি, যাহা আয়-বৈষম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। অর্থ নৈতিক কাঠামোর প্রাণশক্তি জাগাইতে হইলে ভোগব্যয় বাড়ান দরকার, এবং ইহারই জন্য চাই স্বল্প প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা সম্পন্ন ধনীর নিকট হইতে টাকা সরাইয়া আনিয়া অধিক প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাসম্পন্ন দরিদ্রের হাতে উহা তুলিয়া দেওয়া। মৃত্যুকরের সাহায্যে ইহা সম্ভব, তাই ইহাকে দেশের আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াইবার উপযোগী কর-নীতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

মৃত্যুকরের করপাত (incidence of death duty) কাহার উপর সেই সম্পর্কে বহু বিতর্ক দেখা দিয়াছে। একদল বলেন যে ইহা মৃত ব্যক্তির উপর, অপর দল বলেন যে ইহা উত্তরাধিকারীদের উপর, এবং তৃতীয় দল বলেন যে, ইহা উপরের দুই শ্রেণীর কাহারও উপর নয়, উহা সেই সম্পত্তির উপর। প্রথম

দলের অভিমতে মৃতব্যক্তি ঐ সম্পত্তি বণ্টনের অধিকারী, তাই কর-পাত তাঁহারই উপর। যদি তিনি এমন কোন বীমা ব্যবস্থা বা ভাণ্ডার তৈয়ার করিয়া যান যাহা হইতে কর দেওয়া হইল, তবে প্রকৃতপক্ষে কর-ভার তাহারই উপর পড়িল। কারণ এই বীমা বা ভাণ্ডার তৈয়ার করিতে তাঁহাকে বর্তমানের বিশ্রাম ও ভোগ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। মৃত্যুকরকে যদি কেহ অপেক্ষমান আয়-কর বলিয়া মনে করে (as deferred income tax) তবে উহার করপাত মৃতব্যক্তির উপরই মনে করা চলে। অপরদিকে, দ্বিতীয় মতের পক্ষেও বলার কম নাই। করপাত উত্তরাধিকারীদের উপর কারণ কর তাঁহারাই দেন, মৃতব্যক্তির নিকট হইতে কর আদায় করা চলে না। উত্তরাধিকারীদের নিজস্ব অংশ, তাহাদের আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থা এবং মৃতব্যক্তির সহিত সম্পর্কের নৈকট্য বা দূরবর্তিতা—এই সকল বিষয় বিচার করিয়া কর আরোপ করা হয়, সুতরাং আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে করপাত উত্তরাধিকারীদের উপর। এই দুই মতের মধ্যে কাহাকেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না, তাই এই বিতর্কের অবসান এখনও হয় নাই। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে করপাত নিশ্চয় উত্তরাধিকারীদেরই উপর, কারণ মৃতব্যক্তির পকেট হইতে টাকা বাহির করা চলে না। কিন্তু যদি মৃত্যুর পূর্বে সেই ব্যক্তি করের কথা চিন্তা করিয়া উহা বহন করার উদ্দেশ্যে সুবৃহৎ সম্পত্তি গড়িয়া তুলিতে থাকেন যাহাতে কর দিবার পরেও উত্তরাধিকারীরা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিবে, অথবা তিনি যদি করদানের উদ্দেশ্যে কোনরূপ বীমার পলিসি বা ভাণ্ডার নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া যান, তবে কি মৃতব্যক্তির উপর করপাত বর্তাইল না? আবার অপরপক্ষে মৃতব্যক্তি যদি করের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া সম্পত্তি গড়িয়া তোলে, তবে উহার করপাত স্পষ্টতই উত্তরাধিকারীর উপর। করপাত কে বহন করে ইহা তাই মৃতব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ইচ্ছা বহু বিচিত্র রূপ লয় বলিয়া এই সম্পর্কে কোনরূপ সাধারণ সূত্র বা নিয়ম গঠন করা চলে না।

মৃত্যুকরের করপাত: তিনটি মত

করপাত মৃত ব্যক্তির উপর হইতে পারে, জীবিত উত্তরাধিকারীদের উপর হইতে পারে; আংশিকভাবে উহার কিছুটা উভয়েই বহন করিতে পারে—এইরূপ অনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এড়াইবার জন্য তৃতীয় একদল বলিতে চাহেন যে মৃত্যুকরের করপাত জীবিত কি মৃত কাহারও উপর নয়, উহা সম্পত্তির উপর। কিন্তু এইরূপ উপসংহার গ্রহণ করা চলে না। তাহার কারণ হইল যে,

কেবলমাত্র সম্পত্তির পরিমাণের উপরই করের হার নির্ভর করে না, আর তাহা ছাড়া কর দেয় ব্যক্তিরা, কোন বিষয় সম্পত্তি নিজ হইতে কর দিতে আগাইয়া আসে না।

মৃত্যুকর ও আয়-করের ফলাফল তুলনা করা দরকার (Comparison of the effects of Death duties and Income-tax)। আমরা জানি, মৃত্যুকরকে অপেক্ষমান আয় কর (deferred income-tax) বলিয়া মনে করা চলে। আয়করের ক্ষেত্রে, প্রতি বৎসর আয়ের উপর কর আরোপিত হয়, কিন্তু মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে সেই আয়কর প্রতি বৎসর না তুলিয়া অপেক্ষা করা হয়, মৃত্যুর সময়ে একসঙ্গে পূর্বের সকল কর তুলিয়া লওয়া চলে। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতিতে সমান পরিমাণ রেভিনিউ তোলা সম্ভবপর। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য হইল এইটুকু যে আয়করের ক্ষেত্রে করের ভিত্তি (tax base) হইল তাহার বাৎসরিক আয়, আর মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে ইহা হইল তাহার সঞ্চিত মূলধন। কিন্তু এই তুলনা আর বেশিদূর টানা চলে না, কারণ কোন এক ব্যক্তি সারাজীবন আয় করিয়া কোনরূপ সঞ্চয় না করিয়া সকল আয় ব্যয় করিতে পারে। কেবলমাত্র মৃত্যুকর থাকিলে এই ব্যক্তির নিকট হইতে কোনরূপ কর আদায় করা যায় না। সুতরাং ইহাদের তুলনা করিতে হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, বিনিয়োগ-আয়ের উপর কর (a tax on investment income) এবং মৃত্যুকর—উভয়ের তুলনামূলক ফলাফল কি। এই দুই প্রকার করের ফলাফল সাধারণত দুইটি অংশে আলোচনা করা হয়: বাস্তব ফলাফল (physical effects) ও মনস্তাত্ত্বিক ফলাফল (physchological effects)।

মৃত্যুকর ও আয়করের তুলনা

বাস্তব ফলাফল বিচার করিলে দেখা যাইবে বিনিয়োগ-আয়ের উপর কর অপেক্ষা মৃত্যুকরের প্রভাব ব্যক্তির সঞ্চয়ের পক্ষে অহিতকর ও হানিকর। বাৎসরিক আয় হইতে আয়কর দিতে হয় তাই ব্যক্তি তৎকালীন ভোগব্যয় কমাইয়া সেই কর দিয়া দেয়। কিন্তু মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে তাহা হয় না, ব্যক্তি তাহার ভোগ কমায় না। তাই ব্যক্তির মূলধন কাটিয়া মৃত্যুকর দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ আয়করের তুলনায় মৃত্যুকরের আওতায় ব্যক্তির সঞ্চয়ের ইচ্ছা তুলনামূলকভাবে কম।

বাস্তব ফলাফল : আয়কর উন্নততর

ব্যক্তি যদি মৃত্যুকর দেওয়ার জন্য বীমাব্যবস্থা করিয়া রাখে এবং প্রিমিয়াম দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে ভোগ কমাইয়া সঞ্চয় করিতে থাকে, তাহা হইলেও

আয়করের তুলনায় ইহা ব্যক্তিগত মূলধন-সঞ্চয়ের অধিকতর প্রতিকূল। ইংলণ্ডের কল্‌উইন্ কমিটিও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন।

কিন্তু সঞ্চয় ও মূলধন-গঠনের মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, মৃত্যুকর তুলনামূলকভাবে উন্নততর। আয় বাড়াইলে কর দিতে হইবে; তাই নির্দিষ্ট কোন এক সীমার পরে ব্যক্তি আর আয় বাড়াইতে না-ও ইচ্ছুক হইতে পারে। এইরূপে আয়কর কাজের ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমাইয়া দেয়। কিন্তু মৃত্যুকরের এইরূপ কোন বিরূপ প্রভাব নাই, কারণ ব্যক্তি তাহার জীবদ্দশায় কোনরূপ কর দিতেছে না। বংশধরেরা সম্পত্তি কম পাইবে এই চিন্তায় অবশ্য কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কিছুটা কম হইবে, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই নিজের জীবদ্দশায় ধনী বলিয়া পরিচিত হওয়ার অহংবোধ তৃপ্ত করিতে চায়। মৃত্যুকর এই ইচ্ছাকে কোনরূপ বাধা দেয় না। পুত্রকন্যাদের নিরাপত্তা-ই যদি প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয় তাহা হইলেও মৃত্যুকর উন্নততর। কারণ লোকে ইহাদের নিরাপত্তা বাড়াইবার জন্য কর-প্রদানের পরেও সম্পত্তির পরিমাণ বেশি রাখার উদ্দেশ্যে বর্তমানে কর্মোদ্যম ও ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দিতে পারে। সুতরাং সঞ্চয় ও কর্মোদ্যমের ইচ্ছার উপর প্রভাব তুলনা করিলে মৃত্যুকর অপেক্ষাকৃত ভাল।

মনস্তাত্ত্বিক ফলাফল : মৃত্যুকর উন্নততর

ব্যয়কর (The Expenditure Tax) :

আধুনিককালে অধ্যাপক নিকোলাস্ ক্যাল্‌ডর (Nicholas Kaldor) করের ভিত্তি (base) হিসাবে ব্যক্তির আয়ের পরিবর্তে তাহার ব্যয়কে গ্রহণ করার কথা বলিয়াছেন। আয় অথবা ব্যয়—কিসের ভিত্তিতে ব্যক্তির নিকট হইতে কর তোলা হইবে, তাহা লইয়া বহুশতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীতে বাদানুবাদ চলিয়াছে। হব্‌সের লেখা হইতে সুরু করিয়া জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল, মার্শাল পিগু, আরভিং ফিশার ও আরও অনেকে করের ভিত্তি হিসাবে ব্যয়কে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

ব্যয়-করের পুনরুজ্জীবন

বিশেষ কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হইলে উহাকে পণ্যকর বা বিক্রয়কর বা আংশিক ব্যয়কর বা বিশেষ ব্যয়কর (Partial outlay tax) বলে। কিন্তু সাধারণ ব্যয়কর (General Expenditure tax) ইহা হইতে পৃথক। সাধারণ ব্যয়কর আরোপিত হয় ব্যক্তির মোট ভোগব্যয়ের উপর; ইহা প্রত্যক্ষ করও বটে। আয়-করের মতই নির্দিষ্ট কিছু নিষ্কৃতির সীমা,

(exemption limit) বাদ দিয়া ইহা ক্রমবর্ধমান হারে আরোপ করা চলে। তবে করের ভিত্তি হিসাবে আয় ও ব্যয় একটু পৃথক বটে। লোকের মোট আয়ের এক অংশ হইল ব্যয়, অপর অংশ সঞ্চয় বা নীট সম্পদের বৃদ্ধি। সুতরাং কর ভিত্তি হিসাবে আয়ের তুলনায় ব্যয় সংকীর্ণতর। আয়কে যদি সম্পদের নিয়মিত স্রোত হিসাবে ধরা হয়, তবে এই সম্পদের এক অংশ যাহা ভোগের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইতেছে শুধু সেই অংশের উপরই কর আরোপিত হইবে। যে সকল ব্যক্তি আয় অপেক্ষা বেশি ব্যয় করে, তাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর অপেক্ষা ব্যয়করে কর-ভিত্তি অধিকতর প্রসারিত।

বিক্রয়-কর ও আয়-কর হইতে ইহার পার্থক্য কি

ব্যক্তির বাৎসরিক মোট ব্যয় হিসাব করা যাইবে কি উপায়ে? ক্যালডরের মতে ইহার উপায় হইল: প্রথমে, বৎসরের সুরুতে তাহার নগদ টাকা ও ব্যাঙ্ক-আমানতের পরিমাণ হিসাব করিতে হইবে; উহার সহিত বৎসরের শেষে সেই বৎসরে তাহার সকল আয় ও উপহার (gifts) যোগ করিতে হইবে। এই যোগ-ফল হইতে বাদ দিতে হয় বৎসরের শেষে তাহার নগদ টাকা ও ব্যাঙ্ক-আমানত এবং এই বৎসরের সকল ঋণদান ও বিনিয়োগ। এইরূপে ব্যক্তির বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ জানিতে পারা যায়।

আয়করের তুলনায় ব্যয়কর অনেকদিক হইতেই উন্নততর, অধ্যাপক ক্যাল্ডর ইহা মনে করেন। প্রথমত, ব্যক্তির করবহনযোগ্যতার সঠিক পরিমাপ তাহার আয় হইতে পাওয়া যায় না, তাহার ব্যয়ই ইহার উপযুক্ত মানদণ্ড। আয়ের মধ্যে অনেক বিষয় ধরা হয় না, যেমন হঠাৎ কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা হইতে আয়, অনিয়মিতভাবে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় এইরূপ আয় অথবা মূলধনী-লাভ প্রভৃতি। এই সকল ধরনের টাকা ব্যক্তির করবহন-যোগ্যতাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথচ আয়ের মধ্যে এই ধরনের বিষয়গুলি ধরা হয় না বলিয়া ইহাদের উপর হইতে কর আদায় করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ব্যয়করের এই ত্রুটি নাই। নিয়মিত বা অনিয়মিত, হঠাৎ লাভ বা মূলধনী লাভ, সম্পত্তি বা পরিশ্রম, যে কোন সূত্র হইতেই ব্যক্তির হাতে টাকা আসুক না কেন, ব্যয় হইলেই উহার উপর কর আরোপিত হইবে।

১। করবহনযোগ্যতার দিক হইতে বিচার করিলে

দ্বিতীয়ত, ক্যাল্ডর এই করের স্বপক্ষে ন্যায্যতার কথা তুলিয়াছেন। এই সূত্রে

তিনি হবসের বক্তব্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, লোকে জাতীয় সম্পদের সাধারণ-ভাণ্ডারে (Common pool) কি পরিমাণ যোগ করিতে পারে তাহা অপেক্ষা এই ভাণ্ডার হইতে সে নিজে কতটা সম্পদ গ্রহণ করিতেছে তাহারই ভিত্তিতে কর দেওয়া উচিত। ব্যক্তির বর্তমান ও প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে তাহার ভোগব্যয়ের উপর। বর্তমানে সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতে ব্যয় করিলে সর্বশেষস্তরে ভোগের সময় এই করের মাধ্যমে তাহা ধরা পড়িবে। পুরাণো এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সঞ্চয় হইতে ব্যয় করিলে, ন্যায্যতার দিক হইতে বিচার করিয়া বলা চলে যে, সেই ব্যক্তির কিছু কর রাষ্ট্রকে নিশ্চয় দেওয়া উচিৎ। ন্যায়ের দিকে তাকাইয়া ব্যয়করের স্বপক্ষে আরও অনেক কথা বলা চলে। বিভিন্ন ব্যক্তির আয় সমান থাকিলেও তাহাদের দায়িত্ব এবং নিজস্ব স্বভাব পৃথক থাকায় ব্যয়ের পরিমাণ পৃথক হইতে পারে। সুতরাং ব্যয়ের পরিমাণই ন্যায়ত কর-আরোপনের ভিত্তি হওয়া উচিৎ। তাহা ছাড়া আয়করের বিরুদ্ধে মার্শাল-পিগু-ফিসারের সমালোচনাও মনে রাখা দরকার। তাঁহাদের মতে আয়করের ফলে সঞ্চয়ের উপর ডবল কর আরোপন (Double taxation) ঘটে। ব্যক্তির যে আয় সঞ্চিত হয়, তাহার উপর সে প্রথমে একবার কর দেয়, তাহার পরে সেই সঞ্চয় হইতে যতবার আয় হয় প্রতিবার ব্যক্তিকে কর দিতে হয়। ব্যয়করে এইরূপ ঘটে না, কারণ যে অংশ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা করের আঁওতার মধ্যে পড়ে না। তৃতীয়ত, ক্যাল্‌ডরের মতে আয়-করের ফলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা হ্রাস পায়।*

২। ন্যায্যতার দিক হইতে বিচার করিলে

ক্যাল্‌ডর দেখাইয়াছেন যে, ইংলণ্ডের উচ্চ আয়শ্রেণীর লোকেরা আরও বেশি সঞ্চয় করা ছাড়িয়া দিয়াছে, কারণ আয়-করের প্রান্তিক হার (marginal income-tax rates) এত বেশি যে বর্ধিত সঞ্চয় হইতে আয় বাড়িলে ব্যক্তিকে উহাপেক্ষা অনেক বেশি টাকা কর হিসাবে দিয়া দিতে হয়। ব্যয়কর আরোপ করিলে, এই

৩। সঞ্চয়ের উপর ইহার প্রভাব

* ......"income taxes, by reducing the net income from savings, distort the choice of the individual between present and future consumption, by making the latter less attractive than it would otherwise be. Persons are prevented from making their choices in terms of the relative costs to society of providing goods at various times, as reflected in the interest rate. In simple terms, persons are given added incentive to consume now." Due, *Government Finance*, P. 275.

অবস্থা দূর হইবে। নানাবিধ ব্যয়ের আতিশয্য লোপ পাইবে, সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে। অনুন্নত দেশসমূহে, তাই, ব্যয়-করের গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ এই সকল দেশে উন্নত দেশগুলির জীবনযাত্রার মান "অনুকরণ করার" ইচ্ছা খুবই বেশি (Demonstration effect)। মূলধন-গঠনে সাহায্য করার কাজে এই করকে তাই প্রয়োগ করা চলে।

চতুর্থত, বিনিয়োগের উপরও আয়করের তুলনায় ব্যয়করের প্রভাব ভাল, ক্যালডর ইহা মনে করেন। আয়-করের ফলে কোম্পানী ও ধনীব্যক্তিদের হাত হইতে বিনিয়োগযোগ্য টাকার পরিমাণই কেবল কমিয়া যায় না, বিনিয়োগের ইচ্ছাও হ্রাস পায়, কারণ বর্ধিত আয় হইতে বৃহৎ অংশ আয়কর হিসাবে সরকারকে দিয়া দিতে হইবে। তাই, ক্যাল্‌ডরের মতে, আয়করের ফলে ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগে মূলধন নিযুক্ত হইতে চায় না। ব্যয়করের সেইরূপ কোন অসুবিধা নাই, কারণ আয় ও সঞ্চয় বাড়াইলে উহার কর আরোপিত হয় না, একমাত্র ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িলেই বেশি কর দিতে হইবে।

৪। বিনিয়োগের উপর ইহার প্রভাব

৫। কর্মোদ্যমের উপর ইহার প্রভাব

পঞ্চমত, আয়করের তুলনায় কর্মোদ্যমের উপর ব্যয়করের প্রভাব ভাল ইহাও দেখান চলে, ইহার কারণ হইল সঞ্চয় করিয়া ব্যয়কর এড়ান চলে, কিন্তু আয়কর এড়াইবার কোন পথ নাই।

ব্যয়করের বিরুদ্ধেও যুক্তির কোন অভাব নাই। প্রথমত, ন্যায়ের দিক হইতে দেখিলে ইহার প্রধান ত্রুটি হইল পক্ষপাতদুষ্টতা (discrimination)। যাহারা অধিক ব্যয় করে বা ব্যয় করিতে বাধ্য হয় তাহাদেরই উপর কর আদায় হয়; কিন্তু যাহারা ব্যয় না করিয়া টাকা মজুত করে, তাহারা করের হাত হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইতে পারে। ইহাতে সঞ্চয়শীল ধনিকদের বা কৃপণ লোকদের অধিকতর সুবিধা; বড় পরিবার বা বিভিন্ন কারণে ব্যয় বেশি হয় এইরূপ পরিবারের অসুবিধা। তাই ন্যায়ের দিক হইতে ইহা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। অবশ্য এই ত্রুটি দূর করার জন্য উচ্চহারে মৃত্যুকর বা সম্পদকর বসান চলে; কিন্তু উহাতে এখনই সরকারের আয়বৃদ্ধি না পাইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতির সময়ে এইরূপ ব্যয়কর মুদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধের জন্য ভালই কাজ করিতে পারে; কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এই করের প্রভাব

ইহা ১। পক্ষপাতদুষ্ট
২। সংকোচনশীল
৩। আদায়গত অসুবিধা

সংকোচনশীল (deflationary)। যদি দেশে কিছুটা বেকারি থাকে, তবে ব্যয়করের ব্যবহার উহাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবে, এবং অনেক বেশি ঘাটতি ব্যয় না করিলে এই অবনতি দূর হইবে না। এই অবস্থায় কিন্তু আয়কর লোকের ভোগব্যয়, বিনিয়োগব্যয় বা কর্মোদ্যম কিছুই বিশেষ কমায় না। শুধু তাহাই নহে। আয়কর অনেকটা অর্থনৈতিক অবস্থা বা কাঠামোর অঙ্গ-লগ্ন ও নমনীয় ধরনের (built-in flexibility) কারণ, চক্রকালীন অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি উহা হইতে আদায় কমে, আবার সমৃদ্ধির সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই উহা হইতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, ব্যয়করের অন্যতম একটি অসুবিধা হইল ইহাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সংগঠন গড়িয়া তোলা। আদায়-বিষয়ক অসুবিধা ইহার একটি অন্যতম প্রধান ত্রুটি।

ব্যয়-করের আরোপ সম্পর্কে সাধারণভাবে দুইটি পদ্ধতি গৃহীত হইতে পারে। প্রথমত, সারা বৎসরে ব্যক্তির ব্যয়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে কর-আরোপ করা চলিতে পারে। ব্যক্তি যে আয়ব্যয়ের হিসাব (returns filled in by individuals) দেয় তাহার ভিত্তিতেই কর আরোপিত হইতে পারে। ইহাকেই আমেরিকায় বলে খরচা-কর (spendings tax); আর ইংলণ্ডে ইহার নাম ব্যয়কর (expenditure tax)। দ্বিতীয়ত, বিকল্প পদ্ধতি হইল দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করিয়া বিক্রেতাদের নিকট হইতে উহা আদায় করা। ইহাকে পণ্যকর (commodity taxes) বলে। বিক্রেতারা ক্রেতাদের নিকট এই পণ্যকরগুলির ভার অপসারণ করিবে, ফলে প্রকৃতপক্ষে দেশের ভোগ-ব্যয়ের উপর হইতেই এই কর আদায় হইয়া যাইবে। এই দুই পদ্ধতির মধ্যে

দুই ধরনের ব্যয়কর পদ্ধতির ভালমন্দ

কোনটি ভাল বা কোন্‌টি মন্দ তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, খরচা-কর বা ব্যয়-কর প্রত্যক্ষভাবে আরোপ করা চলে, তাই ইহার ভার মোটামুটি ইচ্ছামত কাহারও উপর কম বা বেশি হারে চাপান যায়। ইহার হার ক্রমবর্ধমান করা চলে, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার অনুযায়ী বিভিন্ন আয়স্তরে বা ব্যয়স্তরে হার নির্ধারণ করা যায়, মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে ইহার প্রবল প্রভাব। কিন্তু সাধারণ পণ্যকরগুলির তুলনায় ইহাতে আদায়ের অসুবিধা। সাধারণ পণ্যকরগুলি আদায়ের দিক হইতে সুবিধাজনক হইলেও ইহার ভার এলোমেলো ধরনের ও প্রগতিবিরোধী,

ইহাদের হার ক্রমবর্ধমান করিয়া তোলা চলে না, মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী ক্ষমতাও ইহাদের কম।

এই কারণে আজকাল সাধারণ ব্যয়করের বদলে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উপর বিক্রয় কর আরোপ করা হয়, ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যয়কে করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য না করিয়া উহার বিশেষ বা নির্দিষ্ট একটি অংশের উপর কর আরোপ করা হয়। ইহাকে তাই অনেকে আংশিক ব্যয়-কর বা বিনির্দিষ্ট ব্যয়-কর (Partial outlay tax) বলেন।

আংশিক ব্যয়-কর

বিক্রয় কর (Sales tax):

বর্তমানকালে ব্যয়ের ভিত্তিতে যতপ্রকার কর আরোপিত হইতেছে তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান হইল বিক্রয়-কর।* আপাতদৃষ্টিতে পণ্যসামগ্রীর বিক্রয়ের উপর এই কর আরোপিত হইলেও, কার্যত বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর উপর ব্যক্তির ব্যয় হইতেই এই কর আদায় হয়। সামগ্রিক বিক্রয়-কর (general sales tax) সকল প্রকার ব্যয়ের উপর হইতেই কর আদায় করে। কিন্তু সাধারণত এইরূপ সামগ্রিক বিক্রয়-কর কোন দেশে দেখা যায় না, নিত্যব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতকে বিক্রয়-করের পরিধির বাহিরে রাখা হয়। এই করের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন বলিয়া দাবি করা চলে, কারণ কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'ও ইহার উল্লেখ আছে।

বিক্রয় করের প্রকৃতি

বিক্রয়-করের স্বপক্ষে অনেক প্রকার যুক্তি দেখান হয়। প্রথমত, বলা হয় যে, বিক্রয়-কর হইতে প্রচুর পরিমাণে রেভিনিউ আদায় করা সম্ভব। কিন্তু শুধু তাহাই নহে। আয়-করের তুলনায় বিক্রয়-করের রেভিনিউ সাধারণত অধিকতর স্থিতিশীল ধরনের (Revenue from sales tax more stable than that of income tax)। বিক্রয়-করের ভিত্তি হইল ভোগব্যয়, আর আয়-করের ভিত্তি হইল আয়। কেইন্সীয় মতে আমরা জানি যে, বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন স্তরে মোট আয় অপেক্ষা মোট ভোগব্যয়ে উঠানামা কম হয়। তাই আয় কর

* আবগারী শুল্ক, কাষ্টমস্‌ শুল্ক প্রভৃতির ন্যায় বিক্রয়-করও একপ্রকার আংশিক ব্যয়-কর (Partial outlay tax)। বিক্রয়-করের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ এবং আলোচনা সকলই আংশিক ব্যয়-কর সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তাই পৃথকভাবে আর আংশিক ব্যয়-কর আলোচিত হইল না।

হইতে পাওয়া রেভিনিউর তুলনায় বিক্রয়কর হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ মোটামুটি স্থির, ইহাতে উঠানামার পরিধি কম। আয়-করের তুলনায় ইহার আপেক্ষিক স্থিরতার আর একটি কারণ আছে। আয়-কর ক্রমবর্ধনশীল হারে আরোপিত, আর বিক্রয়-কর সমানুপাতিক হারে। সমাজে সংকটকালে এই ক্রমবর্ধনশীলতার দরুণ আয়-কর হইতে রেভিনিউ বিশেষভাবে কমিয়া যায়, কিন্তু সমানুপাতিক বিক্রয়-কর হইতে আদায় ততটা হ্রাস পায় না। তাই ইহা হইতে রেভিনিউর স্থিরতা আয়-করের তুলনায় বেশি।

ইহাতে রেভিনিউ বেশি ও স্থির

দ্বিতীয়ত, শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে দেখিতে গেলে ইহার সুবিধা আয়-করের তুলনায় অনেক বেশি। যেমন, রাজনৈতিক বা বিভিন্ন কারণে অনেক রাষ্ট্র আয়-করের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করার নীতি পছন্দ করে না, কারণ সঞ্চয় ও কর্মোদ্যমের উপর উহার সংকোচক-প্রভাব প্রবল। এই অবস্থায় ব্যক্তির ব্যয়কে করের ভিত্তি হিসাবে পাইলে খুবই ভাল হয়। যদি আমরা ধরিয়া লই যে, করভারের সম্পূর্ণ অংশ সম্মুখে অপসারিত হইতেছে, অর্থাৎ সবটাই ক্রেতার নিকট হইতে আদায় হইতেছে, তবে আমরা জানি যে, প্রত্যক্ষ-কর হিসাবে আয়-কর যাহা করে তাহার তুলনায় ব্যয়-কর বা বিক্রয়-কর পরোক্ষভাবে একই কাজ করে।

আয়করের ত্রুটিগুলি এখানে নাই, অথচ আদায়ের সুবিধা

তৃতীয়ত, অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে কর শাসন ব্যবস্থা ভাল করিয়া গড়িয়া উঠে নাই, করপ্রদান বিষয়ে নীতিবোধের মানও বিশেষ উন্নত নয়। এই সকল দেশে বিক্রয়-করের গুরুত্ব বেশি। এই করের আদায়গত সুবিধা বেশি আবার খরচও কম। এরূপ কথা প্রচলিত আছে যে, বিক্রয়-কর নিজেই নিজেকে সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। সমাজের বিক্রেতারা বিক্ষিপ্ত ক্রেতাদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেয় বলিয়া এইরূপ বলা হইয়া থাকে। আয়-কর হইতে রাষ্ট্রের কর-আদায়ে যতটা কালক্ষেপ হয়, বিক্রয়-করে তাহা হয় না, কর আরোপ করার পর হইতেই সরকারী তহবিলে টাকা আসিতে থাকে। এই সকল দেশে উচ্চ আয়-করের নিরুৎসাহী প্রভাব (dis-incentive effect) খুবই তীব্র, তাই অনেকে কর-ভিত্তি হিসাবে ব্যয়কেই গ্রহণ করার পক্ষপাতী। আবগারী শুল্ক একান্তভাবে পক্ষপাতমূলক

আদায়ের খরচ ও হাঙ্গামা কম, লুকানো আয়ের উপর কর চাপান যায়

(discriminatory), কিন্তু বিক্রয়-করের এই দোষ নাই। আইনী বা বে-আইনী উপায়ে যাহারা পূর্বে আয়-কর ফাঁকি দিয়াছে বা এখনও দিতেছে এবং দ্রব্য-সামগ্রীর ভোগে সেই টাকা নিয়োগ করিতেছে তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করার প্রকৃষ্ট পন্থা হইল বিক্রয়-কর আরোপ করা।

গরীবদের উপর কর-ভার বাড়াইতে হইলে

চতুর্থত, যাঁহারা ব্যয়ের অধিক অংশ নিম্ন আয় গোষ্ঠীর নিকট হইতে তুলিতে চান তাঁহাদের মতে বিক্রয়-কর আরোপ করাই যুক্তিযুক্ত। আয়-করের তুলনায় বিক্রয়-কর নিম্ন আয়গোষ্ঠীর নিকট অনেক সহজে পৌঁছিতে পারে। দেশে দ্রুত মূলধন-গঠনের জন্য তাই অনেকে বিক্রয়-করের স্বপক্ষে কথা বলেন।

বাণিজ্যচক্র বিরোধী স্থায়িত্ব আনয়নকারী শক্তি

সর্বোপরি, অধ্যাপক হান্‌সেন্ (Hansen) বলিতে চান যে, আয়স্তর ও কর্মসংস্থানে তীব্র উঠানামা বন্ধ করার কাজে ইহাকে নিয়োগ করা সম্ভবপর। অর্থাৎ বিক্রয়-করের বাণিজ্যচক্রবিরোধী ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া তিনি মনে করেন। সমৃদ্ধি যুগের শেষপ্রান্তে উচ্চ বিক্রয়-কর ভোগের পরিমাণ কমাইয়া দেয়, মুদ্রাস্ফীতির গতিরোধে সাহায্য করে। ঠিক এইরূপ, সংকটকালে, বিক্রয়-করের হ্রাস এবং সেই সঙ্গে পূর্বের আদায় করা টাকায় ব্যয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে। এই কাজ ছাড়াও বিক্রয়-করের অন্যান্য ভূমিকা কম নাই। যেমন, যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার উদ্দেশ্যে দেশের ভোগব্যয় কমান প্রয়োজন, তখন এই কর আরোপ করা চলে। করের দরুণ ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়িবে, তাই ভোগব্যয় হ্রাস পাইতে থাকিবে।

অর্থনৈতিক প্রভাব বাঞ্ছনীয় নয়

বিক্রয়-করের বিরুদ্ধে বহু প্রকার আলোচনা হইয়াছে। প্রথমত, ইহার অর্থনৈতিক প্রভাব বাঞ্ছনীয় নয় অনেকে এইরূপ বলেন। একটি টাকা আয়-কর আদায় করিলে সমাজের মোট ব্যয়ের উপর উহার ফল ততটা নয়, কিন্তু একটি টাকা ব্যয়-কর বা বিক্রয়-কর আদায় করিলে সামগ্রিক-ব্যয় বেশি পরিমাণে কমে। দেশের মোট ব্যয়ের উপর এইরূপ করের প্রভাব ভাল নয় বলিয়া তাই অনেকে মনে করেন। দেশ যখন অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে থাকে বা বাণিজ্য-চক্রের সংকটের যুগে আছে, তখন বিক্রয়-করের ফলে লোকে ব্যয় কমাইয়া সঞ্চয়

বাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়, ফলে মোট ভোগব্যয় সংকুচিত হয় এবং দেশের সংকট গভীরতর হইয়া উঠে।

দ্বিতীয়ত, বিক্রয়-করের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হইল ইহা ন্যায়-নীতির বিরোধী। বিক্রয়কর আরোপিত হয় সমানুপাতিক হারে, তাই নিম্নে আয় গোষ্ঠীর উপর করভার তুলনামূলকভাবে বেশি। উপরন্তু, উচ্চ আয়-গোষ্ঠীতে আয়ের অধিক অংশ সঞ্চিত হয়, তাই করভারের সামগ্রিক বণ্টন অধোগতিমূলক বা ক্রমপতনশীল (regressive)। নিম্ন আয়-গোষ্ঠীর লোকের তুলনায় উচ্চ আয়-গোষ্ঠীর লোকেরা সাধারণত তাহাদের আয়ের কম অংশ ব্যয় করে। শুধু তাহাই নহে। উচ্চ আয়-গোষ্ঠীর লোকের ব্যয়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল ব্যক্তিগত সেবা-মূলক কাজকর্ম। ইহাদের উপর কর আরোপিত নাই, তাই এই করের অধোগতিত্ব (regressiveness) আরও বেশি।

ন্যায়নীতির বিরোধী

করের অধোগতিত্ব ভাল কি মন্দ তাহা আজকাল আর আলোচিত হয় না, কারণ করভার বণ্টন সম্পর্কে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির মত হইল ইহা ভাল নয়। অপরপক্ষে সমগ্র কর-কাঠামোর প্রকৃতি ক্রমবর্ধনশীল হইলে উহার মধ্যে কোন বিশেষ একটি কর অধোগতিমূলক হইতে পারে। তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এই করের এই ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্য সাধারণত খাদ্য বস্ত্র ও নিম্ন আয় শ্রেণীর ব্যবহার্য দ্রব্যাদি করের আঁওতা হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

তৃতীয়ত, বিক্রয়করের কর ভারের বণ্টন সম্পর্কে আরও অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। যেমন বলা হইয়াছে যে, এই কর পক্ষপাতদুষ্ট। আদায়গত অসুবিধার জন্য কতকগুলি দ্রব্যের উপর কর আরোপ করা চলে না, যেমন ব্যক্তিগত সেবাকার্য, বৈদেশিক ভ্রমণ, সুসজ্জিত দামী বাড়ি প্রভৃতি। ইহার ফলে এই সকল দ্রব্য যাহারা বেশি ব্যবহার করেন, অন্যের তুলনায় তাহারা এই কর বেশি পরিমাণে এড়াইয়া চলিতে পারেন। সমান আয়বিশিষ্ট পরিবারগুলির মধ্যে লোক বেশি থাকায় বড় পরিবারকে বেশি কর দিতে হয়, আর লোক কম থাকায় ছোট পরিবার করভার কম বহন করেন। অবশ্য খাদ্য ও বস্ত্রের উপর কর না থাকিলে বড় পরিবারের বিরুদ্ধে এই পক্ষপাত অনেকটা কমিয়া যায়।

ইহা খুবই পক্ষপাত দুষ্ট

উপসংহারে বলা চলে যে, এই সকল বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও বিক্রয়-কর

আরোপিত হইবেই কারণ ইহার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আছে যাহার নিকট সকল যুক্তিই ম্লান হইয়া যায়। ইহা হইল, এই করের উৎপাদনক্ষমতা খুবই বেশি। আধুনিক কালের রাষ্ট্রগুলি বেকারি ও অসন্তোষ দূর করিয়া কোন মতে এই ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। তাই বিভিন্ন দিকে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার জন্ম রাষ্ট্রের হাতে বেশি টাকা থাকা দরকার, তাই বিক্রয়করের গুরুত্ব এত বেশি। বণ্টনের উপর প্রভাব খারাপ থাকা সত্ত্বেও তাই এই করের প্রয়োগ একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। তবে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ইহার এই ত্রুটি কিছুটা দূর হইতে পারে। যেমন, বহু বিন্দু-কর (Multi-point tax) অপেক্ষা এক-বিন্দু কর (Single-point tax) ভাল। যদি কোন দ্রব্য প্রতিবার হাত বদলের সময় বিক্রয়-কর দিতে হয়, তবে সর্বশেষ স্তরের ক্রেতাকে বেশি করভার বহন করিতে হয়। কিন্তু একবার একটি স্তরে, খুচরা বিক্রয়ের উপর যদি করটি আরোপিত থাকে, তবে দামের সঙ্গে কর যোগ হয় কম। করের পিরামিড-গঠন (phenomenon of tax-pyramiding) তখনই ঘটিতে পারে যদি করটি প্রতিস্তরে আদায়-যোগ্য হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি পরবর্তী স্তরের ব্যক্তির উপর করভার অপসারণ করিয়া দিতে পারে। এইরূপ করের ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে ফার্ম বা ব্যবসায়ীরা লম্বমুখী প্রসারণ সুরু করে (vertical expansion)। ইহা সম্ভব হইলে বহু বিন্দু করটি প্রকৃতপক্ষে এক-বিন্দু করে পরিণত হইয়া পড়ে, একমাত্র খুচরা বিক্রয়ের সময় করপ্রদানের কথা উঠে। আদায়ের সুবিধা বিবেচনা করিলেও দেখা যায় যে, এক-বিন্দু কর তুলনামূলক ভাবে অধিকতর সুবিধাজনক।

কিন্তু আজকাল সরকারের টাকার প্রয়োজন বেশি

বিভিন্ন ধরনের বিক্রয়-কর

অনুশীলনী

1. What are taxes? Discuss the principles that underlie the system of modern taxation.

2. Enumerate the principles that sholud guide the system of taxation.

3. How would you justify the principle of progressive taxation.

4. Examine critically the case for a system of progressive taxation.

5. Distinguish between Progressive and Proportional taxation and consider their advantages and limitations.

6. On what grounds can you justify the principle of progressive taxation?

7. Discuss how equity in taxation can be ensured.

8. How far Income is a satisfactory measure of ability to pay ?

9. Discuss the concept of taxable capacity. Do you consider it totally useless ?

10. 'Unless hedged about with many qualifications and assumptions the taxable capacity of a community is a phrase which has very little meaning." (Dalton)—Explain.

11. Discuss the factors that determine the shifting and incidence of taxation.

12. Discuss the incidence of a tax under (a) Perfect Competition, and (b) Monopoly.

13. How far, in your opinion, the income tax may be shifted ?

14. Discuss wherein lies the incidence of (a) Income tax, (b) a tax on Monopoly, (c) Customs duties, (d) a tax on land & buildings.

15. What is meant by Capitalisation of taxes ? Discuss how far 'an old tax is no tax' ?

16, Discuss the effects of taxation on will to work and save.

17. Discuss the concept of taxable income.

18. How far income tax checks the incentive to work and save ?

19. What is a Capital gains tax ? Discuss its nature and effects.

20. Discuss the importance and effects of death duties.

21. What is expenditure tax ? Do you support it instead of Income tax ?

22. Discuss the importance and effects of Sales tax in a modern economy.

23. Write short notes on : (a) gifts tax, (b) customs, Excise and use taxes.

24. Compare Income tax and death duties.

25. Discuss the use of Partial outlay taxes on welfare grounds.

১৬

সরকারী ঋণ

Public Debt

আয় হইতে ব্যয় অধিক হইলে ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্রকেও সেই ফাঁক ঋণ করিয়াই পূরণ করিতে হয় বটে; কিন্তু ব্যক্তিগত ঋণ রাষ্ট্রীয় ঋণে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

ব্যক্তিগত ঋণ ও রাষ্ট্রীয় ঋণের পার্থক্য

(১) রাষ্ট্র জনসাধারণের নিকট হইতে জোর করিয়া বা বাধ্যতামূলক ভাবে ঋণগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি কাহারও উপর জোর খাটাইতে পারে না। (২) সরকারী ঋণ সম্পূর্ণ অপরিশোধ্য বা চিরস্থায়ী ধরনের হইতে পারে, কবে ইহা শোধ দেওয়া হইবে সে-সম্বন্ধে কোন তারিখ নির্দিষ্ট নাও থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঋণ অপরিশোধনীয় অবস্থায় রাখিতে পারে না। (৩) রাষ্ট্র নিজের নাগরিকদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজের নিকট হইতে ঋণ পাইতে পারে না। (৪) ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র দেউলিয়া হয় না। (৫) রাষ্ট্র নূতন কাগজী অর্থ প্রস্তুত করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে, বা পুরাতন ঋণ শোধ দিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির সেইরূপ কোন সুবিধা নাই। (৬) ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক কর বসাইতে পারে, ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। (৭) দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রভাব ও ফলাফল ব্যক্তিগত ঋণের প্রভাব ও ফলাফল হইতে পৃথক ও ব্যাপক।

ক্লাসিকাল ধন-বিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্র যত কম ঋণ করে ততই ভাল এবং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে রাষ্ট্রের ঋণ করা উচিত নহে। কিন্তু দেখা যায়

কয়েকটি অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হয়। (১) যদি স্বাভাবিক অবস্থায়, হঠাৎ কোন অচিন্ত্যপূর্ব কারণে আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হইতে থাকে, তাহা হইলে ঋণ না করিয়া উপায় নাই। যুদ্ধ প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থায় এত অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তখন কর-রাজস্ব হইতে সকল ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। (২) অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজেই অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের পূর্ণনিয়োগের উদ্দেশ্যে বা বিশেষ ধরনের শিল্প ব্যবসায় প্রভৃতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করেন; এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ঋণের সাহায্যে সেই অর্থ তোলা চলিতে পারে। এই ধরনের ব্যয় প্রকৃতপক্ষে মূলধন-বিনিয়োগ, ইহা হইতে ভবিষ্যতে অধিকতর সম্পদ বা আয় সৃষ্টি হইবে, সুতরাং বর্তমানে ঋণ করিয়া সেই ঋণভার ভবিষ্যতের উপর বিস্তৃত করিয়া রাখা চলে। ওই সকল রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ হইতে ভবিষ্যতে যে-আয় হইবে তাহা হইতেই সুদসহ উহা পরিশোধ করা চলিবে।

রাষ্ট্রীয় ঋণের যুক্তি-সঙ্গত কারণসমূহ

অ্যালেন্ ব্রাউনলীর মতে আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ঋণের উদ্দেশ্য হইল প্রধানত তিনটি: (ক) যে সকল উপকরণ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত, তাহাদের সরাইয়া আনিয়া সরকারী ক্ষেত্রে নিয়োগ করার উদ্দেশ্য, (খ) অব্যবহৃত বা অনিযুক্ত উপকরণগুলিকে ব্যবহারের বা নিয়োগের উদ্দেশ্য, এবং (গ) আকস্মিক প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্য।

অ্যালেন্ ও ব্রাউনলীর মতে

সাধারণ হারে সুদ প্রদান করিয়া যদি উপযুক্ত পরিমাণে ঋণ আকর্ষণ করা না যায় তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে অধিক ঋণ দানে প্ররোচিত করার চেষ্টা হয়। যেমন, (১) ঋণ প্রদান করিলে উহা হইতে প্রাপ্ত সুদকে আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান, (২) কর-প্রদানের সময়ে সরকারী ঋণপত্রসমূহের মূল্য অধিক ধরিতে দেওয়া, (৩) ঋণপত্রের লিখিত-মূল্য অপেক্ষা কমমূল্যে উহা বিক্রয় করা, যেমন, 100 টাকার সরকারী ঋণপত্র 99 টাকাতে বিক্রয় করা, (৪) ঋণপরিশোধের সময়ে ঋণপত্রের লিখিত-মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য প্রদান (যেমন 100 টাকার ঋণপত্র পরিশোধের সময় 102 টাকা ফেরৎ দেওয়া)।

অধিক ঋণ আকৃষ্ট করার বিশেষ পদ্ধতি সমূহ

রাষ্ট্রীয় ঋণের পক্ষে যুক্তি হইল, (১) ইহা দ্বারা আকস্মিক প্রয়োজন মিটানো

সম্ভবপর হয়। কর আদায় করা সময়সাপেক্ষ, ইতিমধ্যে ব্যয়ের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রাষ্ট্র স্বল্পকালীন ঋণগ্রহণ করে (Ways and Means Advances); অথবা, বাজার হইতে সরকারী বিল ভাঙাইয়া লয় (Treasury Bills)। (২) দীর্ঘকালীন ঋণ ব্যতীত দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের কাজ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। (৩) যুদ্ধের সময়ে কর দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করা অপেক্ষা ঋণ দ্বারা ব্যয় মিটানো তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য নীতি। (৪) জনসাধারণের পক্ষে ইহা নিশ্চিত ও কম-ঝুঁকিসম্পন্ন অর্থ-বিনিয়োগ, ফলে দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও মূলধন-গঠন ত্বরান্বিত হয়। (৫) সরকারী ঋণপত্রসমূহ দেশের ঋণ-ব্যবস্থাকে উন্নত করে এবং ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে (খোলাবাজারে কার্যকলাপ প্রভৃতির দ্বারা), মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ এবং সংকট-ত্রাণ ঘটায়। (৬) অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রসার ঘটাইবার পক্ষে উপযোগী আর্থিক নীতি ও কৌশল হিসাবে রাষ্ট্রীয় ঋণ কাজ করে। শিল্পে উন্নত দেশসমূহে পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছানো অথবা, অনুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা রাষ্ট্রীয় ঋণের অন্যতম প্রধান সুফল।

রাষ্ট্রীয় ঋণের পক্ষে যুক্তি বা ঋণের উপকারিতা

রাষ্ট্রীয় ঋণের ত্রুটি হইল (১) ঋণগ্রহণের সুবিধা থাকিলে অযৌক্তিক বা অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র অযথা ঋণগ্রহণে প্রলুব্ধ হইতে পারে। (২) সরকারী রাজনৈতিক দল স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইহাকে ব্যবহার করিতে পারে। (৩) বিদেশ হইতে ঋণ সত্যই বিশেষ ভারবহুল, কারণ জাতীয় আয়ের একাংশ সুদ প্রদান ও ঋণ পরিশোধের মারফৎ বিদেশে চলিয়া যায়। (৪) প্রভূত রাষ্ট্রীয় ঋণের ফলে করের পরিমাণ ও হার খুবই বেশি হইতে থাকে (সুদ প্রদান ও ঋণ পরিশোধের প্রয়োজনে)। ইহার দরুণ দেশে কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা এবং স্পৃহা কমিতে পারে। (৫) সুদের ভার অধিক হওয়ায় উহার আসল ভার কমাইবার উদ্দেশ্যে সরকার অনেক সময় 'সুলভ অর্থের নীতি' (Cheap Money Policy) গ্রহণ করে; দেশে অত্যধিক পরিমাণ ঋণপত্র প্রভৃতি ছড়াইয়া পড়ায় মূলধনের বাজারে ফাটকাদারির সুবিধা হয়, বাজারদর অস্থিতিশীল (Unstable) হইয়া পড়ে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক অস্থিরতা দেখা দেয়।

রাষ্ট্রীয় ঋণের বিপক্ষে যুক্তি বা ঋণের অপকারিতা

রাষ্ট্রীয় ঋণের শ্রেণী বিভাগ (Classification of public Debt):

বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া রাষ্ট্রীয় ঋণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

(১) কোন্ কর্তৃপক্ষ ঋণগ্রহণ করিতেছে সেই অনুযায়ী ঋণকে কেন্দ্রীয় ঋণ, প্রাদেশিক বা রাজ্য-ঋণ এবং স্থানীয় ঋণ প্রভৃতিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(২) যদি জোর করিয়া ঋণ আদায় করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাধ্যতা-মূলক ঋণ বলে, আর যদি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ঋণদান ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহাকে স্বেচ্ছামূলক ঋণ বলা হয়।

(৩) রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অধিবাসীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে আভ্যন্তরীণ ঋণ বলে, এবং বিদেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে বাহ্য ঋণ বলা হয়।

(৪) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করা হইবে যদি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে নির্দিষ্ট-পরিশোধ্য (Redeemable) ঋণ বলে; আর, যদি এই ঋণ-পরিশোধের কোন সময়-সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া না হয় তাহা হইলে উহাকে অনির্দিষ্ট-পরিশোধ্য (Irredeemable) ঋণ বলা হয়।

(৫) অতি দীর্ঘকাল পরে ঋণ পরিশোধ করা হইবে, এইরূপ ঋণকে দীর্ঘ-আবদ্ধ ঋণ (Funded Debt) বলে; এবং স্বল্পকালের মধ্যে, যেমন এক বৎসরের মধ্যেই ঋণ পরিশোধ করা হইবে এইরূপ ঋণকে স্বল্প-আবদ্ধ ঋণ বা ভাসমান ঋণ (Unfunded Debt or Floating Debt) বলা হয়। এই সকল শব্দ ইংলণ্ডে একটু পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ইংলণ্ডে দীর্ঘ আবদ্ধ ঋণ বলিতে বোঝায় এমন ঋণ যাহার সুদ দিতে সরকার আইনত বাধ্য, কিন্তু মূল-পরিমাণ (Principal) পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। ইহা তাই স্থায়ী ধরণের ঋণ, যেমন কন্‌সলস্ (consols)। অপরপক্ষে, স্বল্প-আবদ্ধ ঋণ বলিতে বোঝায়, যে ঋণ নির্দিষ্ট কোন তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিয়া লইতে হইবে।

(৬) অনেক সময় রাষ্ট্র অ্যানুইটির দ্বারা ঋণ গ্রহণ করে। এই অ্যানুইটি-গুলি সমাপনীয় (Terminable) বা চিরন্তনীয় (Perpetual) হইতে পারে। প্রথমক্ষেত্রে, কয়েক বৎসর যাবৎ সুদ ও মূল-পরিমাণের কিছু অংশ

প্রদান করিয়া ঋণ পরিশোধ করা হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যতদিন অ্যানুইটি-ক্রেতা (Annuitant) বাঁচিয়া থাকেন ততদিন রাষ্ট্র নিয়মিতভাবে সুদ ও মূল-পরিমাণের কিছু অংশ প্রদান করিতে থাকে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়।

(৭) ঋণের দ্বারা অর্থ তুলিয়া যদি এরূপভাবে ব্যয় করা হয় যাহাতে (ক) সেই মূল্যের সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে থাকে, বা (খ) সম্পত্তি হইতে এমন আয় হয় যাহার দ্বারা সুদ প্রদান বা ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর, অথবা (গ) সমাজের উৎপাদন শক্তি খুবই বাড়াইয়া দেয়—তাহা হইলে সেই ঋণকে উৎপাদক ঋণ (Productive Debt) বলা হয়। মিসেস্ হিক্‌স এইরূপ ঋণকে সক্রিয় ঋণ (Active Debt) বলিয়াছেন।

ঋণের দ্বারা গৃহীত অর্থের বিনিময়ে কোন সম্পত্তিই রাষ্ট্রের হাতে না থাকিলে, বা আয় প্রদানকারী সম্পত্তিতে ব্যয়িত না হইলে, অথবা সমাজের উৎপাদন-শক্তি না বাড়াইলে উহাকে অনুৎপাদক ঋণ (Unproductive Debt) বলা হয়। যদি তাহা শুধুমাত্র সমাজের ভোগ বা তৃপ্তিকে বাড়াইয়া দেয় (যেমন মিউজিয়াম্ বা পার্ক প্রভৃতি) তাহা হইলে মিসেস্ হিক্‌সের ভাষায় তাহাকে নিষ্ক্রিয় ঋণ (Passive Debt) বলে।

যে-সকল ঋণ সৃষ্টির কারণ অনুৎপাদক ব্যয় এবং কখনই সেইরূপ ব্যয় হইতে সমাজে তৃপ্তি বা উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িবে না, তাহাদের তিনি মৃতভার ঋণ (Deadweight Debt) বলিয়াছেন।

সরকারী ঋণের উৎস (Sources of Public Borrowing) :

দেশের সামগ্রিক চাহিদা এবং জাতীয় আয়ের উপর সরকারী ঋণের প্রভাব স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইলে জানা দরকার যে কোন ধরনের উৎস হইতে সরকারী ঋণ আসিতেছে। প্রধান উৎসগুলিকে তাই আলোচনা করা প্রয়োজন।

১। ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা চলে। ব্যক্তি সরকারকে ঋণ দেয় সরকারী বণ্ড ক্রয় করিয়া। এই উদ্দেশ্যে হয় তাহার ভোগব্যয় বদলাইতে হয় অথবা তাহার সঞ্চয় পূর্বে যে-রূপে আবদ্ধ ছিল তাহাতে পরিবর্তন আনিতে হয়। সাধারণত, কোন-ব্যক্তি ভোগব্যয় কমাইয়া সরকারী বণ্ড ক্রয় করে না। যে বিশেষ ধরনে ব্যক্তির সঞ্চয় নিযুক্ত হইয়াছিল, সরকারী ঋণ গ্রহণের ফলে প্রধানত তাহাতেই পরিবর্তন আসে।

ব্যক্তিদের নিকট হইতে

সঞ্চয়ের যে সকল পরিবর্ত-ব্যবহার হইতে ব্যক্তি উহা সরাইয়া আনিয়া সরকারী বণ্ডে খাটাইতে পারে তাহা আমরা আলোচনা করিতে পারি। প্রথমত, বণ্ড না কিনিলে ব্যক্তি নিজের ব্যবসায় প্রসারের জন্য ঐ সঞ্চয় নিয়োগ করিতে পারিত। দ্বিতীয়ত, বণ্ডগুলি পাওয়া না গেলে ব্যক্তি অলস নগদের রূপে সঞ্চয় জমাইয়া রাখিতে পারিত। অবশ্য বাজারে সরকারী বণ্ড থাকিলেই ব্যক্তি নিজের ব্যবসায় বা অলসভাণ্ডার হইতে সঞ্চয় সরাইয়া আনিয়া বণ্ডগুলি কিনিতে থাকিবে তাহা নহে। নূতন সরকারী বণ্ডগুলি যদি পূর্বাপেক্ষা কিছু বেশি সুযোগ সুবিধা দিবার প্রতিশ্রুতি বহন করে, তবেই সঞ্চয়ের এইরূপ রূপান্তরণ সম্ভব হইবে। তৃতীয়ত, অন্যান্য প্রকার সিকিউরিটি হইতে সঞ্চয় সরিয়া আসিয়া সরকারী বণ্ডে নিযুক্ত হইবে। ইহাতে সেই অপরাপর সিকিউরিটির দাম হ্রাস পাইবে, সুদের হার বাড়িয়া যাইবে, ব্যবসায়ের প্রসার ব্যাহত হইবে। ২। ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে সরকারী ঋণ উঠান চলে। বীমা কোম্পানী, বিনিয়োগী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নিকট সরকারী বণ্ড বিক্রয় করা সম্ভবপর। এই সকল প্রতিষ্ঠান যখন সরকারী বণ্ড কেনে তখন তাহারা নগদ জমার পরিমাণ কিছুটা কমাইয়া দেয়। কিন্তু সাধারণত তাহাদেয় সরকারী বণ্ড কেনার বেশির ভাগ টাকা আসে অন্যান্য সিকিউরিটি কেনা কমাইয়া দিয়া।

অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে

ইহাতেও, পূর্বের মতন, সিকিউরিটির দাম কমে ও সুদের হার বৃদ্ধি পায়। ৩। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে সরকার ঋণ করিতে পারে। অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যাঙ্কের পার্থক্য হইল এই যে, ব্যাঙ্ক ঋণসৃষ্টি করিতে পারে, আর সকলে ইহা পারে না। ব্যাঙ্কগুলির হাতে নিম্নতম রিজার্ভের ঊর্ধ্বে টাকা থাকিলে সেই অতিরিক্ত টাকার কয়েকগুণ বেশি পরিমাণ সরকারী বণ্ড ইহারা ক্রয় করিতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে

এইরূপে সরকারী বণ্ড কেনার ক্রয়শক্তি ইহারা নিজেরাই সৃষ্টি করে, ব্যক্তির ন্যায় কেবল এক ব্যবহার হইতে অপর ব্যবহারে সঞ্চয় সরাইয়া লইয়াই ইহারা ক্ষান্ত হয় না। ৪। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট সরকারী বণ্ড বিক্রয় করা চলে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট সরকারী বণ্ড বিক্রয় করিলে যেরূপ সমাজের ক্রয়শক্তির পরিমাণ বাড়ে, ঠিক সেইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী বণ্ড কিনিলে দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। কারণ এই বণ্ড কিনিয়া তাহারা সরকারের নামে রক্ষিত অ্যাকাউণ্টে জমার

পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়, এবং সরকার সেই অ্যাকাউন্ট হইতে দরকার-মত চেক কাটিয়া টাকা তুলিয়া লয়। সেই টাকা ক্রমে ব্যক্তিদের হাতে আসে, তাহাদের নিজস্ব নামে এক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে জমা হয়, ঋণসৃষ্টির ধারা শুরু হয়। এইরূপ ঋণ করিলে তাই সংকোচনমূলক ধারার কোনরূপ সম্ভাবনা তো নাই-ই বরং প্রসারণীল ধারার সূত্রপাত ঘটিতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে

রাষ্ট্রীয় ঋণের ভার (The burden of Public Debt) :

সরকারী ঋণের ভার সম্পর্কে আধুনিককালে বেশ কিছুটা মত পার্থক্য দেখা যায়। কেহ বলেন উহা আশীর্বাদ, কেহ বলেন উহা অভিশাপ। যাঁহারা কেইন্সীয় বিশ্লেষণের পক্ষপাতী, তাঁহারা ঘাট্‌তি ব্যয়কে সমর্থন করেন; দেশের সামগ্রিক আয়স্তর ও কর্মসংস্থান স্তর উন্নত করা একমাত্র রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। সরকারী ঋণ বাড়াইয়া বিনিয়োগ বাড়াইলে দেশে আয় প্রসারের সম্ভাবনা—তাই তাঁহারা স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে, আভ্যন্তরীণ ঋণের কোনরূপ ভার নাই। অপরপক্ষে, রক্ষণশীল ক্লাসিকাল তত্ত্বের মতধারা এখনও শুকাইয়া যায় নাই, তাঁহারা ঋণ ব্যাপারটাকেই রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক দেহের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার প্রকাশ বলিয়া তীব্র অপছন্দ করেন, ঋণপ্রসারকে 'দেউলিয়ার পথ' বলিয়া ঘোষণা করেন। এই উভয় মতই একপেশে, ইহাদের মধ্যে কোনটিই পূর্ণ সত্য প্রকাশ না করিয়া অর্ধসত্য প্রকাশ করে।

প্রাচীন ও অর্বাচীন : দুই মত দেখা যায়

জাতীয় ঋণ জাতিকে দেউলিয়া করিয়া তোলে—এই মতের সূত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। সেই সময় এই মত ছিল খুবই সত্য, আর 'দেউলিয়া' কথাটিরও সেই যুগে এক বিশেষ তাৎপর্য ছিল। ইহার কারণ হইল, সেই সময় জাতীয় ঋণ ব্যয়িত হইত প্রধানত অপচয়মূলক কাজে, অন্যায় যুদ্ধে বা অপ্রয়োজনীয় বিলাসবহুল রাজকীয় আড়ম্বর ও বিলাসব্যসনে। কিন্তু আজিকার যুগে সরকারী কাজ-কর্ম দেশের আয়স্তর ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে অনেক বেশি পরিমাণে প্রভাবিত করে, পূর্বের ঐ দৃষ্টি লইয়া ইহাদের আর বিচার করা চলে না। তাই, রক্ষণশীল মতের পরিবর্তে, অপর একটি মত প্রচলিত হইয়াছে। ইহার বক্তব্য হইল যে, আভ্যন্তরীণ ঋণের কোন ভার নাই, কারণ

প্রত্যেক মত নিজের দৃষ্টিতে সমস্যাটি বিচার করে

'আমরা নিজেদেরই নিকট ঋণী'। এক পকেট হইতে টাকা লইয়া ইহা অন্য পকেটে ফেলা মাত্র। সুদ আর ঋণ পরিশোধে যে টাকা খরচ হয়, তাহা মহাজনদের আয় হইল, দেশের সামগ্রিক আয় তাই সমানই রহিয়া গেল। যদি অবশ্য এই ঋণ বিদেশীদের নিকট হইতে আনা হয়, তবে ঋণের জন্য সুদ প্রভৃতি দিলে জাতীয় আয় কমিয়া যায়, জাতীয় অর্থনৈতিক কল্যাণের মান বা স্তর হ্রাস পায়। এই কথার অর্থ এই নয় যে, বৈদেশিক ঋণ কোন দেশের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইতে সাহায্য করে-না। ইহা আভ্যন্তরীণ ঋণের সমান উৎপাদনক্ষম হইতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে দেশের মধ্যে হইতে ঋণ করিলে তাহার নীট প্রতিদান অপেক্ষা বৈদেশিক ঋণের নীট প্রতিদান কম। আভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে আমরা দেশের মধ্যেই ঋণী, এই কথার গুরুত্ব হইল জাতীয় আয়ের স্তর ইহাতে প্রভাবিত হয় না। ঋণ করার সময়ে সমাজের মধ্যে এক হাত হইতে সম্পদ অন্য হাতে চলিয়া আসে, ঋণের ফলে সমাজের হাতে সামগ্রিক জাতীয় সম্পদ হ্রাস পায় না; বরং এই ঋণের ব্যয়ের ফলে বাড়িতেই পারে।

আভ্যন্তরীণ ঋণের কোন ভার নেই

উপরের আলোচনায় অবশ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বাদ দেওয়া হইতেছে। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক দেশে, প্রতিটি ঋণের ব্যক্তিগত দিক এবং জাতীয় দিক দুই-ই আছে। আভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা নিজেদেরই নিকট ঋণী ইহা ঠিকই, কিন্তু আমাদেরই মধ্যে কেহ সেই ঋণ দিয়াছে, আর অন্যেরা সেই ঋণ শোধ করার জন্য দায়ী। ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে ইহা অতি সুস্পষ্ট, দেনাদার ও মহাজন একই সমাজের অধিবাসী হইলেও ইহারা একই ব্যক্তি নন। সরকারী ঋণের ক্ষেত্রে, সর্বশেষ দেনাদাররা (করদাতাগণ, কারণ তাঁহাদেরই কর দিয়া ঐ ঋণ শোধ করিতে হইবে) কেহ কেহ মহাজনও হইতে পারেন (বণ্ড-ক্রেতা), ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকারী ঋণের মালিকানা এবং করভারের বণ্টন ঠিক একই অধিবাসীদের উপর পড়িবে, এমন কোন ব্যবস্থা নাই। একমাত্র তাহা হইলেই মহাজন হিসাবে ব্যক্তির সুবিধা করদাতা হিসাবে করভার বহনের অসুবিধা দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারিত।

আভ্যন্তরীণ ঋণের কিছু ভার আছে: কারণ ব্যক্তি ও জাতি একই নয়

তাই আমরা এই কথা অনায়াসে মানিয়া লইতে পারি না যে, দেশের

অধিবাসীরা সামগ্রিকভাবে নিজেরাই মহাজন বলিয়া আভ্যন্তরীণ ঋণের কোনরূপ ভার নাই। আভ্যন্তরীণ ঋণের কোনরূপ ভার আছে কি নাই তাহা নির্ভর করিবে আমরা কি দৃষ্টিতে ইহা দেখি—সামগ্রিক দৃষ্টিতে, অথবা একক-ভিত্তিক দৃষ্টিতে। ঋণ লইয়া উহাকে উৎপাদনক্ষম কাজে খাটাইলে তাহার কোন নীট ভার নাই, বরং সামগ্রিকভাবে সমাজের নীট কল্যাণ বাড়ে, কারণ বিনিয়োগ না-হওয়ার তুলনায় উহা হওয়ার ফলে সমাজ পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে (better off)। কিন্তু ঋণের ফলে সমাজের মধ্যে এই ঋণমূল (principal) ও সুদের হস্তান্তর এমনভাবে ঘটিতে পারে যে, সমাজের বিশেষ বিশেষ অধিবাসীদের উপর নির্দিষ্ট প্রকার ভার বাড়াইয়া তুলিতে পারে। উৎপাদনের দিক হইতে যাহা ভাল, এইরূপ অনেক নীতিই বণ্টনের দিক হইতে গ্রহণীয় নয়।

উৎপাদন ও বণ্টনের দিক হইতে ইহাদের বিচার করা যায়

উপরের এই আলোচনার পরে এখন আমরা জাতীয় ঋণের ভার সম্পর্কে আমাদের আলোচনাকে সংক্ষেপে সাজাইতে পারি। নিচের এই বিষয়গুলি মনে রাখিলেই এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে।

(১) উৎপাদক ঋণের ভার কিছুই নাই কারণ উহার ব্যয় দ্বারা যে-সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে আসে তাহা হইতে আয় বা উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সুদ বা ঋণ-মূল পরিশোধ করা যায়। অনুৎপাদক ঋণের ভার দেশের লোকের উপর পড়ে, কারণ, কর-রাজস্ব হইতেই উহার পরিশোধ বা সুদ প্রদান করিতে হয়।

(২) ঋণ-ভার পরিমাপ করিতে হইলে বহু বিষয় গণনার মধ্যে আনিতে হয়; যেমন ঋণের পরিমাণ, আভ্যন্তরীণ বা বাহ্য, ঋণের উদ্দেশ্য, পরিশোধের শর্ত ও পদ্ধতি প্রভৃতি। তাহা ছাড়া, জাতীয় আয়ের পরিমাণ, দেশে কর-ব্যবস্থার রূপ, এবং সরকারী ঋণপত্র-সমূহ দেশের কোন শ্রেণীর হাতে কিরূপভাবে বণ্টিত আছে—প্রভৃতি সকল কিছু বিচার করা দরকার।

ঋণভার পরিমাপের বিষয়-সমূহ

(৩) রাষ্ট্রীয় ঋণভার দুইপ্রকার: আর্থিক ভার ও আসল ভার। ইহার প্রত্যেকটি ভার আবার দুই প্রকারের হইতে পারে—প্রত্যক্ষ ভার ও পরোক্ষ ভার।

(৪) কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাহ্য ঋণের প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার হইল, সুদ ও ঋণ পরিশোধের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বাঞ্ছিত হয়। সুদ ও ঋণ-

পরিশোধের জন্য দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করিবার ফলে সমাজের ভোগ, তৃপ্তি বা অর্থনৈতিক কল্যাণ কমিয়া যায়, তাহাই প্রত্যক্ষ আসল ভার; ঋণের প্রত্যক্ষ আসল ভার নির্ভর করে সমাজের কোন্ শ্রেণীর নিকট হইতে কিরূপ অর্থ আদায় করিয়া ঋণ পরিশোধ করা হইতেছে, তাহার উপর। যেমন, যদি ধনিক শ্রেণীর নিকট হইতে অধিক অর্থ আদায় করা হয়, তাহা হইলে ঋণের প্রত্যক্ষ আসল ভার কম হইবে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক কল্যাণ কম হ্রাস পাইবে। বাহ্য ঋণের পরোক্ষ আসল ভারও দেখা যায়, কারণ (ক) পরিশোধনীয় অর্থ তুলিবার জন্য অধিক হারে কর বসাইলে দেশের উৎপাদন ও উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পাইতে পারে, এবং (খ) বিভিন্ন দিকে নিয়োগ করিয়া দেশের কল্যাণ বাড়াইবার কার্যে ওই অর্থ নিয়োগ করা সম্ভব হয় না।

বাহ্য ঋণভার

(৫) আভ্যন্তরীণ ঋণের কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার নাই, কারণ সুদ ও ঋণপরিশোধ করিলে উহা দেশবাসীগণই পাইয়া থাকেন, এক শ্রেণীর নিকট হইতে অপর শ্রেণীর নিকট ওই অর্থ হস্তান্তরিত করা হয় মাত্র। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঋণের পরোক্ষ আর্থিক ভার দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, (ক) ধনী-গরীব সকলেই ঋণ-পত্র ক্রয় করেন। এরূপ অবস্থায়, দেশের সম্পদ গরীবদের হাত হইতে ধনীদের হাতে চলিয়া যায়—সম্পদের এইরূপ হস্তান্তর আর্থিক বৈষম্যের পরিধি বিস্তৃত করে। (খ) উচ্চহারে কর স্থাপনের ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (গ) কল্যাণমূলক সরকারী ব্যয় কমে। (ঘ) দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হয়, গরীবদের জীবনযাত্রার মান ও কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। (ঙ) সুদের দরুণ পূর্বাপেক্ষা অধিক আয় পাইতে থাকায় ধনিকশ্রেণীর উৎপাদনী কর্মপ্রচেষ্টাও হ্রাস পায়। (চ) যুদ্ধের সময়ে গৃহীত ঋণের আসল ভার যুদ্ধের পরে বাড়ে, কারণ যুদ্ধোত্তর যুগে দামস্তর ও সুদের হার কমিয়া যায়।

আভ্যন্তরীণ ঋণভার

(৬) লার্নারের মতে কেবলমাত্র বাহ্য-ঋণই ভারশীল এবং ব্যক্তিগত ঋণের ন্যায় তাহা রাষ্ট্রকে দরিদ্র করিয়া তোলে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঋণের ভার বিশেষ কিছু নাই। বর্তমান ঋণের ভার ভবিষ্যতের বংশধরদের উপর পড়িতেছে, অনেকে তাহা বলিলেও লার্নারের মতে উহা ঠিক নয়, কারণ ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সেই ঋণ নিজেদেরই পরিশোধ করেন, অন্যকে নয়। তাঁহার মতে, রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণও মোটেই

লার্নারের মত

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে। আর আভ্যন্তরীণ ঋণের সুদকে কখনই ভার বলা চলে না কারণ উহা ব্যক্তিরা নিজেরাই পাইয়া থাকেন।

রাষ্ট্রীয় ঋণের অর্থনৈতিক ফলাফল (The Economic Effects of Public Debt)

রাষ্ট্র ঋণ করিলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ রাষ্ট্রের নিকট চলিয়া আসে; সেই অর্থ ব্যয় করিলে পুনরায় তাহা কিছুসংখ্যক ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া যায়; সেই ঋণ পরিশোধের সময়ে সাধারণ করদাতাদের নিকট হইতে অর্থ চলিয়া আসিয়া সরকারী ঋণপত্র ক্রেতাদের নিকট চলিয়া যায়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ঋণ, উহার ব্যয় ও পরিশোধ বহুপ্রকার অর্থনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করে।

যদি রাষ্ট্র ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে তাহা হইলে দেশে অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে। ব্যাঙ্কসমূহ সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া উহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক দিয়া ঋণ গ্রহণের দ্বারা জনসাধারণকে ঋণ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও সেই ঋণপত্রকে জমা হিসাবে গণ্য করিয়া উহার ভিত্তিতে অধিক অর্থ প্রচলিত করিতে পারে। ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে যেমন, ব্যক্তির নিকট ঋণপত্র বিক্রয় করিলে মুদ্রাসংকোচনশীল প্রভাব ঘটে, কারণ ব্যক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরাইয়া লইলে সমাজের ব্যয়স্রোত সংকুচিত হয়।

অর্থের পরিমাণের উপর প্রভাব

দামস্তরের উপর প্রভাব নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর: (ক) অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন, ও (খ) অর্থনৈতিক কাজকর্মে পরিবর্তন। ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ বাড়ে, দামস্তরও বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্যান্য সূত্র হইতে ঋণগ্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ কমে, দামস্তরও হ্রাস পায়। রাষ্ট্রীয় ঋণের ব্যয়ের ফলে যদি উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটে তাহা হইলে দামস্তরে বৃদ্ধি না-ও হইতে পারে; অপরক্ষেত্রে, সেই ব্যয়ের ফলে আয় ও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে এবং দামস্তরে হ্রাস না-ও হইতে পারে। কেইন্সের মতে, দেশে অনিযুক্ত উপাদান থাকিলে উৎপাদন বাড়িবে কিন্তু দামস্তর স্থির থাকিবে, কিন্তু পূর্ণ-নিয়োগের

দামস্তরের উপর প্রভাব

* তবে লুকানো মজুত অর্থ হইতে রাষ্ট্রকে ঋণ প্রদান করিলে এইরূপ ফলাফল নাও ঘটিতে পারে।

পরেও ঋণ ও ব্যয় করা হইলে উৎপাদন সমান থাকে, তবে দামস্তর বাড়িয়া যাইবে।†

ঋণ-পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি ও নিয়মসমূহের দ্বারা (Debt Management) সুদের হার প্রভাবান্বিত হয়। ঋণ-পরিচালনার কাজ হইল ঋণ-গ্রহণের সময়, ঋণ গ্রহণের রূপ ও পদ্ধতি, কোন্ শ্রেণীর নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করা হইবে, কি সুদ দেওয়া হইবে, কবে ও কি হারে কি পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা হইবে, ঋণপত্রে ক্রেতাদের কি সুযোগ দেওয়া হইবে এই সকল বিষয়ে নীতি-নির্ধারণ করাকে ঋণ-পরিচালনা বলে। যে-হেতু স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয়প্রকার ঋণের বাজারেই রাষ্ট্র প্রধান ঋণগ্রহীতা, সেই জন্য ইহার ঋণ-পরিচালনার প্রভাব সুদের হারের উপর পড়ে।

সুদের হারের উপর ইহার প্রভাব

ঋণ গ্রহণ করিয়া সেই অর্থ যে-দিকে ব্যয় করা হয় সেইদিকে উপাদান-সমূহ নিযুক্ত হইতে থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে উপাদান-সমূহের নিয়োগে এমন দিক্-পরিবর্তন ঘটা উচিত যাহা সামাজিক ভাবে কল্যাণবর্ধক।

উপাদানসমূহ নিয়োগের দিক্-নির্ধারণের উপর প্রভাব

সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করেন ধনী ব্যক্তিগণ, কিন্তু উহার সুদ বা পরিশোধ করা হয় দেশের সকলের নিকট হইতে কর-রাজস্ব তুলিয়া। সুতরাং সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির বা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এইরূপে সম্পদের হস্তান্তরণ ঘটে। যদি ব্যয় এরূপ করা হয় যে পুনরায় সেই অর্থ গরীবদের নিকট বর্ধিত আয়রূপে ফিরিয়া আসে, তবে সামগ্রিকভাবে তাহা কল্যাণজনক।

আয়-বণ্টন কাঠামোর প্রভাব

আধুনিক কালে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্রমশ ইহার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। মোটের উপর বলা চলে যে, ইহার প্রভাব নির্ভর করে, (ক) কিরূপে ঋণ তোলা হইল, (খ) কিরূপে এই ঋণ রক্ষিত হইল, এবং (গ) কিরূপে এই ঋণ পরিশোধ করা হইল, এই সকল বিষয়ের উপর।

উপসংহার

† সোমার্সের মতে রাষ্ট্রীয় ঋণ এবং দামস্তরের সহিত কোন সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কিন্তু অ্যালেন ও ব্রাউন্‌লীর মতে ইহাদের মধ্যে কিছুটা সুদূর সম্পর্ক আছে। তবে, যেহেতু বাজেটের মধ্যে ঋণের সুদ ও পরিশোধনীয় অর্থ প্রভৃতির পরিমাণ কম, তাই সাধারণভাবে দামস্তরের উপর ইহাদের প্রভাবও কম।

আবার একে একে ইহাদের আলোচনা করিব। তবে তাহার পূর্বে আমাদের ঋণ পরিশোধের পদ্ধতিগুলি জানা প্রয়োজন।

ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি (Methods of Debt Repayment)

সাধারণভাবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ করা হইয়া থাকে :

(১) **বাজেট উদ্বৃত্তের দ্বারা :** যদি বাজেটে উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলে সেই উদ্বৃত্তের দ্বারা আংশিকভাবে ঋণপরিশোধ করা চলে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় বাজেটে উদ্বৃত্ত হইলে তাহার দ্বারা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয় (যেমন করহ্রাস বা কল্যাণমূলক কাজকর্ম প্রভৃতি), এবং শেষ পর্যন্ত উহার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হইয়া উঠে না।

(২) **নিমজ্জমান তহবিল (Sinking Fund) :** অনেকক্ষেত্রে ঋণ-পরিশোধের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ তহবিল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে নিয়মিতভাবে অর্থ জমা দেওয়া হয়, এবং বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ জমা হইলে উহা হইতে ঋণ পরিশোধ করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়মিতভাবে জমা দিলে তাহাকে নির্দিষ্ট-নিমজ্জমান তহবিল (Definite Sinking Fund) বলা হয়। আর যখন যে-পরিমাণ অর্থ জোটানো গেল তাহা জমা দেওয়া হইলে তাহাকে অনির্দিষ্ট নিমজ্জমান তহবিল (Indefinite Sinking Fund) বলে। প্রতি বৎসর তহবিলজাত অর্থের সুদ উহার সহিত যোগ করিলে তাহাকে বর্ধনশীল নিমজ্জমান তহবিল (Cumulative Sinking Fund) বলা হয় ; উহা হইতে প্রাপ্ত সুদ উহাতেই জমা না রাখিলে তাহাকে স্থির-তহবিল (Constant Sinking Fund) বলে। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনৈতিক প্রভাবে ওই অর্থ অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইয়া যায় এবং উহা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হইয়া উঠে না।

(৩) **রূপান্তরণ (Conversion) :** অধিক সুদবহনকারী ঋণকে কম সুদবহনকারী ঋণে রূপান্তরিত করাকে রূপান্তরণ (Conversion) বলে। বাজারে সুদের হার পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গেলে বর্তমানের কম সুদে নূতন ঋণ করিয়া পুরাতন অধিক সুদ বহনকারী ঋণ পরিশোধ করিলে ঋণের ভার কিছুটা কমে।

(৪) **মূলধনী কর স্থাপন (Capital Levy) :** সকল প্রকার মূলধনের উপর ক্রমবর্ধমান হারে কর বসাইলে প্রভূত পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় এবং

তাহার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা চলে। এই পদ্ধতিকে মূলধনী-কর স্থাপন বলা হয়। ইহার সুবিধা হইল: (ক) দ্রুত ঋণ পরিশোধ হইয়া যায়, (খ) করভার প্রধানত ব্যবসায়ী ও ধনিকশ্রেণীর উপর পড়ে, সাধারণ ব্যক্তিদের উপর নহে। (গ) বৃদ্ধ ও বয়স্ক ব্যক্তিরা ভার বহন করে এবং যুদ্ধে যাহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে সেই সকল অল্পবয়স্ক ব্যক্তিরা ভারগ্রস্ত হয় না। (ঘ) স্থায়ী ও উচ্চ আয়করের অসুবিধার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহার বিরুদ্ধে বলা চলে যে, (ক) ইহার বহু প্রয়োগগত অসুবিধা আছে। (খ) সমস্ত রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ না করাই উচিত, কারণ সমাজে সরকারী ঋণপত্রসমূহের প্রচুর সুবিধা আছে। (গ) ইহা পক্ষপাতদুষ্ট, কারণ যাঁহাদের সম্পত্তি আছে বা যাঁহারা চাকরি করিয়া প্রচুর আয় করেন তাঁহারা করের হাত হইতে বাঁচিয়া যান, কিন্তু মূলধনের মালিকগণের উপর অধিক চাপ পড়ে। (ঘ) ধনিকশ্রেণীর অবস্থা ও সঞ্চয়-ক্ষমতা আঘাত পায়, ফলে দেশের সঞ্চয় ও মূলধন-গঠন হ্রাস পায়।

(৫) **অস্বীকার করা (Repudiation):** অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অবশেষে বাধ্য হইয়া পরিশোধের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারে। প্রভূত পরিমাণ ঋণের দায়িত্ব হইতে এই পদ্ধতি দ্বারা সরকার মুক্তিলাভ করিলেও ইহা সঙ্গত নহে, কারণ সুনাম নষ্ট হয় বলিয়া সরকারের ভবিষ্যৎ ঋণগ্রহণ ক্ষমতা কমিয়া যায়।

ঋণ গ্রহণ, ঋণের মালিকানা ও ঋণ-পরিশোধের অর্থনৈতিক ফলাফল (Economic effects of Borrowing & Owning of existing debt and Debt repayment):

(১) **ঋণ-গ্রহণের ফলাফল (Economic effects of borrowing):** সরকারী ব্যয় করার উদ্দেশ্যে কর-আরোপন দ্বারা টাকা তোলা বা ঋণ সংগ্রহ করিয়া টাকা উঠান এই দুই পদ্ধতির অর্থনৈতিক ফলাফল সমান নয়। ইহার কারণ হইল: (ক) সরকারকে ঋণ দেওয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত, এবং (খ) এইরূপ ঋণদানের ফলে ঋণদাতার ব্যক্তিগত সম্পদ কমিয়া যায় না, ঐ সম্পদের রূপান্তরণ ঘটে মাত্র। এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের প্রধান ফল হইল যে, মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে, একই পরিমাণ টাকা ঋণ করিয়া তোলা হইলে, কর আরোপনের তুলনায় ইহাতে দেশের সামগ্রিক চাহিদার উপর সংকোচনশীল প্রভাব খুব কম। বরং বলা চলে, যে, কর আদায়ের সাহায্যে টাকা তুলিয়া বিশেষ কোন একটি সরকারী ব্যয়

কর ও ঋণের তুলনামূলক ফলাফল

করিলে যে প্রভাব দেখা দিবে, তাহার তুলনায় ঋণ করিয়া সেই ব্যয় করিলে উহাতে অধিকতর প্রসারশীল প্রভাব দেখা দিবে। এই পার্থক্যের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। প্রথমত, ঋণদান স্বেচ্ছাকৃত হওয়ায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যে টাকা সঞ্চিত বা জমানো অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, একমাত্র তাহারাই সরকারের হাতে আসিতেছে, দেশের ভোগ-ব্যয় সংকুচিত হইতেছে না। দ্বিতীয়ত, ঋণদান স্বেচ্ছাকৃত হওয়ায় এবং লোকের হাতে নীট সম্পদ কমে না বলিয়া লোকের সঞ্চয় ও কর্মোদ্যমের উপর কোন বিরূপ প্রভাব ইহাতে দেখা যায় না। করের ক্ষেত্রে এই বিরূপ প্রভাব নিশ্চয় কিছু দেখা দিবে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে, সরকারী ঋণের বৃদ্ধি সরকারের আর্থিক স্থায়িত্বের উপর আস্থা কমাইয়া দেয়, ফলে দেশে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বেসরকারী ব্যয় কমিয়া যাইতে পারে।

ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণ তোলা হইলে

সরকারী ঋণ গ্রহণের প্রভাব মূলত নির্ভর করে কোন্ ধরনের উৎস হইতে ঋণ তোলা হইতেছে উহার উপর। ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঋণ তোলা হইলে, ইহা স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া, সাধারণক্ষেত্রে ভোগব্যয় না কমিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু রাষ্ট্র যদি নৈতিক চাপ দেয় (যেমন যুদ্ধের সময়), অথবা ঋণপত্রগুলিকে খুবই আকর্ষণীয় ও সুবিধাজনক শর্তে ঘোষণা করে, তবে ভোগব্যয় অল্প কিছু কমিতে পারে। শুধু তাহাই নহে। ইহাতে সরকারী বিনিয়োগ ব্যয়ও বিশেষ প্রভাবিত হইবে না। কারণ বেশির ভাগ সরকারী ঋণ-পত্রই কেনা হইবে ব্যক্তির অলস সঞ্চয় হইতে। তবে বেসরকারী বণ্ডগুলির সঙ্গে সরকারী বণ্ডের প্রতিযোগিতা কিছুটা দেখা দিবে না এমন বলা চলে না; কারণ ব্যক্তি নিজের সঞ্চয় হইতে সরকারী বণ্ড অথবা বেসরকারী বণ্ড কিনিবে। এই প্রতিযোগিতার দরুণ উভয়কেই সুদ বাড়াইতে হইতে পারে। এইরূপে দেশে সুদের হার বাড়িলে বিনিয়োগ কিছুটা সংকুচিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিনিয়োগ কতটা বাধা পাইবে তাহা নির্ভর করে সুদের হারে বৃদ্ধির পরিমাণের উপর এবং বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতার উপর।

ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ করিলে (যেমন বীমা কোম্পানী, ইস্যু হাউস প্রভৃতি) দেশের বিনিয়োগব্যয় ততটা বেশি প্রভাবিত

হয় না। এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের সঞ্চিত নগদ টাকা আংশিক পরিমাণে ছাড়িয়া দিয়া সরকারী বণ্ড কিনিবে বটে; কিন্তু নিশ্চয় অন্যান্য ঋণপত্র না কিনিয়া উহাদের পরিবর্তে তাহারা সরকারী বণ্ডে টাকা খাটাইতে চাহিবে। সুতরাং সুদের হারে বৃদ্ধির দরুণ বিনিয়োগের উপর বিরূপ প্রভাব পড়িবে। এই অবস্থায় সরকারী ঋণ উঠান-র আর একটি সংকোচনশীল প্রভাব হইল এই যে, সরকারী বণ্ড কেনার ফলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা দেশে কমিয়া যায়।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে

ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে উহার ফলে দেশে তীব্র ঋণপ্রসারের সম্ভাবনা। ইহা দুইটি উপায়ে সম্ভব: (১) সরকারী বণ্ড কেনার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে ব্যক্তিরা ঋণ লইতে পারে, অথবা, (২) রাষ্ট্র ব্যাঙ্কগুলির নিকট সরাসরি বণ্ড বিক্রয় করিতে পারে। ইহাদের যে কোন উপায় গৃহীত হউক না কেন সরকার এই ঋণ বা ক্রয়শক্তি হাতে পায় অতিরিক্ত ব্যাঙ্ক-ঋণ সৃষ্টি করিয়া। তাই ইহার প্রভাব প্রসারশীল। ইহা সম্ভব হয় যদি দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে অধিক জমা থাকে এবং অন্যান্য ঋণ না কমাইয়াই তাহারা সরকারী বণ্ড ক্রয় করিতে পারে।

ব্যাঙ্কের নিকট হইতে

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বণ্ড বিক্রয় করিয়া যদি রাষ্ট্র ঋণ-গ্রহণ করে তবে উহাও তীব্রভাবে প্রসারমূলক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের খাতায় আমানত লিখিয়া রাখিয়া সরকারকে ঋণ দেয়, এই ক্রয়শক্তি রাষ্ট্র দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়ে ব্যয় করিতে পারে। এই ক্রয়শক্তি একেবারে নূতন তৈয়ারী করা হইল, সমাজের অন্য কোন অংশ এই ক্রয়শক্তির ব্যবহার পরিত্যাগ করে নাই। নূতন-সৃষ্ট এই ক্রয়শক্তি সরকার ব্যয় করিলে উহা আমানতের রূপে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আলমারিতে পৌঁছায়, উহার ভিত্তিতে ব্যাঙ্কগুলি আবার ঋণপ্রসার শুরু করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সামগ্রিক ব্যয়ের উপর সরকারী ঋণের মোট প্রভাব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ভোগব্যয় হ্রাসের সম্ভাবনা খুব কম। বিনিয়োগব্যয়ের উপর ইহার প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি, কারণ ব্যক্তিদের নিকট বণ্ড বিক্রয়ের ফলে তাহাদের টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হওয়ার সুযোগ পায় না, নূতন শেয়ার বা বণ্ডের বাজারে তাহাদের খাটান টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়।

সামগ্রিক প্রভাব আলোচনা

একটি পরোক্ষ পথ আছে যাহা দিয়া সমাজের অর্থনৈতিক দেহে সরকারী ঋণ প্রত্যক্ষভাবে সংকোচনশীল প্রভাব আনিতে পারে। সরকারী ঋণ বৃদ্ধি পাইলে ভবিষ্যতে করবৃদ্ধির বা জাতীয় দেউলিয়াবস্থায় ভয়ে বর্তমানে বেসরকারী বিনিয়োগ-ব্যয় ও ভোগব্যয় দুই-ই কমিতে পারে।

তবে সাধারণক্ষেত্রে সরকারী ঋণের সংকোচনমূলক প্রভাব কম বলিয়া ঋণ করিয়া সরকারী ব্যয়-বৃদ্ধির নীট প্রভাব নিশ্চয় প্রসারশীল। কর আদায় করিয়া ব্যয়ের তুলনায় ঋণ করিয়া ব্যয়ের প্রভাব অনেক বেশি প্রসারমূলক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভোগব্যয়ের উপর সরকারী ঋণ তোলার কোন প্রভাব নাই, এবং বিনিয়োগের উপরও প্রভাব কম। অথচ, অপরপক্ষে, কর-আরোপের ফলে সামগ্রিকভাবে সংকোচনমূলক প্রভাব নিশ্চয় বেশি। সরকারী ঋণের ফলে দেশের সংকোচনশীল প্রভাব একমাত্র তখনই দেখা দিতে পারে যখন লোকের মনে সরকারী আর্থিক স্থায়িত্ব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও আস্থাহীনতা আসে। উপসংহারে, আমরা বলিতে পারি যে, সরকারী ঋণের প্রসারমূলক ফল সেই ঋণ ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল, কেবলমাত্র ঋণ-উঠান-র উপরই অর্থনৈতিক প্রসার নির্ভর করে না।

নীট প্রভাব প্রসারশীল

(২) বর্তমান ঋণ ও তাহার মালিকানার ফলাফল (Economic effects of owning and servicing the debt):

সরকারী ঋণ-উঠান এবং সেই ঋণের টাকায় সরকারী ব্যয়—এই উভয়ের ফলাফল হইতে পৃথক করিয়া বিচার করা দরকার যে, দেশের মধ্যে কিছু পরিমাণ সরকারী ঋণ থাকিলে উহার অর্থনৈতিক ফলাফল কি। এই সরকারী ঋণপত্রগুলি হইল একপ্রকার দাবি বা অধিকার। সরকারের উপর, অর্থাৎ দেশের করদাতাদের উপর এই সকল বণ্ডক্রেতাদের একরূপ দাবি বা অধিকার আছে। মালিকদের দিক হইতে দেখিতে গেলে বণ্ডগুলি ব্যক্তিগত সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহারা জাতীয় সম্পদ নয়, কারণ ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে তাহাদের মূল্য করদাতাদের বিরুদ্ধে তাহাদের দাবি হিসাবে খণ্ডিত হইয়া যায়। যতদিন দেশের অভ্যন্তরে এই ঋণ থাকে ততদিন ইহা দেশের প্রকৃত সম্পদে হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রকাশ করে না। তবুও সারা দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর এইরূপ সরকারী ঋণের গুরুত্ব কম নয়।

বণ্ডের পরিমাণ বাড়িলে বা কমিলে উহা জাতীয় সম্পদে হ্রাস-বৃদ্ধি প্রকাশ করে না

দেশে সরকারী ঋণ থাকার সাধারণ প্রভাব হইল ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া। ইহার কারণ হইল যে, বণ্ড হাতে থাকিলে ব্যয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। ইহাতে অর্থনৈতিক দেহে প্রসারশীল প্রভাব ঘটে। বিনিয়োগের দিক হইতেও ইহার প্রভাব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশে প্রচুর পরিমাণ সরকারী ঋণপত্র থাকায়, রাষ্ট্র সুদের হার বাড়াইতে অনিচ্ছুক থাকে, ঋণপত্র না থাকিলে যে সুদ থাকিত, তাহাপেক্ষা বাস্তবে দেশে সুদের হার কম থাকিতে পারে। ইহাতে বিনিয়োগের প্রসার ঘটার সম্ভাবনা। অপরপক্ষে, ঋণের দরুণ সরকারের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব সম্পর্কে আস্থাহীনতার মনোভাব দেখা দিলে উদ্যোক্তারা দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা খাটাইতে অনিচ্ছুক হইতে পারে।

সমাজে এত ঋণপত্র থাকার ফলে ইহাদের মালিকদের সুদ দিবার দায়িত্ব সরকারের উপর আসিয়া পড়ে। করের প্রধান ভার হইল সুদ দিবার জন্য দেশের অর্থনীতিকে যে ধরনের চাপ বহন করিতে হয়। সাধারণত সুদ দেওয়া হয় কর আদায় করিয়া। ইহার ফলে অনেক অবাঞ্ছনীয় ফলাফল দেখা দিতে পারে। যেমন, উহাতে আয়ের বণ্টন-কাঠামো পরিবর্তিত হইবে। সকল দেশের দিকে তাকাইলেই দেখা যায় যে, বণ্ডগুলি অতি অল্পসংখ্যক ধনী ব্যক্তির মালিকানায় কেন্দ্রীভূত (আমেরিকায় ৬২% বণ্ড মাত্র ১০% ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ); অথচ দেশের করগুলি, এমন কি ক্রমবর্ধমান করগুলিও, গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাত হইতে টাকা তুলিয়া লয়। এইরূপ ইহা আয়-বৈষম্য বাড়াইয়া তুলিতে পারে, ফলে সমাজের মোট ভোগব্যয় হ্রাস করিয়া আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর কমাইয়া দিতে পারে।

সুদ প্রদানের ভার কাহার উপর

এই অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, বণ্টনগত কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না যদি ব্যক্তিরা যে অনুপাতে কর দেয় সেই অনুপাতে বণ্ডের মালিকানা তাহাদের হাতে থাকে। কিন্তু সঠিক কথা বলিতে গেলে তাহা সম্ভব নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। ইহা সম্ভব নয় কারণ, প্রথমত, বণ্ডক্রেতারা সমজাতীয় অর্থনৈতিক দল নয় যাহাদের উপর করের জাল ফেলিয়া একত্র ছাঁকিয়া তোলা যায়। দ্বিতীয়ত, বণ্ডের মালিকানা এবং করের ভিত্তি সদাসর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে। এই পদ্ধতি বাঞ্ছনীয় নয় তাহার কারণ হইল, সুদ দিবার উদ্দেশ্যে কর আরোপন ও আদায়ের পক্ষে বহুপ্রকার

বণ্ডের ও করের সমবণ্টন হইলেও কিছু কিছু ভার থাকে

সংঘাত (frictions) দেখা দেয়। উচ্চ হারে আরোপিত কর কর্মোদ্যম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কমাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতির সংখ্যাও বাড়াইয়া দেয়। তাহা ছাড়া, কোন গণতান্ত্রিক দেশে করের ভার বাড়িলে রাজনৈতিক চাপ এবং গণ-অসন্তুষ্টি বাড়ে বই কমে না। এই সকল চাপ ও টানাপোড়েনের দরুন ঋণের মালিকানার সমান অনুপাতে কর-ভারের বণ্টন ঘটিলেও দেশের সুস্থ অর্থনৈতিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। প্রতি বৎসর ইহারা যে অনিশ্চয়তা ও সংঘাত সৃষ্টি করে, তাহার ভারও কম নয়।

দেনা-পাওনার মালিক এক হইলে সুদের দরকার কি

কোন কোন ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, যদি করদাতা হিসাবে কর দিয়া একই ব্যক্তি বণ্ডদাতা হিসাবে উহা সুদের আকারে ফেরত পায় তবে সুদ না দিলেও কোন ক্ষতি নাই, সুদ দেওয়া একেবারে স্থগিত রাখিলেও চলে। এই প্রস্তাবের অর্থ হইল জাতীয় ঋণের পরিমাণ প্রতি বৎসর কেবল বাড়িয়াই চলিবে। তাহা ছাড়া, সুদ না থাকিলে সরকারের পক্ষে বণ্ড বিক্রয় করিয়া ঋণ তোলা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করা যায় না।

টাকা বাড়াইয়া সুদের ভার কমানো যায়

করভার কমাইবার জন্য অনেক ধনবিজ্ঞানী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কৃত্রিম উপায়ে বণ্ডের বাজার বাড়াইয়া তুলিয়া সরকার সুদের হার কম রাখিতে পারেন। অর্থাৎ রাষ্ট্র দেশে টাকার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়া চলিবেন। এই নীতি সরকারের পক্ষে বিশেষ বিপদজনক হইতে পারে। দেশে কম সুদে এবং অজস্র সরকারী বণ্ড থাকিলে, সরকারের পক্ষে ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক নীতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে ঋণপ্রসারের উপযুক্ত প্রভূত পরিমাণ সরকারী বণ্ড থাকে।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে, আভ্যন্তরীণ ঋণের সুদের ভার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সাহায্য না করিয়া বাধারই সৃষ্টি করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৩) ঋণ পরিশোধের অর্থনৈতিক ফলাফল (Economic effects of debt repayment):

সমাজে মোট সরকারী ঋণের পরিমাণ কমাইতে হইলে কর বা অন্ত

রেভিনিউ খাতে সরকারী আয়ের পরিমাণ সরকারী ব্যয়ের তুলনায় বেশি করা দরকার। ঋণ পরিশোধ অনেক রূপ লইতে পারে, যেমন ফলপ্রসূকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের হাত হইতে সরকারী বণ্ড কিনিয়া লইয়া টাকা মিটাইয়া দেওয়া, অথবা ফলপ্রসূকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই বণ্ড-বাজার হইতে উহাদের কিনিয়া লওয়া।

উদ্বৃত্ত বাজেট খাটানো দরকার

ঋণ-পরিশোধের অর্থনৈতিক ফলাফল অনেকটা ঋণ-গ্রহণের বিপরীত। বণ্ড-ক্রেতাদের দাম মিটাইয়া দেওয়ায় কিছুটা প্রসারমূলক প্রভাব দেখা দিবে, কারণ ইহার ফলে বণ্ড-ক্রেতাদের সম্পত্তি অধিকতর তরল আকার ধারণ করে। কিন্তু এই প্রভাব বিশেষ কিছু শক্তিশালী হইবে না। বণ্ড বিক্রয় করিয়া ব্যক্তি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হাতে যে-টাকা আসিল তাহা সমাজের সঞ্চয়ের অংশ, এই সঞ্চয় দ্বারা তাহারা আবার নূতন ঋণপত্র ক্রয় করিবে। বেসরকারী বণ্ডের জন্য চাহিদার এইরূপ বৃদ্ধি সুদের হার কমাইয়া দিবে এবং বাজারকে তেজী করিয়া তুলিয়া কিছুটা বিনিয়োগ বাড়াইতে পারে।

ঋণ গ্রহণের বিপরীত প্রভাব

ব্যাঙ্ক-কর্তৃক রক্ষিত ঋণপত্র কিনিয়া লইলে উহার প্রসারশীল প্রভাব আরও কম বলিয়া মনে হয়। ব্যাঙ্কগুলির হাতে পূর্ব হইতে বেশি রিজার্ভ থাকিলে বণ্ড কিনিয়া লওয়ায় আমানত কমিয়া গিয়া নগদ টাকার পরিবর্তন বাড়িয়া গেল মাত্র। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়িলে ঋণ সৃষ্টি কিছুটা পরিমাণ বাড়িতে পারে, যদি অবশ্য পূর্বে তাহারা নগদ টাকার পরিমাণ কম থাকায় ঋণপ্রসারের সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতের ঋণপত্রগুলি সরকার কিনিয়া লইলে উহার কোনরূপ প্রসারশীল প্রভাব নাই।

অপরপক্ষে, ঋণ পরিশোধের উপযুক্ত পরিমাণ টাকা সরকারের হাতে তুলিয়া আনার জন্য যে-পরিমাণ কর বসাইতে হইবে, তাহার সংকোচনশীল প্রভাব অনিবার্য, কারণ এইরূপ করের ফলে ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ-ব্যয় উভয়ই কমে। তাই কর আদায় ও ঋণ পরিশোধের মিলিত প্রভাব সংকোচনমূলক হইতে বাধ্য।

আধুনিক কালে, অবশ্য সরকারী ঋণ পরিশোধের ব্যাপারটা নিতান্ত ইচ্ছা

যা খেয়াল-খুশির ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোনরূপ ফলপ্রসূকাল উল্লেখ না করিয়া সরকারী বণ্ড বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া আজকাল রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুনরায় ঋণগ্রহণ এবং রূপান্তরণে (Refunding and conversion) সুবিধা থাকায় ঋণের পরিশোধ অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা চলে। এই অবস্থায় তাই, কেহ কেহ বলেন যে, সরকারী ঋণের ঋণমূল (principal) আর বাস্তব নয়, ইহা নিছক কল্পনা ও অবাস্তব অনুমানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত ভার হইল সুদ প্রদানের এবং এই ভারও নিতান্ত আপেক্ষিক ব্যাপার। ইহা প্রধানত নির্ভর করে (ক) জাতীয় আয়ের পরিমাণ, (খ) কর-কাঠামোর প্রকৃতি এবং (গ) দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বণ্ড-মালিকানার বণ্টনের উপর।

আধুনিককালে ইহাকে আর ভার বলিয়া কেন মনে হয় না

বাস্তবপক্ষে, ঋণভারের গভীরতা প্রধানত নির্ধারণ করা যায় জাতীয় আয়ের স্তর অনুযায়ী। ইহা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অন্তত যখন আমরা ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে জাতীয় আয় বাড়াইবার কথা বলি। কারণ জাতীয় উন্নয়নের এই কার্যসূচী সফল হইলে সরকারী ঋণের মূল-পরিমাণ এবং বাৎসরিক সুদের পরিমাণ নিজের আয়তন বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভার কমাইবার ব্যবস্থা সকলের অলক্ষ্যে আপনা-আপনি করিতে থাকে। জাতীয় আয় অধিকতর বৃদ্ধি পাইলে উহার সহিত জাতীয় ঋণের অনুপাত হ্রাস পায়। ঋণভারের এই হ্রাস ব্যক্তিদের মধ্যে কিরূপে বন্টিত হয় তাহা নির্ভর করে আয়-বণ্টনের উপর এবং উহার সহিত ঋণগ্রহণ ব্যবস্থা, করপাতের ধরন, সুদ প্রদানের বণ্টন কাঠামো প্রভৃতি তুলনা করিয়া। আর ইহা তো স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঋণ-পরিমাণের তুলনায় জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির হার বেশি হইলে আসল ভার হ্রাস পায়।

আসল কথা জাতীয় আয়ের সহিত ইহার অনুপাত কি

সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার, জাতীয় ঋণের আয়তন ও গঠন (size and composition) পরিবর্তিত হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণই বদলাইয়া যাইতে পারে। ব্যক্তি ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে বণ্ডগুলি ব্যাঙ্কের হাতে পৌঁছিলে প্রসারমূলক ধারা শুরু হইতে পারে। যে-কোন সূত্র হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট পৌঁছাইলে উহার প্রসারশীল প্রভাব আরও

ঋণের আয়তন ও গঠন বদলাইলে জাতীয় আয় প্রভাবিত হয়

বেশি। বিপরীত পক্ষে, বণ্ডগুলিকে অপসরণ করিলে দেশে সংকোচনশীল প্রভাব বাড়িয়া যাইবে।

আন্তর্জাতিক ঋণ পরিশোধ (International debt repayments) :

আধুনিক জগতে কোন দেশ একক ও বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচিয়া থাকে না, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাহাকে অর্থনৈতিক লেনদেন করিতে হয়। একটি দেশের জাতীয় ঋণ অন্য দেশের সরকারকে কিরূপে পরিশোধ করা চলে ? বহু বিভিন্ন কারণে একটি দেশের সরকার অন্য দেশের সরকারকে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে, যেমন (১) যুদ্ধের পরে বিজিত দেশের সরকার বিজয়ী দেশের সরকারকে বাধ্যতামূলক ক্ষতিপূরণ দান করিতে পারে (reparations) ; অথবা (২) উন্নয়নমূলক কোন কার্যে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে এইরূপ ঋণ পরিশোধের সময় বিশেষ কতকগুলি অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয় যাহাদের আমরা অপসরণ সমস্যা (transfer problem) বলিয়া থাকি।

কিরূপে টাকা তোলা যায়

ক্ষতিপূরণ দান বা ঋণ পরিশোধের প্রধানত দুইটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, দেনদার দেশটিকে কর আরোপণ দ্বারা বা মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইয়া কিছু পরিমাণ টাকা তুলিতে হইবে। ইহাতে দেনদার দেশটিতে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইলে জাতির আসল আয় কমিয়া যাইবে এবং নিম্ন আয়সম্পন্ন শ্রেণীগুলি তুলনামূলকভাবে অধিকতর ঋণ পরিশোধের ভার বহন করিতে বাধ্য হইবে।

কিরূপে সেই টাকার রূপান্তর ঘটানো যায়

দ্বিতীয় সমস্যা হইল, ঐ দেনদার দেশটি যে-টাকা এইরূপে তুলিয়া লইল তাহাকে মহাজনী দেশটির টাকায় রূপান্তরিত করা। ইহাকেই বলে অপসরণ সংকট বা transfer crisis। যেমন জার্মান সরকার কোন উপায়ে নিজের দেশের মধ্য হইতে এই টাকা তুলিল। এখন তাহার নিকট সমস্যা হইল কিরূপে সে জার্মানীর মার্ককে বৃটেনের পাউণ্ডে রূপান্তরিত করিতে পারে। ঠিক কিরূপে জার্মানীর মার্ক বৃটেনের পাউণ্ডে পরিণত হইয়া বৃটেনে পৌঁছে এবং এই পথে দেনদার দেশটিকে কিরূপ ভার বহন করিতে হয় তাহা লইয়া প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। ঋণ পরিশোধ

সম্ভব করিবার জন্য জার্মানীকে রপ্তানি-আধিক্য (export surplus) ঘটাইতে হইবে, অর্থাৎ আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাড়াইয়া বৃটেনের পাউণ্ড আয় করিতে হইবে এবং এইরূপে পাউণ্ড আয় করিয়া উহার দ্বারা বৃটিশ সরকারের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

লর্ড কেইনসের মতে এইরূপ রপ্তানি-আধিক্য ঘটাইতে হইলে রপ্তানি দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমাইতে হইবে। তাহা না হইলে মহাজনী দেশের ক্রেতারা উহাদের ক্রয় বাড়াইবে কেন ? দাম কতটা কমাইলে এইরূপ রপ্তানি-আধিক্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে তাহা নির্ভর করে বিদেশের বাজারে জার্মান-দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। এইরূপ দামস্তর কমাইবার দরুন বাণিজ্যের পণ্য-হার (the barter terms of trade) জার্মানীর প্রতিকূলে আসিবে। ইতিমধ্যে যদি আমদানি দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যায় তাহা হইলে জার্মানীর বাণিজ্য-হার আরও বেশি প্রতিকূল হইয়া পড়ে। ইহার অর্থ হইল যে, তাহাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আমদানি পাইতে হইলে পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ রপ্তানি করিতে হইতেছে। কর আরোপণ বা মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবার সময় সে প্রথম স্তরের ভার (primary burden) বহন করিয়াছিল ; এখন সে বহন করিতেছে দ্বিতীয় স্তরের ভার (Secondary burden)। তাহার জাতীয় আয়ের এক অংশ বিদেশীদের নিকট শুধু পাঠাইয়া দিলেই চলে না, বাণিজ্য-হার প্রতিকূল হওয়ায় প্রতি-ইউনিট আমদানির জন্য পূর্বাপেক্ষা বেশি দ্রব্য তাহাকে রপ্তানি করিতে হয়। এই দ্বিতীয় স্তরের ভারকেই বলে অপসরণের ক্ষতি (transfer loss)।

কেইনসের মত : দাম কমাইয়া রপ্তানি বাড়াইতে হইবে

অধ্যাপক ও'লীন (Ohlin) অবশ্য এই মত মানিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে রপ্তানি-আধিক্য ঘটাইবার জন্য জার্মানীর আভ্যন্তরীণ দামস্তর কমাইবার কোন প্রয়োজন নাই। এই কারণে ঋণ-পরিশোধের কোন দ্বিতীয় স্তরের ভার দেখা দেয় বলিয়া তিনি মনে করেন না। তাঁহার মতে, সংশ্লিষ্ট দুইটি দেশের ক্রয়শক্তির ক্ষমতাতে পরিবর্তনের কথা কেইনস সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছেন। ক্ষতিপূরণ দানের তাৎপর্য হইল জার্মানী হইতে ক্রয়শক্তি বিদেশে হস্তান্তরিত করা। এইরূপ ক্রয়শক্তি হস্তান্তরিত হইলে জার্মানীর অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যায়, অথচ বিদেশের অধিবাসীদের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পায়।

ও'লীনের মত : দাম না কমাইলেও রপ্তানি বাড়িতে পারে

ইহার ফলে বিদেশী দ্রব্যের জন্য জার্মানীর চাহিদা অর্থাৎ জার্মানীর আমদানি হ্রাস পাইবে, অথচ অপরদিকে বিদেশী অধিবাসীদের চাহিদা অর্থাৎ জার্মানীর রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে পুরাতন দামেই জার্মানীর রপ্তানি বাড়িবে ও আমদানি কমিবে, ফলে জার্মানীর পক্ষে রপ্তানি-আধিক্য সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে। বাণিজ্যের পণ্য-হার জার্মানীর প্রতিকূলে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই এবং কোনরূপ 'অপসরণের ক্ষতি'ও ঘটিবে না।

অনেকে বলেন যে, প্রকৃত সত্য এই উভয় মতের মধ্যে নিহিত আছে। ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই যে, উভয় দেশের পারস্পরিক ক্রয়শক্তিতে কিছুটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই আসিবে যাহাতে কিছু পরিমাণ রপ্তানি-আধিক্য দেখা দিতে পারে। তবে ইহাও ঠিক যে, উভয় দেশের দামস্তরে এইরূপ পরিবর্তন ঘটা নিশ্চয়ই সম্ভব, দেনদার দেশটির বাণিজ্য-হার প্রতিকূল হওয়াও সম্ভবপর। তাই, দ্বিতীয় স্তরের ভার নিশ্চয় কিছুটা দেখা দিতে পারে। বাণিজ্য-হারে পরিবর্তন কতদূর দেখা দিবে তাহা অনেক প্রকার শক্তির উপর নির্ভর করে, যেমন পারস্পরিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, জার্মানীতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, দেশে ঋণ সংকোচের প্রয়োজনীয়তা, বিদেশে শুল্কের পরিমাণ প্রভৃতি। বিদেশে শুল্কের পরিমাণ বাড়াইলে দেনদার দেশটিকে দাম বেশি পরিমাণে কমাইতে হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাজনী দেশের সরকার যদি নিজ দেশের দাম ও আয়স্তর বাড়াইতে বাধা দেয় তবে দেনদার দেশটিকে দাম ও মজুরি বেশি পরিমাণ কমাইতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই, তাই ঋণ পরিশোধের ভার দেনদার দেশটিকে অধিক পরিমাণে বহন করিতে হইবে।

দুইটি মত মিলিয়াই প্রকৃত সত্য পাওয়া যায়

এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। বিদেশ হইতে ঋণ পরিশোধ পাইলে মহাজনী দেশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এইরূপ আলোচনা অনেক ধনবিজ্ঞানী করিয়াছেন। দেনদার দেশটির রপ্তানি বাড়িবে এবং মহাজনী দেশটির আমদানি বাড়িবে ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু ইহাতে মহাজনী দেশটির শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি নিজের দেশে ও বিদেশে কি পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারিবে না? ইহাতে কি মহাজনী দেশটিতে বেকারি ও শিল্প-সংকোচন দেখা দিবে না? তাই কয়েকজন ধনবিজ্ঞানী মহাজনী দেশটির উপর ঋণ পরিশোধের বিরূপ প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন:

মহাজনী দেশের উপর ঋণ পরিশোধের বিরূপ প্রভাব

অবশ্য মনে রাখা দরকার যে সর্বক্ষেত্রেই এরূপ যুক্তি মানিয়া লওয়া চলে না। দেনদার দেশটির পণ্যসামগ্রী যে সব সময়ই মহাজনী দেশটির দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক হইবে উহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেনদার দেশটি কাঁচামাল রপ্তানীতে পারদর্শী হইতে পারে এবং মহাজনী দেশটি শিল্পপ্রধান দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষ হইতে পারে। মহাজনী দেশটির ক্রয়শক্তি বাড়িলে উহা অধিক পরিমাণে দেনদার দেশটির জিনিস কিনিয়া লইতে পারে; এইরূপ ক্ষেত্রে মহাজনী দেশের অভ্যন্তরে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক ঋণ লেনদেনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পুনর্গঠন ও লেনদেনের কাজে ঋণ-প্রদানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহ গঠিত হইয়াছে। এই সকল ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে কিস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে (instalment), ইহাতে মনে হয়, দেনদার দেশগুলির উপর ঋণ-পরিশোধের অত্যধিক চাপ এবং মহাজনী দেশগুলির উপর উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিতে পারিবে না।

আধুনিক যুগে ইহা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত

অনুশীলনী

1. What are public debts? How do they affect our economic life?

2. What are the different forms of public debts? Suggest measures by which the burden of public debt may be reduced.

3. Discuss the purposes for which public debts may be legitimately incurred by the Government.

4. Distinguish between the burden of an internal and external loan.

5. Why it is said that an internally held debt has no burden at all?

6. Discuss the economic effects of government borrowing, interest-payments and the repayment of government loans.

7. What are the problems connected with the repayment of intergovernmental debts?

১৭

ফিস্‌কাল নীতি ও বাজেট

Fiscal Policy and budget

সরকারের আয় ও ব্যয়ের ফলে জাতীয় আয়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের স্তর বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। পূর্বে রাষ্ট্রের কর, ঋণ ও ব্যয় প্রভৃতির প্রভাব মূলত বণ্টনের দিক হইতে আলোচনা করা হইত, কিন্তু বর্তমানে দেশের উৎপাদন ও আয়স্তরের উপর ইহাদের প্রভাব অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইতেছে।

কর, ঋণ ও ব্যয়সংক্রান্ত রাষ্ট্রের সকল নীতিকে একত্রে ফিস্‌কাল নীতি (Fiscal Policy) বলা হয়। দেশের অর্থনৈতিক নীতির (economic policy) যে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ধরিয়া লওয়া হয় তাহাকে সফল করিয়া তোলাই ফিস্‌কাল নীতির কাজ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকে। উন্নত দেশসমূহের লক্ষ্য হইল পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা এবং ঐ স্তরে স্থায়িত্ব বজায় রাখা, আবার অনুন্নত দেশসমূহের লক্ষ্য হইল দেশের উৎপাদনে ও টেক্‌নোলজিকাল কাঠামোতে এমন পরিবর্তন আনা যাহাতে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধি ঘটিতে পারে।*

ফিস্‌কাল নীতি কাহাকে বলে

ফিসকাল নীতির মধ্যে তাই সকল প্রকার সরকারী ব্যয় ও আয় আলোচনা করা দরকার; চলতি দ্রব্য ও কাজকর্মের উপর সরকারী ব্যয়, ঋণদান, হস্তান্তর-ব্যয়, স্থায়ী ধরনের মূলধন গঠন এবং দ্রব্যসামগ্রী মজুত করা—আবার

* "Fiscal policy is concerned with the manner in which all the different elements of public finance, while still primarily concerned with carrying out their own duties (as the first duty of a tax is to raise revenue) may collectively be geared to forward the aims of economic policy." Mrs. Ursula Hicks, *Public Finance*, P 269.

"a policy under which the Government uses its expenditure and revenue programmes to produce desirable effects and avoid undesirable effects on the national income, production and employment." Arther Smithies, article in *Survey of contemporary Economics*, P 174.

অপরদিকে কর হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ, সম্পত্তি হইতে আয়, ঋণ করা—সবকিছুই ফিস্‌কাল নীতির অন্তর্ভুক্ত। ফিস্‌কাল নীতির এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষা করাও এই নীতির অন্তর্ভুক্ত; প্রকৃতপক্ষে এই ব্যালান্সই ফিস্‌কাল নীতির প্রাণ। আয়ের সকল দিক এবং ব্যয়ের সকল দিক মিলিয়া সরকারী ফিস্‌কাল নীতি দেশের মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগে এমন পরিবর্তন আনে যে, দেশের উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান ও দামস্তর বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। আধুনিককালে তাই ফিসকাল নীতির গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ফিস্‌কাল নীতির লক্ষ্য (Objectives of Fiscal Policy)

সরকারী ফিস্‌কাল নীতি বাস্তবে রূপ পায় বাজেট-গঠনের মধ্য দিয়া; রাষ্ট্রের আয়, ব্যয়ের পরিমাণ ও উহাতে পরিবর্তন সরকারী ফিস্‌কাল নীতিকে প্রকাশ করে। সরকারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য সাধনের উপযোগী 'পদ্ধতিই' মূলত ফিস্‌কাল নীতি, কিন্তু অর্থনৈতিক লক্ষ্য ছাড়াও বাজেটের মাধ্যমে সরকারের আরও অনেক প্রকার লক্ষ্য সফল করার চেষ্টা হয়। সরকারী নীতির লক্ষ্য হিসাবে আমরা কয়েকটিকে উল্লেখ করিতে পারি, যেমন জাতীয় নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি, এবং রাজনৈতিক স্থায়িত্ব। এই সকল লক্ষ্যের মধ্যে কয়েকটি পরস্পরের প্রতিযোগী, আবার কয়েকটি পরস্পরের পরিপূরক।

অনেকে মনে করেন সরকারী বাজেট-নীতির একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত জাতীয় নিরাপত্তা। ইহা কিন্তু সত্য নয়। কারণ তাহা হইলে আরও বেশি টাকা, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সকল আয় দেশরক্ষাখাতেই খরচ করা দরকার। তাহা না করিয়া, কিছু টাকা, অন্যান্য খাতে ব্যয় করিয়া রাষ্ট্র কিছু ঝুঁকি বহন করে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঝুঁকি না লইলে অন্যান্য লক্ষ্য একান্তই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে লোকের মনে এইরূপ ধারণা ছিল যে, অর্থনৈতিক প্রগতি ও সামাজিক নিরাপত্তা একই সঙ্গে অগ্রসর হয়, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা উন্নততর করিতে পারিলে অর্থনৈতিক প্রগতির হারও দ্রুততর হয়। আজকাল কিন্তু ইহাদের এই সমমুখী অভিযান স্বীকার করা হয় না।

দেশরক্ষা, প্রগতি, নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব

প্রগতি ও নিরাপত্তার নীতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে, একই সঙ্গে

উভয়ের দাবি পুরণ করা সম্ভব না-ও হইতে পারে। তৃতীয়ত, সকল দেশের রাষ্ট্রেরই নিজের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষা করা অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পরিবর্তনের মাত্রা বেশি হইলে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব সাধারণত রক্ষা পায় না। সরকারী সকল কাজকর্মই প্রধানত এই রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, অন্যান্য সকল লক্ষ্যই এই প্রধান লক্ষ্যকে অনুসরণ করে।

এই সকল লক্ষ্য ছাড়াও সরকারের অর্থনৈতিক যে-সকল লক্ষ্য থাকিতে পারে তাহাদের আলোচনা দরকার, কারণ ফিস্‌কাল নীতি প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় এই সকল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই। সরকারের বহু অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকিতে পারে। প্রথমত, ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের ঐতিহ্য অনুযায়ী আমরা দেখিতে পারি যে, ইহার লক্ষ্য হইল সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ (maximum economic well-being)। অর্থনৈতিক কল্যাণ-এর ধারণা সম্পর্কে বহুপ্রকার তত্ত্বগত ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিলেও ইহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি দেশে এবং সারা বিশ্বে আধুনিক কালে পূর্ণ কর্মসংস্থানকে অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইতেছে। দেশে অনিচ্ছামূলক বেকারি না থাকার অবস্থাকেই পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তর বলা হয়।*

১। সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধি
২। পূর্ণ কর্মসংস্থান
৩। আসল আয়ে বৃদ্ধি

তৃতীয়ত, অনেকে বলেন যে, দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান অপেক্ষা আসল আয়ের বৃদ্ধিকেই প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা উচিত। মূলধন-সঞ্চয়ের এবং টেকনিকাল জ্ঞান-বৃদ্ধির হারের উপর সরকারী নীতির সুপ্রভাব বজায় রাখাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন, এমনভাবে সরকারী করনীতি রচনা করা প্রয়োজন যাহাতে দেশে মূলধন-সঞ্চয়ের সর্বোত্তম (optimum) হার পাওয়া যায়, ইহা যে সর্বাধিক হার হইতে হইবে, তাহার কোন কথা নাই। শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর

* এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে কেবলমাত্র পূর্ণ কর্মসংস্থানকে গণ্য করা চলে না, কারণ দেশে গড় আসল মজুরি কিরূপ, ইহাতে ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির হার কত, এই সকল বিষয়ে ঘোষণা না থাকিলে নিছক বেকারী না থাকাকেই অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে ধরা চলে না। আয়ের বণ্টন কিরূপ, অর্থনৈতিক কল্যাণের স্তর কিরূপ এই সকল না বলিয়া কেবলমাত্র পূর্ণ কর্মসংস্থান ঘটিলেই অপরাপর সকল আশীর্বাদ দেশের উপর আপনা আপনি বর্ষিত হইবে, একথা মানিয়া লওয়া চলে না।

করনীতির প্রভাব বিবেচনা করিতে হইবে। দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আসল আয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলনা করিয়া উন্নয়নমূলক ও কল্যাণকর কার্যসূচীর মধ্যে সরকারী ব্যয় বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। অনেক সময় আসল আয়-বৃদ্ধির এই লক্ষ্য এবং পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিতে পারে। যে-নীতিতে সর্বাধিক কর্মসংস্থান ঘটে, ঠিক সেই নীতিতে আসল আয় সর্বাধিক না হইতে পারে, অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বোত্তম হার না-ও পাওয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, কেহ কেহ সমাজের মোট উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে বৃদ্ধিকেই একমাত্র লক্ষ্য মনে করেন না, ব্যক্তিগত মালিকানাক্ষেত্রের প্রসারকেই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিতে চান। এই লক্ষ্য অনুযায়ী করহার কমানো এবং ব্যবসায়ীদের অধিকতর অসুবিধা দানের নীতিকে সরকারী কল্যাণমূলক কার্যসূচী অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পঞ্চমত, অনেকে আবার ইহার ঠিক বিপরীত পরিকল্পিত কল্যাণ-বৃদ্ধিকেই (planned welfare approach) প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। যেমন লর্ড বিভারিজ্ (Beveridge) মনে করেন যে, অভাব, ব্যাধি, অশিক্ষা ও দারিদ্র্য দূর করার জন্য দেশের সকল বিনিয়োগের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা খুবই প্রয়োজনীয়—ইহাই সরকারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য। ষষ্ঠত, আর একটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য হইল আয়ে অধিকতর সমতা আনা। উৎপাদন-বৃদ্ধি বা জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নয়, সমতার খাতিরেই আয়বৈষম্য দূর করিতে হইবে, ইহাই অনেকে লক্ষ্য হিসাবে সম্মুখে রাখিতে চান। এই লক্ষ্যের সহিত অপরাপর অনেক লক্ষ্যের বিরোধ আছে বলা হয়, যেমন আয়বৈষম্য হ্রাস করিলে ধনীদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা এবং শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার স্তর-উভয়ই কমিয়া যাইতে পারে। সর্বশেষে, দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের স্থায়িত্ব বজায় রাখাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

৪। ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার

৫। পরিকল্পিত কল্যাণ বৃদ্ধি

৬। আয়-সমতা আনা

৭। স্থায়িত্ব বজায় রাখা

উপরে আলোচিত এই সকল বহু বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্যসমূহকে অধ্যাপক মাসগ্রেভ (Musgrave) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। কোন দেশের ফিসকাল দপ্তরের মধ্যে তিনটি শাখা কল্পনা করিয়া লইয়া এক এক শ্রেণীর কাজকর্ম এক একটি শাখার দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া তিনি মনে করিয়া

লইয়াছেন। এই তিনটি শাখা হইল 'উপকরণ-বিন্যাস শাখা' (Allocation Branch), 'বণ্টনের শাখা' (Distribution Branch), এবং 'স্থায়িত্ব রক্ষণের শাখা' (Stabilization Branch)। এই সকল শাখা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য করিবে বটে, কিন্তু একে অন্যের কাজ ব্যাহত করিবে না, পারস্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবে।* প্রতিটি শাখা নিজ নিজ লক্ষ্য অনুসারে সেই শাখার নিজ কাজকর্মের পরিকল্পনা করিবে, এই সময়ে সে ধরিয়া লইবে যেন অন্যান্য শাখাও নিজ নিজ লক্ষ্য অনুসারে কাজ করিতেছে। প্রতিটি শাখার এইরূপ পৃথক পরিকল্পনাগুলি লইয়া জাতীয় বাজেট রচিত হইবে, সরকারী কর ও ব্যয়-নীতি, অর্থাৎ রাষ্ট্রের ফিসকাল নীতি এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-পরিকল্পনাগুলির সম্মিলিত প্রকাশ। সুতরাং তাঁহাদের মতে আদর্শ ফিসকাল নীতি এই তিনটি শাখার পৃথক পৃথক লক্ষ্যের মধ্যে সর্বোত্তম সামঞ্জস্য সাধন করিবে : সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ-বিন্যাস, আয় ও সম্পদের বণ্টন এবং স্থায়িত্ব-সাধন, এই তিনটি লক্ষ্যই উপযুক্তভাবে রক্ষিত হইবে।

সর্বশেষে, আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। কেইনসীয় তত্ত্বের উদ্ভব হয় গভীর বাণিজ্যসংকটের পরিবেশ হইতে, তাই আধুনিক কালের ফিস্‌কাল নীতি উপরের ঐ তিনটি শাখার মধ্যে তুলনামূলকভাবে তৃতীয়টির অধিকতর গুরুত্ব দেয়, অর্থাৎ স্থায়িত্বরক্ষাকে মূল লক্ষ্য বলিয়া মনে করে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে স্থায়িত্বরক্ষণ বলিলে বুঝা যায় দামস্তর স্থির রাখা এবং পূর্ণকর্ম-সংস্থান বজায় রাখা। দামস্তর স্থির রাখার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। ইহাতে সহসা পরিবর্তন হইলে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর দামে পরিবর্তন আসে, আয়-বণ্টনের কাঠামো বদল হইয়া যায়। সমাজের অর্থনৈতিক দেহে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দেখা দেয়, সকল দ্রব্যের দাম সমান হারে পরিবর্তন হয় না বলিয়া

* "The responsibilities of the Fiscal Department in our imaginary state are derived from a multiplicity of objectives. For present purpose these are grouped under three headings : The use of fiscal intruments to (1) secure adjustments in the allocation of resources ; (2) secure adjustments in the distribution of income and wealth ; and (3) secure economic stabilization ....Let us now think of each of these functions as being performed by a particular branch of our imaginary Fiscal Department. These branches may be referred to respectively as the Allocation, Distribution and Stabilization Branches." Musgrave, *The theory of Public Finance*, P. 5.

উপকরণের নিয়োগ-বিন্যাসও পাল্টাইয়া যায়।* পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় রাখার পক্ষেও যুক্তি কম নাই। সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করা—সকল উদ্দেশ্যেই ইহা প্রয়োজন। এই দুইটি লক্ষ্যের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা অনেক সময়েই দেখা দিতে পারে, কিন্তু এই দুইটিই বাঞ্ছনীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে ফিস্‌কাল নীতির লক্ষ্য হিসাবে সাধারণত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিকাশ বা ক্রমবৃদ্ধিকে (economic growth) অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। সকল দেশেই অবশ্য স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধিকে লক্ষ্য হিসাবে ধরা হয়, (কারণ সমাজকে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে স্থির রাখিতে হইলেই কিছুটা ক্রমবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়) ; তাহা হইলেও দেশের অবস্থা অনুযায়ী এক এক দেশে ইহাদের তুলনামূলক গুরুত্ব পৃথক থাকে। দেশটি দরিদ্র ও অনুন্নত, জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে—এই অবস্থায় সে স্বভাবতই ক্রমবৃদ্ধির উপর জোর দিবে বেশি। অবশ্য স্থায়িত্বরক্ষণের দায়িত্ব তখনও তাহাকে মনে রাখিতে হইবে, উহাকে অবহেলা করিলে চলিবে না। যেমন আমরা জানি যে, উন্নয়নের যাত্রাপথে মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে লোকের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়িবে, কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ততটা দ্রুত বৃদ্ধি না পাওয়ায় মুদ্রাস্ফীতির চাপ দেখা দিতে থাকে। মুদ্রাস্ফীতির এই ব্যবধান (inflationary gap) সংকুচিত করার জন্য এই দেশের সরকারকে নিশ্চিত কর এবং ঋণের সাহায্যে বর্ধিত আয়ের এক অংশ তুলিয়া লইতে হইবে। তাহা না হইলে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট ও আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি দেশে অর্থনৈতিক স্থায়িত্বে বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে। সুতরাং সকল দেশেই, ফিস্‌কাল নীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে আমরা বর্তমান কালে, অন্যান্য লক্ষ্যকে বাদ দিয়া স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে পারি ; অবশ্য কোন দেশের বিশেষ অবস্থায় সেই দেশ সাময়িকভাবে

* "The objective of price-level stability needs no lengthy defence. To be sure, there are times when some increase in price-level may be desirable to induce entrepreneurial optimism, or a more substantial rise may be needed to speed up transition to a war economy ; and there are other times when a decline in price level may be useful, for example, in order to adjust to world markets, to release an excessive margin of profits, or to pass on technological gains where rising money wages cannot be secured. Short of these special situations, price level stability is desirable.........Similarly, we may take it for granted that the objective of full employment is desirable." Musgrave, *Public Finance*, P. 406.

ইহাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কোন একটিকে অপরটির তুলনায় প্রধান স্থান দিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।*

ফিস্‌কাল নীতির কৌশল: ফিস্‌কাল নীতি ও জাতীয় আয় (The machanics of Fiscal Policy: Fiscal Policy and National Income):

সরকারের অর্থনৈতিক যে-কোন লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে দেশের জাতীয় আয় বাড়ানো বা কমানো দরকার হয়, অর্থাৎ জাতীয় আয়ের পরিমাণে নিজের ইচ্ছামত উঠানামা ঘটানো প্রয়োজন হয়। সরকারের কর ও ব্যয় কমাইয়া বা বাড়াইয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণে নিজের পছন্দমত পরিবর্তন কিরূপে আনা চলে? ইহা আলোচনা করিতে হইলে আমাদের জাতীয় আয় নির্ধারণের আলোচনা স্মরণ করা দরকার। জাতীয় আয় গঠনকারী অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ অথবা ইহার নিরূপণকারী শক্তিসমূহ স্পষ্টভাবে জানিতে না পারিলে কিরূপে আমরা ইহার উপর সরকারী আয়-ব্যয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করিতে পারিব?

আমরা জানি যে, কোন দেশের জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর নির্ভর করে কার্যকরী চাহিদার উপর এবং এই কার্যকরী চাহিদা সামগ্রিক ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল। দেশের এই সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ (aggregate expenditure) যদি তত বেশি না হয় যাহাতে নিয়োগযোগ্য সকল উপকরণের কর্মসংস্থান সম্ভবপর, তবে রাষ্ট্রকে এই সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিতে হইবে যাহাতে দেশের অর্থনৈতিক সংকট দূর হয় এবং আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়ে। অর্থাৎ সমাজকে পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে থাকিতে হইলে যে-পরিমাণ সামগ্রিক ব্যয় হওয়া দরকার উহা অপেক্ষা কম হইলে এই ব্যয়ের ব্যবধানটুকু রাষ্ট্র নিজে পূরণ করিবে, অথবা এমন নীতি গ্রহণ করিবে যাহাতে সমাজের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

---

* "Now that Fiscal policy has been developed as an established economic function of Government, every country is anxious to gear its public financeal in pursuit of the twin aims of stability and growth; but their relative importance is very differently regarded from one country to another............ The two aspects are, however, inextricably linked. A steady rate of expansion will tend to reduce the violence of such fluctuations as occur; a successful full-empolyment policy will provide an atmosphere which is congenia for growth." Mrs. Hicks, *Public Finance*, P. 270-271.

কোন সমাজের সামগ্রিক ব্যয় (E) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া গঠিত :

1. ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (C).
2. ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় (I).
3. কর-আদায় হইতে প্রাপ্ত টাকার সরকারী ব্যয় (R).
4. ঋণ হইতে প্রাপ্ত টাকার সরকারী ব্যয় (L).
5. বৈদেশিক-বাণিজ্যের ব্যালান্স (B), ইহা ধনাত্মক বা যোগসূচক হইতে পারে (আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি হইলে), অথবা ঋণাত্মক বা বিয়োগ সূচক হইতে পারে (রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হইলে)।

সমাজের সামগ্রিক ব্যয় অর্থাৎ $E=C+I+R+L+B$. পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের সামগ্রিক ব্যয়কে F ধরিয়া লইলে আমরা বলিতে পারি যে, সমাজে $E=F$ থাকিলে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে। E যদি F হইতে বেশি হয়, তবে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িতে থাকিবে, মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। আবার E যদি F হইতে কম হয়, তবে সমাজে অপূর্ণ নিয়োগ থাকিবে, পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে সমাজ পৌঁছিবে না। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের কাজ হইবে এমন নীতি অবলম্বন করা যাহাতে $E=F$ হইতে পারে। এই ভারসাম্যের স্তরে সমাজকে রক্ষা করা ফিসকাল নীতির দায়িত্ব।*

সরকারের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি (Monetary policy) এই কাজ করিতে পারে না বলিয়া ধনবিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। মনে কর, আমরা অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে আছি, এবং এই অবস্থায় টাকার যোগান বাড়ানো হইল। লোকের সম্পত্তি-ধারণ-কাঠামো (asset-structure) সমান ধরিয়া লইলে, অর্থাৎ তাহাদের নগদ-পছন্দ অপরিবর্তিত আছে ধরিয়া লইলে, সুদের হার কমিবে এবং বিনিয়োগ বাড়াইয়া তুলিবে। কিন্তু (কেইনসীয় তত্ত্বানুযায়ী) সুদের হার কমিবার সীমা আছে, একটি নির্দিষ্ট স্তরের পরে সুদের হার আর কমে না (নগদ-পছন্দ রেখা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হইয়া

আর্থিক নীতি নিরুপায় কেন

---

* ক্লাসিকাল মডেলে আমরা পূর্ণকর্মসংস্থান ধরিয়া লই, তাহাদের ধারণায় সমাজে সর্বদাই $E=F$ বজায় থাকে। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদনের পরিমাণ আর বাড়ানো যায় না, কারণ সকল উপকরণের পূর্ণ নিয়োগ আমরা ধরিয়া লইয়াছি। টাকার পরিমাণে বৃদ্ধির সবটাই লেনদেনের খাতে চলিয়া যায়, অর্থাৎ লেনদেনের উদ্দেশ্যে লোকেরা এখন পূর্বাপেক্ষা বেশি টাকা খরচ করিতে চায়। টাকার প্রচলন বেগ (বা V) সমান ধরিয়া লওয়া হয়, তাই ইহা সরাসরি E-র পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে। দামস্তর বৃদ্ধি পায়, অর্থের পরিমাণতত্ত্ব কার্যকরী হইতে থাকে।

উঠে), এই সীমার পরে টাকার পরিমাণ বাড়িলে আর সুদের হার কমে না, বিনিয়োগ ও আয়স্তর বাড়ে না। আর্থিক নীতির ইহাই সীমা, এইখানে সে অসহায়, তাহার কার্যকারিতা আর নাই। এই অবস্থাতেই ফিস্‌কাল নীতির গুরুত্ব।*

জাতীয় আয়ের উপর ফিস্‌কাল নীতির প্রভাব আমরা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করিতে পারি। সরলভাবে বুঝাইবার জন্য আমরা দুইটি অনুমান মানিয়া লইব: (ক) কর ও ব্যয়ের ফলে সমাজের আয়-বণ্টনে এখন কোন পরিবর্তন আসিতেছে না, এবং (২) ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা ও ফার্মগুলির বিনিয়োগের ক্ষমতা ও ইচ্ছা সরকারী নীতি-নিরপেক্ষ অন্যান্য কারণের ফলে বা স্বাধীনভাবে নির্ধারিত হইতেছে। এই দুইটি অনুমান ধরিয়া লইলে আমরা কয়েকটি সূত্র গঠন করিতে পারি।

(১) করের পরিমাণ সমান অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্মের উপর সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। সরকার কর্তৃক ক্রয় করা দ্রব্য-সামগ্রী ও কাজকর্মের মূল্যের সহিত ইহার গুণক ও ত্বরকের দরুন সকল প্রভাব (repurcussion effects) যোগ করিলে জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির পরিমাণ জানিতে পারা যায়।

(২) কর-আদায়ের পরিমাণ সমান রাখিয়া সরকারী হস্তান্তর-ব্যয় বাড়াইয়া দিলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে।

(৩) সরকারী ব্যয় সমান রাখিয়া কর-আদায়ের পরিমাণ কমাইয়া দিলে লোকের হাতে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে (সরকার কর্তৃক হস্তান্তর-ব্যয় বৃদ্ধির সমান ফল হইবে)।

* "Suppose that we are in a position of under-employment equilibrium and that the money supply is increased. At the prevailing level of money income, the increment will be an addition to the supply of asset money. Within some limits, this may be expected to reduce interest and raise investment. In the special Keynesian case, interest cannot continue to fall forever; the liquidity preference schedule becomes infinitely elastic, thus setting a floor to the rate of interest. Once this floor is reached, further additions to the money supply will not reduce and hence, will have no effect on I and Y. This is the characteristic case of the Keynesian model. Monetary policy is totally helpless and without bearing on either real or monetary magnitudes in the system.........Fiscal policy now has its day."—Musgrave, *The theory of public Finance*, P. 415.

(৪) উপরের সূত্রগুলি হইতে জানা যায় যে, সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি বা কর-আদায়ে সমপরিমাণ হ্রাস ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়ের উপর একই প্রভাব ফেলিবে।

(৫) কর-আদায়ে বৃদ্ধি এবং সমপরিমাণে সরকারী হস্তান্তর-ব্যয় একে অন্যকে খণ্ডন করিবে।

(৬) দ্রব্যসামগ্রীর উপর সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি এবং ঠিক সমপরিমাণ কর-আদায়ে বৃদ্ধি পরস্পরকে খণ্ডন করিবে, ফলে কর-আদায়ের পরে ব্যক্তির হাতে আয় ও ব্যয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

সাধারণ সূত্রগুলি আলোচনার পরে আমরা এখন পূর্বের অনুমান দুইটি একে একে অপসারণ করিব। আজকাল সকল দেশেই কর-কাঠামো এমন ভাবে রচিত যাহাতে আয়-বৈষম্য হ্রাস পায়, সরকারী ব্যয়ের প্রভাব সমতার দিকে আরও অধিক পরিমাণে ঝোঁকে। সরকারী ব্যয়ের মধ্যে নির্মাণ কার্য (Public works) প্রভৃতির দরুন ব্যয়ের ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সকলেরই আয় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বেকার ভাতা, বার্ধক্য ভাতা প্রভৃতি ব্যয়ের দরুন নিম্ন-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয় অনেক বেশি পরিমাণে বাড়ে। যদি উদ্যোক্তা বা কার্যের উপর কর-হার খুব বেশি বৃদ্ধি পায়, তবে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-ব্যয় হ্রাস পায়, আবার ইহাদের উপর করের পরিমাণ কমিলে সমাজে এই বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়ে। সরকারী বিনিয়োগ কখনও কখনও ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমাইয়া দেয়, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই বাহ্য ব্যয়-সংকোচের সুবিধা (external economies) বাড়াইয়া দেয় বলিয়া ব্যক্তিগত বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটায়। কম সরকারী ব্যয় করিয়া জাতীয় আয় যদি খুব বেশি বাড়ানো যায়, তবে তাহাই সবচেয়ে ভাল। ইহা অবশ্য নির্ভর করে গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফলাফলের উপর।

স্বল্পকালীন : পূরণমূলক বা চক্রবিরোধী ফিস্‌কাল নীতি (Short run : Compensatory or Contra-cyclical Fiscal Policy)*

আধুনিক কালে শিল্পোন্নত দেশসমূহে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানে সুতীব্র উঠানামা দেখা গিয়াছে, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির সাহায্যে ভারসাম্য স্তর হইতে সামগ্রিক আয়ের এই বিচ্যুতি রোধ করা সম্ভব হয় নাই। তাই ফিস্‌কাল

* আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ফিস্‌কাল নীতিকে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন দুই দিক হইতে বিশ্লেষণ করিব। দীর্ঘকালে আমাদের লক্ষ্য হইল ভারসাম্যের জাতীয় আয় (F) বজায় রাখা। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, টেকনিকাল জ্ঞানের বৃদ্ধি মূলধন গঠনের পরিমাণ, দীর্ঘকালীন ভোগ ও বিনিয়োগ-প্রবণতার এই সকল বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেশকে পূর্ণ কর্মসংস্থানস্তরে গতিশীল রাখা এই ভারসাম্যস্তরের জাতীয় আয়ের দায়িত্ব। এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধি (economic growth) সরকারী ফিস্‌কাল নীতির সাহায্যে প্রভাবিত হইতে পারে। জাতীয়

নীতির গুরুত্ব বাড়িয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই নীতির কাজই হইল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারসাম্য বজায় রাখা; "it uses public finance as a balancing factor in the development of the economy." জাতীয় আয় নির্ধারণকারী শক্তিসমূহ কি কি তাহার সম্বন্ধে আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়াছে, কেইনসীয় তত্ত্ব হইতে আমরা এই শিক্ষা পাইয়াছি। শুধু তাহাই নহে। রাশিবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, জাতীয় আয় গঠনকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রতিটি দেশে বাস্তব জ্ঞান ও সরকারী হিসাব গ্রহণ-ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে। অর্থনৈতিক দেহের গ্রন্থিগুলির পরিমাণগত পরিমাপ এবং পরস্পর-নির্ভরশীল গতিশীল সম্পর্ক লোকচক্ষুর সম্মুখে পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত উভয় দিক হইতেই তাই ফিসকাল নীতি কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বল্পকালীন জাতীয় আয়ে উঠানামা রোধ করার কাজে ফিস্‌কাল নীতির কর্মকৌশল আমরা দুই দিক হইতে আলোচনা করিব, সরকারী আয়ের দিক হইতে (from revenue side) এবং সরকারী ব্যয়ের দিক হইতে (from expenditure side)।

ফিস্‌কাল নীতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি: জাতীয় আয় সম্পর্কে তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত জ্ঞানের প্রসার

পূরণমূলক ফিস্‌কাল নীতির কৌশল বা হাতিয়ারগুলি (instruments of compensatory finance) প্রথমে আলোচনা করা যাউক। আমরা ইহাদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। কতকগুলি হইল সরকারী আর্থিক কাঠামোর অঙ্গ-লগ্ন (built-in to the system of public finance), ইহাদের অনেক সময় স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্বসাধকও বলা হয় (automatic stabilizers)। আবার, কতকগুলি কার্যকারিতা নির্ভর করে সরকারী সিদ্ধান্তের উপর। ইহাদের মধ্যে প্রথমশ্রেণীর নীতিসমূহ, অর্থাৎ বাজেটের অঙ্গ-লগ্ন নীতিসমূহের দুইটি সুবিধা পাওয়া যায়; (১) ভারসাম্যের আয়স্তর হইতে কোন বিচ্যুতি দেখা দিলে এইগুলি তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয়, কোন সময়ক্ষেপ হয় না, এবং

আয় ও কর্মসংস্থানের স্তরে স্বল্পকালে যে তীব্র উঠানামা হয়, যাহাকে আমরা বাণিজ্যচক্র বলি, তাহা রোধ করার জন্য, আজকাল পূরণমূলক ব্যয়ের নীতি গ্রহণ করা হয়। তাই ইহাকে চক্রবিরোধী ফিস্‌কাল নীতিও বলা হয় (contra-cyclical Fiscal policy)। আবার, স্বল্পকালীন বিশ্লেষণে আমরা দেখিব, কোন দেশের জাতীয় আয় এই ভারসাম্য স্তরের উপরে নীচে উঠানামা করে. এই ভারসাম্যের স্তর হইতে প্রকৃত জাতীয় আয়ে বিচ্যুতি ঘটে। ইহা দূর করাই স্বল্পকালীন ফিস্‌কাল নীতির কাজ।

(২) ইহাদের জন্ম কাহারও কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দরকার হয় না। এই ধরনের পদ্ধতিসমূহ আপনাআপনি বাণিজ্যচক্রের বিরোধীশক্তি হিসাবে কাজ করে। দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে থাকিলে ইহারা নিজেদের স্বাভাবিক রীতিতেই আয় বাড়ায় ও ব্যয় কমায়, মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ কমাইতে সাহায্য করে। আবার অবনতি ও সংকটের সূত্রপাত হইতে এই সকল উৎস স্বাভাবিক-ভাবেই আয় কমায় ও ব্যয় বাড়ায়, সংকটের গভীরতা হ্রাস করে। ইহাদের কাজ অনেকটা তাপমাত্রা-রক্ষণ যন্ত্রের মত (in the manner of thermostat), আকাংখিত তাপমাত্রা রক্ষা করিবার জন্ম যে-কোন প্রকার তাপ বিচ্যুতিকে ইহা বাধা দেয়।

এইরূপ দুইটি বিষয়ের কথা সহজেই উল্লেখ করা চলে। প্রথমত ক্রম-বর্ধনশীল হারের আয়কর। দেশে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বাড়িতে থাকিলে এই উৎস হইতে সরকারী আয় বৃদ্ধি পায়, আবার ব্যবসায়-অবনতি ও সংকটের সময়ে এই উৎস হইতে সরকারী আয় কমিয়া যায়। দ্বিতীয়ত, বেকার-ভাতা।

অঙ্গলগ্ন বিষয়গুলির উদাহরণ কিরূপে তাহারা কাজ করে

অবনতি ও সংকটের অবস্থা শুরু হইলে দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়িতে থাকে, সরকারী কোষাগার হইতে বেশি টাকাই এই খাতে ব্যয় হইতে থাকে, সংকট-নিরোধক শক্তি হিসাবে কাজ করে। আবার সমৃদ্ধির যুগ পার হইয়া অতিস্ফীতির যুগে পৌঁছিলে বেকারের সংখ্যা কমে, এই খাতে সরকারী ব্যয় আপনাআপনি হ্রাস পাইতে থাকে, বেকারি-বীমা সংস্থায় অর্থমজুতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।*

এইরূপ স্বয়ংক্রিয় কৌশলগুলির প্রধান ত্রুটি হইল ইহাদের দুর্বলতা; সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে যে-নীতি গৃহীত হয় উহাদের কার্যকারিতা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি সবল।† বিশেষ ধরনের অবস্থা অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার সরকারী সিদ্ধান্ত ফিস্‌কাল নীতির কার্যকারিতা অনেকখানি বাড়াইতে পারে, খুব মৃদু ও হাল্কা ধরনের বিচ্যুতি ছাড়া এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিগুলি কার্য-

পূরণমূলক কর ও ব্যয় নীতি

করী হয় না। শক্তিশালী নীতিগুলির মধ্যে দেখা যায় যে, মুদ্রাস্ফীতির যুগে পূরণমূলক করনীতি (Compensatory Tax Policy) অধিকতর সক্রিয়, আবার অবনতি ও সংকটের যুগে পূরণমূলক

* আরও একটি উৎস উল্লেখ করা যাইতে পারে। "Another, which is not so easily recognised as such, is the practice of reckoning the depreciation on fixed assets and stocks for these purposes on the original costs of the equipment or of the longest held stocks respectively. In times of rising prices this practice results in taxing more than true profits while as prices fall tax-liability is less than true profits." Mrs. Hicks, *Public Finance*, P. 277.

† Taylor, *The Economics of public Finance*, P 539.

ব্যয় নীতির (Compensatory Spending Policy) সাফল্য বেশি। অবনতির যুগে করহ্রাস এবং সমৃদ্ধির যুগে ব্যয়-হ্রাস ততটা কার্যকরী হয় না।

মুদ্রাস্ফীতি রোধের কার্যে কোন্ ধরনের কর অধিকতর সাফল্যলাভ করিবে তাহা নির্ভর করে মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও গভীরতার উপর। যেমন, যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি রোধের কাজে মূলধনী-লেভি বা মৃত্যুকর ততটা দ্রুত কার্যকরী হয় না, কারণ এই ধরনের কর সমাজের চল্‌তি উপকরণকে তৎক্ষণাৎ সরাইয়া আনিতে পারে না। জিনিসপত্রের আমদানি কম, বিক্রয়-করও তাই খুব বেশি কার্যকরী নয়। তাই আয় ও মুনাফাকরের উপরই ভরসা বেশি। রেশনিং-বহির্ভূত দুষ্প্রাপ্য জিনিসগুলির উপরে উচ্চহারে ক্রয়-কর বসাইলে লোকে কিছুটা কম কিনিতে পারে। তবে, এই সময়, সাধারণত, কর বসাইয়া ভোগ বা বিনিয়োগ কিছুই কমানো যায় না, প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি (direct controls) প্রয়োগ করিতে হয়। আজকাল অবশ্য ভোগব্যয় কমাইবার জন্য অনেকে ব্যয়-কর (expenditure tax) আরোপ করার প্রস্তাব তুলিয়াছেন, তাঁহাদের মতে ইহার মুদ্রাস্ফীতি-নিরোধক শক্তি খুবই বেশি।

মুদ্রাস্ফীতির যুগে করনীতি কতটা কার্যকরী

সংকট বা অবনতির যুগে কার্যকরী চাহিদা (effective demand) বাড়ানোই মূল কথা, করের সাহায্যে ইহা মোটেই সম্ভব নয়। যেমন, আয়-কর কমাইলে লোকের হাতে যে-টাকা বাঁচিয়া যায় তাহা দিয়া ভোগ-ব্যয় বাড়ে বলিয়া মনে হয় না। আর, ব্যবসায়ীরাও আয়-কর কমাইলেই বিনিয়োগ বাড়াইবার উপযুক্ত আস্থা ফিরিয়া পায় না। একমাত্র বিক্রয়-কর বা ক্রয়-কর কমাইলে ভোগব্যয় বাড়িবার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। অর্থনৈতিক সংকট দূর করিয়া উন্নতির (recovery) কথা চিন্তা করিতে হইলে সরকারী ব্যয়ের দিক হইতেই আক্রমণ শুরু করা ভাল।

সংকটকালে ততটা নয়

অবনতির (depression) সময়ে, দেশে যখন কর্মসংস্থান ও আয়স্তর খুব কম থাকে সেই অবস্থায়, সরকারী ব্যয় বাড়ানো অনেকটা সফল হইতে পারে। শিল্পোন্নত দেশসমূহে, মোটামুটি তিন ধরনের বেকারি দেখা যায়; সংঘাতজনিত, বাণিজ্যচক্রজনিত এবং সুদীর্ঘকালীন (Frictional, Cyclical and Secular)। ইহাদের দূর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। যেমন সংঘাতজনিত বেকারি দূর করার উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থান-বিনিময়কেন্দ্র (employment

অবনতির যুগে ব্যয়নীতি অধিকতর কার্যকরী

exchanges) স্থাপন করা প্রয়োজন। ইহা শাসনতান্ত্রিক নীতির অন্তর্গত (administrative policies)। দীর্ঘকালীন বেকারি দূর করার উপায় হইল কলকারখানা গড়িয়া তোলা, বেসরকারী বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো, ব্যবসায়ীদের ঋণ দেওয়া, করভার কমানো, দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে কারখানা স্থাপনে ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেওয়া। তাহা ছাড়া, ইহা মোটামুটি দীর্ঘকালীন ফিসকাল নীতির অন্তর্গত। বাণিজ্যচক্রকালীন বেকারিই শিল্পোন্নত দেশের প্রধান সমস্যা। ইহা দূর করার জন্য সরকারী ব্যয়ের দিক হইতে প্রধান নীতি হইল সরকারী নির্মাণ-কার্যসূচীর প্রসার (expansion of Public works programmes)। রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, পার্ক, সরোবর—এই সকল নির্মাণে সরকারী ব্যয় প্রত্যক্ষভাবে লোকের কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ দেয়। ইহাদের দরুন বেসরকারী বিনিয়োগের বাহ্য ব্যয়সংকোচের সুবিধা (external economies) বৃদ্ধি পায় ; তাহা ছাড়া, গুণক ও ত্বরণের দরুণ এই সরকারী ব্যয় অল্পকালের মধ্যে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে। ইহাই পূরণমূলক ব্যয়ের নীতি।

বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারির বিরুদ্ধে আক্রমণে সাফল্যের মূল কৌশল হইল দ্রুততা। কার্যকরী চাহিদার তীব্র হ্রাস কোনমতে অতিদ্রুত ঠেকাইতে পারিলেই সাফল্য সম্ভবপর। সরকারী নির্মাণ কার্যের বাধা বা কালক্ষয় (obstacles and delays) তিন দিক হইতে দেখা দিতে পারে। প্রথমত, ঠিক সময়মত ইহা শুরু করা দরকার। রোগ নির্ণয়ে দেরি হইলে বা ভুল হইলে রোগীর অবস্থা খারাপের দিকেই যাইবে। ঠিক কখন, কোন্ অঞ্চলে কতটা এবং ঠিক কোন্ ধরনের ব্যয় শুরু করা দরকার সেই বিষয়ে বাঁধা-ধরা নীতি অপেক্ষা বাস্তব অভিজ্ঞতাই বড় কথা। সিদ্ধান্ত করার পরেও প্রতিটি কার্যসূচীর খুঁটিনাটি পরিকল্পনা রচনা করা দরকার, ইহাতে বেশ কালক্ষেপ হয়। দ্বিতীয়ত, কন্ট্রাক্ট দেওয়ার ব্যাপারেও প্রচুর সময় অতিবাহিত হয়, জমি কেনার ব্যাপার থাকিলে আরও বেশি সময় লাগে। তৃতীয়ত, বেশির ভাগ নির্মাণ-কার্যেই উপকরণের চাহিদা শুরু হইতে বেশ কিছুটা সময় যায়, কয়েক মাস কাটিয়া যাওয়ার পরে উপকরণ ও শ্রমিকের চাহিদা সর্বাধিক পরিমাণে দেখা দেয়। সর্বোপরি, যদিও তত্ত্বের দিক হইতে বলা সহজ যে, উন্নতি শুরু হইলে এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় সমৃদ্ধি দেখা দিলে এই নির্মাণকার্য

কিন্তু ইহার অসুবিধা কম নয়

গুটাইয়া ফেলিতে হইবে, কিন্তু বাস্তবে চল্‌তি নির্মাণকার্য হঠাৎ থামাইয়া দেওয়া চলে না। এইরূপ অবিবেচক কার্যের দরুন সমৃদ্ধি স্থায়ী না হইয়া অকালে অবনতি শুরু হইয়া যাইতে পারে।

ফিস্‌কাল নীতির সমালোচনা ও সীমাবদ্ধতা (Criticisms and qualifications to Fiscal Policy)

আধুনিককালে ফিস্‌কাল নীতির গুরুত্ব খুবই বাড়িয়া গিয়াছে এবং সকল দেশের সরকারই ক্রমশ বেশি পরিমাণে ইহার সাহায্যে দেশের অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব (economic stalilization) বজায় রাখার চেষ্টা করিতেছেন। এই অবস্থায় এই নীতির সীমাবদ্ধতা জানা দরকার এবং ইহা কার্যকরী করার অন্যান্য শর্ত কিরূপ তাহাও আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমত, ফিস্‌কাল নীতির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া ভারসাম্যের বিচ্যুতি রোধ করার চেষ্টা চলিতে থাকিলে দেশের সামগ্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোর মূলগত দোষ ত্রুটি ও অসামঞ্জস্য অনেক সময় চাপা থাকে। অর্থ নৈতিক দেহের সংস্কার ও কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার, কিন্তু ফিস্‌কাল নীতির মলম দ্বারা বৃহত্তর পরিবর্তন রোধের প্রয়োজনীয়তা এড়াইয়া চলা ভাল নয়। যেমন, একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা কৃত্রিমভাবে দাম বাড়াইয়া রাখিয়াছে, অথবা একচেটিয়া শ্রমিক সংঘ তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা হইতে কৃত্রিমভাবে অনেক বেশি মজুরির হার বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থায় অর্থ নৈতিক দেহে তাহাদের ক্ষমতা কমানোই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া লোকের হাতে কৃত্রিমভাবে টাকা ঢালিয়া দিয়া এই প্রয়োজনীয় কাজে অবহেলা করা হইতেছে, এইরূপ ঘটিতে পারে।* দ্বিতীয়ত, ফিসকাল নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহার ফলে দেশে প্রচুর পরিমাণ সরকারী ঋণ দেখা দিবে। অধিক পরিমাণ সরকারী ঋণ থাকিলে দেশের আয়-বৈষম্য বাড়িয়াই চলিবে, কারণ এই ঋণের সুদ হিসাবে সমাজের অধিকাংশ লোকের হাত হইতে কর তুলিয়া সরকারী ঋণপত্রের মালিক কতিপয় ধনী ব্যক্তিকে নিয়মিত পরিশোধ করিতে হইবে। তৃতীয়ত, অনেকে বলেন যে, বাৎসরিক বাজেটে সমতা

ফিস্‌কাল নীতির সমালোচনা

*"Reliance on fiscal policy perpetuates maladjustments and may obscure the need for economic reforms. For instance, public investment in times of depression may prevent reduction of construction costs which may be used to offset the ill effects of monopolistic action and consequently remove pressure to go to the source of the trouble." Arthur Smithies, *A Survey of contemporary Economics*, P 177.

প্রতিষ্ঠা করায় এই নীতি গ্রহণ করা শুরু হইলে সরকারী অপব্যয় ও অতিব্যয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। চতুর্থত, ইহাও বলা হয় যে, ফিস্‌কাল নীতির উপর নির্ভরশীলতা এইরূপ বাড়াইয়া দেওয়ার ফলে অন্যান্য উপায়গুলির গুরুত্ব অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। আমেরিকার কমিটি অব্‌ ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট-এর গবেষণা-বিভাগের ধনবিজ্ঞানীদের মতে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সাধনের কার্যসূচীতে আর্থিক নীতি ও সরকারী ঋণ পরিচালনার নীতি অনেক বেশি সক্রিয় হওয়ার সুযোগ আছে। পঞ্চমত, পূরণমূলক ফিস্‌কাল নীতির বিরুদ্ধে বহু প্রকার রাজনৈতিক যুক্তি দেওয়া হয়। যেমন, এই নীতির দরুন সরকারের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক অনেকটা চাকুরিদাতা মালিক ও চাকুরিজীবী শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্কের ন্যায় দাঁড়াইয়া যাইবে। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হইবে, সরকারী বিনিয়োগ বাড়িবার অর্থই হইল ব্যক্তিগত বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়া। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধের জালে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার কণ্ঠরোধ হইবে, দেশে সমাজতন্ত্র দেখা দিবে।

এই সকল সমালোচনা ছাড়া আমাদের আর একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে ধনবিজ্ঞানীরা কয়েকটি শর্ত বা পরিবেশের কথা উল্লেখ করেন, যাহা বজায় থাকিলে তবেই পূরণমূলক ফিস্‌কাল নীতি পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারে। এই সকল শর্ত বা অনুকূল পরিবেশের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল প্রশাসনিক জ্ঞান ও দক্ষতা। সমাজের বিভিন্ন অংশের কাজকর্ম ও গতিবিধি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও পরিমাণগত হিসাব থাকা দরকার, রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগ ব্যবস্থায় এইজন্য উপযুক্ত সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। প্রশাসনিক দক্ষতা সততা ও গতিশীলতা থাকা দরকার, তাহা না হইলে এই নীতির পূর্ণ সাফল্য সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, ইহার জন্য দেশের জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি থাকা দরকার। বাণিজ্যচক্রের উঠানামার সহিত করের পরিমাণ ও হার কমাইতে বাড়াইতে হইলে দেশের সাধারণ আইনসভা বারবার বাধা দিতে পারে, তাঁহারা এই কাজে ততটা দক্ষ নহেন। এই উদ্দেশ্যে যোগ্য ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত কমিশন থাকা প্রয়োজন, যাঁহারা অবস্থার পরিবর্তনের দিকে সর্বদা তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিবেন এবং সেই অনুযায়ী কর ও ব্যয় কাঠামোতে উপযুক্ত পরিবর্তন আনিতে

ফিস্‌কাল নীতির সাফল্যের শর্ত

থাকিবেন। ঘন ঘন কর-পরিবর্তন করদাতাদের মনে এমন অনিশ্চয়তার মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে যে, হয়তো তাহাদের এই মনোভাবই সামাজিক অস্থায়িত্বের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তৃতীয়ত, বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিস্কাল নীতি সফল হইলে বাজেটের পুনর্গঠন দরকার। বাজেট-রচনার পুরাতন রীতি পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নূতন ধরনের বাজেট রচনা ও সেই বাজেট কার্যকরী করার নিয়মকানুন দেশে গড়িয়া উঠা প্রয়োজন। তাহা না হইলে এই নীতির পূর্ণ সাফল্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

বাজেট (The Budget)

বাজেট কাহাকে বলে

এক বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন-প্রকার ব্যয়ের পরিমাণ এবং উহার বিভিন্ন প্রকার আয়ের উৎস ও আয়ের পরিমাণ সম্বলিত হিসাবকে বাজেট বলা হয়। পূর্ব বৎসরের প্রকৃত আয় ছাড়াও আগামী বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব; ব্যয়ের তুলনায় আয় অধিক হইলে সেই অর্থ কি করা হইবে; আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হইলে কোন্ উৎস হইতে সেই ঘাটতি পূরণ করা হইবে, এই সকল তথ্য লইয়া বাজেট গঠিত হয়। সম্ভাব্য ব্যয় অপেক্ষা সম্ভাব্য আয় অধিক হইলে তাহাকে উদ্বৃত্ত বাজেট (Surplus budget) বলা হয়; সম্ভাব্য ব্যয় অপেক্ষা সম্ভাব্য আয় কম হইলে তাহাকে ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget) বলে; সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সমান হইলে তাহাকে সমতাসিদ্ধ (Balanced Budget) বলা চলে।

সমতাহীন বাজেট (Unbalanced Budget)

ক্লাসিকাল বাজেটীয় নীতিসমূহ

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, (ক) বাজেট সর্বদাই ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয়, অর্থাৎ ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যক্তিপ্রধান অর্থনীতি ক্ষুণ্ণ না করিয়া রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় উভয়ই খুব কম হওয়া উচিত। (খ) প্রতি বৎসর রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় সমান হওয়া দরকার, বাজেটে ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত কিছুই থাকা উচিত নয়। (গ) প্রধানত, ভোগব্যয়ের উপরই কর বসানো উচিত, সঞ্চয়ের উপর নহে, (ঘ) যদি কোন মতেই ঘাটতি এড়ানো না যায়, তবে দীর্ঘকালীন ঋণপত্র দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়, (ঙ) উৎপাদন-ক্ষম বিনিয়োগের উদ্দেশ্যেই কেবলমাত্র ঋণ গ্রহণ করা সঙ্গত (চ) যত দ্রুত

সম্ভব রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে সমাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগই পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রাখে, সুতরাং রাষ্ট্রে অধিক আয় ও ব্যয়ের চেষ্টা করিলে (ক) ব্যক্তির সঞ্চয় কমিবে, বা (খ) ব্যক্তির কর্মোদ্যোগ ও উৎপাদনের পরিমাণ কমিবে, বা (গ) মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে।

ক্লাসিকাল যুক্তিসমূহ

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ ও কর্ম-প্রচেষ্টায় সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে নাও থাকিতে পারে অথবা এইরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে বাণিজ্যচক্রের উদ্ভব সর্বদাই ঘটিতে পারে; সুতরাং ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের নির্ধারিত এই ফিস্‌কাল নীতি গ্রহণযোগ্য নহে। তাহা ছাড়া, ১২ মাস পরে প্রত্যেক বৎসর নিয়ম করিয়া বাজেটে সমতা ঘটাইতে হইবে বা উহারই মধ্যে যে-কোন প্রকারে আয়-ব্যয়ের হিসাবগত মিলন সাধন করা দরকার এইরূপ ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ধরনের।

বাৎসরিক সমতাসাধন নিছক অভ্যাস ও প্রথা মাত্র

উপরন্তু, বাজেটে তথাকথিত সমতা সাধনেরই বা গুরুত্ব কি, আধুনিক ধন-বিজ্ঞানীগণ এই প্রশ্ন করিয়াছেন। দেশের কর্মসংস্থান, আয়স্তর, জীবনযাত্রার মান সকল কিছুই ভারসাম্যবিহীন থাকিয়া বৎসরান্তে বাজেটে নিছক সমতা বজায় রাখাটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ—আধুনিক ধন-বিজ্ঞানীগণ তাহা স্বীকার করেন না। শুধু তাহাই নহে, বৎসরান্তে বাজেটে সমতা সাধনের নীতি বাণিজ্য-সংকট ও বাণিজ্য-সমৃদ্ধির তীব্রতর ও গভীরতর করিয়া তুলিতে পারে। সংকটের সময়ে রাষ্ট্রীয় আয় কম থাকায় সমতার নীতি অনুযায়ী (ক) উচ্চহারে কর বসাইতে হয় এবং (খ) রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমাইতে হয়—উভয়ই সঙ্কটকে তীব্রতর করে। সমৃদ্ধির যুগে (ক) রাষ্ট্রীয় ব্যয় বেশি থাকে এবং (খ) কর কমাইয়া দেওয়া হয়—উভয়েই মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইতে সাহায্য করিয়া সমৃদ্ধির অবসান ও আগামী সংকটের সম্ভাবনা বড়াইয়া দেয়।

বাজেটে সমতাসাধনের নীতি অর্থনৈতিক যুক্তিতে গ্রহণযোগ্যও নহে

বাজেটে সমতা সাধনের প্রাচীন নীতি পরিত্যাগ না করিয়া, ইহার দোষ-ত্রুটি পরিহার করার উদ্দেশ্যে, আধুনিক কালের কতিপয় সুইডিশ ধনবিজ্ঞানী

বাণিজ্যচক্রকালীন বাজেট (Cyclical Budget) গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সমতাসিদ্ধ বাজেট গঠনের চিরাচরিত নীতি ভালই, তবে দেওয়াল-ক্যালেণ্ডারের দ্বারা বারো মাসে এক বৎসর হিসাব করিয়া উহারই মধ্যে আয় ও ব্যয় সমান না হইলেও ক্ষতি নাই। সমৃদ্ধির যুগ ও সংকটের যুগ—উভয় যুগ লইয়া যে বাণিজ্যচক্র-কাল—ইহার মধ্যে বাজেটের আয় ও ব্যয় সমান হইলেই চলিবে। সংকটের যুগে কয়েক বৎসর বাজেটে ঘাটতি যাইবে, সংকট হইতে উত্তরণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যয় অধিক হইতে থাকিবে। সংকটকালের শেষে ক্রমে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমাইতে হইবে, সমৃদ্ধির যত প্রসার হইবে বাজেটে ঘাটতি তত কমিবে এবং চরম-সমৃদ্ধির স্তরে পৌঁছিবার সময়ে রাষ্ট্রীয় আয় অধিক বাড়াইয়া বাজেটে উদ্বৃত্ত করিতে হইবে। সংকটের যুগের ঘাটতির পরিমাণ সমৃদ্ধির যুগের উদ্বৃত্তের দ্বারা পুরাইয়া লইতে হইবে।

চক্র-কালানুযায়ী বাজেট রচনা ও চক্র-কালীন সমতা সাধন-

কিন্তু চক্রকালানুযায়ী বাজেট গঠনের এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ কোথাও এখন পর্যন্ত হয় নাই, ইহার কিছু কিছু প্রয়োগ-গত অসুবিধা আছে। আগামী বাণিজ্যচক্র ঠিক কবে আসিবে ; কতদিন সমৃদ্ধি বা সংকট থাকিবে ; শুরু হইল কি না ; ইহার তীব্রতা কিরূপ ; ঘাটতি বা উদ্বৃত্তের পরিমাণ কিরূপ হওয়া উচিত ; ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের আশা-নিরাশার তীব্রতা কতখানি—এই সকল বিষয় বিচার বিবেচনা করা বাস্তবে খুবই অসুবিধাজনক। এই নীতি সফল হইতে হইলে প্রশাসনিক সংগঠন ও আর্থিক সংস্থাসমূহকে কার্যকারিতার দিক হইতে খুবই নমনীয় ও সচেতন ধরনের হইতে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বাস্তব অসুবিধাসমূহ

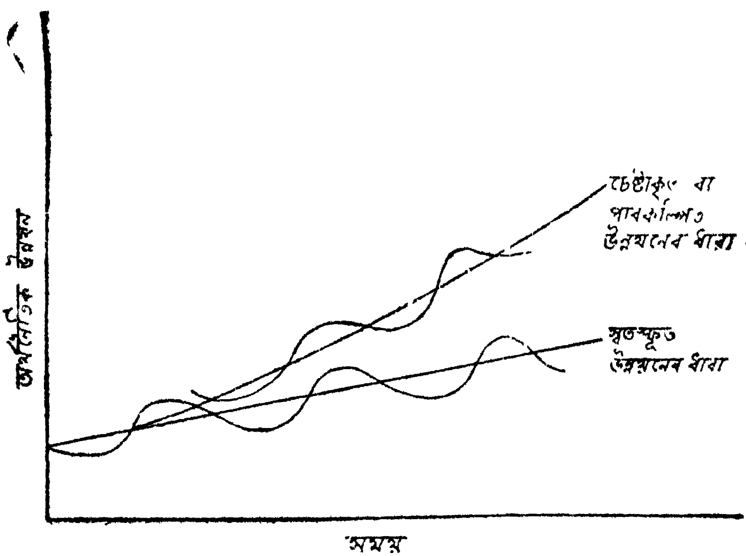
দীর্ঘকালীন ফিস্‌কাল নীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Long-run Fiscal Policy and Economic Growth)

সাধারণত, শিল্পোন্নত দেশে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রমবৃদ্ধির হার (spontaneous growth rate) মোটামুটি বেশি ; ইহারই আশে পাশে জাতীয় আয় ও কর্ম সংস্থান স্তরে স্বল্পকালীন উঠানামা ঘটে। এই বাণিজ্যচক্র রোধ করার উদ্দেশ্যে পূরণমূলক ফিস্‌কাল নীতি প্রয়োগ করা হয়। এই সকল দেশের স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধির হারকে বাড়াইবার জন্য রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের চেষ্টা এখন চলিতেছে। তবে তাহা অপেক্ষাও ভারসাম্যের আয় হইতে স্বল্পকালীন বিচ্যুতির গতিরোধ করিতে পারাই বড়

শিল্পোন্নত ও অপূর্ণোন্নত দেশে

কথা। অপরপক্ষে, অপূর্ণোন্নত দেশসমূহে, এই স্বতঃস্ফূর্ত ক্রমবৃদ্ধির হার মোটামুটি কম; ইহার আশে-পাশে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান স্তরে স্বল্পকালীন উঠানামাও ঘটিয়া থাকে। এই স্বল্পকালীন উঠানামা রোধ করার উদ্দেশ্যে চক্রবিরোধী বা পূরণমূলক ফিস্‌কাল নীতি গ্রহণ করা দরকার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দেশে দীর্ঘকালীন ফিস্‌কাল নীতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন যাহাতে ক্রমবৃদ্ধি হার বাড়িতে পারে। স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধি (Stability and Growth) ইহারাই ফিসকাল নীতির দুইটি লক্ষ্য; কিন্তু শিল্পোন্নত দেশে স্থায়িত্বের উপর জোর বেশি, আর অপূর্ণোন্নত দেশে ক্রমবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব অধিকতর। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, এই দুইটি লক্ষ্য পরস্পরের পরিপূরক, স্থায়িত্বের অবস্থা বজায় রাখিতে পারিলে ক্রমবৃদ্ধি ঘটে, আবার ক্রমবৃদ্ধি না ঘটিলে স্থায়িত্ব দীর্ঘকাল বজায় থাকে না। নিচের চিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, স্বতঃস্ফূর্ত উন্নয়নের ধারা অল্পহারে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু চেষ্টাকৃত উন্নয়নের ধারা অধিক হারে জাতীয়

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ফিস্‌কাল নীতির লক্ষ্য



আয় ও কর্মসংস্থানকে বাড়াইতে পারে। উভয় হারের আশে পাশে চক্রকালীন উঠানামা রোধের চেষ্টা করা পূরণমূলক ফিসকাল নীতির কাজ, কিন্তু দীর্ঘকালীন-

স্বতঃস্ফূর্ত উন্নয়নের ধারা উপরে তুলিয়া ঐ ধারাকে অধিকতর ঊর্ধ্বমুখী করা দীর্ঘকালীন ফিস্‌কাল নীতির দায়িত্ব।

ফিস্‌কাল নীতি সাধারণত দুইটি অংশ, অর্থাৎ ব্যয়-নীতি ও কর-নীতি; ইহারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিরূপে সাহায্য করে আমরা তাহা আলোচনা করিব।

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানে দীর্ঘকালীন উন্নয়ন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় দুইদিক হইতে সাহায্য করে। প্রথমত, দেশের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্ত করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য রাষ্ট্র অনেক সময় "জাতীয়" বা "সামাজিক" ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্ম নিজের হাতে তুলিয়া লয়। ব্যক্তিগত শিল্পপতি ও উদ্যোক্তারা যাহাতে অধিকতর "বাহ্য ব্যয়-সংকোচের সুবিধা (external economies) পাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ তাহাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বাড়াইবার উপযোগী অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তোলাই দীর্ঘকালীন সরকারী ব্যয়ের লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, সরকারী ব্যয় প্রত্যক্ষভাবে কলকারখানা স্থাপন করিয়া দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা সরাসরি বাড়াইয়া তুলিতে পারে।

ক্রমবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয়ের দুই ধরন

প্রথম ধরনের ব্যয় বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সাধারণত অপূর্ণোন্নত দেশে পথঘাট, শহর, বন্দর গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় হইতে থাকে। আর তাহা ছাড়া, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতির জন্যও রাষ্ট্র ব্যয় করিতে শুরু করে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির উপর ব্যয় এমন ধরনের হওয়া দরকার যাহাতে উহার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; কল্যাণ বৃদ্ধি ঘটিলেও উহা সরকারী ব্যয়ের প্রাথমিক লক্ষ্য নহে। এই সকল ব্যয় সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা দরকার। এই ধরনের সুদীর্ঘকালীন সমাজ-উন্নয়নমূলক স্থায়ী অর্থলগ্নী (long-term social over-head outlays) হইতে এমন দ্রুত হারে উন্নয়ন হয় না যাহাতে রাষ্ট্রের আয় দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহাদের প্রভাব অতি ধীরে ধীরে বেশ কিছুদিন পরে পরোক্ষভাবে দেখা দিতে থাকে। দ্বিতীয় ধরনের ব্যয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হইল দেশে শিল্প ও কৃষিতে দ্রুত উন্নয়নের উপযোগী মূল পরিবেশ গড়িয়া তোলা, অর্থাৎ বিদ্যুৎশক্তি, বন্যারোধ, জলসেচ, মৃত্তিকারক্ষণ প্রভৃতি কাজকর্মে ব্যয়।

১। স্বাধীন ব্যবসায়ের পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যয়

ইহারাও 'সমাজকল্যাণমূলক' ব্যয়ের মত, অর্থাৎ অনেককাল পরে এই ব্যয়ের ফলে দেশের সম্পদবৃদ্ধির ধারা শুরু হইতে পারে। উপরন্তু ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা যে সকল শিল্পে বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহণে ইচ্ছুক নন, অথবা সমাজের অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রস্থলগুলি যাহাতে কতিপয় ব্যক্তির কুক্ষিগত হইয়া না পড়ে, এই সকল উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র সরাসরি উন্নত ধরনের যান্ত্রিক কৃষিক্ষেত্র ও কলকারখানা স্থাপন করিতে পারে। এই ধরনের সরকারী ব্যয় বেশি হওয়া ভাল, কারণ ইহাতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার দ্রুততর হয় এবং রাষ্ট্রের হাতে আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ উন্নয়নের সম্ভাবনা আরও বাড়াইয়া তোলে।

২। সরাসরি দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয়

ক্রমবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারী কর-নীতি কিভাবে সাহায্য করে এখন তাহা আলোচনা করা দরকার; অপূর্ণোন্নত দেশে ব্যক্তিদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ কম বলিয়া এই সকল দেশের ফিস্কাল নীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশই হইল অর্থ ও উপকরণ সংগ্রহ করা। মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় কম, সুতরাং উন্নয়ন-মূলক ব্যয় কেবলমাত্র করের সাহায্যে তোলা সম্ভব হয় না। উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সরকারী কর-নীতির দুই ধরনের কাজ আছে: (১) পূর্বে আলোচিত উন্নয়ন-মূলক সরকারী ব্যয় করার উপযোগী আয় বাড়ানো, এবং (২) উন্নয়নকালে যে অবশ্যম্ভাবী মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা। উন্নয়নমূলক ব্যয় ও দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদনবৃদ্ধি—ইহাদের মধ্যে কিছুটা সময়ের ব্যবধান (time lag) দেখা দিবে, সেই সময় মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে। কিছুটা মুদ্রাস্ফীতি ভালই, উন্নয়নের রথচক্র ইহাতে মসৃণ হয়, কারণ মৃদুবর্ধনশীল দামস্তর ব্যবসায় বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি করে, ক্রমবর্ধমান সরকারী ঋণের আসল ভার লোকচক্ষুর অন্তরালে কমিতে থাকে। কিন্তু উহাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখার জন্য এই সময় সরকারী করনীতির ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুদ্রাস্ফীতি রোধের অন্যান্য পদ্ধতিগুলি যেমন আর্থিক ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের নীতিসমূহ এইরূপ দেশে ততটা কার্যকরী নয়; তাই করনীতির প্রয়োগ আরও গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রমবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে করনীতির ব্যবহার

উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোন্ ধরনের করের উপর ভরসা করা চলে, তাহা আলোচনা করা দরকার। অপূর্ণোন্নত দেশে সাধারণত, আমদানি-শুল্কের ব্যবহার অধিক মাত্রায় ঘটে। ইহা সংগ্রহের দিক হইতে সুবিধাজনক,

দেশে যাহাদের আয় বাড়িয়াছে তাহাদেরই পকেট হইতে এই টাকা আদায় হয়, এই শুল্কের আড়ালে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও প্রসার সম্ভবপর হয়, ইহাতে দেশের ব্যবসায়ীরা উৎসাহ পান, বাহিরের পুঁজিপতিরাও সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার জন্য দেশের মধ্যে বিনিয়োগ করেন। রপ্তানি-শুল্কের গুরুত্বও কম নয়, বিশেষত, কৃষি-দ্রব্যের উপর রপ্তানি-শুল্ক হইতে প্রভূত আয় হয়, দেশের শিল্পোন্নয়নে সাহায্যের জন্য এই সকল কৃষি-দ্রব্যের রপ্তানি কমানোও কিছুটা দরকার।

এই সকল দেশে আয় ও মুনাফা-করের সাহায্যেও উন্নয়নের কাজ অগ্রসর করা যায়। এইরূপ অপূর্ণোন্নত দেশে ব্যক্তিগত মালিকানায় ছোট ছোট ফার্মের সংখ্যাই বেশি, তাই কোম্পানী-কর মোটামুটি আয়করেরই রূপ গ্রহণ করে। বিদেশী মালিকানার ফার্মগুলির উপর অধিক কর বসাইবার ঝোঁক খুবই বেশি দেখা দেয়। অনেক সময়, এইরূপ দেশে, কোম্পানীদের প্রথম দিকে কিছুকাল কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া চলে, এইরূপ 'কর-নিষ্কৃতিকাল' (tax-holiday) যত বেশি হইবে, ব্যক্তিগত মালিকানার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ তত বাড়িবার সম্ভাবনা। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে করনীতি অপেক্ষা সরকারী ব্যয় নীতির কার্যকারিতা অনেক বেশি।*

অনুশীলনী

1. What is Fiscal Policy ? How it differs from Monetary policies ?

2. What are the objectives of Fiscal Policy in developed and under-developed economies ?

3. What are the economic objectives of modern states ?

4. Discuss the relationship between Fiscal policy and National Income.

5. Analyse the mechanism of Fiscal Policy.

6. Give an idea of the contra-cyclical fiscal policy.

7. What is compensatory spending ? How it works ? What are its limitations ?

*"......it is very doubtful how far tax concession in their own right really succeed in promoting development........The services which the Government of a backward country can offer through its expenditure to promote development are likely in the long run to be more helpful than the taxes it refrains from collecting." Mrs. Ursula Hicks, *Public Finance*, P 308

8. Write short Notes on : (a) Public works programme, (b) Interest-free financing, (c) Pump-priming, (d) Automatic or Built-in Stabilizers, (e) Functional Finance.

9. Assume that a Government balances the budget every year. Can it still pursue policies which will increase total outlay ?

10. If the Government is willing to incur a deficit, would tax reduction or deficit spending be preferable if we want to increase total outlay ?

11. Discuss the role of Fiscal Policy in promoting Economic Growth.

জাতীয় আয়

National Income

সামগ্রিক বিশ্লেষণ নীতি বা সমষ্টিভিত্তিক ধনবিজ্ঞান (Aggregative analysis or Macro-Economics)

আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞান মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত : এককভিত্তিক ও সমষ্টিভিত্তিক। এককভিত্তিক ধনবিজ্ঞানে বিচ্ছিন্নভাবে একটি ক্রেতা বা একটি ফার্মের আচরণ আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহাদের গতিবিধি ও রীতিনীতি সম্পর্কে বিভিন্নরূপ নিয়ম গঠন করি এবং ক্রেতাটি ও ফার্মটিকে বিভিন্ন পরিবেশে উপস্থাপিত করিলে এই নিয়মগুলিকে কিরূপে বদলাইতে হয় তাহা আলোচনা করি। অপরপক্ষে, সমষ্টিভিত্তিক ধনবিজ্ঞানে দেশের সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামো লইয়া আলোচনা হয়, সমষ্টিগতভাবে অর্থনৈতিক কাঠামোর গতিবিধি ও আচরণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়। সমগ্র দেশের বা জাতির অর্থ নৈতিক ভাঙাগড়া, স্থিতি ও গতি সম্পর্কে বিভিন্নরূপে বৈজ্ঞানিক নিয়ম গঠন করা হয়, এবং সমগ্রভাবে জাতির শ্রীবৃদ্ধি বা লক্ষ্মীলাভ সম্পর্কে আলোচনা হইয়া থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ক্লাসিকাল পণ্ডিতেরা প্রধানত সমষ্টিভিত্তিক বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, অ্যাডাম স্মিথের বই-এর নামই হইল "জাতিসমূহের সম্পদের কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান" (**"An Enquiry into the nature and causes of the wealth of Nations"**)।

সমষ্টিভিত্তিক ধনবিজ্ঞান কাহাকে বলে

নয়া ক্লাসিকাল লেখকগণ এই সমষ্টিভিত্তিক আলোচনার পরিবর্তে প্রধানত এককভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই আলোচনা পদ্ধতির মূল কথাই হইল, কোন সমাজের ব্যক্তিরা নিজ নিজ স্বার্থ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে সর্বাধিক তৃপ্তি বা সর্বাধিক মুনাফা পাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া তাহারা স্থির করিতেছে কোন্ ধরণের দ্রব্য কত পরিমাণে ভোগ করিবে বা উৎপাদন করিবে। মোট উৎপাদন স্থির ধরিয়া লইয়া তাঁহাদের আলোচ

বিষয় হইল কিরূপে বিভিন্ন উপাদান একত্রে সম্মিলিত করা যায় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কিরূপে উপাদানগুলির মধ্যে বণ্টন করা সম্ভবপর। মোট উৎপাদনের পরিমাণ সমান বা অপরিবর্তিত মনে করিলে আমাদের ধরিয়া লইতে হয় দেশের সকল উপকরণ পূর্ণনিযুক্ত আছে। যদি দেশে পূর্ণনিয়োগ আমরা ধরিয়াই লই তাহা হইলে একমাত্র আলোচ্য বিষয় থাকে উৎপাদনের এক শাখা হইতে অপর শাখায়, অর্থাৎ এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে উপাদানের অপসারণ ও নিয়োগ কেমন করিয়া এবং কত ভালভাবে করা যায়। নয়া ক্লাসিকাল লেখকেরা ইহাও মনে করিতেন যে, সকল ব্যক্তির নিজ নিজ স্বার্থবুদ্ধির তাগিদে এবং দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে সর্বদা সর্বোত্তম উপকরণ-নিয়োগ (optimum allocation of resources) ঘটিতে পারে।*

একককভিত্তিক ধন-বিজ্ঞান কাহাকে বলে

কেন প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা পূর্ণ কর্মসংস্থান বা মোট উৎপাদন ধরিয়া লইয়াছিলেন তাহা আলোচনা করা দরকার। প্রকৃতির রাজ্যে এক ধরণের শৃংখলা আছে, যেন কোন এক 'অদৃশ্য হস্ত' (Invisible Hand) এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল গতিবিধি সুচারুরূপে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, এই ধারণা তাঁহারা অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্ষেত্রেও প্রযোগ করিয়াছিলেন। পরম মঙ্গলময় এই শক্তির প্রভাবে আপনা-আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেশে পূর্ণ-কর্মসংস্থান বজায়

*একটি কথা মনে রাখা দরকার। কেইনস্ কিন্তু এই ক্লাসিকাল ও নয়া-ক্লাসিকাল ধারণাকে মূলত সঠিক বলিয়া মনে করিতেন। নয়াক্লাসিকাল লেখকদের অনুমানগুলি (assumptions) সত্য ধরিয়া লইলে তাহাদের আলোচনা মূলত সঠিক ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। তাঁহার আপত্তির বিষয় ছিল এই যে ঐ অনুমানগুলি মানিয়া লইলে আমরা বাস্তব অবস্থা সর্বদা ব্যাখ্যা করিতে পারি না। অদৃশ্য কোন এক শক্তি সমাজে এমন স্তরে মোট উৎপাদন ঘটাইতেছে যে সর্বদা পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকে, এই অনুমান তিনি স্বীকার করেন নাই। তিনি ইহাও মানিতেন না যে, ব্যক্তিস্বার্থ অনুযায়ী কাজকর্ম সর্বদা সমাজ-স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে। এই অনুমানগুলি 'প্রায় ক্ষেত্রেই বা কখনই মানিয়া লওয়া চলে না' (**'seldom or never satisfied'**) এবং ফলে ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র বাস্তব জগতের অর্থনৈতিক সমস্যা মিটাইতে অক্ষম হইয়া পড়ে (incapable of solving 'the economic problems of the actual world')—ইহাই তিনি মনে করিতেন। কেইন্সের মতে পূর্ণ কর্মনিয়োগের অবস্থা হইল একটি বিশেষ স্তর, যে স্তরে পৌঁছিলে তবেই ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহ পুনরায় কার্যকরী হইতে পারে (**'the classical theory comes into its own again'**).

থাকিবে, তাঁহাদের দৃষ্টিভংগী ছিল এইরূপ। প্রকৃতির রাজ্যের মত সুশৃংখল ও মসৃণভাবে সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিগুলি আপনা আপনি পরিচালিত হইবে, এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা নিশ্চিত ছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়মের মতই অমোঘ যোগান ও চাহিদার নিয়ম সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করিবে, সুতরাং ধনবিজ্ঞানীদের কাজ দাঁড়াইল একক-বিচারে আত্মনিয়োগ করা। তাঁহাদের মনে হইল, ধনতন্ত্রই একমাত্র স্বাভাবিক ব্যবস্থা (natural order), ইহার পূর্বে সামাজিক কাঠামোর বিবর্তন হইয়াছে বটে কিন্তু সমাজ-বিবর্তনের শেষ ধাপে আসিয়া আমরা ধনতান্ত্রিক কাঠামো পাইয়াছি (terminal station of social evolution), ইহাই চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় এবং স্বাভাবিক। যদি কোনরূপ অসঙ্গতি ও সংঘাত থাকে তবে তাহা অস্বাভাবিক ও নিয়মবিরুদ্ধ (exception to the rule)। উৎপাদক নিজের স্বার্থ খুবই ভাল বোঝে, সে এমনভাবে দ্রব্যের ও উপাদানের বাজার দুইটিকে দামের উঠানামা দিয়া নিয়ন্ত্রণ করিবে যাহাতে সাময়িকভাবে অবিক্রীত দ্রব্যসামগ্রীর আধিক্য অর্থাৎ সাধারণ উৎপাদনাধিক্য (general over production) দেখা না দেয়। ইহা ধরিয়া লইয়াই এই যুগের ধনবিজ্ঞানীরা এককবিচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ক্লাসিকালে এই ধারণার কারণ কি

যতদিন পর্যন্ত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দ্রুতগতিতে সহজভাবে অগ্রসর হইতেছিল, ততদিন এই কাঠামোকে অক্ষয় ও নিশ্ছিদ্র বলিয়া ধরিয়া লইতে তাঁহাদের মনে কোন বাধা ছিল না। দেশের মোট উৎপাদন কর্মসংস্থান ও দামস্তরের আলোচনা বাদ দিয়া তাঁহারা ফার্মের উৎপাদন বা বিশেষ একটি দ্রব্যের বা উপাদানের দাম লইয়া বিশ্লেষণে মত্ত হইয়াছিলেন। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত 'প্রান্তিক আলোচনা পদ্ধতি' ইংলণ্ডে এমন যুগে দেখা দিয়াছিল যখন বাণিজ্যচক্রের প্রকোপ খুব কম। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে যে ব্যবসায়সংকট সুরু হইল ইহা হইতে ধনতান্ত্রিক কাঠামো আর পূর্বের ন্যায় সুস্থ হইয়া কখনই সবলরূপে দাঁড়াইতে পারিল না। তাই এই ব্যবস্থার চিরস্থায়ী রূপ আর পণ্ডিতদের চোখের সম্মুখে রহিল না। সোভিয়েট রুশিয়ায় সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নও সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দিল। উপরন্তু, আধুনিককালের যুদ্ধে কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পাঠাইলেই চলে না, দেশের সকল উপকরণ ও শক্তিকে পরিকল্পিত ভাবে এই

উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়। যুদ্ধকালীন জরুরী ব্যবস্থায় দেশের সকল উপকরণকে সামগ্রিকভাবে একত্রে সংগৃহীত করা দরকার। এই সকল বিভিন্ন অবস্থার চাপে ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় আবার সেই ক্লাসিকাল সমষ্টিভিত্তিক বিশ্লেষণের সূত্রপাত হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে সমষ্টিভিত্তিক আলোচনার একটি অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া দরকার। ক্লাসিকাল লেখকদের পূর্বে, প্রধানত ইংলণ্ডে, একদল পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদের মার্কেণ্টাইলিষ্ট (Mercantilists) বলা হয়। এই মার্কেণ্টাইলিষ্টরা সমগ্র দেশের ও জাতির অর্থনৈতিক অবস্থার কথা সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিতেন, আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি রাখিলে দেশের সম্পদ সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পায়, দেশের সকল উপকরণের সর্বোত্তম নিয়োগ হয়, তাই তাঁহারা এইরূপ নীতি অবলম্বন করার কথা বলিতেন। দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে সুদের হার কমে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া কর্মসংস্থান বাড়ে, এই সকল আলোচনাও তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। ক্লাসিকাল যুগে ম্যালথাস্‌ও এই রূপ সমষ্টিভিত্তিক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। স্বয়ংক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণকারী অর্থনৈতিক কাঠামোর তদানীন্তন ধারণার বিরুদ্ধে তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, দেশের সামগ্রিক চাহিদা কম থাকিতে পারে। কার্পণ্য ও মধুমক্ষিকা-সুলভ সঞ্চয়প্রবৃত্তিই সকলের পক্ষে একমাত্র কল্যাণকর, এই ধারণার বিরুদ্ধে তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, এই মধুমক্ষিকা-বৃত্তি বেশিদূর বাড়াইলে দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় হ্রাস পাইবে, উৎপাদনের হার কমিয়া যাইবে, মূলধনের জড়ত্ব দেখা দিবে এবং ইহার ফলে শ্রমিকের জন্য চাহিদা হ্রাস পাইবে। অর্থনৈতিক 'অদৃশ্য হস্ত'-এর উপর আস্থা না রাখিয়া তিনি এই আধুনিককালীন সমষ্টিভিত্তিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কার্ল মার্ক্সের কথা অবশ্য উল্লেখ করা দরকার। সকল ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি ছিলেন একটু স্বতন্ত্র এবং অনেকের মতে সমগ্র ক্লাসিকাল মতবাদের যোগ্য উত্তরসাধক ও ধারক। বোল্ডিং-এর মতে মার্ক্সই 'সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর সমস্যা লইয়া আলোচনার প্রথম প্রচেষ্টা করেন', 'অর্থনৈতিক জীবন ও সম্পর্কগুলির সামগ্রিক একটি চিত্র' দাঁড় করাইবার চেষ্টা করেন—'পূর্বতন ধনবিজ্ঞানীরা যে কাজ অবহেলা করিয়াছিলেন, সকল মত

আধুনিক কালে ইহা পুনরায় দেখা দিতেছে কেন

মিলাইবার সেই চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন'। * শুধু তাহাই নহে। বর্তমান কালে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্রমোন্নতির যে সকল তত্ত্ব গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাদের প্রায় সবগুলিই মার্ক্সের তত্ত্ব হইতে প্রেরণা পাইয়াছে। মার্ক্স ও কেইন্‌সের মধ্যে পার্থক্যের কথাও একটু মনে রাখা দরকার। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে মার্ক্স ইতিহাসের গতিধারায় একটি বিশেষ ধরনের স্তর বলিয়া মনে করিতেন এবং এই কাঠামোকে একটি সদা পরিবর্তনশীল ও গতিশীল দেহ হিসাবে গণ্য করিতেন। কেইন্‌স্ এই কাঠামোকে চিরস্থায়ী মনে করিয়া ঐতিহাসিক দিক হইতে এই নির্দিষ্ট অবস্থা-কাঠামোর মধ্যেই ধনতন্ত্রের সামগ্রিক ভারসাম্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন। †

আধুনিককালে, কেইন্‌সের পূর্বে বা তাহার সমসাময়িককালে, আরও কয়েকজন লেখক এই সমষ্টিভিত্তিক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, যেমন ওয়াল্‌রাস্ (Walras) উইকসেল্ (Wicksell), এবং ফিসার (Fisher)। কিন্তু বর্তমান যুগের সামগ্রিক বা সমষ্টিভিত্তিক আলোচনাপদ্ধতি মূলত কেইনসের অবদান। তিনি General theory of Employment, Interest and Money নামক বইখানাতে আধুনিককালে এই সমষ্টিভিত্তিক আলোচনা-পদ্ধতির নূতন সূত্রপাত করেন।

জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক রূপ (A Total picture of the National Economy)

সমাজের সামগ্রিক রূপ চোখের সম্মুখে রাখিলে আমরা দেশের মোট অর্থনৈতিক গতিধারার আভাষ পাইতে পারি। বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী যেমন সমুদ্রে

* 'The first attempt to deal with the problems of the whole economic system, to build 'a picture of economic life and relationship as a whole'—'a task of synthesis which previous economists had neglected.'

† "Marx's aggregative analysis is considered predominantly 'organistic' in the sense that it is concerned with the *organism* of capitalism as a developing whole. By contrast, it is to be noticed, Keynes's analysis ran largely in terms of 'mechanistic' equilibrium analysis, since his method consisted in investigating the equilibrium *mechanism* of capitalism in a historically given situation. This then is the fundamental difference in methodology between Marx and Keynes, apart from the fact that 'Keynes wanted to apologize and preserve, while Marx wanted to criticize and destroy,' as L. R. Klein alludes to their diametrically opposed ideological bearings." K. K. Kurihara, *Introduction to Keynesian Dynamics*. P. 15.

প্রবাহিত হয় এবং আবার মেঘের আকারে নূতন বারিধারায় পুষ্ট হইয়া সমুদ্রের সহিত মেশে—মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মও সেইরূপ ব্যক্তিগত আয় সৃষ্টি করিয়া সামগ্রিক ভাবে জাতীয় আয় সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত আয় হইতেই সমাজে মোট ভোগ ও চাহিদার সৃষ্টি হয়—পুনরায় উৎপাদন চলিতে থাকে—জাতীয় আয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠে। চক্রের ন্যায় সঞ্চরণশীল, উৎপাদন—আয় সৃষ্টি—ব্যয়—ভোগ ও সঞ্চয়—পুনরুৎপাদন, ইহাই সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্মের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি।

সামগ্রিক গতিশীল চিত্র

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোন উপাদান হিসাবে সম্পদ উৎপাদনের কাজে (দ্রব্যাদি বা কার্যাদি) নিযুক্ত আছে। উৎপাদনের সকল উপাদান দেশের বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়া বহুপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদি (goods & services) উৎপন্ন করিতেছে। এই সকল দ্রব্য ও কার্য (goods & services) অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হয় অথবা তাহাদের অর্থ-মূল্য হিসাব করিতে পারা যায়। উহাদের বিক্রয় মূল্য হইতে সৃষ্টি হয় ব্যক্তিগত আয়; এই মোট বিক্রয় মূল্য উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানসমূহের (অর্থাৎ খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা) আয় সৃষ্টি করে। উপাদানসমূহের আয় যোগ করিয়া আমরা জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানিতে পারি। এই জাতীয় আয়-ই সমাজের মোট দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় হইয়া যায় *; ইহা মোট ব্যয়ের সমান। †

স্রোতধারা

মোট ব্যয়ের কিছু অংশ ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয়, যে অংশ সঞ্চয় হয় তাহা নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয়িত হয়। সমাজে ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন সুরু হয়; সমাজের লোকজন উপাদান হিসাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ কর্মে নিযুক্ত হইয়া যায়। পুনরায় তাহাদের আয় সৃষ্টি হয়, ব্যয় ও সঞ্চয়

*এই আলোচনায় বহু জটিলতা বাদ দেওয়া হইয়াছে, প্রাথমিক ধরনের আলোচনা মাত্র। এই সম্পর্কে বিস্তৃত 'আলোচনা 'আয় ও কর্মসংস্থানতত্ত্ব' পরিচ্ছেদে পাওয়া যাইবে।

*রাষ্ট্র যাহা কর হিসাবে আয় হইতে তুলিয়া লয়, উহা ব্যক্তির ব্যয় না হইলেও রাষ্ট্র ব্যয় করে; সুতরাং সমাজের মোট ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

†দুই দিক হইতে ইহা দেখা যায়। এক ব্যক্তির আয় নিশ্চয় অন্য ব্যক্তির ব্যয়, সুতরাং মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান। মোট আয়ের কিছুটা ভোগ্য দ্রব্যে সরাসরি ব্যয়িত হইবে, কিছুটা সঞ্চিত হইবে। সেই সঞ্চয় মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যয় হইবে। অথবা কোন কিছুতে ব্যয় না হইলে মোট আয় কমাইয়া দিবে, কারণ উহার ব্যয় না হওয়ায় অন্যের আয় সৃষ্টি হইতে পারিবে না।

চলিতে থাকে, এইভাবে অবিরাম ধারায় সমাজে অর্থনৈতিক গতিধারার স্রোত বহিয়া চলে। ইহাদের সাজাইলে দেখা যায় :

মোট উপাদানের নিয়োগ
|
মোট উৎপাদন (জাতীয় সম্পদ)
|
মোট আয় (জাতীয় আয়)
|
মোট ব্যয়
|
মোট ভোগ — মোট সঞ্চয়
|
ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন — মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন

মোট উপাদানের নিয়োগ

জীবন যাত্রার গতি ও প্রকৃতি

এই ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার গতি ও প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বোঝা যায়। দেশে যদি উপযুক্ত পরিমাণে উপাদান না থাকে বা তাহারা দক্ষতাবিহীন ও অনুন্নত হয় তাহা হইলে মোট দ্রব্য সামগ্রী বা সম্পদের উৎপাদন কম হইবে। সম্পদ কম উৎপন্ন হইলে উহার বিক্রয় মূল্যও কম হইবে, লোকের আয়ও কমিয়া যাইবে। ভোগ্যদ্রব্যক্রয়ে ব্যয় কম হইবে, এবং কম সঞ্চয়ের দরুন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ও কমিয়া যাইবে। দেশে জীবন যাত্রার মান, মোট আয়, ব্যয়, মোট ভোগ-পরিমাণ এবং মোট মূলধন-গঠন (**capital-formation**) সব হ্রাস পাইবে।

দেশে কর্মনিয়োগের পরিমাণ মোট ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল

আরও জানা যায়, মোট ব্যয় যদি বাড়ানো হয় তাহা হইলে উপাদান-সমূহের অধিক নিয়োগ সম্ভবপর এবং তাহারই ফলে দেশে অধিক আয় সৃষ্টি হইতে পারে। রাষ্ট্র যদি সমাজের মোট ব্যয় বাড়াইতে পারে, তাহা হইলে উপাদানগুলি বেকার থাকিবে না, সমাজে সম্পদ উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে এবং আয়ের স্তরও বৃদ্ধি পাইবে।

দেশের লোকের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে যে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হয় উহারই একাংশ লোকে ভোগ করে এবং অপরাংশ নূতন দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করে। মোট উৎপাদন বাড়াইতে পারিলেই ভোগের জন্য দ্রব্যসামগ্রী

বা বিনিয়োগের জন্য মূলধনী দ্রব্যাদি সকল কিছু বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এইভাবে মোট উৎপাদন, জাতীয় সম্পদ এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

এই সকল কারণে জাতীয় আয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। সমাজের কত পরিমাণ উপকরণ কোন্ অংশে (কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ইত্যাদিতে) কিরূপ ভাবে সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ত আছে তাহা জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায়।

জাতীয় আয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণের গুরুত্ব

এই সম্পদ কোন্ কোন্ দ্রব্য লইয়া গঠিত; কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপন্ন হইল; কোন্ শ্রেণীর হাতে জাতীয় আয়ের কত অংশ চলিয়া যাইতেছে; দেশে মোট ভোগ্যদ্রব্য কোন্ শ্রেণীর মধ্যে কিরূপভাবে বণ্টিত হইয়া আছে, সকলই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। ইহার দ্বারাই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমগ্র-ভাবে দেখা যায় এবং কি কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (component parts) পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর অর্থনৈতিক কাজকর্ম আপনগতিতে আবর্তিত হইতেছে তাহা বোঝা যায়, দেশের অর্থনৈতিক ব্রহ্মাণ্ডের রূপ পর্যবেক্ষণ করা যায়। ভাগীরথী যেরূপ মহাদেবের জটা হইতে নামিয়া আবার মহাদেবের জটাতেই ফিরিয়া যায়—কোন দেশের অধিবাসীদের সকল প্রকার দৈনন্দিন কাজকর্মের স্রোতধারাও জাতীয় আয় হইতে সৃষ্ট হইয়া জাতীয় আয়কেই পুনরায় পুষ্ট করিয়া তোলে।

জাতীয় আয় (National Income)

"কোন দেশের শ্রম ও মূলধন, প্রকৃতির উপকরণ আহরণের দ্বারা এক বৎসরের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তুজাত দ্রব্য বা বিভিন্ন কার্যাদির নীট সমষ্টি (net aggregate) উৎপন্ন করে"—মার্শাল তাহাকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন।*

*অধ্যাপক ফিসার বলেন যে, জাতীয় সম্পদ বলিলে সারা বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্য ও কার্যাদির পরিমাণ বোঝা উচিত নয়। তাঁহার মতে প্রধানত জীবনযাত্রার মান আলোচনার জন্যই জাতীয় আয়ের ধারণা দরকার এবং উহার পরিমাপ গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি সারা বৎসরে মোট ভোগের পরিমাণকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন। যেমন 1959 সালে 60 হাজার টাকা মূল্যের একটি বাড়ি তৈয়ারি হইল। মার্শালের মতে উহাকে সেই বৎসরের জাতীয় আয়ের মধ্যে হিসাব করিতে হইবে। কিন্তু ওই বাড়ীটিকে ব্যক্তি (ধরা যাউক) 30 বছর ধরিয়া ভোগ করিবে, প্রতি বৎসর উহার $\frac{1}{30}$ অংশ ভোগ করা হইতেছে। তাই বছরে 2 হাজার টাকার বেশি যোগ করা উচিত নহে, ইহাই ফিসারের অভিমত। কিন্তু এই মত সাধারণভাবে গৃহীত হয় নাই, উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবেই জাতীয় আয়কে গণনা করার নীতি গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছে। কারণ, জাতীয় আয়ের উৎপাদনে উঠানামাই দেশের কর্মসংস্থান ও আয়স্তরে উঠানামা প্রকাশ করে।

সমাজের বিভিন্ন দিকে উৎপাদনে নিযুক্ত সকল উপাদান যে পরিমাণ সম্পদ এক বৎসরের মধ্যে সৃষ্টি করে তাহার নাম মোট জাতীয় আয় (Gross National Income)। এই মোট জাতীয় আয় হইতে সেই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়-ক্ষতি হইল তাহা পূরণের জন্য কিছু সম্পদ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট জাতীয় আয় (Net National Product) বা জাতীয় বিভাজ্য-আয় (National Dividend)। এই জাতীয় আয় বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক উপাদানের আয় সৃষ্টি করে। সকল উপাদান এই জাতীয় বিভাজ্য আয় হইতে নিজস্ব আয় পায় বলিয়া ইহাকে বিভাজ্য-আয় (Dividend) বলে।

জাতীয় আয়

এই জাতীয় আয় কোন নির্দিষ্ট ভাণ্ডার (fund) নহে, ইহা স্রোতশীল ধারা। প্রতি বৎসর সকল উপাদানের কার্যের ফলে এই সম্পদ উৎপন্ন হয় এবং সকল উপাদানের মধ্যেই তাহা বন্টিত হয়। উপাদানসমূহের মিলিত কার্যফলে উৎপন্ন এই সম্পদ তাহাদের আয়ের উৎসও বটে। এই জাতীয় আয় চারি প্রকার আয়ে বিভক্ত হইয়া (খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা) সমগ্র দেশের জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয় সৃষ্টি করে

মার্শাল এই জাতীয়-আয় বলিতে এক বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী ও কার্যাদির পরিমাণকে বুঝিয়াছেন। দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির এই পরিমাণকে বাস্তব ক্ষেত্রে হিসাব করা এবং তাহার সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নহে। দেশের সকল প্রান্তে কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপন্ন হইল তাহার ঠিকানা নাই। তাহা ছাড়া একই দ্রব্যের বহু প্রকার-ভেদ আছে (যেমন বহুপ্রকারের আম, কুমড়ো, চা, জুতো ইত্যাদি)। একই মানদণ্ডের মাধ্যম ব্যতীত ইহাদের হিসাব করিতে হইলে বিরাট তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। আরও অসুবিধা হয় 'আসল' ধারণা অনুযায়ী ('Real' concept) মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হিসাবের ক্ষেত্রে। 10000 পেন্সিল হইতে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য কত পেন্সিল বাদ দিয়া রাখিতে হইবে? আবার হিসাবে যাহা বাদ দেওয়া হইল (ধরা যাক্ 200টি), তাহা কি ব্যবহৃত হইয়া দেশের সম্পদ ও কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে না? তাই জাতীয় আয়কে 'আসল' আয় হিসাবে গণনা করার বহু বাস্তব অসুবিধা আছে।

দ্রব্য কার্যাদির হিসাবে জাতীয় আয়ের পরিমাপে অসুবিধা

এই সকল অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক পিগু জাতীয় আয়কে হিসাব* করিয়াছেন টাকার হিসাবে ; এক বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির অর্থ-মূল্যের মোট পরিমাণ হিসাব করিয়া। এক বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্য সামগ্রীর ও কাজকর্মের টাকার হিসাবে প্রকাশিত দাম যোগ করিয়া মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায় এবং ওই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা উহা হইতে বাদ দিয়া নীট জাতীয়-আয় বা জাতীয় আয় হিসাব করা হয়।

পিগু : মোট উৎপন্নের অর্থ-মূল্য

জাতীয় আয় সম্পর্কে আরও দুইটি বিষয় বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমত, দেশের সম্পদের উপর বিদেশীদের মালিকানা থাকিলে উহা হইতে আয় জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইতে বাদ দেওয়া উচিত। বিদেশের সম্পদের উপর দেশীয় লোকের মালিকানা থাকিলে উহা হইতে আয় জাতির আয়ের সহিত যোগ করা উচিত। আমদানি-রপ্তানি হইতে দেশের পাওনাকে জাতীয় আয়ের সহিত যোগ করা উচিত : অথবা দেনা-কে বিয়োগ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র কর ধার্য করার ফলে সকল

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও রাষ্ট্রের কার্যকলাপ

*কিন্তু এই ভাবে অর্থমূল্যের সাহায্যে হিসাব করারও অনেক ত্রুটি আছে। বহু দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদক নিজেই ব্যবহার করে (যেমন চাষী নিজের উৎপন্ন ধান ভোগ করে, বা তাঁতী নিজের উৎপন্ন কাপড় ব্যবহার করে, শিক্ষক নিজের ছেলে মেয়েদের পড়ায়, হোটেলওয়ালা নিজের হোটেলেই খাদ্যাদি গ্রহণ করে)। এই সকল দ্রব্যের মূল্যকে অর্থের হিসাবে পরিমাপ করা চলে না, ইহারা অর্থমূল্য সৃষ্টি করে না, অথচ ইহাদের বাদ দিলে জাতীয়-আয়ের প্রকৃত পরিমাণ বোঝা যায় না। কোনো ব্যক্তি তাহার টাইপিষ্টকে বিবাহ করিয়া যদি তাহাকে আর মাহিনা না দিয়া টাইপের কাজ করাইয়া লয় তাহা হইলে সেই কাজের মূল্য সৃষ্টি না হওয়ায়, এইরূপ অবস্থায় অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় কমিয়া যায়। এই সকল অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও পরিমাণগত পরিমাপ করার সুবিধা থাকার দরুণ অধ্যাপক পিগুর সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অর্থমূল্যের হিসাবেই জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হইয়া থাকে।

অর্থমূল্যের সাহায্যে জাতীয় আয় পরিমাপের আরও দুইটি অসুবিধা আছে। প্রথমত, অর্থের নিজেরই মূল্য পরিবর্তন হইতে পারে, ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণে পরিবর্তন দেখা দেয়, কিন্তু তাহাতে দেশের সম্পদের পরিবর্তন হয় না। যেমন দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে (অর্থাৎ অর্থের নিজস্ব মূল্য কমিয়া গেল) অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু দেশের সম্পদ বাড়িল না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য অর্থের নিজস্ব মূল্য স্থির ধরিয়া লইয়া, অর্থাৎ দামস্তর স্থির ধরিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয়। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যকার্যাদির অর্থমূল্যে

উপাদানের আয় হইতেই সেই কর আদায় করা হয়। নীট জাতীয় আয় হইতে করের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সকল ব্যক্তির ব্যয়োপযুক্ত আয়ের সমান (Disposable Income)। রাষ্ট্র কর্তৃক উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপন্নের মধ্যে যোগ করা দরকার। সরকারী কর্মচারীদের মাহিনাকে অবশ্যই মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে হিসাব করা প্রয়োজন, কারণ বিভিন্ন কার্যাদির পারিশ্রমিক হিসাবেই সেই আয়ের সৃষ্টি হয়।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income)

জাতীয় আয় হইল (ক) এক বৎসরের উৎপন্ন সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির মোট দাম ; (খ) সকল উপাদানের আয় সৃষ্টি হইবার উৎস ও ভাণ্ডার, এবং (গ) সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের যোগফল। সুতরাং ইহার পরিমাপ তিন ভাগে হইতে পারে। প্রথমত, সেই বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির দাম যোগ করিয়া ; দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের কার্যে সহায়তার দরুণ উপাদান-সমূহের সকল পাওনা (Payment) যোগ করিয়া, এবং তৃতীয়ত, সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয় যোগ করিয়া। এই তিনটি হিসাব স্বভাবতই সমান হইবে, কারণ মোট উৎপন্নের দামের সমষ্টি হইতে সকল উপাদানের আয় সৃষ্টি হয় ; মোট উৎপন্নের দাম সকল উপাদানের পাওনা লইয়াই গঠিত হয় ; এবং সমাজের মোট আয় সকলের হাতে ভোগব্যয় ও সঞ্চয় রূপে ছড়াইয়া থাকে। প্রথমটিকে বলা হয় সম্পূর্ণ-উৎপন্নের সমষ্টি (Final products total) ; দ্বিতীয়টিকে বলা হয় উপাদান-পাওনার সমষ্টি (Factor payments total) ; এবং তৃতীয়টিকে বলা হয় ভোগ-সঞ্চয়ের সমষ্টি (Consumption-Savings Total)। প্রথম পদ্ধতিতে সকল উৎপন্ন দ্রব্যকার্যাদির (goods and services) দাম যোগ করিয়া ; দ্বিতীয় পদ্ধতিতে, সকল উপাদানের পাওনা বা আয় যোগ করিয়া ; এবং তৃতীয় পদ্ধতিতে সকল ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ পরিমাপ

পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি

অর্থাৎ দামে কোন পরিবর্তন হইল না, অথচ দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইল, তাহা ঘটিতে পারে। ইহার ফলে জীবনযাত্রার মানে বাস্তব পরিবর্তন আনিবে, কিন্তু জাতীয় আয় পরিমাণগত ভাবে সমানই থাকিয়া যাইবে। যেমন পূর্বের ৪৲ ভিজিটের ডাক্তারের তুলনায় এখনকার একই দামের ডাক্তারের কার্য অনেক উন্নত ধরণের।

করা সম্ভব। সংখ্যাতাত্ত্বিকগণ (Statisticians) সাধারণত প্রথম দুইটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন, কারণ কোন ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিতে হিসাব করা সুবিধা (যেমন শিল্প, কৃষি, খনি ইত্যাদি) : আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতি সুবিধাজনক (যেমন ওকালতী, ডাক্তারী, শিক্ষকতা ইত্যাদি)। পরিমাপের পক্ষে তৃতীয় পদ্ধতি বিশেষ সুবিধাজনক নয়।

(ক) উৎপাদন-সুমারী পদ্ধতি বা সম্পূর্ণ-উৎপন্নের সমষ্টি (Census of Production Method or The Final Products Total)

এক বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যকার্যাদির অর্থ-মূল্য যোগ করিলে আমরা মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product) পাইতে পারি। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সর্বশেষ স্তরের উৎপন্ন দ্রব্যের দামই কেবলমাত্র যোগ দিতে হইবে। যে সকল দ্রব্য অর্ধ-উৎপন্ন অথবা উৎপাদনের মাধ্যমিক স্তরে (intermediate stages) রহিয়াছে, তাহাদের ধরা চলিবে না। যেমন আসবাব প্রস্তুতকারী যে-কাঠের সাহায্যে আসবাব উৎপাদন করিতেছে সেই কাঠের দাম যোগ দেওয়া হইবে না, কারণ তাহা উৎপাদনের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছায় নাই। কিন্তু যদি পুড়িবার জন্য কাঠ ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সেই কাঠের দাম হিসাব করিতে হইবে, কারণ তাহা সম্পূর্ণ দ্রব্য (Final Product) হিসাবেই ব্যবহৃত হইতেছে। এইভাবে হিসাব করিলে ডবল-গণনার (double counting) হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়, বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশে আমদানি হয়। রপ্তানি ও আমদানির মূল্যের পার্থক্য মোট জাতীয় আয় হিসাবের সময়ে যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে। যদি তুলনায় আমদানি বেশি হয়, তাহা হইলে বিয়োগ হইবে, যদি তুলনায় রপ্তানি বেশি হয়, তাহা হইলে যোগ হইবে।

এইভাবে মোট জাতীয়-আয় হিসাব করিয়া মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য কিছু অর্থ বাদ দিয়া নীট জাতীয়-আয়ের পরিমাপ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ দেশের সকলে মিলিয়া যে সকল ভোগ্যদ্রব্য বা কার্যাদি ক্রয় করিয়াছে তাহাদের দাম, গভর্ণমেণ্ট যাহা ক্রয় করিল তাহার দাম, নূতন মূলধনী দ্রব্যের দাম, এই সকল যোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

(খ) আয়-শুমারী পদ্ধতি বা উপাদান-পাওনার সমষ্টি (Census of Income Method or The Factor Payments Total)

এক বৎসরে দেশের, (ক) সমগ্র মজুরি, মাহিনা, ইত্যাদি (খ) সকল ফার্ম বা ব্যবসায়ের নীট আয় (মজুরি মাহিনা ইত্যাদি বাদ দিয়া, কারণ তাহা অন্যত্র ('ক'-তে) হিসাব করা হইয়াছে) ; (গ) সকল ঋণ হইতে নীট সুদ ; এবং (ঘ) সকল নীট খাজনা, এই সকল যোগের দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করা চলে।

এই ভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। (ক) হস্তান্তর-পাওনাসমূহ (Transfer Payments) বাদ দিতে হইবে। যেমন, একখণ্ড জমি বিক্রয় হইলে সেই পাওনা জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আসিবে না ; কারণ তাহা কোন নূতন আয় নহে, কোন নূতন উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর অর্থ মূল্য নয়। ভিক্ষুকের আয় বা কোন দান-গ্রহণও গণনার মধ্যে আসে না, কারণ ওইরূপ আয় কোন দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন ধারায় কাজ করিবার দরুণ সৃষ্টি হয় না। কোন দ্রব্যোৎপাদন বা কোন কাজকর্মের দরুণ যে আয় তাহাই জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে আসিবে। (খ) মালিকের নিজের যে সকল উপাদান (যেমন নিজের বাড়ী, জমি, পরিচালনা ক্ষমতা বা মূলধন) উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদের বাজার-দরের হিসাবে অর্থ-মূল্যে রূপান্তরিত করিয়া গণনার মধ্যে আনা প্রয়োজন। (গ) বিনা দামে যে সকল দ্রব্য বা কার্যাদি পাওয়া যাইতেছে (যেমন, বাড়িতে স্ত্রীলোকের কাজ বা নিজের বাগানের তরী-তরকারী) তাহাদের কোন আয় বা অর্থমূল্য সৃষ্টি না হওয়ায়—জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আনা হইবে না। (ঘ) ফার্মের মোট মুনাফার যে অংশ মজুত-তহবিলে (Reserve Fund) জমাইয়া রাখা হইয়াছে (অর্থাৎ যাহা লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ার-ক্রেতাদের আয় সৃষ্টি করে নাই), তাহাও যোগ দিতে হইবে। কারণ আয় হিসাবে ব্যক্তিদের হাতে না গেলেও ঐ মূল্য দেশে সৃষ্টি হইয়াছে।

(গ) ভোগসঞ্চয় পদ্ধতি বা ভোগসঞ্চয়ের সমষ্টি (Consumption-Saving Method or The Consumption Savings Total)

সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই আয়ের এক অংশ ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয় এবং অপর অংশ সঞ্চয় হয়। তাই এক বৎসরের মধ্যে সমাজের মোট ভোগ ব্যয়

ও মোট সঞ্চয় যোগ করিতে পারিলে নীট জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে পারা যায়।

সাধারণত ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না, তাই এই পদ্ধতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুবিধা নাই।

জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা (Difficulties in the measurement of National Income)

জাতীয় আয়ের পরিমাপ সকল দেশেই বহু বাস্তব অসুবিধার মধ্য দিয়া করিতে হয়; বিশেষত অনুন্নত দেশসমূহে অসুবিধার পরিমাণ বেশি। প্রথমত, যে সকল দ্রব্য বা কার্যাদি বিক্রয় হয় না অথবা বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসে না, তাহাদের ক্ষেত্রে বাজার-দাম কি হইতে পারিত ইহা ধরিয়া লইয়া জাতীয় আয়ের মধ্যে যোগ করিতে হয়। ইহা অসুবিধাজনক তো বটেই, হিসাবও নির্ভুল না হইবার সম্ভাবনা। অনুন্নত দেশসমূহে সমাজের মোট উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ উৎপাদকগণ নিজেরা ব্যবহার করেন। অনেক ক্ষেত্রে অর্থের প্রচলন কম; পণ্য-বিনিময় (Barter) প্রচলিত আছে। এই সকল দেশে অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা বিশেষ অসুবিধাজনক। দ্বিতীয়ত, অনুন্নত দেশে অধিক সংখ্যায় একক- মালিকানা ব্যবসায় সংগঠন প্রচলিত থাকায় এবং সাধারণভাবে ব্যবসায়ের হিসাবপত্র বৈজ্ঞানিকভাবে না রাখায়, উৎপাদনের পরিমাণ এবং দাম সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার সুবিধা কম। তৃতীয়ত, এই সকল দেশে উপাদানসমূহের বিশেষায়ণ (Specialisation) অনেক দূর প্রসার লাভ করে নাই। যেমন, একই ব্যক্তি চাষ করিয়া, মাছ ধরিয়া, বস্ত্রাদি উৎপাদন করিয়া এবং দোকান চালাইয়া আয় করে। জাতীয়-আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র-ভেদ করার (Classification of sectors), অর্থাৎ কোন্ ক্ষেত্র হইতে কি আয় হইল তাহা স্পষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার উপায় থাকে না।

অনুন্নত দেশে, যেমন ভারতবর্ষে, পরিমাপের বাস্তব অসুবিধা

কি বিষয়ের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে (Factors determining the size of the National Income)

জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে দেশের নীট উৎপাদন এবং বিদেশ হইতে নীট আয়ের উপর। এই দুইটি বিষয় লইয়াই জাতীয় আয় গঠিত।

প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ স্থির ধরিয়া লইলে, দেশের মোট উৎপাদন

নির্ভর করে কর্মনিয়োগের পরিমাণ ও শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতার উপর। দেশে মোট কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে দ্রব্যসামগ্রীর জন্য কার্যকরী চাহিদার (Effective Demand) উপর। কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অধিক দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনের জন্য অধিক শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে। অনুন্নত দেশে জীবনযাত্রা ও আয়ের স্তর এত নিচে যে কার্যকরী চাহিদা কম ; তাই শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কম।

কার্যকরী চাহিদা, মূলধন নিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্য

শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে প্রধানত শ্রমিক-পিছু মূলধন নিয়োগের অনুপাতের উপর। শ্রমিক-পিছু মূলধন-নিয়োগের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইবে, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা ততই বাড়িবার সম্ভাবনা। সুতরাং মূলধন ও তাহার নিয়োগের পরিমাণের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করিবে। বিদেশ হইতে নীট আয় নির্ভর করে দেশ কত কম আমদানি করিয়া চালাইতে পারে এবং কত বেশি রপ্তানি করিতে পারে তাহার উপর। এই সকল বিষয়ের উপর জাতীয়-আয়ের আয়তন নির্ভর করে।

মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখা (Maintaining Capital Intact)

উৎপাদন ধারায় মূলধনী দ্রব্য নিয়োগের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিয়া মূলধনের মূল্য পূর্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ রাখা—ইহাকে মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখা বা মূলধন বজায় রাখা বলে।

ক্ষতিপূরণ কিভাবে পরিমাপ করা হয়

যদি একটি যন্ত্রের দাম 500 টাকা হয় এবং ওই যন্ত্রটির আয়ু 10 বৎসর ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর উহার 10 ভাগের 1 ভাগ অর্থাৎ 10 টাকা ক্ষয় হইতেছে, এইরূপ মনে করা চলে। ওই যন্ত্রদ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হইতে এই পরিমাণ অর্থ (অর্থাৎ 50 টাকা) প্রতি বৎসর সরাইয়া রাখিলে 10 বৎসর পরে ওই যন্ত্রটি সম্পূর্ণ ক্ষয় হইলেও নূতন যন্ত্র ক্রয় করিবার মতন অর্থ সঞ্চিত হইবে, উৎপাদন ধারা অব্যাহত থাকিবে। যন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত পূরণ না হইলে 10 বছর পর যন্ত্রটি সচল থাকিবে না এবং ইহার ফলে ফার্মের আয় কমিয়া যাইবে।

'মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখা'র এই তত্ত্ব হইতে জানা যায় যে, ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত ভাবে পূরণ হইলে দেশে মূলধন বজায় থাকিবে। কিন্তু মূলধনের পরিমাণ একই থাকিলে

অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির (Economic growth) সম্ভাবনা থাকে না, সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামো একই স্তরে আবর্তন করিতে থাকে। সুতরাং মোট জাতীয় আয় হইতে শুধু ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্যই নহে, দেশে আরও যন্ত্রপাতি প্রসারের জন্য, ক্রমাগত অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতি বৎসর জাতীয় আয় হইতে আগের বৎসরের তুলনায় অধিকতর উপকরণ মূলধন-গঠনের উদ্দেশ্যে সরাইয়া লইলে দেশে ক্রমশ বর্ধনশীল হারে মূলধন-গঠন সম্ভব হয় এবং সেই মূলধন প্রয়োগের দ্বারা শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যায়।

মূলধন-গঠন ও অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি

জাতীয়-আয় বিশ্লেষণের তাৎপর্য : সামাজিক হিসাব গ্রহণ (Significance of National Income analysis : Social Accounting)

জাতীয় সম্পদ ও আয় সম্বন্ধে এমন ভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয় এবং শ্রেণীবদ্ধ করা হয় যে তাহা হইতে আমরা জাতীয় আয়ের গঠনকারী বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (Component parts) বুঝিতে পারি। যেমন ব্যবসাদি হইতে কি পরিমাণ মুনাফা, জমির মালিকানা হইতে কি পরিমাণ খাজনা, চাকুরি ইত্যাদি হইতে কি পরিমাণ মাহিনা, ঋণ-প্রদান হইতে কি পরিমাণ সুদ এবং পরিশ্রমের দরুণ কি পরিমাণ মজুরি দেশের লোকে পাইতেছে—এই সকল আমরা জানিতে পারি জাতীয় আয় বিশ্লেষণের সাহায্যে। জাতীয় অর্থ নৈতিক কাঠামো, ইহার সামগ্রিক রূপ, এক অংশের সহিত অপর অংশের সম্পর্ক, ইহার গতিপ্রকৃতি, সকল কিছু আমরা জাতীয় আয় গঠন-কারী অংশ-সমূহের বিভাগ হইতে বুঝিতে পারি। আয় ব্যয়ের ধরন (pattern of Income and Expenditure), জাতীয় উৎপাদনের কোন্ অংশে কি পরিমাণ মূলধন নিযুক্ত, কোন্ অংশে শ্রমিক-দক্ষতা কিরূপ, কোন্ অংশ হইতে মূলধন সরাইয়া আনিয়া কোন্ অংশে নিয়োগ করা দরকার—সবই এই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতে জানিতে পারা যায়। কতটুকু আয় সরাইয়া লইলে (কর, ঋণ ইত্যাদির সাহায্যে) মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায়, তাহাও জানা যায়। জাতীয় আয়ের উঠানামা (Fluctuations in National Income) রোধ করিতে হইলেও এই সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দেশের উপকরণ-সমূহের সর্বাধিক সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা সঞ্চয়ের ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনুমান করা চলে। এক দেশের

জাতির অর্থ নৈতিক কাঠামো ও গতি-প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়

অর্থ নৈতিক অবস্থার সহিত অপর দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার তুলনামূলক বিচারে জাতীয় আয়ের ধারণা খুবই সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের দ্বারা আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। একটি দেশের জাতীয় আয়ে উঠা নামা, অপর দেশের জাতীয় আয়কে কিরূপে প্রভাবিত করে, তাহার পর্যালোচনা জাতীয় স্বার্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন দেশের অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ও প্রগতির হার (**Rate of Economic Growth or Progress**) পরিমাপ করার ব্যাপারে ইহা খুবই কার্যকরী। আধুনিক ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ, তাই, কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা তৈয়ার করার সময়েও ইহা বিশেষ উপযোগী। কোন্ ক্ষেত্র হইতে উপকরণ সরাইয়া কোন্ ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইবে তাহা এই বিশ্লেষণ হইতেই জানা যায়। কোন্ ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগ করিলে যে-হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, অপর ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগের অনুপাত তত রাখিলে উৎপাদন হয়তো সেই হারে বাড়ে না।

অনুশীলনী

1. What is Macro-economics? Why marco-analysis has become important in our times?

2. Discuss the circular flow of a National Economy. Or, Give a total picture of the National Economy.

3. Define National Income and discuss how to measure it.

4. What precautions should be taken in computing the National Income of a country?

5. Discuss the need and importance of National Income calculation or Social Accounting.

6. Write a short note on : Social Accounting.

২

টাকার প্রকৃতি

The Nature of Money

টাকার উৎপত্তি ও ব্যবহারিক উপকারিতা (Origin and usefulness of Money)

প্রত্যেক দেশে সমাজ-বিবর্তনের প্রাথমিক কোন এক স্তরে অর্থের বা টাকাকড়ির আবিষ্কার ও চলন শুরু হইয়াছে। এমন সময় ছিল যখন ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজেই উৎপাদন করিত, দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে সে স্বাবলম্বী ছিল। সেই অবস্থায় বিনিময়ের প্রয়োজন হইত না এবং বিনিময়ের কোন মাধ্যম ব্যবহারের প্রয়োজনও ছিল না। ক্রমে সমাজে শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হইল, স্বাবলম্বিতা লুপ্ত হইয়া গেল, অন্যের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত নিজের উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম সৃষ্টি হইল। বহু প্রকার স্থূল ও অসুবিধাজনক দ্রব্যের সাহায্যে প্রথম যুগের বিনিময় চলিত, বর্তমানে উন্নত ধরনের মুদ্রা, কাগজীনোট, চেক, হুণ্ডি, বিনিময়-বিল বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছে।

বার্টার কাহাকে বলে

যখন হইতে গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত শ্রমবিভাগ শুরু হইয়াছে তখন হইতেই এক গোষ্ঠীর বা এক ব্যক্তির দ্রব্যের সহিত অন্য গোষ্ঠী বা অন্য ব্যক্তির দ্রব্য-বিনিময়ের সূচনা হইয়াছে। যখন পণ্যের সহিত পণ্য বিনিময় হইতেছে, বিনিময়ের মাধ্যম রূপে টাকা যেখানে উপস্থিত নাই, সেই প্রকার দ্রব্য বিনিময়কে বলা হয় 'অর্থ বিহীন পণ্যবিনিময়' বা বার্টার (Barter)। এই বার্টার প্রথায় পণ্যের সহিত পণ্যের সরাসরি বিনিময় হইয়া থাকে।

কিন্তু এই প্রথার বহুপ্রকার অসুবিধা আছে। বিনিময়কারী ব্যক্তিদের অভাবগুলি পরস্পরের পরিপূরক হওয়া চাই। বস্ত্র উৎপাদনকারী তাঁতী যদি

বস্ত্রের বিনিময়ে চাউল পাইতে চায় তবে তাহাকে কেবলমাত্র একজন চাষীর নিকট গেলেই চলিবে না, এমন একজন চাষী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যাহার ঠিক সেই পরিমাণ বিনিময়যোগ্য চাউল আছে, এবং তাঁতী যে-পরিমাণ ও যে-প্রকারের বস্ত্র বিনিময় করিতে ইচ্ছুক, চাষীরও ঠিক সেই পরিমাণ ও সেই প্রকার বস্ত্রের দরকার। এরূপ অবস্থায় বিনিময়ের গতিধারা নিয়মিত ভাবে চলিতে পারে না, যদি পরস্পরের পরিপূরক অভাবযুক্ত ব্যক্তি জুটিয়া যায় তবেই ইহা সম্ভব। এইরূপ বিনিময়ের মধ্যে আকস্মিকতা আসিয়া যায়। দ্বিতীয় অসুবিধা হইল, পণ্যবিনিময় প্রথায় একটি দ্রব্যকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করিয়া বিক্রয় বা ক্রয় করার সুবিধা নাই। কেহ যদি জামার বিনিময়ে এক সের চাউল পাইতে চায়, তবে সে কি জামাটাকে বহু অংশে বিভক্ত করিয়া একসের চাউল পাইবে? এইরূপ বৃহৎ দ্রব্যের সহিত ক্ষুদ্র দ্রব্যগুলি বিনিময়ের সুযোগ এই প্রথায় নাই। তৃতীয়ত, বার্টার প্রথায় প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত প্রত্যেকটি দ্রব্যের অসংখ্য বিনিময়-মূল্যের হার উদ্ভূত হয়। সমাজে এইরূপ অসংখ্য বিনিময়ের অনুপাত থাকিলে বিনিময়ের কাজ সুচারুরূপে চলিতে পারে না। চতুর্থত, টাকা না থাকিলে সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয় থাকিতে পারে না, কারণ দ্রব্যসামগ্রী বেশিদিন সঞ্চয় করিয়া রাখা চলে না। সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে সুবিধা অনুযায়ী ও ইচ্ছানুযায়ী বিনিয়োগ করাও চলে না।

বার্টার প্রথার অসুবিধা

পণ্য-বিনিময় প্রথার এই সকল অসুবিধা থাকায় বিনিময়ের সুবিধার জন্য নানা প্রকার মাধ্যমের ব্যবহার শুরু হইয়াছে। টাকা ব্যবহারের প্রথম যুগে যে-জিনিস সকলে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, সকলের নিকট প্রয়োজনীয়, সকলেই যাহা পাইতে চায়, যাহা বহন করা সুবিধাজনক, সেইরূপ কোন দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হইতে শুরু করিয়াছিল। গো-ধন, কড়ি, হাতীর দাঁত, কাঁচ প্রভৃতি দ্রব্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ও বাহিরে পণ্য-বিনিময়ের মাধ্যমরূপে প্রচলিত ছিল। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইলে ক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি বিনিময়ের উপযোগী মাধ্যমরূপে প্রচলিত হইয়াছে। বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ভালভাবে কাজ করিতে হইলে সেই দ্রব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকা দরকার। (১) দ্রব্যটিকে বহন করার সুবিধা থাকা চাই। বিনিময়ের মাধ্যমটি এমন হওয়া চাই যাহাতে ক্ষুদ্র আয়তন ও কম ওজনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ মূল্য নিহিত থাকিতে পারে। তাহা হইলেই ইহা স্থানান্তরে বহন করা সুবিধাজনক হইতে পারে। (২) বিনিময়ের মাধ্যমটি দীর্ঘস্থায়ী হওয়া চাই।

সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিময়ের মাধ্যম হইবার গুণসমূহ

কারণ, মূল্য ও ক্রয়শক্তি সঞ্চিত অবস্থায় অর্থের রূপে জমাট বাঁধিয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। ইহা অনবরত হস্তান্তরিত হইবে, তাই সমাজে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় সেইরূপ হওয়া দরকার। (৩) বস্তুটিকে বিভাগ-যোগ্য হইতে হইবে, যাহাতে উহাকে সমানভাবে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং উহাকে গলাইয়া উহার উপর সীলমোহর বা স্বাক্ষর মুদ্রণ করা সম্ভব হয়। (৪) বিনিময়ের মাধ্যমগুলি আকারে ও প্রকারে একই রকম হওয়া দরকার, একজাতীয়তা না থাকিলে লোকে উহা গ্রহণ করিতে চাহিবে না, উহার আদান-প্রদানে বিঘ্ন ও বিলম্ব দেখা দিবে। (৫) মাধ্যম বস্তুটি এরূপ হওয়া দরকার যে, সকলেই উহাকে সহজে চিনিতে পারে, বিনিময়ের কাজ যাহাতে ব্যাহত না হয়। (৬) বস্তুটির নিজস্ব মূল্য সাধারণভাবে মোটামুটি স্থির থাকা প্রয়োজন নতুবা বিনিময়ের অসুবিধা দেখা দিবে। যে-মানদণ্ডের সাহায্যে অপরাপর পণ্যসমূহের মূল্য পরিমাপ করা হইবে উহার নিজস্ব মূল্য সঠিক ও স্থির থাকা প্রয়োজন। সকল জিনিসের মূল্য-পরিমাপের আদর্শ মানদণ্ড হইতে হইলে মাধ্যম-বস্তুটির নিজ-মূল্যের ঘন ঘন পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয়।

আধুনিক কালে দেখা গিয়াছে, ধাতু দ্বারা নির্মিত মুদ্রার পরিবর্তে কাগজী নোটের প্রচলন তুলনামূলক ভাবে অধিকতর সুবিধাজনক। বিনিময়ের মাধ্যমবস্তু হইবার সকল প্রকার গুণই কাগজের আছে। কম মূল্যের বিনিময়-কার্যগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য অল্প মূল্যের ধাতু নির্মিত মুদ্রাও রহিয়াছে। কারণ অল্পমূল্যের বিনিময়ের পরিমাণ খুবই বেশি, এই উদ্দেশ্যে কাগজের নোট ব্যবহার করিলে উহা অতি দ্রুত ক্ষয় হইয়া বিনিময়ের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করিবে।

টাকার কাজ (Functions of Money)

বার্টার বা পণ্যবিনিময় প্রথার সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিয়া পণ্য-বিনিময়ের গতিধারাকে অব্যাহত রাখা ও মসৃণ করা টাকার প্রধান কাজ। বার্টার প্রথায় অভাবের পারস্পরিক পরিপূরকতা না থাকিলে বিনিময় হইতে পারে না, টাকার প্রচলন ঐরূপ আকস্মিকতা হইতে বিনিময়-প্রথাকে মুক্তি দেয়। পণ্য বিনিময়ের ধারার মধ্যে এইরূপে টাকা এক পণ্যের সহিত অপর পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কাজ করে।

মাধ্যম

দ্বিতীয়ত, টাকা হইল মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড বা মূল্যের মাপকাঠি। স্থানের পরিমাপের জন্য যেরূপ ফুট, গজ, মাইল; কালের পরিমাপের জন্য সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা ইত্যাদি; সেইরূপ সমাজে উৎপন্ন বিনিময়যোগ্য বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের পরিমাপের জন্য সাধারণ কোন মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন। অর্থের নামেই সকল দ্রব্যের মূল্যকে পরিমাপ করা হয়।

মানদণ্ড

তৃতীয়ত, সমাজে দেনাপাওনার হিসাব রাখার ব্যাপারে মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে টাকা। সমাজের অর্থ নৈতিক কাজকর্মে সকল সময়ে নগদ টাকার লেনদেন না-ও হইতে পারে, বরং আধুনিককালে ঋণের সাহায্যে অর্থ নৈতিক কাজকর্ম চলিতেছে। ঋণের পরিমাণ ও মূল্য সঠিকভাবে স্থির রাখা টাকার অন্যতম প্রধান কাজ। কোন ব্যক্তি যে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য বর্তমানে ঋণ গ্রহণ বা প্রদান করিতেছে সে সেই পরিমাণ মূল্যই ফেরৎ পাইবে বা দিবে। টাকা ঋণ প্রদান ও ঋণ-পরিশোধের ভিত্তি হওয়ার ফলে ঋণ লেনদেনের প্রচুর সুবিধা হইয়াছে। ঋণের বাজার সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে প্রচুর পরিমাণে অর্থের ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ চলিতেছে, উৎপাদন ও যাবতীয় অর্থ নৈতিক কাজকর্মের সুবিধা হইয়াছে। ভবিষ্যতের বাজার ও বর্তমানের বাজারের মধ্যে, দূরবর্তী স্থানের বাজারসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। টাকাই হইল এইরূপ ঋণ লেনদেনের মাপকাঠি।

ঋণের মাপকাঠি

চতুর্থত, মূল্যকে বিশেষ একটি আকারে বা রূপে সঞ্চয় করিয়া রাখা অথবা মূল্যের সঞ্চিত রূপ হিসাবে কাজ করা টাকার কাজ। ইহা হইল জমাট বাঁধা ক্রয়শক্তি; ভবিষ্যতে ব্যয়ের জন্য বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে ইহাকে জমাইয়া রাখিতে পারে। এই ক্রয়শক্তি সে অপর কাহাকেও দিতে পারে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই ক্রয়শক্তির উপর অধিকার ছাড়িয়াও দিতে পারে। অন্য কোন আকৃতিতে এই সম্পত্তি বা ক্রয়শক্তি পরিবর্তিত করা যায়, রূপান্তরিত করা চলে, তাই টাকাকে বলা হয় তরল সম্পত্তি (Liquid asset)। সমাজে উৎপন্ন পণ্যের মূল্যসমূহ যেন টাকার আকৃতিতে লোকের হাতে ক্রয়-শক্তির রূপ ধরিয়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে—তাই টাকা হইল মূল্যেরই সঞ্চিত রূপ।

মূল্যের সঞ্চিত রূপ

টাকার এই সকল কাজ হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক সমাজে ইহার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। টাকা প্রচলনের দরুণ লোকেরা অর্থ নৈতিক দিক

হইতে ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। টাকা ব্যবহারের দরুণ পারস্পরিক পণ্য বিনিময়ের কাজ বাজার-যোগান ও বাজার-চাহিদায় রূপান্তরিত হয়। জিনিসপত্রের লেনদেন মূলত নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal) হইয়া উঠে। পণ্যবিনিময় যুগের তুলনায় এই ব্যবস্থায় বিনিময়ের স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা ও নির্দিষ্টতার বাধা অপসারিত হয়। দ্রব্যগুলিকে আর মানুষের শ্রমজাত সামগ্রী বলিয়া মনে হয় না; মানুষের শ্রমনিরপেক্ষ নিজস্ব গতিসম্পন্ন কোন জিনিসপত্র বলিয়া ইহারা প্রতিভাত হয়। যোগান, চাহিদা ও বাজারের শক্তিসমূহের ক্রিয়াকলাপ দেখা দিতে থাকে। দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শ্রমের বদলে অদৃশ্য এই বাজারী শক্তিসমূহ দ্রব্যের দাম নির্ধারণে প্রধান প্রভাব বলিয়া মনে হয়। বিনিময় ব্যবস্থার প্রসার ঘটে, দেশের অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্ম বেচাকেনার জন্য বাজারে উপস্থিত হইতে থাকে। টাকার পরিমাণ বাড়াইলে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়ের পরিমাণ বিপুল পরিবর্তন আসে, সমাজের শ্রেণীবিন্যাসে প্রভূত পরিবর্তন সূচিত হয়।

অর্থের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Money)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে যে-সকল ধরনের অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় উহাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। প্রথমত, অর্থকে হিসাবী-অর্থ (Money of account) এবং প্রকৃত-অর্থ (Actual money) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রকৃত অর্থ হইল, যে-মুদ্রার বা কাগজী নোটের সাহায্যে সমাজে

হিসাবী অর্থ ও বাস্তব অর্থ

বিনিময়ের কাজকর্ম চলে, যেমন পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স অথবা আমাদের দেশে ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত টাকা বা কাগজী নোটের টাকা। হিসাবী-অর্থ হইল যে-নামে একটি দেশের অর্থ-নৈতিক কাজকর্ম ও বিনিময়ের লেনদেনের হিসাব রাখা হয়। সব দেশেই এমন একটি নাম থাকে যাহার দ্বারা সমস্ত হিসাব পাররক্ষিত হয়, যেমন বৃটেনে স্টার্লিং, আমেরিকায় ডলার, ফ্রান্সে ফ্রাঙ্ক, রাশিয়ার রুবল্ ইত্যাদি। হিসাবী-অর্থ হইল সেই দেশের অর্থের নাম বা উপাধি মাত্র, প্রকৃত অর্থ হইল যে-বস্তুটি বিনিময়ের মাধ্যমরূপে হস্তান্তরিত হয়। নাম বা উপাধি স্থির ও সমান থাকিতে পারে, আসল অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। যেমন আমাদের দেশে টাকা এই নামটি হিসাবী-অর্থরূপে বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে, 1941 সালের পূর্বে প্রত্যেকটি

প্রকৃত মুদ্রাতে 160 গ্রেন রৌপ্য থাকিত, কিন্তু বর্তমানে প্রকৃত মুদ্রা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, ইহা নিকেলে প্রকৃত বা কাগজী নোট।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃত অর্থকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, ধাতব অর্থ (Commodity money) ও প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ (Representative money)। ধাতব অর্থ হইল যাহা ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত এবং যাহার উপরিলিখিত-মূল্য (Face-value) উহার অন্তর্নিহিত ধাতুর (Intrinsic value) মূল্যের সমান। এই ধাতব অর্থ যেরূপ বিনিময়ের মাধ্যম, তেমনই মূল্যের সঞ্চয়। কিন্তু প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হইলেও মূল্যের সঞ্চয় নহে। এই প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থকে (যেমন, কাগজী নোট) আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, রূপান্তর-যোগ্য (Convertible) ও রূপান্তরের অযোগ্য (Inconvertible)। যদি সেই কাগজী নোট ও প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থকে ধাতব অর্থে পরিবর্তিত করা যায় অর্থাৎ যদি আর্থিক কর্তৃপক্ষ কাগজী নোটের পরিবর্তে দেশের জনসাধারণকে ধাতব অর্থ দিতে বাধ্য থাকেন, তবে সেই অর্থকে রূপান্তর-যোগ্য প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ বলা যাইতে পারে। অপর পক্ষে, যদি আর্থিক কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থের পরিবর্তে ধাতব অর্থ দিতে বাধ্য না থাকেন, তবে উহাকে অরূপান্তরণীয় প্রতিনিধি-স্থানীয় অর্থ বলা হইয়া থাকে।

ধাতব অর্থ ও প্রতি-নিধিত্বমূলক অর্থ

তৃতীয়ত, অর্থকে আইন-সিদ্ধ অর্থ (Legal tender) এবং ঐচ্ছিক অর্থে (Optional money) বিভক্ত করা যাইতে পারে। আইন-সিদ্ধ অর্থ হইল যাহার সাহায্যে যে-কোনরূপ বিনিময় করা সম্ভব এবং সমাজের সকল ব্যক্তি ঐ অর্থ দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে বা প্রদান করিতে বাধ্য। আইন যাহাকে অর্থ বলিয়া স্বীকার করে এবং জনসাধারণকে অর্থ হিসাবে মানিয়া লইতে চাপ দেয়, যাহা কেহ অর্থ বলিয়া স্বীকার না করিলে তাহা আইন-বিরোধী কাজ হয়, তাহার নাম আইন-সিদ্ধ মুদ্রা। ইহাকে প্রচলিত প্রধান অর্থও (Standard money) বলা হয়। ইহা ব্যতীত সমাজে আর একরূপ অর্থের প্রচলন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইল ঐচ্ছিক অর্থ। এই অর্থকে আমানতী অর্থও বলা যাইতে পারে। বর্তমান সমাজে বেশির ভাগ লেনদেন নগদ অর্থে হয় না, অন্তত বেশির ভাগ বৃহৎ লেনদেন প্রায়ই চেকের সাহায্যে হইয়া থাকে। লোকে ব্যাঙ্কে যে-অর্থ আমানত রাখে

আইন সিদ্ধ অর্থ ও ঐচ্ছিক অর্থ

তাহার ভিত্তিতে চেক কাটিয়া সে দেনা মিটায়। এইরূপে যে-বিনিময় কাজ চলে তাহার মাধ্যম হইল চেক। আমানতকারীর উপর লোকের আস্থা আছে—এই জন্যই স্ব-ইচ্ছায় পাওনাদার চেক গ্রহণ করে, আইন তাহাকে জোর করিয়া চেক গ্রহণে বাধ্য করিতে পারে না। তাই ইহার নাম ঐচ্ছিক অর্থ। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের খাতাতেই হিসাব রক্ষিত হয়, সকল ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক দেনা-পাওনা কাগজে পত্রেই শেষ হইয়া যায়, ইহাব দরুণ নগদ অর্থ প্রচলনের কোনরূপ প্রয়োজন হয় না। চেক, যেহেতু বিনিময়ের মাধ্যম, সুতরাং ইহাও বিনিময়-ক্ষেত্রে প্রায় টাকার কাজ করে।

অর্থ বা টাকার প্রকৃতি (The Nature of Money)

সমাজবদ্ধ সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিচার করিলে দেখা যায় টাকাকড়ি বা অর্থের লেনদেনই এই সম্পর্কের ভরকেন্দ্র। সমাজের মানুষে মানুষে বহুবিচিত্র সকল প্রকার সম্পর্কের কেন্দ্রস্থল হইল টাকা। অর্থ বা টাকাকড়ির বৈশিষ্ট্য হইতে ইহা দেখা গিয়াছে। প্রথমত, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বেশির ভাগ দেনাপাওনাই টাকা দিয়া মেটানো হয়। জিনিসপত্র বা অপরের কাজকর্ম ক্রয় করা, শেয়ার ও বণ্ড কেনা, করপ্রদান সমস্ত কিছুই করা হয় টাকার সাহায্যে। এই কথাটির গভীর তাৎপর্য আছে। আমরা সকলে আমাদের সকল আয় পাই টাকার মাধ্যমে; আমরা টাকা আয় করি এবং টাকাই ব্যয় করি। অপর কাহারও নিকট কোন-না কোন উপকরণ বিক্রয় করিয়াই আমাদেব আয় হয়, তাই টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া আমাদের আয় হয় টাকা। দ্বিতীয়ত, যত রকম বিভিন্ন পদ্ধতিতে লোকে তাহাদের সম্পদ হাতে রাখে, তাহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হইল এই টাকা। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রায় প্রতিটি ব্যক্তির কিছু-না-কিছু পরিমাণ টাকা হাতে আছে, কম হউক বা বেশি হউক।

টাকার দুইটি বৈশিষ্ট্য
১। টাকার রূপেই আয় দেখা দেয়

সমাজে বহু রকমের সম্পদ আছে, যেমন ঘর বাড়ি, জায়গা-জমি, খনি-কারখানা, শেয়ার, বণ্ড প্রভৃতি। কোন ব্যক্তির হাতে এই সকল বিষয় থাকিলে তাহার মনে হয় যে, সেই দ্রব্যটি বা অপর কোন কিছুর উপর তাহার অধিকার আছে। টাকাও এক ধরনের সম্পদ, ইহারও মূল কথা হইল অধিকার বা দাবি (claim)। কাগজের নোট হাতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দাবি থাকে, আবার চেক বই হাতে থাকিলে ব্যাঙ্কের উপর দাবি থাকে। অবশ্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য

২। ইহা দাবি বা অধিকার প্রকাশ করে

আছে। নগদ টাকা সকলে লইতে রাজি, কিন্তু পরিচিত লোক ছাড়া অন্য কেহ বিনা দ্বিধায় চেক লইতে রাজি নয়। উপরন্তু, দাবি বা অধিকার বলিলে আর একটি কথা বোঝা যায়। টাকার সাহায্যে যে-কোন জিনিস কেনা যায় বলিয়া আমরা বলিতে পারি যে, টাকা হাতে থাকিলে সমাজের সকল প্রকার দ্রব্যের উপর অধিকার বা দাবি জন্মায়। অর্থের বা টাকার সংজ্ঞা হিসাবে আমরা তাই বলিতে পারি, সমাজের সকল প্রকার বিনিময়যোগ্য দ্রব্যের উপর সাধারণভাবে যে-জিনিসটির দাবি বা অধিকার আছে, তাহাই টাকা।

এই দাবি বা অধিকার আরও কিছুর মধ্যে দেখা যায়

টাকা বা অর্থের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে টাকা ছাড়া সমাজের অন্যান্য প্রকার সম্পদের কথাও অল্প আলোচনা করা দরকার। টাকা ছাড়া সমাজে আরও কতকগুলি জিনিসের মধ্যে এই অধিকার বা দাবি আছে। এক ব্যক্তির হাতে যদি এমন একটি কাগজ বা দলিল থাকে যাহার সাহায্যে সে অল্প কিছুদিনের মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু পরিমাণ টাকা পাইবে, তাহা হইলে সেই দলিলটি নিশ্চয় এক ধরনের সম্পদ। ইহা টাকা নয়, কারণ সমাজের সর্বসাধারণ লেনদেনের ক্ষেত্রে সেই দলিলটি গ্রহণ করিতে না-ও রাজি হইতে পারে। তাহা ছাড়া, এই সকল দলিল বা ঋণপত্র হইতে এক ধরনের আয় পাওয়া যায় তাহাকে সুদ বলে।

বিল ও বণ্ড কাহাকে বলে

যে-সকল দলিল বা ঋণপত্র হইতে সুদ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে দুই ধরনের ঋণপত্র সম্পর্কে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার, ইহারা হইল বিল এবং বণ্ড। যে-সকল ঋণপত্রের নাম বিল, তাহাতে লেখা থাকে নির্দিষ্ট কিছুকাল পরে (সাধারণত 3 মাস) উল্লিখিত কিছু পরিমাণ টাকা দেওয়া হইবে। সুদের হার সম্পর্কে বিলে কোন কিছু লেখা থাকে না। লেখা না থাকিলেও সুদের হারের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, তাহা নয়। 1000 টাকার একটি বিল যদি আমি 990 টাকা দিয়া ক্রয় করি, তবে এই 990 টাকা খাটাইয়া তিনমাস পরে আমার 10 টাকা বেশি আয় হইল। ইহাই সুদ। আমরা হিসাব করিয়া বলিতে পারি যে, তিনমাসে 1%-এর অল্প একটু বেশি সুদের হারে আমি টাকা খাটাইলাম। বণ্ডের বিষয় একটু পৃথক। এইরূপ দলিলে লেখা থাকে যে, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সাধারণত এক বছরের শেষে, নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ টাকা সুদ হিসাবে এই দলিলের মালিক পাইবে। এই প্রতিশ্রুতি কয়েক বছরের জন্য দেওয়া হইতে পারে,

তাহার পরে যে-মূলধন ঋণ লওয়া হইয়াছিল উহা ফেরৎ দেওয়া হয়। আবার এই প্রতিশ্রুতি অনির্দিষ্ট কালের জন্যও হইতে পারে।

বিল ও বণ্ডের মধ্যে এই পার্থক্য হইতেই জানা যায় সমাজে কত বিচিত্র ধরনে সুদের উদ্ভব হয়; এবং সুদ প্রদানশীল এই দলিলগুলি কত সূক্ষ্মভাবে শ্রেণীবিভক্ত। প্রথমত, বিল ও বণ্ড হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঋণের উপর সুদ দিবার প্রতিশ্রুতি দুইটি ধরনে প্রকাশ করা যাইতে পারে—ঋণ পরিশোধের মধ্যে ইহা লুকানো থাকিতে পারে (যেমন বিলের ক্ষেত্রে); অথবা পৃথকভাবে ইহা উল্লিখিত থাকিতে পারে (যেমন বণ্ডের ক্ষেত্রে)। দ্বিতীয়ত, ঋণ পরিশোধ পাইবার জন্য ঋণ-দাতাকে কতদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে সেই বিষয়েও ইহাদের মধ্যে বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। বিলকে সাধারণত গণ্য করা হয় স্বল্পকালীন ঋণ বলিয়া, আর বণ্ডকে গণ্য করা হয় দীর্ঘকালীন ঋণ হিসাবে। সাধারণত সুবিধার জন্য এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধ্য ঋণকে স্বল্পকালীন ঋণ বলে, আর উহার বেশি দিনের জন্য পরিশোধ্য ঋণকে দীর্ঘকালীন ঋণ বলে।

ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি

বিল ও বণ্ড ছাড়াও, আধুনিক সমাজে আর এক গুরুত্বপূর্ণ ধরনের দাবি বা অধিকার দেখা দিয়াছে, উহারা হইল শেয়ার বা স্টক। কোন একটি কোম্পানীর সম্পত্তির উপর মালিকানার অংশীদারত্ব স্বীকার করিয়া এই শেয়ার-গুলি সর্বসাধারণের ক্রয়ের জন্য বাজারে ছড়ানো থাকে; ইহাদের ক্রয় করিলে কোম্পানীর কিছু পরিমাণ মুনাফার উপর অধিকার বা দাবি জন্মায়। শেয়ার হইতে আয় সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, কোম্পানীর পরিচালনার সাফল্যের উপর নির্ভর করে আয় হইবে কি না, এমন কি মূলধনের বাজার-মূল্য বজায় থাকিবে কি না। এই সকল শেয়ারের ক্রয় সম্পর্কে তাই ঝুঁকি লইতে হয়, বিভিন্ন রকমের শেয়ার থাকে বলিয়া কেউ কম বা কেউ বেশি ঝুঁকি লইতে পারেন।

ইহাদের সঙ্গে শেয়ারের পার্থক্য আছে

ইহা ছাড়াও সমাজে বহু প্রকার সম্পত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বহু বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, যে-রূপ ধারণ করিলে মালিকের সুবিধা হয়, ইহারা সেইরূপে অবস্থিত থাকে, যেমন ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, জায়গা-জমি, রাস্তাঘাট প্রভৃতি। সমগ্র দেশের দিক হইতে দেখিতে গেলে সমাজের মোট সম্পদ এই সকল বিভিন্ন রূপ লইয়া অবস্থান করে।

এই সকল ছাড়া বহুবিধ রূপে সমাজে সম্পদ অবস্থান করে

টাকা (money) ; বিভিন্ন প্রকার দাবি ও অধিকার (claims) ; এবং এই সকল সম্পত্তি (assets) – ইহা ছাড়া, আর এক ধরনের সম্পদ (wealth) আছে, যাহাদের উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। ইহাদের কোন বাস্তব রূপ নাই, ইহারা অশরীরী সম্পত্তি (incorporeal assets), যেমন ব্যবসায়ের সুনাম (good will), সরকারী মালিকানা স্বীকার (patent) rights), ব্যক্তির দক্ষতা ও জ্ঞান প্রভৃতি (skill and knowledge)। এই সকল বিষয়কে কেবলমাত্র উহার মালিকের দৃষ্টিতে দেখিলেই সম্পদ বলা চলে ; সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী ইহাদের আমরা মোট সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি না।

কতকগুলির আবার বাস্তব রূপ নাই

আর্থিক বিশ্লেষণের তাৎপর্য (Significance of Monetary Analysis)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, অর্থসংক্রান্ত ঘটনাসমূহ সমাজের প্রকৃত ঘটনার রূপ ও গতি-প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে ; বিনিময়-কাঠামোর প্রকৃত গতিবিধি অর্থরূপ পর্দার অন্তরালে ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা তাই প্রধানত উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগ-কার্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন, যোগান ও চাহিদার 'প্রাকৃতিক' নিয়মসমূহ অর্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না, অর্থ এই সকল নিয়মের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ বা বিকৃত করিতে পারে না ; অর্থনৈতিক আচরণ (economic behaviour) নিরূপণকারী এই সকল মৌলিক নিয়মসমূহ আর্থিক বিষয়ের দ্বারা বিচলিত হয় না।

ক্লাসিকাল ধারণা

এইরূপ ধারণা থাকার মূল কারণ হইল, তাঁহারা অর্থের নিজস্ব মূল্য অপরিবর্তিত মনে করিতেন। বলা চলে, তাঁহারা কার্যত অর্থের মূল্যকে স্থির বা অপরিবর্তনশীল ধরিয়া লইতেন। অর্থের মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ সমাজের সামগ্রিক দামস্তর স্থির ধরিয়া লইলে আর্থিক বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন থাকে না, অর্থের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করিয়া পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের দাম বা ফার্ম বা শিল্পের ভারসাম্যাবস্থা বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হয়।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থের মূল্য কখনই স্থির থাকে না, দাম-স্তর সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল, ইহা ধরিয়া লইয়াই আধুনিক কালের আর্থিক তত্ত্বসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থের মূল্য বা দামস্তরের ভারসাম্য যে-সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ আর্থিক ভারসাম্যের (Monetary equilibrium) শর্ত-নিরূপণ

আধুনিক ধারণা

বর্তমান যুগের আলোচনায় অন্যতম প্রধান অংশ গ্রহণ করে। অর্থের মূল্যকে অস্থির ও চঞ্চল গণ্য করিয়াও তাহাকে স্থির ও অচঞ্চল রাখার প্রয়াস আধুনিক ধনবিজ্ঞানে আর্থিক তত্ত্বের লক্ষ্য।

অর্থ ও সমাজ-দেহ

আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে গতিশীলতা আনিয়া দেওয়া ব্যাপক অর্থ-ব্যবহারের প্রধান ফল। বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু বন্ধন অর্থের অন্যতম প্রধান কাজ এবং ইহারই ফলে সমাজে এই গতিশীলতার সৃষ্টি হয়। ভবিষ্যতের দামস্তর বা অর্থের মূল্য সম্বন্ধে ধারণা বর্তমান কালের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। অর্থের ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন সমগ্র সমাজের মোট উৎপাদন, মোট কর্মনিয়োগ, মোট আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে পরিবর্তিত করিয়া সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করিতে পারে। সমাজের বহু সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য করে এই অর্থ ; এবং তাই আর্থিক নীতি ও কৌশল (Monetary policy) অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশলের (Economic policy) অবিচ্ছেদ্য অংশ। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ অর্থের মূল্যকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহেন, যাহাতে সমাজে উৎপাদন, পূর্ণ কর্মসংস্থান বা অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ও অর্থের ভূমিকা

কিন্তু আর্থিক তত্ত্বালোচনা যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, ইহা প্রধানত স্বল্পকালীন বিশ্লেষণ, কারণ স্বল্পকালেই আর্থিক শক্তিগুলির প্রভাব তীব্রভাবে অনুভব করা যায়, দামস্তর এবং আয়স্তর বিশেষভাবে উঠানামা করে। সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির (Economic growth) দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে আর্থিক তত্ত্বসমূহের গুরুত্ব অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অনেক কম ; উহার আলোচনায় যন্ত্র-কৌশলগত (Technological), প্রতিষ্ঠানগত (Institutional) এবং কাঠামোগত (Structural) বিষয়ের পরিবর্তন প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

ইহাও মনে রাখা দরকার যে, আর্থিক পদ্ধতিসমূহ অন্যান্য অনার্থিক (non-monetary) পদ্ধতিসমূহের সাহায্য লাভ ব্যতীত কোন সময়েই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। শুধু আর্থিক ও কর-কৌশল (Monetary and fiscal policies) সমাজের সকল মৌলিক সমস্যার মূলোদ্‌ঘাটন ও সমাধান করিতে পারে না। রবার্টসন বলিয়াছেন, "সমাজের প্রকৃত অর্থনৈতিক আপদ

(economic evils) হইল অপ্রচুর উৎপাদন এবং অসম বণ্টন. ইহারা নিছক আর্থিক মলমের প্রয়োগে দূর হইবার নয়"। সুতরাং আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ যতই শুধু আর্থিক সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করুন-না-কেন, সমাজের মৌলিক ও প্রকৃত শক্তিসমূহের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে অর্থের বিশ্লেষণকে প্রধান স্থান দেওয়া চলে না।

অনুশীলনী

1. What is money ? Discuss its chief functions.

2. What were the difficulties of Barter Economy ? How money has facilitated economic transactions ?

3. Money has been classified in your text book as follows :

(i) Standard money.

(ii) Representative money.

(iii) Credit money :—(a) Token money, (b) Government Notes, (c) Bank Notes. Explain and illustrate this classification.

4. Define Money. "There are different degrees of money." Explain.

5. Discuss the Significance and role of Money in a modern economy.

৩

আৰ্থিক ব্যবস্থা

Monetary Systems

যে পদ্ধতিতে কোন দেশের অর্থ প্রচলিত রাখা হয় এবং তাহার পরিমাণ ও মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহাকে আৰ্থিক ব্যবস্থা বলে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে তিনপ্রকার আর্থিক ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় ; একধাতুমান, দ্বিধাতুমান এবং কাগজীমান। একধাতুমান ব্যবস্থায় আইনসিদ্ধ মুদ্রা স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা প্রস্তুত হয়। এরূপ ব্যবস্থায় ইহাকে হয় স্বর্ণমান অথবা রৌপ্যমান বলা হয়। দ্বিধাতুমান অবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুদ্বারা প্রস্তুত দুই প্রকার মুদ্রা প্রচলিত থাকে ; ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়-হার সরকারীভাবে নির্দিষ্ট থাকে। কাগজীমান অবস্থায় কাগজের নোটসমূহ আইনসিদ্ধ অর্থরূপে সমাজ-দেহে প্রচলিত থাকে।

আৰ্থিক ব্যবস্থা কাহাকে বলে এবং উহা কয় প্রকার

দ্বিধাতুমান (Bimetallism)

দ্বিধাতুমানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে দুইটি ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা আইনসিদ্ধ ভাবে প্রচলিত থাকিবে যেমন (সোনা ও রূপা); সরকারীভাবে নির্দিষ্ট বিনিময়-হার অনুযায়ী ইহাদের পারস্পরিক বিনিময় হইবে ; দেশে মুদ্রায়ন (coinage) প্রচলিত থাকিবে, অর্থাৎ সোনা এবং রূপা লইয়া টাঁকশালে গেলে কোন খরচ না লইয়া বা অতি অল্প ব্যয়ে মুদ্রা প্রস্তুত করা সরকারী নীতিসম্মত। যখন এরূপ নিয়ম থাকে যে, একটি ধাতু মুদ্রায়নের জন্য গৃহীত হয় এবং অন্য ধাতুটি গৃহীত হয় না ; তখন তাহাকে খঞ্জমান (Limping Standard) বলা হয়।

দ্বিধাতুমানের বৈশিষ্ট্য

দ্বিধাতুমানের বহু সুবিধা আছে। প্রথমত, স্বর্ণমান বা রৌপ্যমানের তুলনায় এই ব্যবস্থায় দামস্তর অধিকতর স্থির থাকে। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের

প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ বাড়ানো সহজ হয়, কারণ কোন একটি ধাতুর যোগান কম পড়িলে অন্য ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো যায়। অথবা, যখন কোন একটি ধাতুর যোগান বৃদ্ধি পাইতেছে তখন অপর ধাতুটির যোগান কমিয়া যাইতে পারে, ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা এড়ানও সম্ভবপর। শুধু স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে, পৃথিবীর সকল দেশেই স্বর্ণের প্রয়োজন বেশি হইত। এই অবস্থায় স্বর্ণের যোগান পর্যাপ্ত না হইবার সম্ভাবনা; ফলে দামস্তর নামিয়া আসিতে পারে এবং ব্যবসায় সংকট শুরু হইতে পারে। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে ইহা সুবিধাজনক, কারণ তাহারা যে-কোন ধাতুর সাহায্যে নিজেদের নিম্নতম জমার ভাণ্ডার রক্ষা করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, রৌপ্য-উৎপাদনকারী দেশসমূহ রৌপ্য বিক্রয় করিতে না পারিলে নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে পারিত না; তাই রৌপ্যের অর্থগত ব্যবহারের ফলে তাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকিতে পারে। এই যুক্তি একসময়ে দ্বিধাতুমানের স্বপক্ষে প্রবলভাবে প্রচারিত হইল। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক দ্বিধাতুমান আপনাআপনি বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির রাখে, কারণ স্বর্ণ ব্যবহারকারী দেশসমূহ এবং রৌপ্য ব্যবহারকারী দেশসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে ধাতু-বিনিময় সম্ভবপর হইয়া থাকে। যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়-হার নির্দিষ্ট থাকে, সেই কারণে বৈদেশিক বিনিময় হারও স্থির থাকে।

সুবিধা

দ্বিধাতুমানের অসুবিধা হইল, যদি দুইটি ধাতুর উৎপাদন ও যোগান পরস্পর-বিরোধী দিকে না হইয়া একই দিকে ধাবিত হয়, তাহা হইলে ফলে হয় প্রবল মুদ্রাস্ফীতি নতুবা প্রবল মুদ্রাসঙ্কোচন ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের পক্ষে দ্বিধাতুমান বজায় রাখা শক্ত, কারণ গ্রেশামের নিয়ম অনুযায়ী স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাজার-মূল্য সরকারী মূল্য হইতে পৃথক হইলে 'নিকৃষ্ট' অর্থ (অর্থাৎ বাজারে যাহার মূল্য কমিয়া গিয়াছে) বা এইরূপ ধাতু মুদ্রা 'উৎকৃষ্ট' অর্থকে, (অর্থাৎ বাজারে যাহার মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে) এইরূপ ধাতুমুদ্রাকে বাজার হইতে অপসারিত করে। দুইটি ধাতুমুদ্রা লইয়া ফাটকাদারি বৃদ্ধি পায়, দেশের বিনিময়-কাঠামো বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা যায় যে, কার্যত একধাতুমান প্রচলিত থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল দেশ যদি দ্বিধাতুমান গ্রহণ করে, তবেই ইহার সাফল্য সম্ভবপর।

অসুবিধা

আধুনিক কালে দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা কোথাও প্রচলিত নাই এবং ভবিষ্যতেও প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে। কাগজী অর্থের বহুল ও ব্যাপক প্রচলন রৌপ্যের পুনরর্থীকরণের (Remonetisation of silver) সম্ভাবনা বিশেষভাবে কমাইয়া দিয়াছে।

গ্রেশামের নিয়ম (Gresham's Law)

ইংলণ্ডে টিউডাব রাজবংশের স্বেচ্ছাচারী রাজবৃন্দ নিকৃষ্ট মুদ্রা বাজারে প্রচলন করিয়াছিলেন। এলিজাবেথ রাণী হইয়া ওই নিকৃষ্ট ধরণের মুদ্রাগুলিকে অসম্মানজনক বিবেচনা করিয়া উৎকৃষ্ট ধরণের মুদ্রা প্রচলিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি যতই উৎকৃষ্ট মুদ্রা বাজারে ছড়ান না কেন, নিকৃষ্ট মুদ্রাগুলি প্রচলিত হইতে লাগিল, উৎকৃষ্ট মুদ্রাসমূহ বাজার হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। রাণী বার বার চেষ্টা করিয়াও উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বাজারে প্রচলিত করিতে পারিলেন না, অবশেষে তাঁহার আর্থিক উপদেষ্টা টমাস গ্রেশামকে ইহার কারণ দর্শাইতে বলিলেন। গ্রেশাম এই ঘটনার যে-কারণগুলি দেখাইলেন, তাহাই পরে গ্রেশামের নিয়ম নামে পরিচিত হইল।

উৎপত্তি

গ্রেশামের নিয়ম হইল, কোন সমাজে যদি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ধরনের অর্থ পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তবে নিকৃষ্ট অর্থ উৎকৃষ্ট অর্থকে প্রচলন ধারা হইতে অপসারিত করিয়া দেয়। যদি গুণ বা মূল্যের দিক হইতে পৃথক একটি উৎকৃষ্ট ও একটি নিকৃষ্ট প্রকার অর্থ একই সঙ্গে আইন-সিদ্ধ অর্থ হিসাবে বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে কিছুদিন পরে দেখা যাইবে উৎকৃষ্ট প্রকার অর্থ আর প্রচলন-ধারার মধ্যে নাই, নিকৃষ্ট প্রকার অর্থ-ই সমাজের সকলের মধ্যে হস্তান্তরিত হইতেছে। 'যখন উভয়েই সীমাহীনভাবে আইনসিদ্ধ, তখন নিকৃষ্ট-প্রকার অর্থ উৎকৃষ্ট-প্রকার অর্থকে প্রচলন ধারা হইতে অপসারিত করিবে।"—সংক্ষেপে ইহাই হইল গ্রেশামের নিয়ম।

নিয়ম

এই নিয়মে অর্থের উৎকর্ষ বা নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নিকৃষ্ট অর্থ বলিতে অচল মুদ্রা বা অর্থ বুঝায় না। গুণ বা ধাতুগত মূল্যে দিক হইতে যাহার মূল্য অপরের তুলনায় কম, তাহাকেই তুলনামূলকভাবে নিকৃষ্ট বলা যাইতে পারে। যেমন, যখন দেশে কেবলমাত্র স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত মুদ্রার

প্রচলন থাকে তখন পুরাতন, ঘষা, ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রাগুলি তুলনামূলকভাবে নূতন পরিমাণে বেশি ধাতুযুক্ত, এখনও পর্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, এইরূপ উৎকৃষ্ট অর্থের তুলনায় নিকৃষ্ট। যখন ধাতব মুদ্রা এবং কাগজী নোট পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তখন যেহেতু কাগজী অর্থের বস্তুগত মূল্য কম, সেই হেতু তাহারা নিকৃষ্ট। যখন সমাজের আর্থিক কাঠামো দ্বি-ধাতুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত তখন দুইটি ধাতু-মুদ্রার বাজার-দর এবং সরকারী দরের তারতম্য অনুযায়ী যাহার মূল্য কম তাহা নিকৃষ্ট।

কারণসমূহ

কি-ভাবে এই নিকৃষ্ট-প্রকার অর্থ উৎকৃষ্ট-প্রকার অর্থকে বাজার হইতে অপসারিত করে? কি-কারণে উৎকৃষ্ট অর্থ দেশের প্রচলন-ধারা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়? তিনটি কারণের সাহায্যে এই ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রথমত, স্বর্ণ বা রৌপ্যের ধাতু হিসাবে মুদ্রাতে ব্যবহৃত হওয়া ব্যতীত আরও অনেক ধরনের অনার্থিক (**non-monetary**) ব্যবহার আছে। উৎকৃষ্ট ধরণের মুদ্রাগুলির ভিতরে ধাতুর পরিমাণ বেশি থাকায় লোকে সেইগুলি সর্বাপেক্ষা পূর্বে গলাইয়া ফেলিবে। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী রপ্তানীকারীগণ মুদ্রার ভিতর ধাতুর পরিমাণ অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিবে; সুতরাং, যে-সকল মুদ্রার মধ্যে ধাতুর পরিমাণ বেশি, সেইগুলি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অর্থগুলি দেশের বাহিরে চলিয়া যাইবে। তৃতীয়ত, লোকের স্বভাব হইল উৎকৃষ্ট-প্রকার অর্থ যতক্ষণ সম্ভব নিজেদের নিকট রাখিয়া দেওয়া; বিনিময় ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট-প্রকার অর্থ-ই তাহারা প্রথমে চালাইবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং, উৎকৃষ্ট অর্থ লোকের জিম্মায় থাকিবে, প্রচলন-ধারা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, এবং নিকৃষ্ট ধরনের অর্থ প্রচলিত হইতে থাকিবে।

এই নিয়ম যাহাতে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী না হয়, সেই উদ্দেশ্যে আধুনিক কালের আর্থিক কর্তৃপক্ষ সর্বদাই পুরাতন, ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রা বা নোটকে বাজার হইতে অপসারিত করিয়া নতুন উৎকৃষ্ট ধরনের অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে ছাড়িয়া দেন।

বাস্তবক্ষেত্রে দুইটি বিশেষ অবস্থায় এই নিয়ম কার্যকরী হইবে না। যদি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় প্রকার অর্থের মোট পরিমাণ, সমাজের বিনিময়-কার্যে মাধ্যমের নিকট প্রয়োজনের তুলনায় কম হয় তবে এই নিয়ম কার্যকরী হইবে না। দ্বিতীয়ত, যদি নিকৃষ্ট অর্থ এতই নিকৃষ্ট হয় যে লোকে ইহা মোটেই গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না, তবে বাধ্য হইয়াই উৎকৃষ্ট অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে চলিতে থাকিবে।

সীমাবদ্ধতা

স্বর্ণমান (Gold Standard)

যখন কোন দেশের প্রধান আইনসিদ্ধ অর্থ হইল সোনার দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা এবং এরূপ কাগজী অর্থ যাহার বিনিময়ে সরকারী মুদ্রা-দপ্তর হইতে নির্দিষ্ট হারে সোনা পাওয়া সম্ভবপর, তখন সেইরূপ আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণমান বলা হয়। পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হইবার সময় হইতে সোনা প্রধান বিনিময়ের মাধ্যম হিসাব প্রচলিত হইতেছে এবং বহুদেশ নিজেরা স্বর্ণমান গ্রহণ করায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও স্বর্ণের সাহায্যে লেনদেন চলিত। অর্থের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলেই পৃথিবীতে এককালে স্বর্ণমানের উদ্ভব ও প্রচলন হইয়াছিল।

স্বর্ণমান কাহাকে বলে

স্বর্ণমান প্রচলিত থাকায় স্বর্ণ ও অর্থের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল; স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত, স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া গেলে অর্থের পরিমাণও হ্রাস পাইত। স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, হয় সেই স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত হইত অথবা সেই স্বর্ণকে মজুত করিয়া ব্যাঙ্কগুলি দেশে ঋণগত অর্থের (Credit Money) পরিমাণ বাড়াইয়া দিত। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি এমনভাবে পরিচালিত হইত যাহাতে স্বর্ণের যোগান বৃদ্ধি পাইলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে, এবং স্বর্ণের যোগান কমিলে অর্থের যোগানও কমিয়া যাইতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এইরূপ স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে ইহা স্বয়ংক্রিয় মানরূপে (Automatic Standard) বিভিন্ন দেশের দামস্তর ও লেনদেন ব্যালান্সের (Balance of Payments) ভারসাম্য রক্ষা করে। প্রত্যেকটি দেশের বৈদেশিক বিনিময়-হারে ভারসাম্য আপনা-আপনি রক্ষিত হয়। এই স্বয়ংক্রিয়তা (Automatism) স্বর্ণমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ বলিয়া পরিগণিত হইত।

যদি এইরূপ অবস্থায় কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল (unfavourable) হইয়া উঠে, অর্থাৎ রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হয়, তবে সেই দেশ হইতে স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইবে। স্বর্ণের পরিমাণ কম হওয়ায় দেশে মুদ্রা সঙ্কোচন (Currency Contraction) ঘটিবে, দামস্তর নামিয়া আসিবে। অপরপক্ষে, যে-দেশের লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল (favourable) হইয়াছিল, সেই দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিবে, মুদ্রাপ্রসার (currency expansion) ঘটিবে,

স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয় গতি-পদ্ধতি

এবং দামস্তর ঊর্ধ্বে উঠিবে। দুই দেশের দামস্তর এইরূপ পরিবর্তিত হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি ও পরিমাণে পরিবর্তন আসিবে। যে-দেশের দামস্তর কম, ক্রমে সেই দেশ অধিক রপ্তানি করিতে সক্ষম হইবে ও স্বর্ণ ফিরিয়া পাইবে; যে-দেশের দামস্তর অধিক, তাহার রপ্তানি কমিবে এবং স্বর্ণ দেশের বাহিরে চলিয়া যাইবে। পুনরায় স্বর্ণের আনাগোনা শুরু হইবে, এবং ক্রমে দুই দেশের দামস্তর এরূপ অবস্থায় আসিবে যখন স্বর্ণের আনাগোনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বৈদেশিক বাণিজ্যের দরুণ লেনদেনের মারফত পৃথিবীর স্বর্ণ বিভিন্ন দেশে বন্টিত হইয়া থাকিবে।

স্বর্ণমান ব্যবস্থার এই স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্য সাধনের কারণ দুই দিক হইতে দেখা চলে: ব্যাঙ্কিং-প্রতিক্রিয়া ও গুণক-প্রতিক্রিয়া। দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া গেলে অর্থের যোগান হ্রাস পাইবে, ফলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের ঋণদানের পরিমাণ ও নীতি সংকুচিত করিবে। স্বর্ণ প্রবেশ করিতে থাকিলে ইহার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হইবে, অর্থাৎ টাকার যোগান বৃদ্ধি পাইবে, সুদের হার হ্রাস পাইবে, ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের ঋণদানের পরিমাণ ও নীতি প্রসারিত করিবে। এই ব্যাঙ্কিং প্রতিক্রিয়ার কিছুটা পরিবেশের প্রভাব আছে (palliative effects), তাহা আমাদের মনে রাখা দরকার। সুদের হার বাড়িলে স্বর্ণক্ষয়শীল দেশে বাহির হইতে কিছুটা স্বল্পকালীন মূলধন (short term capital) প্রবেশ করিতে থাকিবে। উপরন্তু, সুদের হার বাড়িলে পরোক্ষভাবে আমদানি কিছুটা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা, কারণ, ব্যবসায়ীদের টাকা ঋণ করার খরচা বেশি। গুণক-প্রতিক্রিয়ার কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার, কারণ ইহা দ্বারাও স্বর্ণমানের সামঞ্জস্য-সাধনকারী ধারা প্রভাবিত হয়। স্বর্ণ বাহির হইতে থাকিলে দেশের মধ্যে সংকোচক শক্তিসমূহ কাজ করিতে শুরু করে। স্বর্ণ প্রবেশ করিতে থাকিলে প্রসারশীল শক্তিগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্কিং-প্রতিক্রিয়া ও গুণক-প্রতিক্রিয়ার মিলিত ফলে দেশে অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তর (level of business activity) হয় নিচে নামিবে, অথবা উপরে উঠিবে। অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তর হ্রাস পাইলে অর্থাৎ উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ কম হইলে সেই দেশের আমদানি হ্রাস পাইবে। আবার অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তর উচ্চে উঠিলে অর্থাৎ উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেশি হইলে সেই দেশে বাহির হইতে আমদানির পরিমাণ বাড়িবে। ইহার ফলে স্বর্ণক্ষয়শীল দেশ হইতে স্বর্ণক্ষয়ের

ব্যাঙ্কিং প্রতিক্রিয়া ও গুণক প্রতিক্রিয়া

পরিমাপ কমিয়া আসিবে, আবার স্বর্ণবৃদ্ধিশীল দেশে স্বর্ণবৃদ্ধির পরিমাণ হ্রাস পাইবে। আয় ও কর্মসংস্থানের এই উঠা-নামা কেবলমাত্র নিজেদের প্রভাবের মধ্য দিয়া দুই দেশে ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিতে পারে না বটে, কিন্তু ব্যাঙ্কিং ও গুণক-প্রতিক্রিয়া অনেকখানি বৈদেশিক লেনদেনের খাতে ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করে।*

স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্যসাধনের এই ধারা সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা দরকার। এই ভারসাম্যে যখন কোন দেশ পৌঁছিবে, তখন উহার বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার ব্যালান্সই রক্ষিত হইবে। একমাত্র বাহ্য ব্যালান্স থাকিলেই স্বর্ণের স্রোত (আগমনের বা বহির্গমনের) বন্ধ থাকিবে, ফলে আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স বা ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার কোন ভয় থাকিবে না। প্রতিটি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স বজায় থাকিলে তবেই উহার দামস্তর ও আয়স্তর সমান থাকিবে, বাহ্য ব্যালান্স ভাঙিবার মত প্রভাব দেশের মধ্যে দেখা দিবে না। ভারসাম্যের একমাত্র সম্ভাবনা হইল যখন উভয় দেশের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ভারসাম্য বজায় আছে, কারণ কোন দেশে ইহার কোন একটিতে পরিবর্তন দেখা দিলে উভয় দেশেই উভয় প্রকার ভারসাম্যে বিচ্যুতি দেখা দিতে থাকিবে।

উভয় দেশে উভয় প্রকার ভারসাম্য থাকাই ব্যালান্সের মূল কথা

পূর্ণ ও দ্রুত ভারসাম্যের শর্ত (Conditions of full and rapid Adjustment)

আমরা আলোচনা করিলাম যে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় এই ধারা পূর্ণ ভারসাম্যে তখনই পৌঁছিতে পারে যেখানে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স বজায় আছে। কিন্তু এই ধারার মধ্যে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই যে কোনরূপ ভারসাম্য নিশ্চয় স্থাপিত হইবে। উপরন্তু, এই ভারসাম্য অতি দ্রুত ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহারও কোনরূপ স্থিরতা নাই। সুতরাং ভারসাম্যে পৌঁছানোর শর্ত এবং তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর শর্ত দুইটি বিষয়ই আলোচনা করা দরকার।

---

3. *"The two forces that set the gold standard adjustment process in motion...are the banking reaction...and the multiplier induced reactions. ...In general and in the long run the banking forces and the multiplier forces operate together. Both forces lead to a change in the level of activity, which is an essential stage in the adjustment process in gold standard conditions in industrialized countries...But in so doing they cause a serious disturbance in internal balance in both countries." A. C. L. Day, *Outline of Monetary Economics*. P. 483-5.

প্রথমত, সামঞ্জস্য সাধনের এই ধারার একটি মূল কথা হইল অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তরে উপযুক্ত পরিবর্তন আসা এবং একমাত্র এই ধারার শেষেই পরিপূর্ণ আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য ফিরিয়া আসিতে পারে। যদি উভয় দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তরে পরিবর্তন না হয় তবে ভারসাম্য ফিরিয়া আসা সম্ভব হয় না। কিন্তু দামস্তরে পরিবর্তন আনিতে হইলে দেশের মজুরি ও দাম-কাঠামো (wage and price structure) খুবই নমনীয় হওয়া দরকার। তবেই অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিমাণে পরিবর্তনের স্তরগুলি অল্প সময়ে পার হইয়া আসা চলে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই খেলার নিয়মগুলি (rules of the game) পালন না করিলেও ভারসাম্য ফিরিয়া আসিতে পারে যদি স্বয়ংক্রিয় গুণকের সাহায্যে দেশে আয়স্তরের প্রসার বা সংকোচন ঘটে। ইহা সম্ভব, কারণ ব্যাঙ্কিং নীতি অপরিবর্তিত থাকিলেও আয়স্তরে পরিবর্তন দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তরে কিছুটা পরিবর্তন আনিতে পারে। তৃতীয়ত, দামস্তরে কিছুটা পরিবর্তন যদি লোকের মনে ফাটকা-বাজির প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দিয়া সেই পরিবর্তনের গভীরতা বাড়াইয়া দেয় তবে ইহার ফলে ভারসাম্য ফিরিয়া আসিতে পারে না। যেমন, দামস্তর হ্রাস পাইল, আরও দাম কমিবার আশায় ক্রেতারা ক্রয় করা স্থগিত রাখিল, ইহাতে দামস্তর আরও হ্রাস পাইবে। এইরূপ অবস্থায় ভারসাম্যবিন্দুর আশেপাশে অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তর উঠানামা (oscillate) করিবে, কিন্তু ভারসাম্যে পৌঁছিবে না।

পূর্ণ ভারসাম্যের শর্তগুলি

চতুর্থত, সামঞ্জস্য-সাধনের এই ধারা ভারসাম্যে না-ও পৌঁছিতে পারে যদি উভয় দেশেই আমদানির প্রান্তিক প্রবণতা (marginal propensity to import) খুব বেশি হয়। যে-দেশটি হইতে স্বর্ণ বাহির হইতেছে, উহার দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান স্তর হ্রাস পাওয়া দরকার। পরবর্তী বাণিজ্যকালে ইহার আমদানি কম হওয়া প্রয়োজন এবং রপ্তানির আধিক্য দরকার। যদি ইহার প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা বেশি থাকে, তবে এই ধারা সম্ভব না-ও হইতে পারে। ঠিক একই কারণে, যদি উভয় দেশেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাগুলির মোট সমষ্টি (the sum of the price elasticities of demand) কম হয়, তবে এইরূপ ভারসাম্য না-ও আসিতে পারে।

উপরের এই শর্তগুলি বজায় থাকিলেও ভারসাম্যে পৌঁছানোর পথ অতি দীর্ঘ হইতে পারে, ফলে এই পথে গুরুত্বপূর্ণ ভাঙাগড়ার (serious fluctuations)

সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুতরাং দ্রুত ভারসাম্যে পৌছিবার শর্তগুলি আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, স্বর্ণমান ব্যবস্থার "খেলার নিয়মগুলি" সকলের মানিয়া চলা চাই। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি ভারসাম্য ঘটাইতে হয়তো পারে ঠিকই, কিন্তু তাহাতে দেরি হইতে পারে। সকল খেলোয়াড় যদি সচেতনভাবে এই নিয়মগুলিকে অনুসরণ করে, তবে ইহা দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইতে পারে। যেমন, স্বর্ণের আনাগোনায় কেহ কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ করিবে না, ইহার প্রভাব সুদের হার, দামস্তর ও আয়স্তরের উপর পড়িবে, তাহাতে কেহ বাধা দিবে না। দ্বিতীয়ত, ভারসাম্য দ্রুত ফিরিয়া পাওয়া যায় যদি দেশের দাম ও মজুরির কাঠামো নমনীয় হয়। তৃতীয়ত, যদি উভয় দেশের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাগুলি প্রবল হয়, তবে দ্রুত ব্যালান্স ফিরিয়া আসে। সর্বোপরি, কোন দেশে দামস্তর বাড়িলে ফাটকাবাজি যাহাতে শুরু হইয়া না যায় অর্থাৎ দামস্তরের উপর ফাট্‌কাবাজির প্রভাব কম পড়ে, তাহাও লক্ষ্য রাখা দরকার।

দ্রুত ভারসাম্যের শর্তগুলি

স্বর্ণমানের এইরূপ স্বয়ংক্রিয় গতিবিধির পূর্ণ সাফল্যের জন্য (Full equilibrium under gold standard adjustment process) কয়েকটি শর্ত বজায় থাকা চাই। প্রথমত, স্বর্ণের আনাগোনায় কোনরূপ বাধানিষেধ থাকা চলিবে না। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার স্বর্ণের আনাগোনার ফলে দামস্তরের উপর ইহার হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। স্বর্ণের আনাগোনায় বাধানিষেধ থাকিলে বা উহা দামস্তরের উপব প্রভাব ফেলিতে না পারিলে লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্যবিহীনতা দূর হইতে পারে না। স্বর্ণমান সফল ভাবে চালাইতে গেলে এই সকল "খেলার নিয়ম" (Rules of the gold standard game) মানিয়া চলিতে হয়।

সাফল্যের সম্ভাবনা

স্বর্ণমানের বিভিন্ন রূপ (Different types of gold standard)

স্বর্ণের সহিত দেশে প্রচলিত অর্থের সম্পর্কের গভীরতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের স্বর্ণমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে দেখা গিয়াছে।

(১) স্বর্ণমুদ্রামান বা বিশুদ্ধ স্বর্ণমান (Gold currency standard or the pure Gold Standard)

1914 সালের পূর্বে ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং আরও কয়েকটি দেশে বিশুদ্ধ স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা প্রধান অর্থরূপে প্রচলিত থাকে ; মুদ্রাকর্তৃপক্ষ (Currency Authority) আইনত স্বর্ণের বদলে অধিবাসীদিগকে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন এবং দেশের ভিতরে বা বাহিরে স্বর্ণের যাতায়াতের উপর কোন প্রকার বাধা-নিষেধ থাকে না।

(২) স্বর্ণধাতুমান (The gold Bullion Standard)

যখন দেশে স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকে না, কাগজীমুদ্রার দ্বারাই দেশের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ চলে, মুদ্রাকর্তৃপক্ষ আইনত স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দিতে বাধ্য থাকেন না, তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের জন্য নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ বিক্রয় করেন বা নির্দিষ্ট হারে লেনদেন করেন, তখন এইরূপ আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণধাতুমান বলা হয়। 1925 সাল হইলে 1931 সালের মধ্যে ইংলণ্ডে এবং 1927 সাল হইতে 1631 সালের মধ্যে ভারতবর্ষে এইরূপ স্বর্ণধাতুমান প্রচলিত ছিল।

(৩) স্বর্ণবিনিময় মান (Gold Exchange Standard)

1898 সাল হইতে 1931 সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণ-বিনিময় মান বলা হইত। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকে না, মুদ্রাকর্তৃপক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিবার জন্য স্বর্ণ গ্রহণ করেন না বা স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয়ও করেন না। তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদানের জন্য প্রয়োজন হইলে নির্দিষ্ট হারে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে এমন কোন দেশের মুদ্রা বিক্রয় করেন, যাহা স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৪) স্বর্ণ মজুত মান (Gold Reserve Standard)

এইরূপ ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকে না, কাগজীনোট বা অপর কোন মুদ্রা চালু থাকিতে পারে। মুদ্রাকর্তৃপক্ষ স্বর্ণের বা বৈদেশিক মুদ্রার একটি ভাণ্ডার গঠন করেন এবং মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়-হারের উঠানামা নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহাতে

ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত সেই ভাণ্ডার হইতে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়বিক্রয় করেন। এইরূপ ভাণ্ডারকে বিনিময়-হারে সমতারক্ষাকারী ভাণ্ডার (Exchange Equalisation Fund) বলা হয়। ইহারই সাহায্যে দেশীয় অর্থের বহির্মূল্য এইভাবে স্থির রাখার চেষ্টা করা হয়। যখন অর্থের বহির্মূল্য বা বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানামা ঘটে, তখন এইরূপ ভাণ্ডার হইতে নিজদেশের মুদ্রা বা স্বর্ণের ক্রয় এবং বিক্রয়ের দ্বারা বিনিময়-হারকে স্থির রাখার অথবা লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়। পশ্চিম ইউরোপে এবং ব্রিটেনেও 1936 সাল হইতে 1939 সালের মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

স্বর্ণমানের গুণ ও দোষ বিচার (Merits and Demerits of Gold Standard)

স্বর্ণমানের গুণ হইল, এই ব্যবস্থায় দামস্তর ও বৈদেশিক বিনিময়-হার আপনা-আপনি স্থির হইয়া পড়ে এবং কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যালান্সে ভারসাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উহা পুনরায় ভারসাম্যের বিন্দুতে ফিরিয়া আসে। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় স্বর্ণ আনা-গোনার মাধ্যমে উহার প্রভাবের ফলে আপনাআপনি লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান চলিতে থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেনাপাওনা সুবিধাজনক হয় এবং একটি সর্বজনগ্রাহ্য সাধারণ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণের ব্যবহার সম্ভবপর হয়। তৃতীয়ত, স্বর্ণমান বজায় থাকিলে অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে দেশে স্বর্ণের যোগানের উপর; রাজনৈতিক কারণে টাকার যোগান নিরূপিত হয় না, মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে না। চতুর্থত, জনসাধারণ স্বর্ণ পছন্দ করে, স্বর্ণমান চালু রাখিলে সেই দেশের মুদ্রাব্যবস্থা দেশে ও বিদেশে সম্মান লাভ করে এবং উহার উপর জনসাধারণের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ইহার গুণ কি কি

স্বর্ণমানের ত্রুটি হইল, প্রথমত, ইহাকে কখনই স্বয়ংক্রিয়মান বলিয়া গণ্য করা চলে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা মুদ্রাকর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সাবধানতা ও বিবেচনার সহিত স্বর্ণমানের খেলার নিয়মসমূহ মানিয়া না চলিলে নিছক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইহা সচল থাকে না; ইহাকে তাই পরিচালিত মান (Managed Standard) হিসাবেই গণ্য করা উচিত। শুধু তাহাই নহে, বাস্তবক্ষেত্রে তথাকথিত 'খেলার

নিয়মসমূহ' পরিপূর্ণভাবে কখনো পালন করা হইত না। দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ 'ব্যাঙ্ক হার' বাড়াইয়া স্বর্ণের পুনরায় বহির্গমন বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন, অথবা বর্ধিত স্বর্ণের বিনিময়ে নিজ দেশের অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে চাহিতেন না। দেশীয় স্বার্থরক্ষাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেই স্বার্থের তাগিদে পরবর্তীকালে স্বর্ণমানের নিয়ম কেহই বিশেষ মানিয়া চলেন নাই। দ্বিতীয়ত, স্বর্ণমান ব্যবস্থায় অর্থের আভ্যন্তরীণ মূল্য স্থির রাখার পরিবর্তে প্রধানত উহার বহির্মূল্যের স্থিরতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত। নিজেদের দামস্তর, উৎপাদন ও আয়স্তর অবহেলা করিয়া কেবল বৈদেশিক বিনিময়-হার স্থির রাখা কখনই যুক্তিসঙ্গত কাজ বলিয়া মনে করা যায় না। তাহা ছাড়া, এই ব্যবস্থায় কোন দেশ নিজস্ব পৃথক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আয়স্তর বৃদ্ধির জন্য নিজস্ব অর্থ নৈতিক নীতি গ্রহণ করিতে পারে না।* তৃতীয়ত, কেইন্‌সের অভিমতে, স্বর্ণমান ব্যবস্থার ফলে মুদ্রাসঙ্কোচন ও বেকারির দিকে ঝোঁক আসিয়া পড়ে। যে-দেশে আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ বেশি, সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়াইয়া স্বর্ণের রপ্তানি বন্ধ করিতে চায়। ইহার ফলে দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ কমিয়া যায় এবং দেশে আয়স্তর ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পায়। যদি দেশে আমদানির তুলনায় রপ্তানি অধিক হইতে থাকে তাহা হইলে দেশের মধ্যে স্বর্ণ প্রবেশ করে এবং মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় সুদের হার কমে, দেশে বিনিযোগ বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তর উত্তীর্ণ হইয়া মুদ্রাস্ফীতি ও সঙ্কটের সৃষ্টি করে। চতুর্থত, স্বর্ণমান ব্যবস্থা কিন্তু বাস্তবে কখনই কোন দেশের দামস্তর বা বিনিময়-হার স্থির রাখিতে পারে নাই। কালিফোর্নিয়ার স্বর্ণ খনি আবিষ্কার স্বর্ণের যোগান বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইয়াছিল। গত শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন কারণে স্বর্ণের চাহিদা ও ব্যবহার খুবই বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থের পরিমাণ কমিয়া মুদ্রাসঙ্কোচনের সৃষ্টি করিয়াছিল। পঞ্চমত, কাগজী মানের তুলনায় স্বর্ণমান খুবই ব্যয়বহুল।

ইহার দোষ কি কি

*"But the gold standard is a jealous god. It will work—provided it is given exclusive devotion. The Central Bank must be prepared to work for stability of exchange rates and for nothing else; it must be prepared to expand credit when—but only when—it is receiving gold from abroad, and to contract credit when—but only when—it is losing gold for export." Crowther, *An outline of Money*. P. 306.

কাগজী অর্থের দ্বারা বিনিময়ের কাজ চালানো মোটেই অসুবিধাজনক নহে, সুতরাং স্বর্ণের প্রচলন বা স্বর্ণ মজুত রাখা অযথা অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নহে। সভ্য মানুষের এইরূপ 'হলুদে ধাতুর' (yellow metal) প্রতি অহেতুক আকর্ষণ শোভনীয় নহে। কেইন্সের অভিমতে ইহা একপ্রকার 'বর্বর যুগের নিদর্শন' (Barbarous relic)।

স্বর্ণমান পতনের কারণ (Causes of breakdown of the gold Standard)

স্বর্ণমান ব্যবস্থার তথাকথিত 'খেলার নিয়মসমূহ' যথাযথভাবে কখনই প্রতিপালিত হয় নাই, প্রায় সকল দেশই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্বর্ণমানকে প্রায় অচল অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছিল। স্বর্ণের আনাগোনার উপর যথেষ্ট বাধা-নিষেধ আরোপিত হইত, এবং স্বর্ণের আগমনের বা বহির্গমনের কোন প্রভাব দামস্তরের উপর পড়িতে দেওয়া হইত না। ইহাই স্বর্ণমান পতনের প্রধান কারণ।

খেলার নিয়ম ভঙ্গ

প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে অস্ত্র বা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং স্বর্ণ দ্বারা উহার মূল্য প্রদানের ফলে আমেরিকাতে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণপ্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সেই স্বর্ণ আমেরিকার দামস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ মুদ্রাকর্তৃপক্ষ সেই স্বর্ণকে ভিত্তি করিয়া মুদ্রাপ্রসার না করিয়া তাহাকে বন্ধ্যা ধাতু হিসাবে জমাইয়া রাখিয়াছিল। ফলে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমেরিকার দামস্তর তুলনামূলক ভাবে কম থাকায় দামস্তরের এই অসমতার (Disparity) ফলে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণ আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছিল। এইরূপে অন্যান্য দেশে স্বর্ণের যোগান কম হওয়ায় তাহারা বাধ্য হইয়া স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ ও আমেরিকার নীতি

অন্যান্য দেশে স্বর্ণ ছিল অল্প পরিমাণ, উহাকে জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার দরুণ রক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল ; সুতরাং বৃটেন হইতে যখন স্বর্ণত্যাগের হিড়িক শুরু হইল, সেই অবস্থায় 1931 সালে ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (Auturcky) প্রসার লাভ করায় বৈদেশিক বাণিজ্যহারের তুলনায় নিজ দেশের দামস্তর, আয়স্তর প্রভৃতি স্থির রাখা, বেকারি দূর করা ও কর্মনিয়োগের স্তর ঊর্ধ্বে তোলা, এই সকল

অধিকতর প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয় লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। তাই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই স্বর্ণমান ভাঙিয়া পড়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল।

সাফল্যের শর্ত

সাফল্যের সহিত স্বর্ণমান চালু থাকিতে হইলে ইহাও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, যেন অধমর্ণ দেশগুলি আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাড়াইয়া রপ্তানি-উদ্বৃত্ত (Export Surplus) সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা উত্তমর্ণ দেশগুলিকে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। অর্থাৎ স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত কোন দেশ এমন কোন আর্থিক বা বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করিবে না যাহাতে লেনদেনের ব্যালান্সের কোন ভারসাম্যবিহীনতা বিদূরিত হইতে বাধা পায়। লেনদেন ব্যালান্সের প্রয়োজনে মুদ্রাপ্রসার ও মুদ্রাসঙ্কোচন করিতে হইবে, এবং প্রয়োজন হইলে অপর দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি গ্রহণ করিতে হইবে এবং স্বর্ণের বহির্গমন মানিয়া লইতে হইবে, কোন শুল্ক-প্রাচীর তুলিয়া বা কৃত্রিম বাধানিষেধ আরোপ করিয়া দ্রব্য বা স্বর্ণের গতিবিধি বন্ধ করা চলিবে না। স্বর্ণমানের এই স্বর্ণসূত্র (golden rule) কেহই মানিয়া না লইবার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে ইহার পতন হইয়াছে।

কি-ভাবে স্বর্ণমানের পতন হইল

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে স্বর্ণমানের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়ে ইংলণ্ড স্বর্ণের সহিত পুরাতন হারে স্টার্লিং-এর বিনিময়-মূল্য ধার্য করিল, এবং এই বিনিময়-হার ধার্য করার ফলে স্টার্লিং 'বর্ধিত-মূল্য' মুদ্রাতে (Overvalued Currency) পরিণত হয়। ফ্রান্সের বিনিময়-হার এরূপ স্থির হয় যে, ফ্রাঙ্কের মূল্যহ্রাস (Devaluation) ঘটিয়া গেল। জার্মানীতে নূতন এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন হইল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধকালীন উদ্বৃত্ত ক্রয়ক্ষমতার বিলোপসাধন অর্থাৎ মুদ্রার অতি-স্ফীতি (hyper-inflation) রোধ করা।

ইংলণ্ডের মুদ্রা-মূল্য বৃদ্ধি (over-valuation) রপ্তানির পরিমাণ কমাইয়া দিল। তাহার অর্থনৈতিক কাঠামোর কাঠিন্য বা অনমনীয়তা (Rigidities) রপ্তানি দ্রব্যাদির দাম কমাইতে সুযোগ দেয় নাই, ফলে সে রপ্তানি বাড়াইয়া অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই, রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হইয়াছে, এবং ফলে স্বর্ণের বহির্গমন হইয়াছে। অপর পক্ষে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে, রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সেই স্বর্ণ ফ্রান্সের দামস্তরের

উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহা মজুত করিয়া রাখিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানি দ্রব্যের আগমন এবং স্বর্ণের বহির্গমন উভয়ের উপরেই বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া স্বর্ণমানের ভারসাম্য-সাধনকারী পদ্ধতিকে (Equilibrating mechanism) বানচাল করিয়া দিয়াছিল।

এই সকল কারণ ছাড়াও সমস্যা ছিল 'উত্তপ্ত অর্থের' (Hot Money)। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী আন্তর্জাতিক আবহাওয়ায় ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদের প্রভূত পরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা ও সুদের লোভে দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। তদানীন্তন পৃথিবীতে বিপুল আন্তর্জাতিক ঋণ, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ-জনিত বিপুল দেনা-পাওনা এবং তাহার লেনদেন স্বর্ণমানের মুদ্রাপরিবর্তন পদ্ধতির (Transfer-mechanism) উপর গুরুতর চাপ ফেলিয়াছিল, যাহার ভারে উহার ভরাডুবি প্রায় অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। 1929 সালে আমেরিকার শেয়ার বাজারে সহসা দ্রুত-মন্দার ফলে যে-সকল দেশ আমেরিকার অর্থ-সাহায্যের দ্বারা বাঁচিতেছিল বা আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত নিজের অবস্থা সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল (বিশেষত জার্মানী ও অস্ট্রিয়া), সেই সকল দেশে বিপুল সংকট উপস্থিত হয়। স্বল্পকালীন ঋণসমূহ তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চাওয়া হয় এবং ব্যবসায়ীদের আশার মূলে কুঠারাঘাতের ফলে উৎপাদন ও বিনিয়োগ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। 1930 সালে জার্মানীর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হয়, আমেরিকা এক বৎসর যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণ গ্রহণ স্থগিত রাখে। ইংলণ্ডে বহু দেশ হইতে অর্থ জমা রাখা হইত, তাহা সহসা তুলিয়া লইবার প্রচেষ্টা শুরু হওয়ায় স্বর্ণমান টিঁকাইয়া রাখা খুবই কঠিন হইয়া উঠে। নৌ-বিদ্রোহের ফলে ইংলণ্ড হইতে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণের বহির্গমন চলিতে থাকায় বাধ্য হইয়া 1931 সালের সেপ্টেম্বরে ইংলণ্ড স্বর্ণ-প্রদান বন্ধ করিয়া দিল। 1933 সালে আমেরিকা স্বর্ণমান ত্যাগ করিল এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী সকলেই নেতৃস্থানীয় দেশগুলির পদাঙ্ক অনুসরণে বাধ্য হইল। স্বর্ণমানের কলঙ্ক-বিজড়িত গৌরবময় ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটিল। নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির বাধাস্বরূপ স্বর্ণমানের স্বর্ণশৃংখল অপসারিত হইল।

স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা (Possibility of Restoration)

আধুনিক কালে সকল দেশের সরকারই নিজ দেশে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, পূর্ণকর্মসংস্থান, দেশের সামগ্রিক উন্নতি প্রভৃতিকে আর্থিক নীতির লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। 'মুদ্রা-সংকোচনের দিকে অন্তর্নিহিত ঝোঁক' (inherent bias towards deflation), অনমনীয় বিনিময়-হার, সর্বদা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখা, স্বর্ণের গতিবিধি অনুযায়ী পারস্পরিক মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসঙ্কোচন, রক্ষণশীল আভ্যন্তরীণ ঋণ-নীতি, বাজেটে সমতা রক্ষা করা বা ঘাটতি বাজেট না করা; স্বর্ণমানের এই সকল নিয়ম নিজ দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় আর্থিক নীতিকে সাহায্য করে না। উপরন্তু, অনুন্নত দেশগুলিতে বর্তমানে যে বিপুল উন্নয়নের কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে, তাহার জন্য প্রভূত পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন এই সকল দেশের মধ্যে আসিতেছে। এইরূপ একপাক্ষিক মূলধনের প্রেরণ বা প্রবেশ (unilateral capital transfer) কোনটিই স্বর্ণমান থাকিলে সম্ভবপর নয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, যুদ্ধ-পূর্ব ধরনের স্বর্ণমান ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

জাতীয় অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতি

শুধু তাহাই নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ স্বর্ণ এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মজুত হইয়া রহিয়াছে: অন্যান্য দেশে স্বর্ণের পরিমাণ এত কম যে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার উপযোগী স্বর্ণ তাহারা পাইবে না। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের সংরক্ষণী-বাণিজ্যনীতি স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বিরাট প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিক কালে, আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে, স্বর্ণের গুরুত্ব বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে, ফলে প্রধান প্রধান মুদ্রা নিজস্ব লেনদেনের সুবিধার জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে; স্টার্লিং এলাকা, ডলার এলাকা, রুব্‌ল এলাকা প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়াছে।

এতৎসত্ত্বেও ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডারের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটি দেশ তাহার প্রধান আইন-সিদ্ধ মুদ্রার সহিত স্বর্ণ বা মার্কিন ডলারের বিনিময়-হার নির্দিষ্ট করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে সর্বসম্মত পারস্পরিক বিনিময়-হার নির্দিষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হইয়াছে। ইহাকে তাই অনেকে মিশ্রমান (Mixed Standard) বলেন। কিন্তু ইহা মনে

রাখা দরকার যে, স্বর্ণের ভিত্তিতে আর্থিক ব্যবস্থা গঠন করা এই নিয়মের উদ্দেশ্য নহে, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন উপায়ে ইহাকে চালু করা বাস্তব অবস্থা বিচার করিলে আর সম্ভবপর নয়।

কাগজী মান (Paper Standard)

দেশের প্রধান আইন-সিদ্ধ টাকা হিসাবে কাগজীনোট প্রচলিত থাকিলে তাহাকে কাগজীমান বলা হয়। এই কাগজী নোট আজকাল সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচলিত হয় এবং সরকারী আর্থিক নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। চেক বা বিনিময়-বিলকে কখনই নোট বলা হয় না, কারণ তাহা সীমাবদ্ধভাবে আইন-সিদ্ধ (Limited legal tender)। এই কাগজীনোট রূপান্তর-যোগ্য (convertible) বা রূপান্তরহীন (Inconvertible হইতে পারে।

কাগজী মান

কাগজী নোটের বহু সুবিধা আছে। একসঙ্গে বহু টাকার লেনদেন করিতে হইলে ধাতু দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রার তুলনায় কাগজী টাকা বিশেষ সুবিধাজনক। দ্বিতীয়ত, ধাতুমুদ্রার তুলনায় ইহাতে ব্যয় অনেক কম। এবং ক্রমাগত হস্তান্তরের ফলে ধাতুর প্রভূত অপব্যয় কাগজী নোটের ক্ষেত্রে বহন করিতে হয় না। তৃতীয়ত, কাগজীমান ব্যবস্থাতে দেশের অর্থনৈতিক নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আর্থিক নীতি গঠন করা চলে। কেইন্‌সের মতে, দেশে কর্মসংস্থানের স্তরোন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করিতে হইলে আর্থিক নীতির সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, সুতরাং উহা এরূপ নমনীয় হওয়া উচিত যে, আভ্যন্তরীণ নিয়মকানুনের দ্বারা টাকা প্রচলনের পরিমাণকে প্রয়োজনানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা চলে। ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত কোন মানের পক্ষে এরূপ নমনীয়তা সম্ভবপর নয়। বাণিজ্যচক্র বা ব্যবসায়-সংকট দূর করিতে হইলে অর্থের পরিমাণ সহজে পরিবর্তনযোগ্য রাখা প্রয়োজন। কাগজীমান ব্যবস্থাতে প্রভূত ধাতু মজুত রাখার প্রয়োজন নাই, ইহার নমনীয়তা (flexibility) এবং স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) অধিক। বর্তমান পৃথিবীতে অনমনীয় অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহ (Rigid Economic Institutions) থাকায়, (যেমন শ্রমিক সংঘ, মালিক সংঘ, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি) এবং অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী মনোভাব (Auturcky) শক্তিশালী হওয়ায় কাগজী টাকার গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সুবিধা

কাগজী অর্থের অসুবিধা হইল, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবন্ধক এই ব্যবস্থার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিহিত নাই। যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি জনসাধারণের স্মৃতিতে এখনও জাগরূক আছে। তাই তাহাদের মনে বিশ্বাস ও আস্থা উৎপাদন করা কাগজীমানের দ্বারা মোটেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়ত, পরিচালনার ত্রুটিবিচ্যুতি হইতে পারে, শ্রেণীস্বার্থে বা দলগত স্বার্থে টাকার নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক নীতি পরিচালিত হওয়াও অসম্ভব নয়। তৃতীয়ত, কাগজীমান ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানামার কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, কাগজীমান ব্যবস্থায় টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্যের স্থিরতা বা স্থায়িত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়, কিন্তু টাকার বহির্মূল্যকে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় যোগান ও চাহিদার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চতুর্থত, টাকার পরিমাণ যথেচ্ছ বৃদ্ধি করিলে দেশে দামস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস (Devaluation) ঘটাইতে হয়, এবং রপ্তানি বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিতে পারে। অন্যান্য সকল দেশও আত্মরক্ষামূলক বা প্রতিশোধমূলক বহির্মূল্য হ্রাসের (Devaluation) চেষ্টা করিবে এবং এই ভাবে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হইবে। এইরূপে প্রতিযোগিতামূলক বহির্মূল্যহ্রাসের দৌড় শুরু হইবে ও বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশৃংখলা দেখা দিবে। কাগজী টাকা প্রচলনের এই সকল বিশেষ অসুবিধা রহিয়াছে।

অসুবিধা

কাগজী নোট প্রচলনের নীতিসমূহ (Principles of Note Issue)

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি নীতি অনুযায়ী কাগজী টাকা প্রচলন করিবে, তাহার সম্পর্কে দুই প্রকার মতবাদ এককালে প্রচলিত ছিল। একদল ধনবিজ্ঞানীর অভিমতে দেশে কাগজী নোট প্রচলিত হয় ধাতুমুদ্রার পরিবর্তে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা হিসাবে রক্ষিত মূল্যবান ধাতুর প্রতিনিধি হিসাবে ইহা সমাজে প্রচলিত থাকে মাত্র। সুতরাং যে-পরিমাণ মূল্যের নোট প্রচলিত হইবে তাহার সমমূল্যের ধাতু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের নিকট জমা রাখিবে। ইহাকে বলা হয় কারেন্সী নীতি (Currency Principle)। অপর মতবাদ অনুযায়ী নোটের কাজ হইল ব্যবসায়-বাণিজ্যে সহায়তা করা, ইহা তাই সমাজে বক্তিদের মধ্যে অনবরত হস্তান্তরিত হইতে থাকে, খুবই অল্প

কারেন্সী নীতি ও ব্যাঙ্কীয় নীতি

পরিমাণ কাগজীনোট ধাতু-মুদ্রায় বা ধাতুতে রূপান্তরণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থাপিত হয়। যদি অর্থনৈতিক লেনদেনের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধিক টাকা সমাজে চালু করা হয়, তাহা হইলেই ধাতুতে রূপান্তরণের জন্য সেই টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ফিরিয়া আসিবে, প্রয়োজনীয় পরিমাণের সমান হইলে উহা প্রচলিত হইতেই হইবে। সুতরাং কোন সাধারণ বাণিজিক ব্যাঙ্ক যেরূপ অল্প মজুত রাখিয়া অধিক ঋণদান করিতে পারে, সেরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও জনসাধারণের আস্থা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অতি অল্প ধাতু মজুত রাখিয়া কাগজীনোট চালু করিতে পারে। নোট-প্রচলনের এই নীতিকে ব্যাঙ্কিং নীতি (Banking Principle) বলে।

কারেন্সী প্রথায় প্রচলিত কাগজীনোট জনসাধারণের আস্থাভাজন হইলেও ইহা ব্যয়বহুল এবং অপব্যয়মূলক, কারণ প্রভূত পরিমাণ মুদ্রা বা ধাতু অযথা অনুৎপাদকভাবে সঞ্চিত থাকে। এই প্রথায় সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নোটের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো সম্ভব হয় না, ধাতুর যোগানই টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করে। কারেন্সী প্রথায় দেশে সকল উপকরণের পূর্ণনিয়োগের পক্ষে প্রয়োজনীয় টাকার পরিমাণ অপেক্ষা বাস্তবে কম বা বেশি টাকা প্রচলিত হইয়া যাইতে পারে, কারণ সেই ধাতুর যোগানের ও মূল্যের উপর টাকার যোগান ও মূল্য নির্ভর করে। ব্যাঙ্কিং প্রথায় এই অসুবিধা দূর হইলেও দেশের আর্থিক ব্যবস্থা কিছুটা ঝুঁকিবহুল হইয়া পড়ে।

ধাতু জমার পরিমাণ সম্পর্কীয় বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী নোট প্রচলন ব্যবস্থাসমূহকে চারিপ্রকারে বিভক্ত করা যায়।

১। নির্দিষ্ট ফিডিউসিয়ারী ব্যবস্থা (Fixed Fiduciary System)

এই ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত বিনা মজুতে টাকা প্রচলন করা যাইতে পারে; এই সীমাকে ফিডিউসিয়ারী সীমা (Fiduciary Limit) বলে। এই সীমার পরে টাকা চালু করিতে হইলে উহার অতিরিক্ত কাগজীনোটের সম্পূর্ণ মূল্য ধাতুতে জমা রাখিতে হয়। যেমন 1000 পর্যন্ত টাকা চালু করিতে গেলে কোন জমা দরকার হয় না; কিন্তু উহার পরে যে কোন পরিমাণ টাকা, যেমন 10 টাকা যদি বাজারে ছাড়ার দরকার হয়, তবে 10 টাকার মূল্যের ধাতুই

জমা রাখিতে হইবে। এই প্রথা অপচয়মূলক, কারণ ফিডিউসিয়ারী সীমার ঊর্ধ্বে প্রভূত পরিমাণে ধাতু অযথা আটক থাকে, যাহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দরকার-মত খাটানো চলিত। তাহা ছাড়া, ইহা যথেষ্ট প্রসার-ক্ষম নহে, সম্পূর্ণ মূল্যের ধাতু মজুত রাখার নিয়ম বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করিতে পারে।

1844 সালের ব্যাঙ্কচার্টার আইন অনুসারে ইংলণ্ডে এই বিধি গৃহীত হইলেও এবং আরও কয়েকটি দেশ ইহা অনুসরণ করিলেও, দেখা গিয়াছে যে বহুবার ব্যাঙ্কচার্টার আইন মুলতুবী রাখিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডকে ধাতু জমা না রাখিয়া নোট প্রচলনের সুবিধা দিতে হইয়াছে। অবশেষে ম্যাক্‌মিলান কমিটির সুপারিশে এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়।

২। সর্বোচ্চ সীমা ব্যবস্থা (The Maximum Limit System)

এই ব্যবস্থায় আইনসভা একটি সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, যে-পর্যন্ত কোন জমা না রাখিয়া টাকার প্রচলন করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সীমার পরেও অর্থপ্রচলনের চেষ্টা করিলে আইনসভার অনুমোদনের ও আইন-পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থার দুইটি গুণ আছে: অর্থ-কর্তৃপক্ষ অর্থপ্রচলনের ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ চালাইতে পারে, অযথা ধাতু মজুত করিয়া রাখিতে হয় না। ইহার অসুবিধা হইল যে, যদি এই সীমা খুব নিচুতে ধার্য করা হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থার প্রসার ক্ষমতা রহিল না, আর যদি খুবই উঁচুতে ধার্য করা হয় তবে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা রহিয়া গেল। ফ্রান্সে 1929 সালের পূর্বে ইহা প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহার পরে ইহাকে তুলিয়া দেওয়া হয়।

৩। আনুপাতিক জমা ব্যবস্থা (The Proportional Reserve System)

এই ব্যবস্থায় মোট প্রচলিত নোটের কিছু অংশ ধাতুতে জমা হিসাবে রাখিতে হয় (শতকরা হিসাবে, যেমন 55% বা 30% বা 40% ইত্যাদি।)

এই ব্যবস্থার সুবিধা হইল, ইহার পরিচালনা খুবই সহজ ও সরল। তদুপরি, ইহা প্রসার-ক্ষম এবং ইহাতে অধিক ধাতু অযথা মজুত রাখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই ব্যবস্থার ত্রুটি হইল, ইহা কিছু পরিমাণ ধাতুকে অযথা মজুত রাখে। তাহা ছাড়া, এই ব্যবস্থায় ধাতুর মজুত কমিয়া গেলে উহা হইতে অধিক হারে টাকার প্রচলন কমাইয়া ফেলিতে হয়। যেমন 500টি নোটের পিছনে 25% হারে জমা হিসাবে 125টি স্বর্ণমুদ্রা জমা রাখা হইয়াছে; যদি স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া

124টি হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ 4টি কাগজী নোটের প্রচলন বন্ধ করিতে হইবে। সর্বোপরি বলা যায়, যদি আর্থিক কর্তৃপক্ষের উপর লোকের আস্থা বজায় থাকে তবে ওই জমা নিতান্তই অনাবশ্যক এবং যদি লোকে আস্থা হারাইয়াই ফেলে তবে ওই আংশিক জমা সকল নোটের স্বর্ণে রূপান্তরণের পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত।

৪। স্বর্ণব্যতীরকী আনুপাতিক জমা ব্যবস্থা (Proportional Reserve System not based on gold)

এই ব্যবস্থায়, কোন দেশের নোটের বিনিময়ে, আইনত, একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে অপর দেশের অর্থ এবং কিছু পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখিতে হয়। যেমন, কিছুকাল পূর্বেও, ভারতবর্ষে প্রচলিত নোটের মূল্যের 40% জমা রাখা হইত, তবে এই জমা কিছু স্বর্ণমুদ্রা, কিছু স্বর্ণ (ধাতু) এবং কিছু বৈদেশিক মুদ্রাতে (স্টার্লিং বা ডলার)। এই ব্যবস্থার সুবিধা অনেক। ইহা প্রসার-ক্ষম, বৈদেশিক বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং বিদেশের ব্যাঙ্কে বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখার সুবিধা থাকায় সুদ হিসাবে দেশের কিছু আয়ও হইতে পারে।

এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলা হয় যে, বৈদেশিক মুদ্রাকে নিজ দেশের অর্থের পিছনে জমা হিসাবে না রাখাই ভাল। যেমন, গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে প্রাপ্ত স্টার্লিং জমা হিসাবে গণ্য করিয়া ভারতের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে নোট প্রচলিত হইয়াছিল এবং ফলে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল। সুতরাং, বৈদেশিক বিনিময়-হারে স্থিরতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সুফলদায়ী হইলেও দেশের মধ্যে নোট-প্রচলনের ভিত্তি হিসাবে কোন বৈদেশিক মুদ্রাকে গ্রহণ না করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

নোট-প্রচলন নিয়ন্ত্রণের সঠিক নীতি (Right Principle of Regulation):

আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই অর্থনৈতিক উন্নতি, দামস্তরের উঠানামা বন্ধ করা, পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌঁছানো এই রূপ বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্য অনুযায়ী টাকা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত আছে। সুতরাং, কি-পরিমাণ নোট চালু করা দরকার অথবা প্রচলন-ধারা হইতে তুলিয়া লওয়া দরকার, এই সকল নির্ধারণ করা অতি অবশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। অর্থকর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যথেষ্ট দায়িত্বশীল

প্রতিষ্ঠান, সুতরাং তাহার বিবেচনার উপর এই ব্যাপারে নির্ভর করা চলে। আর সমাজের ঋণরূপ অর্থ নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের, তখন নোটের উপর তাহার দায়িত্ব স্বীকার না করার কি যুক্তি থাকিতে পারে? যখন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নের জন্য অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব এবং ঘাট্‌তি বাজেটের দ্বারা উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাসমূহে অর্থবিনিয়োগের ভার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বহন করিতেছে, তখন নোট প্রচলনের দায়িত্ব তাহার উপর নিশ্চয়ই ছাড়িয়া দেওয়া চলে, আইনের দ্বারা আহার ক্ষমতার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে চলিবে না।

কিন্তু তবুও জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের সুবিধার জন্য, হঠাৎ প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ, লেনদেন ও বিনিময়-হার সঠিক রাখিবার নিমিত্ত কিছু পরিমাণ স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখার নিয়ম করিয়া দেওয়া ভাল। শুধু তাহাই নহে; নোট প্রচলনের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত করিয়া রাখা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের উপায় হিসাবে যথেষ্ট কার্যকরী। তবে এই সীমা বেশ উর্ধ্বে ধার্য করা দরকার, যাহাতে স্বাভাবিক সময়ে উন্নয়ন-মূলক আর্থিক নীতি গ্রহণে কোন বাধা না আসিতে পারে।

এই সীমা কোথায় ধার্য হইবে বা কি-পরিমাণে স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা থাকিবে তাহা বিভিন্ন দেশের পৃথক অর্থনৈতিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী পৃথক হইবে। শুধু তাহাই নহে, একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী তাহা নির্ধারিত হইবে। নোট-প্রচলনের এমন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা দরকার যাহা কমব্যয়শীল বা ব্যয়সঙ্কোচমূলক, প্রসারক্ষম, ঝুঁকিহীন ও নিরাপদ এবং অর্থের অন্তর্মূল্য (Internal Value) এবং বহির্মূল্য (External Value) মোটামুটিভাবে স্থির রাখে।

অনুশীলনী

1. When is a country said to be on Gold Standard? "There are degrees of Gold Standard"—Illustrate the statement.

2. Discuss the automatic mechanism of restoring equilibrium under Gold Standard. What are the conditions of full and rapid adjustment?

3. Discuss the merits and demerits of Gold Standard.

4. Explain what you understand by the Gold Bullion Standard and the Gold Exchange Standard.

5. Elucidate the merits and drawbacks of a paper currency system.

6. Discuss the different methods for the regulation of the Note issue. Which of them you prefer and why?

৪

টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা

Money Market and Banking

ঋণপ্রথা ও ঋণপত্র (Credit system and Credit Instrument)

কোন দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যদি টাকা লেনদেন হয় তবে তাহাকে নগদ লেনদেন (Cash Transaction) বলা হয়। যদি ক্রেতা দ্রব্য ক্রয়ের সময়েই দ্রব্যের মূল্য হিসাবে টাকা দিতে রাজি না হয়, কিছুদিন পরে দিবে এইরূপ আশ্বাস দেয় এবং তাহার এই অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাখিয়া বিক্রেতা যদি দ্রব্য বিক্রয় করে, তবে তাহাকে ঋণভিত্তিক লেনদেন (Credit Transaction) বলা যাইতে পারে। এই ঋণভিত্তিক লেনদেনের মূল হইল আস্থা বা বিশ্বাস। ভবিষ্যতে ঋণগ্রহীতার নগদ অর্থ দিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতার উপর ঋণদাতার আস্থা ও বিশ্বাস এইপ্রকার ঋণভিত্তিক লেনদেনের মূল ভিত্তি।

ঋণপ্রথা

যে-ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে সে ভবিষ্যতে নগদ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া দেয়। এই সকল বিভিন্ন প্রকার চুক্তিপত্রকে ঋণপত্র (Credit Iustruments) বলা হইয়া থাকে। সমাজে বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র প্রচলিত আছে, যেমন—কাগজী নোট, চেক, হুণ্ডি বা বিনিময়-বিল, ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ ইত্যাদি। বর্তমানের ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিপুল লেনদেন ও জটিল সম্পর্ক-জালে ঋণের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য।

ঋণপত্র

কি উদ্দেশ্যে ও কেমনভাবে এই ঋণ গ্রহণ করা হইতেছে সেই অনুযায়ী ইহাকে ভোগোদ্দেশী-ঋণ এবং উৎপাদনী-ঋণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্যক্তির ভোগের উদ্দেশ্যে জিনিসপত্র ক্রয়ের দরুণ যখন ঋণ গ্রহণ করা হয় তখন তাহা ভোগোদ্দেশী-ঋণ এবং নতুন বা বর্ধিত উৎপাদনের কার্যে নিয়োজিত হইলে তাহাকে উৎপাদনী-ঋণ বলা চলে।

বহু প্রকারের ঋণপত্র বর্তমান সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, (ক) প্রমিসরী নোট, (খ) চেক, (গ) বিনিময়-বিল, (ঘ) ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ প্রভৃতি। কোন নির্দিষ্ট তারিখে অথবা চাহিদা অনুযায়ী নগদ অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ থাকিলে সেইরূপ ঋণপত্রকে প্রমিসরী নোট বলা হয়। পূর্বে কোন ব্যক্তি, কোন ব্যাঙ্ক বা সরকার এইরূপ প্রমিসরী নোটের প্রচলন করিতে পারিত। প্রমিসরী নোটের প্রচলনকারীর উপর আস্থা ও বিশ্বাস থাকিলে এইসকল নোটসমূহ এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত হইতে থাকে এবং ইহার সহায়তায় অর্থনৈতিক লেনদেন ঘটে। সাধারণভাবে, আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা গভর্ণমেন্ট এইরূপ নোট চালাইবার অধিকার নিজেরা গ্রহণ করিয়াছেন। (খ) ব্যাঙ্কে আমানতকারী ব্যক্তি কর্তৃক কাহাকেও টাকা দিবার জন্য ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশপত্রকে চেক বলা হয়। এই চেক্ হস্তান্তরিত হইয়া অর্থনৈতিক লেনদেনে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কাজ করে। এই চেকের সহিত কাগজী নোটের পার্থক্য আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার কর্তৃক প্রচলিত নোটগুলি হইল আইন-সিদ্ধ মুদ্রা, চেক কখনই আইনসিদ্ধ নহে ; ইহা গ্রহণ করিতে আইনত কেহ বাধ্য নহেন। (গ) দ্রব্যের ক্রেতার উপরে দ্রব্যের বিক্রেতা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার নির্দেশ দিয়া যে-পত্র দেন তাহাকে বিনিময়-বিল বলে। সাধারণত, ৩০ দিন, ৬০ দিন, বা ৯০ দিন পরে ক্রেতা বিক্রেতাকে এই অর্থ প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দ্রব্যের বিক্রেতাকে ঐ বিল ভাঙাইতে পারে অথবা বন্ধক দিয়া টাকা পাইতে পারে। (ঘ) যখন কোন ব্যাঙ্ক নিজের অপর কোন শাখাকে বা অপর কোন ব্যক্তিকে কিছু টাকা দিবার জন্য নির্দেশ দেয় তখন সেই নির্দেশ-নামাকে ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ বলে।

বহুপ্রকার ঋণপত্র

ঋণ ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হইল, ইহার ফলে নগদ টাকা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যায়। প্রভূত পরিমাণে টাকা বহনের ও লেনদেনের ঝুঁকি এবং অসুবিধা থাকে না। সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন সকল কিছু ঋণপ্রথার দ্বারা উপকৃত হয় ; স্থান ও কালের মধ্যে সংযোগ-সেতু হিসাবে ঋণ-প্রথা কাজ করে। ধাতু ও ধাতব মুদ্রার বদলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ঋণপত্র দ্বারা লেনদেন অনেক বেশি সুবিধাজনক।

ইহাদের সুবিধা

ঋণ-প্রথার বিশেষ বিপদ ও ত্রুটি হইল, ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে খুব বেশি। ব্যাঙ্ক ঋণদানের পরিমাণ বাড়াইলে বা সরকার অধিক পরিমাণে

প্রমিসরী নোটের প্রচলন করিলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতি হইতে পারে। হ'ট্রে বলেন যে, ব্যবসা-সংকট বা বাণিজ্য-চক্র সৃষ্টিতে এই প্রকার ঋণপ্রথাই প্রধানত দায়ী, ব্যাঙ্ক-ঋণের সঙ্কোচ ও প্রসারই এইরূপ ব্যবসায়-চক্র ঘটাইয়া থাকে। ঋণ-প্রথার ফলে সমাজে অনির্দিষ্টতা আসিয়া পড়ে; শেয়ার বাজারে বা দ্রব্যের বাজারে ফাট্‌কা ব্যবসায় শুরু হইতে পারে। জাতীয় বা আন্তর্জান্তিক ক্ষেত্রে ট্রাস্ট বা বৃহৎ একচেটিয়া ব্যবসায় সংগঠন স্থাপিত হইতে পারে।

ও অসুবিধা

ব্যাঙ্ক (Banks): ঋণ লইয়া যে-সংগঠনের ব্যবসায় পরিচালিত হয় সেইরূপ প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক বলে। সমাজের নিকট হইতে ঋণ করা এবং সেই টাকা ব্যক্তিদের মধ্যে ঋণ হিসাবে খাটানো, ইহাই ব্যাঙ্কের কাজ। সমাজে বহু প্রকার ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়; বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণদানের কাজে বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক নিযুক্ত থাকে।

ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল ব্যক্তিদের সঞ্চয়গুলি আমানতের আকারে একত্র সংগ্রহ করা। আমানত অনেক প্রকারের হইতে পারে। কারেণ্ট বা চল্‌তি আমানত, সেভিংস বা সঞ্চয়ী-আমানত ও স্থির-আমানত। কারেণ্ট আমানত হইতে ইচ্ছানুযায়ী টাকা উঠানো চলে, কিন্তু সেভিংস ও স্থির-আমানত হইতে টাকা উঠাইবার কিছু কিছু বাধা-নিষেধ থাকে। আমানত হইল ব্যাঙ্কের ঋণ এবং ইহা ব্যাঙ্কেরই দায়িত্ব (Liability)। কারেণ্ট হিসাবে রক্ষিত টাকাকে চাহিদা আমানত (Demand deposit) বলা চলে এবং অন্যান্য ধরনের আমানতকে কাল-আমানত (Time deposit) বলা চলে।

দ্বিতীয়ত, এই সকল টাকা ব্যাঙ্ক নিজের ব্যবহারের জন্য ধার করে না। সুদ পাইবার আশায় সে এই টাকাকে বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্রে খাটায় অর্থাৎ শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজে ঋণ দেয়। ব্যাঙ্ক ঋণ দেয় ঋণগ্রহীতার নামে আমানত সৃষ্টি করিয়া, কোন আমানতকারীকে ওভার ড্রাফট্‌ দিয়া, বিল অব এক্সচেঞ্জ বা হুণ্ডি ক্রয় করিয়া। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত ঋণ দেয় স্বল্প কালের জন্য, আবার বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক বা শিল্প ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দেয় দীর্ঘকালের জন্য। বণ্ড বা অন্যান্যপ্রকার দীর্ঘকালীন ঋণপত্র ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়।

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজী নোট প্রচলন করে এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কও চেকের সাহায্যে লেনদেনের সহায়তা করে। কোন ব্যাঙ্ক যখন টাকা জমা রাখে

তখন আমানতকারীকে চেক কাটিয়া টাকা তুলিয়া লইবার সুযোগ দেয়। এক ব্যাঙ্কের চেক অপর ব্যাঙ্কে জমা হয়, একজনের চেক বহুজনে গ্রহণ করে। এইরূপে বিনিময় ও প্রচলনের মাধ্যম হিসাবে টাকা সৃষ্টি করা ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলা চলে।

চতুর্থত, ব্যাঙ্কের বিবিধ প্রকার কাজ আছে। দলিল-পত্র বা অলঙ্কার প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যাদি নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে লোকে ব্যাঙ্কে জমা রাখে। ব্যক্তির হিসাব রক্ষা করে, বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনা করে, অথবা ব্যবসায়ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন প্রকার কাজ করিয়া থাকে। বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনা করে। দেশের এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে টাকার যাতায়াত সহজ করিয়া তোলে।

বর্তমান সমাজে ব্যাঙ্কের গুরুত্ব

দেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। উপযুক্ত ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ছাড়া শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠা কোন দেশের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। অনুন্নত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে অনুন্নতির কারণ বলা চলে। ব্যাঙ্ক-প্রথার ফলে মূলধনের চলনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ব্যাঙ্ক সংযোগ ঘটাইয়া দেয়। যাহারা মজুত টাকা ব্যবহার করিতে পারে না তাহাদের নিকট হইতে সেই টাকা লইয়া আসিয়া উপযুক্ত বিনিয়োগকারীদের সেই টাকা ঋণ দিয়া ব্যাঙ্ক উভয়কেই সাহায্য করে। সমগ্র দেশে টাকার যে-কেনাবেচা চলিতেছে ব্যাঙ্ক সেই কাজে সহায়তা করে। চেক কাটিয়া ও জমা লইয়া দেশের ব্যাঙ্কগুলি মিলিয়া যে প্রভূত পরিমাণ টাকা 'সৃষ্টি' করে তাহাতে দেশের আর্থিক কাঠামোতে প্রসারশীলতা ও নমনীয়তা দেখা দেয়। সমাজে সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বা সঞ্চয়-প্রবণতা বাড়িয়া যায় ; ব্যাঙ্কে বিনিয়োগের সুযোগ থাকায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে একত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা বিনিয়োগ করা হয় বলিয়া সমাজে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বৃদ্ধি পায়, অর্থ নৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়।

ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শীট (Balance Sheet of a Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উদ্বর্ত পত্র বা ব্যালান্স শীট (Balance sheet) বিশ্লেষণ করিলে ব্যাঙ্কের কাজকর্মের রূপ প্রকৃতভাবে বোঝা যায়। যে-সকল টাকা ব্যাঙ্কের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে, ব্যাঙ্ক সেই সকলের জন্য জনসাধারণের

নিকট দায়ী ; ইহা তাহার দেনাসমূহ (liabilities)। যে সকল টাকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক খাটাইয়াছে, নিযুক্ত সেই সকল টাকা ব্যাঙ্কের পাওনাসমূহ (assets)। দেনা ও পাওনার কাঠামো বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা, উহার কার্যাবলী প্রভৃতি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। সাধারণভাবে, দেনা ও পাওনার উভয়দিক সমান থাকে : কারণ ব্যাঙ্কের সকল পাওনা বা অর্থনিয়োগ বা সম্পত্তি অন্যের নিকট হইতে গৃহীত টাকার সাহায্যে করা হয়। সাধারণত, ব্যাঙ্কসমূহ যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গঠিত হয় ; সুতরাং শেয়ার বিক্রয় করিয়াই প্রাথমিক মূলধন সংগৃহীত হয়।

দেনা ও পাওনা

দেনার দিকে (ক) শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে-পরিমাণ অর্থ পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। (খ) দ্বিতীয়ত, চল্‌তি আমানত বা চাহিদা-আমানত। (গ) তৃতীয়ত, স্থায়ী আমানতসমূহ। (ঘ) চতুর্থত, সাবধানতার জন্য সকল ব্যাঙ্কই মুনাফার অংশ দ্বারা রিজার্ভ তহবিল গড়িয়া তোলে। উহা শেয়ার ক্রেতাদের সম্পত্তি বলিয়া ব্যাঙ্কের দেনা হিসাবে ধরা হয়। (ঙ) পঞ্চমত, অন্যান্য ব্যাঙ্ককে দেয় যে অর্থ বাকি রহিয়াছে অথবা ব্যাঙ্কের নিকট যে-সকল বিল দেনা হিসাবে রহিয়াছে।

দেনার বিষয়সমূহ

পাওনা বা সম্পত্তির দিকে (ক) সর্বপ্রথমে ধরিতে হয়, যে নগদ টাকা ব্যাঙ্কের হাতে রহিয়াছে, দৈনন্দিন লেনদেনের কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য যাহা ব্যাঙ্কের নিজের রিজার্ভে অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। (খ) অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট যে-পাওনা আছে অথবা অত্যল্পকালীন বিনিয়োগসমূহ। (গ) তৃতীয়ত, সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক যে টাকা বিনিয়োগ করিয়াছে। (ঘ) ঋণ হিসাবে যে-টাকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিয়াছে। (ঙ) পঞ্চমত, ব্যাঙ্কের নিজস্ব ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র অথবা অন্যান্য সম্পত্তিসমূহ।

পাওনার বিষয়সমূহ

ব্যাঙ্কের এই ব্যালান্স শীট বা দেনাপাওনার হিসাব পর্যবেক্ষণ করিয়া ব্যাঙ্কের কাজকর্মের স্বরূপ জানিতে পারা যায়। কোন বিশেষ ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থাও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-প্রথার নিয়মসমূহ সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহাও বুঝা যায়। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কপ্রথার তিনটি নীতি আছে ; সাবধানতা, মুনাফালভ্যতা ও তরলতা (safety, profitability and liquidity)। ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ এরূপ

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কপ্রথার তিন নীতি

হওয়া আবশ্যক যাহাতে জনসাধারণের আমানতী টাকার কোন লোকসানের ভয় থাকে না। উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উপযুক্ত বন্ধক লইয়া তবেই টাকা বিনিয়োগ করা উচিত। মুনাফার দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। সর্বোপরি, বিনিয়োগ এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে প্রয়োজন হইলেই অতি সত্বর উহাকে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যায়। অর্থাৎ, এরূপ সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা উচিত, যাহাকে অতিদ্রুত নগদ টাকায় পরিণত করা চলে।

বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তিতে ব্যাঙ্কের টাকা খাটানো (Distribution of assets of a Bank)

কোন ব্যাঙ্কের ব্যালান্স শীটের পাওনা বা সম্পত্তির দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাইব ব্যাঙ্কটি কোন্ কোন্ খাতে কত টাকা খাটাইয়াছে। দেশে বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তি আছে, যেমন নগদ টাকা, বেসরকারী ও সরকারী ঋণপত্র, বিল্ অফ্ এক্সচেঞ্জ, বণ্ড ও ডিবেঞ্চার, বিভিন্ন শিল্পে বা ব্যবসায়ে ঋণ দেওয়া, ঘর ভাড়া, আসবাবপত্র, জায়গা জমি প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে কোন্ ধরনের সম্পত্তিতে সে কত টাকা খাটাইবে, তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন।

ব্যাঙ্ক জানে যে, তাহার সকল আমানত যদি সে ধার দিয়া দিতে পারিত তবে তাহার মুনাফা হইত খুব বেশি। কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। বেশির ভাগ আমানত-কারীই চেক কাটিয়া লেনদেন করে স্থতরাং ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের পারস্পরিক দেনাপাওনা খাতায়-পত্রেই মিটাইয়া ফেলিতে পারে ; নগদ টাকার বিশেষ দরকার হয় না। তবুও কিছু সংখ্যক আমানতকারী নগদ টাকা অনেক সময় ফেরৎ চায়। তাই কিছু পরিমাণ নগদ টাকা তাহাকে নিজের কাছে সর্বদা জমা রাখিতেই হইবে। বেশি ঋণ দিলে বেশি স্থদ আয় হইবে, স্থতরাং ব্যাঙ্কের ইচ্ছা হইল নগদ টাকা কম রাখিয়া বেশি টাকা ঋণ দেওয়া। কিন্তু সাবধানের মার নাই, তাই ব্যাঙ্ক এই লোভ সংবরণ করিয়া রাখে, মোট আমানতের কিছু অংশ সে নগদ টাকা রূপে জমা রাখে। নগদ টাকাই সর্বাপেক্ষা তরল সম্পত্তি (most liquid of all assets), দরকার মত ইহার সাহায্যে ব্যাঙ্ক তাহার যে-কোন দেনা মিটাইতে পারে, কিন্তু নগদ টাকা হাতে জমাইয়া রাখিলে সেই টাকা হইতে স্থদ পাওয়া যায় না। বেশির ভাগ দেশে সরকারী আইন অনুযায়ী বা চিরাচরিত প্রথা (convention) অনুযায়ী মোট আমানতের কিছু অংশ সকল ব্যাঙ্ক নগদ টাকার আকারে জমা রাখিয়া থাকে।

নগদ টাকা জমা রাখা

ইহার পরেই সর্বাধিক তরল সম্পত্তি হইল অন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওনা টাকা। ইহাই তাহার আত্মরক্ষার বা প্রতিরোধের প্রথম লাইন (first line of defence)। ব্যাঙ্ক যখন দরকার মনে করে তৎক্ষণাৎ সে অন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নিজ পাওনা আদায় করিয়া নিজের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া ফেলিতে পারে।

অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট পাওনা

সম্পত্তিগুলির তারল্য ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে, (in descending order of liquidity), তাই দেখা যায় যে, অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওনার পরেই স্থান হইল তলব-ঋণের (call loans) বা অত্যল্পকালীন ঋণের। একদিন বা কয়েকদিনের জন্য এই ঋণ দেওয়া হয়। এই ধরণের ঋণ হইতে ব্যাঙ্কগুলি সুদ পায় খুবই কম, ঋণগ্রহীতাকে কোনরূপ সময় না দিয়া (without notice) এই ধরণের ঋণ ফেরৎ লওয়া চলে অর্থাৎ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। অনুন্নত দেশের তুলনায় উন্নত দেশগুলি ব্যাঙ্কের এই প্রকার বিনিয়োগে বেশি টাকা খাটাইয়া থাকে। তারল্য অনুযায়ী ইহার পরের ধাপের বিনিয়োগ হইল সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করা। স্বল্পকালীন ঋণপত্র বা ট্রেজারী বিল ক্রয় করিয়া অথবা দীর্ঘকালীন ঋণপত্র বা সরকারী প্রমিসরী নোট ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক এই খাতে টাকা খাটায়। এই সকল সূত্র হইতে একটু বেশি সুদ পাওয়া যায়। ইহাদের তারল্যও বিশেষ কম নয়, কারণ যে-কোন সময় ইহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ডিস্‌কাউন্ট করিয়া নগদ টাকা পাওয়া যায়। এইখাতে ব্যাঙ্কগুলির বিনিয়োগ যুদ্ধের মধ্যে ও পরবর্তীকালে বাড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কেরা তাহাদের মোট আমানতের ৩০% সরকারী ঋণপত্রে খাটায়, ভারতের ব্যাঙ্কগুলি প্রায় ৫০%।

তলব-ঋণ বা অত্যল্পকালীন ঋণ

সরকারী ঋণপত্র

বেসরকারী ব্যবসায়ীদের যে বিলগুলিকে ডিস্‌কাউন্ট করিয়া ব্যাঙ্ক নিজের হাতে রাখিয়াছে, সেইগুলিও তাহার গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি। ইহাদের মধ্যে যেগুলি খুব শীঘ্র ফলপ্রসূ হইবে (nearing maturity) উহাদের তারল্য অপেক্ষাকৃত বেশি। এই বিলগুলি নিজে নিজেই ফলপ্রসূ হয়, অর্থাৎ, ৩ বা ৬ মাসের মধ্যে ইহা হইতে টাকা পাওয়া যাইবে, দরকার হইলে এই সময়-সীমার পূর্বেই অন্য ব্যাঙ্কে বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ইহাদের ভাঙাইয়া লওয়া চলিবে, অর্থাৎ ডিস্‌কাউন্ট করিয়া নগদ টাকা পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া এই বিলগুলি

বেসরকারী ব্যবসায়ীদের বিল বা বণ্ড

হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি (negotiable instruments), তাই ইহাদের বন্ধক দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দরকার মত নগদ টাকা পাওয়া যায়।

ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়, অবশ্য কোন-না-কোন সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া সে এই ধরনের বিনিয়োগ করিয়া থাকে। আজকাল অবশ্য কোন কোন দেশে (যেমন ইংলণ্ডে) অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামিনের ভিত্তিতেও ঋণ দেওয়া হয়। ঋণগ্রহীতার নামে নূতন আমানত বা জমা খুলিয়া দিয়া বা তাহার নিজস্ব আমানতের তুলনায় বেশি টাকা তুলিয়া লওয়ার অনুমতি দিয়া (overdraft) ব্যাঙ্ক এইরূপ ঋণ দিয়া থাকে। এই ধরণের বিনিয়োগের তারল্য প্রধানত নির্ভর করে বন্ধকী রাখা জিনিসের তরলতার উপর।

আমানত সৃষ্টি এবং ওভারড্রাফট

তাহা ছাড়া, নিজস্ব ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র প্রভৃতিও ব্যাঙ্কের নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু এই প্রকার সম্পত্তির তারল্য অন্যান্য প্রকার বিনিয়োগের তুলনায় কম।

নিজস্ব ঘরবাড়ি

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মূলনীতি বা ঋণনীতি (Fundamental Principles of Commercial Banking or the credit Policy of a Commercial Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাজ হইল জনসাধারণের নগদ টাকাকে আমানতে পরিণত করা, আবার সেই আমানতকে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা। জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত হিসাবে তাহারা যে ঋণ লয়, সেই ঋণ আমানতকারী ব্যক্তিরা যখন খুশি ফেরৎ চাহিতে পারে। ব্যাঙ্কের টাকা ফেরৎ দিবার ক্ষমতার উপর এই আস্থা বা বিশ্বাসই ব্যাঙ্কের দিক হইতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। তাই তাহাকে সর্বদা সাবধান থাকিতে হয়, সে এমন পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখিবে বা এমন জায়গায় টাকা খাটাইবে যাহাতে আমানতকারীর টাকা নষ্ট না হয়। কিন্তু কেবলমাত্র সাবধানতার নীতি অবলম্বন করিয়া টাকা হাতে লইয়া বসিয়া থাকিলেই তাহার চলিবে না। ব্যাঙ্ক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, আর মুনাফা করাই সকল ব্যবসায়ের লক্ষ্য। যত কম

সাবধানতা মুনাফা লভ্যতা ও তরলতা

টাকা জমা রাখিয়া বেশি টাকা ধার দিবে, ততই তাহার মুনাফার সম্ভাবনা। তাই যে-ধরনের বিনিয়োগে সর্বাধিক মুনাফা পাওয়া যায় সেই ধরণের বিনিয়োগে টাকা খাটাইবার কথা তাহাকে ভাবিতে হইবে। কেবলমাত্র সাবধানতার নীতি অবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহার চলিতে পারে না। তাহাকে মুনাফালভ্যতার নীতি অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণে বিনিয়োগও করিতে হইবে। কিন্তু, ব্যাঙ্ক সর্বোচ্চ মুনাফার নীতি অনুযায়ী টাকা খাটাইতে পারে না, কারণ কেবলমাত্র এই নীতি অনুসরণ করিলে তাহাকে বিপদে পড়িতে হইতে পারে। ব্যাঙ্ক নিজের টাকায় ব্যবসায় করে না, অপরের নিকট হইতে ঋণ লওয়া টাকা বা আমানতই সে ঋণগ্রহীতাদের ধার দেয়। এই আমানতকারীরা যখন খুশি নিজেদের টাকা ফেরৎ চাহিতে পারে, অধিকাংশ আমানতকারীরা তাহাদের আমানত একত্রে তুলিয়া লইতে চাহিলে ব্যাঙ্কে রান্ (run) হইতে থাকে। এই সময়ে ব্যাঙ্কের উপর লোকের আস্থা ও বিশ্বাস টলিয়া গিয়াছে, সকল আমানতকারীকে নগদ টাকা ফেরৎ দিতে পারিলে তবেই এই আস্থা সে পুনরায় অর্জন করিতে পারে। সুতরাং ব্যাঙ্কগুলি এমনভাবে টাকা খাটায় যাহাতে তাহার বিনিযোগগুলিকে সে যথাসম্ভব দ্রুত নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতে পারে। কোন কোন সম্পত্তি দ্রুত অপর ধরনের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, তাহাই সেই সম্পত্তির তরলতার মাত্রা (degree of liquidity), তাই নগদ টাকাই সর্বাপেক্ষা তরল সম্পত্তি। ব্যাঙ্ক তাই এমনভাবে বিনিয়োগ করে যাহাতে তাহার বেশির ভাগ আমানতই তরল বিনিয়োগে আবদ্ধ থাকে, এই তারল্যের নীতি স্মরণ না করিয়া সে পারে না।

বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারের এই তিনটি নীতি স্মরণ রাখিবে

বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারের কাজই হইল এই সকল পরস্পরবিরোধী নীতির মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্য আনা। সে সাবধান থাকিবে, মুনাফাও বাড়াইবে, আবার এমন রূপে বিনিযোগ করিবে যাহা সহজে নগদ টাকায় রূপান্তর-যোগ্য। সাবধান হইয়া যদি সে বেশি টাকা জমা রাখে তবে বিনিয়োগের জন্য টাকা কম থাকিবে, লাভের আশা কম। যদি সর্বাধিক তরল সম্পত্তি, অর্থাৎ একেবারে নগদ টাকা হাতে রাখে তাহা হইলে লাভ হইবে কোথা হইতে? যত বেশি অতরল বা তারল্যহীন বিনিয়োগে টাকা খাটাইবে তত বেশি সুদ পাইবে, তাহার লাভও বেশি হইবে। কিন্তু তারল্যহীন বিনিয়োগে তাহার ঝুঁকি বেশি, নিরাপত্তা কম। তাই বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারের কাজই হইল এই তিনটি নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা।

প্রথমেই ধরা যাউক জমার কথা। বলা হয় যে, ব্যাঙ্কিং-এর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে জমা বা রিজার্ভের উপযুক্ত পরিচালনার উপর (**Successful banking depends laregely on the management of reserves**)। নিজের হাতে রক্ষিত নগদ টাকা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত জমা ইহাই তাহার আত্মরক্ষার প্রথম সোপান। এই জমার পরিমাণ বেশি হইবে না, কিন্তু পর্যাপ্ত হইবে। জমা উপযুক্ত না হইলে ব্যাঙ্ক নিজের বিপদ নিজেই ডাকিয়া আনিতেছে। আবার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হইলে যে-মুনাফা সে পাইতে পারিত তাহা হইতে ব্যাঙ্ক বঞ্চিত হইতেছে। এই জমা বা রিজার্ভ পরিচালনার ব্যাপারে তাই বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারকে ধনলিপ্সা ও ভীরুতার মধ্যে কোথাও একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আমানতের ঠিক কত অংশ সে নগদ টাকায় জমা রাখিবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে তাহার বিবেচনার উপর, কি-হারে আমানতকারীরা নগদ টাকা তুলিয়া লইবার কথা চিন্তা করিতেছে সেই সম্পর্কে ব্যাঙ্কারের অভিজ্ঞতার উপর। ব্যাঙ্কের মোট দেনার তুলনায় তাহার নগদ জমার পরিমাণ সর্বদাই কম, তাই সকল আমানতকারী এক সঙ্গে নগদ টাকা চাহিলে ব্যাঙ্ক ফেরৎ দিতে পারে না। কোন একটি ব্যাঙ্ক অবশ্য অন্যান্য ব্যাঙ্কের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে হঠাৎ প্রয়োজন হইলে টাকা আনিয়া আমানতকারীদের দেনা মিটাইতে পারে, কিন্তু সকল ব্যাঙ্কের পক্ষে একইসঙ্গে ইহা সম্ভবপর নয়। ব্যাঙ্কের উপর যতক্ষণ আমানতকারীদের আস্থা আছে, ততক্ষণ এই রিজার্ভের গুরুত্ব ততটা নাই, কিন্তু একবার আস্থা হারাইতে থাকিলে মোট আমানতের ১০০% জমা রাখাই একমাত্র নিরাপদ। সুসময়ে ইহার প্রয়োজন নাই, কিন্তু অসময়ে এই জমা পর্যাপ্ত নয়—এই অবস্থা মানিয়া লইয়াই ব্যাঙ্কারকে কাজ চালাইতে হয়।* সাধারণত ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের মোট আমানতের ৮ হইতে ১০% জমা রাখে; সকল দেশেই ব্যাঙ্কারদের অভিজ্ঞতা হইতে মোটামুটি এই রিজার্ভের অনুপাত সকল ব্যাঙ্কারের জানা থাকে।

রিজার্ভ সম্পর্কে ব্যাঙ্কের নীতি

রিজার্ভ বা জমার পরিমাণ সম্পর্কে মোটামুটি স্থির করিয়া ব্যাঙ্কার তাহার বিনিয়োগের দিকে নজর দেয়। মুনাফা বাড়াইতে হইবে, আবার বিনিয়োগের তারল্যও বজায় রাখিতে হইবে। বিভিন্ন ঝুঁকিসম্পন্ন ঋণে বিভিন্ন সুদের

***"Modern private banking is an uneasy compromise of elements which are unnecessary if the sun is shining, and insufficient if it is not."**

হারে সে টাকা খাটায়। এই বিষয়ে কোন ব্যাঙ্কারকে অনেক দিকে চিন্তা করিতে হয়। যেমন, সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বেশি দিন আবদ্ধ থাকিতে পারে এইরূপ স্থানে টাকা খাটায় না। সাধারণত লোকে অল্প সময়ের জন্য টাকা আমানত রাখে, তাই ব্যাঙ্ককেও ঐ আমানত অল্পসময়ের মধ্যেই খাটাইয়া লইতে হয়। অল্প-সময়ী আমানত লইয়া দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা খাটাইবার ঝুঁকি সে নিতে পারে না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে (যেমন তিন মাসে) যে-বিলগুলি আপনাআপনি ফলপ্রসূ হইয়া উঠে (self liquidating), সেই ধরনের ঋণপত্রে নিয়োগ করাই ব্যাঙ্কের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। অধিক সময়ের জন্য ধার দেওয়ার দুইটি বিপদ, টাকা ফেরং না পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আর বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য বাজারে হ্রাস হইতে পারে। সেইজন্য বলা হয় যে, বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারের গুণ হইল বিল ও বন্ধকের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারা (difference between bill and mortgage)।

বিনিয়োগ সম্পর্কে ব্যাঙ্কের নীতি

কেবলমাত্র প্রথমশ্রেণীর বিল চিনিতে পারিলেই ব্যাঙ্কারের কাজ শেষ হয় না, তাহাকে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে এই বিনিয়োগগুলি উপযুক্তভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হয়। এই বিষয়ে তাহাকে অনেক দিকের উপর নজর রাখিতে হয়। দেশে কখনও কখনও টাকার লেনদেন বাড়ে, তাহাকে বলে তেজী মরসুম (busy season); আবার কখনও কখনও টাকার লেনদেন কমে উহাকে বলে মন্দা মরসুম (slack season)। মন্দার মরসুমে ব্যাঙ্কের ঋণের জন্য চাহিদা কম, আবার তেজী মরসুমে উহার চাহিদা বেশি। তাই ব্যাঙ্কার এমনভাবে বিল ও সিকিউরিটিগুলি কেনে যাহাতে মন্দার মরসুমে বেশি টাকা তাহার কাছে ফিরিয়া না আসে অথচ তেজী মরসুমে অধিকাংশ বিল ও সিকিউরিটিগুলি ফলপ্রসূ হয় এবং তাহার নিকট নগদ টাকা পৌঁছে। মন্দার মরসুমে যখন ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা বেশি, তখন সে অতি অল্প সময়ের জন্য টাকা খাটাইবে, ইহাতে খুব কম আয় হইলেও সে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা আবদ্ধ করিবে না। কারণ সে তেজী মরসুমের অপেক্ষায় আছে, সেই সময় তাহার হাতে নগদ টাকার পরিমাণ যথাসম্ভব বেশি থাকা দরকার। দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা খাটানোর ঝোঁক আজকাল ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে দেখা যাইতেছে। যদি হাতে বেশ কিছু পরিমাণ বেশি টাকা থাকে তবেই ব্যাঙ্ক এই চিন্তা করিতে পারে।

বিভিন্ন সময়ে ফলপ্রসূ ঋণপত্র

বিনিয়োগের ঝুঁকির পরিমাণ কমাইবার উদ্দেশ্যে আজকাল কয়েকটি ব্যাঙ্ক মিলিয়া সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান (consortiumn) গঠন করিয়া দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখার জন্য ব্যাঙ্ক তাহার মোট বিনিয়োগকে বিভিন্ন প্রকার ঋণের মধ্যে সুচিন্তিতভাবে ছড়াইয়া রাখিবে। কিছু টাকা সে তরল-ঋণ ও অত্যল্পকালীন ঋণেব বাজারে খাটাইবে। এবং নির্দিষ্ট সময়ে যে-বিলগুলি আপনা আপনি ফলপ্রসূর সম্ভাবনা তাহাতে কিছু টাকা রাখিবে। সরকারী স্বল্পকালীন বিল বা ট্রেজারী বিলে সাধারণত বেশি টাকা রাখা হয়। মধ্যকালীন বা দীর্ঘকালীন সরকারী বিনিয়োগে টাকা রাখা ততটা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া অনেকে মনে করেন, কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদ সম্পর্কে নীতির উপর এই সিকিউরিটি-গুলির দাম নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়াইলে সরকারী সিকিউরিটিগুলির বাজার-দর কমিয়া যায়, তাই ইহাতে টাকা খাটানো বিশেষ নিরাপদ নয়।

বিভিন্ন তরলতা-সম্পন্ন ঋণপত্র

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ব্যাঙ্কের ধনসম্পন্নতা (solvency) ও তরলতা (liquidity) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কোন ব্যাঙ্কের অবস্থা ভাল, ইহা বেশ ধনসম্পন্ন—এই কথা বলিলে বোঝা যায় তাহার ঋণ-পরিশোধের যোগ্যতা আছে। অর্থাৎ, ব্যাঙ্কের মোট সম্পত্তির পরিমাণ এত যে সে মোট দেনা মিটাইতে সক্ষম, তাহার ঋণশোধযোগ্যতা আছে। কিন্তু এই অবস্থাতেও তাহার তারল্য না থাকিতে পারে। তারল্য নির্ভর করে সে কি ধরনের সম্পত্তিতে টাকা খাটাইয়াছে, উহাদের কত দ্রুত এবং ক্ষতি স্বীকার না করিয়া আবার নগদ টাকায় পরিণত করা সম্ভব—ইহার উপর। ঋণসম্পন্নতা থাকিলেই ব্যাঙ্কটি নিরাপদ নহে, তারল্য থাকিলে তবেই তাহার ঝুঁকি কম। অনেক সম্পত্তি থাকা অবস্থাতেই যদি চাহিবামাত্র ব্যাঙ্কটি আমানতকারীকে টাকা দিতে না পারে, তবে তাহার নিরাপত্তা নাই। তাই বিনিয়োগের দিক হইতে ব্যাঙ্কের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা।

ঋণশোধযোগ্যতা ও তরলতা এক নয়

সম্পত্তি বা বিনিয়োগ পরিচালনার তত্ত্ব (Theories of Asset Management)

কেমন করিয়া ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের বিনিয়োগের বা সম্পত্তির তারল্য বজায় রাখিতে পারে সেই বিষয় ব্যাঙ্কিং-এর পণ্ডিতেরা বহু আলোচনা করিয়াছেন। অনেকদিন ধরিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে যে, এই ব্যাঙ্কগুলি কেবলমাত্র স্বল্পকালের জন্য আপনাআপনি পরিশোধ্য এবং উৎপাদক-ঋণ (**shorterm self-liquiding, productive loan**) দিবে। এই নীতি অনুসরণ করিলে ব্যাঙ্কগুলি কেবলমাত্র দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ের (বা বণ্টনের) উদ্দেশ্যে ঋণ দিবে। কোন কারখানায় দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, বা কারখানা হইতে দ্রব্যগুলি বিক্রয়ের জন্য বাজারে যাইতেছে —এই সকল ধারাকে সাহায্য বা ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যাঙ্কগুলি ধার দিবে, অনেকে এইরূপ মনে করেন। দ্রব্য উৎপন্ন হইলে বা বিক্রয় হইয়া গেলে ব্যাঙ্ক সেই টাকা হইতে এই ঋণ ফেরৎ পাইবে, উৎপাদন ও বিক্রয়ের ধারার মধ্যেই এই ঋণ শোধ হইয়া যাইবে—তাই ইহাদের স্বয়ংশোধ্য ঋণ বা সম্পত্তি (**self-liquidating assets**) বলিয়া মনে করা হয়। এই ধরণের কাজে ঋণ দানের নীতিকে বলা হয় "আসল-বিলের নীতি" (**Real Bills Doctrine**) বা "স্বয়ং পরিশোধের তত্ত্ব" (**Theory of Self-Liquidity**)। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাঙ্কিংজগতে এই নীতির প্রাধান্য ছিল, এবং বর্তমানেও বহু পণ্ডিত ইহাকে সমর্থন করেন।

আসল-বিল বা স্বয়ংশোধের নীতি

আধুনিককালে এই তত্ত্বের বহুবিধ সমালোচনা হইয়াছে এবং মোটামুটি ইহার পরিবর্তে ভিন্নরূপ নীতির কথা বলা হইতেছে।* যেমন, প্রতিটি ব্যাঙ্কের প্রতিটি ঋণই যদি এইরূপ 'আসল-বিলের নীতি' অনুযায়ী করা হয় তাহা হইলে ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতে পারে না। যে-উৎপাদনধারা বা বিক্রয়-ধারা সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ঋণ লওয়া হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্বমুহূর্তে আবার ঋণ লওয়া দরকার হয় অথবা পুরাতন সেই ঋণ আবার দেওয়া হইবে (**renewal of old loans**) এইরূপ প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন হয়। পুরাতন ঋণ সম্পূর্ণ শোধ পাইলে আবার

এই নীতির ত্রুটি

***"The real bills doctrine, as Mr. Hart has observed, sounds very nice as it has a flavour of 'unattainable moral beauty' about it. But it conceals several fallacies."—Dr. S. K. Basu, *A Survey of Contemporary Banking Trends*, p 281.**

নূতন ধারা শুরুর সময়ে ঋণ পাওয়া যাইবে এইরূপ হইলে সমাজে উৎপাদন ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। দেশের কোন কোন ব্যাঙ্ক যদি নূতন ঋণ সৃষ্টি করিয়া চলে তবে সেই ঋণস্রোতই দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইয়া দিয়া সকল ব্যাঙ্ক হইতে ঋণগ্রহীতাদের পুরাতন ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা গড়িয়া তুলিতে থাকে। পুরাতন বিলগুলি পরিশোধের পূর্বে যদি ব্যাঙ্কেরা নূতন বিল গ্রহণ করিতে রাজি না হয়, তবে সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতাদের কাজকর্ম প্রসারিত হয় না, উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য হ্রাস পায়, দেশের ক্রয়শক্তি কমিয়া যায়, দামস্তর কমে, পুরাতন ঋণগ্রহীতারাও তাহাদের ঋণ শোধ করিয়া উঠিতে পারে না।* বিশেষত, ব্যবসায় সংকটের যুগে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া অনেক সময় ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, এই অবস্থায় যদি ব্যবসায়ীদের নূতন ঋণ পাইবার পূর্বেই পুরাতন ঋণ শোধ দিতে হয় এবং দেশে সকল ব্যাঙ্ক মিলিয়া ঋণ-সংকোচনের নীতি গ্রহণ করে তবে ব্যবসায়-বাণিজ্য নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই নীতি তাই সমর্থনযোগ্য নহে।

তাহা ছাড়া, আধুনিক কালে তারল্য সম্পর্কে ধারণা পূর্বাপেক্ষা একটু ভিন্নরূপ হইয়া উঠিয়াছে। কোন ব্যাঙ্ক যদি তাহার সম্পত্তিগুলিকে অন্য ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে পারে অথচ তাহার কোনরূপ আর্থিক ক্ষতি না হয়, তবেই সেই ব্যাঙ্ক তরল অবস্থায় আছে বলিয়া মনে করা যায়।

অপসারণের তত্ত্ব

দরকারমত আমার হাতের বিল ও সিকিউরিটিগুলি বিনা-ক্ষতিতে আমি যদি অন্যত্র বিক্রয় করিতে পারি, তবেই আমার ঋণশোধযোগ্যতা এবং তারল্য বজায় রহিল, এইরূপ মনে করা চলে। ইহাকে বলে 'অপসারণের নীতি' (Shiftability theory)। দ্রুত এবং লোকসান না দিয়া কোন ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের নিকট নিজ সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিয়া নগদ টাকা ফেরৎ

* "If bankers, in a misguided attempt to 'liquidate' their assets, refuse to take up any new bills and do simply sit back in their parlours and wait for the maturities of the bills in their portfolios there is a catastrophic fall in the supply of purchasing power and the catastrophic fall in prices which makes it impossible for debtors to meet bills out of the proceeds of their operations. Only by maintaining their assets can banks maintain the 'self-liquidating' character of a substantial class of them. The banks are for the most part important direct lenders in the short-term Capital market, and the availability of means to pay off maturing short-term debts depends essentially on the bank's readiness to make new short-term loans." Sayers, *Modern Banking* (4th Edn) P, 196.

পাইতে পারে—এই ধরণের সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করিলেই তারল্য বজায় থাকে। ফলপ্রসূ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই—দরকার হইলে উহার পূর্বেই বিলগুলিকে অন্যত্র অপসারণ করা সম্ভব হইলে উহাকে তারল্য বলিয়া মনে করা হয়।*

অপসারণ তত্ত্বের সমর্থনকারীরা মনে করেন যে, কেবলমাত্র অন্য ব্যাঙ্কের নিকট নয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট অপসারণের যোগ্য বিবেচিত হইলেই সেই বিলগুলি কিনিয়া বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা চলে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে-সকল বিল বা ঋণপত্র কিনিতে প্রস্তুত আছে, কোন ব্যাঙ্ক সেইগুলিতে টাকা খাটাইলেই তাহার তারল্যাবস্থা বজায় থাকে, কারণ দরকারমত সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে উহাদের বিনিময়ে নগদ টাকা পাইবে।

'আসল-বিলের তত্ত্ব' বা 'অপসারণের তত্ত্ব' যাহাই গ্রহণ করা হউক না কেন ব্যবসায়-সংকটের যুগে ইহাদের কোনটিই ব্যাঙ্ককে বাঁচাইতে পারে না। সংকট-কালে বিল ও সিকিউরিটিগুলি আপনা-আপনি ফলপ্রসূ (self-liquidating) হইয়া উঠে না, কারণ ঋণগ্রহীতাদের ঋণশোধের ক্ষমতা হ্রাস পায়। সকল ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা আসিলে কোন ব্যাঙ্কই অপর কাহারও নিকট নিজের কোন সম্পত্তি অপসারণ করিতে পারে না। এই অবস্থায় একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই আশ্রয়স্থল

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঋণপত্রগুলি গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়, তবে সেই ব্যাঙ্কের পক্ষে তারল্য বজায় রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গ্রহণযোগ্য বিলগুলিতে বিনিয়োগ করিতে পারাই তাই তারল্যরক্ষার প্রকৃষ্ট পথ।

সর্বশেষে আমেরিকার ব্যাঙ্কিং-জগতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝোঁকের কথা উল্লেখ করা দরকার। আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলি আজকাল ব্যবসায়ীদের মধ্যকালীন ও দীর্ঘকালীন প্রয়োজন মিটাইবার জন্যও ঋণ দিতেছে। ইহাদের টার্ম লোন্ (Term loan) বলে। বর্তমানের চুক্তি অনুযায়ী এক বৎসর পরে যে-ঋণ পরিশোধনীয় উহাকে টার্ম ঋণ বলা হইতেছে। সাধারণত এই সকল ক্ষেত্রে ঋণ-কাল ১ বৎসরের বেশি, কিন্তু ৫ বৎসরের কম। সমস্ত ঋণকাল ধরিয়া ভবিষ্যতের

* "What is essential is maintenance of a substantial quantity of assets which can be shifted on to other banks before maturity in case of necessity. Thus liquidity is tantamount to shiftability." S. K. Basu *Contemporary Banking Trends*, P 283.

আয় হইতে এই ধরণের ঋণ পরিশোধ করা হইয়া থাকে। যন্ত্রপাতি, মজুত দ্রব্যসামগ্রী এবং অনেক সময় ঘরবাড়িও বন্ধক লওয়া হয়। বারবার স্বল্পকালীন ঋণ-দান ও গ্রহণ করার অসুবিধা এড়াইবার জন্য এবং আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলির হাতে প্রভূত উদ্বৃত্ত টাকা বিনিয়োগের পথ বাহির করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের ঋণনীতির উদ্ভব হইয়াছে। মার্কিন ব্যাঙ্কিং-জগতের এই নূতন কাজকর্ম বহুলাংশে পুরাতন ব্যাঙ্কিং নীতির বিরোধী। 'আসল-বিলের তত্ত্বে' ঋণগ্রহীতার দ্রব্য বা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক টাকা আদায় করে; 'অপসারণ তত্ত্বে' অপর কোন ঋণদাতার নিকট হইতে ব্যাঙ্ক এই ঋণ পরিশোধ পায়। কিন্তু এই টার্ম ঋণগুলি ব্যাঙ্ক ফেরৎ পায় "ঋণগ্রহীতার প্রত্যাশিত আয়" হইতে (anticipated income of the borrower)। এইরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্কগুলির বিনিয়োগের তারল্য সম্পর্কে নূতন এক তত্ত্ব গড়িয়া উঠিতেছে। ঋণগ্রহীতা নিজের ভবিষ্যত আয় হইতে সঞ্চয় করিয়া ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করিবে—এই তত্ত্ব পূর্বের দুইটি হইতে অনেকাংশে পৃথক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

ঋণগ্রহীতার ভবিষ্যৎ প্রত্যাশিত আয়ের তত্ত্ব

ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণসৃষ্টি (Creation of credit by Banking system)

আধুনিককালে ব্যাঙ্কের আমানত দুই প্রকারে সৃষ্টি হইতে পারে। প্রথমত, আমানতকারী কোন ব্যক্তি নগদ টাকা লইয়া ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলে ব্যাঙ্ক তাহার নামে আমানত-হিসাব (Deposit account) খুলিয়া দেয়; ইহাকে প্রকৃত আমানত (Actual deposit) বলে। দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিলে ব্যাঙ্ক ঋণ-গ্রহীতার নামে নিজের খাতায় হিসাব খুলিয়া দেয়; সেই হিসাব হইতে ঋণের পরিমাণ পর্যন্ত টাকা চেকের সাহায্যে তুলিয়া লইবার অনুমতি দেয়। ইহাকে সৃষ্ট-আমানত (Created deposit) বলা হয়।

দুই প্রকার আমানত সৃষ্টি

প্রথম প্রকার বা প্রকৃত আমানত সৃষ্টি হয় আমানতকারী ব্যক্তির তাগিদে। দ্বিতীয় প্রকার বা সৃষ্ট-আমানত সৃষ্টির তাগিদ আসে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে। এইরূপে আমানত সৃষ্টি করিয়াই ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়।

ব্যাঙ্ক কোথা হইতে ঋণ দেয়? যে নগদ টাকা তাহার নিকট আমানত

* Dr. S. K. Basu, *Contemporary Banking Trends*, P. 285—89.

হিসাবে আসে, তাহার সম্পূর্ণ পরিমাণ ঋণ দিতে পারে না, কারণ আমানতকারী যদি টাকা উঠাইয়া লইতে চায়, ব্যাঙ্ককে তাহা দিতে হইবে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক জানে যে, সকল আমানতকারীগণ এক সঙ্গে তাঁহাদের সকল আমানত উঠাইয়া লইতে চাহেন না। মোট নগদ আমানতের সম্পূর্ণ পরিমাণ ব্যাঙ্কে না রাখিলেও দৈনন্দিন লেনদেনের কাজ চালানো যায়। সুতরাং নগদ আমানতের কিছু অংশ, শতকরা কিছুভাগ নগদ টাকা দৈনন্দিন লেনদেনের উদ্দেশ্যে জমা রাখিয়া অধিকাংশ টাকাই ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। নগদ সঞ্চয়াংশের (Cash Reserve) পরিমাণ বেশি হইলে ব্যাঙ্ক কম ঋণ দিতে পারে, নগদ সঞ্চয়াংশের পরিমাণ কম হইলে ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে পারে।

ব্যাঙ্ক কর্তৃক আমানতী অর্থের নির্দিষ্ট হার নিজের হাতে নগদ জমা

ব্যাঙ্ক যখন আমানত সৃষ্টি করে তখন ঋণগ্রহীতার নামে আমানত হিসাবে ব্যাঙ্কের খাতায় হিসাব লিখিয়া রাখে এবং সেই হিসাব হইতে চেক কাটিয়া ঋণ-গ্রহণকারী ঋণ লয়। সেই ঋণ পুনরায় নগদ আমানত হিসাবে, হয় ঋণপ্রদানকারী ব্যাঙ্কে, অথবা অপর কোন ব্যাঙ্কে জমা হইয়া পড়ে। এই নূতন জমার ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক পুনরায় ঋণবৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পায়। এইরূপে প্রতিবার ঋণদানের ফলে নূতন আমানত সৃষ্টি হয় এবং প্রতিবার নূতন আমানত সৃষ্টির ফলে নূতন ঋণদান সম্ভব হয়। এইরূপে ব্যাঙ্কগুলি মিলিয়া সামগ্রিকভাবে তাহাদের মোট নগদ-আমানতের বহুগুণ বেশি মোট ঋণ সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ব্যাঙ্কব্যবস্থা কর্তৃক ঋণার্থ সৃষ্টি

মনে করা যাউক, A-ব্যাঙ্ক কোন এক ব্যক্তির নিকট হইতে 1000 টাকার নগদ আমানত পাইল। ধরা যাউক, দেশে এইরূপ আইনসঙ্গত নিয়ম বা প্রথা চালু আছে যে, মোট নগদ আমানতের 10% ব্যাঙ্ককে নিজের কাছে জমা রাখিতে হয়। এমতাবস্থায় A-ব্যাঙ্ক নগদ আমানতের 10% অর্থাৎ 100 টাকা জমা রাখিয়া অবশিষ্ট 900 টাকা কাহাকেও ঋণদান করিবে।

কিন্তু বর্তমান ব্যাঙ্কব্যবস্থাই এইরূপ যাহাতে ঘটনার স্রোত আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়া যায়। যাহারা 900 টাকা ঋণ পাইল তাহারা এই টাকা ব্যয় করার ফলে যাহাদের হাতে গিয়া ইহা নূতন আয়রূপে দেখা দিল, তাহারা A-ব্যাঙ্কে বা অন্য কোন ব্যাঙ্কে জমা দিবে। মনে করা যাউক, সেই 900 B-ব্যাঙ্কে নগদ আমানতরূপে জমা পড়িল। B-ব্যাঙ্ক 900 টাকা নগদ-আমানতের 10%

অর্থাৎ 90 টাকা জমা রাখিয়া 810 অপর কাহাকেও ঋণ হিসাবে দিয়া দিল। সেই 810 টাকা, আবার ধরা যাউক, C-ব্যাঙ্কে জমা পড়িল এবং C-ব্যাঙ্ক ইহার 10% অর্থাৎ 81 টাকা জমা রাখিয়া 729 টাকা নূতন ঋণ স্থষ্টি করিল। যতদিন না পর্যন্ত নগদ-আমানতের পরিমাণ বিশেষভাবে কমিয়া গিয়া পরিমাণ এইরূপ দাঁড়াইবে যাহাতে নূতন ঋণস্থষ্টি করা আর সম্ভব নহে, ততদিন এইরূপে নূতন ঋণস্থষ্টি-ধারা চলিতে থাকিবে। এই ক্ষেত্রে 900 টাকার প্রথম ঋণদানের ফলে সমগ্র সমাজে 9000 টাকার ঋণ স্থষ্টি পাইবে। স্থতরাং, দেখা যাইতেছে, ব্যাঙ্কগুলি একত্রে মিলিয়া সমাজে মোট অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে পারে।

দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা (Banking System) কর্তৃক ঋণস্থষ্টির ক্ষমতার কিন্তু সীমা আছে। কোন ব্যাঙ্ক যদি বেশি নগদ টাকা নিজের হাতে জমা রাখিয়া দেয়, তবে ভবিষ্যতে অন্য ব্যাঙ্কও নগদ-আমানত কম পাইবে এবং সমাজে মোট ঋণস্থষ্টির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তি যদি ঋণ গ্রহণ করিয়া কোন ব্যাঙ্কে জমা না দিয়া সেই নগদ টাকা নিজের হাতে জমাইয়া রাখে, তবে তাহা ঋণস্থষ্টি করিতে পারে না। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির (খোলা বাজারে কার্যাদির) দ্বারা সমাজে নগদ টাকার পরিমাণ কমাইয়া দিলে মোট ঋণস্থষ্টির পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে তখনই রাজি থাকে যখন উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য পায়। উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য না থাকিলে ঋণ দেওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে বিপজ্জনক। তাই দেশে বন্ধক-যোগ্য উপযুক্ত শেয়ার ও সম্পত্তি থাকা দরকার ; তবেই ঋণের প্রসার সম্ভব। অধ্যাপক সেয়ার্স ঠিকই বলিয়াছেন যে, "The banks put this newly created money into the hands, not of everybody at once, but of those individuals who can offer to the bank the kind of asset which the bank thinks attractive."

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কর্তৃক ঋণস্থষ্টির সীমাবদ্ধতা

সর্বোপরি, মনে রাখা দরকার যে, ব্যাঙ্কগুলির ঋণস্থষ্টির ক্ষমতা নির্ভর করে দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থার উপর, অর্থাৎ দেশে উপযুক্ত আশাবাদী আবহাওয়া আছে কি নাই তাহার উপর। যদি বেশি সংখ্যক ব্যক্তি ঋণ লইতে না আসে, তবে ব্যাঙ্কের নিজের ইচ্ছা থাকিলেও ঋণপ্রসারের এই ধারা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে না। ঘোড়াকে জলের নিকট পৌঁছানো চলে, কিন্তু জলপানে

বাধ্য করা যায় না ; ঠিক সেইরূপ ব্যাঙ্কের ইচ্ছা থাকিলেও দেশে ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তির অভাবে ঋণপ্রসারের ধারা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে।

মিশ্র ব্যাঙ্কিং (Mixed Banking)

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে. ইউরোপের কয়েকটি দেশে (যেমন ইতালী, জার্মানী, হাঙ্গেরী, বেলজিয়াম প্রভৃতিতে) প্রাচীন ব্যাঙ্কিং-নীতির বদলে নূতন ব্যাঙ্কিং রীতি-পদ্ধতি দেখা দিয়াছে। চিরাচরিত ব্যাঙ্কিং-নীতি ছিল স্বল্পকালীন প্রয়োজনে ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা খাটানো : ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত শিল্প-কলকারখানাকে ধার দিত না, কারণ ইহাতে বেশিদিনের জন্য টাকা অপরের নিকট আবদ্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু এইসকল দেশের ব্যাঙ্কসমূহ শিল্পগুলিকেও ধার দিয়াছে এবং বেশিদিনের জন্য তাহাদের নিকট টাকা ফেলিয়া রাখিয়াছে। নিজেদের দেশের শিল্পোন্নয়নে ব্যাঙ্কসকল এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, ইহাদের প্রচেষ্টায় নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। এই সকল দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ বিনিয়োগ-ব্যাঙ্কিং (Investment Banking) শুরু করিয়াছে। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট, শিল্প-পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা, দেশে অর্থনৈতিক সংগঠনের পরিবর্তন (যেমন জার্মানীতে যুদ্ধের প্রয়োজনে অতি দ্রুত শিল্পায়ন), এই সকল কারণে রক্ষণশীল ব্যাঙ্কিং-নীতি ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং পৃথিবীর বহুদেশে নূতন ধরণের এই প্রকার মিশ্র ব্যাঙ্কিং গড়িয়া উঠিযাছে।

মিশ্র ব্যাঙ্কিং কি ও কেন

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে এই প্রকার মিশ্র ব্যাঙ্কিং বিশেষ সুবিধাজনক—ইহা জার্মানী, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ইতিহাস হইতে জানা যায়। এখানকার ব্যাঙ্কাররা ঋণগ্রহণকারী শিল্পপতির আদ্যন্ত খোঁজখবর রাখে, সেই শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা লইয়া যথেষ্ট চিন্তা করে। ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য বাজারে শেয়ার ছাড়া হইবে ইহার ভিত্তিতেই ব্যাঙ্ক শিল্পপতিকে ঋণ দেয়, শেয়ার ছাড়া হইলে যাহাতে উহা বিক্রয় হয় সেইজন্য ব্যাঙ্ক সেই শেয়ার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তোলে, নিজেরা অনেক সময় শেয়ার বিক্রয়ের আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করে, গ্যারান্টি দেয়, আণ্ডাররাইট করে, নিজেদের সুনাম জড়াইয়া দিয়া শিল্পপতিকে টাকা তুলিতে এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। যদি কোন একটি ব্যাঙ্কের আমানতের

মিশ্র ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা ও কি অবস্থায় ইহা সম্ভব

তুলনায় নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ বেশি হয়, আমানতের অধিক অংশ দীর্ঘকালীন আমানত হয়, তাহা হইতে ব্যাঙ্কের মোট বিনিয়োগের কিছু অংশ শিল্পের দীর্ঘকালীন মূলধন ভাণ্ডারে নিয়োগ করা সম্ভবপর। এই ধরণের বিনিয়োগে লাভের হার বেশি, উপরন্তু যে-ঝুঁকি আছে তাহা দূর করা অসম্ভব নয়। খুব সাবধানতার সহিত ও বিবেচনা করিয়া যদি ভবিষ্যতে উন্নত হইবে এইরূপ শিল্পে টাকা খাটানো যায়, এবং কয়েকটি ব্যাঙ্ক একত্র হইয়া সিণ্ডিকেট বা কন্‌সর্টিয়াম গঠন করিয়া শিল্পে ঋণ দেওয়া হয় তবে স্বভাবতই ঝুঁকির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। ব্যাঙ্কার ও শিল্পপতি পরস্পরের অভিজ্ঞতা হইতে লাভবান হন; শিল্পপতি বাজারের অবস্থা জানিতে পারেন, আবার ব্যাঙ্কাররাও শিল্পটির আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানেন বলিয়া লোকসান এড়াইবার চেষ্টা করিতে পারেন।

মিশ্র ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতির দিকটাও আলোচনা করা দরকার। এই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সর্বাধিক প্রকাশ পায় ব্যবসায়-সংকটের যুগে; কারণ এই সময় মূলধনী দ্রব্যসামগ্রীর দাম বা বিনিয়োগের মূল্য হ্রাস পায়। ব্যাঙ্কের অধিকাংশ বিনিয়োগই আবদ্ধ হইয়া পড়ে, নগদ টাকায় রূপান্তরণ সম্ভব হয় না। ১৯২৯–৩০ সালের অর্থনৈতিক সংকটে আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান ও অন্যান্য দেশে ইহাই ঘটিয়াছিল। আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলি নিজেরা বা তাহাদের সহ-প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে শেয়ার-বাজারে প্রভুত টাকা খাটাইয়াছিল, তাই শেয়ারের দাম কমিয়া যাওয়ায় তাহাদের অবস্থা হঠাৎ বিপদজনক হইয়া উঠে। ব্যাঙ্কগুলি প্রায়ই সাবধানতার সীমারেখা অতিক্রম করিয়া দীর্ঘকালীন ঋণে টাকা খাটাইত, ফলে তাহাদের অবস্থা সর্বদাই তারল্যহীন হইয়া উঠিত। শিল্পে অতি-বিনিয়োগের দরুণই ১৯৩২ সালে ফ্রান্সের **Banque Nationale de credit** ভাঙিয়া পড়িয়াছিল; ঠিক একই কারণে **Austrian Creditanstalt** বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মিশ্র ব্যাঙ্কিং-এর ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোর সকল অঙ্গে এমন এক ফাটকাবাজির মনোভাব দেখা দেয় যে, তাহা দেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক গতিকে তুচ্ছ করিয়া অস্বাভাবিক কতকগুলি প্রবণতার সৃষ্টি করে। ব্যাঙ্কসমূহ অসঙ্গত ধরণের বিনিয়োগে প্রমত্ত হইয়া উঠে, অবশেষে তারল্যহীন সম্পত্তিতে আমানতকারীদের টাকা আবদ্ধ করিয়া ফেলে।

মিশ্র ব্যাঙ্কিং-এর ত্রুটিবিচ্যুতি

এই সকল বিরূপ অভিজ্ঞতার ফলে অনেক দেশেই মিশ্র ব্যাঙ্কিং-এর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন করিয়া বলা হইয়াছে যে,

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ শিল্পে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করিতে পারিবে না। ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে বেলজিয়ামের ব্যাঙ্কসমূহ আর শেয়ার বা শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিতে পারিবে না - এইরূপ আইন করা হইয়াছে। সুইডেন, ভারতবর্ষ সর্বত্র এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু, মিশ্র ব্যাঙ্কিং এর বিরুদ্ধে এইরূপ আইন করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সম্মুখীন হইয়া পুনরায় মিশ্রব্যাঙ্কিং রীতি গ্রহণ করার কথা চিন্তা করিতেছেন। ব্যাঙ্কগুলির হাতে টাকার পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছে, স্বল্পকালীন বিনিয়োগে আর তাহাদের উপযুক্তভাবে নিয়োগ করা যাইতেছে না। তাই উন্নত দেশগুলিতে ব্যাঙ্কিং-বিশেষজ্ঞগণ অল্প পরিমাণে মিশ্রব্যাঙ্কিং গ্রহণ করার প্রস্তাব সমর্থন করিতেছেন।

বিরূপ প্রতিক্রিয়া, কিন্তু উহা কাটিয়া যাইতেছে

ব্যাঙ্কিং-কাঠামো : একক ব্যাঙ্কিং বনাম শাখা-ব্যাঙ্কিং (Banking Structure : Unit-Banking vs Branch-Banking)

প্রত্যেক দেশের অগ্রগতির ইতিহাসে বিশেষ প্রকার কতকগুলি প্রভাব কাজ করিয়াছে, তাই সকল দেশের অর্থনৈতিক সংগঠন সমান নয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এর কাঠামোও সকল দেশে সমান হইতে পারে না। তবুও সাধারণ-ভাবে ব্যাঙ্কিং-কাঠামোকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় : বিটিশ ধরণের শাখা-ব্যাঙ্কিং এবং মার্কিন ধরণের একক বা ইউনিট ব্যাঙ্কিং। ইংলণ্ড ছাড়া কানাডা. দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে শাখা-ব্যাঙ্কিং প্রচলিত আছে। একটিমাত্র অফিস হইতে ব্যাঙ্কিং-এর কাজকর্ম করা হইলে উহাকে বলে একক ব্যাঙ্কিং ; আবার একাধিক অফিস হইতে ব্যাঙ্কিং-এর কাজকর্ম করা হইলে তাহাকে বলে শাখা-ব্যাঙ্কিং। সাধারণত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই একক ব্যাঙ্কিং দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের অনেক সময় স্থানীয় ব্যাঙ্কিং (Localized Banking) বলে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাখা-ব্যাঙ্কিং এর সুবিধাগুলি পাওয়ার জন্য করেসপণ্ডিং ব্যাঙ্ক-প্রথা (Corresponding Bank System) প্রভৃতি দেখা দিয়াছে। এই প্রথায় গ্রামাঞ্চলের কোন স্থানীয় ব্যাঙ্ক বড় বড় শহরের কোন কোন ব্যাঙ্কে নিজের টাকা জমা রাখিতে পারে। এই ভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টাকা পাঠানো তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়, অন্য কোন

ইউনিট ব্যাঙ্কিং ও শাখা-ব্যাঙ্কিং কাহাকে বলে

শহরের ব্যবসায়ীর বিল আদায় করাও সুবিধাজনক হয়। বিরাট শাখা-অফিস না রাখিয়া এইরূপে মার্কিন ব্যাঙ্কগুলি শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা কিছুটা ভোগ করিতে পারে। উভয় প্রকার ব্যাঙ্ক-কাঠামোর সুবিধা-অসুবিধা আলোচনার সময়ে এই কথা মনে রাখা দরকার। শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধাগুলি আলোচনা করিলে ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর অসুবিধাগুলি ধরা পড়িবে; আবার ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধাগুলি বিশ্লেষণ করিলে শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর ত্রুটিগুলি বোঝা যাইবে।

শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধার মধ্যে প্রথম হইল যে, ইহা বৃহৎমাত্রায় উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ ও সুযোগসমূহ পাইতে পারে, অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের সুবিধা পাওয়া যায়। তাহাদের বেশি অর্থ-সামর্থ্য থাকে, তাই বেশি মাহিনায় দক্ষ ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগ করিতে পারে। ইউনিট-ব্যাঙ্কিং-এ বিশেষায়ণ প্রসার করার সুবিধা খুবই কম, তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষ ব্যক্তিকে পরিচালনার কাজ হইতে অব্যাহতি দিয়া নীতি-নির্ধারণ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে (যেমন কোথায় টাকা খাটানো হইবে, ঝুঁকি ও ফলপ্রসূতা কেমন ইত্যাদি বিচার করার কাজে) নিয়োগ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা হইল যে, প্রতিটি শাখা-অফিস কম নগদ জমার সাহায্যে কাজ চালাইবার সুযোগ পায়। দরকারের সময় একটি শাখা অপর শাখা হইতে টাকা লইয়া আসিয়া কাজ চালাইতে পারে তাই প্রতিটি শাখাতেই কম জমা রাখিলে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় না। করেস্‌পণ্ডেন্ট ব্যবস্থায় ইউনিট ব্যাঙ্কগুলিও এই সুবিধা পায়; ইউনিট ব্যাঙ্কটি অপর ব্যাঙ্কে যে-টাকা জমা রাখে তাহা হইতে সুদ পায় না (বা পাইলেও খুব কম পায়)। তৃতীয়ত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর তুলনায় শাখা-ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কম খরচে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টাকার আদান-প্রদান করা চলে। আমানতকারীরা যখন টাকা জমা রাখে তখন তাহারা এই সকল সুযোগ-সুবিধা খুঁজিবে, যে-ব্যাঙ্কে কম খরচায় ভাল কাজ পাওয়া যায়, তাহারা সেই ব্যাঙ্কেই টাকা জমা রাখিবার চেষ্টা করিবে। চতুর্থত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর তুলনায় শাখা-ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থা বিভিন্ন স্থানের মধ্যে ঝুঁকি ছড়াইয়া রাখিতে পারে। এক বাক্সে যেমন সকল ডিম রাখা যুক্তিযুক্ত নয় সেই রকম একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির উপর ভরসা না করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়া ভাল। কোন দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলের লোকসান সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলের লাভ দিয়া পূরণ

শাখা-ব্যাঙ্কিংএর সুবিধা ও ইউনিট ব্যাঙ্কিংএর অসুবিধা কি কি

করা চলে। এই কারণেই ১৯২৯-৩০ সালের সংকটকালে আমেরিকার কৃষি-অঞ্চলের ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ব্রিটেনের ব্যাঙ্কসমূহ কোনমতে টিঁকিয়া যায়। ভারতেও এইরূপ দেখা গিয়াছে। পঞ্জাবে দাঙ্গার সময়ে ওখানকার স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু উপদ্রুত অঞ্চলে যে-সকল ব্যাঙ্কের শাখা ছিল, তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও নিজেদের অবস্থা সামলাইয়া লইতে পারিয়াছে। পঞ্চমত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর দরুণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সুদের হারে তারতম্য কিছুটা দূর হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মূলধনের চলনশীলতার অভাব সুদের হারে আঞ্চলিক তারতম্যের অন্যতম প্রধান কারণ। কোন অঞ্চলে সুদের হার বেশি হইলে কম সুদের অঞ্চল হইতে টাকা তুলিয়া আনিয়া সেখানে খাটানো যায়, ফলে উভয় অঞ্চলের সুদের হারে পার্থক্যের মাত্রা কমিয়া আসে। ষষ্ঠত, এইভাবে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে টাকা পাঠানো সহজ ও সুবিধাজনক হওয়ায় ব্যাঙ্কের মোট মুনাফা বৃদ্ধি পায়। কোন একটি শাখায় টাকা অলস হইয়া পড়িয়া থাকার উপক্রম হইলে উহাকে অপর অঞ্চলে পাঠানো চলে, যেখানে বেশি সুদের হারে উহাকে নিয়োগ করা হয়। সকল অঞ্চলে তেজী বা মন্দার মরসুম একই সময়ে আসিবে এমন কোন কথা নাই, তাই শাখা-ব্যাঙ্কিং এই দিক হইতে বিশেষ সুবিধাজনক। সপ্তমত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র এবং বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাঙ্ক পছন্দ বা বাছাই করার সুবিধা পায়। কোন এক বিশেষ ধরনের ঋণপত্রে টাকা খাটানো হইবে, এই সিদ্ধান্ত একবার গ্রহণ করা হইবার পর বিভিন্ন শাখার মারফৎ সারা দেশে সেই প্রকার ঋণপত্র খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব। অষ্টমত, শাখা-ব্যাঙ্কিং কম ব্যয়শীল, শাখা-অফিসগুলি সাধারণত জাঁকজমক-হীনভাবে পরিচালনা করা চলে, কিন্তু ইউনিট ব্যাঙ্কের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু এই যুক্তি অনেকেই মানিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে সকল শাখার ব্যয় যোগ দিলে দেখা যায় ইহাতে ব্যয়ের পরিমাণ বেশিই হইবে। নবমত, শাখা-ব্যাঙ্কিং থাকিলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থা ও সমস্যাগুলি ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ জানিতে পারেন, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অধিবাসীদের অভ্যাস, রীতিনীতি ও জীবিকা প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁহাদের জ্ঞান গভীরতর হয়। ব্যাঙ্কারদের জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি অনেক তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে, ব্যাঙ্কিং-পরিচালনার মান উন্নত হয়। উপরন্তু, বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রয়োজন মিটানোও সম্ভবপর হয়। সর্বোপরি ব্যাঙ্কের শাখাগুলি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষণকেন্দ্র, নূতন শিক্ষার্থীরা কোন এক শাখা

কাজ করিলে ব্যাঙ্কিং-এর সকল প্রকার কাজকর্ম শিখিতে পারে, ক্রমে জটিল ধরণের কাজ বুঝিতে পারে।

শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর অসুবিধাগুলি বা ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধাগুলি আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমত, ব্যাঙ্কটির কাজের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি প্রয়োজনবোধ না করে, তবে শাখা-ব্যাঙ্কিং-এ লাভ নাই। বিভিন্ন দেশে ব্যাঙ্কটির শাখা প্রতিষ্ঠা করিলে বহুপ্রকার অসুবিধা দেখা দেয়। বিভিন্ন দেশের আইন-কানুন, ব্যবসায়ের রীতিনীতি, প্রথা, অবস্থা ও টাকার ইউনিট সকল বিষয়ে পার্থক্য থাকে—শাখা-ব্যাঙ্কিংকে এই সকল অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এ উপযুক্ত পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের বহুবিধ সমস্যা দেখা দেয়। বহুদূরে অবস্থিত, বিক্ষিপ্ত শাখাগুলির উপর নজর রাখা খুবই অসুবিধা-জনক, উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের অভাবে যে, কোন শাখা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তৃতীয়ত, শাখা-ব্যাঙ্কিং খুবই ব্যয়বহুল ও অপচয়মূলক। প্রত্যেকটি শাখার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যাঙ্কের ব্যয় বাড়িয়া চলে, মুনাফাও হ্রাস পায়। ব্যাঙ্কগুলি দূরে অবস্থিত থাকায় তাহাদের ব্যবসায়িক কাজকর্মের মোট পরিমাণ বাড়ে বটে, কিন্তু শাখাগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা ও কেন্দ্রীয়ভাবে উহাদের পরিচালনা করার ব্যয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। চতুর্থত, কোন শাখার অবিবেচনা ও গাফিলতির দরুণ সেই শাখার প্রতি লোকের আস্থাহীনতা জন্মাইলে অন্যান্য শাখার উপরও আমানত-কারীদের বিশ্বাস টলিয়া যায়, সমগ্র ব্যাঙ্কটি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অবশ্য ইহাদের বিপক্ষে বলা চলে যে, প্রতিটি শাখা অপর শাখার শক্তিস্তম্ভও বটে, কারণ কোন একটি শাখায় রান্ হইতে শুরু হইলে অন্যান্য সকল শাখার অর্থ ভাণ্ডার ঐ শাখার সাহায্যে অবিলম্বে ছুটিয়া আসিতে পারে। পঞ্চমত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কোন একটি ব্যাঙ্ক দুর্বল হইলে সেই ব্যাঙ্কটি উঠিয়া যায়। কিন্তু শাখা-ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কোন একটি দুর্বল শাখাও সমগ্র ব্যাঙ্কটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুলিতে পারে। শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর ছত্রচ্ছায়ায় দুর্বল ব্যাঙ্কগুলি বাঁচিয়া থাকে, জনসাধারণ তাঁহাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি ধরিতে পারে না। ষষ্ঠত, শাখা-ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রতা আসিয়া পড়ে; সকল সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রধান-কার্যালয়ের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, ফলে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দ্রুত কাজকর্ম সম্পাদন সম্ভবপর হয় না। সপ্তমত, প্রয়োজনের মাত্রা ছাড়াইয়া শাখা-ব্যাঙ্কিং এর প্রসার ঘটাইলে যত্রতত্র ব্যাঙ্কের

শাখা-ব্যাঙ্কিংএর অসুবিধা ও ইউনিট ব্যাঙ্কিংএর সুবিধা কি কি

শাখা গজাইয়া উঠে, ব্যাঙ্কের আধিক্য দেখা দেয়। ইহার ফলে শুরু হয় আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা, দাম-কাটাকাটি, আমানত আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত হারে সুদ ঘোষণা, এবং ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগে টাকা খাটাইবার প্রবণতা। অষ্টমত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর স্বপক্ষে বলা হয় যে, এই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের স্থানীয় লোকজন, তাহাদের ব্যবসায়িক ক্ষমতা, সততা ও সমস্যা সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞান থাকে, ফলে কোন্ ব্যবসায়ে টাকা খাটানো নিরাপদ তাহা ভালভাবে বুঝিতে পারে। কিন্তু জ্ঞান থাকিলেও উহা প্রয়োগ করা স্থানীয় ব্যাঙ্ক পরিচালকের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক। পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক ঘনিষ্ঠতা প্রভৃতি কারণে এই পরিচালক অনেক সময় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকেও ঋণদানে বাধ্য হন।* কিন্তু শাখা ব্যাঙ্কের পরিচালকের এই অসুবিধা নাই। ঋণদানের প্রত্যেকটি প্রস্তাব প্রধান-কার্যালয়ে পাঠাইতে হয়, তাই কাহাকেও কোন ঋণ অগ্রাহ্য করিতে হইলে তিনি প্রধান-কার্যালয় নামে এক অদৃশ্য শক্তির উপর দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিজের মুখ রক্ষা করিতে পারেন।†

উপসংহারে, আমরা বলিতে পারি যে, উভয়ের তুলনামূলক বিচারে শাখাব্যাঙ্কিং-এর পক্ষে যুক্তিগুলি দৃঢ় এবং ইহার সুবিধাই বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে শহরের ব্যাঙ্কারদের সম্পর্কে একটা ভীতি ও বিরূপতা আছে, তাহা ছাড়া সারা দেশে অর্থের বাজারে একচেটিয়া অর্থ-ট্রাস্ট (Money trust) গড়িয়া উঠিতে পারে এইরূপ ভয়ও লোকের মনে আছে। তাই প্রকাশ্যে শাখাব্যাঙ্কিং গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু অপ্রকাশ্যে, বিভিন্ন ইউনিট ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় করিয়া পরস্পর-সংলগ্ন ডিরেক্টারী (interlocking directorates), হোল্ডিং কোম্পানী

শাখাব্যাঙ্কিং-এরই প্রসার দেখা যাইতেছে

* "The individual banker may have been too unwilling to refuse a loan to the incompetent or dishonest scion of a family with which his father or grand-father had been on intimate social terms." Sayers, *Modern Banking*, P. 26.

† "At the sametime, the remoteness of Head office and the local manager's subjection thereto enables him, when he has to refuse a loan, to do so without the social awkwardness that might arise if he took sole responsibility for the decision. The local manager can always place his personal knowledge of a client at the disposal of Head office, and, if there is occassion to refuse a loan, he can always thurst the unpleasant onus on that remote abstraction 'Head office' without jeopardizing his social contacts with the client." Sayers, *Modern Banking* Pp 26-27.

গঠন করা, প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে মোটামুটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও একচেটিয়া কর্তৃত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে--ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সর্বোত্তম ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ (The essentials of a sound banking system)

আধুনিক জগতের উন্নত দেশসমূহে বিনিময়-মাধ্যমের বেশির ভাগ সরবরাহ করে ব্যাঙ্কসমূহ। দেশের শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মূলধনগঠন, এই সকল কিছু প্রসারের জন্য উপযুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দেশের অধিকাংশ লোক তাহাদের সমস্ত সঞ্চয় ব্যাঙ্কে আমানত রাখে, সুতরাং তাহারা আশা করিতে পারে যে, তাহাদের এই সঞ্চয় বিনষ্ট হইবে না এবং প্রয়োজনমত তাহারা এই আমানত নগদ টাকায় ফিরিয়া পাইবে। দেশের ব্যাঙ্কগুলি বেশি সংখ্যায় ফেল পড়িতে শুরু করিলে লোকেরা নগদ টাকা নিজেদের হাতে রাখিবে, উহা শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিয়োগ করিতে দ্বিধা করিবে। ভাল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় গুণ হইল নিরাপত্তা। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার এই নিরাপত্তার জন্য সাধারণত কয়েকটি পদ্ধতি প্রত্যেক দেশেই অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রথমত, দেশের সরকার বা আর্থিক কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কিং পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দেয়—নিম্নতম মূলধনের পরিমাণ, নিম্নতম জমা বা রিজার্ভের অনুপাত, শাখা ও উপশাখার সংখ্যা, রিজার্ভ তহবিল গঠন প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, সাধারণত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অনেক ধরণের ক্ষমতা দেওয়া হয় যাহার দ্বারা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির হিসাব পরিদর্শন করিতে পারে, সময়মত বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ ও উপদেশ দিতে পারে। তৃতীয়ত, অনেক দেশে, যেমন আমেরিকায়, ব্যাঙ্কের আমানত নষ্ট হইবার ঝুঁকি এড়াইবার জন্য বীমার ব্যবস্থা আছে। এই সকল ব্যবস্থা থাকিলে তবেই দেশে ভাল ব্যাঙ্কিং-কাঠামো গড়িয়া উঠিতে পারে।

কিরূপে ব্যাঙ্কগুলির নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়

এই বিষয়ে মনে রাখা দরকার যে, কেবলমাত্র কতকগুলি ভাল আইন থাকিলেই যে ভাল ব্যাঙ্কিং গড়িয়া উঠিবে এরূপ কোন কথা নাই। ভাল ব্যাঙ্কার থাকাই ভাল ব্যাঙ্কিংয়ের অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত। ব্যাঙ্কারদের মধ্যে সততা, কর্মদক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা, বিচার-বিবেচনা এবং ব্যবসায়িক নৈপুণ্য এই সকল গুণের সমাবেশ আবশ্যক।

ভাল ব্যাঙ্কার

ভাল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার জন্য দরকার সারা দেশে সকল অঞ্চলে সমান ভাবে ব্যাঙ্ক গড়িয়া ওঠা। যে-কোন শিল্পে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে লোকেরা নিযুক্ত থাকুক না কেন, অথবা যে কোন অঞ্চলেই তাহারা বসবাস করুক না কেন, আমানত হিসাবে টাকা জমা রাখা এবং প্রয়োজনমত ঋণ পাওয়ার সুবিধা সকলের সমানভাবে থাকা দরকার।

দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া উঠিতে হইলে একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার, ইহা হইল তাহাদের বিনিয়োগের তারল্য। আমানতকারীরা চাহিবামাত্র যদি নগদ টাকা না পায় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের উপর আস্থা টুটিয়া যায়, সুতরাং ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সম্পত্তিকে সর্বাপেক্ষা তরল অবস্থায় রাখিতে পারিবে এইরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

তারল্য

আমরা জানি, দেশের সকল ব্যাঙ্ক মিলিয়া অনেক পরিমাণে ঋণসৃষ্টি করিতে পারে। নিজেদের খাতায় আমানত হিসাবে লিখিয়া রাখিয়া ঋণগ্রহীতাদের টাকা ধার দেয়। দেশের লোকেরা নিজেদের ইচ্ছায় যে-পরিমাণ সঞ্চয় করে ব্যাঙ্কগুলি সেই স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ দ্বারা তাহাদের ঋণের পরিমাণ প্রভাবিত হইতে দেয় না। নিজেদের ঋণ দিবার ক্ষমতা তাহারা নিজেরাই সৃষ্টি করে। ব্যাঙ্কগুলির হাতে ঋণসৃষ্টির এই ক্ষমতা প্রকৃত পক্ষে দেশের ঋণ-ভাণ্ডারের যোগান বাড়াইয়া চলে এবং ইহার স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে। ব্যাঙ্কঋণের প্রসারের ফলে বহুপ্রকার অর্থনৈতিক কাজকর্মের সুবিধা হয়, ব্যবসায়ীরা তাহাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য চলতি মূলধন এই ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতেই পাইয়া থাকে। সুতরাং ভাল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হইল উহার স্থিতিস্থাপকতা।

স্থিতিস্থাপকতা

সর্বোপরি, দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার স্থায়িত্বের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। যদি অতিরিক্ত ঋণসৃষ্টি হইতে থাকে, তবে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক সমৃদ্ধি দেখা দেয়, অপরপক্ষে ঋণসৃষ্টির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হইলে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যাঙ্কঋণের অতিরিক্ত প্রসার বা সঙ্কোচন কোনটিই বাঞ্ছনীয় নয়, ইহার স্থায়িত্বই হইল মূল কথা। দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থায় এই স্থায়িত্ব আছে কি না সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতিগুলির সাহায্যে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে পারিলে দেশে উপযুক্ত ব্যাঙ্কিং সংগঠন গড়িয়া উঠিতে পারে।

স্থায়িত্ব

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ (Nationalisation of commercial banks)

ব্যাঙ্কিং-এর জাতীয়করণ বলিলে বোঝা যায় সাধারণভাবে দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইবে। কোন ব্যক্তির হাতে ইহার পরিচালনা থাকিবে না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাঙ্কগুলির উপর সরকারী কর্তৃত্ব বাড়িয়া যাইতেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রমশ দেখা গেল পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সরকারী মালিকানায় অথবা নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অবাধ বাণিজ্যের ধারণা আর নাই। রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও জাতীয় পরিকল্পনা এই দুই ভাবধারার প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ব্যাঙ্কের লক্ষ্য হইয়াছে পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা, আর অনুন্নত দেশগুলিতে দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণ জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড এবং তাহা ছাড়া ব্যাঙ্ক অফ্ ফ্রান্স, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ চেকোস্লোভাকিয়া, কমনওয়েলথ ব্যাঙ্ক অফ্ অস্ট্রেলিয়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতির জাতীয়করণ হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ সম্পর্কে মোটামুটি সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত হইয়াছেন। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ বিষয়ে এই পর্যন্ত কোন ঐক্যমত দেখা যায় নাই।

আধুনিককালে জাতীয়-করণের দাবি উঠিয়াছে

অধ্যাপক সেয়ার্স (Sayers) জাতীয়করণের এই সমস্যাকে বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়াছেন। প্রথমত, বলা হয় যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ হইলে উহারা আরও দক্ষতার সহিত কাজকর্ম করিতে পারিবে, বেসরকারী মালিকানায় থাকিলে এতটা দক্ষতা আশা করা যায় না। বেসরকারী নিয়ন্ত্রণে ব্যাঙ্কগুলি দেশের সঞ্চয় সংগ্রহ করা এবং বিভিন্ন দিকে উহাকে বিনিয়োগ করা প্রভৃতি কাজ সরকারী কর্তৃপক্ষের ন্যায় ততটা দক্ষতার সহিত করিতে পারে না। আরও বলা হয় যে, জাতীয়করণের পরে ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন-ব্যয় কমিয়া যাইবে এবং বহুপ্রকার অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্য হইল দেশের অর্থনৈতিক গতিবিধিকে উপযুক্তভাবে

জাতীয়করণের দাবির পিছনে যুক্তিসমূহ

নিয়ন্ত্রণের ভার রাষ্ট্রের হাতে লইয়া আসা, কিন্তু দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ না হইলে এই নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি সফল করিয়া তুলিতে হইলে দেশের সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হওয়া দরকার। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি হইল যে উহা টাকা তৈয়ারী করে। কিন্তু অর্থসৃষ্টির ক্ষমতা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিরও কম নয়। সুতরাং দেশের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য, উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান, দামস্তর ও জীবনযাত্রার মান বেসরকারী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের খেয়াল খুশির উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না। চতুর্থত, দেশে যদি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে পরিবর্তনের এই মধ্যবর্তী স্তরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়-করণ করা অবশ্যই দরকার। দেশে সমাজতান্ত্রিক পথে শিল্প ও কৃষির প্রসার তখনই দ্রুত হইতে পারে যদি দেশের অর্থসৃষ্টি এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই মূল কেন্দ্রগুলি, অর্থাৎ দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে রাষ্ট্রের হাতে আসে। বেসরকারী টাকার ব্যবসায়ীরা বেসরকারী শিল্পকেই সাহায্য করিবে। সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে তাহারা অর্থসাহায্য করিলেও ইহা সমাজতান্ত্রিক নীতিসম্মত নয়, কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হইতে উৎপাদনের এক অংশ সুদ হিসাবে বেসরকারী ক্ষেত্রে চলিয়া যাইবে। সর্বশেষে বলা চলে যে, বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীরা ফাট্‌কাবাজি ও নিজেদের ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় বহু ব্যাঙ্ক নষ্ট করিয়াছে, দরিদ্র জনসাধারণের সারা জীবনের সঞ্চয় যতটা গুরুত্ব সহকারে রক্ষা করা উচিত ছিল, তাহা করে নাই। সুতরাং সকল আমানতকারীর স্বার্থে এবং সঞ্চয়ের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালিত হওয়া উচিত।

এই সকল যুক্তির বিরোধী বক্তব্য

এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে অনেকে বলেন যে, ব্যাঙ্কগুলি সরকারী হাতে চলিয়া গেলে দীর্ঘসূত্রতা, আমলাতান্ত্রিক পরিচালনা, জরুরী কাজগুলি দ্রুত সম্পাদনে অক্ষমতা প্রভৃতি দোষ দেখা দিবে; ফলে দক্ষতার মান নামিয়া যাইবে। দ্রুততা ও দক্ষতা - ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের দুইটি পরম প্রয়োজনীয় গুণ, কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় তাহা হইবার নয়। জাতীয়করণের পক্ষে যে-সব উপকারের কথা বলা হইয়াছে তাহার অনেকটাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পাওয়া সম্ভবপর। পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বন্ধ

হইলে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের মান হ্রাস পাইবে, সুতরাং অবিলম্বে জাতীয়করণ দরকার নাই—ইহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

অর্থের বাজার (Money Market)

যে-বাজারে ঋণ হিসাবে অর্থের লেনদেন হয় তাহাকে অর্থের বাজার বলা হয়। এই বাজারে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতাগণ পরস্পরের সহিত ঋণের লেনদেন করেন। সাধারণত, ব্যাঙ্কসমূহ ঋণের 'বিক্রেতা', সুদ হইল ঋণের 'দাম', এবং ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিগণ বা সংগঠনসমূহ হইল ঋণের 'ক্রেতা'। শিল্পে বাণিজ্যে উন্নত দেশসমূহে অর্থের বাজার খুবই সংগঠিত ; অনুন্নত দেশে অর্থের বাজার অনুন্নত এবং অসংগঠিত।

অর্থের ক্রয়-বিক্রয় ও অর্থের দাম

অর্থের বাজারকে সময়ানুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ অত্যল্পকালীন বাজার, স্বল্পকালীন বাজার ও দীর্ঘকালীন বাজার। বিভিন্ন পরিমাণ সময়ের জন্য সমাজে ঋণের চাহিদা ও যোগান হইতে পারে। যদি একদিন, কয়েকদিন বা মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য ঋণ দেওয়া হয় তবে তাহাকে তলব-ঋণের (Call-loan Market) বাজার বলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণভাবে এই তলব-ঋণের বাজারে ঋণ দেয় ; এইরূপ ঋণকে তাহারা খুবই তরল-বিনিয়োগ (Liquid Investment) বলিয়া মনে করে, কারণ প্রয়োজন হইলে খুব কম সময়ের মধ্যে এই ঋণ আদায় করিয়া নগদ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর। অনেক সময় যৌথ-মূলধনী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহও মুনাফা বণ্টনের পূর্বে সেই মুনাফাকে কিছু সময়ের জন্য এইরূপ তলব-ঋণের বাজারে খাটাইয়া লয়। এই বাজারে ঋণগ্রহীতা হইল (ইংলণ্ডে প্রধানত) বিলের দালালগণ (Bill-brokers), এবং (আমেরিকায় প্রধানত) শেয়ারের দালালগণ (Share brokers)। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বিলের দালালগণ ঋণ গ্রহণ করিয়া বিল ক্রয় করে এবং উহা ফলপ্রসূ (mature) হওয়া পর্যন্ত ধরিয়া রাখার চেষ্টা করে। যে-সুদে এই ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহার নাম তলব-হার (Call rate)। সাধারণত, ব্যাঙ্কগুলি এই প্রকার তলব-ঋণ পুনরনুমোদন (Renew) করে বটে, কিন্তু নগদ অর্থের প্রয়োজন অধিক হইলেই তাহারা ইহা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চায়। তখন ঋণগ্রহীতাগণ যে-কোন উপায়ে অন্য যে-কোন স্থান হইতে এই অর্থ আনিয়া দেয়। প্রধানত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতেই তাহারা ঋণ গ্রহণ করিয়া আনে। অর্থাৎ বিলের দালালগণকে বা ঋণ-

বিভিন্ন প্রকার ঋণের বাজার: অত্যল্পকালীন

গ্রহীতাগণকে ' নিঙড়াইয়া' ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য করা হয় বা অর্থ আদায় করিয়া লওয়া হয়। তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহে বাধ্য হয়; বলা হয় যে, "বাজার ব্যাঙ্কের নিকট হাজির হইয়াছে" ("to go into the bank")। আমেরিকায় প্রধানত, শেয়ার বাজারের দালালরাই তলব-ঋণের বাজারে ঋণ করে; কারণ আমেরিকায় ফাটকা বাজারে শেয়ার ক্রয়ের সময়ে উহার মূল্যের ২৫% অংশ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হয়। অবশিষ্ট ৭৫% অংশ দিবার সময়ে ফাটকা বাজারের শেয়ারের দালালগণ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিতে আসে এবং ওই শেয়ারগুলিকেও অন্যান্য সম্পত্তির সহিত সহ-বন্ধকী (Colateral security) হিসাবে জমা রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। ব্যাঙ্ক এইরূপ ক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ের জন্য যে-সুদে তাহাদের ঋণ দেয় তাহাকে ঋণের তলব-হার (Call-rate) বলে। ফাট্‌কা বাজারের অবস্থা অনুযায়ী এই তলব-হারও উঠানামা করে। সাধারণত, যুক্তরাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, বাজারের তলব-হার নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ।

স্বল্পকালীন ঋণের বাজার

কিছু বেশিদিনের, যেমন সাধারণত, ৩ মাসের জন্য স্বল্পকালীন ঋণ দেওয়া হয়। বিশেষ করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ এইরূপ স্বল্পকালীন ঋণের বাজারে (Short period Loan Market) ঋণ দেয় এবং বিল ডিস্‌কাউন্ট করিয়া বা ব্যক্তিকে তাহার আমানতের পরিমাণের অধিক উঠাইবার সুযোগ দিয়া এই ঋণ প্রদান করা হয়। ব্যবসায়ীরা ছাড়াও কোন দেশের সরকার ট্রেজারী বিল ভাঙ্গাইয়া এই বাজার হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া থাকে।

দীর্ঘকালীন ঋণের বাজার

ইহা ব্যতীত দীর্ঘকালীন ঋণের বাজারও দেশে থাকে। এই দীর্ঘকালীন ঋণের বাজারে দেশে ব্যক্তিদের মূলধন-সঞ্চয়, সেই সঞ্চয়ের সংগ্রহীকরণ (accumulation) ও মূলধন-গঠন হইয়া থাকে। ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও শেয়ার বিক্রয় প্রতিষ্ঠান-সমূহ সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়গুলিকে একত্রে সংগ্রহ করিয়া শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগের উপযোগী মূলধনে রূপান্তরিত করে। বিভিন্ন কার্যে লগ্নীর জন্য সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি, জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ (Public bodies) বা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বাজারে ঋণের চাহিদা করে। শেয়ার-বাজারে শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ ঘটে এবং মূলধনের হস্তান্তর হইয়া থাকে।

ঋণের বাজারেও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণদানের জন্য পৃথক ধরণের প্রতিষ্ঠান থাকে এবং সাধারণত, বিশেষ ধরণের বাজারে ঋণদানের জন্য বিশেষ প্রকার প্রতিষ্ঠানই নিয়োজিত থাকে। যেমন, বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক আছে: বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, শিল্প ব্যাঙ্ক বা বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এই সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের বাজারে ঋণদান করে।

বিভিন্ন বিনিয়োগ-ক্ষেত্র অনুযায়ী ঋণের বাজারে বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন

সর্বোপরি, অর্থের বাজারের মধ্যমণি এবং পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের সকল প্রকার অর্থ সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান-গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে; ঋণের বাজারে অর্থের চাহিদা ও যোগান নির্ধারণ করে। ঋণের দাম অর্থাৎ সুদের হার দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা ও লক্ষ্য অনুযায়ী নির্ধারিত করার প্রয়াস পায়। দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা অনুযায়ী আর্থিক নীতি পরিচালনা করা এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। সমাজে অর্থের শুষ্কতা দেখা দিলে অর্থ ঢালিয়া দেওয়া এবং অর্থাধিক্য দেখা দিলে অর্থ ছাঁকিয়া তুলিয়া আনা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

ক্লিয়ারিং হাউস (Clearing House)

অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে কোন বিশেষ অঞ্চলের ব্যাঙ্কসমূহ খুবই ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সহিত যুক্ত এবং একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের গ্রাহক, সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্যে এক ব্যাঙ্কের আমানতকারীগণ অন্য ব্যাঙ্কের আমানতকারীগণের নিকট হইতে চেক পান এবং তাহাদের চেক দিয়া থাকেন। ফলে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কই অন্য ব্যাঙ্কের নিকট দেনাদার ও পাওনাদার হইয়া পড়ে। কোন ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওনা নগদ অর্থ লইয়া আসিল আবার সেই ব্যাঙ্ককেই নগদ অর্থ দিয়া দিল, এইরূপ পারস্পরিক নগদ লেনদেন অহেতুক পরিশ্রমসাধ্য ও অপব্যয়মূলক। সুতরাং বিশেষ কোন স্থানে একত্র হইয়া ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ পারস্পরিক দেনাপাওনার হিসাব করিয়া খাতায়-পত্রে নিজেদের হিসাব মিলাইয়া লন; এই সংগঠনই ক্লিয়ারিং হাউস বলিয়া পরিচিত। সাধারণত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্থানীয় অফিসে এই কার্য

ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে পারস্পরিক দেনাপাওনা মিটাইবার প্রতিষ্ঠান

পরিচালিত হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত নিজের জমা হইতে প্রতিটি ব্যাঙ্কের হিসাব বাড়াইয়া বা কমাইয়া ব্যাঙ্কগুলি নিজের মধ্যে লেনদেন করে।

অনুশীলনী

1. Distinguish between credit and cash and explain how credit affects an economy of cash.

2. What are credit instruments ? Discuss their utility.

3. Discuss the various functions performed by a modern Bank. Indicate the benefits that banks render to society.

4. Draw an imaginary Balance-sheet of a commercial bank and explain the items mentioned therein.

5. "Banks are not merely purveyors of money, but also in one important sense; manufacturers of money." Discuss.

6. Describe how the commercial banking system can create credit.

7. Discuss the process of multiple credit creation by the Banking System.

8. Explain how banks create money, and discuss the limitations, if any, on the bank's power of creating money.

9. "The bank does not create money out of thin air ; it transmutes other forms of wealth into money." Discuss.

10. How do the commercial banks distribute their assets to ensure their liquidity ?

11. "A constant tug of war between the competing aims of liquidity and profitability summarises the functions of a Modern Bank." Explain.

12. "Commercial banks should employ their resources in self-liquidating trade bills and not in the long term financing of the industry." Discuss.

13. Annalyse briefly the assets of a modern Bank and explain the principles which govern its structure.

14. "The art of banking lies in being able to distinguish between a bill of exchange and a mortage"—Explain.

15. Examine carefully the "real bills doctrine" and the "shiftability" theory of bank liquidity. Discuss in this connection the 'anticipated income theory of liquidity' that has been recently developed.

16. Discuss the advantages and disadvantages of Unit-Banking and Branch-Banking structures.

17. What is Mixed Banking ? What are its merits and dangers ?

18. Discuss whether you would like to nationalise the Commercial banks of a country.

19. Discuss the essential requirements of a good banking system.

20. What is Money Market ? Discuss the constituents of a typical money market.

৫

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

Central Bank

প্রত্যেকটি দেশে টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে। টাকার বাজারে টাকার যোগান যাহাতে কম না পড়ে অথবা বেশি না হয়, টাকার চাহিদা যাহাতে মিটিতে পারে, টাকার দাম বা সুদের হার যাহাতে খুব বেশি বা খুব কম না হয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে লগ্নী করার জন্য টাকার দামে যাহাতে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকে, এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্য একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কর্তা দরকার। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এইরূপ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান। শুধু টাকার দাম নয়, টাকার মূল্যে কখন কিরূপ উঠানামা হইতেছে, সেই বিষয়েও লক্ষ্য রাখা দরকার। যে-সকল প্রতিষ্ঠান টাকার বাজারে লেনদেন করে (যেমন ব্যাঙ্ক) তাহাদের কাজকর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখাও কম দরকার নহে। সর্বোপরি, যত দিন যাইতেছে, ততই সকল দেশের সরকার অর্থনৈতিক কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছে। কেহ পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে, কেহ বা দ্রুত শিল্পোন্নয়নকে অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতেছে—এই সকল লক্ষ্য সাধনের চেষ্টায় তাহারা টাকার যোগান, চাহিদা, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও সুদের হার প্রভৃতিকে নিজেদের প্রভাবাধীন করিবার চেষ্টা করিতেছে। রাষ্ট্রকে তাহার অর্থনৈতিক লক্ষ্য (economic objective) সাধনে সাহায্য করার উদ্দেশ্য দেশে টাকার যোগান, চাহিদা, দাম ও মূল্য—এই সকল বিষয়ে নীতি অর্থাৎ আর্থিক নীতি পরিচালনা করার দায়িত্ব লইতে পারে, এইরূপ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সকল দেশেই অবশ্য প্রয়োজনীয়।

টাকার যোগান, চাহিদা, দাম ও মূল্যের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান

এমন সময় ছিল যখন ধনবিজ্ঞানীরা টাকার বাজারকে এইরূপ নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। মানুষমাত্রেই ভুল করে, সুতরাং দেশের সামগ্রিক লেনদেন অর্থনৈতিক কল্যাণ এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উপর ছাড়িয়া

দিতে তাঁহারা রাজি ছিলেন না। যোগান ও চাহিদার স্বয়ংক্রিয় শক্তি টাকার মূল্যকে যে-স্তরে রাখিবে, উহাই স্বাভাবিক স্তর, সেই স্তর হইতে বিচ্যুত হইলে আপনাআপনি স্বয়ং-শোধনের ধারা শুরু হইবে, বাহিরের কোন হস্তক্ষেপ দরকার নাই, তাঁহারা এইরূপ মনে করিতেন। আজকাল অবশ্য এই সকল যুক্তি অচল হইয়া গিয়াছে। বারবার পৃথিবীতে বহুবিধ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়াছে, বাজারের আত্ম-নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি সেই সংকট রোধ করিতে পারে নাই। টাকার মূল্যে কখনো তীব্র উঠানামা ঘটিয়াছে; কখনও-বা ব্যবসায়ের প্রয়োজন থাকিলেও টাকার পরিমাণ বাড়িতে পারে নাই; আবার কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কাজকর্ম বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। সমাজে টাকার নিরপেক্ষ (neutral) ভূমিকা সম্পর্কে তাঁহাদের যে-বিশ্বাস ছিল, বর্তমান কালে সকল সমাজেই টাকার সক্রিয় শক্তি সেই বিশ্বাস টলাইয়া দিয়াছে। তাই আজকাল সবাই টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষে।

অনেকে বলিতেন ইহার কোন দরকার নাই

তাহা ছাড়া, বর্তমান কালের সমাজে বহু প্রকার পরিবর্তন আসিয়াছে। আজকালকার সমাজে টাকা বলিলে অনেক ধরণের সম্পত্তি বোঝা যায়, ইহাদের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য খুব কম। নগদ টাকা, চেক, বিল, বণ্ড, শেয়ার, সোনা—ইহারা সবাই টাকা, সকলেই কোন না কোন ক্ষেত্রে বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের সঞ্চয়রূপে কাজ করে। তাহা ছাড়া, এই সকল লইয়া ব্যবসায় করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান তৈয়ার হইয়াছে। এত বিভিন্নরূপের টাকা এবং এত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান লইয়া যে-সমাজ গঠিত, তাহা কতটা আত্ম-নিয়ন্ত্রণশীল হইতে পারে, সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই কারণে দেশে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এবং দক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিশ্চয় দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু বর্তমান কালে ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয়

টাকার বাজারে জটিলতা থাকিলেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দরকার—এই যুক্তির দরুণ একদল ব্যক্তি বলেন যে, অপূর্ণোন্নত দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কোন দরকার নাই। এই সকল দেশে এখনও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ততটা প্রসার হয় নাই, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম, মূলধন-গঠন ও মূলধন-নিয়োগ কম, তাই টাকার বাজারের জটিলতা ততটা নাই। উপরন্তু এই সকল দেশে ব্যাঙ্ক বা বিনিয়োগ-

কারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম, উপযুক্ত সংখ্যক চেক, বিল, বণ্ড, শেয়ার না থাকায় ইহাদের কাজকর্মও সীমাবদ্ধ। দেশে স্বল্পকালীন টাকার বাজার এখনও গড়িয়া উঠে নাই। এইরূপ বাজারেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি স্বল্পকালীন বিল ও সিকিউরিটিগুলি বেচাকেনা করিয়া টাকা খাটায়। কিন্তু যদি দেশে এইরূপ টাকার বাজার না থাকে, তবে সেই দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দরকার নাই মনে করা চলে। তাহা ছাড়া, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার কম বলিয়া লোকের স্বল্পকালীন বিনিয়োগের ততটা দরকার নাই, বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্রগুলির মধ্যে সুদের হারে সমতা রাখার প্রশ্নও ততটা উঠে না। এই সকল ঋণপত্র বা তরল সম্পত্তির সুষ্ঠু আদানপ্রদান নির্ভর করে এই সকল বিভিন্ন ঋণকালের মধ্যে সুদের হারে সামঞ্জস্য থাকার উপর। এই উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু যদি উপযুক্ত পরিমাণে ঋণপত্র না থাকে, বা লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান না থাকে তবে অযথা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া লাভ কি? সর্বোপরি, অনুন্নত দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা খুবই প্রবল, তাই উচ্চাকাংক্ষী অপরিপক্ক রাজনৈতিক নেতাদের হাতে দেশের টাকার বাজারের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা চলিয়া যাইতে পারে। এইরূপ দেশে, তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কোন দরকার নাই, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

অনুন্নত দেশে ইহার দরকার আছে কি?

এই সকল যুক্তি আমরা মানিয়া লইতে পারি না। ইঁহারা মনে করেন যে, ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর কোন কাজ নাই। কিন্তু দেশে টাকার প্রচলন ও গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা, সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করা এই সকল কাজ কে করিবে? অধ্যাপক সেয়ার্সের (**Sayers**) মতে অনুন্নত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন সুষ্ঠুভাবে চালানো বা টাকার বৈদেশিক মূল্যকে স্থির রাখা সবই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গুরুদায়িত্ব, এই সকল বিষয়ে সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে উহার ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। তাহা ছাড়া, এই সকল দেশে উপযুক্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। আর রাজনৈতিক প্রভাব উন্নত অনুন্নত সকল দেশেই আসিতে পারে, এইরূপ অবাঞ্ছনীয় কিছু না ঘটে, সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার চেষ্টা সর্বদা করা প্রয়োজন। বহু অনুন্নত দেশের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, কেন্দ্রীয়

ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা বহুভাবে এই সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সাহায্য করিয়াছে।

দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্ক হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেকাংশে পৃথক। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি পরিচালিত হয় উহাদের মালিকদের মুনাফা বাড়াইবার জন্য, ইহাই উহাদের লক্ষ্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয় জাতীয় ও সামগ্রিক দৃষ্টিভংগী লইয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্য সাধনের জন্য, মুনাফার জন্য নয়। তাই নোট প্রচলনের অধিকার অন্যান্য ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয় না, কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ইহার একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য ব্যাঙ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, উহাদের সর্বশেষ স্তরের টাকা পাইবার মহাজন (lender of the last resort) হিসাবে সে কাজ করে। সরকারের ব্যাঙ্কার রূপে অন্যান্য ব্যাঙ্ক কাজ করে না, ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই দায়িত্ব। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নীতি সাবধানতা, মুনাফা করা এবং বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা এই সকল কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-এর নীতি নয়।

অন্যান্য ব্যাঙ্কের সহিত ইহার অনেক পার্থক্য

প্রথম মহাযুদ্ধের পর এইরূপ ধারণা ছিল যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী হস্তক্ষেপ হইতে স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে। ইহার কারণ হইল প্রধানত রাজনৈতিক প্রভাব হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে মুক্ত রাখা। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় পরিচালনা আমলাতান্ত্রিক প্রভাবের বৃদ্ধি ঘটায়। বেতনভুক্ সরকারী কর্মচারীদের চাকুরির স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা অধিক থাকায় তাহাদের উৎসাহ ও উদ্যোগ ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। ইহাও বলা হইত যে, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় একটি বিশেষ ধরণের কার্য, ইহার জন্য বিশেষ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন; আইন-সভার সদস্য বা পার্টি-নেতাদের এইরূপ জ্ঞান না থাকাই সম্ভব। এই সকল কারণের দরুণ শেয়ার-ক্রেতাদের বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন করাই তখন প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই সকল যুক্তি থাকা সত্ত্বেও দেখা গিয়াছে যে, জনস্বার্থ রক্ষাকারী কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্তাদের ঝুঁকি গ্রহণ বা অধিক উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজন নাই, ইহা মুনাফা অনুসন্ধানকারী প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নয়। আর যদি কোন মুনাফা হয়, তবে তাহা জাতীয় স্বার্থে জাতীয় অর্থভাণ্ডারে যাওয়াই উচিত। রাষ্ট্রের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কিরূপ সম্পর্ক হইবে তাহা মূলত নির্ভর করে

জাতীয় করণ ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ

কেন ও কিরূপে

দেশের রাজনৈতিক, আদর্শগত ও অর্থনৈতিক বহুবিধ কারণের কার্যফলের উপর। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ, যুদ্ধকালীন উপকরণ সংগ্রহ ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সকল কিছু মিলিয়া জাতীয়করণের দিকে ঝোঁক বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। দেশের অর্থনীতি ঠিক কিরূপ ভাবে চলে, সেই গতিধারা বর্তমানকালে অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রাশিবিজ্ঞানের উন্নতি, গণচেতনা বৃদ্ধি, ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি—সকল কিছু মিলিয়া সমাজ-দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিগুলির চিত্র আমরা অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি। তাই নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছে। রাষ্ট্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে; শেয়ার ক্রয় করিয়া, পরিচালকমণ্ডলীতে মনোনীত সদস্য নিয়োগ করিয়া অথবা সম্পূর্ণ মালিকানা স্থাপন করিয়া।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী (Functions of a Central Bank)

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন রকম কাজ করিয়া থাকেন।

আর্থিক ব্যবস্থার সংগঠন গড়িয়া তোলা ও পরিচালনা

প্রথমত, দেশে অর্থের প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণের একচেটিয়া অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ন্যস্ত থাকে। পূর্বে রাষ্ট্র নিজেই অর্থ প্রচলন করিতেন। পরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ এই কার্যের ভার গ্রহণ করে, কিন্তু বর্তমানে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতেই এই ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কাগজী নোট প্রচলনের অধিকার যাহাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয় সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ইহা ন্যস্ত থাকা উচিত। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকার নোট থাকে; সুতরাং দেশে অর্থনৈতিক লেনদেনের প্রভূত অসুবিধা হয়। এক প্রকার নোট প্রচলিত হইলে নোটের অতিরিক্ত প্রচলনের (Excess issue) সম্ভাবনা কম। দেশে ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়াতেও নোট প্রচলনের ক্ষমতা বাড়িয়া গিয়াছে কারণ নোট প্রচলনের ক্ষমতা থাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের ঋণপ্রদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। রাষ্ট্রের নির্দেশ ও পরিচালনায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রচলিত কাগজী নোটের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস স্বভাবতই বেশি থাকে। তাহা ছাড়া,

নোট-প্রচলন হইতে যাহাতে মুনাফার উদ্ভব না হয় সেইজন্য নোট-প্রচলনের ক্ষমতা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের হাতে না দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতেই রাখা উচিত।

সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সরকারের সকল আয় জমা হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতেই সকল ব্যয় করা হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেক ক্ষেত্রে এই সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাবও রক্ষা করে। সরকারী ঋণ পরিচালনার ভারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর। সরকারের জন্য প্রয়োজন হইলে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ঋণ গ্রহণ করে, নিয়মিত সুদ দেয় এবং পরিশোধের ব্যবস্থা করে।

ব্যাঙ্কসমূহের ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য

তৃতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের নগদ আমানতের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে। জমার পরিমাণ আইন বা প্রথার দ্বারা নির্ধারিত। এই জমা রাখিবার ফলে ব্যাঙ্কগুলি প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ পায় অথবা প্রথম শ্রেণীর বিনিময়-বিল ভাঙাইয়া দরকার মত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইল সর্বশেষ স্তরের ঋণদাতা। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ প্রয়োজন হইলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ বিনিময় বিলের বদলে অথবা স্বল্পকালীন ঋণপত্রের (Short-term Securities) বদলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ পাইতে পারে এবং সেই ঋণের দ্বারা নিজেদের দেনা মিটাইতে সক্ষম হয় বা উচ্চ সুদে কোথাও লগ্নী করিতে পারে। কোনরূপ ব্যাঙ্কিং-সংকটের সময় তাহাদের সম্পত্তিগুলির বদলে হঠাৎ নগদ-অর্থ পাওয়ার এই সুবিধার ফলে তাহাদের পক্ষে বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা সুবিধাজনক হয়। দেশের সমগ্র ঋণ-কাঠামোতে এইরূপে তারল্য ও প্রসারতা (Liquidity and elasticity) বজায় থাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজের ফলেই ঘটে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক না থাকিলে, অথবা ঋণ-পত্র বা বিনিময়-বিল প্রভৃতিকে প্রয়োজন হইলেই নগদ অর্থে রূপান্তরণের সুবিধা না থাকিলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ আমানতের আরও বেশি অংশ নিজেদের নিকট নগদ অর্থরূপে জমা রাখিতে বাধ্য হইত; তাহাদের অর্থলগ্নীর পরিমাণ আরও কম হইত, দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে নগদ অর্থ পাইবার সম্ভাবনা কম থাকিত: ঋণ-ব্যবস্থা সংকুচিত থাকিত।

সর্বশেষ স্তরের ঋণ দান

চতুর্থত, প্রচলিত কাগজী নোট বা দেশের ঋণব্যবস্থার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য স্বর্ণ বা বৈদেশিক অর্থ জমা রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব। দেশে স্বর্ণমান চালু

থাকিলে দেশের মধ্যে ও বাহিরে স্বর্ণের আসা-যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার বা অর্থের বহির্মূল্য নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব। বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্তব্য। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহে দেশীয় স্বার্থ রক্ষা করা এবং বৈদেশিক বিনিময়-হারকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে লেনদেন ব্যালান্সে মৌলিক ভারসাম্যবিহীনতা (Fundamental Disequilibrium) আসিতে না পারে, তাহা দেখাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব।

অর্থের বহির্মূল্য নিয়ন্ত্রণ

পঞ্চমত, দেশে টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাঙ্কঋণকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান কাজ। ব্যাঙ্ক-হার পরিবর্তনের দ্বারা বাজারের সুদের হার নিয়ন্ত্রণ, খোলাবাজারের কার্যকলাপের দ্বারা দেশে টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে নগদ জমার পরিমাণে পরিবর্তন করিয়া এবং অনুরোধ বা নির্দেশ প্রভৃতির দ্বারা টাকার বাজারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই দায়িত্ব।

ঋণনিয়ন্ত্রণ

দেশের ঋণকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে দামস্তর স্থির রাখা সম্ভব হয় না; ব্যবসায়সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়সংকট বা বাণিজ্যচক্র দূর করা সম্ভব হয় না। আধুনিক কালে পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্থায়িভাবে বজায় রাখিবার জন্যও ঋণনিয়ন্ত্রণের কাজ বিশেষ সাহায্যকারী। যে-সকল অনুন্নত দেশ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে দ্রুত অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির (Economic growth) চেষ্টা করিতেছে, উহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ হইল সেই উদ্দেশ্যে আর্থিক নীতিসমূহ পরিচালনা করা।

দামস্তর স্থির রাখা বাণিজ্য-চক্র দূর করা, পূর্ণ-কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি

ষষ্ঠত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যান্য বহু প্রকার কাজকর্ম আছে। ব্যাঙ্কসমূহের পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য ক্লিয়ারিং হাউস পরিচালনা করা, দেশের আর্থিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি নজর রাখা এই সকল কার্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককেই করিতে হয়।

ক্লিয়ারিং হাউস পরিচালনা প্রভৃতি

ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (Methods of credit Control)

আমরা জানি যে, দেশের টাকার মূল্য মোটামুটি স্থির রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গুরু দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করিতে হইলে দেশে টাকার যোগান

তাহাকে নিশ্চয় নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। কিন্তু টাকার যোগান বলিলে কেবল নগদ টাকা বুঝায় না, ব্যাঙ্কের যে-আমানত হইতে চল্‌তি লেনদেন চলে, উহা নিশ্চয় টাকার সমানই কাজ করে। বস্তুত, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে দেশে টাকার মোট যোগানের মধ্যে বেশির ভাগ অংশই এইরূপ ব্যাঙ্কের আমানত। তাই দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রয়োজন এবং ব্যাঙ্কগুলির ঋণ-সৃষ্টি বা ঋণদান-ক্ষমতার উপব প্রভাব বিস্তারের উপযোগী পদ্ধতি ও ক্ষমতা উভয়ই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জানা থাকা দরকার।

ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক কয়েকটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল ব্যাঙ্ক-রেটে পরিবর্তন। যে-হারে সরকারীভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিনিময়-বিলসমূহের বদলে টাকা ঋণ দেয় তাহাকে ব্যাঙ্ক-হার বা ব্যাঙ্ক-রেট (Bank Rate) বলে। এই ব্যাঙ্ক-হার হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদের হার—এই হারেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়। সমাজে দ্রব্যসামগ্রী বৃদ্ধির তুলনায় আর্থিক আয়ের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে বা সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-হার বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্ক-হারে বৃদ্ধির ফলে বাজারে সুদের হারও বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে ঋণগ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি হয়, ঋণগ্রহণ ও বিনিয়োগ কম পরিমাণে হইতে থাকে, সমাজে আর্থিক আয়ের স্রোতে ভাঁটা পড়ে। ব্যাঙ্ক-হার কমাইলে ঋণগ্রহণের ব্যয় কমিয়া যায়, ঋণগ্রহণ ও বিনিয়োগ অধিক পরিমাণে হইতে থাকে, সমাজে আর্থিক আয়ের স্রোতে জোয়ার আসে।

ব্যাঙ্ক-হারে পরিবর্তন

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারে সরকারী ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয় করিয়া দেশে টাকার যোগান বাড়াইতে বা কমাইতে চেষ্টা করে; এই পদ্ধতির নাম খোলা বাজারের কার্যকলাপ (open market operations)। সমাজে টাকার পরিমাণ কমাইতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করে, এইরূপে জনসাধারণের বা ব্যাঙ্কের হাত হইতে নগদ টাকা তুলিয়া লয়, ফলে ব্যাঙ্কসমূহের ঋণসৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও কমে। টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হইলে সে ঋণপত্রসমূহ ক্রয় করিয়া লয়, এইরূপে জনসাধারণের বা ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা তুলিয়া দেয়, ব্যাঙ্কসমূহের ঋণসৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

খোলাবাজারের কার্যকলাপ

দেশের ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের নিকট নগদ জমার কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের

নিকট জমা রাখে (Reserve Ratio)। ফলে ব্যাঙ্কের পক্ষে সেই নগদ টাকা ঋণসৃষ্টি করিবার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে ঋণসৃষ্টির পরিমাণ বাড়াইতে চান, তাহা হইলে জমার অনুপাত কমাইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাতে নগদ অর্থ বেশি থাকায় তাহার ভিত্তিতে অধিক 'ঋণসৃষ্টি' সম্ভব হয়। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে ঋণরূপ অর্থের পরিমাণ কমাইতে চান, তাহা হইলে জমার অনুপাত বাড়াইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাত হইতে নগদ অর্থ সরাইয়া আনেন, ঋণ সৃষ্টির ভিত্তি কমিয়া যাওয়ায় ঋণরূপ অর্থের পরিমাণ কমিয়া যায়।

রিজার্ভের অনুপাতে পরিবর্তন

অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইতে বা বাড়াইতে চাহিলে পৃথক ভাবে তাহা করিতে পারেন (Rationing of credit)। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মনে করেন যে, ধরা যাউক, বস্ত্র-শিল্পে বিনিয়োগ অধিক হইতেছে, কিন্তু ইস্পাত শিল্পে আশানুরূপ বিনিয়োগ হইতেছে না, তাহা হইলে ব্যাঙ্কসমূহকে নির্দেশ দিবেন যে নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক ঋণ বস্ত্র-শিল্পে দেওয়া চলিবে না। এইরূপে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন শেয়ার বাজারে ফাট্‌কাদারী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ঋণের রেশনিং

শেয়ার বাজারে ফাটকাদারী রোধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কঋণের ব্যবহার কমাইবার জন্য অনেক সময় এক প্রকার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। শেয়ারের কোন দালাল বা কোন ফাটকা ব্যবসায়ী শেয়ার বন্ধক রাখিয়া ঋণ আনিতে গেলে যে-পরিমাণ নগদ টাকা জমা দেয় তাহাকে বলে প্রয়োজনীয় নগদাংশ (Margin Requirements)। যেমন 1000 টাকার কোন শেয়ার বন্ধক দিয়া যদি ঋণ হিসাবে 900 টাকা আনিতে পারা যায় তাহা হইলে 100 টাকা হইল প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মার্জিন। এক্ষেত্রে মার্জিন হইল শেয়ারের মূল্যের 10%। অর্থাৎ 10% মার্জিনে কোন ব্যক্তি সহবন্ধকী (Colateral Security) দ্রব্যের (শেয়ারের) মূল্যের 90% ঋণ লইতে পারে। প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মার্জিন যত অধিক হইবে তত অধিক নগদ টাকা জমা দিতে হইবে বা শেয়ারের বন্ধকীতে তত কম পরিমাণ ঋণ পাইতে পারিবে। যেমন প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মার্জিন 20% হইলে সে 800 টাকা ঋণ পাইবে। এইভাবে মার্জিন

শেয়ার বন্ধকী ধরণের মার্জিনে পরিবর্তন

বাড়াইয়া ফাট্‌কাদারীতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ কমানো সম্ভবপর।

স্থায়ী ধরণের ভোগ্য দ্রব্যসমূহ (যেমন রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজিডেয়ার, গ্রামোফোন, আসবাবপত্র প্রভৃতি) আজকাল প্রায়ই কিস্তিতে দাম দেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়; দ্রব্য ক্রয়ের সময় দামের একাংশ (যেমন 20% বা 25%) দেওয়া হয় এবং মাসিক, বা ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক নির্দিষ্ট সংখ্যক কিস্তিতে (যেমন মাসিক হিসাবে 30 কিস্তি বা ত্রৈমাসিক হিসাবে 10 কিস্তি, ষাণ্মাসিক হিসাবে 5 কিস্তিতে) সম্পূর্ণ দাম পরিশোধ করা হয়। দেখা গিয়াছে যে, স্থায়ীধরণের ভোগ্য দ্রব্যসমূহের চাহিদা অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির (unstable), এবং তাহা দামস্তর, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর বিশেষ প্রভাবশীল। সুতরাং আধুনিককালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, বিশেষ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে দেশের স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের কিস্তি বা অন্যান্য শর্তাদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে (Consumer credit Regulation)। আমেরিকায় এই ক্ষমতা Regulation W নামে পরিচিত। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে মুদ্রাস্ফীতি ও বিনিয়োগ-বৃদ্ধি কমাইতে হইবে তাহা হইলে সে এই ঋণের শর্তাদি কঠিনতর করিবে যাহাতে দ্রব্যাদির ক্রয় কমিয়া যায়। যেমন, ক্রয়ের সময় নগদ একাংশের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে, ঋণে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের সংখ্যা কমাইয়া দিবে, দাম পরিশোধের কিস্তির সংখ্যা কমাইবে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে এইরূপ স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি হউক এবং উহাতে উৎপাদন ও বিনিয়োগ বাড়িয়া যাউক, তাহা হইলে সে এই ঋণের শর্তাদি শিথিলতর করিবে। যেমন, ক্রয়ের সময় দামের নগদ একাংশের পরিমাণ কমাইয়া দিবে, ঋণে বিক্রয়-যোগ্য দ্রব্যের সংখ্যা বাড়াইয়া দিবে, দাম পরিশোধের কিস্তির সংখ্যাও বাড়াইবে।

ভোগকার্যে ঋণের নিয়ন্ত্রণ

অর্থের বাজারের শীর্ষে অবস্থিত বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণত সকল ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুরোধ সকল প্রতিষ্ঠানই রক্ষা করিবে, এই আশায় অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনুরোধ-উপরোধের পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং ব্যাঙ্কঋণ বাড়ানো বা কমানো উচিত কিনা তাহা ব্যাঙ্কদের বুঝাইবার চেষ্টা করে (moral persuasions)।

অনুরোধ উপরোধের দ্বারা

ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহের সীমাবদ্ধতা (Limitations of the methods of Credit Control) :

এই সকল পদ্ধতি বিনা বাধায় পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগশীল ও কার্যকরী হইয়া থাকে তাহা নহে ; বাস্তব ক্ষেত্রে ইহারা নানাবিধ কারণে সীমাবদ্ধ। সুচিন্তিত ভাবে প্রয়োগ করিলেও ইহারা সর্বত্র সফল না হইতে পারে।

যেমন ধরা যাউক, দামস্তরে পরিবর্তন আসিয়াছে। দেশে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতেছে, "স্বাভাবিক" অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজস্ব সুদের হার বা ব্যাঙ্কহার কমাইয়া বা বাড়াইয়া দিবে। (ক) কিন্তু সুদের হার ঠিক কি পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো দরকার তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি-ভাবে স্থির করিবে? ভুল-ত্রুটির মধ্য দিয়া পরীক্ষা (Trial and Error) করার সুযোগ এই ব্যাপারে খুবই কম। (খ) যদি ব্যাঙ্ক-হারের সেই 'আদর্শ' পরিবর্তনটুকু জানাও যায়, তাহা হইলেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-হার কমাইলে বা বাড়াইলে অন্যান্য ব্যাঙ্ক তাহাদের সুদের হার কমাইবে বা বাড়াইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। অনুন্নত দেশসমূহে, যেমন ভারতবর্ষে, অর্থের বাজার বিশেষ অসংগঠিত, "দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি" (যেমন গ্রাম্য মহাজন, শ্রেষ্ঠী, সাহুকার ইত্যাদি) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদের হার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারে। (গ) ব্যাঙ্কসমূহ সুদের হার পরিবর্তন করিলেও, যেমন মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সুদের হার বাড়িলেও ব্যবসাদারগণ বিনিয়োগ কমাইবে এমন নিশ্চয়তা নাই, কারণ প্রত্যাশিত মুনাফার হার খুব বেশি এবং মোট ব্যয়ের মধ্যে সুদের দরুণ ব্যয় অতি অল্প অংশ মাত্র। আবার ব্যবসায়-সংকটের সময়ে সুদের হার কমাইলেও গভীর নিরাশার প্রভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি না হইবারই সম্ভাবনা।

ব্যাঙ্ক হার পদ্ধতির অসার্থকতা

খোলাবাজারের কার্যাবলীও যে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে তাহা নহে। (ক) দামস্তর বাড়িতে থাকিলে মুদ্রাস্ফীতি কমাইবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সরাইয়া আনিতে পারে, কিন্তু যদি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইয়া সেই নগদ টাকার সাহায্যে ঋণবৃদ্ধি করিতে থাকে তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। (খ) ব্যবসায়-সংকটের যুগে বাজার হইতে ঋণপত্রসমূহ ক্রয় করিয়া

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকার পরিমাণ সমাজে বাড়াইয়া দিতে পারে বটে কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহ পুরাতন ঋণ পরিশোধের জন্য বা সাবধানতা অবলম্বন করিয়া সেই নগদ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিবার জন্য ফেরৎ দিতে পারে ; ঋণসৃষ্টির ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার না করিয়া নিজের আলমারিতে জমাইয়া রাখিতে পারে ; জনসাধারণও নগদ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে সরাইয়া লইয়া নিজেদের হাতে মজুত করিয়া রাখিতে পারে। (গ) বর্ধিত নগদ টাকার সাহায্যে ঋণসৃষ্টি করিতে রাজি হইলেও ব্যাঙ্কসমূহ যে ঋণ দিতে পারিবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, কারণ ব্যবসায়-সংকটের কালে গভীর হতাশায় নিমগ্ন ব্যবসায়িগণ সস্তা ও সহজ ঋণ পাইয়াও অনেক সময় বিনিয়োগে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না। অনিচ্ছুক ঘোড়াকে জলের সম্মুখে পৌঁছানো যাইতে পারে, কিন্তু জলপানে বাধ্য করা যায় না।

খোলাবাজারে কার্যাদির সীমাবদ্ধতা

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন, (ক) সকল ব্যাঙ্ককে সমানভাবে প্রভাবান্বিত করে না, কারণ অনেক ব্যাঙ্ক পূর্ব হইতেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট নিয়মের বেশি নগদ জমা রাখে। তাহা ছাড়া, নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই যে ব্যাঙ্কসমূহ ঋণবৃদ্ধি করিতে চাহিবে এরূপ নহে। আর, ঋণবৃদ্ধি করিতে চাহিলেই তাহারা করিতে পারে না, উদ্যোক্তাগণ ঋণগ্রহণে প্রস্তুত আছে কি না তাহাও লক্ষ্য রাখা দরকার।

নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তনের সীমাবদ্ধতা

তত্ত্বের দিক হইতে ঋণের রেশনিং সত্যই বিশেষ সুবিধাজনক, কারণ ইহার দ্বারা ঋণের পরিাণকে নিয়ন্ত্রণ করা তো যায়ই, উপরন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমাজের বিভিন্ন দিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নতির জন্য ঋণবণ্টন করিতে পারে। তবে এই পদ্ধতি বাস্তবে প্রয়োগের অসুবিধা হইল ইহার বাধ্যতা-মূলক দিকটি, জবরদস্তি করিয়া ব্যাঙ্কের ঋণদানের ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ বলিয়া ইহাকে মনে করা চলে। এই পদ্ধতির কার্যকারিতাও কম, কারণ এক উদ্দেশ্যে ঋণ লইয়া উদ্যোক্তাগণ অন্য উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পক্ষে ঋণব্যবহারের দিকটি নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ অসুবিধাজনক।

ঋণের রেশনিং-এর অসুবিধা

শেয়ার-বন্ধকী ঋণের প্রয়োজনীয় নগদাংশে বা মার্জিনে পরিবর্তন ফাট্‌কা-

ব্যবসায়কে বহুপরিমাণে সংকুচিত করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রা-সংকোচের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে না। সমাজে টাকার পরিমাণ বা আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো এই পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব হয় না, ইহা কেবলমাত্র শেয়ার-লেনদেনে লগ্নীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

মার্জিন নীতির সীমাবদ্ধতা

ভোগ্যদ্রব্যক্রয় নিয়ন্ত্রণও ঋণের কেবল মাত্র বিশেষদিকে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা যে মৌলিক কারণ-গুলির ফলে দামস্তর ভারসাম্যবিহীন হইয়া পড়ে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

ক্রয়নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

অনুরোধ বা প্রভাব-বিস্তার সাফল্য লাভ করে যদি অন্যান্য ব্যাঙ্ক স্বভাবতই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে নেতা হিসাবে স্বীকার করিয়া লয় এবং দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা কম থাকে। আর ব্যাঙ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেই দেশে ঋণসৃষ্টি কমানো বা বাড়ানো যায় না, ঋণগ্রহীতাদের আশা-নিরাশা ও কাজকর্মের উপর ইহা বহুলাংশে নির্ভর করে।

অনুরোধ বা প্রভাবের সীমা

ব্যাঙ্করেট সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা (A further discussion on Bank rate)

নিম্নতম যে-হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রথম শ্রেণীর বিলগুলিকে ডিস্‌কাউন্ট করে অথবা পছন্দসই সিকিউরিটির ভিত্তিতে ঋণ দেয়, তাহাকে ব্যাঙ্করেট বলে। এই ব্যাঙ্করেটের মোটামুটি উদ্দেশ্য হইল বাহির হইতে দেশের মধ্যে সোনা ও আন্তর্জাতিক মূলধন আকৃষ্ট করা এবং দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্তর নিয়ন্ত্রণ করা। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন কিরূপে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতির উপর প্রভাব বিস্তার করে সেই কার্যপদ্ধতি (Modus operandi) সম্পর্কে মোটামুটি তিনপ্রকার বিশ্লেষণ প্রচলিত আছে: প্রাচীন ধারণা, হট্রের (Hawtrey) বিশ্লেষণ ও কেইন্‌সের বিশ্লেষণ। প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী ব্যাঙ্করেটের কাজ হইল সোনার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা; হট্রে'র মতে ইহা বিনিয়োগের ব্যয়ে পরিবর্তন আনে; আর কেইন্‌সের মতে ইহা বিনিয়োগে পরিবর্তন আনে দীর্ঘকালীন সুদে পরিবর্তনের মাধ্যমে। হট্রে ও কেইন্‌সের আলোচনা অনেকাংশে একরূপ, উভয়েই ব্যাঙ্করেটের প্রধান প্রভাব যে বিনিয়োগের উপর তাহা

তিন দিক হইতে ইহাকে আলোচনা করা হইবে

বলেন। তবে হট্রে ইহাকে গণ্য করেন ব্যয়-প্রভাব হিসাবে (as a cost factor) কিন্তু কেইন্‌স ইহাকে গণ্য করেন মূলধনীকরণ-প্রভাব হিসাবে (as a capitalisation factor)। আমরা একে একে ইহাদের আলোচনা করিব।

প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী ব্যাঙ্করেটের প্রধান কাজ হইল দেশে স্বর্ণের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা। কোন দেশের বৈদেশিক ব্যালান্সে ঘাটতি দেখা দিলে সেই দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইতে থাকে। দেশের স্বর্ণভাণ্ডার কমিয়া যায়, তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধির প্রভাব প্রথমেই পড়িবে বৈদেশিক বিনিময়ের উপর। সেই দেশের সকল ব্যাঙ্ক তাহাদের লেনদেনের উদ্দেশ্যে নিজস্ব সুদের হার বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্করেট বেশি বলিয়া বেশি সুদ পাওয়ার আশায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীরা সেই দেশের ব্যাঙ্কে টাকা লগ্নী করিতে চাহিবে, বিদেশ হইতে সোনা সেই দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে, অন্ততপক্ষে স্বর্ণের বহির্গমন বন্ধ হইবে। বিদেশের বাজারে সেই দেশের টাকার চাহিদা বাড়িয়া যাইবে, তাই বিদেশী মুদ্রার হিসাবে দেশীয় টাকার দাম বাড়িবে। বৈদেশিক বিনিময়হার দেশের অনুকূলে আসিবে। ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়ীরা কম ঋণ লইবে, দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য কম হইবে, আয় ও দামস্তর নামিয়া যাইবে। সেই দেশের বাজারে দ্রব্যসামগ্রী আর বেশি বিক্রয় হইবে না (কারণ সেখানে আয় ও দাম কম); বরং সেই দেশ হইতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে (কারণ অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহা পূর্বাপেক্ষা সস্তা)। ইহাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি দূর হইবে, দেশে অধিকতর স্বর্ণ প্রবেশ করিতে থাকিবে। এইরূপে স্বল্পকালীন টাকার বাজার, দীর্ঘকালীন মূলধনের বাজার এবং লেনদেন ব্যালান্সে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে পরিবর্তন আনে।

ব্যাঙ্করেট কিরূপে বাণিজ্য ব্যালান্সে ভারসাম্য আনে

অবশ্য ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন তখনই লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য আনিতে পারে যখন সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা থাকে। সেই দেশের টাকার স্থায়িত্বের উপরই যদি লোকের বিশ্বাস না থাকে, তবে ব্যাঙ্কহার বাড়াইলেই তাহারা নিশ্চয় নিজ নিজ দেশের টাকা বা সোনা এই দেশে জমা দিতে ছুটিয়া আসিবে না।

প্রাচীন ধারণার মূল ভিত্তি ছিল স্বর্ণমান। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একমাত্র কাজ ছিল নিজের স্বর্ণভাণ্ডারকে রক্ষা করা। পৃথিবীর পরিবর্তিত

অবস্থায় ব্যাঙ্করেট আর প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী কাজ করে না। ইহার প্রধান প্রভাব আভ্যন্তরীণ আয়, কর্মসংস্থান ও দামস্তরের উপরে। তাই আজকালকার ধনবিজ্ঞানীরা বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্করেটের কিরূপ প্রভাব পড়ে উহাই আলোচনা করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে দুইটি ধারায় আলোচনা হইয়াছে।

হট্রে কি বলেন

হট্রে (Hawtrey) বলেন যে, ব্যাঙ্করেট বাড়িলে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের স্বল্পকালীন সুদের হার বাড়াইয়া দেয়। ইহার কারণ আমরা জানি : (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ করিয়াছে, তাহার দরুণ এখন উচ্চতর হারে সুদ দিতে হইবে, এবং (খ) ব্যাঙ্কগুলি যে-সকল বিল কিনিয়াছে উহাদের ভাঙাইতে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এখন পূর্বাপেক্ষা বেশি সুদ চাহিবে। দেশে যে-সকল পাইকারী বা খুচরা ব্যবসায়ী আছে, তাহারা সাধারণত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে স্বল্পকালীন ঋণ লইয়া জিনিসপত্র মজুত করে। এইরূপ সকল দ্রব্য মজুত করার খরচা এখন বাড়িয়া গেল, কারণ ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সুদের হার চড়াইয়া দিয়াছে। তাই এই ব্যবসায়ীরা যতটা সম্ভব কম দ্রব্য মজুত রাখিবে, উৎপাদকদের নিকট হইতে মালপত্র কেনার জন্য আর নূতন অর্ডার দিবে না। শুধু তাহাই নহে, ব্যাঙ্কের ঋণ তাড়াতাড়ি ফেরৎ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহারা মজুত দ্রব্য দ্রুত বিক্রীর চেষ্টা করিবে, প্রয়োজন মনে করিলে দাম একটু কমাইয়াও দিতে পারে। এদিকে উৎপাদকেরা নূতন অর্ডার না পাইয়া উৎপাদন হ্রাস করিতে থাকিবে, জিনিসের দাম একটু কমাইয়াও বিক্রীর পরিমাণ বজায় রাখার চেষ্টা করিতে থাকিবে। কিন্তু দাম কমাইলেও জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িবে না, কারণ দেশে ব্যাঙ্ক-ঋণের পরিমাণ কমিলে বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় কমে। ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পাইলে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন কম হইবে, পুরানো যন্ত্রের বদলে কেহ নূতন যন্ত্র বসাইবে না, তাই মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনও হ্রাস পাইবে। ঠিক ইহার বিপরীত ফল হইবে যদি ব্যাঙ্করেট কমানো হয়। পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীরা বেশি টাকা ঋণ লইবে, মালপত্র মজুত করার উদ্দেশ্যে বেশি অর্ডার দিবে. বিনিয়োগ. উৎপাদন ও আয় বাড়িতে থাকিবে।

এই বিশ্লেষণ কিন্তু কেইন্‌স মানিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি মনে করেন যে, মজুত করার জন্য ব্যবসায়ীরা যে-টাকা লগ্নী করে, তাহার খরচা সুদের হার

বদলাইলে ততটা বদলায় না। মজুত করার জন্য টাকা চাই ঠিকই. এবং সেই টাকা ব্যাঙ্ক হইতে ধার করিয়া আনিলে সুদও নিশ্চয় দিতে হয়। কিন্তু এই সুদের হারই তাহাদের মজুত করার পিছনে একমাত্র কারণ নয়, এমন কি প্রধান কারণও নয়। গুদামের ভাড়া, বীমার প্রিমিয়াম, নষ্ট হইবার জন্য কিছুটা ক্ষয় ও ক্ষতিপূরণ, এই সকল খরচা কম নয়; এবং সেয়ার্সের মতে "বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সকল ব্যয় সুদের হারের বিপুল পরিবর্তনকে অগ্রাহ্য করিবার পক্ষে যথেষ্ট।"* কেইন্‌স্ তাই হট্রের বিশ্লেষণকে ভুল না বলিলেও "a very incomplete account" বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন।

হট্রের অসম্পূর্ণতা কোথায়

কেইন্‌সের (Keynes) মতে ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় পরিবর্তন আনে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আনিয়া। স্বল্পকালীন সুদের হারগুলিতে পরিবর্তন আসিলে দীর্ঘকালীন সুদের হারও ক্রমে প্রভাবিত হয়, ইহার ফলে উদ্যোক্তাদের মনে স্থায়ী মূলধনী দ্রব্যে, যেমন কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে, দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করার ইচ্ছায় পরিবর্তন আসে। সুদের হার যত বেশি, দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের ইচ্ছা তত কম; আবার সুদের হার কম থাকিলে এই সকল যন্ত্রপাতিতে টাকা খাটাইবার সম্ভাবনা ও ইচ্ছা তত প্রবল।

কেইন্‌স কি বলেন

ব্যাঙ্করেটে স্বল্পকালীন পরিবর্তনের প্রভাব কিরূপে দীর্ঘকালীন সুদের হারের উপর প্রসারিত হয়? স্বল্পকালীন সুদ বাড়িলে ব্যাঙ্ক ও বিনিয়োগকারী ব্যক্তিরা স্বল্পকালীন ঋণপত্র বা সিকিউরিটিগুলি বেশি কিনিবে, এবং এই উদ্দেশ্যে দীর্ঘকালীন ঋণপত্রগুলি বাজারে বেচিয়া দিবে। তাই দীর্ঘকালীন ঋণপত্রগুলির দাম কমিয়া যাইবে। ইহা আরও ঘটিবে এই কারণে যে, স্বল্পকালীন সুদের হার বাড়িলে লোকে কম টাকা ধার করিয়া ব্যবসায় চালাইতে চাহিবে, তাই দীর্ঘকালীন ঋণপত্রগুলি বেচিয়া দিয়া নিজের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করিবে। দীর্ঘকালীন ঋণপত্রের দাম কমিয়া যাওয়ার অর্থ হইল, কম টাকা খাটাইয়া পূর্বের ন্যায় নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ

স্বল্প ও দীর্ঘকালীন সুদের হারের সম্পর্ক কিরূপ

* "but in most cases they are sufficient to swamp any but the most extreme changes in interest rates...in general, in speaking of most modern economies, we can say that the bankers cannot substantially influence economic activity through this particular channel." Sayers, *Modern Banking* (4th Edition. P. 168-169.

পাইতে থাকা, অর্থাৎ দীর্ঘকালীন সুদের হার বাড়িয়া যাওয়া। এইরূপেই স্বল্পকালীন সুদের হারে পরিবর্তনের ফলে দীর্ঘকালীন সুদের হারে একই দিকে পরিবর্তন আসে।

দীর্ঘকালীন সুদের হারে পরিবর্তন বিনিয়োগের বাজারে পরিবর্তন আনে। স্থায়ী মূলধনী দ্রব্য বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে উহা হইতে প্রত্যাশিত মুনাফার হারের উপর, ইহার উপর দীর্ঘকালীন সুদের হারের প্রভাব খুবই বেশি। প্রত্যাশিত মুনাফার হার সমান অবস্থায় সুদের হার বাড়িলে তাই বিনিয়োগ কমে; আর সুদের হার কমিলে তাই বিনিয়োগ বাড়ে। বিনিয়োগ কমিলে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর কমে, ফলে সঞ্চয় ও ভোগব্যয় উভয়ের পরিমাণই হ্রাস পায়, মূলধনী দ্রব্যে বিনিয়োগ আরও কমিয়া যায়। সুদের হার কমিলে ইহার বিপরীত প্রভাব ঘটিতে দেখা যায়।

সুদের হার বদলাইলে বিনিয়োগ প্রভাবিত হয়

ব্যাঙ্করেটের কার্যপদ্ধতি যত সহজ সরল মসৃণরূপে আলোচিত হইল, বাস্তবে কিন্তু বিষয়টি এত সরল নহে। ব্যাঙ্করেট পদ্ধতির সাফল্যের জন্য কয়েকটি অবস্থা বজায় থাকা দরকার, এই শর্তগুলি প্রতিপালিত না হইলে ইহা সফলভাবে কাজ করিতে পারে না। দেশে সুসংগঠিত এবং ব্যাপক মূলধনের বাজার (**well organised and broad capital market**) থাকা ইহার সাফল্যের অন্যতম প্রধান শর্ত। আমরা জানি, স্বল্পকালীন সুদের হার কত দ্রুত এবং কতটা সাফল্যের সহিত দীর্ঘকালীন সুদের হারে পরিবর্তন আনিতে পারিল, তাহাই ব্যাঙ্করেট-প্রভাবের গোড়ার কথা। সুসংগঠিত ও প্রশস্ত মূলধনের বাজার গড়িয়া তুলিতে না পারিলে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন ঋণপত্রের কেনাবেচা ভালভাবে করা যায় না, উভয় কালের সুদের হার একই দিকে পরিবর্তিত হওয়ার পথ সুগম থাকে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট বাড়াইলে বা কমাইলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও সুদের হার বাড়াইবে বা কমাইবে—এইরূপ অবস্থা থাকা চাই। যদি অবশ্য তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে প্রভূত পরিমাণে ঋণ গ্রহণে অভ্যস্ত থাকে, তবে ইহা ঘটিবেই। এইরূপ ঋণের প্রয়োজন না থাকিলেও ইহা সম্ভব হয় যদি ব্যাঙ্কগুলি সহযোগিতা করে। সর্বোপরি ব্যাঙ্করেটের সাফল্য নির্ভর করে দেশের আর্থিক কাঠামোর নমনীয়তার উপর। যেমন ব্যাঙ্করেট কমানো হইল, ব্যাঙ্কগুলির সুদের হারও কমিল, কিন্তু কোন না কোন প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো গেল না, বিনিয়োগ সম্ভব হইল না, এইরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন নিজ উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবে না।

ব্যাঙ্করেটে রসাফল্যের শর্ত

ব্যাঙ্করেট পদ্ধতিকে বহুভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, বলা হইয়াছে যে, উপরের শর্তগুলি সর্বত্র পাওয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশ ছাড়া এই শর্তগুলি পালিত হইতে দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, এই নীতি সফল হইবে কি না তাহা অনেকটা নির্ভর করে ব্যবসায়ীদের মানসিক অবস্থার উপর। সংকটের সময়ে ব্যাঙ্করেট কমাইলেও ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করিবার মত মনের জোর খুঁজিয়া পায় না। আবার তীব্র মুদ্রাস্ফীতির সময়ে ব্যাঙ্করেট অল্প কিছু বাড়াইয়া কোনরূপ কাজ হয় বলিয়া মনে হয় না, কারণ ব্যবসায়ীদের মনে প্রত্যাশিত মুনাফা তখন খুবই উঁচুতে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট স্তরের পরে ব্যাঙ্কহার আর বেশিদূর বাড়ানো চলে না। তৃতীয়ত, যখন ব্যবসায়ীদের মনোভাবে আশা বা নিরাশার আতিশয্য থাকে না, তখন মনে রাখা দরকার যে, ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন দেশের সকল শিল্পকে সমান ভাবে প্রভাবিত করিতে পারে না। কোন কোন বিনিয়োগ হইতে স্বল্পকালে ফল পাওয়া যায়; আবার কোন কোনটি হইতে দীর্ঘকালে প্রতিদান আসে।

ব্যাঙ্করেট নীতির সমালোচনা

দ্রুত-প্রতিদানশীল বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্কহারের প্রভাব ততটা নাই, কিন্তু দূর-প্রতিদানশীল বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্কহারের প্রভাব খুবই বেশি। চতুর্থত, সরকারী মালিকানা, ট্রাস্টসম্পত্তি, আধা-সরকারী মালিকানা প্রভৃতির কর্তৃত্বাধীনে যে-সকল বিনিয়োগ ঘটে, তাহারা সাধারণভাবে মূলধনের বাজার-নিরপেক্ষ, ইহারা সুদের হারে উঠানামায় ততটা বিচলিত হয় না। পঞ্চমত, আধুনিক কালে দুইটি নূতন বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে। আজকালকার দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে উৎপাদনেব যন্ত্রপাতি ও মূলধনী দ্রব্যগুলি অতি দ্রুত পুরাতন ও অকেজো হইয়া পড়ে (obsolescence), ফলে উদ্যোক্তারা অতি দীর্ঘদিন স্থায়ী অধিক মূল্যের যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ করিতে চায় না। ইহার সহিত আরও একটি বিষয় যুক্ত হইয়াছে। উদ্যোক্তারা উচ্চহারে মূলধনী দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ বাবদ টাকা উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যেই ধরিয়া লইতেছেন, তাই সুদের হার অনেকখানি গুরুত্বহীন হইয়া উঠিয়াছে। ষষ্ঠত, আধুনিক কালে সকল দেশেই সরকারী ঋণের পরিমাণে বিপুল প্রসার হইয়াছে। ব্যাঙ্করেট বাড়িলে সরকারের অসুবিধা, কারণ তখন তাহাকেও ধার করিতে হইবে পূর্বাপেক্ষা বেশি সুদে (সরকারী ঋণপত্রে বেশি সুদ না দিলে লোকেরা ইহা না কিনিয়া অন্য কিছু ক্রয় করিবে)। সুদের হার

বাড়ানোর ব্যাপারে আজকাল তাই সরকারপক্ষ ততটা মত দেন না। এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, গত কয়েক বৎসরে, এই পদ্ধতির কিছুটা পুনরভ্যুত্থান দেখা যাইতেছে। যুদ্ধোত্তর যুগের মুদ্রাস্ফীতি রোধের কাজে আজকাল সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র আর্থিক নীতি প্রয়োগ করেন না, আরও বহুপ্রকার ফিস্‌কাল ও শাসনতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করেন (যেমন রেশনিং, কোটা প্রভৃতি)। তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অস্ত্রাগারে ব্যাঙ্করেট একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহাকে একেবারে বাদ দেওয়া হয় না

খোলাবাজারে কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা (A further discussion on Open market operations)

উপরের আলোচনা হইতে আমরা দেখিয়াছি, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যদি ব্যাঙ্করেট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ সুদের হারে একই দিকে পরিবর্তন না আনে, তবে ঐ পদ্ধতি সাফল্য লাভ করিতে পারে না। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চেষ্টা হইবে যাহাতে অন্যান্য ব্যাঙ্ক তাহাকে অনুসরণ করে। এই উদ্দেশ্যেই প্রথম দিকে খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি প্রয়োগ করা হইত। কিন্তু বর্তমানে ইহাকে আর ব্যাঙ্করেটের সাহায্যকারী নীতি বলিয়া মনে করা হয় না—ইহার স্বাধীন কার্যক্ষমতা সকলে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

এখন আর ইহা ব্যাঙ্করেটের অনুগামী নয়

এই নীতি কিরূপে কার্যকরী হয় তাহা আমরা দেখিয়াছি। দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী সিকিউরিটিগুলি বিক্রয় করিতে থাকে, লোকের (ও ব্যাঙ্কের) হাত হইতে টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে চলিয়া যায়, ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা কমে, তাহাদের ঋণসৃষ্টির ভিত্তি সংকুচিত হয়, সমাজে ঋণগত টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়, মুদ্রাস্ফীতির বেগ মন্দীভূত হয়। আবার অর্থনৈতিক মন্দার অবস্থা থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই সিকিউরিটিগুলি ক্রয় করিতে থাকে লোকের (ও ব্যাঙ্কের) হাতে নগদ টাকা চলিয়া যায়, ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা বাড়ে, তাহাদের ঋণসৃষ্টির ভিত্তি প্রসারিত হয়, সমাজে ঋণগত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়া উঠিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি

পূর্বে এইরূপ ধারণা ছিল যে, একমাত্র ব্যাঙ্করেটের সহকারী নীতি হিসাবেই

খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি কাজ করিতে পারে। ব্যাঙ্করেট বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিত, ব্যাঙ্কগুলির হাতে টাকার পরিমাণ কমিয়া যাইত, ঋণদান সংকুচিত করিবার জন্য সুদের হার বাড়াইয়া দিত। ঠিক এইরূপ ব্যাঙ্করেট কমাইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই সিকিউরিটিগুলি ক্রয় করিত, ব্যাঙ্কের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাইত, ঋণদান বাড়াইবার উদ্দেশ্যে সুদের হার কমাইয়া দিত। এইরূপে উভয়নীতি একত্রে প্রযুক্ত হইত। অনেকে তাই খোলাবাজারী নীতিকে পৃথক বলিয়া মনে করিতেন না। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন না ঘটাইয়া স্বাধীনভাবে খোলাবাজারী নীতি গ্রহণ করা চলে না—ইহাই তাঁহারা মনে করিতেন। তাঁহাদের যুক্তি ছিল এইরূপ: যদি ব্যাঙ্করেট সমান থাকে, কিন্তু সংকট-ত্রাণের উদ্দেশ্যে বাজার হইতে সিকিউরিটি কিনিয়া লইয়া ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকা ঢালিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা সেই টাকা দিয়া ঋণের প্রসার না ঘটাইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের ঋণশোধ শুরু করিতে পারে। ইহারই সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ব্যাঙ্কহার কমাইলে, তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে টাকা না-ও ফেরৎ দিতে পারে, কারণ সুদের হার কম, এবং ব্যবসায়ীরা এই কম সুদের হারে বেশি টাকা চাহে বলিয়া তাহাদের ঋণদানের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে পারে। তাই ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন ছাড়া ইহার স্বাধীন কার্যকারিতা নাই, এইরূপ মনে করা হইত।

ইহাকে পূর্বে ব্যাঙ্করেটেরই অঙ্গ বলিয়া অনেকে বলিতেন

কেইন্‌স কিন্তু ভিন্নরূপ মনে করেন। তাঁহার মতে খোলাবাজারী নীতির কার্যকারিতা অনেক বেশি, ইহাকে তাই স্বাধীন নীতি বলিয়া গণ্য করাই ভাল। যেমন মনে কর, কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে নিজের রিজার্ভের অতিরিক্ত কিছু টাকা আছে। সে উহা কাহাকেও ঋণ দিবার কথা ভাবিতেছে। এই ঋণদানের ফলে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ টাকা আরও বহুগুণ ঋণ সৃষ্টি করিবে। এই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বেচিয়া ঐ টাকাটি তুলিয়া লইলে এই ঋণ প্রসারের ধারার সূত্রপাত হইতে পারিল না, গোড়াতেই বন্ধ হইয়া গেল। এইরূপে দেখা যায় অল্প অল্প করিয়া খোলাবাজারে সিকিউরিটি বেচিলে ব্যাঙ্কগুলি ধীরে ধীরে তাহাদের কাজকর্ম কমাইয়া দেয়। আবার ক্রমে ক্রমে খোলাবাজার হইতে সিকিউরিটি কিনিয়া লইতে থাকিলে ধীরে ধীরে ব্যাঙ্কগুলিও ঋণ প্রসারের নীতি অবলম্বন করে। ব্যাঙ্করেট পরিবর্তন না

কিন্তু অনেকে ইহাকে স্বাধীন নীতির মর্যাদা দিতে চান

করিয়াই খোলাবাজারী নীতির মাধ্যমে অনেক দূর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। *

ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি এই দুই-এর মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। প্রথমত, দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপর উভয়ের প্রভাব ভিন্নরূপ। খোলাবাজারে কার্যকলাপের ফল অনেকটা প্রত্যক্ষ, ব্যাঙ্ক-গুলির নগদ জমার পরিমাণ বদলাইলে তাহাদের ঋণ দিবার ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবিত হয়। কিন্তু ব্যাঙ্করেটের প্রভাব অনেকটা পরোক্ষ, বহু কিছু বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উহা ঋণের বাজারে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্করেটের প্রভাব অনেকখানি অনিশ্চিত, বহু বিভিন্ন কারণের চাপে ব্যাঙ্করেট বাড়িলেও দেশের সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণের পরিমাণ না কমাইবার সিদ্ধান্ত লইতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকার পরিমাণে আঘাত দেয় বলিয়া খোলাবাজারী কার্যকলাপ অনেকটা নিশ্চিত। তৃতীয়ত, ব্যাঙ্করেটের প্রভাব প্রথমে পড়ে স্বল্পকালীন সুদের হারের উপরে, কিন্তু খোলাবাজারী কার্যের প্রভাবে দীর্ঘকালীন সিকিউরিটিগুলির কেনাবেচা হয় বলিয়া প্রথম হইতেই দীর্ঘকালীন সুদের হার কিছুটা প্রভাবিত হইতে থাকে।

ব্যাঙ্করেট ও খোলা-বাজারী কার্যকলাপে পার্থক্য

খোলাবাজারী কার্যকলাপের সাফল্যের জন্য তিনটি শর্ত বজায় থাকা দরকার। প্রথমত, এই সকল সিকিউরিটি বেচাকেনার জন্য সুসংগঠিত ও প্রশস্ত বাজার থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি মোটামুটি স্থির ও নির্দিষ্ট অনুপাতে জমা রাখে, এইরূপ হওয়া দরকার। তৃতীয়ত, সরকারী ঋণের পরিমাণ অতিরিক্ত না হওয়া দরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে প্রচুর পরিমাণ বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটি থাকা দরকার। উপরের এই

খোলাবাজারী কার্য কলাপের সাফল্যের শর্ত ও সীমাবদ্ধতা

* "In this way a progressive series of small deflationary open market sales by the Central bank can induce the banks progressively to diminish little the scale of their operations. Certainly there can be no doubt that a progressive series of small inflationary open market purchases by the Central bank......are potentially, and almost invariably, effective in inducing the member banks to follow suit. In this way, much can be achieved without changing the Bank rate."

J. M. Keynes, *A Treatise on Money*, Vol. II. Pp. 254-255.

শর্তগুলির মধ্যেই খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতির সীমাবদ্ধতা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। অনেক উন্নত দেশের টাকার বাজারেও এই নীতি কার্যকরী হওয়ার পথে অনেক বাধা থাকে। এই প্রসঙ্গ কিছু পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।*

অপূর্ণোন্নত টাকার বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-এর সমস্যা (Problems of Central Banking in underdeveloped Money Markets)

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু সকল দেশের টাকার বাজার সমান স্তরে উন্নীত হয় নাই। কোন দেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নত, সেখানকার টাকার বাজারে উন্নত শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ও মূলধনী প্রতিষ্ঠান আছে; আবার অপর অনেক দেশে এইরূপ কোন কিছু এখনও গড়িয়া উঠে নাই। অপূর্ণোন্নত দেশগুলির টাকার বাজারের কয়েকটি বিশেষত্ব থাকে। প্রথমত, এইরূপ দেশে অত্যল্পকালীন (3 দিন, 7 দিন প্রভৃতির জন্য) ঋণের বাজার, বা তলব-ঋণের বাজার (call-loan market) নাই, ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি নির্দিষ্ট হারে নগদ আমানতের সহিত জমার অনুপাত রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। যেখানে ব্যাঙ্কগুলির জমার অনুপাত নির্দিষ্ট নাই, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিপুল পরিমাণে খোলা-বাজারী কার্য না করিলে ব্যাঙ্কগুলির ঋণনীতি প্রভাবিত হয় না। কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশে এত বিপুল পরিমাণ সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা না-ও থাকিতে পারে।

এইরূপ দেশে টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য:
১। তলব-ঋণের বাজার না থাকা

দ্বিতীয়ত, দেশে উপযুক্ত বিল-বাজারের অভাবও একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিল-বাজার না থাকিলে স্বল্পকালীন ঋণের জন্য রি-ডিস্‌কাউন্ট করিয়া ব্যাঙ্কগুলি বা ব্রোকাররা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হাজির হয় না। তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। বিল-বাজারের লেনদেনকারীরা যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট টাকার জন্য আসে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার পাল্টাইয়া বা ঋণের পরিমাণ কম বেশি করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু বিল-বাজার না থাকিলে নিয়ন্ত্রণের এইরূপ

২। বিল-বাজার না থাকা

* 'ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির সীমাবদ্ধতা' শীর্ষক আলোচনা দেখুন।

সম্ভাবনা কমিয়া যায়। তৃতীয়ত, অপূর্ণোন্নত দেশে টাকার বাজারে বহু বিচ্ছিন্ন, স্বয়ংস্বাধীন অসংলগ্ন অংশ থাকে, ইহাদের একের সহিত অপরের যোগ থাকে না, একটি বাজারে যে-দামে টাকা বিক্রয় হয়, পাশাপাশি অন্য বাজারে ভিন্ন দামে উহার লেনদেন চলে, বিভিন্ন বাজারের মধ্যে ঋণযোগ্য টাকার চলনশীলতা থাকে না, তাই দামের পার্থক্য দূর হয় না।

৩। বিচ্ছিন্ন বহু উপবাজার

ভারতবর্ষে টাকার বাজারে আমরা এক ধরনের দ্বৈতস্থিতি (dichotomy) দেখিতে পাই, সুসংগঠিত পশ্চিমী ধরনের ব্যাঙ্ক এবং অসংগঠিত ধরনের দেশীয় ব্যাঙ্ক। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রভাব পড়ে প্রধানত সংগঠিত অংশের উপর, অপর অংশের ঋণনীতি, ঋণ পরিমাণ, ঋণবিষয় বা ঋণের দাম (policy, volume, direction and price of loans) কিছুই সে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। দেশীয় ব্যাঙ্ক, অর্থাৎ মহাজন, শ্রেষ্ঠী ও সাহুকার প্রভৃতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ধার করিতে যায় না, তাই ব্যাঙ্করেটে হেরফের হইলে তাহার সুদের হার প্রভাবিত হয় না। চতুর্থত, অপূর্ণোন্নত "অনেক দেশই অর্থনৈতিক দিক হইতে এখন পর্যন্ত অন্য-নির্ভর ধরনের (dependent economies), এবং তাহাদের অবস্থা অর্থনৈতিক দিক হইতে স্ব-নির্ভর বা আত্মপ্রধান দেশের (dominant economies) তুলনায় ভিন্নরূপ। স্ব-নির্ভর দেশগুলিতে অর্থনৈতিক কাজকর্মের গতি স্থির হয় প্রধানত আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির চাপে, যেমন দেশে বিনিয়োগী কাজকর্মের হঠাৎ বৃদ্ধি; যদিও অবশ্য লেনদেন ব্যালান্সের অবস্থা দ্বারা এই আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির বেগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির চাপে কাজকর্মের গতিবেগ যত বাড়িতে থাকে ব্যাঙ্কের ঋণপ্রসার তত বৃদ্ধি পায়, যদি না ঠিক একই সময়ে তাহাদের নগদ ব্যালান্স বাড়ে তবে ব্যাঙ্কসমূহ এই চাহিদা মিটাইবার অবস্থায় আসে না। দেশে বিনিয়োগী কাজকর্ম বাড়িলে তাহাদের কাছে নগদ টাকা জমার পরিমাণ বাড়িবে এমন কোন কথা নাই। তাহারা এই অতিরিক্ত নগদ ব্যালান্স দুইটি উপায়ে পাইতে পারে, বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিয়া। ব্যাঙ্করেট বাড়িলে এই উভয় দিকেই অসুবিধা হইবে। তাই দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যের দ্বারা ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রভাবিত হইতে পারে। কিন্তু অপরপক্ষে, পরনির্ভর অর্থনীতিতে, অর্থনৈতিক কাজকর্মের গতিবেগ

৪। ব্যাঙ্কগুলি বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে ব্যালান্স বাড়াইতে পারে

স্থির হয় সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থার চাপে, বিশেষত রপ্তানি দ্রব্যাদির দামের দ্বারা। তাই যে-সকল শক্তির ফলে ব্যাঙ্কঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহারাই আপনা-আপনি ব্যাঙ্কসমূহের বৈদেশিক ব্যালান্স বাড়াইয়া তোলে। ব্যাঙ্ক তখন এই বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে বিক্রয় করিয়া নিজের হাতে দেশীয় টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিতে পারে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকার বৈদেশিক বিনিময়-হারে সমতা রাখিতে চায়, তবে সে ব্যাঙ্কগুলিকে নগদ ব্যালান্স যোগান দিতে থাকিবে। সুতরাং এইভাবে ব্যাঙ্কসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণের প্রয়োজনীয়তা এড়াইতে পারে, ফলে ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধির সংকোচক প্রভাব হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া চলিতে পারে''।*

পঞ্চমত, এই সকল অপূর্ণোন্নত বা পরনির্ভর দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি

* "There are however certain characteristics which may tend to make the bank-rate a less effective instrument of control in these money markets than in the industrially advanced countries. Many of the countries which have undeveloped money markets are also dependent economies, and their position is in some respects quite different from what may be called dominant economies. In the latter of the pace of activities is set mainly by domestic factors, *i.e.*, a burst of investment activities at home, though these may be reinforced by the position of the balance of payments. As the pace of activities quickens under the impact of internal factors and the demand for bank-advances rise, banks may not be in a position to meet this demand unless their cash balances increase at the same time. There is nothing in the rise of investment activities at home to cause an increase in their cash reserves. They may get hold of additional cash balances in two ways, *viz.* by selling a portion of their security holdings in the market, and by rediscounting bills or borrowing from the Central Bank. A rise in the Bank rate will cause difficulties in both directions. The banking system may therefore be influenced by the central bank action through changes in the bank rate. In a dependent economy, however, the pace of activities is usually set by the state of foreign trade especially by the level of export prices. So the same factors which give rise to increased demand for bank advances also cause an increase in the foreign balances of the banks. The latter may easily replenish their local cash balances by selling these foreign funds to the Central Bank. In so far as the Central Bank aims at keeping the rate of exchange steady, it will have to supply the banks with cash balances. Banks may therefore be enabled to avoid borrowing from the Central Bank and escape the restrictive effects of a change in the bank rate in the upward directions."

Dr. S. N. Sen, *Central Banking in undeveloped Money Markets.* P. 50-51.

আন্তর্জাতিক অর্থকেন্দ্র নয়, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের টাকার লেনদেন ইহাদের মাধ্যমে ঘটে না। ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া, অল্প কিছু বিদেশী টাকা আকর্ষণ করিতে পারিলেও অন্যান্য দেশ হইতে প্রভূত পরিমাণে স্বল্পকালীন মূলধন ইহাদের নিকট ছুটিয়া আসে না। তাহাদের বাণিজ্য ব্যালান্সের অবস্থা অনুযায়ী বিদেশী টাকা তাহারা পায়, ইহার বেশি নয়। তাই বৈদেশিক ব্যালান্সে ঘাটতি হইলে ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া তাহারা ইহা মিটাইতে পারে না।

৫। এই সকল দেশে ব্যাঙ্করেট বৈদেশিক ব্যালান্সে সমতা আনিতে পারে না

অপূর্ণোন্নত দেশের টাকার বাজারের যে-বৈশিষ্ট্যগুলি উপরে আলোচিত হইল, তাহা হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, এই সকল দেশে ব্যাঙ্করেটের কার্যকারিতা কেন সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া এইরূপ টাকার বাজারে ব্যাঙ্করেট পদ্ধতির একেবারেই কোন প্রকার উপযোগিতা নাই, এমন মনে করা চলে না। ডি'কক্ (De kock) বলেন যে, অপূর্ণোন্নত দেশেও ব্যাঙ্করেটের কিছুটা গুরুত্ব নিশ্চয় আছে। প্রথমত, নির্দিষ্ট ধরনের অনুমোদিত সিকিউরিটির বদলে জনসাধারণ কি হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের সুবিধা পাইয়া থাকে, তাহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা এই সকল দেশে ব্যাঙ্করেটের কাজ। এইরূপ একটি মান (Standard) ঘোষণা করিলে উহার প্রভাব অনেকটা ভাল হয়। দ্বিতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ এমন একটি সুদের হার পায়, যাহার ভিত্তিতে তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দরকারমত টাকা ধার আনিতে পারে। তৃতীয়ত, ব্যাঙ্করেট ঘোষণা করিলে টাকার বাজারে, অন্তত ইহার সুসংগঠিত অংশে, কিছুটা মানসিক প্রভাব পড়ে। কারণ এই ব্যাঙ্করেট দ্বারা মোটামুটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ইচ্ছা-অনিচ্ছার রূপ প্রকাশ পায়, ব্যাঙ্কসমূহ টাকার বাজারে কি-নীতি অনুসরণ করিবে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ইচ্ছা ও নির্দেশের রূপ তাহারা জানিতে পারে। সর্বোপরি, অনেকে মনে করেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল দেশে ঋণ নিয়ন্ত্রণের নীতি হিসাবে ব্যাঙ্করেটের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে। কালপ্রবাহে ক্রমশ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেরা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নেতৃত্ব মানিয়া লইতেছে, বেশি পরিমাণ টাকা ঋণ লইতেছে এবং মোটামুটি উহার সহযোগিতা, উপদেশ ও নির্দেশ গ্রহণ করিতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, অপূর্ণোন্নত দেশের ব্যাঙ্কসমূহ আজকাল

ইহার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গুরুত্ব

মোটামুটি নগদ জমার অনুপাত স্থির রাখিতেছে। ভবিষ্যতে, তাই ব্যাঙ্করেটের কার্যকারিতা বাড়িবে, এইরূপ মনে করা চলে।

অপূর্ণোন্নত টাকার বাজারে খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি কার্যকরী হয় কি না, এখন তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা জানি যে খোলাবাজারী নীতি সফল হইতে হইলে মোটামুটি তিনটি শর্ত প্রয়োজন: প্রশস্ত ও সক্রিয় সিকিউরিটি বা বিলের বাজার থাকা, ব্যাঙ্কগুলির নগদ জমার অনুপাত নির্দিষ্ট থাকা, এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পুনর্বাট্টার সুবিধা বা ঋণ লেনদেনের সুবিধা না থাকা। সাধারণত বেশির ভাগ অপূর্ণোন্নত দেশেই এই সকল শর্ত অনুপস্থিত থাকে। সেয়ার্স বলেন যে, এইরূপ দেশে সিকিউরিটির বাজার খুব ছোট বা নাই বলিলেই চলে, তাই খোলাবাজারী কার্যকলাপের সম্ভাবনা খুবই সীমাবদ্ধ। তাঁহার মতে "সংকীর্ণ সিকিউরিটির বাজারে ইহার প্রভাব মূলত পড়ে বিভিন্ন সুদের হারের কাঠামোর উপর, ব্যাঙ্কগুলির নগদ জমার পরিমাণের উপর নয়, ফলে তাহাদের ঋণ দিবার ইচ্ছার উপরেও নহে।"

খোলাবাজারী নীতির সীমাবদ্ধতা

দ্বিতীয়ত, নগদ জমার অনুপাত অনির্দিষ্ট থাকিলেও এই নীতি কার্যকরী হয় না; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি ক্রয় করিলে সেই নগদ টাকা ব্যাঙ্কেরা জমাইয়া রাখিতে পারে, অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিলে, হস্তে রক্ষিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দিয়া উহা ক্রয় করিতে পারে, ঋণের পরিমাণ কমানো দরকার হয় না। তৃতীয়ত, পুনর্বাট্টা বা ঋণ গ্রহণের সুবিধা থাকিলে খোলাবাজারী নীতি ততটা কার্যকরী হয় না; কারণ নিজেদের হাতে টাকা বাড়িলে ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ দিয়া আসিতে পারে বা টাকা কমিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ঋণ লইয়া আসিতে পারে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। সকল অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতেই উন্নয়ন-প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে, সরকারী ঋণপত্র বেচিয়া টাকা উঠানোর পরিমাণ সকল দেশেই বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, কারণ দীর্ঘকালীন সুদের হার বাড়িয়া গেলে সরকারের বিশেষ লোকসান। তাহা ছাড়া, বিক্রয় যোগ্য ঋণপত্রের পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সকল সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিবে, এমন কথা বলা যায় না। সর্বোপরি, অপূর্ণোন্নত দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা খাটাইবার মনোবৃত্তির অভাব দেখা যায়, এই সত্য অস্বীকার করা চলে না। খোলাবাজারী নীতির দ্বারা টাকা ঢালিয়া দিলেই আপনা-আপনি ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ বাড়িবে, এমন কথা ধরিয়া লওয়া চলে না। এই সকল

কারণে এই নীতির কার্যকারিতা অপূর্ণোন্নত টাকার বাজারে বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ।

অবশ্য অনেক ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, এইরূপ দেশে, ক্রমশ সিকিউরিটি-বাজারের আয়তন ও কাজকর্ম বৃদ্ধি পাইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে এই নীতির কার্যকারিতা তাই বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন মরসুমে দেশে টাকার বাড়তি বা ঘাটতি দেখা যায়, এবং টাকার যোগানে এই তারতম্য ঘটানোর অস্ত্র হিসাবে খোলাবাজারী নীতি কিছুটা কার্যকরী। সর্বোপরি, এইরূপ টাকার বাজারের সকল অংশ সমান উন্নত নয় এবং বিভিন্ন খণ্ড-বাজারের মধ্যে টাকার লেনদেন ততটা নাই। কখনও, বাজারের কোন অংশে, হঠাৎ টাকার বাড়তি ও ঘাটতি দেখা দিলে ব্যাঙ্করেট অপেক্ষা এই নীতি অধিকতর কার্যকরী, কারণ ইহা সঠিক বা নির্দিষ্ট স্থানে আঘাত দিতে পারে। ব্যাঙ্করেট সামগ্রিকভাবে সকল প্রকার বিনিয়োগের উপর প্রভাবশীল, কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশে আঞ্চলিক বা অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ কোন অঙ্গের উপর প্রভাব বিস্তার করা অনেক সময় দরকার হইয়া পড়ে। এই উদ্দেশ্যে, তুলনামূলকভাবে, খোলাবাজারী নীতিকে বেশ কিছুটা ব্যবহার করা চলে।

তবে ব্যাঙ্করেটের তুলনায় ইহা গুরুত্বপূর্ণ

ব্যাঙ্কসমূহের রিজার্ভের অনুপাতে পরিবর্তন পদ্ধতিকে (**variation in the reserve ratio**) অনেকে অপূর্ণোন্নত দেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঘোষণা করে যে, ইহার পর হইতে মোট আমানত ও নগদ জমার অনুপাত বাড়াইতে হইবে, তবে প্রতিটি ব্যাঙ্কের ঋণদান ক্ষমতা কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে ঋণপ্রসার ঘটুক—ইহা মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই নগদ জমার অনুপাত কমাইয়া দিবে, ব্যাঙ্কসমূহের হাতে ঋণদানের যোগ্য টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। যখন ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারী নীতি বিফল হয়, সেই অবস্থায় এই নীতি প্রয়োগ করা চলে, কারণ ইহার কার্যকারিতা অনেকটা প্রত্যক্ষ (**direct**)। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন অন্যান্য ব্যাঙ্কের সুদের হারকে না-ও প্রভাবিত করিতে পারে, খোলাবাজারী কার্যকলাপও অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের ঋণনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। কিন্তু এই নীতি ব্যাঙ্কের ঋণ দিবার ক্ষমতাকে সরাসরিভাবে কমাইতে বা বাড়াইতে পারে। সরকারী ঋণের পরিমাণ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ঋণপত্রের পরিমাণ—এই সকল বিষয়ের উপর খোলাবাজারী নীতির কার্যকারিতা নির্ভর করে, কিন্তু পরিবর্তনীয় জমার নীতি ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত

ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারী নীতির সহিত ইহার তুলনা

হয় না। এই সকল কারণে অধ্যাপক সেয়ার্স ও আরও অনেকে অপূর্ণোন্নত দেশে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ সুপারিশ করিয়াছেন।

কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশে অনেকে এই নীতি কার্যকরী হয় না বলিয়া মনে করেন। বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থা আলোচনা করিয়া Mr. Plumptre এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, এই নীতিতে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। তিনি বলেন যে, এই নীতি কার্যকরী হইতে গেলে দুইটি শর্ত স্বীকার করিতে হয়ঃ (ক) ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের নগদ রিজার্ভের অনুপাত অনুযায়ী ঋণ দেয়, এবং (খ) তাহারা মোট আমানত ও নগদ জমার মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষা করে। কিন্তু Mr. Plumptre-র মতে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাঙ্কসমূহ সর্বদা নজর রাখে কি-পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা তাহাদের হাতে আছে, স্থানীয় টাকার নগদ ব্যালান্সের প্রতি তাহাদের ততটা নজর নাই। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কগুলি নির্দিষ্ট অনুপাতে রিজার্ভ রাখার নীতি মানিয়া চলে না। নগদ জমার পরিমাণ ও অনুপাত তাহারা কখনও খুব বেশি বা কখনও খুব কম রাখে; তাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভের অনুপাত অল্প একটু-আধটু বদল করিলে তাহাদের ঋণনীতি মোটে প্রভাবিত হয় না। সর্বোপরি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জমার অনুপাত বাড়াইলে যদি তাহাদের ঋণযোগ্য টাকার পরিমাণ কমিয়াই যায়, তবে তাহারা সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট কিছুটা বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করিয়া স্থানীয় নগদ টাকার ভাণ্ডার বাড়াইয়া তোলে। Mr. Per Jacobsson-ও এইরূপ আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যাঙ্কের ঋণনীতি স্থির করার পূর্বে সে বহু বিষয়ের উপর নজর রাখে, উহার মধ্যে নগদ জমার অনুপাত হইল মাত্র ক্ষুদ্র একটি বিষয়। তাই কেবল ইহাতে পরিবর্তন আনিয়া ব্যাঙ্কের ঋণ-পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নয়। এই সকল আপত্তি ছাড়াও এই নীতির বিরুদ্ধে আর এক ধরনের যুক্তি দেখানো হয়। বলা হয় যে, এই নীতি জটিল, অনমনীয় ও পক্ষপাত দোষ-দুষ্ট (clumsy, inflexible and discriminatory)। খোলাবাজারী নীতিতে অল্প একটু পরিবর্তন ঘটানো যায়, কিন্তু নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন সারা দেশের ঋণব্যবস্থাকে বিপুলভাবে নাড়া দিতে পারে। ইহার নমনীয়তা নাই, কারণ দেশের কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে টাকার বাড়তি বা ঘাটতি দেখা দিলে এই নীতি প্রয়োগ করা চলে না। রিজার্ভের অনুপাতে পরিবর্তন সারা দেশের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। অপূর্ণোন্নত দেশে অনেক সময়

অনেকে বলেন এই নীতি কার্যকরী হয় না

আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, কিন্তু এই নীতি সেই লক্ষ্য সাধনে সমর্থ নয়। ইহা পক্ষপাতদুষ্ট, কারণ বড় ব্যাঙ্ক ইহাতে বিচলিত হয় না, কিন্তু ছোট ব্যাঙ্কগুলি বিব্রত হইয়া পড়ে। আরও বলা হয় যে, রিজার্ভের অনুপাত বদলাইলে উহার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ভাল নয়, কারণ ইহাতে দেশের শেয়ার-বাজারের স্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হইতে পারে।

তবুও অনেকে ইহাকে বাদ দিতে চান না

এই সকল সমালোচনা সত্ত্বেও অনেক ধনবিজ্ঞানী ইহার প্রয়োগ পছন্দ করেন। যে সকল অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হইল, উহাদের দূর করিয়া এই নীতিকে কিছুটা কার্যকরী করিয়া তোলা যায়। যেমন, সেয়ার্স (Sayers) বলেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর বা বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যাঙ্ককে বিভিন্ন হারে জমার অনুপাত রক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ নীতি ঘোষণা করা চলে। অতি অল্প পরিমাণে জমার অনুপাত বদলাইতে থাকিলে দেশে হঠাৎ ইহার বিরূপ প্রভাব না-ও দেখা দিতে পারে।

অপূর্ণোন্নত দেশে উপরের এই সকল নীতির তুলনায় ঋণনিয়ন্ত্রণের বাছাই-পদ্ধতিসমূহ (selective methods of credit control) অনেক বেশি কার্যকরী। এই সকল দেশে উপকরণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে এমনভাবে উপকরণের নিয়োগ পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে শিল্পসম্প্রসারণ দ্রুত হইতে পারে। তাহা ছাড়া, সমাজের দিক হইতে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া উপকরণের অপব্যয় না হয় তাহাও দেখা দরকার। এই সকল উদ্দেশ্যে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ও দিক নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। তাই বাছাই-পদ্ধতিসমূহ (selective methods) অধিকতর কার্যকরী। বাছাই-পদ্ধতিসমূহ প্রধানত দুইটি: প্রয়োজনীয় মার্জিনের অনুপাতে পরিবর্তন এবং ভোগ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের কিস্তিতে পরিবর্তন।

বাছাই করার নীতি

এই সকল দেশে ভোগ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় এখন পর্যন্ত এমন ব্যাপক স্তরে উন্নীত হয় নাই, যেখানে কিস্তিবন্দী ক্রয়-বিক্রয়ের বিপুল প্রসার হইয়াছে। তাই এই নীতির কার্যকারিতা ততটা নাই। কিন্তু প্রয়োজনীয় মার্জিনের অনুপাতে পরিবর্তনের নীতি খুবই কার্যকরী এবং ইহার প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশি। তাই 1949 সালের ভারতীয় ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই ক্ষমতা দিয়াছে। আমাদের দেশে ইহার প্রয়োগও করা হইয়াছে, যেমন, ভারতে খাদ্যদ্রব্যের ফাটকাবাজি বন্ধ করার জন্য 1956 সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

নির্দেশ দিয়াছিলেন, যেন ব্যাঙ্কঋণের সাহায্যে খাদ্যশস্যের ফাটকাবাজি না হয়।

অপূর্ণোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে অনেক সময়ে বলা হয় যে, এই সকল দেশে টাকার বাজারে কিছুটা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত। সাধারণ ব্যাঙ্কেরা যে-সকল কাজ করে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরও সেইরূপ কিছু কিছু কাজ করা প্রয়োজন। ঋণনিয়ন্ত্রণের জন্য এইরূপ ক্ষমতা উহার হাতে থাকা দরকার যে, প্রয়োজন মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সোজাসুজি বাজারে প্রবেশ করিয়া যাহাকে খুশি ঋণ দিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইরূপ নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং যাহাতে নিজের ব্যাঙ্করেট বাজারে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে সেইজন্য কিছু কিছু বিল কেনা-বেচার পথও অবলম্বন করিয়াছিলেন। কোন কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট হইতে তাঁহারা আমানতও গ্রহণ করেন। টাকার বাজারের সহিত নিয়মিত ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা, টাকার দাম ও ব্যাঙ্কের নীতিকে প্রভাবিত করা, টাকার বাজারের অসংলগ্ন অংশসমূহের মধ্যে টাকার দাম ও পরিমাণে মোটামুটি সমতা রক্ষা করা—এই সকল উদ্দেশ্যে অনেকেই ইহাকে সমর্থন করেন। দেশে ব্যাঙ্কব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন এবং উপযুক্ত উৎকর্ষের স্তরে পৌঁছানো, এই নীতির দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন ব্যবসায়ে মূলধনের নিয়োগ পরিকল্পনা অনুযায়ী করিতে হইলে এইরূপ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে নিশ্চয় থাকা দরকার।*

কিছুটা সাধারণ ব্যাঙ্কিং-এর কাজ করা দরকার

* "The tendency for the lopsided distribution of credit is to be found in the less developed economies. One important characteristic of most of these countries is their reliance upon the production of a few commodities for export. This may induce the businessmen to concentrate their activities on the already known lines of production and to neglect the development of new industries. Moreover, these countries seem to be determined to crowd into the compass of 5 to 10 years the developments that took 50 or more years in the older countries. The authorities should naturally like to retain in their hands control over the misuse or direction of the limited resources...This has involved not only attempts to extend the sphere of influence of Central Banks into the comparatively inaccessible or inadequately organised branches of the short-term market, but even incursions into the domain of long term finance, which is traditionally regarded as lying outside the proper interest of the Central Banks."

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা (British Banking System)

পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যাঙ্ক হইল ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড। 1694 সালে পার্লামেণ্টের আইন দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহার পর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির নমুনা (Model) হিসাবে ইহা গণ্য হইয়াছে। গঠনের সময় হইতে বেসরকারী শেয়ার ক্রেতাগণ ইহার মালিক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 1946 সালের ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড আইন অনুযায়ী সমস্ত শেয়ার রাষ্ট্র কিনিয়া লইয়াছে। বর্তমানে ইহার পরিচালনা করেন একটি কোর্ট। ইহাতে আছেন একজন গবর্ণর, – একজন ডেপুটি গবর্ণর এবং ষোল জন ডিরেক্টর—সকলেই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত। গবর্ণর এবং ডেপুটি গবর্ণর পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন, আর ডিরেক্টরগণ চার বৎসরের জন্য। ইহারা প্রত্যেকেই পুনর্নিযুক্ত হইতে পারেন।

ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডের গঠন

ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের সমস্ত কাজকর্ম উহার দুইটি বিভাগের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়—ইস্যু বিভাগ ও ব্যাঙ্কিং বিভাগ। ইস্যু বিভাগের কাজ হইল নোট প্রচলন করা, Fixed Fudiciary Limit System অনুযায়ী ইংলণ্ডের নোট প্রচলন করা হইয়া থাকে। 1450000 পাউণ্ড পর্যন্ত কোন স্বর্ণ মজুত না রাখিয়া নোট প্রচলন করা চলে, উহার উপরে প্রচলিত নোটের শতকরা 100 ভাগই স্বর্ণে জমা রাখিতে হয়। স্বর্ণ মজুতের এই রীতি এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, যদিও মনে রাখা দরকার যে, কাগজের এই নোটগুলি স্বর্ণে রূপান্তর যোগ্য নয়।* 1939 সাল হইতে দেশের স্বর্ণমজুতের পরিমাণ বিনিময়ের সমতা সাধনকারী অ্যাকাউণ্টে (Exchange Equalisation Account) জমা রাখা হইয়াছে।

কাজকর্ম: ইস্যু বিভাগ

ব্যাঙ্কিং বিভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সকল প্রকার কাজ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বিশেষত্ব এই যে, যদিও ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড সকল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে ঋণ দিতে রাজি আছে এবং তাহাদের দ্বারা উপস্থাপিত বিলগুলিকে প্রয়োজন হইলে

* প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পরিচালকবৃন্দের সভায় ব্যাঙ্কের পরিচালন সম্পর্কীয় যাবতীয় নীতির পর্যালোচনা করা হয়, ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ বহুদিন যাবৎ এই ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

পুনরায় ভাঙ্গাইয়া দিতে রাজি আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দরকার হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে টাকা চাহিতে যায় না।

ব্যাঙ্কিং বিভাগ

ব্যাঙ্কগুলির হঠাৎ টাকার দরকার হইলে তাহারা বিল-ব্রোকারদের দেওয়া ঋণ ফেরৎ চায় এবং এই বিল-ব্রোকাররা তখন ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নিকট হাজির হয় ঋণ বা পুনরায় ডিসকাউণ্টের স্থবিধা পাইবার জন্য। এইরূপ অবস্থায় বলা হয়, যেন বাজার ব্যাঙ্কের নিকট হাজির হইয়াছে ("to go into the bank")।

বৃটিশ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিল-ব্রোকার এবং ডিস্‌কাউণ্ট হাউসগুলির কার্যকলাপ। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত তাহাদের নিয়মিত গ্রাহকদের নিকট হইতে পাওয়া বিলগুলি ডিস্‌কাউণ্ট করে। কিন্তু বেশির ভাগ বিল তাহাদের নিকট হাজির করে এই বিল-ব্রোকাররা। ডিস্‌কাউণ্ট হাউসগুলি বিলের ব্যবসায়ে বিশেষ পারদর্শী, কোন বিল ভাল বা মন্দ তাহা চিনিতে পারার বিষয়ে তাহাদের দক্ষতা খুবই বেশি। টাকা কম পড়িলে এই ডিস্‌কাউণ্ট হাউসগুলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট ধার লইতে যায় অথবা এই বিলগুলি পুনরায় ভাঙ্গাইবার জন্য উপস্থিত হয়। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেরা যদি ঋণ সংকোচনের নীতি গ্রহণ করে, অর্থাৎ ডিস্‌কাউণ্টের ও পুনর্ডিস্‌কাউণ্টের স্থবিধা তুলিয়া লইতে থাকে, তবে এই ডিস্‌কাউণ্ট হাউসগুলি ঋণের জন্য বা বিলগুলিকে ভাঙ্গাইবার জন্য ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নিকট ছুটিয়া যায়। ব্যাঙ্ক এবং ডিস্‌কাউণ্ট হাউসগুলি যে-সকল বিল লইয়া কাজকর্ম করে সেগুলি সবই বৈদেশিক বিনিময় বিল (Foreign Bills of Exchange)। সাধারণত ইংলণ্ডে আভ্যন্তরীণ বিনিময়-বিল লইয়া লেনদেন বিশেষ করা হয় না। সাধারণত ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের ডিস্‌কাউণ্টের হার অর্থাৎ ব্যাঙ্করেট ব্যাঙ্কগুলির বিল ভাঙ্গাইবার রেট অপেক্ষা অর্থাৎ ডিস্‌কাউণ্টের রেট অপেক্ষা বেশি।

বৃটেনের টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য

ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিংএর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, দেশের পাঁচটি বৃহৎ ব্যাঙ্ক তাহাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা লইয়া সারা দেশের টাকার বাজারে লেনদেন করে। এইরূপ শাখা-ব্যাঙ্কিংয়ের ফলে ব্যাঙ্ক পরিচালনার খরচ অনেক কম এবং খুব কম পরিমাণ নগদ জমা লইয়া তাহাদের পক্ষে ব্যবসায় পরিচালনা সম্ভবপর হয়। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যাঙ্করেট নীতি, খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি এবং অনুরোধ-উপরোধের নীতি প্রয়োগ

ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির বৈশিষ্ট্য

করেন। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি নিম্নতম কি-পরিমাণ নগদ টাকা জমা রাখিবে তাহা আইনের দ্বারা কোনরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই। তাই নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তনের নীতি এই দেশে প্রয়োগ করা চলে না। কিন্তু ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নিজস্ব সম্মান খুবই বেশি, তাহা ছাড়া ওই দেশে স্বল্পকালীন টাকার বাজার খুবই অনুভূতিশীল ও উন্নত ধরনে সংগঠিত—এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী।

ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Federal Reserve Bank)—সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বারোটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রতিটি অঞ্চলের জন্য নিজস্ব এক একটি ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে। যে-কোন অঙ্গরাজ্যে নিজস্ব আইনের অধীনে কোন একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং ইহাকে যে ফেডারাল রিজার্ভ ব্যবস্থার সভ্য হইতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। কিন্তু ফেডারাল রিজার্ভ আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাকে ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সভ্য হইতে হইবে; এই অবস্থায় তাহাকে নিজ অঞ্চলের ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয় করিতেই হইবে। এইরূপ জাতীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা মোট ব্যাঙ্কের অর্ধেক। কিন্তু ইহাদের আমানতের পরিমাণ দেশের মোট আমানতের $\frac{5}{6}$ অংশ।

আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

1913 সালের ফেডারাল রিজার্ভ আইন অনুযায়ী ওয়াশিংটনে একটি উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন ফেডারাল রিজার্ভ বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। এই বোর্ডেরই বর্তমান নাম হইল ফেডারাল রিজার্ভ সিস্টেমের বোর্ড অফ গবর্ণরস্। এই বোর্ডই প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, এবং বারোটি ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইল কার্যত ইহার শাখা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক মনোনীত (সেনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে) সাতজন সভ্য লইয়া এই বোর্ড অফ্ গবর্ণরস গঠিত। প্রতি দুই বৎসর অন্তর একজন সভ্য পদত্যাগ করিয়া থাকেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ভাইস্ চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চার বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। ইহা ছাড়া একটি ফেডারাল উপদেষ্টা কাউন্সিল (Federal Advisory Council) আছে, ইহা প্রতিটি ফেডারাল রিজার্ভ জিলা হইতে একজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। এই বোর্ডের খোলাবাজারী কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য একটি ফেডারাল খোলাবাজারী কার্যকলাপ কমিটি আছে (Federal Open

তবে সব ক্ষমতাই বোর্ড অফ্ গভর্ণরের হাতে

Market Committee), বোর্ডের সাতজন সভ্য এবং ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলি হইতে পাঁচজন প্রতিনিধি লইয়া ইহা গঠিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে খোলা-বাজারী কার্যকলাপ এবং ব্যাঙ্করেট পরিবর্তনের নীতি প্রয়োগ করা হয়। ফেডারাল রিজার্ভ বোর্ড অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড-এর ন্যায় সভ্য ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ আদান-প্রদান সম্পর্কে অনুরোধ বা উপদেশ জানান। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলি কি-হারে নগদ টাকা জমা রাখিবে তাহা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট এবং বোর্ড অফ্ গবর্ণরের হাতে এই অনুপাত পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। বাছাই-বিনিয়োগের নীতি এবং গুণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের নীতি (Selective and Qualitative credit controls) আমেরিকাতে গত কুড়ি বৎসরে ক্রমশ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

ঋণনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি-সমূহ

আমেরিকার ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য করিয়া থাকেন। কোন সভ্য ব্যাঙ্ক তাহার নিকট কোন বিল লইয়া আসিলে তিনি ঐ বিলগুলি ভাঙ্গাইয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত আছেন। মার্কিন ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকা কম পড়িলে তাহারা সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কেরা এইরূপ অবস্থায় বিল ব্রোকার এবং ডিস্কাউন্ট-হাউসগুলিকে বাধ্য করে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নিকট হইতে ঋণ লইতে। আধুনিক কালে আমেরিকায় দেখা যাইতেছে যে, কোন একটি ব্যাঙ্কের টাকা কম পড়িলে সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট না গিয়া অপর কোন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইতে পারে। তাহা ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলি আইনত প্রচুর পরিমাণ সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া রাখিতে পারে। নগদ টাকা কম পড়িলে সাময়িকভাবে বাজারে সে ঋণপত্রগুলি বিক্রয় করিয়া দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির সহিত এইরূপ ঋণ আদান-প্রদান সম্পর্ক থাকায় খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি ততটা সাফল্য লাভ করিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলিতে নগদ জমার অনুপাত বেশি বলিয়া তাহারা নগদ জমার পাঁচ ছয়গুণের বেশি ঋণ সৃষ্টি করিতে পারে না। অপর পক্ষে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলিতে নগদ জমা কম রাখা হয় বলিয়া তাহারা নগদ আমানতের প্রায় $12\frac{1}{2}$ গুণ ঋণ প্রসার করিতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সহিত তাহার সম্পর্ক

ইংলণ্ড ও আমেরিকার ব্যাঙ্কব্যবস্থার তুলনা (Comparison between British and US Banking systems)

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করিলে প্রথমেই চোখে পড়ে উভয় দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এর মধ্যে পার্থক্য। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কিংজগতে যেমন বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রাধান্য (Big Five) আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেইরূপ নাই। ইংলণ্ডের সকল শহরেই পাঁচ-ছয়টি বৃহৎ ব্যাঙ্কের শাখা দেখিতে পাওয়া যায়, মোটামুটি ইহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য বা কাজকর্মের ধরণ একই। কিন্তু আমেরিকায় শাখা ব্যাঙ্কিং এর প্রসার ঘটে নাই, এক একটি অঞ্চল লইয়া এক একটি ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। শুধু তাহাই নয়। এই সকল বিভিন্ন ইউনিট-ব্যাঙ্কগুলির সকলে সমান ধরণের কাজ করে না। কাহারও কৃষিতে ঝোঁক, কাহারও শিল্পে, কাহারও-বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে—তাহা ছাড়া কাজকর্মের খুঁটিনাটি ধরণেও অনেক পার্থক্য দেখা যায়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এর রীতিনীতিতে এত বৈচিত্র্য থাকায় দুই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজকর্মের ধরণও কিছুটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।*

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এ পার্থক্য

ইংলণ্ডে কয়েকজন ব্যক্তি একত্রে বসিয়া আলাপ-আলোচনা করিলে দেশের ব্যাঙ্কিংনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসিতে পারে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও সুবিধা-অসুবিধার কথা কয়েকজনকে জানাইলেই ব্যাঙ্কিং জগতকে নিয়ন্ত্রণের কাজ সহজ হইয়া যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে 14000 স্বয়ংস্বাধীন ব্যাঙ্ক আছে, বহু সহস্র ব্যক্তি নিজেদের ব্যাঙ্কার বলিয়া দাবি তুলিতে পারে, বিস্তৃত অঞ্চলে ইহারা ছড়ানো ও বিক্ষিপ্ত। নিউ ইয়র্কের ব্যাঙ্কারদের বা ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি ইহাদের বশ্যতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলতি আমানতের পরিমাণ ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক

*"The development of nationwide branch banks has been prevented by law and still more by the traditional feelings in which the legal restrictions are deeply entrenched. These feelings are derived to some extent from the historical fear of the newer west for the money power of the older east; they also express the more general feeling in every region against remote control, and the distrust of any incipient monopoly of finance. The laws restricting branch banking are essentially those of the forty eight states, and they vary from one state to another." Sayers, *Modern Banking*. P. 257.

বেশি। ঋণ দিবার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, তাহাদের মাঝারি সময়ের জন্য ঋণ বেশি, বন্ধকী-ঋণও (দীর্ঘকালীন) আছে। বর্তমান কালে ভোগের উদ্দেশ্যে ঋণের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংলণ্ডে এই সকল দেখা যায় না। লণ্ডনের বাজারে ব্যাঙ্কগুলি সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার করে না, দরকার হইলে ডিস্‌কাউণ্ট মার্কেটে চাপ দেয় এবং বিল-ব্রোকাররা তখন বাধ্য হইয়া ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নিকট ছুটিয়া আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ ঘটে না। সেখানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার পায়। ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলি অনেক সময় বড় বড় ব্যাঙ্কের নিকট নিজেদের ব্যালান্স আমানতী হিসাবে জমা রাখে। ইংলণ্ডে এইরূপ কখনও ঘটে না।

বহু বিষয়ে এই পার্থক্য দেখা যায়

আমেরিকায় প্রচুরসংখ্যক ব্যাঙ্ক থাকার ফলে এবং ভৌগোলিক দিক হইতে বিক্ষিপ্ত থাকার দরুণ ক্লিয়ারিং ও টাকা লেনদেনের ব্যাপারে বহু জটিলতা ভোগ করিতে হয়। ইংলণ্ডে মোটেই এত অসুবিধা নাই। এই জটিলতার দরুণ যুক্তরাষ্ট্রে একজন আমানতকারীকে যতটা কমিশন ও পারিশ্রমিক দিতে হয়, ইংলণ্ডে তাহাপেক্ষা এই সকল দেয়-র পরিমাণ অনেক কম। 1929-30 সালের ব্যাঙ্কিং-সংকটের পর হইতে দেশের অধিকাংশ আমানতই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। এইজন্য ফেডারাল আমানত-বীমা করপোরেশন (Federal Deposit Insurance Corporation or F. D. I. C.) গঠিত হইয়াছে। কোন ব্যাঙ্কের প্রতিটি আমানতকারীর 10000 ডলার পর্যন্ত এই বীমার দ্বারা সংরক্ষিত; ফলে বৃহৎ কোম্পানী ও অতি ধনীব্যক্তি ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিবাসীদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় লোকসান যাইবার কোন ভয় নাই। একটি ব্যাঙ্ক এইরূপে বীমাবদ্ধ হইলে F. D. I. C. তাহার হিসাবপত্র সম্পর্কে খোঁজখবর রাখিবার অধিকারী। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অনেক ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারেন। এইরূপ কোন ব্যবস্থা ইংলণ্ডে নাই।

ইংলণ্ডে সাধারণত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কগুলি অতি অল্পকালীন ঋণদান করে। ব্যাঙ্কের হাতে টাকার পরিমাণ বেশি থাকিলেও তাহারা মোটামুটি এই নীতি মানিয়া চলে। কিন্তু আমেরিকায় 1930 সালের পর হইতেই টার্ম লোন (term loan) ও ক্রেতা-ঋণ (consumer credit) দেখা দিয়াছে। চার বা পাঁচ বৎসরের জন্য ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের এই ঋণ দেওয়া হয়। ইংলণ্ডের

তুলনায় আর একটি পার্থক্য হইল যে, ইংলণ্ডে অনেক সময়ে মুখের কথায় বা চিঠির আদান-প্রদানে ঋণের লেনদেন হয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঋণের ব্যাপারে বহুপ্রকার কাগজপত্র, উকিল-মুহুরী ও দলিল লেখাপড়ার দরকার হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে কি-পরিমাণ নগদ জমার অনুপাত হইবে তাহা নির্ভর করে আইনের উপর ; ফেডারাল রিজার্ভ ব্যবস্থা বা কোন কোন অঙ্গরাজ্য (member-state) এইরূপ আইন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডে এইরূপ কোন আইন নাই, ব্যাঙ্কগুলি মোটামুটি সর্বসম্মত একটি প্রথা মানিয়া চলে। সর্বোপরি, সারা ইংলণ্ডে সকল স্থানে ব্যাঙ্কে সমান প্রকার ঋণে সুদের হার সমান—এইরূপ অবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না।

উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায়, উভয়েরই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে শক্তি ও ক্ষমতার উৎস হইল, ইহারা নগদ টাকা জোটাইবার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড যে-রূপ নগদ টাকা প্রচলন করে, আমেরিকাতেও সেইরূপ ফেডারাল ট্রেজারী কর্তৃক বুলিয়ন সার্টিফিকেট (Bullion certificates) প্রচলিত করা হয়। বৃটেন এবং আমেরিকা উভয় দেশেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত তাহাদের টাকাকে দরকার মত নগদ টাকা বা তরল সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করে। উভয় দেশেই সাধারণ ব্যাঙ্কেরা প্রয়োজন হইলে নগদ টাকার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়। উভয় দেশেরই ব্যাঙ্করেট বাজারের সুদের হার অপেক্ষা ঊর্ধ্বে।

এই সকল পার্থক্যের ফলেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-এ পার্থক্য

উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিংয়ে এইরূপ সমতা থাকা সত্ত্বেও পার্থক্য কম দেখা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেকটা বিকেন্দ্রিক ধরণের। বারোটি ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং একটি ফেডারাল বোর্ড সকলেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিংয়ের কোন না কোন কর্তব্য করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড নিজ-দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্তৃত্ব যেন কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছে। ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড একটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলির মালিক হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ব্যাঙ্কেরা।

উভয় দেশের ইতিহাস, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের ধারা, জাতিগত বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রভেদ—সকল কিছু মিলিয়া এই সকল পার্থক্য গড়িয়া তুলিয়াছে।

অনুশীলনী

1. Discuss the necessity of a Central Bank in a country.

2. What is a Central Bank and in what respects it is different from ordinary bankers?

3. What is a Central Bank? Do you support its Nationalisation? What is its relation to the state?

4. Discuss the functions of a typical Central Bank.

5. "The Central Bank operates as a bankers' bank and a lender to them of last resort." Elucidate.

6. Discuss the validity of the argument used to support the following propositions: (a) A Central Bank should not undertake ordinary banking business with public, (b) A Central Bank should have a monopoly of note-issue.

7. Consider the need for controlling money supply. Briefly enumerate the more important methods which the Central Bank of a country may adopt in order to control such supply.

8. Discuss the more important methods of controlling the volume of credit. What are their limitations?

9. How does a modern bank control the quantity and quality of credit?

10. What is a Bank Rate? Discuss the effects of the Bank Rate on general prices, trade and industry.

11. What are open market operations? How do they affect the volume of currency?

12. Discuss the efficacy of monetary measures in controlling fluctuations in the price level.

13. How and how far a Central Bank can maintain monetary equilibrium?

14. Discuss the operations of (a) Bank of England, (b) Federal Reserve System.

15. Distinguish between the banking systems of the U.K. and the U.S.A.

16. Discuss the problems of Central Banking in underdeveloped money markets.

17. Discuss how far Bank Rate and Open Market Operation policies are suitable in the underdeveloped economies.

৬

আর্থিক তত্ত্ব ঃ টাকার মূল্য ও তাহার পরিমাপ

Monetary theory : the value of money and its measurement

টাকার বিনিময়ে যে-সকল জিনিসপত্র পাওয়া যায় তাহারাই টাকার মূল্য।

অর্থের মূল্য

কিছুকাল পূর্বের তুলনায় বর্তমানে টাকার বিনিময়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গেলে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা হয় ঃ আবার পূর্বের তুলনায় দ্রব্যসামগ্রী কম পরিমাণে পাওয়া গেলে টাকার মূল্য হ্রাস হইয়াছে বলা চলে।

টাকার বিনিময়ে দেশে কি-পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহা নির্ভর করে দামস্তরের (Price-level) উপর। দামস্তর ঊর্ধ্বাভিমুখী হইলে টাকার মূল্য কমিয়া আসে ; দামস্তর নিম্নাভিমুখী হইলে টাকার মূল্য বাড়িয়া যায়।

কিন্তু কিছু সময়ের ব্যবধানে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সমাজে কোন কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে, কোন কোন দ্রব্যের দাম কমিয়া গিয়াছে—সকল দ্রব্যের

দামস্তর

দামে একই সঙ্গে বৃদ্ধি বা একই সঙ্গে হ্রাস সচরাচর দেখা যায় না। ইহাদের দামে বৃদ্ধির বা হ্রাসের হারেও তারতম্য থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড় (average) হয় ঊর্ধ্বমুখী অথবা নিম্নগামী ; সকল দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় ঝোঁক থাকে। সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের এই গড়ের নাম হইল দামস্তর। বিভিন্ন সময়ের দামস্তরগুলিকে পাশাপাশি সাজাইলে সূচক-সংখ্যা (Index Number)

সূচক সংখ্যা

পাওয়া যায়। কোন বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড়কে, অপর কোন সময়ের একই দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড়ের সহিত তুলনা করিতে হইলে এই সূচক সংখ্যা ব্যবহার করিতে হয়।

যে-বৎসরের দামস্তরের সহিত পরবর্তী কোন বৎসরের দামস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে, তাহাকে বলা হয় মূল বৎসর (Base year)। সেই

মূল বৎসরের সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় এবং প্রত্যেকটি দামকে 100 হিসাবে ধরিতে হয়। তাহার পর, যে-বৎসরের দামস্তরে পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে সেই বৎসরের পূর্বোক্ত দ্রব্যসামগ্রীর দামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া মূল-বৎসরের দামসমূহের সহিত তুলনামূলক পরিবর্তন হিসাব করিতে হয়; 100-র তুলনায় আনুপাতিক ভাবে তাহাদের হ্রাস বা বৃদ্ধির হিসাব করা হয়। অবশেষে উভয়ের গাণিতিক গড় (Arithmetic average) নির্ণয় করিয়া মূল বৎসরের তুলনায় পরবর্তীকালের দামস্তরে পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারা যায়। নিচের উদাহরণ হইতে ইহা বুঝা যাইবে।

কিভাবে সূচক-সংখ্যা গঠন করিতে হয়

1939 সাল (মূল বৎসর)	1947 সাল (হিসাবী বৎসর)
চাল—প্রতি মণ 4 টাকা=100 ...	... 16 টাকা=400
ডাল—প্রতি মণ 10 টাকা=100 ...	... 20 টাকা=200
জুতা—প্রতি জোড়া 5 টাকা=100 ...	... $7\frac{1}{2}$ টাকা=150
চা—প্রতি পাউণ্ড 4 টাকা=100 ...	... 3 টাকা=75
$400 \div 4 = 100$	$825 \div 4 = 206\frac{1}{4}$

উপরের উদাহরণে দেখা যাইতেছে, কয়েকটি দ্রব্যের দামের সাহায্যে প্রস্তুত সূচকসংখ্যাতে 1939 সালের তুলনায় 1947 সালে দামস্তর শতকরা $106\frac{1}{4}$ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থের সহিত বিনিময় হয় এরূপ যত অধিক দ্রব্যসামগ্রী লইয়া হিসাব করা হইবে, সেই সূচক সংখ্যা তত সঠিকভাবে অর্থের সাধারণ ক্রয়শক্তিতে (general purchasing power of money) পরিবর্তন পরিমাপ করিতে পারিবে।

কিন্তু এইভাবে হিসাব করার একটি বিশেষ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। সকল দ্রব্যকে সমান গুরুত্ব দিয়া হিসাব করিলে সেই সূচক সংখ্যা নির্ভুল হইতে পারে না, কারণ দেশের ক্রেতারা তাহাদের ভোগ-পরিকল্পনায় সকল দ্রব্যকে সমান গুরুত্ব দেন না। তাই সকল দ্রব্যের দামে পরিবর্তন তাহাদের জীবনযাত্রার মানে, অর্থাৎ তাহাদের নিকট অর্থের ক্রয়-ক্ষমতাতে পরিবর্তনের সঠিক পরিমাপ করিতে পারে না। সমাজের ব্যয়-কাঠামোতে (Expenditure structure) দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব অবহেলা করা চলে না। গণিতের

বিভিন্ন দ্রব্যে যথাযোগ্য গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয়তা

হিসাব বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত না-ও করিতে পারে। সমাজের অধিকাংশ লোকের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অল্প পরিবর্তন সমাজের অল্পাংশ লোকের পক্ষে কম-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অধিক পরিবর্তন অপেক্ষা বাস্তব-ক্ষেত্রে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ, গণিতের হিসাবে চালের দামে বৃদ্ধি টর্চের দামে হ্রাসের ফলে খণ্ডিত হইয়া যাইতে পারে, সূচক সংখ্যায় সেই পরিবর্তন প্রতিফলিত না-ও হইতে পারে, অথচ এইরূপ পরিবর্তন নিশ্চয়ই টাকার সাধারণ ক্রয়শক্তি অর্থাৎ জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন আনিয়াছে, অর্থাৎ ব্যক্তির নিকট অর্থের বাস্তব মূল্য বদ্‌লাইয়া দিয়াছে।

এই অসুবিধা দূর করার জন্য দেশে গুরুত্বশীল সূচক সংখ্যা (**weighted index number**) গঠন করা হয়। দেশের মোট ব্যয়ের মধ্যে কত অংশ একটি দ্রব্যের পিছনে ব্যয়িত হইতেছে তাহা হিসাব করিয়া সমাজের ব্যয়-কাঠামোতে প্রত্যেকটি দ্রব্যসামগ্রীর গুরুত্ব অনুধাবন করা হয় এবং মূল ও হিসাবী বৎসরের দামগুলিকে সেই পরিমাণ গুরুত্ব দিয়া পূরণ (**Multiplication**) করিয়া গুরুত্বশীল সূচকসংখা গঠন করা হয়। নিচের তালিকা হইতে ইহা দেখা যাইতেছে। পূর্বের সরল সূচক সংখ্যাটিকে গুরুত্ব দিয়া নূতন ভাবে হিসাব করা হইয়াছে।

গুরুত্বশীল সূচকসংখ্যা

	মূল বৎসর	হিসাবী বৎসর
	গুরুত্ব	গুরুত্ব
চাল	$100 \times 8 = 800$	$400 \times 8 = 3200$
ডাল	$100 \times 6 = 600$	$200 \times 6 = 1200$
জুতা	$100 \times 5 = 500$	$150 \times 5 = 750$
চা	$100 \times 1 = 100$	$75 \times 1 = 75$
	$2000 \div 20 = 100$	$5225 \div 20 = 261\frac{1}{4}$

গুরুত্বহীন সূচক সংখ্যায় দামস্তরে বৃদ্ধি হইয়াছিল শতকরা $106\frac{1}{4}$; কিন্তু উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়ার পরে দেখা যাইতেছে ইহাতে বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা $161\frac{1}{4}$ ।

সূচকসংখ্যা গঠনের ও ব্যবহারের বহু বাস্তব (**Practical**) অসুবিধা এবং তত্ত্বগত (**Theoritical**) ত্রুটি আছে। প্রথমত, মূল বৎসর নির্বাচনের অসুবিধা। যে-মূল বৎসরের দামস্তরের সহিত অন্যান্য বৎসরের দামস্তরের তুলনা-

মূলক পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে, সেই বৎসরটি স্বাভাবিক হওয়া চাই, সেই বৎসরে অর্থের মূল্যকে স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করা দরকার। কিন্তু যুদ্ধ-প্রস্তুতি, যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর অবস্থার প্রায় সকল বৎসরই কমবেশি অস্বাভাবিক। তবে, এই সকল অসুবিধা দূর করার জন্য অনেক সময় কয়েক বৎসরের দ্রব্য-সামগ্রীর দামের গড়কে মূল বৎসরের দাম হিসাবে গণনা করা হয়। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যসামগ্রী নির্বাচনেব অসুবিধা। যদি অর্থের সাধারণ ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন হিসাব করিতে হয়, তাহা হইলে যত অধিক সংখ্যক দ্রব্যের দাম গ্রহণ করা হইবে, ততই সেই সূচক সংখ্যা সঠিক ও অধিক প্রতিনিধিত্বমূলক হইবে। যে-উদ্দেশ্যে সূচক সংখ্যা প্রস্তুত করা হইতেছে, সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে কলেজের ছাত্রদের দ্বারা ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর দাম হিসাব করিলে ভুল হইবে। তৃতীয়ত, দাম নির্বাচনের অসুবিধা। দ্রব্য-সামগ্রীর পাইকারী দাম জানিতে পারা সুবিধাজনক, এই কারণে অনেক সময় পাইকারী দামের সাহায্যে সূচক সংখ্যা গঠনের চেষ্টা করা হয়; কিন্তু বাস্তবপক্ষে জনসাধারণ খুচরা দামেই দ্রব্য ক্রয় করে, খুচরা দামের পরিবর্তনই তাহাদের নিকট অর্থের মূল্য বা ক্রয়শক্তির পরিবর্তন হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু সকল দ্রব্যের খুচরা দাম সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে একই দ্রব্যের খুচরা দামে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। চতুর্থত, গড় নির্ণয়ের বহু পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করিলে কিছুটা তারতম্য ঘটিয়া থাকে। পঞ্চমত, গুরুত্বশীল সূচক সংখ্যা গঠনেও বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। ব্যয়-কাঠামোতে দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব নির্ধারণ বিশেষ সহজ নয়, প্রত্যেক পরিবারের ব্যয়-কাঠামো অন্য পরিবারের ব্যয়-কাঠামো হইতে পৃথক। বিভিন্ন পরিবর্ত-দ্রব্য বা অনুপূরক দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে বা নূতন দ্রব্য প্রচলনের ফলে ব্যয়-কাঠামোতে দ্রব্যাদির পারস্পরিক গুরুত্বে সর্বদাই পরিবর্তন হইতেছে। দ্রব্যাদির গুরুত্ব সর্বদাই নূতনভাবে হিসাব করিয়া প্রত্যেকটি সূচক সংখ্যা গঠন করা খুবই পরিশ্রমসাধ্য ও জটিল ব্যাপার।

নির্মাণগত অসুবিধা সমূহ
মূল বৎসর, দ্রব্যসামগ্রী ও দাম নির্বাচন
গড়নির্ণয় ও গুরুত্বপ্রদান

বিভিন্ন ব্যবহারে সূচক সংখ্যা প্রয়োগের বহু তত্ত্বগত আপত্তি (Theoritical objections) দেখা দিতে পারে। **প্রথমত, একই দেশের মধ্যে সকল লোক সকল প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করে না; আয়, অভ্যাস, রুচি ও পরিবেশের**

পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবারের ব্যয়-কাঠামো পৃথক থাকে, সাধারণভাবে নির্দিষ্ট ধরণের কয়েকটি দ্রব্য লইয়াই বিশেষ কোন পারিবারিক ব্যয়-কাঠামো গঠিত থাকে। একই আয়-স্তরের মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চল, পরিবেশ ও অভ্যাসের ফলে সকল পরিবার সমজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করে না। সুতরাং টাকার সাধারণ ক্রয়শক্তি বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না; বস্তুত, অষ্ট্রীয় ধন-বিজ্ঞানীদের একাংশ সাধারণ দামস্তরের ধারণাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে চাহেন। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সময়ের মধ্যে সূচক-সংখ্যার সাহায্যে টাকার মূল্যে পরিবর্তন পরিমাপ করা সঠিক ভাবে সম্ভব নহে। সময়ের পার্থক্যে লোকের ভোগে বা দ্রব্য-ব্যবহারের ধরণে বিপুল পরিমাণে ও মৌলিক ধরণের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। নূতন দ্রব্যাদির ব্যবহার সুরু হয়; বহু দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়; ব্যবহারিক জীবনে পুরাণো দ্রব্যের তাৎপর্যও পৃথক হইয়া পড়ে। দ্রব্যের দাম সমানই আছে, কিন্তু তাহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইয়াছে, এরূপ ঘটিলে সূচক-সংখ্যায় পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় না বটে, কিন্তু টাকার মূল্যে বাস্তবক্ষেত্রে নিশ্চয়ই পরিবর্তন আসে, জীবন-যাত্রার মান নির্ধারণে অর্থের বাস্তব তাৎপর্য ভিন্নরূপ হইয়া পড়ে। যেমন, পূর্বের 50 নয়া পয়সা দামের সিগারেট বর্তমানে একই দাম থাকিলেও পূর্বাপেক্ষা ভাল বা মন্দ হইলে জীবন-যাত্রার মান-স্তরে অর্থাৎ টাকার মূল্যে পরিবর্তন আসে, কিন্তু সূচকসংখ্যার গাণিতিক হিসাবে সেই পরিবর্তন ধরা পড়ে না, ইহাতে কোন পরিবর্তন আসে না। রবার্টসন তাই বলিয়াছেন “আসনে বসিয়া গাড়ী-চড়া এবং আসন না পাইয়া দাঁড়ানো অবস্থায় গাড়ী-চড়া, উভয় অবস্থাতে দাম এক দিলেও ভোগের দিক হইতে ইহারা কখনই সমান জিনিস নহে।”

তত্ত্বগত আপত্তিসমূহ ঃ একই দেশের বিভিন্ন আয়স্তর এবং একই আয়স্তরের অন্তর্গত বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে এবং বিভিন্ন স্থানের মধ্যে, জীবন যাত্রার মানের তুলনা চলে না।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন স্থানের মধ্যে জীবন-যাত্রার মান স্তরে অর্থাৎ টাকার মূল্যে তুলনামূলক পরিমাপ করা তত্ত্বের দিক হইতে অযৌক্তিক। পরিবেশ, রুচি ও অভ্যাসের তারতম্য এত বিস্তৃত যে বিভিন্ন দেশে নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যের গুরুত্ব তুলনা করা চলে না, একই দামে ক্রীত দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত তৃপ্তির পরিমাণে বিপুল পার্থক্য থাকে। কেইনসের ভাষায় বলা হয়, “একই ধরণের ব্যক্তিদের তৃপ্তির তুলনামূলক পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; ফ্যারাও’-র ক্রীতদাসের সহিত ফিফ্‌থ এভিনিউতে চলমান মোটর গাড়ীর, অথবা

একদিকে ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসীর নিকট দামী জ্বালানি ও সস্তা বরফ, অপরদিকে, হোটেনটট্‌দের নিকট সস্তা জ্বালানি ও দামী বরফ—ইহাদের তৃপ্তির তুলনা করা চলে না।"*

এই সকল প্রয়োগগত ও তত্ত্বগত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও টাকার মূল্য বা সাধারণ ক্রয়শক্তির ধারণা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় তাহা বলা চলে না। সূচক-সংখ্যার সঠিক না হইলেও, প্রায় কাছাকাছি ও মোটামুটি-ভাবে তুলনামূলক বিচারে কিছুটা সাহায্য করে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সময়ের পার্থক্য যদি কম হয় তবে ইহার সাহায্যে টাকার মূল্যে পরিবর্তন মোটামুটিভাবে পরিমাপ করা চলে, কারণ রুচি, অভ্যাস এবং ব্যয়-কাঠামো স্বল্পকালে বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং দীর্ঘকালে না হইলেও, স্বল্পকালীন বিশ্লেষণে সূচকসংখ্যার ব্যবহার সম্ভবপর।

সূচকসংখ্যার প্রয়োজনীয়তা

বিভিন্ন প্রকার সূচক সংখ্যা (Different kinds of Index Numbers)

যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে, সেইজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট টাকার মূল্য সাধারণভাবে পৃথক। তাহা ছাড়া, টাকাকড়িও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যয় হয় বলিয়া বিভিন্ন উদ্দেশ্যের সূচকসংখ্যা প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। টাকা যে কেবলমাত্র ভোগ্যদ্রব্য বা সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করে, তাহা নহে, বিভিন্ন উৎপাদন-কার্যে নিয়োগের উপযোগী উৎপাদক দ্রব্যাদির ক্রয়েও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, টাকার সাহায্যে ক্রয় করা হইয়াছে এইরূপ বিভিন্ন দ্রব্যাদির গোষ্ঠী অনুযায়ী বিভিন্ন দামস্তর থাকিতে পারে, যেমন পাইকারী দামস্তর, রপ্তানি দামস্তর, মূলধনী দ্রব্যের দামস্তর প্রভৃতি। বিভিন্ন সূচকসংখ্যার সাহায্যে এই সকল বিভিন্ন দামস্তরে পরিবর্তন বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকার মূল্যে পরিবর্তন পরিমাপ করা চলে।

অনুশীলনী

1. How would you measure changes in the value of money?
2. Examine the difficulties you have to face in constructing an Index number showing changes in the purchasing power of Money.
3. What are Index Numbers? Point out their usefulness.
4. What are Index Numbers? How they are prepared? Briefly discuss the utility and the limitations of Index Numbers.

* "We are not in a position to weigh the satisfactions of similar persons, of Pharaoh's slaves against Fifth Avenue motor cars, or dear fuel and cheap ice to Laplanders with cheap fuel and dear ice to Hottentots." Keynes, *Treatise on money.* Vol. I. P. 104.

৭

আর্থিক তত্ত্ব ঃ দামস্তরে পরিবর্তন

Monetary theory : Changes in the Price level

কোন দেশের টাকার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য দুই প্রকার মূল্য আছে। দেশের মধ্যে টাকার বিনিময়ে কি পরিমাণ দেশীয় জিনিসপত্র কিনিতে পারা যায়, তাহা হইল টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য। আর টাকার বাহ্য মূল্য হইল ইহার বিনিময়হার, অর্থাৎ একটি দেশের টাকার বদলে অন্য দেশের টাকা কি পরিমাণ পাওয়া যায়। আলোচনার সুবিধার জন্য টাকার এই দুই প্রকার মূল্য পৃথক করিয়া রাখা দরকার।

অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য হইতে টাকার পার্থক্য আছে। টাকার মূল্য হইল সাধারণ ক্রয়শক্তি, সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীকে কিনিতে পারা যায় এইরূপ সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা। টাকার মূল্যে পরিবর্তন হইলে ইহার বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী কিনিতে পারার ক্ষমতা বদলাইয়া যায়। সকল দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িলে তাই আমরা বলি যে, টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে, আবার দ্রব্যসামগ্রীর দাম কম হইলে আমরা বলি যে, টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। দামস্তরকে P ধরিয়া লইলে টাকার মূল্য হইল $1/P$. টাকার মূল্য বদলাইয়া গেলে যাহাদের হাতে টাকা আছে তাহারা যেমন প্রভাবিত হয়, ঠিক সেইরূপ সকল অর্থনৈতিক কাজকর্মের ধরনও বদলাইতে থাকে। এই সকল পরিবর্তন বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। উপরন্তু, টাকার মূল্য পরিবর্তন সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে অস্থায়িত্ব (an element of instability) আনিয়া ফেলে। এই সকল কারণের জন্য টাকার মূল্যে পরিবর্তন কেন আসে তাহার আলোচনা এত গুরুত্বপূর্ণ।

টাকার মূল্য ও দামস্তর

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। •ক্লাসিকাল ও নয়া-ক্লাসিকাল লেখকেরা দামস্তরে পরিবর্তনকেই সমগ্র অর্থনৈতিক দেহের ভারসাম্যহীনতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলিয়া মনে করিতেন। দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে ইহা ধরিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, দেশে অর্থনৈতিক ও আর্থিক

ভারসাম্য রক্ষা করাই মূল কথা এবং অর্থের ক্রয়শক্তি বা টাকার মূল্য কেন পরিবর্তিত হয় সেই শক্তিগুলি খুঁজিয়া বাহির করাই আর্থিক তত্ত্বের লক্ষ্য। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা পূর্ণ কর্মসংস্থান ধরিয়া লইতে পারেন না, তাঁহাদের নিকট দামস্তরে পরিবর্তন অপেক্ষা উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানামাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

দামস্তরে পরিবর্তন কেন হয় সেই সম্পর্কে ক্লাসিকাল লেখকদের মতবাদের নাম অর্থের (বা টাকার) পরিমাণতত্ত্ব। তাঁহাদের মতে অন্যান্য সকল দ্রব্যের দামের মতনই টাকার মূল্য নির্ভর করে উহার যোগান ও চাহিদার উপর। টাকার যোগান ও চাহিদা কাহাকে বলে ?

অর্থের যোগান ও চাহিদা (The supply of and Demand for money)

কোন দেশে অর্থের যোগান বলিলে নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক সৃষ্ট অর্থ—এই উভয়ের যোগফল বুঝায়। দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে নগদ টাকার পরিমাণ প্রধানত নির্ভর করে স্বর্ণের মোট পরিমাণের উপর। নূতন স্বর্ণখনির আবিষ্কার হইলে, অন্য ব্যবহার হইতে স্বর্ণ সরিয়া আসিয়া অর্থরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকিলে, বা বিদেশ হইতে দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে দেশে মোট স্বর্ণের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই স্বর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় এবং উহার বিনিময়ে লোকেরা নগদ টাকা লইয়া যায়, এইরূপে অর্থের প্রচলন বাড়িয়া যায়। যদি স্বর্ণ বা স্বর্ণ মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে না-আসিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে পৌঁছায় তবে এই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ উহার ভিত্তিতে ঋণপ্রসার সুরু করিয়া দেয়। এইরূপে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় স্বর্ণের পরিমাণ দেশে টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করে।

টাকার যোগান
১। স্বর্ণমান

কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় অর্থের যোগান নির্ভর করে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতির উপর। কাগজী নোটের পরিমাণ স্থির করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। আজকাল সরকার নিজে নোট ছাপায় না। যখন সরকারের টাকার দরকার হয় সে তখন সরকারী সিকিউরিটি বা ঋণপত্রের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লয়। ঐ সকল ঋণপত্রের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারকে টাকা দেয়। সরকার যখন নিজের ঋণ-ভার লাঘব করে অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করে, তখন স্বভাবতই দেশের প্রচলন ধারায় টাকার পরিমাণ হ্রাস পায়। ব্যাঙ্ক কর্তৃক সৃষ্ট অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে

২। কাগজী মান

ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান নীতির উপর। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অবশ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে যেমন, ব্যাঙ্করেট পরিবর্তন, খোলাবাজারী কার্যকলাপ, জমার অনুপাতে পরিবর্তন প্রভৃতি উপায়ে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির ঋণনীতি অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করিতে পারে। তাই আমরা বলিতে পারি যে, কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় দেশে অর্থের যোগান নির্ভর করে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির উপর।

নগদ টাকা বা ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট ঋণগত অর্থের পরিমাণ—কেবল এই উভয়ের যোগফলকেই আমরা কোন দেশের টাকার যোগান বলিতে পারি না। আমরা জানি প্রতিটি কাগজের নোট প্রতিদিনে বা সপ্তাহে বা মাসে বহুবার হাতবদল হইয়া অনেক টাকার কাজ করিতেছে। এইরূপে ব্যাঙ্কের রক্ষিত জমার উপর চেক-ও অনেকবার হাত বদল হইতেছে। প্রতিটি নগদ বা ব্যাঙ্কের অর্থ-ই যে এইরূপ কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঠিক নির্দিষ্ট কয়েকবার হাত বদল হয় তাহা নহে, তবে গড়ে কতবার হস্তান্তরিত হইল উহা হিসাব করিয়া বাহির করা চলে। ইহারই নাম অর্থের প্রচলন বেগ। টাকার পরিমাণকে উহার গড় প্রচলন বেগ দিয়া গুণ বা পূরণ করিলে দেশে টাকার মোট যোগান আমরা জানিতে পারি। টাকার পরিমাণ যদি হয় M, এবং গড় প্রচলনবেগ যদি হয় V, তবে দেশে টাকার মোট যোগান হইল $M \times V = MV$.

টাকার প্রচলন বেগ

এইরূপে দেশের প্রচলনধারায় যে অর্থ সঞ্চালিত হইতে থাকে উহার মূল্য বলিতে কি বোঝায়? অর্থের এক একটি ইউনিট (1 টাকা, 1 পাউণ্ড, 1 ডলার প্রভৃতি) নিজের বিনিময়ে যতটুকু দ্রব্য সামগ্রী কিনিতে পারে তাহাই অর্থের মূল্য। স্পষ্টত বুঝা যায় যে, অর্থের একটি ইউনিটের বিনিময়ে দ্রব্য সামগ্রী কতটুকু পাওয়া যাইবে তাহা নির্ভর করে জিনিস-পত্রের দামের উপর, অর্থের সাধারণ মূল্য বলিলে তাই আমরা বুঝি সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর দামের গড় বা দামস্তর। দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে আমরা বলি অর্থের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে, অর্থাৎ অর্থের একটি ইউনিট পূর্বাপেক্ষা কম জিনিস ক্রয় করিতে পারিতেছে। আবার দামস্তর হ্রাস পাইলে আমরা বলি যে অর্থের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে, অর্থাৎ টাকার একটি ইউনিট পূর্বাপেক্ষা বেশি জিনিস ক্রয় করিতে পারিতেছে।

অর্থের মূল্য

অর্থের মূল্য কিসের উপর নির্ভর করে? কোন ধরনের শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দ্রব্য সামগ্রীর সাধারণ দামস্তর পরিবর্তিত হয়? ঊনবিংশ শতাব্দীতে

এইরূপ ধারণা ছিল যে অর্থ তৈয়ারী হয় স্বর্ণ বা রৌপ্যের দ্বারা, তাই এই স্বর্ণ বা রৌপ্য উৎপাদনের খরচের উপর অর্থের মূল্যও নির্ভর করে। কিন্তু আজকাল বেশির ভাগ টাকাই কাগজের নোট, ইহাদের উৎপাদন-ব্যয় নিতান্ত অল্প, ইহা একেবারে না-ই বলিলেই চলে। তাই অর্থের উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত অর্থের মূল্যের কোনরূপ সম্পর্ক আজকাল আর মানিয়া লওয়া চলে না। বর্তমানে অর্থের মূল্য নিরূপণ সম্পর্কে দুই ধরনের তত্ত্ব প্রচলিত আছে: অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্ব। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মতে অর্থের যোগান ও চাহিদা উভয়ে মিলিয়া অর্থের মূল্যকে প্রভাবিত করে।

অর্থের মূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব

অর্থের যোগান সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। অর্থের চাহিদা কাহাকে বলে? চাল বা পাট বা গমের জন্য চাহিদার মত অর্থের চাহিদার প্রকৃতি নয়। এই সকল ভোগ্য দ্রব্যের জন্য লোকের চাহিদা হয় কারণ তাহারা এই সকল দ্রব্য হইতে উপযোগিতা বা তৃপ্তি পায়। কিন্তু অর্থের নিজস্ব কোন উপযোগিতা নাই, ইহাকে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করাও চলে না। ব্যক্তি টাকা চায় কারণ ইহার সাহায্যে দ্রব্যসামগ্রীর উপর সে নিজের প্রয়োজনমত অধিকার আরোপ করিতে পারে।

টাকার চাহিদা কাহাকে বলে

এই কারণে আরভিং ফিশার এবং প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা বলিতেন যে, অর্থের জন্য মোট চাহিদার পরিমাণ আর দেশে বিক্রয়-যোগ্য মোট দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য সমান। জিনিসপত্র কেনার জন্যই টাকার প্রয়োজন, তাই টাকার চাহিদা বলিলে দেশে টাকার সহিত বিনিময়-যোগ্য সকল প্রকার দ্রব সামগ্রীর মোট মূল্যকেই বুঝিতে হইবে। তাই বিনিময়-যোগ্য সবল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণকে দ্রব্যসামগ্রীর গড় দাম দিয়া গুণ বা পূরণ করিলে অর্থের জন্য চাহিদা জানিতে পারা যায়। যেমন যদি বিনিময়যোগ্য সকল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হয় T এবং উহাদের গড় দাম হয় P, তবে টাকার চাহিদা $P \times T = PT$.

ফিসারীয় মত

কেম্ব্রিজের ধনবিজ্ঞানীরা টাকার চাহিদার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন এবং ফিসারের ব্যাখ্যা হইতে তাঁহাদের ব্যাখ্যা ছিল ভিন্নরূপ। ফিসারীয় তত্ত্বে টাকার চাহিদা বলিলে বোঝা যায় ইহার সহিত বিনিময়যোগ্য

সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর স্রোতধারা, বিনিময়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যই টাকার জন্য চাহিদার পরিমাণ। কেম্ব্রিজের ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সকল দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা সৃষ্টি হয় না, সুতরাং টাকার জন্য চাহিদা বলিলে সকল দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যকে ধরা যায় না। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, কিছু পরিমাণ টাকা জিনিসপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য রাখিতে চান বা পাইতে চান। অর্থাৎ মোট সামগ্রীর বা আসল আয়ের (real income) কিছু অংশ ক্রয়ের জন্য বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে টাকার চাহিদা করে: টাকার জন্য সকল ব্যক্তির এইরূপ চাহিদা যোগ করিলে সমাজে টাকার মোট চাহিদা পাওয়া যায়।

কেম্ব্রিজীয় মত

আধুনিক কালের লেখকেরা, প্রধানত কেইনস্, টাকার জন্য চাহিদা বলিলে অনুরূপ বোঝেন। তাঁহাদের মতে টাকার চাহিদা হইল নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছা। লেনদেন করা, সাবধান থাকা এবং ফাট্কা নিয়োগ —এই তিনটি অভিপ্রায়ে সমাজের সকল ব্যক্তি মিলিয়া কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চান বা ব্যাঙ্কে জমা রাখেন তাহাই সমাজে মোট টাকার চাহিদা। লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার অংশের নাম L_1 এবং ফাট্কানিয়োগের অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার নাম L_2। টাকার মোট চাহিদা L ইহাদের যোগফল। L_1 নির্ভর করে আয়ের স্তরের উপর এবং L_2 বা ফাট্কা নিয়োগের অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদা নির্ভর করে প্রধানত সুদের হারের উপর। সুদের হার বাড়িলে টাকা হাতে রাখার ইচ্ছা বা টাকার চাহিদা হ্রাস পায়, অপরপক্ষে সুদের হার কমিলে টাকা হাতে রাখার ইচ্ছা বা টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

কেইনসীয় মত

টাকার মূল্যের পরিমাণতত্ত্ব (Quantity theory of the value of Money)

পরিমাণতত্ত্বের অতি সরল আলোচনা ষোড়শ শতাব্দীর বিভিন্ন লেখা হইতেই পাওয়া যায়। সরল ভাবে বলা হইত যে, টাকার পরিমাণে পরিবর্তনের সহিত একই অনুপাতে দামস্তর পরিবর্তিত হয়। দেশে টাকার পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে দামস্তরও দ্বিগুণ হইবে, টাকার পরিমাণ অর্ধেক হইলে দামস্তরও অর্ধেক হইবে। ইহাদের মধ্যে এই সম্পর্ককে আমরা $M = KP$-রূপে সংক্ষেপে লিখিতে পারি। একই হারে বা সমান অনুপাতে পরিবর্তনের প্রতীক হইল K. যে হারে M পরিবর্তিত হয়, P-ও সেই অনুপাতে পরিবর্তিত হইবে—ইহাই টাকার পরিমাণতত্ত্ব।

স্থূল ও প্রাচীন ধারণা

পরিমাণতত্ত্বকে এইরূপ সরলভাবে ব্যাখ্যা করার সময়ে পণ্ডিতেরা দুইটি বিষয় নিজেদের অজান্তে সমান বা অপরিবর্তিত থাকিবে বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। প্রথমত, তাঁহারা মনে করিতেন যে, দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িলে সকল টাকাই যেন জিনিসপত্র কেনাতে খরচ হইবে। অর্থাৎ লোকে টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে পারে বা পূর্বেকার জমান টাকা বাজারে ছাড়িয়া দিতে পারে সেই কথা তাঁহারা চিন্তা করেন নাই। ধনবিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা চলে যে, তাঁহারা টাকার প্রচলনবেগ (velocity of circulation) সমান ধরিয়া লইয়াছিলেন। *

দুইটি অবাস্তব স্বীকার্য বিষয় ১। প্রচলনবেগ সমান থাকে

দ্বিতীয়ত, তাঁহারা মনে করিতেন যে দেশে জিনিসপত্রের পরিমাণ সর্বদা সমান থাকে। অর্থাৎ দেশে সকল উপাদানের পূর্ণনিয়োগ আছে, এই অবস্থা তাঁহারা ধরিয়া লইতেন। যদি টাকার পরিমাণে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের পরিমাণও বৃদ্ধি পায় ; অথবা টাকার পরিমাণ কমার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের পরিমাণও কমিয়া যায় তবে দামস্তরে কোনরূপ পরিবর্তন হইতে পারে না।

২। জিনিসপত্রের পরিমাণ সমান থাকে

টাকার পরিমাণ তত্ত্বের এই সকল অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া অধ্যাপক ফিসার ইহাকে উন্নত করেন। তিনি অবহেলিত এই দুইটি বিষয়কে অর্থাৎ, টাকার প্রচলনবেগ ও দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণকে – আলোচনার মধ্যে লইয়া আসিয়া পরিমাণতত্ত্বের উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁহার এই তত্ত্বকে তিনি একটি সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করিয়াছেন। সমীকরণটি হইল :

এই দুইটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফিসার কর্তৃক উৎকর্ষ সাধন

$$PT = MV + M'V' \text{ ; অথবা } P = \frac{MV + M'V'}{T}.$$

* এইরূপ মনে করার কারণ ছিল। তখনকার পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, লোকে টাকা চায় কেবলমাত্র লেনদেন ও সাবধানতার উদ্দেশ্যে। টাকা খাটাইয়া সুদ পাইবার জন্য খুশিমত হাতে টাকা জমাইয়া রাখা বা ছাড়িয়া দেওয়া—অর্থাৎ এইরূপ ফাটকাদারিতে নিয়োগের অভিপ্রায়ে লোকে হাতে টাকা রাখে—ইহা তাঁহারা চিন্তা করেন নাই। টাকা যে কেবল বিনিময়ের মাধ্যম তাহা নহে, ইহা মূল্যের সঞ্চয়, সুতরাং ইহাকে হাতে জমাইয়া রাখা সহজেই সম্ভবপর। যেমন, দেশে টাকার পরিমাণ বাড়ে নাই, কিন্তু লোকের নগদ-প্রবণতা বা টাকা হাতে রাখার ইচ্ছা বাড়িয়া গেল, এই অবস্থায় টাকার প্রচলন-বেগ কম হইবে। অর্থাৎ টাকার পরিমাণ বাড়িলেই ইহা যে দেশের আয়স্রোতে প্রবেশ করিবে এইরূপ কোন কথা নাই। কারণ, পূর্বের তুলনায় বেশি টাকা লোকে হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে। টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি সত্ত্বেও দামস্তর বাড়িল না, ইহা নিশ্চয় সম্ভবপর।

P হইল দামস্তর, T হইল টাকার সহিত বিনিময় হইতেছে এইরূপ সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ, M হইল নগদ টাকার পরিমাণ, এবং V হইল নগদ টাকার প্রচলনবেগ, M′ হইল ব্যাঙ্ক কর্তৃক সৃষ্ট ঋণগত টাকার পরিমাণ এবং V′ হইল এই ঋণগত টাকার প্রচলনবেগ। ফিসারের মতে, উপরের এই সমীকরণটির মধ্যে স্বল্পকালে T, V, V′ এই বিষয়গুলি এবং M ও M′-এর অনুপাত পরিবর্তিত হয় না। T নির্ভর করে জনসংখ্যা, ভোগের কাঠামো, উৎপাদন পদ্ধতি, সমাজে টাকা ছাড়া পণ্য বিনিময়ের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর। স্বল্পকালে ইহারা অপরিবর্তিত থাকিবে মনে করা চলে। V এবং V′ নির্ভর করে, জনসাধারণের রীতিনীতি অভ্যাস প্রভৃতির উপর। M ও M′-এর অনুপাত নির্ভর করে লোকের ব্যাঙ্কিং-অভ্যাস এবং প্রচলিত রীতিনীতির উপর। সুতরাং দামস্তর অর্থাৎ P নির্ভর করে একমাত্র M এর উপর —নগদ টাকার পরিমাণ বদলাইলে দামস্তরেও সরাসরি ও সমহারে পরিবর্তন আসিবে।

ফিসারের তত্ত্বকে সমীকরণরূপে ব্যাখ্যা করা চলে

ফিসারের এই তত্ত্বকে আমরা অভেদরূপেও (Identity) প্রকাশ করিতে পারি।* সমাজের সকল জিনিসপত্র কিনিতে যে পরিমাণ টাকা দরকার হইল ঠিক সেই পরিমাণ টাকারই জিনিসপত্র বিক্রয় হইয়াছে —ইহার কমও নয় বা বেশিও নয়। সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে মোট ক্রয়মূল্য = মোট বিক্রয় মূল্য। টাকার পরিমাণকে (M) উহার প্রচলন বেগ (V) দিয়া গুণ করিলে আমরা মোট ক্রয়মূল্য জানিতে পারি, ইহাই দেশের মোট ব্যয় MV)। আবার, জিনিসপত্রের পরিমাণকে (T) উহাদের গড় দাম (P) দিয়া গুণ করিলে আমরা মোট বিক্রয়-মূল্য জানিতে পারি, ইহা নিশ্চয় মোট ব্যয়ের সমান হইবে।

আবার অভেদরূপেও প্রকাশ করা চলে

এই নগদ লেনদেনের সমীকরণ (Cash transactions equation) সম্পর্কে বহুবিধ সমালোচনা করা হইয়াছে। সর্বপ্রথমেই বলা চলে, এই তত্ত্বের

* "Two alternative methods of expressing it have to be considered. On the one hand the theory can be presented as an identity : that is, as a statement of a situation which is necessarily one, because of the way in which the terms used in it are defined. An identity is a statement of the same facts in two different ways ; its usefulness depends on whether alternative presentations give additional insight into the situation. The other method of presenting the Quantity Theory is in the form of an equation. This form expresses causal relationships ; its usefulness depends on the ability to something helpful about the causal relationships represented. A. C. L. Day, *Outline of Monetary Economics*, Pp. 247—248.

একটি প্রধান ত্রুটি হইল যে, লোকে ফাট্‌কাদারির মনোভাব হইতে টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে এই তত্ত্ব তাহা বিচার করে না। টাকার পরিমাণ বাড়িলে তাহা দামস্তর বাড়াইতে পারে যদি লোকে উহা ব্যয় করে। কিন্তু যদি বর্ধিত টাকা তাহারা হাতে জমাইয়া রাখে, তবে দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর কিরূপে বাড়িবে? শুধু তাহাই নহে। দেশে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলেও যদি নগদ-পছন্দে পরিবর্তন আসে, তবে আয়স্তর পরিবর্তিত হইয়া দামস্তরে পরিবর্তন আসিতে পারে। দামস্তরে পরিবর্তন আসে আয়স্তর পরিবর্তিত হইলে; অতএব টাকার পরিমাণ বাড়িলে আয়স্তর বাড়িবে অথবা উহা কমিলে আয়স্তর কমিবে, ইহা মানিয়া লওয়া চলে না।

কার্যকরী চাহিদা ও টাকার পরিমাণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে না

সমীকরণটির কাঠামো বিশ্লেষণ করিলেও ত্রুটি ধরা পড়ে। M-এ পরিবর্তন হইলে P-তে প্রত্যক্ষ ও সমানুপাতিক (direct and proportionate) আসিতে পারে তখনই, যদি আমরা ধরিয়া লই যে, M-এ পরিবর্তনের ফলে V, T, M' ও V' কিছুতেই পরিবর্তন হইবে না। কিন্তু বাস্তবে ইহা ঘটে না।

অন্যান্য বিষয়গুলি "স্বাধীন" নয়

তাহা ছাড়া, এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা টাকার পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের সুস্পষ্ট পরিচয় জানিতে পারি না। টাকার পরিমাণ বদলাইলে কি ভাবে, কোন্ পথে, কোন্ কোন্ শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে, কাহাদের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে দামস্তরে পরিবর্তন আসিল তাহা এই সমীকরণে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ইহা নিছক অভেদ (identity) মাত্র। আর্থিক তত্ত্বের প্রধান কাজ অর্থের ও দ্রব্যের স্রোতকে যুক্ত করিয়া অভেদ বা নিশ্চল সমীকরণ দাঁড় করানো—ইহা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। সমস্যাটিকে গতিশীল পদ্ধতিতে আলোচনা করা দরকার।*

অভেদ মাত্র, সমীকরণ নয়

* 'The fundamental problem of monetary theory is not merely to establish identities or statistical relations......but to treat the problem dynamically, analysing the different elements involved in such a manner as to exhibit the causal processes by which the price level is determined and the method of transition from one position of equilibrium to another." J. M. Keynes, *Treatise on money*. Vol. I.

বিভিন্ন দেশের আর্থিক ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বাণিজ্যচক্রের এক প্রান্তে সমৃদ্ধির শীর্ষবিন্দু হইতে হঠাৎ যখন অবনতি সুরু হয়, তখন দামস্তর দ্রুত হ্রাস পায় কিন্তু টাকার পরিমাণ কম থাকে তাহা নয়। সংকটকালে টাকার পরিমাণ বাড়িলেও দামস্তর বাড়িতে চাহে না। দামস্তরে স্বল্পকালীন উত্থান-পতন, বিশেষত বাণিজ্য-চক্রকালীন উঠানামা তাই টাকার পরিমাণ তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না।

চক্রকালীন উঠানামা ব্যাখ্যা করিতে পারে না

মনে রাখা দরকার, এই তত্ত্ব ধরিয়া লয় যে, স্বল্পকালে T অপরিবর্তিত থাকে, অর্থাৎ সমাজে পূর্ণ কর্মনিয়োগ বর্তমান আছে, অনিযুক্ত উপকরণ সমাজে নাই। পূর্ণ কর্মনিয়োগ বজায় থাকিলেই সেই বিশেষ স্তরে ইহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অপূর্ণ নিয়োগের স্তরে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গেলে সুদের হার কমিবে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে, দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, দামস্তর প্রথমেই প্রভাবিত না হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং, এই তত্ত্ব সকল স্তরেই কার্যকরী নহে।

পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তর ধরিয়া লইতেছে

টাকার মূল্যে পরিবর্তন বলিলে বুঝা যায় টাকার ক্রয়ক্ষমতায় পরিবর্তন। শিল্প-সংক্রান্ত, ব্যবসায়-সংক্রান্ত, শেয়ার, ডিবেঞ্চার, অর্ধনির্মিত ও অপূর্ণনির্মিত সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী টাকার সহিত বিনিময় হইতেছে বলিয়াই উহাদের হিসাবের মধ্যে আনিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে অনেক দ্রব্য আছে যাহাদের টাকার ক্রয়শক্তি বা টাকার মূল্য-নিরূপণে হিসাব না করাই বাঞ্ছনীয়; যাবতীয় সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী মিলিয়া এইরূপ নগদ লেনদেনের স্তরমান (Cash Transactions Standard) আর্থিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ উপযোগী নয়, ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান আলোচনার উপযোগী বাস্তব ক্রয়শক্তি ইহা দ্বারা জানা যায় না।* শুধু তাহাই নহে। জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময়ে সর্বশেষ স্তরের সম্পূর্ণোৎপন্ন (final product) দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যকেই ধরা হয়। কিন্তু ফিসারীয় T এবং (ফলে) PT-র মধ্যে মূলধনী শিল্পদ্রব্য ও অর্ধনির্মিত দ্রব্যসামগ্রীকেও হিসাবের মধ্যে ধরায় ইহা সঠিকভাবে জাতীয় আয়কে পরিমাপ করে

টাকার ক্রয়শক্তি হিসাব করার সময়ে অবাঞ্ছিত বহু দ্রব্য বাদ দেওয়া উচিত

* কেইন্‌সের মতে "the power of money to buy goods and services on the purchase of which for purposes of consumption a given community of individuals expend their money income"—ইহাই টাকার ক্রয়শক্তি। (*Treatise*, vol I P.54)

না, তাই কর্মনিয়োগের স্তর বা আয়স্তরের নির্ধারণও এইরূপ 'জগাখিচুরি দামস্তরের' (Hotch-potch price-level) দ্বারা সম্ভব হয় না।

উপরন্তু, এইরূপ সাধারণ দামস্তরের বিশ্লেষণের মধ্য হইতে আপেক্ষিক দাম বা কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের দাম নিরূপণ সম্পর্কে আমরা কিছু জানিতে পারি না। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা সাধারণ দামস্তরের এই বিশ্লেষণকে ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের মূল ধারা হইতে পৃথক করিয়া আলোচনা করিতেন। কোন বিশেষ দ্রব্যের দাম-নিরূপণ তত্ত্বে তাঁহারা যোগান ও চাহিদার ধারণা প্রয়োগ করিতেন, কিন্তু সাধারণ দামস্তর আলোচনার সময়ে তাঁহারা টাকার পরিমাণ, প্রচলনবেগ প্রভৃতি অস্পষ্ট ধারণাসমূহ ব্যবহার করিতেন। কেইন্‌স্ বলিয়াছেন যে, ইহার ফলে ধনবিজ্ঞানীরা "একবার চাঁদের এপিঠে আর একবার ওপিঠে পৌঁছিতেন কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না কোন্ পথ এই উভয়ের সংযোগ সেতু, অনেকটা আমাদের স্বপ্ন-মন ও সজাগ-মনের মধ্যে সম্পর্কের মত"।*

এই আলোচনা পৃথক দ্রব্যের দাম নিরূপণ হইতে অবাঞ্ছিত ভাবে দূরে

নগদ লেনদেনের স্তরমান বা টাকার পরিমাণতত্ত্ব সমগ্র অর্থতত্ত্বের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে আলোচিত ও সমালোচিত হইয়াছে। দামস্তরে পরিবর্তন নির্ভর করে কার্যকরী চাহিদায় পরিবর্তনের উপর, টাকার পরিমাণে পরিবর্তনের উপর ইহা নির্ভরশীল নয়। দেশের মোট ব্যয়ের পরিমাণে যে সকল বিষয় পরিবর্তন আনে, উহারাই কার্যকরী চাহিদায় পরিবর্তন এবং দামস্তরে উঠানামা ভালভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে। এই সকল কথা মানিয়া লইলেও এই তত্ত্বের গুরুত্ব আমরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারি না। ইহার মূল কথা যে, টাকার মোট যোগান ও মোট চাহিদার উপর টাকার মূল্য (বা দামস্তর) নির্ভর করে—ইহার মধ্যে সত্যতা একেবারে নাই এমন কথা বলা চলে না। অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দামস্তরে বৃদ্ধির যুগে সাধারণত টাকার পরিমাণও বাড়িয়াছে,

পরিমাণ তত্ত্বের মধ্যে কিছুই কি সত্যতা নাই

* "So long as economists are concerned with what is called the Theory of Value they have been accustomed to teach that prices are governed by conditions of supply and demand......But when they pass in......to the theory of Money and Prices,......we are lost in hage where nothing is clear and everything is possible. We have all of us become used to finding ourselves sometimes on the one side of the moon and sometimes on the other, without knowing what route or journey connects them, related apparently, after the fashion of our walking and our dreaming lives." Keynes, *General Theory*. P. 292

যেমন, 1917-18 এবং 1939-45 সালে দেখা গিয়াছে। অবশ্য ইহা ঠিকই যে, এই পরিমাণতত্ত্ব 'কার্যকারণ শৃংখলের অনেক গ্রন্থিকে ঢাকিয়া রাখে' (hides many links in the chain of causation') ; কিন্তু মোটামুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর (অর্থাৎ টাকার পরিমাণে পরিবর্তন) জোর দেয় বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই স্থূলভাবে হইলেও ইহাকে কাজে লাগান যায়। রবার্টসন ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "a serviceable platitude." তাই, উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, "আর্থিক বা আসল আয়ে বিপুল কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়, যদি-না টাকার পরিমাণে মোটামুটি সমপরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে ; টাকার যোগান যদি কম থাকে তবে যে কোন সময়ে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা চলে। ইহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বটে, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি-তত্ত্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র" ।*

নগদ লেনদেন সমীকরণের বিষয়গুলি কিসের উপর নির্ভর করে
(Determinants of Cash Transaction Variables)

দামস্তর নির্ধারণের জন্য অধ্যাপক ফিসার PT=MV এই সমীকরণকে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে V ও T স্বল্পকালে অপরিবর্তিত থাকে, তাই M-এ পরিবর্তন আসিলে, তবেই P-তে পরিবর্তন আসিতে পারে। সমীকরণের এই বিষয়গুলি একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমরা উহাদের প্রকৃতি ভালভাবে বুঝিতে পারিব। অর্থনৈতিক, প্রতিষ্ঠানগত, যন্ত্রকৌশলগত, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক – সকল প্রকার শক্তিই এই বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করে।

এই সমীকরণের মধ্যে M বলিলে বুঝা যায় দেশে টাকার মোট যোগান ; নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্কের আমানতের যোগফল। ব্যাঙ্কের আমানতের সকল অংশ ইহার মধ্যে নাই, চেক কাটিয়া যে আমানত তুলিয়া আনা চলে, সেই চলতি আমানতকেই (current or demand deposits) কেবল মাত্র হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে। কারণ স্থির আমানতের সাহায্যে জিনিসপত্র কেনা যায় না,

* 'The fact is that monetary economics is too complicated to be dealt with by theories as simple as the Quantity Theory. The most important conclusion we can derive from it is that big rises in the level of real or of money income are not possible unless there are more or less equal rises in the quantity of money ; an inflation can always be brought to an end if the supply of money is limited. This is an important fact, but it is only a small part of the theory of inflation"—A. C. L. Day, *Outline of monetary Economics*, P. 252.

উহার উপর চেক কাটিয়া লেনদেনের উদ্দেশ্যে ঐরূপ আমানতকে ব্যবহার করা চলে না। M-এর পরিমাণ নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর : (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ নগদ টাকা বাজারে ছাড়িয়া দিয়াছে ; (খ) লোকের হাতে নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্কে রক্ষিত চাহিদা-আমানতের অনুপাত ; (গ) চাহিদা আমানত ও ব্যাঙ্কের জমার (বা রিজার্ভের) অনুপাত। প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণ নগদ টাকা (নোট ও খুচরা প্রভৃতি) প্রচলন করে, দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে এই টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়, আবার অবস্থা বুঝিয়া কমাইয়া দেয়। দ্বিতীয়ত, লোকের হাতে নগদ 1 টাকা নিছক একটি টাকা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সে যদি ওই টাকাটি কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখে, তবে উহার ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণ ঋণগত অর্থ সৃষ্টি করিতে পারে। তাই দেশের মোট নগদ টাকার কত অংশ চাহিদা-আমানতের হিসাবে জমা আছে তাহা গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়ত, চাহিদা-আমানতের যত বেশি অংশ ব্যাঙ্ক নিজস্ব জমা বা রিজার্ভ হিসাবে রাখিবে, ঋণগত অর্থসৃষ্টি তত কম হইবে : আবার এই রিজার্ভের অনুপাত যত কম হইবে তত বেশি ঋণ-সৃষ্টি সম্ভব হইবে। তাই দেশের ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত আমানত ও জমার মধ্যে যে অনুপাত বজায় রাখিতে চান তাহা গুরুত্বপূর্ণ।

কিসের উপর M নির্ভর করে

V বলিলে বুঝা যায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি টাকা গড়ে কতবার হাত-বদল হইতেছে ; জিনিসপত্র কেনার কাজে গড়ে কতবার উহাকে ব্যবহার করা হয়। দেশের মোট ব্যয়কে টাকার পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে আমরা প্রতিটি টাকার গড় প্রচলনবেগ জানিতে পারি। ফিসারের ভাষায় হইল V হইল PT/M. টাকার এই প্রচলনবেগ বা V অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। বাস্তব বিষয়গুলির (objective factors) মধ্যে প্রধান হইল দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও ব্যাঙ্কিং-অভ্যাসের প্রসার, কারণ ইহার উপর ঋণদান, ঋণগ্রহণ, ব্যয় করা—প্রভৃতির দ্রুততা নির্ভর করে। যদি সহজ কিস্তিতে ক্রয় বিক্রয়ের সুব্যবস্থা থাকে তবে টাকার প্রচলনবেগ বেশি হয়। দেশে মাহিনা ও মজুরি দেওয়ার রীতিনীতি কিরূপ, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বার্ষিক,—তাহার দ্বারাও V প্রভাবিত হইবে। মাহিনা ও মজুরির মধ্যে সময়ের ব্যবধান যত কম, V তত বেশি। যন্ত্রকৌশলের উন্নতি, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কর ও ব্যয় সম্পর্কে সরকারী নীতি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণনীতি, যৌথমূলধনী কোম্পানীগুলির ডিভিডেণ্ড-বণ্টনের নীতি, শেয়ারবাজারের কার্যকলাপ

কিসের উপর নির্ভর করে

তরল সম্পত্তির পরিমাণ ও ধরন– এইরূপ সকল বিষয় ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর প্রভাবের মাধ্যমে টাকার প্রচলনবেগ বা V-এর উপর প্রভাব বিস্তার করে। মনোগত বিষয়গুলির (subjective factors) মধ্যে প্রধান হইল ভোগ ও সঞ্চয় সম্পর্কে লোকের অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গী। সাধারণত লোকে সঞ্চয় করে ভোগ না করিয়া, তাই ভোগব্যয় কমিলে টাকার প্রচলনবেগও হ্রাস পাইবে। লোকে তাহাদের সঞ্চয় ভালভাবে বিনিয়োগ করিতে পারিতেছে কি না, বিনিয়োগের সুযোগ আছে কি না, সুদের হার কিরূপ, এই সকল বিষয় দ্বারা V প্রভাবিত হয়। ভবিষ্যতে দাম ও আয় বাড়িবে এইরূপ ধারণা থাকিলে V বেশি হইবে—উহারা ভবিষ্যতে কমিবে এইরূপ মনে হইলে V কম হইবে।

T বলিলে বোঝা যায় সকল দ্রব্যসামগ্রী, কাজকর্ম, শেয়ারপত্র প্রভৃতি—যে কোন প্রকার ইউনিট যাহা টাকার বদলে বিনিময় হয়। যেমন, দেশে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হইল 200 ইউনিট। যদি উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে সর্বশেষ স্তরে ভোগ পর্যন্ত উহা পাঁচবার বেচাকেনা হয় তবে T হইল 1000। বাণিজ্যের পরিমাণ বা T কয়েকটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, (ক) উৎপাদক উপাদানগুলির পরিমাণ ও উৎকর্ষ, (খ) কর্মসংস্থানের স্তর, এবং (গ) উৎপাদনপদ্ধতির উৎকর্ষ। দেশে উপকরণ ও উপাদানের পরিমাণ যত বেশি থাকিবে, T তত বেশি হইবার সম্ভাবনা। উপকরণের পরিমাণ দেখিলেই চলিবে না, দেশে বিভিন্ন উপকরণের অনুপাতও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শ্রম ও ভূমির তুলনায় যদি মূলধন কম থাকে তবে শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা কম হয়, উৎপাদনের পরিমাণও কম। উপাদানগুলির উৎকর্ষের দিক হইতে বিচার করিলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যন্ত্রবিদ্যা বা টেকনিকাল জ্ঞান। দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে, তাই জাতির উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ভর করে উপকরণের পরিমাণ ও উৎকর্ষের উপর। স্বল্পকালে অবশ্য প্রকৃতিদত্ত উপকরণ ও যন্ত্রবিদ্যার স্তর স্থির ধরিয়া লইলে মোট উৎপাদন নির্ভর করে কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর। পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে উপাদানের অভাবে দ্রুত গতিতে T বাড়ান যায় না, অপূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে চেষ্টা করিলে T দ্রুত বাড়ান সম্ভবপর। পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে আর্থিক আয় বাড়িতে থাকিলেও T বাড়ান যায় না। তাই পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তর বলিলে বুঝা যায় যেখানে T সমান আছে ; অথবা T স্থির থাকে বলিলেই বুঝা যায় যে পূর্ণ কর্মনিয়োগের অবস্থা ধরিয়া লওয়া হইতেছে।

T কাহাকে বলে ও কিসের উপর নির্ভর করে

দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনের উপরেও T নির্ভর করে। শ্রমবিভাগ ও

বিশেষায়ণ উৎপাদনের মোট পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে। উৎপাদন-সংগঠনের মধ্যে যত অধিকসংখ্যক স্তরে উৎপাদন-ধারা বিভক্ত থাকিবে (যেমন, পাইকারী ব্যবসাদার, দালাল, খুচরা ব্যবসায়ী প্রভৃতি,) তত বেশি দ্রব্য-সামগ্রী একহাত হইতে অন্য হাতে চলাচল করিবে, T তত বেশি হইবে। যদি দেশে লম্বমুখী সংযুক্তি (vertical integration) বেশি থাকে, তবে T কম, কারণ একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎপাদন-ধারার অনেকগুলি স্তর জড়িত থাকে। দেশে একচেটিয়া ব্যবসায় না থাকিলে এবং স্বাধীন ও পরস্পর প্রতিযোগী ফার্ম ও শিল্পের সংখ্যা বেশি থাকিলে T বেশি হইবে।

P কাহাকে বলে কিসের উপর নির্ভর করে

P এমন একটি বিষয় যাহা M, V ও T এই তিনটি শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র। বাস্তব জগতে, M, V এবং T একই দিকে বা একই অনুপাতে পরিবর্তিত হয় না। V-তে পরিবর্তন না হইলেও M-এ পরিবর্তন আসিতে পারে, আবার যখন MV বাড়িতেছে তখন T সমান থাকিতে পারে। এই সকল বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন P-কে বিভিন্ন-ভাবে প্রভাবিত করে। M বাড়িলে যদি ঠিক সেই সময়ে V হ্রাস পায় তবে P-র উপর ইহার কোন প্রভাব পড়িতে পারে না। MV বৃদ্ধি পাইবার সময়ে যদি T-ও বাড়ে, তবে সাধারণভাবে P বৃদ্ধি পাইবে না। সুতরাং, যদি V এবং T স্থির থাকে, তবেই M-এর পরিবর্তন P-তে পরিবর্তন আনিতে পারে। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে T-ও বৃদ্ধি পাইবে, তাই এই সময়ে MV না বাড়াইলে P কমিয়া যাইবে। আর্থিক নীতি প্রয়োগের ব্যাপারে এই সকল বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক তাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। মনে রাখা দরকার, P হইল টাকার সাধারণ ক্রয়শক্তি, অর্থাৎ এই P হইল দেশের সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড়। ভোগদ্রব্য, উৎপাদক দ্রব্য, অর্থনৈতিক কাজকর্ম, সোনা, শেয়ার সকল প্রকার দ্রব্য, যাহা লইয়া T গঠিত তাহাদের সকলের পক্ষে প্রযোজ্য টাকার এক সাধারণ ক্রয়-ক্ষমতা পরিমাপের সূচক হইল এই P.

কেম্ব্রিজ সমাকরণ (Cambridge Equation)

কেম্ব্রিজের ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেষত মার্শাল, অর্থমূল্যের পরিমাণ-তত্ত্বের ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। ফিসার যেমন টাকার যোগান-এর উপর

জোর দিয়া তাঁহার তত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন, কেম্ব্রিজের ধনবিজ্ঞানীরা সেইরূপ টাকার চাহিদার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তাঁহাদের মতে, লোকে নির্দিষ্ট সময়ের বিন্দুতে কেন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধরিয়া রাখিতে চায়, তাহাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফিসারীয় সমীকরণে টাকার চাহিদা বলিলে বোঝা যায়, ইহার সহিত বিনিময়-যোগ্য সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর স্রোতধারা, বিনিময়-যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণের দ্বারাই টাকার চাহিদা স্থির হয়। কেম্ব্রিজের ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সকল দ্রব্যসামগ্রীর জন্যই চাহিদা সৃষ্টি হয় না, সুতরাং সেইরূপে টাকার চাহিদা হিসাব করার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, কিছু পরিমাণ টাকা জিনিসপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ধরিয়া রাখিতে চান বা হাতে জমাইয়া রাখিতে চান। অর্থাৎ মোট দ্রব্যসামগ্রীর বা আসল আয়ের (Real Income) কিছু অংশ ক্রয়ের জন্য বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে টাকার চাহিদা করে : টাকার জন্য সকল ব্যক্তির এইরূপ চাহিদা যোগ করিলে সমাজে টাকার মোট চাহিদা পাওয়া যায়।

টাকার চাহিদার ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা

মনে করা যাক, দেশে 100 খানা কাপড় সমাজের মোট আসল আয় (Real Income)। ইহার কিছু অংশ যেমন, $\frac{4}{5}$ অংশ, অর্থাৎ ৪0 খানা কাপড় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিনিময় হইবে। সমাজে যত টাকা আছে, তাহা দিয়া ব্যক্তিরা এই সময়ের মধ্যে সকলে মিলিয়া 80 খানা কাপড় ক্রয় করিতে চায়, সুতরাং সকল টাকা এই 80 খানা কাপড় ক্রয়েই ব্যয়িত হইবে। যদি দেশে টাকার যোগান 400 হয়, তবে প্রত্যেকটি কাপড় ক্রয় করিতে গড়ে 5 টাকা ব্যয় হইল, কাপড়ের গড় দামস্তর হইল 5। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দামস্তর বৃদ্ধি হইবে, কারণ সেই বর্ধিত অর্থও 80 টি কাপড় ক্রয়ের উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হইল। টাকার পরিমাণ কমিলে দামস্তরও কমিবে।

কেম্ব্রিজ তত্ত্বকে আমরা একটি সমীকরণ বা ফর্মুলার আকারেও প্রকাশ করিতে পারি।

R হইল সমাজের আসল আয় (100) ; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসল আয়ের যে আনুপাতিক অংশ লোকে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং যাহার জন্য তাঁহারা টাকার চাহিদা করে তাহা হইল K ($\frac{4}{5}$) ; টাকার পরিমাণ হইল M (400)। তাহা হইলে M পরিমাণ টাকা দিয়া তাহারা KR পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়

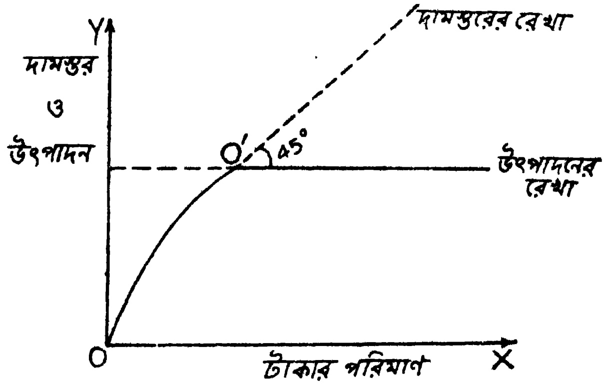
করিতে চাহে। টাকার মূল্য হইল ইহার বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, অর্থাৎ KR/M টাকার মূল্যের বিপরীত হইল দামস্তর, সুতরাং উপরোক্ত সমীকরণকে উল্টাইয়া স্থাপন করিলে দামস্তর বা P পাওয়া যায়, অর্থাৎ P = M/KR. এই তত্ত্ব ও সমীকরণের আরও অনেক ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছিল ; কেইন্‌স, পিগু সকলেই কোন না কোন বিষয়ের উপর জের দিয়া নিজ নিজ সমীকরণ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিসারীয় পরিমাণতত্ত্ব এবং কেম্ব্রিজ পরিমাণতত্ত্বে মৌলিক কোন প্রভেদ নাই ; ফিসারীয় পরিমাণতত্ত্বের সমালোচনাসমূহ মোটামুটি কেম্ব্রিজ পরিমাণতত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ফিসারীয় তত্ত্বে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, টাকার সহিত বিনিময় করা হইল এইরূপ সকল দ্রব্যসামগ্রীর গড় দামস্তর বা অর্থের মূল্য বাহির করার চেষ্টা করা হইয়াছে ; রবার্টসনের ভাষায় ইহা হইল "উড়ন্ত টাকার মূল্য" (Value of "*Money on the wing*")। কেম্ব্রিজ তত্ত্বে, নির্দিষ্ট সময়ে কিছু পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতের লেন-দেনের জন্য হাতে জমা-রাখা টাকার মূল্য বাহির করার চেষ্টা হইয়াছে, রবার্টসনের ভাষায় ইহা হইল 'উপবিষ্ট' অর্থের মূল্য (Value of '*Money Sitting*')।

টাকার পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Quantity of Money and the Price level)

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, ক্লাসিকাল ও নয়াক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে দেশে টাকার পরিমাণের উপর দামস্তর নির্ভর করে। এই তত্ত্বকে ফিসার যে সমীকরণের আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইল PT = MV. তাঁহার মতে, স্বল্পকালে V ও T পরিবর্তিত হয় না, সুতরাং M-এ পরিবর্তন আসিলে তবেই একমাত্র P-তে পরিবর্তন আসিতে পারে। এই কারণে আমরা দেখিতে পাই যে, V ও T অপরিবর্তিত থাকিবে, এইরূপ অনুমানের উপরই ফিসারীয় তত্ত্বের সত্যতা নির্ভর করে, অর্থাৎ এই তত্ত্বের মতে দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িলে সেই টাকা যাহাদের হাতে পৌঁছায় সেই অধিবাসীদের ক্রয়শক্তি সরাসরি ও সমপরিমাণে বৃদ্ধি পায়। লোকের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু জিনিসপত্রের পরিমাণ বাড়িল না, কারণ দেশে পূর্ণনিয়োগ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। তাই তৎক্ষণাৎ দামস্তর বাড়িবে। কিন্তু যদি পূর্ণনিয়োগ না থাকে তবে জিনিষপত্রের চাহিদা বাড়িলে উহাদের উৎপাদন বাড়িবে, দেশের উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ স্তর বাড়িয়া যাইবে। ক্রমে সমাজে পূর্ণনিয়োগ দেখা দিবে।

ফিসারীয় তত্ত্ব

তাহার পরেও টাকার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। আমরা ইহাকে নিচের চিত্রে দেখাইতে পারি :



OX অক্ষে টাকার পরিমাণ এবং OY অক্ষে উৎপাদন ও দামস্তর পরিমাপ করা হইতেছে। O হইতে X-এর দিকে যত অগ্রসর হইতেছে উৎপাদন তত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সময় দেশে পূর্ণনিয়োগ নাই, অনিযুক্ত উপাদানগুলির নিয়োগ বাড়িতেছে। দামস্তর বাড়িতেছে না। উৎপাদন বৃদ্ধির শীর্ষতম বিন্দু হইল O′। এই বিন্দুতে পূর্ণনিয়োগ ঘটিয়াছে। ইহার পরে উৎপাদনের রেখা ঐ স্তরেই আছে। তখনও যদি টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তবে দামস্তরের রেখা উপরে উঠিতে থাকিবে। O′ বিন্দুতে এই দুই রেখার মিলনস্থলের কোণটি 45°, অর্থাৎ উহার পরে টাকার পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়িবে দামস্তরও সেই হারে বৃদ্ধি পাইবে। এইজন্য বলা হয় যে, যদিও অনেক বিষয়ে ইহা দোষদুষ্ট তবুও পূর্ণ-কর্মনিয়োগ স্তরে টাকার পরিমাণতত্ত্ব কার্যকরী হয়।

পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে ইহা কার্যকরী হয়

উপরের আলোচনা হইতে আমাদের নিকট বিষয়টি সরল মনে হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, টাকার পরিমাণ দামস্তরকে প্রত্যক্ষভাবে বা সোজাসুজি প্রভাবিত করে না, অনেক প্রকার বিষয় ও শক্তিকে প্রভাবিত করিয়া পরোক্ষভাবে দামস্তরের উঠানামার উপর নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, কেইনসের মতে, টাকার পরিমাণ বাড়িলে, অন্যান্য সকল কিছু সমান অবস্থায়, উহার

প্রথম প্রভাব হইবে সুদের হারের উপর। লোকের নগদ-পছন্দ সমান আছে ধরিয়া লইলে তাহারা কি পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায় তাহা মোটামুটি স্থির। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়িলে ঋণের বাজারে বেশি টাকা আসিয়া যাইবে, তাই কম সুদে ঋণ পাওয়া সম্ভব হইবে, অর্থাৎ সুদের হার হ্রাস পাইবে। সুদের হার কমিলে দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, অনিয়োজিত উপাদানসমূহ ক্রমে নিযুক্ত হইতে থাকিবে। কেইন্স তাই বলিয়াছেন যে, "যতদিন পর্যন্ত বেকারি থাকে, ততদিন টাকার পরিমাণে পরিবর্তনের অনুপাতে কর্মসংস্থান বাড়ে; এবং যখন পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকে তখন টাকার পরিমাণের একই অনুপাতে দাম পরিবর্তিত হয়।"*

কোন্ কোন্ শক্তির উপর প্রভাবের মাধ্যমে টাকা দামস্তরকে প্রভাবিত করে

টাকার পরিমাণে পরিবর্তন কোন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে কিরূপে প্রবেশ করে তাহা এখন আমরা মোটামুটি বুঝিতে পারিয়াছি। অনেক সময় বিষয়টি সহজ ও সরল করার উদ্দেশ্যে আমরা বলিতে পারি যে, টাকা এমন এক ধরনের মদ যাহা অর্থ নৈতিক দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সতেজ রাখে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, পানাধার ও অধরের মাঝে বহুবার স্খলনের সম্ভাবনা আছে (several slips between the cup and the lip)। টাকার পরিমাণে পরিবর্তন সুদের হার কমাইয়া দিবে, ইহা আশা করা যায় বটে, কিন্তু টাকার পরিমাণ অপেক্ষা লোকের নগদ পছন্দ বেশি বাড়িতে থাকিলে ইহা ঘটিতে পারে না। আবার সুদের হারে হ্রাস দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইবে বলিয়া আশা করিতে পারি, কিন্তু ইহা সম্ভব হইবে না যদি মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা সুদের হারের তুলনায় অধিক হারে কমে। আবার, আমাদের আশা হইল বিনিয়োগের পরিমাণে বৃদ্ধি দেশে কর্মসংস্থান বাড়াইবে, কিন্তু যদি ভোগপ্রবণতা হ্রাস পাইতে থাকে, তবে ইহা সম্ভবপর হয় না। সর্বশেষে, যদি কর্মসংস্থান বাড়ে, তবে দামস্তরে বৃদ্ধির মাত্রা নির্ভর করিবে দেশের উৎপাদন-কাঠামো হইতে যোগান বাড়াইবার ক্ষমতার

সেই পথে কি কি বাধা দেখা দিতে পারে

* **"So long as there is unemployment, *employment* will change in the same proportion as the quantity of money; and when there is full employment *price* will change in the same proportion as the quantity of money." Keynes, *General Theory*, P. 296.**

উপর (physical supply functions) এবং টাকার হিসাবে মজুরী বাড়িবার উপর।*

উপরের এই আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি এবং কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি ঠিক নির্দিষ্ট একই হারে ঘটে, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি না। এবং টাকার পরিমাণ বাড়িলেই কার্যকরী চাহিদা বাড়িল, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিল, সোজা লাইন ধরিয়া সমাজ একেবারে সরাসরি পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরে পৌঁছিয়া গেল—পথ এত সরল নহে। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি ও আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, এই উভয়ের সম্পর্ক অতীব জটিল—অন্তত কোনরূপ পরিমাণগত ভবিষ্যদ্বাণী ইহাদের সম্পর্কে করা চলে না। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির ফল নির্ভর করে : (ক) নগদ-পছন্দের উপর ইহার প্রভাব, (খ) গুণকের আয়তন, এবং (গ) মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার উপর ইহার প্রভাব – এই সকল বিষয়ের উপর। সঠিকভাবে ইহাদের কাহারও সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই পরিমাণগত পরিমাপ করা চলে কি ?

টাকার পরিমাণে বৃদ্ধির ফল কিসের উপর নির্ভর করে

দামস্তরে স্বল্পকালীন পরিবর্তন আনয়নকারী বিষয়সমূহ—(Factors bringing Short Period changes in the Price level)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে টাকার পরিমাণে পরিবর্তন হইলে দামস্তরে পরিবর্তন আসে। টাকার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর বাড়ে, ইহার পরিমাণ কমিলে দামস্তর কমে ; পরস্পরের এই সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও সমানুপাতিক।

* "We are able to catch a glimpse of the way in which changes in the quantities of money work their way into the economic system. If however we are tempted to assert that money is the drink which stimulates the system to activity, we must remind ourselves that there may be several slips between the cup and the lip. For whilst an increase in the quantity of money may be expected *cet par.*, to reduce the rate of interest, this will not happen if the liquidity preferences of the public are increasing more than the quantity of money; and whilst a decline in the rate of interest may be expected *cet. par.*, to increase the volume of investment, this will not happen if the schedule of marginal efficiency of capital is falling more rapidly than the rate of interest; and whilst an increase in the volume of investment may be expected, *cet. par.*, to increase employment, this may not happen if the propensity to consume is falling off. Finally, if employment increase, prices will rise in a degree partly governed by the shapes of the physical supply functions and partly by the liability of the wage-unit to rise in terms of money. And when output has increased and prices have risen, the effect of this on liquidity preference will be to increase the quantity of money necessary to maintain a given rate of interest." Keynes, *General Theory*, P. 173.

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে, দেশের সাধারণ দামস্তর নির্ভর করে সমাজের মোট ব্যয় এবং মোট উৎপাদন-পরিমাণের উপর। মোট ব্যয় নির্ভর করে মোট আয়ের উপর। যদি আয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় তবে ব্যয়ের পরিমাণ নিশ্চয় হ্রাস পাইবে, দামস্তরও কমিয়া যাইবে, যদি উৎপাদনের পরিমাণ সমান থাকে। তাই বলা হয় যে, আয়স্তরে উঠানামা-ই দামস্তরে উঠানামা ঘটায়ঃ টাকার পরিমাণে পরিবর্তন ইহা ঘটায় না। টাকার পরিমাণ কারণ নয়, ইহা কার্যফল, মোট ব্যয়ে পরিবর্তনের ফল। যে টাকা ব্যয় হয় তাহাই সমাজে বিভিন্ন উপাদানের মালিকের আয়, তাই মোট ব্যয়=মোট আয়। দামস্তর হইল মোট জাতীয় আয়÷মোট উৎপন্ন, অর্থাৎ $P=Y/O$. মোট উৎপন্ন অর্থাৎ O সমান অবস্থায়, যদি Y বাড়ে তবে P বাড়িবে, যদি Y কমে তবে P-ও কমিবে।

এই আয়স্রোতে বা ব্যয়স্রোতে পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির আর্থিক আয় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের অংশ যোগ করিয়া সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয় পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি এককভাবে পূর্বাপেক্ষা নিজের আয়ের অধিক অংশ সঞ্চয় করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে সমাজের মোট সঞ্চয় বাড়ে না। কোন ব্যক্তির অধিক সঞ্চয়ের ফলে নিশ্চয়ই কোন না কোন দ্রব্যের বিক্রেতার আয় কমিয়া যাইবে, ফলে তাহার সঞ্চয় কমিবে। সুতরাং, ইহাতে সমাজের মোট সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হইবে না। কোন ব্যক্তির ব্যয় বৃদ্ধি হইলে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিব আয় বৃদ্ধি হয়, কোন ব্যক্তির ব্যয় কমিলে অন্যান্য ব্যক্তির আয় কমিয়া যায়। কিন্তু সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয় নির্ভর করে মোট জাতীয় আয় ও গড় সঞ্চয়প্রবণতার (Propensity to save) উপর। দেশে গড় সঞ্চয়-প্রবণতা বাড়িয়া গেলে, অর্থাৎ আয়ের সহিত সঞ্চয়ের অনুপাত বৃদ্ধি পাইলে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। পূর্বাপেক্ষা মোট আর্থিক আয়ের কম অংশ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হইবে, ভোগ্য দ্রব্যের দামস্তর কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে, সঞ্চয়প্রবণতা কমিয়া গেলে মোট আর্থিক আয়ের অধিক অংশ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হওয়ায়, উহাদের দামস্তর বাড়িবার ঝোঁক দেখা দিবে।

সঞ্চয়ে পরিবর্তন হইলে

বিনিয়োগ বলিলে বুঝা যায়, নূতন মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে অর্থ লগ্নী করা।

সমাজ অপূর্ণ কর্ম-নিয়োগের স্তরে থাকিলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে অনিয়োজিত উপাদানসমূহের নিয়োগ বাড়িতে থাকে। নূতন কাজে নিযুক্ত এই সকল উপাদানের মালিকদের আর্থিক আয় বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা ভোগদ্রব্য ক্রয়ে অধিক ব্যয় করিতে থাকায় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা, উৎপাদনের পরিমাণ, উপাদানের নিয়োগ, আর্থিক আয় ক্রমে বাড়িতে থাকে। কোন কোন উপাদানের পরিমাণ দেশে কম থাকিলে তাহাদের পূর্ণনিয়োগ ঘটিবে, দাম বাড়িতে থাকিবে, উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, দামস্তরও ক্রমে বাড়িয়া যাইবে। সমাজ পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌঁছিলে বা তাহার পূর্বেই তাই বিনিয়োগ-বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বাড়ে। দেশে বিনিয়োগ কমিলে ইহার বিপরীত ফলাফল হইবে। উপাদানসমূহের নিয়োগ কম হইবে, তাহাদের আর্থিক আয় কমিয়া যাইবে, দ্রব্যসামগ্রীর উপর সমাজের মোট ব্যয় কমিতে থাকিবে, দামস্তরও হ্রাস পাইতে থাকিবে।

বিনিয়োগে পরিবর্তন হইলে

সুতরাং কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঞ্চয়-প্রবণতা ও বিনিয়োগের পরিমাণের উপর দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তর নির্ভর করে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায়, সঞ্চয়-প্রবণতা মোটামুটিভাবে স্থির ও অপরিবর্তনশীল। লোকের অভ্যাস, জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে তাহাদের চিন্তা ধারণা প্রভৃতির উপর ইহা নির্ভরশীল, দীর্ঘকালে ইহার পরিবর্তন ঘটিলেও স্বল্পকালীন বিশ্লেষণে ইহা মোটামুটিভাবে স্থির। সুতরাং, বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তনই প্রধান শক্তি. ইহার ফলেই স্বল্পকালে দামস্তরে পরিবর্তন আসে। বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন সমাজের মোট আর্থিক আয়কে এবং ফলে মোট ব্যয়ের পরিমাণকে পরিবর্তিত করে, দামস্তর তাহার ফলে পরিবর্তিত হয়।

বিনিয়োগের পরিবর্তনই প্রধান

মনে রাখা দরকার, পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের দাম নির্ভর করে উহার উৎপাদন-ব্যয়ের উপর এবং উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে সেই উৎপাদন-ব্যয়ে পরিবর্তন আসে। দেশে টাকার পরিমাণে পরিবর্তন প্রত্যক্ষ ও পৃথকভাবে কোন বিশেষ-দ্রব্যের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে না। তবে, টাকার পরিমাণে পরিবর্তন হইলে সুদের হারে পরিবর্তন ঘটিয়া উৎপাদন-ব্যয়ও পরিবর্তিত হইতে পারে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিবর্তন সমাজের আর্থিক আয় ও কর্মনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আনে, সুতরাং বিভিন্ন দ্রব্যের

পৃথকভাবে কোন দ্রব্যের দামে পরিবর্তন

চাহিদাও পৃথকভাবে প্রভাবান্বিত হয়। এইরূপে সমাজের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর দামের উপর পৃথক পৃথক ভাবেও প্রভাব বিস্তার করে।*

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation)

মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন তত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে মোটামুটি দুইটি পৃথক ধারা দেখিতে পাওয়া যায়—উহার মধ্যে একটি ধারা অতি প্রাচীন, অপরটি গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম বা প্রাচীন ধারাটি টাকার পরিমাণ-তত্ত্বের কোন না কোন রূপ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই মত অনুযায়ী দেশে টাকার পরিমাণ-বৃদ্ধির ফলে যদি দামস্তর বাড়ে, তবে তাহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। টাকার সঙ্গে বিনিময়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ-বৃদ্ধির তুলনায় দেশে টাকার পরিমাণ বাড়ে বলিয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, ইহাই মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের মতানুযায়ী টাকার পরিমাণে যে কোন বৃদ্ধিকেই মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া মনে করা হইত। টাকার পরিমাণের উপর অহেতুক এই অস্বাভাবিক জোর দেওয়ায় অনেক সময় ভুল ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইত। যেমন, অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্য লইয়া যদি সরকার বেশি নগদ টাকা বাজারে ছাড়িত তবে তাহাকেও অনেক সময় মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া বিরোধিতা করা হইত।

পরিমাণতত্ত্বের ধারা

এই সম্পর্কে দ্বিতীয় মত বা ধারার সূত্রপাত হয় 'Lectures on Political Economy' নামক গ্রন্থে উইক্‌সেলের দামস্তর সম্পর্কে আলোচনা হইতে। তাঁহার অভিমত ছিল এই যে, ঠিক যেমন কোন একটি দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা হয় উহার চাহিদা ও যোগান দ্বারা, সেইরূপ সাধারণ দামস্তর নির্ভর করে এইরূপ দামস্তরের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা এবং মোট যোগানের উপর। "সুইডিশ" মুদ্রাস্ফীতি তত্ত্ব, অনেকাংশেই এই উইক্‌সেলীয় ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ও উহার পরবর্তীকালে ইহারই ভিত্তিতে মোটামুটি এই তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাড়্‌তি চাহিদাতত্ত্বের ধারা

টাকার পরিমাণের দিকে লক্ষ্য কম রাখিয়া যখনই দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা ও উহার যোগানের দিকে চিন্তা করা যায়, তখনই 'বাড়্‌তি চাহিদার ধারণা' (concept of excess demand) ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা-

* সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে পূর্ণতর আলোচনা আয় ও কর্মসংস্থান তত্ত্ব আলোচনার সময়ে করা হইয়াছে।

মূলক কোন এক বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান রেখা দুইটির দিকে লক্ষ্য রাখিলে আমরা মনে করিতে পারি যে, 'বাড়্তি চাহিদা' হইল নির্দিষ্ট দামে মোট চাহিদা ও মোট যোগানে পার্থক্য। নির্দিষ্ট কোন দামে এই বাড়্তি চাহিদা ধনাত্মক, শূন্য বা ঋণাত্মক (positive, zero, or negative) তিন প্রকারই হইতে পারে।

'বাড়্তি চাহিদা'-র এই ধারণা ক্রমশ উন্নত হইয়া বর্তমানকালে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান (Inflationary Gap) রূপে আলোচিত হইতেছে। মুদ্রাস্ফীতির তত্ত্ব বিশ্লেষণের কাজে এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে আজকাল এই ফাঁক বা অবকাশ বা ব্যবধান (Gap) আলোচিত হইতেছে। লর্ড কেইন্‌স প্রথমে How to pay for the war গ্রন্থে এইরূপ আলোচনার সূত্রপাত করেন। তবে 'মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান' এই কথাটি প্রথমে ব্রিটেনের চ্যান্সেলর অব্ এক্সচেকার 1941 সালে কমন্স সভায় বক্তৃতাকালে ব্যবহার করেন।

মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক কাহাকে বলে

মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কাহাকে বলে? মুদ্রাস্ফীতি সুরু হওয়ার পূর্বে জিনিসপত্রের দামকে বলে মূল দাম (base prices); বাজারে বিক্রয়যোগ্য জিনিসকে মূল দাম দিয়া গুণ করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতে সম্ভাব্য বা প্রত্যাশিত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ব্যয়ের আধিক্য বা বাড়্তিটুকু হইল মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান (An excess of anticipated expenditure over available output at base prices)। ইহাকে সূত্রের আকারে প্রকাশ করা চলে :

মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান = প্রত্যাশিত ব্যয়—বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র × মূল দাম।

মূল দাম (base prices) দিয়া বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র কিনিতে যে পরিমাণ টাকার দরকার যদি সম্ভাব্য ব্যয় তাহাই থাকে তবে কোন মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক দেখা দেয় না দামস্তরও বাড়ে না। সাধারণত, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির মূল্য ও জাতীয় আয় সমান, সুতরাং এক্ষেত্রে কোন ব্যবধান সৃষ্টি হইতেছে না, দামস্তর স্থির আছে ও আর্থিক ভারসাম্য বজায় আছে। কিন্তু যদি পুরাণো সঞ্চিত আয় হইতে বা নূতন টাকা সৃষ্টি করিয়া জাতীয় আয় বা অর্থের স্রোতধারা বাড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে দেশের সম্ভাব্য ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। এইরূপে সম্ভাব্য ব্যয় অধিক হইলেই বিক্রয়-যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ সমান থাকায় জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে

এই ফাঁক কেমন করিয়া মুদ্রাস্ফীতি বা দামস্তরে বৃদ্ধি ঘটায়

থাকে ; মূল দামসমূহের উপর অধিক ব্যয়ের চাপ পড়ে, দামস্তর বাড়ে ও মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হয়। যেমন, ধরা যাউক, মূল দামসমূহের হিসাবে বাজারে বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের মোট মূল্য হইল 1000 টাকা। সম্ভাব্য ব্যয় যদি 1000 টাকাই থাকে তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি হইবে না ; কিন্তু যদি সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ 1400 টাকা হয়, তাহা হইলে এই 400 টাকা বিক্রয়-যোগ্য জিনিসপত্র কেনাতে খরচ হইতে চাহিবে ; ফলে দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যাইবে। এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি আনয়নকারী ব্যবধান হইল 400 টাকা।

কিরূপে এই ফাঁক সৃষ্টি হয়

সম্ভাব্য-ব্যয়ের পরিমাণ স্থির হয় ভোগ-সঞ্চয়ের ধরন ও কর-কাঠামোর (Consumption-savings patterns plus the tax structure) সম্মিলিত প্রভাবের দ্বারা ; বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ স্থির হয় কর্ম-সংস্থানের অবস্থা ও যন্ত্র-কৌশলগত কাঠামোর দ্বারা (conditions of employment plus the technological structure)। নিচের উদাহরণ হইতে কিরূপে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান সৃষ্টি হয়, তাহা আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

বর্তমানের জাতীয় আয় ও দ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যয়=1600 টাকা

বিভিন্ন প্রকার কর (কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক বা স্থানীয়)=200 টাকা

তাহা হইলে, ব্যয়োপযোগী আয় বা সম্ভাব্য ব্যয়=1400 টাকা

মোট জাতীয় আয় (মূল দামসমূহের হিসাবে)=1100 টাকা

(অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির পূর্বেকার দামসমূহের হিসাবে)

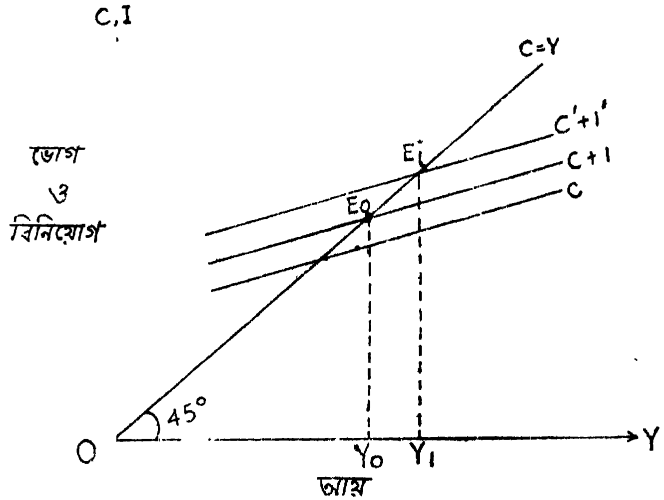
আত্মভোগ (Self-consumption) বা বিক্রয়ের জন্য বাজারে অনুপস্থিত দ্রব্যাদির মূল্য=100 টাকা

সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি আনয়নকারী ব্যবধান=400 টাকা।

আসলে অবশ্য 1400 টাকার ব্যয়োপযোগী আয় সবটাই ব্যয় হয় না, কিছুটা সঞ্চিত হয়। যদি স্বাভাবিক অবস্থায় জনসাধারণ শতকরা 10% সঞ্চয় করে তাহা হইলে 140 টাকা সঞ্চিত হইবে এবং 1260 টাকা (1400-140) দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয়িত হইতে চাহিবে। এমতাবস্থায়, প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক হইল 260 টাকা (1260-1000)। এই মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক ধারণাটিকে আমরা পরপৃষ্ঠার ছবির সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি :

উপরের চিত্রটিতে লম্বমুখী অক্ষে ভোগ ও বিনিয়োগ এবং ভূসমান্তরাল অক্ষে আয় পরিমাপ করা হইতেছে। 45° রেখাটিতে দেখান হইতেছে, সকল আয়ই

ভোগব্যয় হইয়া যায়, উহাকে শূন্য-সঞ্চয়ের রেখা (zero saving function) বলিতে পারা চলে। বিভিন্ন আয়ের স্তরে কিরূপ মোট ভোগব্যয় হয় উহা C রেখা



দ্বারা বোঝা যাইতেছে। বিভিন্ন আয়ের স্তরে মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় মিলিতভাবে প্রকাশ করিতেছে C+I রেখা। ইহা C রেখাটির ঊর্ধ্বে অবস্থিত, কারণ ভোগব্যয়+বিনিয়োগব্যয় কেবলমাত্র ভোগব্যয় হইতে বেশি। মোট আয়=ভোগব্যয়+বিনিয়োগব্যয়, তাই E_0 বিন্দুতে ভারসাম্যের আয়স্তর অর্থাৎ OY_0 দেখা যাইতেছে। এই OY_0 আয়স্তরে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে ধরা হইতেছে।

এই অবস্থায় সমাজে সরকারী ও বেসরকারী ভোগ ও বিনিয়োগব্যয় বাড়িয়া গেল। C+I রেখাটি ঊর্ধ্বে উঠিল, ইহা এখন C'+I' রেখায় পরিণত হইল। ফলে নূতন আয়স্তর Y_1 দেখা দিবে। মোট উৎপন্ন হইল E_0Y_0, পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকায় ইহা আর বাড়িতে পারিল না, অথচ জাতীয় আয় E_1Y_1 (অথবা OY_1) ইহা হইতে বেশি। E_1 হইতে E_0-র লম্বমুখী দূরত্বই মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান। এই ব্যবধান দূর না হইলে E_0Y_0-র দাম বৃদ্ধি পাইবে। এই ব্যবধান পূর্ণ করিতে হইলে (ক) সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কমাইতে হইবে, হয় কর বসাইয়া বা সঞ্চয় বাড়াইয়া, অথবা (খ) বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি

আমরা জানি যে, পূর্ণনিয়োগ স্তরের পরেই একমাত্র প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি (True Inflation) দেখা দিতে পারে। অপূর্ণ কর্ম-নিয়োগের স্তরে টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে সুদের হার কমিবে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইবে, অনিয়োজিত উপাদানসমূহের নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে, দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়িবে। এইরূপে সমাজ পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে পৌঁছিবে। তাহার পর টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি দ্রব সামগ্রীর উৎপাদন বা উপাদানের নিয়োগ বাড়াইতে পারিবে না, ফলে দামস্তর বাড়াইয়া দিবে।*

অনেক সময় পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে পৌঁছিবার পূর্বেই দামস্তর বৃদ্ধি পায়, এরূপ অবস্থাকে কেইন্‌স আংশিক মুদ্রাস্ফীতি (Partial Inflation) বলিয়াছেন। শিল্পে অনুন্নত দেশে বা উন্নত দেশেও পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরে পৌঁছিবার পূর্বেই এইরূপ আধা-মুদ্রাস্ফীতি (Semi Inflation) দেখা দিতে পারে। এইরূপ আধা-মুদ্রাস্ফীতির ৫টি কারণ আছে। (ক) প্রথমত, বর্ধিত টাকার সকল পরিমাণ কর্মসংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদন বাড়াইবার কাজে নিয়োজিত না হইতে পারে। যেমন, ব্যবসায়ীরা বর্ধিত টাকার কিছুটা ফাট্‌কাবাজারে খাটাইয়া দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দিতে পারে, এইরূপ কয়েকটি দ্রব্যের দাম বাড়িলে তাহা অপরাপর দ্রব্যের দামবৃদ্ধির জন্য চাপ দেয়। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যসামগ্রীর বাজার তেজী না হইয়া শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের বাজার তেজী হইয়া উঠিতে পারে।

আংশিক মুদ্রাস্ফীতির কারণসমূহ

(খ) দ্বিতীয়ত কোন উপাদান বা উপকরণের সকল ইউনিট নিপুণতার দিক হইতে সমান নয়। নিপুণ ইউনিটগুলি প্রথমেই নিযুক্ত হইয়া যায়; উৎপাদন বাড়িলে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কম নিপুণ ইউনিট বা একেবারে অনিপুণ ইউনিটগুলির সাহায্যে উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে উৎপাদনব্যয় বাড়িতে থাকে এবং দামস্তর বৃদ্ধির দিকে প্রবণতা দেখা যায়। (গ) তৃতীয়ত, কতকগুলি উপাদানের যোগান খুবই কম থাকিতে পারে, ফলে অন্যান্য উপাদানসমূহ বেকার অবস্থায় থাকিলেও দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন আরও বাড়ান অসম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। যে সকল উপকরণের যোগান হঠাৎ সীমাবদ্ধ হইয়া

*তবে পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে পৌঁছিয়া যদি ক্রমাগত শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইয়া দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ান হয়, তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি না-ও ঘটিতে পারে। কিন্তু স্বল্পকালে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ান সম্ভব না-ও হইতে পারে সুতরাং ততদিন মুদ্রাস্ফীতি চলিতে থাকিবে।

পড়ায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে "প্রতিবন্ধকের" (Bottlenecks) সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের পরিবর্তে অন্য উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব হইলে দামস্তরে বৃদ্ধি কম হইবে। এইরূপ অবস্থায় দামস্তরে বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে ওই সকল উপকরণের বিনির্দিষ্টতার মাত্রার উপর (degree of specificity)। (ঘ) চতুর্থত, নবনিযুক্ত উপকরণের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শ্রমিকদল মজুরি বৃদ্ধির জন্য চাপ দিতে পারে, কারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির স্তরে দ্রব্যমূল্য কিছুটা বাড়ে। মজুরি বৃদ্ধি হইলে তাহা দুই ভাবে দামস্তরকে বাড়াইয়া দেয় ; দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়াইয়া এবং দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি করিয়া। (ঙ) পঞ্চমত, স্বল্পকালে ফার্মের মাত্রা স্থির রাখিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টায় প্রান্তিক ও গড় উৎপাদনব্যয় কিছুটা বাড়ে এবং দামস্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকার ভেদ (Types of Inflation)

লর্ড কেইন্‌স্, তাঁহার 'Treatise on money' গ্রন্থে চারিপ্রকার মুদ্রাস্ফীতির কথা বলিয়াছেন ; (ক) দ্রব্যস্ফীতি (Commodity Inflation), (খ) মূলধনী দ্রব্যস্ফীতি (Capital Inflation), (গ) মুনাফারূপে মুদ্রাস্ফীতি (Profit Inflation) এবং (ঘ) আয়রূপে মুদ্রাস্ফীতি (Income Inflation)।

দ্রব্যস্ফীতি (Commodity Inflation) বলিলে বোঝা যায়, দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণের তুলনায় বিনিয়োগের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে (The excess in the cost of investment over the volume of saving); অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যসমূহের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় উহাদের দামস্তরের বৃদ্ধি বেশি হইয়াছে।

দ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যস্ফীতি

মূলধনী দ্রব্যস্ফীতি (Capital Inflation) বলিলে বোঝা যায়, এই অবস্থায় নূতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় উহাদের দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। নূতন-মূলধনী দ্রব্যের দামস্তরে বৃদ্ধি টাকার ক্রয়ক্ষমতাকে প্রথমেই কমাইয়া দেয় না ; কিছুকাল পরে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন আনিয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়।

মুনাফারূপে মুদ্রাস্ফীতি তখন ঘটে যে অবস্থায় দ্রব্যমূল্য স্থির আছে, কিন্তু উৎপাদনের ব্যয় কমিয়া যাওয়ায় মোট মুনাফা পূর্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে। আয়রূপে মুদ্রাস্ফীতি হইল যে অবস্থায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে উৎপন্ন দ্রব্য-

পিছু পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ দক্ষতাজনিত পারিশ্রমিকের হার (rate of efficiency-earnings) বাড়িয়া গিয়াছে।

পরবর্তী কালে, কেইন্‌স্ প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি (True Inflation) এবং ভুয়া মুদ্রাস্ফীতির (False Inflation) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। পূর্ণ কর্মসংস্থানের পূর্বে কোন কোন উপাদানের যোগান কম থাকায় বা বিভিন্ন প্রকার "প্রতিবন্ধকের" দরুণ উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া ভুয়া মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিতে পারে। অনেক সময় প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতিকে পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি (Full Inflation) এবং ভুয়া মুদ্রাস্ফীতিকে আংশিক মুদ্রাস্ফীতি (Partial Inflation) বলা হয়।

প্রকৃত ও ভুয়া

অধ্যাপক পিগুর মতে মুদ্রাস্ফীতি দুই প্রকারের : ঘাটতি ব্যয়ের চাপজনিত (Deficit-Induced) বা মজুরির চাপজনিত (Wage-induced)। দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং দামস্তরের বৃদ্ধির জন্য, যুদ্ধের প্রয়োজনে বা বিশেষ কারণে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে সমাজে আয়ের পরিমাণ বাড়ে এবং এই আয়বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বাড়িতে থাকে। দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে সরকারী ব্যয় আরও বাড়াইতে হয়, নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া সেই ব্যয় বাড়ান হয়, ফলে মুদ্রাস্ফীতির আরও প্রসার ঘটে। ইহাকে ঘাটতিব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

ঘাট্‌তি-উদ্ভূত ও মজুরি-উদ্ভূত

দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং দামস্তরের বৃদ্ধির দরুণ শ্রমিকগণের সংঘবদ্ধ চাপের ফলে মজুরির পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদন-ব্যয় আরও বৃদ্ধি পায় ; বর্ধিত মজুরি দিবার জন্য ব্যবসায়ীরা মুনাফা না কমাইয়া দামস্তর বাড়াইয়া দেয়। শ্রমিকগণ পুনরায় মজুরি বৃদ্ধির জন্য চাপ দেয়। উৎপাদন-ব্যয় পুনরায় বৃদ্ধি পায় এবং দামস্তর আরও বর্ধিত হয় ; এইরূপে চক্রধারায় (Spiral movement) মুদ্রাস্ফীতি বাড়িতে থাকে, দামস্তরে বৃদ্ধি—মজুরি বৃদ্ধি—দামস্তরে আরও বৃদ্ধি, এইরূপ এক দুষ্টচক্রের (Vicious Circle) সৃষ্টি হয়। ইহাকে মজুরির চাপজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

মুদ্রাস্ফীতি আরও দুই ধরনের হইতে পারে, অবাধ মুদ্রাস্ফীতি (Open Inflation) এবং দমিত মুদ্রাস্ফীতি (Suppressed Inflation)। সমাজের মোট-আয় ও ব্যয়ের পরিমাণে বৃদ্ধি যখন অবাধভাবে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা এবং দামস্তর বাড়াইবার সুযোগ পায় তখন দামস্তরের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে অবাধ মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অবাধ মুদ্রাস্ফীতিরোধের কোনরূপ প্রচেষ্টা না

হইলে উহা অবশেষে উল্লম্ফনশীল মুদ্রাস্ফীতিতে (Galloping Inflation) পরিণত হয়। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, অল্প সময়ের মধ্যে দামস্তরে অনবরত বৃদ্ধিকে, অর্থাৎ টাকার মূল্যে দ্রুত পতনকে উল্লম্ফনশীল মুদ্রাস্ফীতি বলা চলে। যদি মুদ্রাস্ফীতি রোধের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিকট হইতে অধিক টাকা বা আয় সরাইয়া না আনিয়া দ্রব্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বা ভোগ-নিয়ন্ত্রণ (রেশনিং) চালু করা হয় অথবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে (Investment-sector) সংকুচিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দ্রব্যমূল্য বিশেষ বৃদ্ধি না হইয়াও ব্যাঙ্ক-আমানতের পরিমাণ ও নগদ টাকার মজুতের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এইরূপ অবস্থাকে 'রুদ্ধ'বা 'দমিত' মুদ্রাস্ফীতি (Repressed) বলা চলে।

উন্মুক্ত ও দমিত

কেন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে (Why Inflation)

চাহিদা ও যোগান উভয় দিক হইতেই মুদ্রাস্ফীতির চাপ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে চাহিদা বলিলে বোঝা যায় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করিবার জন্য সমাজে কি পরিমাণ ব্যয়োপযোগী আয় রহিয়াছে এবং এক্ষেত্রে যোগান বলিলে বোঝা যায় আর্থিক আয় ব্যয় করা যাইতে পারে এরূপ কি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বাজারে রহিয়াছে। চাহিদার দিকে মুদ্রাস্ফীতিকারী প্রধান শক্তিসমূহ (Inflationary forces) হইল : (ক) টাকার যোগান, (খ) ব্যয়োপযোগী আয় (Disposable income), (গ) ভোগকারীদের ব্যয় ও ব্যবসায়ীদের লগ্নী, (ঘ) বৈদেশিক চাহিদা।

(ক) ব্যবসায়বাণিজ্য প্রসারের ফলে নগদ টাকার যোগান যেমন বাড়ান হয়, সেইরূপ ব্যবসায়বাণিজ্যের প্রয়োজনেই ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ বা ঋণগত টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়। ব্যাঙ্কঋণের বৃদ্ধি এক সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও ফল উভয়ই বটে। (খ) ব্যয়োপযোগী আয় নির্ভর করে কর-কাঠামোর উপর। যদি করভার কমান হয় তাহা হইলে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বা মোট ব্যয় বাড়িয়া যায়; যদি করভার বাড়ান হয়, তাহা হইলে ব্যয়োপযোগী আয় বা মোট ব্যয় কমে। শ্রমিক সংঘের চাপে মজুরি-হারের বৃদ্ধি হইলেও সমাজে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বাড়ে। (গ) ব্যবসায় সমৃদ্ধির যুগে বেশি পরিমাণে নূতন মূলধন লগ্নী হয় এবং এই লগ্নী বিভিন্নরূপে, যেমন

চাহিদার দিক হইতে কারণসমূহ

শেয়ারের লভ্যাংশ, মজুরি, কাঁচামাল ক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রভৃতি দ্বারা সমাজের আয়স্রোতে প্রবেশ করে। ইহার সহিত "কল্যাণ রাষ্ট্রের" জনহিতকর কার্যে ব্যয় বা অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির (economic growth) দরুণ ব্যয় সমাজের মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান (Inflationary gap) আরও বাড়াইয়া দেয়।

(ঘ) দেশের দ্রব্যসামগ্রীর জন্য বৈদেশিক ব্যয়ও মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ। যদি কোন দেশ নিয়মিতভাবে "রপ্তানির উদ্বৃত্ত" (Export surplus) বজায় রাখিতে চাহে, তাহা হইলে দেশে আয়-স্তর বাড়ে এবং বিদেশী দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ কম হওয়ায় দেশী দ্রব্যের উপরই এই অধিক আয়ের চাপ পড়ে, আভ্যন্তরীণ দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যোগানের দিক হইতে কারণসমূহ

যোগানের দিক হইতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবার অন্যতম মূল কারণ হইল (ক) উপাদানসমূহের পূর্ণতর নিয়োগ। কাঁচামাল, শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির দুষ্প্রাপ্যতা দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ করে। (খ) দেশ হইতে বিদেশে দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানিও আভ্যন্তরীণ যোগান কমাইয়া দেয়। রপ্তানির উদ্বৃত্ত একদিকে আভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে দেশে দ্রব্যের যোগান কমাইয়া দেয়। যে সকল দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বিশেষ শক্তিশালী, তাহাদের অধিক রপ্তানি মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ আরও বাড়াইয়া তোলে।

সর্বশেষে, একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা দরকার। টাকার চাহিদা ও যোগান দ্বারা অথবা মোট ব্যয় ও মোট দ্রব্যসামগ্রীর হিসাব দ্বারা মুদ্রাস্ফীতিকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা চলে না ; ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ধারণা ও প্রত্যাশা (Expectations) মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যক্ষ কারণ না হইলেও ইহার গতিবেগ নির্ণয় করে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা ও আন্দাজী ধারণা চারিটি উপায়ে

দাম ও আয় সম্বন্ধে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন আশা-নিরাশা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিনিয়োগকারীদের ধারণা

মুদ্রাস্ফীতির প্রসার-বেগকে প্রভাবান্বিত করে। (ক) ভবিষ্যতে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িবে, এই ধারণার ফলে বর্তমানেই বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া যায়, ফলে মুদ্রাস্ফীতির গতিবৃদ্ধি সুরু হইতে পারে। (খ) ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধি হইবে এইরূপ ধারণার ফলেও বর্তমানে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে। ভবিষ্যতে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা যত প্রবল ততই বর্তমানে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ; প্রধানত ইহা নির্ভর করে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতার (Income elasticity of Demand)

উপর। উদ্যোক্তাগণ বা ব্যবসায়ীরাও ভবিষ্যৎ আয় বৃদ্ধির ধারণা অনুযায়ী বর্তমানে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া থাকে। (গ) ভবিষ্যতে মজুরির হার বৃদ্ধি হইতে পারে এই ধারণার ফলে ব্যবসায়ীরা বর্তমানেই দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দিতে পারে। (ঘ) ভবিষ্যৎ বৈদেশিক চাহিদা সম্বন্ধে ধারণা বর্তমানের উৎপাদন ও দামকে প্রভাবান্বিত করে।

৫. অর্থের মূল্যে পরিবর্তনের ফলাফল (Effects of Changes in the Value of Money):

উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব: দামস্তরে বৃদ্ধি বা দামস্তরে হ্রাস অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন (Deflation) দেশে উৎপাদনের এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। দামস্তর বাড়িয়া গেলে কর্মনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে, উৎপাদনের প্রসার হয়। অধিক মুনাফা লাভের আশায়, ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়িবে এই ভরসায়, ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন বাড়াইয়া ফেলেন এবং তাহাদের বিনিয়োগে বৃদ্ধি সমাজে মোট আয়ের পরিমাণকে আরও বাড়াইয়া মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ ক্রমে প্রবলতর করিয়া তোলে। বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর সকলেই পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে বাড়িতে থাকে, ঘূর্ণিচক্রের (Spiral) গতিতে ইহারা প্রসার লাভ করে। অর্থনৈতিক কাজকর্মের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলাফল সকল সময়ে শুভ নহে, উৎপাদন-ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা ও ফাট্‌কা মনোভাব বৃদ্ধি পায়, বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় উদ্যোক্তাগণ ও ফাট্‌কাদারগণ অসঙ্গত আশাবাদের ঝোঁকে সমাজে দ্রব্যের প্রয়োজন ও উহার বিক্রয়-যোগ্যতার কথা চিন্তা না করিয়া অহেতুক উৎপাদনকে ফাঁপাইয়া তোলেন। এই সকলের পুঞ্জীভূত ফল হইল অধিকোৎপাদন এবং হঠাৎ ব্যবসায়-সংকটের সৃষ্টি, ব্যবসায়-সমৃদ্ধির বুদ্‌বুদ হঠাৎ ফাটিয়া গিয়া উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর সকল কিছুকে অস্বাভাবিক ভাবে কমাইয়া দেয়। অবিক্রীত দ্রব্যের বোঝা বাড়িতে থাকে, অস্বাভাবিক নিরাশাবাদের ঝোঁকে সংকট গভীরতর হইতে থাকে। দামস্তর কমিতে থাকিলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়, বিনিয়োগ সবই দ্রুত হ্রাস পায়। সম্ভাব্য মুনাফার হার কম থাকায় মুদ্রাসংকোচনের (Deflation) সৃষ্টি হয়।

উৎপাদনের উপর প্রভাব

মনে রাখা দরকার যে, অনুন্নত দেশসমূহে বা অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে

অল্পমাত্রায় মুদ্রাস্ফীতি প্রয়োজনীয় এবং উহা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক বলিয়া আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করেন। অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে, সমাজে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিতে ইহা সাহায্য করে। তবে, লক্ষ্য রাখা দরকার যেন ইহা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া না যায়, আয়ত্তরের মধ্যে রাখিয়া ইহাকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় ব্যবহার করা চলিতে পারে।

বণ্টনের উপর প্রভাব: দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের উপর মুদ্রাস্ফীতি বিভিন্ন প্রকার বিস্তার করে, সমাজের একাংশ হইতে সম্পদ অপর অংশের হাতে চলিয়া যায়।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে ইহাতে ঋণগ্রহীতাগণের সুবিধা, কারণ মুদ্রাস্ফীতিতে তাহাদের আয় ও বৃদ্ধি হওয়ায় ঋণপরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়ায় তাহারা সমান পরিমাণ টাকা পরিশোধ করিলেও দ্রব্য-সামগ্রীর হিসাবে তাহাদের কম পরিশোধ করিতে হইতেছে। দামস্তর বেশি থাকায় টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়াছে এবং সেই কম-ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন টাকার সাহায্যে ঋণ পরিশোধ করিলে দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাকে কম দিতে হইতেছে। ঋণদাতাগণের অসুবিধা, কারণ মুদ্রাস্ফীতির পূর্বে টাকার মূল্য যখন বেশি ছিল সেই অবস্থায় তাঁহারা ঋণ দিয়াছিলেন, এখন সেই ঋণের পরিশোধ হইলেও সমপরিমাণ টাকার দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য, যদি ক্রয়ক্ষমতা কমে নাই এমন বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণের পরিশোধ সে পায় তাহা হইলে ঋণদাতার লোকসান হয় না। তবে সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সমাজের ব্যক্তিগণ একই সঙ্গে সাধারণত ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতারূপে কাজ চালায়। তাই ঋণদাতা হিসাবে কোন ব্যক্তির লোকসান হইলেও ঋণগ্রহীতা হিসাবে লাভ হয়।

ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতা

মুদ্রাস্ফীতির সময়ে উদ্যোক্তাগণের সুবিধা হয় কারণ দামস্তর বাড়িলে বেশি দামে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া তাহাদের লাভ বাড়িবার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া, সাধারণত তাঁহারা ঋণগ্রহীতা, সুতরাং মুদ্রাস্ফীতিকালের কম ক্রয়ক্ষমতা-বিশিষ্ট টাকার সাহায্যে তাঁহারা ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। দাম-বৃদ্ধি এবং ব্যয়বৃদ্ধির মধ্যে কিছুদিন সময়ের ফাঁক (time-lag) থাকে, যতদিন না পর্যন্ত শ্রমিকের মজুরি, কাঁচামালের দাম, যন্ত্রপাতির দাম বা সুদের হার বৃদ্ধি পায় ততদিন তাহারা দ্রব্যের দাম-বৃদ্ধির সম্পূর্ণ সুবিধা লাভ করেন। "স্বাভাবিক মুনাফা" হইতে বাস্তবে-প্রাপ্ত মুনাফার

উদ্যোক্তা

পরিমাণ খুবই বেশি থাকে। মুদ্রাসংকোচনের সময় উদ্যোক্তাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ তাঁহারা সাধারণত ঋণগ্রহীতা, এবং তাহা ছাড়া, দ্রব্যের দামহ্রাস ও উহার ব্যয়হ্রাসের মধ্যে কিছুকাল সময়ের ফাঁক থাকে।

দাম ও মজুরি উভয়ের দৌড়ে মজুরি কখনও জেতে না, তাই শ্রমিকগণ বা মজুরি আয়কারীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাহাদের আয় স্থির ও নির্দিষ্ট, সুতরাং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে তাঁহারা নির্দিষ্ট আয়ের দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাইয়া থাকেন। দামস্তর বৃদ্ধি হারের তুলনায় মজুরি বৃদ্ধির হার কম থাকে, সুতরাং দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাঁহাদের আয় কমিয়া যায়; আর্থিক আয়ের বৃদ্ধি হইলেও আসল আয় কমে। পেনশনভোগী বা নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিদেরও এই প্রকার অসুবিধা হয়। তবে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকের সুবিধা, বেকারি বা কর্মে নিযুক্ত থাকার সম্ভাবনা মোটামুটি বেশি।

শ্রমিক ও বেতনভোগী

বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যাঁহারা শেয়ার প্রভৃতিতে টাকা বিনিয়োগ করিয়াছেন মুদ্রাস্ফীতিতে তাঁহাদের সুবিধা হয়; কিন্তু যাঁহারা নির্দিষ্ট সুদ বা আয় লাভের জন্য বণ্ড বা ডিবেঞ্চারে টাকার লগ্নী করেন, তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। নিম্ন মধ্যবিত্তগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ তাঁহারা সাধারণত নির্দিষ্ট সুদে ব্যাঙ্কে বা বীমা কোম্পানীতে অর্থ-সঞ্চয় করেন।

বিনিয়োগকারী

কৃষিজীবিদের মধ্যে যাঁহাদের জমি-জমা আছে এবং মজুর খাটাইয়া জমি চাষ করেন বা নির্দিষ্ট খাজনাতে জমি ভাড়া দেন তাঁহাদের লাভ হয়। কিন্তু ভূমিহীন কৃষি মজুরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। সাধারণত শিল্প-জাত দ্রব্যের দাম কৃষিজাত দ্রব্যের তুলনায় বেশি বাড়ে, সুতরাং, শিল্পে নিযুক্ত উদ্যোক্তাদের তুলনায় কৃষিতে নিযুক্ত উদ্যোক্তাগণ কম লাভবান হন।

কৃষিজীবি

মুদ্রাস্ফীতির ফলে করদাতাদের সুবিধা হয়, কারণ করভার একটু বৃদ্ধি হইলেও টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাদের কম দিতে হয়। রাষ্ট্রীয় ঋণের ভারও কমে, কারণ ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্র দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে কম সম্পদ পরিশোধ করে। মুদ্রা-সংকোচনের সময় করের আর্থিক ভার সমান থাকে, কিন্তু টাকার মূল্য বেশি হওয়ায় আসল ভার (**Real burden**) বাড়ে। রাষ্ট্রীক ঋণের আসল ভারও মুদ্রা সংকোচনের সময় বৃদ্ধি পায়।

করভার ও রাষ্ট্রীয় ঋণ

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ (Control of Inflation) :

সমাজের মোট ব্যয় যখন মোট দ্রব্যোৎপাদনের তুলনায় অধিক হারে বাড়িতে থাকে তখন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি রোধের দুইটি উপায় আছে : দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে বৃদ্ধি এবং সমাজের টাকার পরিমাণ বা আর্থিক আয়-ব্যয়ের পরিমাণ কমান। দেশে উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ থাকিলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় কেবলমাত্র শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইয়া এবং উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিয়া। দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় উপাদানের নিয়োগ বাড়াইয়া এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া। অবশ্য, ইহার ফলে সমাজের মোট ব্যয় বাড়িতে পারে এবং সাময়িকভাবে মুদ্রাস্ফীতি প্রবলতর হইতে পারে।

দ্রব্যোৎপাদন বৃদ্ধি

সমাজের মোট আর্থিক ব্যয় কমাইবার জন্য যে সকল পদ্ধতি আছে সেই সকল পদ্ধতিকেই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা সম্ভব। এই সকল পদ্ধতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : (ক) আর্থিক (Monetary) পদ্ধতিসমূহ, (খ) ফিস্‌কাল (Fiscal) পদ্ধতিসমূহ এবং (গ) প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের (direct controls) পদ্ধতিসমূহ।

আর্থিক পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগকারী হইলেন দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। টাকার বাজারের শীর্ষে অবস্থান করিয়া দেশের আর্থিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের সুদের হার বা ব্যাঙ্কহার বাড়াইয়া দিবে। ব্যাঙ্কহার বাড়িলে দেশের ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণত তাহাদের সুদের হার বাড়াইবে এবং ঋণগ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় উৎপাদকগণ বা ভোগকারীগণ ঋণের পরিমাণ কমাইয়া ফেলিবে এবং সমাজের মোট আর্থিক ব্যয় কমিয়া আসিবে। দ্বিতীয়ত, টাকার যোগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল ব্যাঙ্কঋণ ; সুতরাং, ইহার পরিমাণ কমাইবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-সমূহের নিকট তাহাদের নগদ-আমানতের অধিক অংশ জমা হিসাবে চাহিতে পারে। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকার পরিমাণই ঋণপ্রসারের ভিত্তি, সুতরাং আমানতের যে অংশ জমা হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের নিকট গচ্ছিত রাখে, তাহার পরিমাণ বাড়াইয়া দিলে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ কমিবে, সুদের হারও বাড়িবার সম্ভাবনা। এইভাবে সমাজের ঋণগত টাকার প্রসারকে (expansion of credit money) কমাইয়া ফেলা সম্ভব।

আর্থিক পদ্ধতি : ব্যাঙ্ক হার বৃদ্ধি, নগদ জমার অংশ বৃদ্ধি, খোলা বাজারের কার্যকলাপ, পৃথকভাবে বাছাই করিয়া বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারী কাজকর্ম (open market operations) চালু করিতে পারে, অর্থাৎ সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া লোকের হাত হইতে নগদ টাকা তুলিয়া লইতে পারে ; ফলে আয়-স্রোত হইতে নগদ টাকা কমিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণও কমিবার সম্ভাবনা। চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দেশ দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ বন্ধ করিয়া দিতে পারে বা কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ দান করিতে হইলে বন্ধকীমূল্যের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ দিতে পারে। ইহার ফলে যে শিল্পে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ বেশি বা যে দ্রব্যের বাজারে অধিক ফাট্‌কা ব্যবসায় চলিতেছে, অথবা যে মূল শিল্পসমূহে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব অবাঞ্ছনীয়— এইরূপ পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর। ঋণ নিয়ন্ত্রণের এই বাছাই পদ্ধতিগুলি (Selective credit control) মুদ্রাস্ফীতির সময়ে প্রয়োগ করা খুবই দরকার ; কারণ, সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সংকুচিত হইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যাহত হইবে এবং মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং, বাছাই করিয়া, বিশেষভাবে ফাট্‌কাদারী ব্যবসাগুলি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই দরকার।

ফিস্‌কাল পদ্ধতিসমূহের মধ্যে, প্রথমত, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন সরকারী ব্যয় কম হয়। সরকারের চেষ্টা হইবে একই সঙ্গে ব্যয় কমান এবং আয়-বৃদ্ধি করা।

করপদ্ধতি :সরকারীব্যয় কমান, আয় বৃদ্ধি, জনসাধারণের হাত হইতে আয় তুলিয়া লওয়া, রপ্তানি শুল্কের বৃদ্ধি আমদানি শুল্কের হ্রাস বাধ্যতামূলক সঞ্চয়

সরকারী ব্যয় দেশের মোট ব্যয়ের একাংশ, সুতরাং ইহা কমাইলে দ্রব্যসামগ্রীর উপর চাহিদার চাপ কমিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইহারই সঙ্গে নূতন নূতন কর আরোপের দ্বারা বা বর্তমান করের হার বাড়াইয়া ব্যক্তির হাত হইতে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ কমাইয়া ফেলাও দরকার। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, করসমূহের প্রভৃতি কিরূপ, যেন তাহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যোৎপাদনে বিনিয়োগ কমাইয়া না দেয়। সাধারণভাবে, বাজেট উদ্বৃত্ত রাখিতে হইবে। মনে রাখা দরকার যে মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সকল কর বাড়ান হইলেও আমদানি-শুল্ক বাড়ান উচিত নহে, তবে রপ্তানিশুল্ক বাড়ান উচিত। রপ্তানিশুল্কের বৃদ্ধি এবং আমদানিশুল্কের হ্রাস দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বাড়াইতে পারে, ফলে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ কমিতে পারে। তৃতীয়ত, সমাজ-দেহ হইতে টাকা সরাইয়া আনিবার জন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয়-পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা দরকার। ব্যক্তিদের আয় হইতে একাংশ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসাবে সরকারের হাতে তুলিয়া আনা উচিত। সরকারী ঋণপত্ররূপে সেই সঞ্চয় জমা থাকিবে, মুদ্রাস্ফীতির পরে অপসৃত এই আয় ব্যক্তিদের ফেরৎ দেওয়া হইবে।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে প্রধান হইল দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ। স্বল্পকালের মধ্যে হঠাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব না হইলেও যে সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতিজনিত অনুভূতিশীল (**Inflation-sensitive**), তাহাদের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কম মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে এইরূপ ক্ষেত্র হইতে উপকরণ সরাইয়া আনা দরকার। এই সকল দ্রব্যের আমদানিও মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাইতে সাহায্য করিবে। এইরূপে উপকরণের নিয়োগবিন্যাসে পরিবর্তন (**changes in the allocation of resources**) মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ কমাইতে পারে। উপকরণের দাম বাড়াইবার প্রচেষ্টাও নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এবং উপাদানের বাজারে একচেটিয়া অধিকার থাকিলে তাহাও ভাঙিয়া দেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, মজুরি-নিয়ন্ত্রণের নীতি। দেশে মজুরির হার এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার যাহাতে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির দরুণ আয়-বৃদ্ধি পায় এবং জীবনযাত্রার মান না কমে, অথচ সেই মজুরি বৃদ্ধির দরুণ দ্রব্যসামগ্রীর দাম আরও বাড়িয়া না যায়। সুতরাং শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত মজুরি-বৃদ্ধির যোগ থাকা দরকার, অধিক দ্রব্যোৎপাদন করিতে পারিলে তবেই যাহাতে মজুরি-বৃদ্ধি হয় (ফলে দ্রব্যের ইউনিট-পিছু উৎপাদনব্যয় কমিতে পারে) তাহা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। উদ্যোক্তাগণ মজুরি বাড়াইলেও যেন দাম বাড়াইতে না পারে অর্থাৎ নিজেদের মুনাফা কমাইয়া যেন সেই বর্ধিত মজুরি দেয় সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। তৃতীয়ত, দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং-এর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সরকারী হস্তক্ষেপের দ্বারা অন্ততপক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। কিন্তু, সাধারণত দাম নিয়ন্ত্রণের ফলে দ্রব্যাদি খোলা বাজার হইতে 'কালোবাজারে' চলিয়া যায় এবং অতিরিক্ত দামে বিক্রয় হইতে থাকে। সুতরাং সকলে যাহাতে নিয়ন্ত্রিত দামে জিনিষপত্র পাইতে পারে এইজন্য ইহার সঙ্গে রেশনিং-প্রথা প্রবর্তন করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতি : দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, মজুরি নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং ও দামনিয়ন্ত্রণ

অনুশীলনী

1. Examine critically the Quantity theory of money.
2. Critically examine Fisher's Quantity equation as an explanation of short period changes in the price level.
3. Explain the Cash Transactions Standard.
4. Discuss the determinants of cash transaction variables.
5. Explain the relationship between the Quantity of Money and the Price Level.
6. What factors bring short period changes in the price level.
7. Explain how Savings and Investment explain fluctuations in the general level of prices.
8. Define Inflation and discuss the various types of inflation.
9. When does inflation occur? Discuss the effects of inflation on production and distribution of wealth.
10. What do you mean by Inflation? Examine the methods that can be adopted for controlling inflation.

৮

আর্থিক নীতির লক্ষ্য

Objectives of Monetary Policy

আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি ও লক্ষ্য সাধনের জন্য আর্থিক নীতিকে প্রয়োগ করা হয়, আর্থিক নীতি অর্থনৈতিক নীতিরই অঙ্গ। এরূপ ভাবে দেশের আর্থিক নীতি স্থির করা হয় যে তাহা সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতির সাফল্য লাভে সাহায্য করে। সুতরাং স্থান কাল, ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজের ও রাষ্ট্রের কাঠামো, দেশের অর্থনৈতিক লক্ষ্য প্রভৃতির উপর আর্থিকনীতি নির্ভর কের। বিভিন্ন অবস্থায় কিরূপ আর্থিকনীতি প্রয়োগ করা হয় তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। ব্যাঙ্কহারে পরিবর্তন, খোলাবাজারে কার্য-কলাপ প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা শেষ হইয়াছে। এখন আমাদের জানা দরকার দেশের আর্থিক নীতির বিশেষ কোন লক্ষ্য থাকিবে কি না এবং কোন একটি লক্ষ্য গ্রহণ করার তাৎপর্য কি।

আর্থিক নীতি অর্থ-নৈতিক নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ

(১) বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিরতা (Stability of external value)

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যখন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন আর্থিক নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল টাকার বহির্মূল্যের স্থিরতা। ঊর্ধ্বে ও নিম্নে দুই স্বর্ণবিন্দুর মধ্যে বিনিময় হারে উঠানামা সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই সীমার মধ্যেই স্বর্ণের গমনাগমনের ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তর, উৎপাদন ও ব্যয়স্তরের কাঠামোতে পরিবর্তন হইত। "খেলার নিয়মসমূহ" মানিয়া চলিয়া স্বর্ণমান বজায় রাখা আর্থিক নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল বলা চলে। এই আর্থিক নীতির ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার হইয়াছিল, বৈদেশিক বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

স্বর্ণমান ব্যবস্থায়

কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় টাকার বহির্মূল্য অপেক্ষা উহার অন্তর্মূল্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ টাকার অন্তর্মূল্যে পরিবর্তন ঘটিলে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান প্রভাবান্বিত হয়, অন্তর্মূল্যকে বাহিরের বিভিন্ন ঘটনাস্রোতের দ্বারা নির্ধারিত হইতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। আধুনিক যুগের উগ্র অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (Autarcky) আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রার মান ও

বর্তমান অবস্থায় পরিবর্তন

দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়া টাকার বহির্মূল্যের ভারসাম্য রক্ষা করাকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করে না।

মনে রাখিতে হইবে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ থাকা উচিত নহে ; দেশের স্বার্থ অনুযায়ী উভয় মূল্যকেই কখনও স্থির রাখা উচিত এবং কখনও বা পরিবর্তিত হইতে দেওয়া উচিত, যদিও পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ভরযোগ্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা নিশ্চয় দরকার।

(২) মৃদুবর্ধনশীল দামস্তর (A gently rising price level) :

অনেকের মতে দেশের আর্থিক নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত মৃদুবর্ধনশীল দামস্তর বজায় রাখা, কারণ (ক) দামস্তরে বৃদ্ধিই দেশে উদ্যোক্তাদের প্রেরণাশক্তি ও উৎসাহবর্ধক হিসাবে কাজ করে। দেশে দামস্তর বর্ধনশীল হইলে শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে, দেশে কর্মসংস্থান আয়স্তর প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, বেকারি দূর হয়। (খ) মৃদু বর্ধনশীল দামস্তরই ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প সমৃদ্ধির কারণ বলিয়া রবার্টসন মনে করেন। (গ) তাহা ছাড়া মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক কালের সমাজে মোট ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতেছে। যদি দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে না থাকে তাহা হইলে ব্যক্তিদের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ ঋণের ভার বহন করা ক্রমশ শক্ত হইয়া উঠিবে ; দামস্তরে ক্রমশ বৃদ্ধিই ঋণের আসল ভার (Real burden) কমাইয়া দিতে পারে। ধীরে ধীরে, অদৃশ্য উপায়ে, ঋণদাতাদের চক্ষুর অন্তরালে ঋণের আসল ভার কমাইয়া আংশিকভাবে ঋণপরিশোধের কাজ করাও মৃদুবর্ধনশীল দামস্তরের ফল বলা চলে।

গ্রহণের পক্ষে যুক্তি-সমূহ

কিন্তু অনেকের মতে, শিল্পবাণিজ্যের উদ্যোক্তাদের এইরূপ কোন উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহাদের 'স্বাভাবিক' মুনাফা এবং পারিশ্রমিকই যথেষ্ট উৎসাহ দান করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত। (খ) তাহা ছাড়া এই বর্ধনশীল দামস্তর তাহাদের মধ্যে অযোগ্য ও নিরুৎসাহী উদ্যোক্তাদের বাঁচাইয়া রাখিবে, দামস্তর বাড়িতে থাকায় অযোগ্যের বিলুপ্ত ঘটিয়া সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে না। (গ) দাম বাড়িবে ইহা পূর্বেই জানা থাকিবে কাঁচামাল ও উপকরণের দামও পূর্ব হইতে বাড়িয়া যাইবে, ফলে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া শিল্পোৎসাহ কমাইয়া দিতেও পারে। (ঘ) দামস্তরে বৃদ্ধিতে মুনাফার বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু মজুরির

গ্রহণের বিপক্ষে যুক্তি সমূহ

হার সেই অনুপাতে কখনই বাড়ে না ; ফলে জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বিশেষ ভাবে কমিয়া যায়। (ঙ) সর্বোপরি, দামস্তরে মৃদুবৃদ্ধি বিনিয়োগের বাজারে ফাট্‌কা ব্যবসায়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে, সমগ্র শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা ও অতিরিক্ত মুনাফালোভিতার আবহাওয়া আনিয়া দিবে, ব্যবসায়-সংকটের পথ ক্রমশ প্রশস্ত করিবে। অস্বাভাবিক শিল্প সমৃদ্ধির মধ্যেই আগামী শিল্পসংকটের বীজ উপ্ত থাকে।

সিদ্ধান্ত

এতদ্‌সত্ত্বেও, অনেকে মনে করেন যে, যদি উপাদানের ব্যয় এবং ফাট্‌কা ব্যবসায় বন্ধ রাখা যায় তাহা হইলে এই নীতি গ্রহণ করা উচিত ; কারণ, বেকারি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ ও আয়স্তবে বৃদ্ধির জন্য দামস্তরে মৃদু বৃদ্ধি বিশেষ সাহায্য করিতে পারে।

(৩) মৃদু পতনশীল দামস্তর (A gently falling Price level):

গ্রহণের পক্ষে যুক্তি সমূহ

মৃদু পতনশীল দামস্তরের স্বপক্ষে বলা হয় যে, (ক) বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও উন্নত যন্ত্র-কৌশলের প্রয়োগের ফলে অর্থনৈতিক দিক হইতে সমগ্র সমাজের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদন ক্ষমতায় বৃদ্ধির হার অনুযায়ী দামস্তরও কমিয়া আসা উচিত, কারণ তাহা হইলেই জনসাধারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফল লাভ করিতে পারিবে। (খ) তাহা ছাড়া দামস্তর কমিতে থাকিলে শ্রমিক, বেতনভুক ব্যক্তিগণ ও নির্দিষ্ট আয়কারী ব্যক্তিগণ সকলেরই দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে আসল মজুরি বৃদ্ধি পায়, জীবন যাত্রার মান উন্নত হইয়া উঠে। (গ) সমাজের গড় উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও যদি দামস্তর না কমে তাহা হইলে মুনাফা বৃদ্ধি পায় (কারণ মজুরির হার বা অন্যান্য ব্যয় কখনই সেই হারে বাড়ে না) অর্থাৎ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফললাভ করে ব্যবসায়ী শ্রেণী ; জনসাধারণ সেই ফললাভে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। দামস্তরে বৃদ্ধি অবশেষে চরমতম স্তরে সমাজকে পৌঁছাইয়া ব্যবসায় সংকটের সৃষ্টি করে।

গ্রহণের বিপক্ষে যুক্তি সমূহ

এই আর্থিক নীতি গ্রহণের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে মৃদু পতনশীল দামস্তর শিল্পবাণিজ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া দেয় এবং দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আবহাওয়া বজায় রাখিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির বা অগ্রগতির হার পরিমাপের বহু বাস্তব অসুবিধা আছে, বিশেষত সেই অগ্রগতি ঘটিবার সময়েই উহা সঠিকভাবে পরিমাপ করা চলে না।

(৪) স্থির দামস্তর (Stable Price Level):

টাকা হইল দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড, ঋণ পরিশোধের মাপকাঠি এবং মূল্যের সঞ্চিত রূপ। এরূপ অবস্থায় উহার মূল্য স্থির থাকা সর্বদা বাঞ্ছনীয়, কারণ একমাত্র তাহা হইলেই সমাজে বহুপ্রকার অনিশ্চয়তা ও ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। (খ) দামস্তরে হঠাৎ উঠানামা বা বাণিজ্যচক্র জনসাধারণের সুষ্ঠু জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক। সমৃদ্ধির "অস্বাভাবিকতা" এবং সংকটের গভীরতা উভয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে দামস্তর স্থির রাখিতে হয়। (গ) তাহা ছাড়া, দামস্তরের বৃদ্ধি বা হ্রাস সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে . কাহারও উপকার করে বা কাহারও অপকার করে। সুতরাং দামস্তর স্থির রাখা সকলের স্বার্থরক্ষার পক্ষে একমাত্র ন্যায়সঙ্গত নীতি বলিয়া মনে হয়।

সুবিধাসমূহ

দামস্তর স্থির রাখার এই নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, (ক) ইহার ফলে শিল্প বাণিজ্য প্রসারের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ সৃষ্টি হয় না, সুতরাং ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। আরও বলা যায় যে, (খ) দামস্তর স্থির রাখার নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করা বিশেষ অসুবিধাজনক। কারণ দামস্তর বলিলে পাইকারী দামের স্তর না খুচরা দামের স্তর কি বোঝা যাইবে? তাহা ছাড়া সূচকসংখ্যা পরিমাপের সাহায্যে দামস্তর স্থির রাখা হইল; কিন্তু ধনীদের ব্যবহৃত বিলাস-দ্রব্যের দামে হ্রাস গরীবের ব্যবহৃত অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে বৃদ্ধি খণ্ডাইয়া দিতে পারে; এইরূপে জীবনযাত্রার মানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচকসংখ্যাতে ধরা না-ও পড়িতে পারে। (গ) বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনব্যয় হ্রাস পাইল, কিন্তু দামস্তর সমান থাকিলে জনসাধারণ সেই অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারিল না, শুধু ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধি হইল, এইরূপ ঘটিতে পারে। কেইন্‌স্ ইহাকে মুনাফা-স্ফীতি বলিয়াছেন। সুতরাং সর্বদা দামস্তর স্থির রাখাও সম্পূর্ণ সঠিক আর্থিক নীতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

অসুবিধা-সমূহ

(৫) অর্থের নিরপেক্ষতা রক্ষা করা (Neutral Money):

অধ্যাপক হায়েক এবং আরও কয়েকজন ধনবিজ্ঞানীর অভিমতে আর্থিক নীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার যাহাতে সমাজের আসল শক্তি সমূহের (Real forces) গতিবিধি প্রভাবিত না হয়। টাকা যেন পর্দার মত

কাজ করে, অর্থনৈতিক কাজকর্মকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করিতে না পারে ; নিষ্ক্রিয় বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কেবলমাত্র মূল্যের মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে। পণ্য-বিনিময় বা বার্টার প্রথায় সমাজে যেরূপ আসল শক্তিসমূহের দ্বারাই অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলিতে থাকে, টাকার উপস্থিতি যেন সেই আসল শক্তিসমূহের গতি প্রকৃতিকে মোটেই বিচলিত বা গতিভ্রষ্ট না করে। উৎপাদন-দক্ষতা, দ্রব্যোৎপাদনের আসল ব্যয়, ভোগকারীর পছন্দ প্রভৃতি অনার্থিক (**non-monetary**) শক্তিসমূহের দ্বারাই যেন দ্রব্যসমূহের দাম বা পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাত নির্দিষ্ট থাকে, টাকার পরিমাণের দ্বারা তাহারা যেন নির্ধারিত না হয়।

অর্থের নিরপেক্ষতা কাহাকে বলে

হায়েকের মতে বাস্তবে টাকার এই নিরপেক্ষতা বজায় রাখা চলে যদি সমাজে টাকার ও ঋণের "কার্যকরী যোগান" (**Effective supply**) স্থির রাখা যায়। সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন হইলে টাকার পরিমাণে পরিবর্তন করিতে হইবে, তাহা নহে ; দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন যেন টাকার পরিমাণকে আপনা-আপনি পরিবর্তন করায়। সমাজের মোট উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে দামস্তর যেন কমিয়া যায়, উৎপাদন-ক্ষমতা কমিয়া গেলে দামস্তর যেন বাড়িয়া যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে যেন টাকার পরিমাণ বাড়ে, জনসংখ্যা কমিয়া গেলে (যুদ্ধ বা মহামারী ইত্যাদির ফলে) টাকার পরিমাণ যেন কমে। টাকার প্রচলনবেগ বাড়িলে টাকার পরিমাণ কমাইতে হয়, প্রচলনবেগ কমিলে ইহার পরিমাণ বাড়াইতে হয়। শিল্প-কাঠামোতে পরিবর্তন হইলে, যেমন উৎপাদন-ধারা আরও বিভক্ত হইয়া গেলে, অর্থাৎ বিযোজন ঘটিলে (**Disintegration in the process of Production**) টাকার পরিমাণ বাড়ান দরকার।

কিরূপে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা চলে

এই নীতির বহুপ্রকার সুবিধা আছে সন্দেহ নাই। প্রথমত. উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি অনুযায়ী দামস্তরে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটান হইবে, সুতরাং দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক বিনিময়ের "আসল" অনুপাত বাহিরের প্রভাবে বিকৃত হইবে না। বাণিজ্য চক্রের সৃষ্টি হইবে না, দামস্তরে হঠাৎ উঠানামা হইয়া ব্যবসায়জগৎ বিধ্বস্ত করিবে না। দ্বিতীয়ত, যন্ত্রকৌশলে উন্নতির বা নূতনপ্রচলনের (**Innovation**) সহিত

এই নীতির সুবিধা-সমূহ

দামস্তর বা দ্রব্যবিনিময়ের পারস্পরিক অনুপাতে সামঞ্জস্য থাকিবে। তৃতীয়ত, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাগণ উপকৃত হইবে, শ্রমিকশ্রেণীও উৎপাদন ক্ষমতায় বৃদ্ধির ফল ভোগ করিতে পারিবে।

নীতি প্রয়োগের বাস্তব অসুবিধা

কিন্তু অর্থের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার এই আর্থিকনীতি বাস্তবে প্রয়োগ করার বিশেষ অসুবিধা আছে। শিল্প-কাঠামোতে বা যন্ত্রকৌশলে বা টাকার প্রচলনবেগে পরিবর্তনের হার সঠিক পরিমাপ করা এবং টাকার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইয়া উহাদের প্রভাব খণ্ডাইয়া দেওয়া কোন আর্থিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে সঠিকভাবে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, সমাজে একচেটিয়া বা আধা-একচেটিয়া ব্যবসায় সংগঠন থাকায় উৎপাদনক্ষমতায় পরিবর্তন বা ব্যয়ে পরিবর্তন দ্রব্যের দামে সমহারে পরিবর্তন আনিতে পারিবে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না।

তত্ত্বে গলদ

সর্বশেষে, ইহাও মনে রাখা দরকার, বর্তমান সমাজে টাকা হইল সক্রিয় শক্তি, ইহার পরিমাণে পরিবর্তন সুদের হারে বা মোট আয়ব্যয়ে পরিবর্তন আনিয়া দ্রব্যোৎপাদন ও কর্মসংস্থানে পরিবর্তন আনে। তরলসম্পত্তি (Liquid asset) হিসাবে ইহার আর কোন জুড়ি নাই, সুতরাং লোকে ইহা ব্যবহার করিলেই, সমাজে আসল সম্পত্তিসমূহের (Real assets) পরিমাণে ইহা প্রভাব বিস্তার করিবেই।

(৬) পূর্ণকর্মসংস্থান (Full Employment) :

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞান অনুযায়ী সমাজ সর্বদাই পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে আছে। কোন উপকরণ অনিয়োজিত অবস্থায় থাকিলে, উহার দাম কমাইলেই চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং উহার নিয়োগের পরিমাণ বাড়ে ; দেশে শ্রমিক বেকার থাকিলে মজুরির হার কমিয়া আপনা-আপনি এই বেকারি দূর হইয়া যায়।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে কেবলমাত্র মজুরির হার কমাইলেই পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে পৌঁছানো যায় না। কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে সমাজের মোট ব্যয়-পরিমাণের উপর। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উপর সমাজের মোট আয় ব্যয়িত না হইলে পূর্ণকর্মসংস্থানে পৌঁছান সম্ভব নহে। মোট ব্যয় দুই প্রকারের হইতে পারে ; ভোগদ্রব্য ক্রয় ও মূলধনী দ্রব্য ক্রয়। সমাজের সঞ্চয়প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়া ভোগ্যদ্রব্যের ক্রয় কমিলে

মোট চাহিদা সেই পরিমাণ কমিয়া যায় এবং এই সকল ভোগ্যদ্রব্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় কমে। দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় ও চাহিদা আরও কমে, এইরূপে উৎপাদন ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পায়। এমতাবস্থায় কর্মসংস্থানের পরিমাণ বজায় রাখিতে হইলে বা বাড়াইতে হইলে মূলধনীদ্রব্যের উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। সুতরাং দেখা যায়, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছিতে হইলে তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে; ভোগপ্রবণতা বাড়াইয়া সমাজে ভোগ-ব্যয় বাড়ান, ব্যক্তি উদ্যোগী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগে বৃদ্ধি। আর্থিক নীতির সাহায্যে কি ভাবে বিনিয়োগ-ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় বাড়ান যাইতে পারে ?

পূর্ণ কর্ম সংস্থানে পৌঁছিবার উপযোগী আর্থিক নীতিসমূহ

ব্যক্তি-উদ্যোগী বিনিয়োগ বাড়াইতে হইলে সুদের হার কমাইতে হয়, যাহাতে উদ্যোক্তাদের নিকট বিনিয়োগ লাভজনক বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুদের হার কমাইবার জন্য ব্যাঙ্কহার-পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় এবং টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য খোলাবাজারের কাজকর্ম প্রভৃতি নীতি গ্রহণ করা চলে। রাষ্ট্র উদ্যোগী বিনিয়োগ বাড়াইতে হইলেও টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হয়, কারণ তাহা হইলে সমাজে ব্যাঙ্কগুলির ঋণ দিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং কম সুদের হারে ঋণ পাওয়া সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, নূতন অর্থসৃষ্টি করিয়া, সেই টাকার সাহায্যে রাষ্ট্র-উদ্যোগী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ান চলে। সমাজের মোট ব্যয় বাড়াইতে হইলে কিস্তি-প্রথায় স্থায়ী ধরনের ভোগদ্রব্যের ক্রয় বাড়ান করা চলে, কিস্তির নিয়মকানুনে পরিবর্তন বা ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যাঙ্কঋণের বৃদ্ধি প্রভৃতি আর্থিক নীতির দ্বারা ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ান সম্ভবপর।

আর্থিকনীতির সীমাবদ্ধতা

অন্যান্য নীতির সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র আর্থিক নীতির দ্বারা পূর্ণকর্মস্থানে পৌঁছানো কি পরিমাণ সম্ভবপর তাহা সন্দেহজনক। দেশে আশাবাদী আবহাওয়া না থাকিলে টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া এবং সুদের হার কমাইয়া ব্যক্তি-উদ্যোগী বিনিয়োগ বাড়ান চলে না। এরূপ অবস্থায় শুধু আর্থিকনীতি ব্যর্থ হয়, তাই ইহারই সহিত প্রচুর পরিমাণে রাষ্ট্র-উদ্যোগী বিনিয়োগ-ব্যয় করিতে হয়; নিম্নতম ভোগব্যয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি বা নিম্নতম প্রাথমিক নগদ-জমার পরিমাণ (Minimum down Payments) কমাইলেই চলে না;

ইহারই সহিত পুনর্বণ্টনকারী কর-কাঠামো (Redistributive Tax-structure) প্রবর্তনও প্রয়োজন।

সুতরাং, অন্যপ্রকার নীতির সাহায্য ব্যতীত নিছক আর্থিক নীতির দ্বারা পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব নয়, বরং ইহাতে বিপরীত ফল হইতে পারে। যেমন সুলভ আর্থিক নীতির (Cheap money policy) ফলে সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং অসঙ্গত বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে।

৭। **অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি (Economic growth) :**

দামস্তর স্থির রাখা বা পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় রাখার তুলনায়, আধুনিক কালে বিশেষ করিয়া অনুন্নত দেশসমূহে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধি আর্থিক নীতির লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। আধুনিক কালে বিভিন্ন অনুন্নত দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংগঠন ও কার্যাবলী সংক্রান্ত নিয়মে স্পষ্টভাবে বলা হইতেছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির লক্ষ্য হইবে "জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত অগ্রগতি", "জাতীয় সম্পদ ও উপকরণের ক্রমোন্নতি", "দেশের ক্রমবৃদ্ধি" প্রভৃতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে যেরূপ পুরাতন লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণকর্মসংস্থান আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেইরূপ বর্তমানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগে পুরাতন ধরনের আর্থিক নীতি পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন প্রকার আর্থিক নীতি গ্রহণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিশেষত অনুন্নত দেশ সমূহে

মনে রাখা দরকার যে, লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণকর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি এক নহে, ইহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। পূর্ণ কর্মনিয়োগের লক্ষ্যে পৌঁছাইবার পথে যে সকল আর্থিক নীতিসমূহ গ্রহণ করা হয় তাহা অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এইরূপ হইতে পারে। অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির যে হার (the rate of economic growth) জাতির পক্ষে বজায় রাখা সম্ভব বা প্রয়োজনীয়; পূর্ণ কর্মসংস্থান লাভের পদ্ধতিসমূহের দ্বারা সেই হারে বৃদ্ধি না-ও আসিতে পারে। অন্য প্রকার পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন হইতে পারে। যেমন, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছাইবার উদ্দেশ্য ভোগ-ব্যয় (Consumption expenditure) বাড়াইবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিস্তিবন্দী ক্রয়ের (Instalment

পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি—এই দুই লক্ষ্যে বিরোধ থাকিতে পারে, দুই লক্ষ্যের উপযোগী আর্থিক নীতি পৃথক হইতে পারে

(purchases) সুবিধা করিয়া দিল। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য থাকিলে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে (Sector) বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়ত ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ কমাইতে হইবে। সুতরাং উভয় লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপযোগী পদ্ধতিসমূহের মধ্যে, অর্থাৎ সেই অনুযায়ী বিভিন্ন আর্থিক নীতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ দেখা দিতে পারে।

শুধু তাহাই নহে। দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় এই লক্ষ্যে বেশি বিরোধ দেখা যায় না বটে, কিন্তু কর্মনিয়োগ যতই বাড়িতে থাকে, তত উভয়ের মধ্যে গভীরতর সংঘাত সৃষ্টি হইতে পারে, কারণ তখনও ক্রমবৃদ্ধির হার পূর্বের ন্যায় অধিক রাখিলে মুদ্রাস্ফীতি ও সংকটের সম্ভাবনা বাড়িতে পারে।

অবশ্য উভয় লক্ষ্যের প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রধানত স্বল্পকালীন ধারণা এবং অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি দীর্ঘকালীন হিসাবের বিষয়।

দুই লক্ষ্যের প্রকৃতিতে কোথায় পার্থক্য

যন্ত্রকৌশল, উহার জ্ঞান ও উহার ব্যবহারের স্তর প্রভৃতি স্থির ধরিয়া সকল উপকরণের নিয়োগ পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য; কিন্তু ক্রমশ উন্নত ধরনের যন্ত্র কৌশলের (Technology) স্তর লাভ করিয়া, প্রত্যেক ধাপেই উপকরণের সফল ও পূর্ণ নিয়োগের দ্বারা তদানীন্তন উৎপাদন-ক্ষমতা ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য উপকরণ ও উৎপাদন-ক্ষমতা (Country's economic potential) ক্রমাগত বাড়াইয়া চলা অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য সাধনের জন্য কিরূপ আর্থিক নীতি গ্রহণ করা উচিত তাহা সাধারণভাবে স্থান, কাল, ক্রমবৃদ্ধির হার, প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাদি (Institutional arrangements) প্রভৃতির দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে।

অনুশীলনী

1. Examine the various objectives of Monetary policy. Which of them has become more important in modern times and why?

2. What are the objectives of Monetary policy? What objective in your opinion should be preferred?

3. How and how far full employment may be achieved through monetary policies?

৯

বেকারি ও পূর্ণনিয়োগ

Unemployment and Full Employment

কাজ করিতে সক্ষম ব্যক্তি যদি কাজ না করে, তাহা হইলেই তাহাকে বেকারি বা কর্মে অনিয়োগ বলা চলে না। অনেকে আছেন যাঁহারা নিজেরা ইচ্ছা করিয়া বেকার থাকেন, যেমন, ধনিকশ্রেণীর ব্যক্তিগণ, যাঁহাদের কাজ করিবার প্রয়োজন নাই; চোর ডাকাত প্রভৃতি। এবং কর্মে নিয়োগের অযোগ্য ব্যক্তিগণ যেমন বৃদ্ধ, শিশু বা রুগ্ন প্রভৃতি। এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত বেকারিকে বা ইহাদের কর্মে অনিয়োগকে বেকারি বলা চলে না। অনেকে আছেন যাঁহারা বর্তমান মজুরির হারকে নিজেদের প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয় বলিয়া মনে করেন, সঠিকভাবে বিচার করিলে তাঁহাদেরও বেকার বলা চলে না। তবে, কেহ যদি বর্তমান মজুরির হারে কাজ করিতে চাহিয়াও শ্রম বিক্রয় করিতে না পাবেন, তবেই তাঁহাকে বেকার গণ্য করা হইবে এবং এইরূপ অবস্থাকে বেকারি বা কর্মে অনিয়োগ বলা চলে। এইরূপ বেকারিকে **অনিচ্ছামূলক বেকারি** (Involuntary unemployment) বলে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে ইহা অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে গণ্য হয়। এইরূপ অনিচ্ছাকৃত বেকারি না থাকিলে সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান বা পূর্ণ কর্মনিয়োগ আছে, বলা চলে। ঐ অনিচ্ছাকৃত বেকারিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে এবং বিভিন্ন ধরণের বেকারির কারণে পার্থক্য থাকে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বেকারি ও তাহাদের কারণসমূহ নিম্নে বর্ণিত হইল।

স্বেচ্ছামূলক বেকারি ও অনিচ্ছামূলক বেকারি

(১) সমাজে **কাঠামোজনিত বা যন্ত্রজনিত বেকারি** (Structural and Technological) দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন উৎপাদন-সংগঠন, নূতন উৎপাদন—পদ্ধতি, মূলধন-প্রগাঢ় নূতন যন্ত্রের প্রচলন, নূতন দ্রব্যের আবিষ্কার, চাহিদায় বিপুল পরিবর্তন, এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে কারখানা বা উৎপাদন-কেন্দ্রকে সরান, পুরাতন বা

যন্ত্রজনিত বেকারি

প্রাচীন শিল্প লোপ পাওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সমাজের কর্মসংস্থান কমিয়া যাইতে পারে, বেকারি উদ্ভূত হইতে পারে।

মরসুমী বেকারি

(২) **মরসুমী বেকারি** (Seasonal unemployment) বহু কারণে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক শিল্পে বৎসরের কোন বিশেষ সময়ে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয় কিন্তু বৎসরের অন্য সময়ে তাহাদের কোন কাজ থাকে না (যেমন চিনির কারখানা, ধানকল, কৃষিকার্য, গৃহনির্মাণ শিল্প প্রভৃতি)। অনেক ক্ষেত্রে, বৎসরের যে কোন সময়ে হঠাৎ অধিক কাজ আসিয়া পড়ে এবং কিছুদিন পরে কাজের পরিমাণ কমিয়া যায় (যেমন বন্দর প্রভৃতি স্থানে)। বলা হয় যে, সকল কাজেরই বিশেষ ধরনের সময়-কাঠামো (Time-pattern) থাকে ; এই ধরনের বেকারিকে তাই কাল-কাঠামো জনিত বেকারি বা মরসুমী বেকারি বলা চলে।

বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারি

(৩) বাণিজ্যচক্রের সংকট কালে সমাজে সামগ্রিকভাবে আয়স্তর ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং সেই ধরনের বেকারিকে **বাণিজ্য-চক্রজনিত বেকারি** (Cyclical unemployment) বলা হয়। সংকটের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায় সমৃদ্ধি সুরু হইলে এই বেকারি কমিয়া যায়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। এই বেকারির কারণ হইল বাণিজ্যচক্র ; ইহাকে আজকাল প্রধানত কর্মসংস্থান-চক্র (Employment cycle) বলিয়া গণ্য করা হয়।

(৪) সমাজে স্বাভাবিক গতিশীলতার ফলে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত ব্যক্তিগণের বেকারিকে অনেকে **সংঘাতজনিত বেকারি** (Frictional unemployment) বলেন।

সংঘাত জনিত বেকারি

শ্রমিকের বাজারে শ্রম ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভাব থাকিলে, শ্রমিকের অচলনশীলতার ফলে, কাজকর্মের সুযোগ সুবিধা জানা না থাকিবার ফলে, উৎপাদনের পুনঃ-সংগঠনের ফলে, যন্ত্রপাতি ভাঙিয়া যাইবার ফলে, কাঁচা মালের সাময়িক অভাবের জন্য বা বৎসরের মধ্যে কিছু কাল কাজকর্ম চলিলে, বেকারি দেখা যায়। এই সকল কারণের জন্য উদ্ভূত বেকারিকে সংঘাতসৃষ্ট বেকারি (Frictional unemployment) বলে।

(৫) ইহা ব্যতীত দেশে **প্রচ্ছন্ন বেকারিও** (Disguised unemploy-

ment) থাকিতে পারে। বিভিন্ন কারণের ফলে (যেমন মূলধন কম থাকায়) শ্রমিক এমন কাজে নিযুক্ত থাকিতে পারে যে তাহার শ্রমশক্তি, নৈপুণ্য, কার্যের সময় প্রভৃতি পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহার ফলে তাহার আয়ও কম হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থাকে মিসেস্ রবিনসন্ প্রচ্ছন্ন বেকারি বলিয়াছেন (যেমন ভারতীয় কৃষকগণ বৎসরের কয়েকমাস কাজের অভাবে বেকার থাকেন)। এইরূপ প্রচ্ছন্ন-বেকার ব্যক্তিদের অন্য কোথাযও কর্মে নিযুক্ত হইবার সুযোগ নাই, তাই কম হইলেও, বাধ্য হইয়া সেই কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইতেছে (যেমন মাত্র 5 বিঘা জমি 3 ভাই মিলিয়া সারা বৎসর চাষ করে); এইরূপ অবস্থাকেও বেকারি বলা হয়। ইহার কারণ হইল উপযুক্ত পরিমাণ কর্মসংস্থান ব্যবস্থার বা সুযোগের অভাব অর্থাৎ অনমনীয় কর্মসংস্থান-কাঠামোর মধ্যে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি।

প্রচ্ছন্ন বেকারি

মনে রাখা দরকার, পশ্চিমী ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা আলোচিত বেকারি আর ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশের বেকারি সম্পূর্ণ এক জিনিস নহে। উন্নত দেশসমূহে কোন লোক গরীব কারণ সে বেকার ; আমাদের দেশে তাহার কাজ থাকিলেও সে গরীব. কারণ তাহার আয় কম, কাজ থাকা অবস্থাতেও সে আধা-বেকার। চাকুরি ও বেকারিতে পার্থক্যের সীমা-রেখা টানা এইরূপ দেশে বিশেষ কষ্টকর।

এই সকল বিভিন্ন কারণ ছাড়াও সমাজে **কার্যকরী চাহিদা কম থাকায় বেকারি** থাকিতে পারে। সমাজে বেকারির সাধারণ স্তর (General level of unemployment) নির্ভর করে সমাজের সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ কম থাকার উপর। শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার পরিমাণ এমন নহে যাহাতে সকল শ্রমিককে কাজে লাগান যায়। অর্থাৎ, শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে হইলে সমাজে যত পরিমাণ মোট ব্যয় হওয়া দরকার তাহা হইতেছে না, তাই শ্রমিকগণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে পারিতেছে না। এ ক্ষেত্রে বেকারির কারণ হইল সমাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কম। সমাজের মোট ব্যয়কে দুইভাগে বিভক্ত করা চলে : ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আয়বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের অনুপাত

অনিচ্ছাকৃত বেকারি

ক্রমাগত কমিয়া আসে, ফলে যদি বিনিয়োগ ব্যয় যথোপযুক্ত পরিমাণে বাড়ানো না যায়, তবে সমাজের সামগ্রিক চাহিদা কমিয়া যাইবে; যে পরিমাণ শ্রমিক কাজ পাইতে চায়, তাহার কিছু অংশ বেকার থাকিয়া যাইবে। আধুনিক কালে ধনতান্ত্রিক সমাজের অগ্রগতির এমন স্তর আসিয়াছে যখন বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা আর বিশেষ সম্ভব হইতেছে না, ভোগপ্রবণতাও আর বাড়িতেছে না—ফলে, স্থায়ী ও দুরারোগ্য বেকার সমস্যার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি (Automation) আবিষ্কার ও প্রয়োগ সমাজের মোট কর্মসংস্থান, আয় ও ক্রয়ক্ষমতা কমাইয়া ভোগব্যয় যথেষ্ট কমাইয়া দিবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইহার ফলে বিভিন্নপ্রকার যন্ত্র উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের সম্ভাবনাও রহিত করিয়াছে। মূলধনের অতি-দীর্ঘকালীন জড়ত্ব (Secular Stagnation) আসিয়া গিয়াছে, সুতরাং বর্তমান-কালীন বেকারি এবং ভবিষ্যৎ-কালীন আরও বেকারির সম্ভাবনা—ইহাই শিল্পোন্নত দেশসমূহে আধুনিক কালে ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেছে।

যন্ত্রের স্বয়ংগতিত্ব ও মূলধনের অতি দীর্ঘকালীন জড়ত্বের ফলে ভবিষ্যতে বেকারি বৃদ্ধি সম্ভাবনা

বেকারির ফলাফল (Effects of unemployment)

দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, সমাজের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রসার করিতে হইলে দ্রুত মূলধন-গঠনের সহিত কম মজুরিতে শ্রমিক পাওয়াও দরকার। উৎপাদন বাড়াইতে গেলে এমন একদল শ্রমিক সমাজে থাকা প্রয়োজন যাহাদের দিয়া সহজে শ্রমশক্তি বিক্রয় করানো যায়, অর্থাৎ কম মজুরিতে সেই শ্রমিকদের নিয়োগ করা চলে। বেকারি থাকিলেই ইহা সম্ভব, 'শিল্পে নিয়োগযোগ্য মজুত সেনাবাহিনী' (Industrial Reserve Army) না থাকিলে শিল্প বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার সম্ভব নহে। অর্থনৈতিক প্রগতি ত্বরান্বিত করিবার জন্য ব্যয়স্বীকার বা ত্যাগ হিসাবেই এই বেকারিকে ধরা উচিত; ইহা বাণিজ্য বৃদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক, সুতরাং কল্যাণকর।

বেকারির সুফল

কিন্তু বেকারি থাকিলে দেশে জনসাধারণের একাংশ বিপুল দুঃখ দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে জীবন যাপন করে; জীবনধারণের উপযোগী নিম্নতম

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যবহারের সুযোগ তাহারা পায় না। ইহাদের কর্মে নিয়োগ করিলে আয়, ব্যয় ও দ্রব্য সামগ্রীর জন্য চাহিদা সবই বৃদ্ধি পাইবে, দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইবে; ইহাদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে। শ্রমশক্তিই সম্পদ সৃষ্টির প্রধান সক্রিয় উপাদান, ইহার অব্যবহার সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ কম রাখে, জাতির পক্ষে ইহাকে অপচয় ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। নিরন্তর বেকারির ফলে শ্রমিকের মন ভাঙিয়া যায়; আশাহীন, উৎসাহহীন অবস্থায় তাহার দিন কাটে; বর্তমানের অভাব ও ভবিষ্যৎএর অনিশ্চয়তা তাহার মনোবল সম্পূর্ণ ভাঙিয়া দেয়। ইহার ফলে, সমাজের আইন শৃংখলার উপর সে আস্থা হারাইয়া ফেলে, তথাকথিত "সমাজ-বিরোধী" কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়া পড়ে; দারিদ্র্য দূর করার "সহিংস" পথে চলিতে পারে। বলা হয় যে, ইহাই জার্মানী ইটালী প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের কারণ।

বেকারির কুফল

বেকারি দূর হওয়া বা পূর্ণ কর্মসংস্থানের সুফল অনেক। ব্যক্তিগত অর্থ-নৈতিক নিরাপত্তা বজায় থাকে, অভাব দূর হয়। অভাব মোচন ও নিরাপত্তার ফলে সমাজের ও সভ্যতার অগ্রগতি বা প্রগতি সম্ভবপর হয়। মানুষ নিজের যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের পুরস্কার পাইয়া নিজেকে প্রকৃত মানুষ বলিয়া মনে করে, নিজের ও অপরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা গড়িয়া ওঠে। সমাজে পরশ্রমজীবির সংখ্যা কমিয়া যায়। গণতন্ত্রের প্রসার ঘটে, মোহ ও অন্ধতার পরিবর্তে যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করে।

পূর্ণ কর্মসংস্থানের সুফল

বেকারি দূরীকরণের উপায় (Remedies of Unemployment)

বিভিন্ন ধরনের বেকারি দূর করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। যেমন, কাঠামোজনিত বা যন্ত্রজনিত বেকারি দূর করার জন্য কর্মবিনিময় কেন্দ্র (Employment Exchanges) স্থাপনের উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরি সম্বন্ধে শ্রমিকদের সংবাদ দেওয়া। সাময়িকভাবে (casual) নিযুক্ত শ্রমিকদের স্থায়ী চাকুরির ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষা বিস্তার, যাতায়াতের ব্যয় কমানো বা যাতায়াতের বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়া শ্রমিকের চলনশীলতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা দরকার।

মরশুমী বেকারি (Seasonal Unemployment) দূর করার জন্য শিল্পের সংগঠনে পরিবর্তন প্রয়োজন, যাহাতে এক শিল্পে শ্রমিকের কার্যকাল শেষ

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য শিল্পের কাজ সুরু হইতে পারে। কৃষকদের জন্য অন্যান্য কুটির শিল্পের বন্দোবস্ত করা দরকার ; ইহার ফলে বৎসরের কোন সময়ে তাহাদের অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না ; আয় বৃদ্ধি হইবে, দেশে প্রচ্ছন্ন বেকারির পরিমাণ কমিবে। শিল্প প্রসারের গতিবৃদ্ধি করিয়া বিভিন্ন প্রকার কর্মনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইলেও এই বেকারি কমিতে পারে।

বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারি দূর করার উপায় হইল বাণিজ্য চক্র রোধ করা। আর্থিক পদ্ধতি, কর-সম্পর্কীয় বিভিন্ন পদ্ধতি এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা এইরূপ বেকারি দূর করা যায়।

সামগ্রিকভাবে বেকারির স্তর কিভাবে কমান যায়, তাহার সম্বন্ধে দুই প্রকার তত্ত্ব প্রচলিত আছে। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, মজুরির হার কমাইলেই শ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে এবং বেকারি দূর হইবে। কেইন্‌সের মতে, বেকারি দূর করার উপায় দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। আর্থিক পদ্ধতিসমূহের দ্বারা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান, কর সম্পর্কীয় পদ্ধতিসমূহের দ্বারা ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান, এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা সমাজে অধিক আয় সৃষ্টি করা—এই সকল পদ্ধতি দ্বারা পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে বেকারি দূর করা সম্ভব।

মজুরির হার ও বেকারি (Wages and Unemployment)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে শ্রমিকের যোগান, চাহিদা ও দামের উপর। তাঁহাদের মতে শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে দেশে আসল মজুরির হারের উপর (**supply of labour is a function of the rate of real wages**)। শ্রমিকেরা শ্রমের যোগান দেয় কিছু পরিমাণ খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতি পাইবার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট আসল মজুরি পাইলে তবেই শ্রমের যোগান হয়। আবার বিশেষ কোন একটি ফার্মে শ্রমিকের জন্য চাহিদা হয় উৎপাদন-পরিমাণের সেই স্তরে, যেখানে আসল মজুরির হার শ্রমিকের প্রান্তিক নীট উৎপাদনের সমান। সমাজে নির্দিষ্ট আসল মজুরির হারে সকল ফার্ম মিলিয়া মোট যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করে, তাহাই শ্রমিকের চাহিদা। এইরূপে, দেশে আসল মজুরির হার শ্রমের চাহিদা ও যোগান উভয় দিকের মধ্যে সমতা সাধন করে।

আসল মজুরির ভারসাম্য হার

যদি কখনও বেকারি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, দেশে শ্রমের বাজারে ভারসাম্য নাই। এই অবস্থা দূর করার উপায় হইল শ্রমিকদের কম হারে আসল মজুরি লইতে রাজি করান। কম আসল মজুরির হারে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, বেকার শ্রমিকের চাকুরি জুটে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। জিনিষপত্রের দাম কমান যায় না, কারণ মুনাফা কমিলে উৎপাদন কম হইবে, শ্রমিকের চাহিদাও হ্রাস পাইবে। সুতরাং আসল মজুরি কমাইবার উপায় হইল আর্থিক মজুরি হ্রাস করা। আর্থিক মজুরি কমাইয়া দিলে দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয় কমে, উহার দাম কমে, চাহিদা বাড়ে, বেশি শ্রমিকের দরকার হয়। ইহাই ক্লাসিকাল বেকারির তত্ত্ব।

বেকারি থাকিলে আর্থিক মজুরি কমাও

উপরের এইরূপ আলোচনা কেইন্‌স্ মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে, আসল মজুরির উপর শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে, এই কথা বাস্তবে সত্য নয়। ইহা সত্য হইলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে, জিনিসপত্রের দাম অল্প একটু বৃদ্ধি পাইলেই (অর্থাৎ আসল মজুরি হ্রাস পাইলে) শ্রমিকেরা কাজ ছাড়িয়া দিত। কিন্তু তাহা ঘটে না। বরং আমরা দেখিতে পাই যে, আর্থিক মজুরির হার কমাইতে গেলে তাহারা তীব্রভাবে বাধা দেয়। তাই কেইন্‌স্ বলিয়াছেন যে, শ্রমের যোগান আসল আয়ের উপর নির্ভর করে না; ইহা আর্থিক মজুরির উপর নির্ভরশীল। আর্থিক মজুরি বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকের যোগান রেখা উপরে উঠে, কিন্তু এই রেখা নিচের দিকে অনমনীয় (rigid downwards)। * ইহার কারণ হিসাবে কেইন্‌স্ বলেন যে, আধুনিককালের সমাজে শুধু শ্রমিকদের মধ্যে কেন, সর্বসাধারণের মধ্যেই, টাকা সম্পর্কে এক ধরনের ভ্রান্তি বা মোহ আছে (Money illusion)। সকলেরই মনে হয়, যেন দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে একটি টাকার মূল্য সকল সময় সমানই থাকে। আমরা ধরিয়া লই যে, একটি টাকা সব সময় একটি টাকারই সমান, ফিসারের ভাষায় বলা চলে, "আমরা লক্ষ্য করি না যে, ডলার বা টাকার যে কোন ইউনিটের মূল্য বাড়ে ও কমে, প্রসারিত হয় ও সংকুচিত হয়"। †

আর্থিক মজুরি কমান যায় কি না

ইহার অসুবিধা—টাকার ছলনা

---

* তাহা ছাড়া কেইনসের মতে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে এমন কোন পথ নাই যাহাতে তাহারা সংঘবদ্ধ ভাবে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে সমাজের অবস্থানুযায়ী প্রয়োজনমত আসল মজুরি কমাইবার জন্য উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে পারে।

† 'A failure to perceive that the dollar or any other unit of money expands or shrinks in value.'

এই কারণেই, কেইন্‌সের মতে, যদি দেশে মজুরির হার কমাইয়া দেশের সামগ্রিক বেকারি (general unemployment) কমাইতে হয়, তবে আর্থিক মজুরি সমান রাখিয়া, আসল মজুরির হার কমান বাঞ্ছনীয়। জিনিসপত্রের দাম বাড়াইলে আসল মজুরি কমে, সুতরাং সেই পথে অগ্রসর হইলে দেশে বেকারি হ্রাস পাইয়া কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। কেইন্‌সের ভাষায় বলা যায় 'শ্রমিকেরা সাধারণত আর্থিক মজুরি হ্রাস করাকে বাধা দেয়, কিন্তু জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িলেই তাহারা চাকুরি ছাড়িয়া দেয় না।'* এইরূপ 'টাকার ভ্রান্তির' (Money illusion) আরও কারণ আছে। শ্রমিকেরা নিশ্চয় বোঝে যে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িলে তাহাদের আসল আয় কমে, তবুও তাহারা মনে করে উহা সামগ্রিক ব্যাপার, অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদেরও একই অবস্থা। অন্যান্যদের সঙ্গে তুলনায় নিজেদের অবস্থাতে কোনরূপ পরিবর্তন আসিল না, তাই তাহারা ইহাতে ততটা তীব্র আপত্তি করে না। তাহারা ইহাও জানে যে, বিশেষ কোন শিল্পে আর্থিক মজুরি কমাইলে ধর্মঘট, আন্দোলন প্রভৃতির সাহায্যে উহা ঠেকান যায়, কারণ সেখানে স্পষ্টভাবে মালিকপক্ষই প্রধান বিরোধী শক্তি। কিন্তু আসল মজুরি হ্রাস পাইলে এইরূপ কোন প্রত্যক্ষ বিরোধীপক্ষ পাওয়া যায় না, শ্রমিকেরা মনে করে যে, উহা সামগ্রিক ভাবে অর্থ নৈতিক নিয়মের কার্যকারিতার ফল।

তাই কেইন্‌স বলেন দাম বাড়াইয়া আসল মজুরি কমাও

তাহা ছাড়া, আর্থিক মজুরি হ্রাস করিলে বেকারি কমিবে, এই ধারণা একান্তই আংশিক ভারসাম্যের বিশ্লেষণ। চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি থাকিলে দাম কমে এবং এই নূতন কম দামে চাহিদা বাড়িয়া যোগানের সঙ্গে সমান হইয়া পড়ে, এইরূপ বিশ্লেষণ পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের বাজারে সম্ভবপর। কিন্তু সামগ্রিক বা সমষ্টিগত দৃষ্টিতে ইহা সঠিক হইতে পারে না। যাঁহারা এইরূপ পথ অবলম্বনের কথা বলেন, তাঁহারা কার্যকরী চাহিদার উপর দেশের সামগ্রিক মজুরি-হ্রাসের কি প্রভাব পড়িতে পারে, সেই কথা চিন্তা করেন না। দেশের সকল শিল্পে একসঙ্গে মজুরি হ্রাস করিলে লোকের হাতে ক্রয়শক্তি হ্রাস পাওয়ায় সকল দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা কমিয়া গেল, জিনিসপত্র অবিক্রীত

সকলে একত্রে আর্থিক মজুরি কমাইলে প্রত্যেকেরই সংকট দেখা দিবে

* "Whilst workers will usually resist a reduction of money wages, it is not their practice to withdraw their labour whenever there is a rise in the price of wage-goods." Keynes, *General Theory*. P. 9.

রহিয়া গেল, সকল শিল্পেই কর্মনিয়োগ নিশ্চয় হ্রাস পাইবে। মজুরি হ্রাসের ফলে কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় আয় ও কর্মসংস্থান স্তর নিচুতে নামিয়া যাইবে।

সুতরাং দেখা গেল যে, মজুরি-হ্রাসের ফল কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব বিস্তার করে কার্যকরী চাহিদাকে প্রভাবিত করিয়া। কার্যকরী চাহিদা প্রভাবিত হয় তিনটি বিষয়ে পরিবর্তনের দ্বারা— ভোগপ্রবণতা, সুদের হার এবং মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা। মজুরি-হ্রাসের ফল এই সকল শক্তিগুলিকে কিরূপ প্রভাবিত করিবে আলোচনা করিলে তবেই বলা চলে ইহা কার্যকরী চাহিদার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপর কতটা ও কোন্‌দিকে প্রভাব বিস্তার করিবে।

কার্যকরী চাহিদার পরিবর্তনই আসল কথা

ইহাদের প্রথমটি আলোচনা করা যাউক। আর্থিক মজুরি কমাইলে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের ব্যয় কিছুটা কমিবে (কতটা কমিবে তাহা নির্ভর করে মোট উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে মোট মজুরির অনুপাত এবং যোগানের অবস্থার উপর); ফলে জিনিসপত্রের দাম কিছুটা কমিতে পারে। এই অবস্থায় যাহাদের আর্থিক আয় কমে নাই, সেই শ্রেণীর হাতে তুলনামূলকভাবে আসল আয় বেশি চলিয়া গেল। ব্যবসায়ী বা ধনিকশ্রেণীর হাতে দেশের আসল আয় যদি একটু বেশি যায়, তবে গড় ভোগপ্রবণতা হ্রাস পাইবে, কারণ ধনীব্যক্তিরা আয়ের বেশি অংশ ভোগ-ব্যয় করে না।

ভোগ প্রবণতা হ্রাস পাইবে

দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তারা যদি মনে করে যে, বর্তমানে আর্থিক মজুরি কমিলেও ভবিষ্যতে শীঘ্রই উহা বাড়িবে তবে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে এবং কর্মসংস্থান বাড়িয়া যাইবে। তাহা ছাড়া, ভবিষ্যতে মজুরি, ব্যয়, দাম সকল কিছু বাড়িবে, এইরূপ ধারণা প্রবল হওয়ায় লোকে এখনই বেশি জিনিষপত্র কিনিতে থাকিবে, ভোগপ্রবণতাও কিছুটা বাড়িতে পারে। অপর-পক্ষে, যদি আর্থিক মজুরির হ্রাস দেখিয়া উদ্যোক্তারা মনে করে ভবিষ্যতে ইহা আরও কমিবে, তবে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বর্তমানে বৃদ্ধি না পাওয়ারই সম্ভাবনা।

মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার উপর প্রভাব অনিশ্চিত

তৃতীয়ত, দেশে সাধারণ মজুরি-হ্রাসের ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য

অনেকের আয় কম হইবে, তাহারা লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে হাতে কম টাকা রাখিবে। ইহাতে সুদের হার কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা, ফলে বিনিয়োগ বাড়িতে পারে। কিন্তু সুদের হার কমাইবার জন্য 'নমনীয় আর্থিক নীতি' গ্রহণ করাই ভাল, এইরূপ 'নমনীয় মজুরি নীতি' গ্রহণ করা উচিত নয়। ইহার তিনটি কারণ আছে। (ক) শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপুল অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। (খ) সামাজিক ন্যায়বিচারের দিকে তাকাইয়া ইহা বলা চলে যে, মজুরি হ্রাস করা উচিত নয়। কারণ ইহাতে তুলনামূলক ভাবে অপরাপর শ্রেণীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মানে ব্যবধান ও বৈষম্য আরও বাড়াইয়া তুলিবে। (গ) সুদের হার কমিলে, পূর্বের সরকারী ঋণগুলির ভার (burden of public debt) বৃদ্ধি পায়, ইহা আমরা জানি। মজুরি-হ্রাস করিয়া দেশের অধিকাংশ লোকের আয় কমাইয়া তাহাদেরই উপর হইতে কর আদায় করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করা সুবিবেচনার কাজ বলা চলে না। টাকার যোগান বৃদ্ধির নীতি ইহার তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য, কারণ তাহাতে জনসাধারণের উপর চাপ কম পড়িবার সম্ভাবনা।

সুদের হার কমাইলেও এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়

পূর্ণ কর্মসংস্থান (Full Employment) :

আধুনিক কালে প্রায় সকল রাষ্ট্রেরই অর্থনৈতিক লক্ষ্য হইল বেকারি দূর করা এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সমগ্র পৃথিবীতে শিল্পোন্নত সকল দেশেই অর্থনৈতিক সংকট ও বেকারি দেখা দিয়াছিল, ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব এই সংকটের কারণ ও উৎস খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে অগ্রসর হইয়াছে। "কল্যাণ রাষ্ট্রের" ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বেকারি দূর করিয়া সমাজকে পূর্ণসংস্থান স্তরে পৌঁছান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইতেছে।

পূর্ণ কর্মসংস্থান বলিলে দেশের আপামর সকল জনসাধারণের কর্মে নিযুক্ত থাকা বুঝায় না। স্বেচ্ছামূলক বেকারি; সংঘাতজনিত বেকারি; দেশের সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাজনিত বেকারি (স্ত্রীলোকদের চাকুরী সংক্রান্ত প্রথা প্রভৃতি); দেশের সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ম-কানুন জনিত বেকারি (দৈনিক শ্রমের সময়, চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের নিয়ম, নিম্নতম শিক্ষার বয়স প্রভৃতি); নিয়োগের অযোগ্যতাজনিত বেকারি (বৃদ্ধ, শিশু, রুগ্ন বা অসুস্থ প্রভৃতি)—এই সকল কারণে কিছু লোক সর্বদাই দেশে বেকার থাকিবে। পূর্ণ কর্মসংস্থান

পূর্ণ কর্মসংস্থান কাহাকে বলে

বলিলে বোঝা যায় যে, অনিচ্ছামূলক বেকারি নাই, প্রচলিত মজুরির হারে যাঁহারা কর্মে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা মোটামুটি ভাবে সকলই কর্মে নিযুক্ত আছেন।*

উনবিংশ শতাব্দীর ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞান মোটামুটি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, সমাজে সর্বদাই পূর্ণ কর্মসংস্থান রহিয়াছে। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে আপনা আপনি পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধনবিজ্ঞানী শ্যে (Say) বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী যোগান নিজেই নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে; শ্রমিকের যোগান বাড়িলে মজুরির হার কমিয়া শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবেই। তাঁহাদের মতে বেকারি তখনই থাকা সম্ভব যদি শ্রমিক তাহার উৎপাদন ক্ষমতা বা বাজারে প্রচলিত মজুরির হার হইতে বেশি মজুরি দাবি করে। একচেটিয়ামূলক শ্রমিক সংঘের চাপে মজুরি হার অধিক থাকিলে, তাই বেকারি অধিক হইবার সম্ভাবনা।

ক্লাসিকাল ধারণা

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণের, বিশেষ করিয়া কেইন্‌স্‌ ও তাঁহার অনুগামীগণের মতে, সমাজ সাধারণত পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে সর্বদা অবস্থান করে না; বা এই ধরনের সময় ছাড়া সকল দেশেই অনিচ্ছামূলক বেকারি আছে, সকল দেশই অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে রহিয়াছে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে পৌঁছান এবং সেই স্তরে ইহাকে রক্ষা করা – ইহাই রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক নীতির লক্ষ্য।

আধুনিক ধারণা

কি কারণে সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থানের ভারসাম্যাবস্থায় (**Full Employment Equilibrium**) নাই; পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তর হইতে বিচ্যুতির (**Lapses from Full Employment**) কারণ কি? ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানের যুক্তি হইল যে, শ্রমিকগণ কর্তৃক কৃত্রিমভাবে বাড়াইয়া রাখা মজুরির স্তর-ই ইহার কারণ। আধুনিক ধনবিজ্ঞান তাহা স্বীকার করে না। কেইন্‌সের মতে ইহার কারণ হইল, সমাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণ এত বেশি নহে যাহাতে সকল শ্রমিককে কর্মে নিযুক্ত রাখা

পূর্ণ কর্মসংস্থান হইতে বিচ্যুতির কারণ

* পূর্ণ কর্মসংস্থান লক্ষ্যের মধ্যে নিছক পরিমাণগত ভাবে কর্মনিয়োগের আদর্শ আছে তাহা নহে, জীবন যাত্রার মান উন্নত করা, বর্ধিত আয়স্তরে স্বাধীন সুখী জীবন নিরাপত্তার সহিত যাপন করার ধারণাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন কালের দাস-সমাজেও পূর্ণকর্মসংস্থান ছিল; আধুনিক কালের ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রেও অপ্রচুর পারিশ্রমিকে পূর্ণ কর্মনিয়োগ দেখা গিয়াছে। অভাব ও উপবাস হইতে মুক্তি, ভবিষ্যতের গভীর অনিশ্চয়তা হইতে মুক্তি নিজের ঝোঁক অনুযায়ী যোগ্যতা ও দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা পাওয়া—এই সকল মিলিয়া পূর্ণ কর্মসংস্থানকে নিছক অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হইতে উন্নততর এক সামাজিক আদর্শে পরিণত করিয়াছে।

যায়। দেশের কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ কম, তাই শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণও কম। এই কার্যকরী চাহিদা নির্ভর করে সমাজে মোট ব্যয়ের উপর। সমাজের মোট ব্যয়কে দুই ভাবে ভাগ করা চলে, ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়। সমাজের ও আয়স্তরের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় না, সুতরাং যদি বিনিয়োগ-ব্যয় বৃদ্ধি করা না হয়, তবে সমাজের মোট আয়, ব্যয় এবং কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাইবে।

পূর্ণ কর্ম সংস্থানে পৌঁছিবার তিনটি পথ

কি ভাবে সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌঁছিতে পারে? শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়াইতে পারিলে তাহাদের কর্মনিয়োগ বাড়িবে। ইহার জন্য সমাজে মোট ব্যয় বাড়াইতে হইবে, অর্থাৎ ভোগ্য দ্রব্যের দরুণ ব্যয় এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যয়, এই উভয় প্রকার ব্যয়ের পরিমাণই বাড়ান দরকার। সমাজে বিনিয়োগ করে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাগণ এবং সরকার। সুতরাং, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছিবার তিনটি পথ: ভোগব্যয় বাড়ানো, ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ানো, এবং সরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়ানো।

ভোগব্যয় বৃদ্ধির উপায় সমূহ

ভোগ-দ্রব্যের উপর ব্যয় বাড়াইবার প্রধান উপায় হইল কম ভোগ প্রবণতা-সম্পন্ন ধনী শ্রেণীর উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপ করিয়া বা প্রত্যক্ষ করসমূহের হার বৃদ্ধি করিয়া রাজস্ব বাড়াইয়া বেকার ভাতা, সামাজিক বীমা, অসুস্থতার বীমা, বার্ধক্যে পেনসন প্রভৃতির মাধ্যমে সেই অর্থ গরীব শ্রেণীর হাতে তুলিয়া দেওয়া—কারণ তাহাদের ভোগপ্রবণতা বেশি। একই সঙ্গে, এই উদ্দেশ্যে, পরোক্ষহারের পরিমাণ ও হার কমাইয়া দিলে ভোগব্যয় বাড়িয়া যাইতে পারে। এই পদ্ধতি গ্রহণের সময়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে প্রত্যক্ষ করের হার বাড়াইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমে কি না। তাই প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি করিয়া আয়ের পুনর্বণ্টন করিবার সময়ে যাহাতে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের উৎসাহ ও প্রেরণা না কমে এইজন্য বিশেষ ধরনের সুবিধা দেওয়ার বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে, যেমন ব্যবসায়-লব্ধ আয় পুনর্বিনিয়োগ হইলে কর দিতে হইবে না, অথবা করের হার কম হইবে, মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে আয়ের অধিক অংশ জমা রাখিতে পারিবে।

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপায়সমূহ

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-বৃদ্ধির প্রধান পদ্ধতি হইল সুদের হার কমাইয়া রাখা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে, আয়কর বা অন্যান্য প্রত্যক্ষ কর হইতে উদ্যোক্তাদের কিছুটা রেহাই দেওয়া। কিন্তু এই পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অসুবিধা হইল ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীরা এরূপ নিরুৎসাহী অবস্থায় থাকিতে পারে যে, কম সুদের হার বা

কম আয়করের হার কিছুতেই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধিতে তাহাদের উৎসাহিত করিতেছে না।

সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপায়সমূহ

সুতরাং, প্রধান পদ্ধতি হইল সরকারী ব্যয় বাড়ান। রাষ্ট্র বা জনপ্রতিষ্ঠান-সমূহ যদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অর্থাৎ রাস্তা ঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করে তাহা হইলে সমাজের মোট বিনিয়োগব্যয় বৃদ্ধি হইবে, কর্মসংস্থানও বাড়িয়া যাইবে। সরকারী বিনিয়োগের বৃদ্ধি যাহাতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পরিমাণ সংকুচিত করিতে না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সরকার দুই উপায়ে টাকা সংগ্রহ করিতে পারে: (ক) কর বৃদ্ধি এবং (খ) ঋণবৃদ্ধি। প্রত্যক্ষকরের যতখানি বৃদ্ধি ব্যক্তিগতকে বিনিয়োগ নিরুৎসাহ করিবে না সেই পরিমাণ টাকা করবৃদ্ধি দ্বারা উঠানো হইবে; আরও অধিক টাকার প্রয়োজনে সরকার ঋণ করিবে। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ করিলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের জন্য অর্থ কমিয়া যাইবে, ভোগব্যয়ও কিছুটা সংকুচিত হইতে চাহিবে। সুতরাং তাহা না করিয়া রাষ্ট্র প্রধানত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে নূতন টাকা সৃষ্টি করিয়া (Deficit Financing) বাজেট-ঘাট্তি পদ্ধতির দ্বারা সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া দিবে। নূতন টাকা সৃষ্টি করিয়া সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করাকে বিনা সুদে টাকা সংগ্রহের পদ্ধতি (Interest-free financing) বলে, কারণ এই টাকার জন্য রাষ্ট্রকে কোন সুদ দিতে হয় না।

ঘাট্তি ব্যয়

ঘাট্তি ব্যয় পদ্ধতির আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

ঘাট্তি ব্যয়ের দ্বারা টাকা সংগ্রহ করিয়া বিনিয়োগ করিলে যাহাতে দ্রুত কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে, এই জন্য, (ক) শ্রমিকের চলন-শীলতা বাড়াইতে হইবে, ইহাতে শ্রমিকগণ দ্রুত কর্মে নিযুক্ত হইতে পারে (খ) নূতন শিল্পের স্থান নির্বাচন (Location) সঠিকভাবে করিতে হইবে। (গ) পরিকল্পিতরূপে সরকারী উন্নয়নমূলক নির্মাণ-কার্য (Public Works) সুরু করিতে হইবে।

ঘাট্তি ব্যয়ের নীতির বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য হইল, (ক) ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা প্রবল, কারণ কাযকরী চাহিদার বৃদ্ধি শ্রম ও উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করিতে পারে। অনুন্নত দেশসমূহে ঘাট্তিব্যয়ের বৃদ্ধি সমাজে অধিক আয় সৃষ্টি করিবে, কিন্তু মূলধনী দ্রব্যের অভাবের দরুণ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ানো যায় না. বলিয়া টাকার পরিমাণ বাড়াইলে দামস্তর বাড়াইয়া দিবে। সুতরাং সকল দেশেই শিল্পপ্রসারের প্রথম দিকে পূর্ণকর্মসংস্থান

অর্থ নৈতিক নীতি ও পরিকল্পনার লক্ষ্য হইতে পারে না। প্রথমে দ্রুত শিল্প-সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতে হইবে, মূলধনী দ্রব্যাদি প্রস্তুতের হার খুবই বাড়াইয়া দিতে হইবে, (যেমন ভারতের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা)। (খ) তাহা ছাড়া, ঘাটতি ব্যয়ের বৃদ্ধি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের মনে নিরুৎসাহ সঞ্চার করিতে পারে, তাহারা ভবিষ্যৎ করের ভয়ে মুদ্রাস্ফীতির ভয়ে বা সংকটের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িতে পারে, (গ) সরকারী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির বহু প্রকার বিপদ আছে, সুদ প্রদান, আসল পরিশোধ, বিশেষত ক্রমবর্ধমান ঋণ-ব্যবস্থার সঠিক পরিচালনা সকল বিষয়েই ইহা অনেক প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করে।

ঘাটতি ব্যয়ের অসুবিধা

অনুন্নত দেশ ও পূর্ণকর্মসংস্থান তত্ত্ব (Underdeveloped countries Full Employment Theory):

অনুন্নত দেশসমূহ প্রধানত কৃষি-প্রধান, মূলধনী সামগ্রীর পরিমাণ কম, যন্ত্র সম্পর্কীয় জ্ঞানের স্তর খুবই নিচুতে। দ্বিতীয়ত, মালিকের নিকট মজুরির বিনিময়ে চাকুরি করে এইরূপ শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম, অধিকাংশ জনসাধারণই স্বয়ং-নিযুক্ত, নিজেই নিজের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করে। তৃতীয়ত, জাতীয় উৎপন্নের একটি বিশেষ বড় অংশ বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয় না, উৎপাদকগণ নিজেরা ভোগের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন করে। এইরূপ অবস্থায় গুণকের নীতি উঃ ত দেশ-সমূহের ন্যায় সহজে কার্যকরী হয় না।

অনুন্নত দেশের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য

বিনিয়োগের বৃদ্ধি প্রথমে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ায়, তাহার পরবর্তী স্তরে সেই আয় ভোগব্যয়ের মারফৎ নূতন আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াইয়া দেয়। দ্বিতীয় স্তরের আয় পুনরায় ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয়িত হয় এবং এইভাবে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়িয়া প্রথম বারের-বর্ধিত আয় ও কর্মসংস্থান × গুণকের আয়তন—এই পর্যন্ত বাড়িবে। কিন্তু অনুন্নত দেশে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা পরবর্তী স্তরসমূহের ভোগব্যয় বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরবর্তী স্তরসমূহে উহাদের আরও বৃদ্ধির পথে বহু বাধা থাকে। যদিও এইরূপ দেশে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা থাকে খুব বেশি এবং তত্ত্বানুযায়ী গুণকের আয়তন খুবই বড় হওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবে তাহা হয় না। ইহার প্রধান কারণ হইল এইরূপ দেশে আয়-বৃদ্ধি প্রধান ভোগ্যদ্রব্য হিসাবে খাদ্যশস্যের চাহিদা-ই প্রথমে বাড়ায়। কৃষি দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক আর অনুন্নত দেশগুলিতে প্রধানত প্রকৃতির খেয়ালেই

গুণক ও ত্বরক উভয়ই কেন কম হয়

কৃষির উৎপাদনে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। তাহা ছাড়া উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি না থাকায় ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতে পারে। আর কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বাড়িলে কৃষকের অলসতা বাড়িয়া যাওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাইতেও পারে।

খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে (কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন সমান থাকায়) দাম বাড়িবে এবং ফলে কৃষক শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীকে বেশি দাম দিয়া খাদ্যাদি ক্রয় করিতে হইবে ; কিন্তু কৃষকের সঞ্চয়-প্রবণতা বেশি থাকায়, অন্যান্য ক্ষেত্র (sector) আয় বৃদ্ধির সুবিধা পাইবে খুবই কম। কৃষকেরা শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিলেও শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো এইরূপ দেশে সহজ নহে, তাই আয় বৃদ্ধি হইলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান না বাড়িতেও পারে।

প্রচ্ছন্ন বেকারি (Disguised unemployment) থাকাতেও গুণক ও ত্বরকের প্রভাবের গতি ভিন্নরূপ দাঁড়ায়। অনিচ্ছাকৃত বেকারির বদলে প্রচ্ছন্ন বেকারি থাকায় বিনিয়োগে প্রাথমিক বৃদ্ধি প্রচ্ছন্ন বেকারদের আয় বাড়াইলে উহা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্তী স্তরের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়াইতে পারে না। তাহা ছাড়া এইরূপ চলতি মজুরির হারে অন্যত্র চাকুরি করিবার কোন প্রেরণা তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। দেশ এক ধরনের "তথাকথিত" পূর্ণ কর্মসংস্থান-এর স্তরে থাকে : বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রধানত, মুদ্রাস্ফীতি-ই ঘটায়।

অনুশীলনী

1. Discuss the principal types of unemployment in modern society and suggest some remedies for the mitigation of unemployment.

2. Analyse the different types of unemployment and what are their causes ?

3. How is the level of Employment determined in a country ?

4. What factors determine the volume of Employment in a country ?

5. What is full Employment ? What are the causes of lapses from Full Employment and how to achieve full employment in a free society ?

6. Discuss the implications of Keynesian theories in underdeveloped countries.

১০

আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ত্ব

Theory of Income and Employment

1930 সাল পর্যন্ত অধিকাংশ ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, দেশে সাধারণ বেকারি থাকিতে পারে না। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, সমাজে সর্বদা পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে। এই কারণেই 'ক্লাসিকাল' ধনবিজ্ঞানীরা কর্মসংস্থানের সাধারণ স্তর নির্ধারণকারী বিষয়গুলিকে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেন নাই। তাঁহাদের এই চিন্তা প্রকৃষ্টভাবে রূপ পাইয়াছিল 'বাজার সম্বন্ধীয় স্যে-র নিয়ম'-এর মধ্যে (**Say's Law of Markets**)। এই 'নিয়ম' হইতেই ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। স্যে বলিয়াছিলেন যে, 'যোগানই নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে' (**Supply creates its own demand**)। ইহার অর্থ হইল সমাজে সাধারণ উৎপাদনাধিক্য বা বাড়্‌তি উৎপাদন (**General over-production**) সম্ভব নয়। কোন একটি বিশেষ শিল্পদ্রব্যের জন্য চাহিদা হঠাৎ কম হইতে পারে, বা চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ও যোগান বেশি হইতে পারে, তাহা স্বীকার করিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই।

ক্লাসিকাল ধারণা: সামগ্রিক অধিকোৎপাদন সম্ভব নয়

কিন্তু সাধারণভাবে বা সামগ্রিকভাবে সকল দ্রব্য সামগ্রীর জন্য চাহিদা নাই বা উহাদের বাড়্‌তি উৎপাদন হইয়াছে ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? জেম্‌স্ মিল (**James Mill**) বলিয়াছেন 'উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই ভোগের প্রসার ঘটে' (**consumption is coextensive with production**); তাঁহার মতে 'চাহিদার একমাত্র কারণই হইল উৎপাদন, একই সময়ে এবং সমান পরিমাণ চাহিদা সৃষ্টি না করিয়া ইহা কখনও যোগানের ব্যবস্থা করে না';* 'বাৎসরিক উৎপন্নের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, ইহা বাৎসরিক চাহিদার পরিমাণকে কখনই ছাড়াইয়া যাইতে পারে না।'† রিকার্ডোও বলিয়াছেন,

---

* **'Production is the cause, and the sole cause of demand. It never furnishes supply without furnishing demand, both at the same time and both to an equal extent.'**

† **'Whatever the amount of annual produce it can never exced the amount of the annual demand.'**

"একটি জাতির দিক হইতে দেখিতে গেলে, যোগান কখনই চাহিদাকে ছাপাইয়া যাইতে পারে না'। ('in reference to a nation, supply can never exceed demand')।

1848 সালে প্রকাশিত জন স্টুয়ার্ট মিলের **Principles of Political Economy** গ্রন্থেও আমরা ইহা দেখিতে পাই। দেশের সমগ্র চাহিদা হঠাৎ কমিয়া গিয়া উৎপাদনের আধিক্য এবং বেকারি ঘটাইতে পারে। এই ধারণার বিরুদ্ধে মিল বহুপ্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, "লেনদেনের মাধ্যমের অভাবের দরুণ সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদার ঘাট্‌তি দেখা দিয়াছে, ইহা কি সম্ভব? যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা বিচার করেন নাই যে, দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেনের মাধ্যম কি লইয়া গঠিত হয়। এই মাধ্যম হইল দ্রব্যসামগ্রী। প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই অন্য ব্যক্তির উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য দাম দিবার মাধ্যম হইল তাহার নিজস্ব দ্রব্যসামগ্রী। সকল বিক্রেতা নিশ্চয়ই ক্রেতা, শব্দগত বা সংজ্ঞাগত দিক হইতেও ইহারা একই। যদি দেশটির উৎপাদন ক্ষমতা আমরা দ্বিগুণ করিতে চাই তবে সকল বাজারেই জিনিসপত্রের পরিমাণ আমাদের দ্বিগুণ করিয়া তুলিতে হইবে, অর্থাৎ ইহার ফলে একই সঙ্গে ক্রয় শক্তির পরিমাণও আমরা দ্বিগুণ করিয়া ফেলিতেছি। দ্বিগুণ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই দ্বিগুণ যোগান বাজারে লইয়া আসিবে; প্রত্যেকেই পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ কিনিতে পারিবে, কারণ বিনিময়ে দিবার মত প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ জিনিষপত্র আছে।……ইহা সম্পূর্ণ অকল্পনীয় যে, সকল দ্রব্যেরই মূল্য হ্রাস পাইয়াছে এবং ফলে সকল উৎপাদক উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক পাইতেছে না।"*

কেন তাহাদের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল

* "is it…possible that there should be a deficiency of demand for all commodities, for want of the means of payment? Those who think so cannot have considered what it is which constitutes the means of payment for commodities. It is simply commodies. Each person's means of paying for the productions of other people consists of those which he himself possesses. All sellers are inevitably and *ex vi termini* buyers. Could we suddenly double the productive powers of the country we should double the supply of commodities in every market, but we should by the same stroke double the purchasing power. Every one would bring or double demand as well as double supply: everybody would be able to buy twice as much because everybody would have twice as much to offer in exchange ….. It is a sheer absurdity that all things should fall in value and that all producers should, in consequence, be insufficiently remunerated."

—*Book III, Section 2, Chapter XIV.*

অবশ্য সেই যুগেও ক্লাসিকাল লেখকদের এই মতের বিরুদ্ধে কোন কোন ধনবিজ্ঞানী সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের আধিক্যের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ম্যালথাস্ রিকার্ডোকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, দেশে চাহিদা কম থাকার দরুণ বেকারি ঘটিতে পারে। কিন্তু তাঁহার এই মত তখন গৃহীত হয় নাই। কেইন্‌স্ বলিতেছেন, "রিকার্ডোর এই মতবাদ যে, দেশে কার্যকরী চাহিদার (Effective demand) ঘাট্‌তি হওয়া অসম্ভব, ইহাকে ম্যাল্‌থাস তীব্র ভাবে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। ইহার কারণ হইল ম্যাল্‌থাস্ স্পষ্টভাবে বুঝাইতে পারেন নাই কিরূপে ও কেন কার্যকরী চাহিদার ঘাট্‌তি বা বাড়্‌তি দেখা দেয়, ফলে তিনি বিকল্প কোন কাঠামো দাঁড় করাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন ; এবং পবিত্র খৃষ্টধর্ম যেমন স্পেন জয় করিয়াছিল, রিকার্ডোও তেমনি ইংলণ্ডে নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সহরের লোকজন, রাজনীতিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা সকলে তাঁহার মত কেবল মাত্র গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। বিরোধের অবসান হইল ; অপর দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল ; কোন আলোচনার মধ্যেও ইহা আর প্রবেশ করিল না। কার্যকরী চাহিদার এই গুরুত্বপূর্ণ জটিল ধাঁধাঁ, ম্যালথাস্ যাহা লইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র হইতে অবলুপ্ত হইয়া গেল।"*

ম্যালথাস ও রিকার্ডোর মধ্যে মতবিরোধ ছিল

সামগ্রিক যোগান ও সামগ্রিক চাহিদা (Aggregate Supply and Aggregate Demand)

কোন ফার্মের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে তাহা নির্ভর করে কতজন মজুর খাটাইলে ফার্মটি সর্বাধিক মুনাফা করিতে পারে। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে, একত্রভাবে বিচার করিলে সকল উদ্যোক্তার এইরূপ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ফলে সমষ্টিগত মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ পাওয়া যায়। যে প্রধান শক্তিগুলির কার্যকারিতার দরুণ দেশের মোট কর্মসংস্থানের

* "Malthus, indeed had vehemently opposed Ricardo's doctrine, that it was impossible for effective demand to be deficient ; but, vainly. For since Malthus was unable to explain clearly (apart from an appeal to the facts of common observation) how and why effective demand could be deficient or excessive, he failed to furnish an altenative construction ; and Ricardo conquered England as completely as the Holy Inquisition conquered Spain. Not only was his theory accepted by the City, by statesmen and by the academic world. But controversy ceased ; the other point of view completely disappeared ; it ceased to be discussed. The great puzzle of Effective Demand with which Malthus has wrestled vanished from economic literature." J. M. Keynes, *General theory*, P. 32.

পরিমাণ স্থির হয়, তাহাদের সামগ্রিক যোগান (aggregate supply) এবং সামগ্রিক চাহিদা (aggregate demand) বলে।

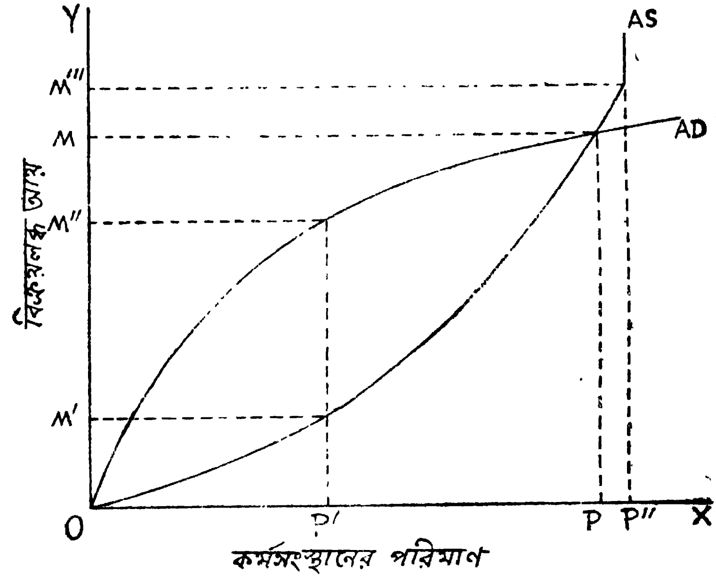
মনে কর, সমাজে কিছু সংখ্যক শ্রমিক কাজে নিযুক্ত আছে। এই পরিমাণ কর্মসংস্থান বজায় রাখিতে গেলে সকল উদ্যোক্তারা মিলিয়া জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া কমপক্ষে যে পরিমাণ টাকা নিশ্চয়ই পাইতে চান (must expect to receive), তাহাকে বলে সামগ্রিক যোগান দাম। অর্থাৎ, কিছুসংখ্যক শ্রমিক মিলিয়া মোট যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করেন, তাহার মোট ব্যয়কে সামগ্রিক যোগান দাম বলা চলে। যদি উদ্যোক্তারা মনে করেন যে, দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া এই খরচা তুলিয়া আনা যাইবে না তবে তাহারা কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমাইয়া দিবেন। অপরপক্ষে, সামগ্রিক চাহিদা দাম বলিলে বোঝা যায় কিছু-সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত থাকিলে সকল উদ্যোক্তারা মিলিয়া দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া যত পরিমাণ টাকা পাইবেন বলিয়া আশা করেন (really do expect)। কিছু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের স্তরে উদ্যোক্তাদের প্রত্যাশিত রেভিনিউর মোট পরিমাণকে তাই সামগ্রিক চাহিদা দাম বলা চলে।

সামগ্রিক যোগান দাম ও সামগ্রিক চাহিদা দাম কাহাকে বলে

বিভিন্ন পরিমাণ কর্মনিয়োগের স্তরের বিভিন্ন পরিমাণ সামগ্রিক যোগান দাম ও সামগ্রিক চাহিদা দাম থাকে; তাই কর্মনিয়োগের বিভিন্ন স্তরের সামগ্রিক যোগান দামের তালিকা ও সামগ্রিক চাহিদা দামের তালিকা (schedule) প্রস্তুত করা যায়। যদি উভয়ের মধ্যে সামগ্রিক চাহিদা দাম বেশি থাকে, অর্থাৎ উদ্যোক্তাগণ মিলিয়া যে পরিমাণ বিক্রয়লব্ধ টাকা নিশ্চয়ই পাইতে চাহেন সেই নিম্নতম প্রয়োজনীয় টাকার পরিমাণ অপেক্ষা যদি বিক্রয়লব্ধ টাকার পরিমাণ অধিক হইবে বলিয়া আশা করেন, তাহা হইলে সকল উদ্যোক্তারা মিলিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করিবে, ফলে কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিবে। অবশেষে যদি এমন এক অবস্থায় পৌঁছান যায় যখন সামগ্রিক চাহিদা দাম ও সামগ্রিক যোগান দাম সমান, তখন সেই কর্মনিয়োগের পরিমাণে হ্রাস বা বৃদ্ধির ঝোঁক থাকে না; কর্মসংস্থানের ভারসাম্য-স্তর (Equilibrium Level of Employment) স্থাপিত হয়। এই স্তরে সমাজের সকল অনিয়োগ বা বেকারি দূর হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ণ কর্ম-নিয়োগের স্তরে সমাজ উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে; অপূর্ণ কর্মসংস্থান-স্তরেও

যে পরিমাণ কর্মসংস্থান সমাজে উপস্থিত থাকিলে উভয়ে মিলিত হয়, তাহাই কর্মসংস্থানের ভারসাম্য স্তর

এইরূপ ভারসাম্য থাকা সম্ভব (underemployment equilibrium)। এইরূপ অবস্থায় এই কর্মসংস্থানের স্তরে ভারসাম্য স্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ উহার বাড়িবার বা কমিবার দিকে কোন ঝোঁক নাই। নিচের রেখাচিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে :



OX অক্ষে বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তর পরিমাপ করা হইতেছে এবং OY অক্ষে শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া বিভিন্ন পরিমাণ বিক্রয়লব্ধ আয় পরিমাপ করা হইতেছে। সামগ্রিক চাহিদা রেখা হইল AS এবং সামগ্রিক যোগান রেখা হইল AD. AS রেখা হইতে আমরা জানিতে পারি বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তরে সকল উদ্যোক্তারা মিলিয়া কিরূপ বিভিন্ন পরিমাণ টাকা নিশ্চয়ই পাইতে চান। যেমন, উদ্যোক্তারা যদি OP′ সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করেন তবে কমপক্ষে তাঁহাদের OM′ পরিমাণ টাকা পাইতেই হইবে, এই টাকা তাঁহারা নিশ্চয়ই পাইবেন বলিয়া মনে করেন। AD রেখা হইতে আমরা জানিতে পারি বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তরে সকল উদ্যোক্তারা মিলিয়া কিরূপ বিভিন্ন পরিমাণ টাকা পাইবেন বলিয়া আশা করেন। যেমন OP′ সংখ্যক শ্রমিক-নিয়োগের স্তরে তাঁহারা মনে করেন ঐ শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী

ইহাদের তালিকা এবং রেখার আকৃতি কিরূপ

বিক্রয় করিয়া OM″ পরিমাণ টাকা তাঁহারা পাইবেন। প্রত্যাশা বেশি বলিয়া তাঁহারা কর্মসংস্থান বাড়াইতে থাকেন। কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে AS রেখা প্রথমে ধীরে ধীরে বাড়ে, তাহার পর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, AD রেখা প্রথমে দ্রুত বাড়ে, পরে বৃদ্ধির গতি হ্রাস পায়।

সামগ্রিক যোগান দামের রেখা ও সামগ্রিক চাহিদা রেখা উভয়ে মিলিয়া দেশে কর্মসংস্থানের স্তর বা পরিমাণ স্থির করে। যতক্ষণ উদ্যোক্তাদের মনে প্রত্যাশিত আদায়ের পরিমাণ (AD) নিম্নতম প্রয়োজনীয় পরিমাণ (AS) হইতে বেশি, ততক্ষণ উদ্যোক্তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিবে। যতদূর পর্যন্ত AD রেখা AS রেখার উপরে ততক্ষণ কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। একমাত্র OP পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তরে পৌঁছিয়া উভয় রেখা মিলিত হইতেছে। আমরা তাই বলিতে পারি যে, সমাজে OP পরিমাণ কর্মসংস্থান আছে তাহার কারণ হইল ঐ স্তরেই AS রেখা ও AD রেখা মিলিত হইতেছে। AS রেখা ও AD রেখা কোন বিন্দুতে মিলিত হইবে তাহা নির্ভর করে সমাজের সকল ক্রেতারা মিলিয়া কত টাকা ব্যয় করিতে চান, অর্থাৎ তাহাদের মোট ব্যয়ের উপর। যদি তাহারা OM পরিমাণ মোট ব্যয় করিতে রাজি থাকে তবে OP পরিমাণ কর্মসংস্থান হইবে, ইহাই আমরা জানিতে পারি।

দেশে কর্মসংস্থানের স্তর নির্ভর করে এই দুই রেখার মিলনবিন্দুতে

সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগানের এই মিলনবিন্দুকে কার্যকরী-চাহিদার (Effective Demand) বিন্দু বলা হয়। কোন এক দেশে কর্মসংস্থানের স্তর এই বিন্দুতে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ এই পরিমাণ কার্যকরী চাহিদা থাকাতেই সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থান বজায় আছে। ঐ বিন্দুতে সামগ্রিক চাহিদা দাম, সামগ্রিক যোগান দাম এবং কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ সমান। যদি কার্যকরী চাহিদায় বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে কর্মনিয়োগের স্তর ঊর্ধ্বে উঠিবে, কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িবে; যদি কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যায়, তাহা হইলে কর্মনিয়োগের স্তর নামিয়া যাইবে, কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমিবে। প্রতি মুহূর্তে বা স্বল্পকালের মধ্যে কোন একটি দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ঠিক যে স্তরে আছে সেই স্তরেই সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান সেই সময়টুকুর মধ্যে ভারসাম্যে পৌঁছিয়াছে। ইহাদের ভারসাম্যের বিন্দুতে কার্যকরী চাহিদা পাওয়া যাইতেছে, আমরা তাই বলিতে পারি, এই কার্যকরী চাহিদা থাকার দরুণ-ই কর্মসংস্থান এই স্তরে আছে।

সেই বিন্দুতে কার্যকরী চাহিদা প্রকাশ পায়

আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে (Factors determining the level of Income and Employment)

জাতীয় আয়, জাতীয় ব্যয় ও কার্যকরী চাহিদা

কার্যকরী চাহিদা বলিলে টাকার হিসাবে, কোন বিশেষ স্তরে কর্মনিয়োগ-পরিমাণের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যকে বুঝা যায়। দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যই চারিটি উপাদানের আয়ে বিভক্ত হইয়া যায়; অথবা বলা চলে যে, চারিটি উপাদানের সকল প্রকার আয় যোগ দিয়াই দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য গঠিত হয়। সুতরাং কার্যকরী চাহিদা = মোট জাতীয় আয় = মোট দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য।*

সাধারণভাবে দ্রব্যসামগ্রীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, ভোগ্যদ্রব্য এবং বিনিয়োগ-দ্রব্য; সুতরাং কার্যকরী চাহিদা (বা মোট ব্যয়) হইল মোট ভোগ্যদ্রব্যে

* প্রথম পরিচ্ছেদে জাতীয় আয়ের পরিমাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, কোন দেশে বিনিময়যোগ্য সকল প্রকার সম্পূর্ণোৎপন্ন (Final Product) দ্রব্য সামগ্রীর মোট মূল্যকে মোট জাতীয় আয় বলা হয়। সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর বিক্রয়মূল্য হইতেই সকলের আয়, সুতরাং জাতীয় আয় আর সামগ্রিক চাহিদা সমান।

সামাগ্রিক চাহিদা (Aggregate Demand) চারি ধরনের বিষয় লইয়া গঠিত হয় (ক) ব্যক্তিগত ভোগ-ব্যয়, (খ) ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-ব্যয়, (গ) রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ-ব্যয় এবং (ঘ) বিদেশী দ্রব্যকার্যাদির উপর দেশীয় জনসাধারণের ব্যয় অপেক্ষা দেশীয় কার্যাদির উপর বিদেশী জনসাধারণের ব্যয়ে আধিক্য (বা ঘাট্তি)। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্য কার্যাদি বা মোট উৎপাদনের উপর আর্থিক ব্যয়ের স্রোতকেই আমরা সামগ্রিক চাহিদা বলিতে পারি।

সংখ্যাতত্ত্বানুযায়ী হিসাব করিলে দেখা যায়, এই সামগ্রিক চাহিদা এবং মোট জাতীয় উৎপন্ন (Gross National Product) একই বিষয়। ইহারা একই, কারণ কোন আর্থিক লেনদেনকে দুইদিকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখা চলে: আয় ও ব্যয়। বিক্রেতার যাহা আয়, ক্রেতার তাহাই ব্যয়: কম-ও নহে, বেশি-ও নহে। সুতরাং বলা যায়, মোট জাতীয় উৎপন্ন হইল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য বা চল্তি সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উপর মোট আর্থিক ব্যয়। যেমন, যদি কোন বৎসরে মোট সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য হয় ৫০০ কোটি টাকা, তাহা হইলে ইহা হইতে বুঝা যায় ওই সময়ের মধ্যে দেশের মোট ব্যয় হইল ৫০০ কোটি টাকা অথবা ওই সময়ের মধ্যে দেশের সামগ্রিক চাহিদা-ও ৫০০ কোটি টাকা।

মোট জাতীয় উৎপন্নকে বিভক্ত করিলে আমরা $Y = C + I$ এই কেইন্সীয় সূত্র পাইতে পারি। এখানে Y হইল মোট জাতীয় উৎপন্ন (বা মোট জাতীয় আয়); c হইল ভোগ এবং I হইল বিনিয়োগ। I-এর মধ্যে ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয় বা বৈদেশিক সকল প্রকার বিনিয়োগ নিহিত আছে।

ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয়ের সমষ্টি। আর মোট ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় =মোট ভোগ্যদ্রব্য হইতে বিক্রয়লব্ধ আয়; এবং মোট বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয় =মোট বিনিয়োগ দ্রব্য হইতে বিক্রয়লব্ধ আয়। সুতরাং,

কার্যকরী চাহিদা=মোট জাতীয় আয়=জাতীয় উৎপাদনের মোট মূল্য,

=ভোগদ্রব্যের উপর ব্যয়+বিনিয়োগ দ্রব্যের উপর ব্যয়,

=ভোগদ্রব্য হইতে বিক্রয় লব্ধ আয়+বিনিয়োগ দ্রব্য হইতে বিক্রয় লব্ধ আয়।

দেশে কার্যকরী চাহিদার উপর মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে; অর্থাৎ (ক) ভোগব্যয় এবং (খ) বিনিয়োগ ব্যয়, এই উভয় ব্যয়ের দ্বারা কর্ম-নিয়োগের পরিমাণ স্থির হয়। যদি ভোগব্যয় বা বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া মোট ব্যয় বা কার্যকরী চাহিদা বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে কর্মসংস্থান বাড়ে; যদি ভোগব্যয় বা বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস পাইয়া, মোট ব্যয় বা কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যায়, তাহা হইলে কর্মসংস্থান কমে। ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ ব্যয় কিসের উপর নির্ভরশীল? কোন্ কোন্ শক্তির দ্বারা ইহারা নির্ধারিত হয়?

ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়

(ক) সমাজে ভোগব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে মোট আয়ের কি অংশ ব্যক্তিরা মিলিয়া ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে, অর্থাৎ মোট আয় এবং সমাজের গড় ভোগ-

---

"সম্পূর্ণোৎপন্ন" কথার অর্থ হইল যে হিসাবের সময় আধা-উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর বা উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের দাম গ্রহণ করা হয় না, পাছে ডবল হিসাব হইয়া যায়। "মোট" কথাটিতে বোঝা যায় মূলধনী দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতির বাবদ কোন অর্থ পৃথক করিয়া হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইতেছে না। মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পূরণ বাবদ অর্থ মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়। এই নীট জাতীয় উৎপাদনের মোট বিক্রয় মূল্য হইতে বিক্রয়কর বা অন্যান্য ব্যবসায়-কর প্রভৃতি বাদ দিলে আমরা "জাতীয় আয়" পাইতে পারি। কারণ, সকল দ্রব্য সামগ্রীর মোট বিক্রয় মূল্য হইতে পরোক্ষ কর আদায় প্রভৃতির পরিমাণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সকল উৎপাদনের জন্য ব্যয় বা সকল উপাদানের আয় (খাজনা, মজুরি, সুদ এবং অবণ্টিত মুনাফা)।

সুতরাং বলিতে পারা যায়, স্থূল জাতীয় উৎপাদন—মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ=নীট জাতীয় উৎপাদন।

নীট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য—পরোক্ষকর=জাতীয় আয়। নীট জাতীয় আয়ের সাহায্যে দেশের আয়স্তর ও কর্মনিয়োগের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয় না; বিশ্লেষণের জন্য মোট জাতীয় উৎপাদন এবং মোট আয় ব্যবহার করা হয়; কারণ পরোক্ষ কর বা মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ যথাক্রমে রাষ্ট্র বা ফার্ম কর্তৃক ব্যয়িত হয়, এবং ফলে উহা দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা সৃষ্টি করে।

প্রবণতার উপর। আয়-বৃদ্ধি হইলে ভোগের পরিমাণ বাড়ে বটে, কিন্তু যে হারে আয়ে বৃদ্ধি হয়, ব্যক্তির ভোগের পরিমাণে সেই হারে বৃদ্ধি হয় না। আয়ের বৃদ্ধি ও ভোগের বৃদ্ধির অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বলে।

ভোগ-প্রবণতা নির্ভর করে প্রধানত আয়ের স্তরের উপর। তাহা ছাড়া, সমাজে জাতীয় আয় কি ভাবে বন্টিত থাকে তাহার দ্বারাও ভোগপ্রবণতা স্থির হয়। যদি জাতীয় আয়ের বেশি অংশ কমসংখ্যক ধনী-ব্যক্তির হাতে থাকে তাহা হইলে সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা কম; অপরপক্ষে যদি জাতীয় আয়ের বেশি অংশ অধিকসংখ্যক গরীব লোকের হাতে থাকে, তাহা হইলে সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা বেশি। সঞ্চয় ও ব্যয় সম্বন্ধে জনসাধারণের প্রচলন রীতি-নীতি, চিন্তা, ও অভ্যাস প্রভৃতি ভোগপ্রবণতার আয়তন নির্ণয় করে। ব্যক্তিদের হাতে সঞ্চিত তরল সম্পত্তির (Liquid Assets) পরিমাণের উপর ভোগপ্রবণতা নির্ভরশীল; কারণ অধিক পরিমাণ তরল সম্পত্তি (যেমন সরকারী ঋণপত্র, নগদ টাকা, বা সঞ্চয়ী আমানত প্রভৃতি) হাতে থাকিলে নিরাপত্তার মনোভাব বেশি হওয়ার জন্য এবং ভবিষ্যতে ইহা হইতে আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকায় বর্তমান-আয় হইতে সঞ্চয়ের ইচ্ছা কম থাকে অর্থাৎ ভোগপ্রবণতা বেশি থাকিতে পারে। কর-কাঠামোর উপরও ভোগপ্রবণতা কিছুটা নির্ভর করে, অর্থাৎ করসমূহের প্রকৃতি এবং হার উভয়ে ভোগপ্রবণতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘকালে ভোগপ্রবণতা নির্ধারণকারী এই সকল বিষয়সমূহে পরিবর্তন হইয়া সমাজের গড় ভোগপ্রবণতায় পরিবর্তন ঘটিলেও স্বল্পকালে ইহা মোটামুটি স্থায়ী বিষয়।

ভোগপ্রবণতা নির্ভর করে মোট আয়; আয়-বৈষম্যের হার, প্রচলিত অভ্যাস ও রীতি; সঞ্চিত তরল সম্পত্তির পরিমাণ, কর কাঠামো প্রভৃতি

স্বল্পকালে ইহা মোটামুটি স্থির

(খ) সমাজের মোট বিনিয়োগ-ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর: (১) মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা (Marginal Efficiency of Capital) ও (২) সুদের হার। এক ইউনিট মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করিয়া তাহা হইতে ব্যয়ের উর্ধ্বে যে নীট আয় হইবার সম্ভাবনা, অর্থাৎ নূতন মূলধনী দ্রব্যোৎপাদন হইতে সম্ভাব্য আয়ের হার—ইহাকে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বলা হয়। বাজারে প্রচলিত সুদের হার হইতে যদি সম্ভাব্য আয়ের হার বেশি হয়, তাহা হইলে সমাজে বিনিয়োগ-ব্যয় বৃদ্ধি হইবে; মূলধনের

বিনিয়োগ-ব্যয় নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও সুদের হারের উপর

প্রান্তিক কার্যকারিতা বা সম্ভাব্য আয়ের হার সুদের হার হইতে কম হইলে সমাজে বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়া যাইবে। এই উভয় বিষয় মিলিয়া স্থির করে বিনিয়োগ-প্রবণতা (**Propensity to Invest**)।

মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কিসের উপর নির্ভর করে

(১) মূলধনের প্রান্তিক-কার্যকারিতা বা বিনিয়োগ-প্রবণতা বহু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। (ক) যেমন, ভবিষ্যতে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে কি না। চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বাড়ে; চাহিদা হ্রাসের সম্ভাবনা থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কমে। (খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশি থাকে। (গ) সেই বিশেষ প্রকার মূলধনী দ্রব্যে বর্তমান উৎপাদন ও যোগানের পরিমাণের উপর ইহা অনেকটা নির্ভর করে, পরিমাণ বেশি হইলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কম, পরিমাণ কম হইলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বেশি। (ঘ) বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও নূতন যন্ত্র-প্রচলনের হার অধিক থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কম; এই হার কম থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বেশি। (ঙ) মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে বর্তমান নিয়োগ-হার কিরূপ তাহাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইহা বেশি থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম, ইহা কম থাকিলে প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশি। (চ) বর্তমান কর-কাঠামোর প্রকৃতি ও হার এবং তাহাতে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রভাবও কম নয়। করহার অধিক হইলে প্রান্তিক কার্যকারিতা কম, করহার কম হইলে ইহা অধিক। (ছ) ব্যবসায় বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশানিরাশার অবস্থা ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভবিষ্যতে লাভের আশা বা ক্ষতির ভয়, অর্থাৎ ব্যবসায় জগতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা দুই ধরনের: আশাবাদী মনোভাব প্রবল থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশি, নিরাশাবাদী মনোভাব প্রবল থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা দুই প্রকার: স্বল্পকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা ও দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা। বর্তমানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বল্পকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বল্পকালীন ধারণা ও দীর্ঘকালীন ধারণা

ধারণা স্থির হয়; অপরপক্ষে, স্থায়ী ধরনের আশা ও ভয়ের ভিত্তিতে দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা গড়িয়া উঠে। কাল যত স্বল্প, পরিচিত বর্তমান অবস্থা চলিতে থাকার সম্ভাবনা তত বেশি, নিশ্চয়তার অনুভূতি তত প্রবল; কাল যত দীর্ঘ,

বর্তমান ও পরিচিত অবস্থা চলিতে থাকার সম্ভাবনা তত কম, অনিশ্চয়তার অনুভূতি তত প্রবল। (ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চিত অসম্পূর্ণ জ্ঞান, পরিকল্পনাবিহীন বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির উদ্ভব, ব্যবসায়-বিশ্বাসে (business confidence) বিপুল উঠানামা, বাণিজ্যচক্রের তীব্রতা ও গভীরতা বৃদ্ধির কারণও বটে)।

সুদের হার নির্ভর করে টাকার পরিমাণ ও নগদ-পছন্দের উপর

(২) সুদের হার নির্ভর করে (ক) টাকার পরিমাণ, ও (খ) নগদ-পছন্দের তালিকার উপর। টাকার পরিমাণ কমিয়া গেলে অথবা নগদ-পছন্দের হার বাড়িয়া গেলে সুদের হার বৃদ্ধি পায়; টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গেলে অথবা নগদ-পছন্দের হার কমিয়া গেলে সুদের হার হ্রাস পায়।

সুতরাং কর্মসংস্থানের স্তর-নির্ধারণী শক্তিসমূহকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজান যায়।

মোট কর্মসংস্থান
|
কার্যকরী চাহিদা
|
মোট ব্যয়
- ভোগ ব্যয়
  - আয়স্তর
  - সঞ্চয় প্রবণতা
- ব্যক্তি উদ্যোগী বিনিয়োগ ব্যয়
  - সুদের হার
    - টাকার যোগান
    - তারল্য পছন্দ
  - মূলধনের প্রান্তিক কার্যকরিতা
    - মূলধনের দাম
    - সম্ভাব্য আয়
- সরকারী ব্যয়

ভোগ-ব্যয় ও আয় (Consumption and Income : The consumption Function)

সমাজে মোট ভোগের পরিমাণ নির্ভর করে সকল ব্যক্তির ভোগের পরিমাণের সমষ্টির উপর। প্রত্যেক ব্যক্তি ভোগদ্রব্য ক্রয়ে যে পরিমাণ ব্যয় করে তাহা যোগ করিলে সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট ভোগ-পরিমাণ জানা যায়।

ব্যক্তির ভোগের পরিমাণ প্রধানত কিসের উপর নির্ভরশীল? কেইন্‌সের মতে, অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে (যেমন, দাম) প্রধানত ইহা নির্ভর করে ব্যক্তির আয়ের উপর। দ্রব্যের দামের সঙ্গে উহার জন্য চাহিদার

যেরূপ কার্যকারণ সম্পর্ক আছে, ঠিক সেইরূপ ব্যক্তির ভোগপরিমাণ তাহার আয়ের উপর নির্ভরশীল।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরূপ, সমষ্টির ক্ষেত্রেও তাই। দেশে মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে প্রধানত আয়স্তরের উপর। তালিকার আকারে বা রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহাদের এই সম্পর্ক আমরা প্রকাশ করিতে পারি। বিভিন্ন আয়ের পরিমাণে (Y) সমাজে কি বিভিন্ন পরিমাণ ভোগব্যয় (C) হইতেছে তাহা একটি তালিকাতে সাজান চলে :

ভোগ-ব্যয়ের তালিকা

Consumption Schedule

(কোটি টাকার হিসাবে)

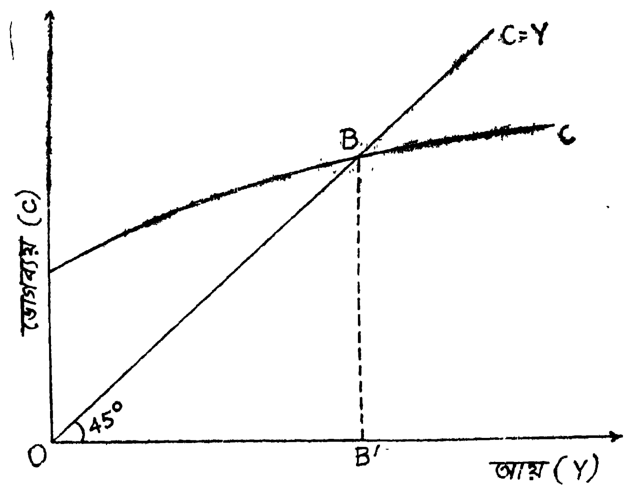
Y	C
0	20
50	65
100	100
150	130
200	155
250	175
300	185

বিভিন্ন আয়স্তরে ভোগব্যয়ের এই তালিকাকে ভোগ-প্রবণতা (Propensity to consume) বা ভোগ-অপেক্ষক বা ভোগ-নির্ভরক (consumption function) বলা হয়। আয়ের পরিমাণের সহিত ভোগব্যয়ের পরিমাণের এই সম্পর্ককে অপেক্ষক-সম্পর্ক (বা Functional relationship) বলা হয়, অর্থাৎ ঐ আয়স্তর আছে বলিয়া ঐরূপ ভোগের পরিমাণ হইতেছে, অর্থাৎ $C=f(Y)$. ইহাকে আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে প্রকাশ করিতে পারি।

ভূ-সমান্তরাল অক্ষে আমরা সমাজের মোট বিভিন্ন আয়স্তর প্রকাশ করিতেছি এবং লম্বমুখী অক্ষে ঐ প্রতিটি আয়স্তরে মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ দেখাইতেছি। 45° রেখাটিতে আয় ও ভোগের পরিমাণ সমান, মোট আয় যে পরিমাণ, ভোগের পরিমাণও ততখানি। ঐ রেখাটিকে আমরা তাই সঞ্চয়-শূন্যতার রেখা (Zero-savings line) বলিয়াও অভিহিত করিতে

পারি, কারণ ভোগকারীরা বা ক্রেতারা ঐ রেখার উপর সঞ্চরণ করিলে আয়ের সমস্তটাই ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় করিয়া ফেলে। C রেখাটি ধীরে ধীরে বাঁকিয়া যাইতেছে, অর্থাৎ আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোগব্যয় বাড়ে বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধির পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া আসে। পূর্বের তালিকার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া এই রেখাটি আঁকা হইয়াছে। C রেখা উৎসবিন্দু 0 হইতে সুরু হয় না কারণ আয় যখন শূন্য তখনও ভোগব্যয় শূন্য

আয়স্তর ও ভোগের সম্পর্ক



নয়, অর্থাৎ যখন Y=0 তখনও C=২০ কোটি টাকা। C রেখাটি উপরে উঠিতেছে অর্থাৎ দেখা যাইতেছে আয়স্তর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভোগব্যয় বাড়িতে থাকে (an increasing function of income)। উভয় রেখার ছেদবিন্দু B হইল এমন একটি স্থান যেখানে C=Y. B′ বিন্দুরা দিকে বাঁঅর্থাৎ OB′ পরিমাণের কম আয়স্তরে আয়ের তুলনায় ভোগব্যয় বেশি, ঋণাত্মক সঞ্চয় (negative savings) হইতেছে ; B′ বিন্দুর ডানদিকে অর্থাৎ OB′ পরিমাণের বেশি আয়স্তরে ভোগব্যয় কম, ধনাত্মক সঞ্চয় (positive savings) হইতেছে। তালিকার উদাহরণ হইতে বলা চলে যে, এই ছেদ-বিন্দু বা B এমন স্তর প্রকাশ করে যেখানে ১০০ কোটি আয় এবং ১০০ কোটি ব্যয়। 45° রেখাটি হইতে C রেখাটির দূরত্ব বিভিন্ন আয়স্তর (ঋণাত্মক বা ধনাত্মক) সঞ্চয়ের পরিমাণ পরিমাপ করিতেছে।

সুতরাং, যে অপেক্ষক বা নির্ভরক (Function) ভোগ ও আয়ের মধ্যে

পরস্পর-নির্ভরশীলতা বা সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তাহাকেই আমরা ভোগপ্রবণতা (**Propensity to consume**) বলিতে পারি। আমাদের চিত্রের C রেখাটিই হইল এই ভোগপ্রবণতা, ইহার এক ধরনের অবস্থান ও ঢাল (**position and slope**) আমরা দেখাইয়াছি। এই প্রবণতার দুইটি টেকনিকাল ধর্ম (**technical attributes**) আমাদের আলোচনা করা দরকার : প্রথমত গড় ভোগপ্রবণতা, ও দ্বিতীয়ত, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা। বিশেষ কোন আয়স্তরের সহিত ভোগব্যয়ের যে অনুপাত অর্থাৎ C/Y, ইহাকেই গড় ভোগপ্রবণতা বলা হয়। যেমন, যদি 100 টাকা আয়ের মধ্যে 80 টাকা ভোগব্যয় হয় তবে গড় ভোগ-প্রবণতা হইল $\frac{৮০}{১০০}$ অর্থাৎ 80% বা 0·8। এই গড় ভোগপ্রবণতা বাহির হইলে ইহা হইতেই গড় সঞ্চয় প্রবণতা জানা যায়, উপরের উদাহরণে গড় সঞ্চয় প্রবণতা হইল 20% বা 0 2। আয়স্তর যত বাড়ে এই গড় সঞ্চয়প্রবণতা তত বৃদ্ধি পায় এবং গড় ভোগপ্রবণতা তত কমে। অর্থাৎ S/Y বৃদ্ধি পায় এবং C/Y হ্রাস পায়। আমাদের চিত্রের ভাষায় বলিতে গেলে গড় ভোগপ্রবণতা হইল C রেখার উপর অবস্থিত যে কোন একটি বিন্দু সেই বিন্দুতেই জানা যায় আয়ের কত অংশ ভোগব্যয় বা সঞ্চয় হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, এই গড় ভোগপ্রবণতা সাধারণ অবস্থায় 1 হইতে কম কোন এক ভগ্নাংশ হইবে।*

আয় বৃদ্ধি হইলে ভোগব্যয় বাড়িবে। আয়ের বৃদ্ধি ও ভোগের বৃদ্ধি এই অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (**Marginal Propensity to consume**)

---

* এই গড় ভোগপ্রবণতার অর্থনৈতিক তাৎপর্য কম নয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তরে যে পরিমাণ দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতেছে তাহাদের মোট ব্যয়ের কত অংশ কেবল ভোগ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া তুলিয়া আনা যাইতে পারে, আমরা তাহা ইহার সাহায্যে জানিতে পারি। ভোগব্যয় হইল ভোগ্যদ্রব্যের জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্য বিক্রয়জাত আয়ের পরিমাণ, সুতরাং ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ও যোগান হইতে জাতীয় আয়ের কত অংশ আসিল, তাহা আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি। অপরপক্ষে সকল দ্রব্যসামগ্রীর মোট ব্যয়ের কত অংশ মূলধনী দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তোলা যাইবে, অর্থাৎ মূলধনী দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান হইতে জাতীয় আয়ের কত অংশ আসিল, তাহাও আমরা গড় সঞ্চয়প্রবণতা হইতে জানিতে পারিব। তাই অন্যান্য বিষয় সমান থাকিলে দেশে ভোগ্যদ্রব্যের এবং মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনের পারস্পরিক অনুপাত নির্ভর করে C/Y এবং S/Y এর উপর। পূর্ণ শিল্পোন্নত দেশগুলিতে গড় ভোগপ্রবণতা কম থাকে এবং গড় সঞ্চয় প্রবণতা বেশি থাকে। সুতরাং দীর্ঘকালীন উন্নয়ন বা স্থায়িত্ব (**stability**) বজায় রাখার শর্ত আলোচনার জন্য গড় ভোগ ও সঞ্চয়-প্রবণতা ধারণা দুইটি খুবই প্রয়োজনীয়।

বলে। যদি δ-কে অতি অল্প পরিবর্তনের প্রতীক ধরা হয়, তাহা হইলে এই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাকে $\delta C/\delta Y$ বলা চলে। ইহাতে বোঝা যায় যে, আয়ের অতি অল্প পরিবর্তন ভোগে অতি অল্প পরিবর্তন আনিবে এবং এই দুই পরিবর্তনের অনুপাত কিরূপ। কিন্তু আমরা জানি, আয়ে পরিবর্তন অপেক্ষা (অর্থাৎ δY) ভোগে পরিবর্তন (অর্থাৎ δC) কম হইবে। সুতরাং $\delta C/\delta Y$ ধনাত্মক হইলেও উহা 1 হইতে কম। আয় ও ভোগের বৃদ্ধির পরিমাণ সমান হইলে উহা হইত 1 ; আয়-বৃদ্ধির তুলনায় ভোগবৃদ্ধি বেশি হইলে উহা হইত 1-এর বেশি ; আয় বৃদ্ধির তুলনায় ভোগের বৃদ্ধি কম বলিয়া উহা 1 হইতে কম। তাই আমরা বলিতে পারি $O < \frac{\delta C}{\delta Y} < 1$, অথবা $1 > \frac{\delta C}{\delta Y} > O$.*

ভোগপ্রবণতা কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল (Determinants of C Function)

কেইন্‌স ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, ভোগ প্রবণতা বা ভোগকারক স্বল্পকালে মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে ; তাই আয়স্তর নির্ধারণে বিনিয়োগব্যয়ের গুরুত্ব বেশি বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। ভোগপ্রবণতা শুধুমাত্র আয়ের উপর নির্ভরশীল বলিলে আমরা ধরিয়া লই যে, মনোগত বিষয়গুলিতে (subjective factors) পরিবর্তন আসে না, এবং বাস্তব বিষয়গুলির মধ্যে আয় ছাড়া অন্য কিছুতে পরিবর্তন হইতেছে না। ভোগ-প্রবণতা অপরিবর্তিত থাকে কি না জানিতে হইলে, তাই, এই বাস্তব ও মনোগত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। ভোগপ্রবণতা নির্ধারণকারী এই সকল বিষয় আলোচনার সময়ে আমাদের দুইটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, কি সময়ের মধ্যে আমরা

* এই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার অর্থনৈতিক তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে আয়স্তরে যতটুকু বৃদ্ধি হয় তাহার কিছু অংশ ভোগ ব্যয় হইবে এবং কিছু অংশ সঞ্চয় হইবে। ইহা জানা থাকিলে কোন এক বিশেষ আয়স্তর বজায় রাখার জন্য কতখানি বিনিয়োগ ব্যয় করা দরকার তাহা আমরা পূর্বেই জানিতে পারি (planning of investment to maintain the desired level of income)। যেমন ধরা যাউক, (১০০ কোটি টাকার স্তর হইতে) ৫০ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইল এবং ভোগব্যয় বাড়িল ৩০ কোটি ; অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইল ৬০% বা ০·৬। সকল উৎপাদক মিলিয়া উৎপাদন বাড়াইল ৫০ কোটি টাকার, কিন্তু ভোগব্যয় ৩০ কোটি হওয়ায় (৫০—৩০) ২০ কোটি টাকার বিনিয়োগ ব্যয় হওয়া দরকার। তাহা না হইলে আয়স্তর ১৫০ কোটি টাকায় বজায় রাখা যাইবে না।

এই বিশ্লেষণ করিতেছি, অর্থাৎ সেই সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবগুলি বিচার করা দরকার। দ্বিতীয়ত, আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে, আমরা পূর্ণ শিল্পোন্নত দেশের ক্রেতাদের আচরণ বিশ্লেষণ করিতেছি। এই দুইটি অনুমানের ভিত্তিতে প্রথমে বাস্তব বিষয়গুলি আলোচনা করা যাউক।

সর্বপ্রথমে বলা দরকার যে, দেশের আয়বণ্টনকাঠামোর উপর ভোগপ্রবণতা বা ভোগকারক নির্ভর করে।* দেশের আয়বণ্টন অধিকতর বৈষম্যমূলক হইলে অল্প কয়েকজন ব্যক্তির হাতে আয় বেশি থাকে এবং অধিক সংখ্যক ব্যক্তির হাতে আয় কম থাকে। আমরা জানি আয় বেশি থাকিলে ভোগপ্রবণতা কম এবং যাহাদের আয় কম তাহাদের ভোগপ্রবণতা বেশি। তাই আয়-বৈষম্য অধিক হওয়ায় দেশে গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা কম থাকে, অর্থাৎ সঞ্চয়-প্রবণতা বেশি থাক। আয়বণ্টন যত কম বৈষম্যমূলক হইবে, অর্থাৎ ক্রেতাদের মধ্যে আয়ের বণ্টন-সাম্য যত বেশি হইবে, তাহাদের গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা তত বেশি অর্থাৎ সঞ্চয় প্রবণতা তত কম। রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণে আয়বণ্টনে বিপুল পরিবর্তন আসিলে ক্রেতাদের অভ্যাসেই এমন পরিবর্তন আসিতে পারে যে, ভোগপ্রবণতায় গুরুত্বপূর্ণ বদল হয়। প্রগতিশীল করব্যবস্থার সাহায্যে তাই অনেক সময় সমাজের আয়বণ্টনে পরিবর্তন আনিয়া ভোগপ্রবণতাকে বদ্‌লাইয়া দিয়া পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছিবার চেষ্টা করা হয়।

আয়-বণ্টন কাঠামো

দেশের কর-কাঠামোতে পরিবর্তন (changes in the tax struoture) ভোগপ্রবণতায় পরিবর্তন আনিতে পারে। প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বেশি থাকিলে ভোগপ্রবণতা বেশি থাকে, পরোক্ষ কর বেশি থাকিলে ভোগের পরিমাণ হ্রাস পায়। ইহার কারণ হইল প্রত্যক্ষ কর সাধারণত সঞ্চয়ের উপর বেশি চাপ দেয়, ভোগব্যয়ের উপর ততটা নয়। পরোক্ষ করের পরিমাণ বাড়াইলে সাধারণত ভোগব্যয় কমে।

কর কাঠামো

কোন দেশে কি পরিমাণ ভোগব্যয় হইবে তাহা কিছু পরিমাণ নির্ভর করে যৌথমূলধনী কোম্পানীসমূহের বিভিন্নরূপ রীতিনীতির উপর (corporate

* 'The most important influence on the demand for consumption goods is the distribution of income.' Mrs. Robinson, *The Problem of Ful Employment*. P. 3.

financial policies)। লাভের কত অংশ তাহারা নিজেদের নিকট রাখিয়া দিয়া কত অংশ লভ্যাংশ হিসাবে দিবে, তাহা ভোগপ্রবণতাকে প্রভাবিত করে। কোম্পানীরা নিজেরা টাকা সঞ্চয় করিলে ক্রেতাদের হাতে ভোগব্যয়ে খরচার উদ্দেশ্যে কম টাকা যায়, তাই ভোগব্যয় কমে। কোম্পানীর লাভ হওয়া এবং লভ্যাংশ বণ্টন করা ইহাদের মধ্যে যত বেশি সময়ক্ষেপ হইবে, (গুণকের ফলে) আয় প্রসারের বেগ তত মন্দীভূত হইবে, তাহাও মনে রাখা দরকার।

যৌথমূলধনী কোম্পানীগুলির আর্থিক নীতি

তাহা ছাড়া, ক্রেতাদের হাতে তরল নগদ সম্পত্তির পরিমাণ দ্বারা (consumer's Liquid Assets) ভোগপ্রবণতা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। যেমন ক্রেতাদের হাতে রক্ষিত নগদ টাকা, চল্‌তি ও সঞ্চয়ী আমানত এবং সরকারী বণ্ড—এই সকল তরল সম্পত্তির পরিমাণ জানা না থাকিলে ভবিষ্যৎ ভোগব্যয় ও নূতন সঞ্চয়ের পরিমাণ জানা যায় না।

তরলসম্পত্তির পরিমাণ

পরোক্ষভাবে হইলেও, সুদের হার দ্বারা ভোগপ্রবণতা প্রভাবিত হয়। সুদের হার বাড়িয়া গেলে বীমাকোম্পানীগুলির নিজেদের লগ্নী হইতে বেশি আয় হয়, তাই তাহারা প্রিমিয়ামের হার কমাইয়া দিতে পারে। সুদের হার বাড়িলে বণ্ডগুলির দাম কমিয়া যায়, অর্থাৎ ভোগ হ্রাস পাইয়া বণ্ডের চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে। স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যগুলির (গাড়ি, বাড়ি প্রভৃতি) চাহিদার সঙ্গে বণ্ডের চাহিদা প্রতিযোগিতা করে, সুদের হার বাড়িলে এক ধরনের সম্পত্তির পরিবর্তে ব্যক্তি অপর ধরনের সম্পত্তি ক্রয় করিতে থাকে, ভোগব্যয় হ্রাস পাইতে পারে। আবার সুদের হার কমিলে ক্রেতারা বণ্ডের জন্য চাহিদা কমাইয়া দিয়া স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যগুলির জন্য চাহিদা বাড়াইয়া দিতে পারে।

সুদের হার

এই সকল "বাস্তব" বিষয়গুলি দ্বারা ব্যক্তির ভোগপ্রবণতা প্রভাবিত হয়, তাই সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা ইহাদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ইহাদের মধ্যে যে শক্তি ব্যক্তির ভোগপ্রবণতার উপর অধিকতর প্রভাবশীল, ঠিক সেইটিই সমাজের গড় ভোগপ্রবণতার উপর অধিক প্রভাবশীল না-ও হইতে পারে। ভোগপ্রবণতা স্থিতিশীল—ইহা ধরিয়া লইবার জন্য আমরা তাই এই সকল বিষয়ে পরিবর্তন ঘটিতেছে না বলিয়া মনে করিয়া লই : নির্দিষ্ট 'অবস্থা-কাঠামো' বজায় আছে স্বীকার করিয়া আলোচনা করি ('in a given situation')।

ইহারা বদলায় না বলিয়া আমরা ধরিয়া লই

যে সকল মনোগত বিষয়ের (subjective factors) উপর ভোগপ্রবণতা নির্ভর করে, তাহাদেরও আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, বর্তমান সমাজের ব্যক্তি ও পরিবারসমূহ সাধারণত বেশির ভাগ চিন্তা করে নিরাপত্তা সম্পর্কে : বার্ধক্য, অসুস্থতা ও অন্যান্য বিপদ আপদের জন্য সঞ্চয় করাই তাহাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি সামাজিক নিরাপত্তার (Social security measures) ব্যবস্থা উন্নত হয়, তবে ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভোগপ্রবণতা অধিকাংশে নির্ভর করে, সমাজে কিরূপ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহাদের বিক্রয় ব্যবস্থা ভাল কি খারাপ, প্রতিবেশিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া তাহাদের অপেক্ষা জীবনযাত্রার মান বাড়াইয়া চলার ইচ্ছা প্রভৃতির উপর। তৃতীয়ত, ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ইচ্ছায় ব্যক্তি বর্তমানে ভোগ কমাইয়া বেশি সঞ্চয় করিতে পারে, এই ইচ্ছা যত শক্তিশালী বর্তমানে ব্যক্তি তত বেশি সঞ্চয় করিতে চাহিবে। বর্তমানে জীবনযাত্রার মান খুব নিচু থাকিলে সঞ্চয় বাড়াইয়া মূলধন-গঠনের চেষ্টা চলিতে থাকিবে যাহাতে ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার মান বাড়ান যায়। চতুর্থত, আর্থিক ব্যাপারে বিজ্ঞতা ও বিবেচনা (Financial prudence) সাধারণত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয়-প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, বর্তমান যন্ত্রপাতির পরিমাণ ও উৎকর্ষ, বাজারে প্রতিযোগিতার তীব্রতা ও সম্ভাবনা, দরকারমত অন্য কোন সূত্র হইতে টাকা পাওয়ার সুযোগ সুবিধা, যন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ-এর প্রয়োজন—এই প্রকার বিষয় মিলিয়া তাহাদের সঞ্চয় প্রভাবিত হয়। তবে সাধারণত বলা হয় যে, স্বল্পকালে ভোগপ্রবণতা মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে।

মনোমত বিষয়গুলি —স্বল্পকালে ইহারা মোটামুটি স্থির

বিনিয়োগ ও আয় (Investment and Income : The Investment Function)

বিনিয়োগ বলিলে বোঝা যায় নূতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে টাকা লগ্নী করা। সমাজে পুরাতন কোন বণ্ড, ডিবেঞ্চার বা শেয়ারে টাকা খাটাইলে তাহাকে বিনিয়োগ বলা চলে না, কারণ এইরূপ টাকার লগ্নীতে নূতন কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি হইতেছে না। যে টাকা খাটান হইল, তাহাতে নূতন কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উদ্ভব হইলে অর্থাৎ বর্তমানের তুলনায় আয় ও

বিনিয়োগ ও অবিনিয়োগ কাহাকে বলে

কর্মসংস্থানের স্তর বাড়িলে, তবেই তাহাকে বিনিয়োগ বলা চলে। আবার উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যাইতেছে, এইরূপ ভাবে সমাজে টাকা খাটান বন্ধ করিলে তাহাকে অবিনিয়োগ (Disinvestment) বলা চলে।

কোন নির্দিষ্ট সময়ে, সমাজের সকল উদ্যোক্তারা মিলিয়া নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে যে টাকা খাটান, তাহাই মোট বিনিয়োগ ব্যয়। এই বিনিয়োগ-ব্যয় বহু বিচিত্র প্রকার শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। উহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটিকে পৃথক করিয়া ফেলা দরকার, তাহা না হইলে এই জটিলতা খণ্ডন করা যাইবে না। যেমন, আমরা ধরিয়া লইব সমাজে উদ্যোক্তাদের সম্মুখে বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধার নির্দিষ্ট একটি ধরন আছে, উহা ঐতিহাসিক দিক হইতে মোটামুটি নির্দিষ্ট (investment opportunities historically given)। আমরা স্বল্পকালের অবস্থা বিচার করিতেছি, তাই ইহাও ধরিয়া লইতে হইবে যে, সমাজে মূলধন-সঞ্চয়ের পরিমাণ পর্যাপ্ত আছে।* এই সকল বিষয় মোটামুটি স্থির ধরিয়া লইয়া আমরা দুইটি প্রধান শক্তি বাছিয়া লইব। বর্তমান কালে, অতিদীর্ঘকালীন প্রভাবগুলিকে হিসাবের মধ্যে না আনিয়া আমরা বলিতে পারি যে, সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে আয়স্তর, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা এবং সুদের হারের উপর।

বিনিয়োগ নির্ভর করে অনেক প্রকারের উপর: উহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান

(ক) আয়স্তরের উপর বিনিয়োগ কিরূপভাবে নির্ভর করে, তাহা বুঝিতে হইলে বিনিয়োগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা দরকার: স্বয়ংভূত বিনিয়োগ ও উদ্ভূত বিনিয়োগ (Autonomous Investment and Induced Investment)। সমাজে কিছু পরিমাণ বিনিয়োগ থাকে, যাহা আয়-স্তরের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল নয়। বিভিন্ন আয়স্তরে এইরূপ বিনিয়োগ সমান থাকে, আবার আয়স্তর সমান থাকিলেও এইরূপ বিনিয়োগে পরিবর্তন হইতে পারে—এই ধরনের বিনিয়োগ

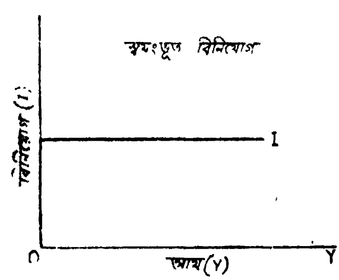
আয়স্তরের উপর বিনিয়োগের নির্ভরশীলতা

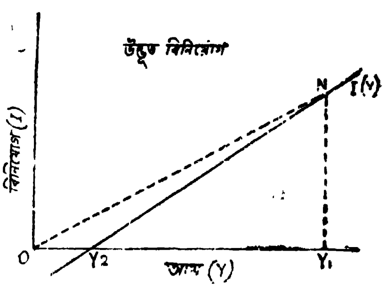
* সুদীর্ঘকালের বিশ্লেষণে কেইন্‌স্ বলিয়াছেন যে, বিনিয়োগের উপর অন্যান্য প্রভাব ছাড়াও, মূলধন সঞ্চয়ের পরিমাণ (capital accumulation) প্রধানত প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘকালে তাই একদিকে বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধার অভাব এবং অপরদিকে প্রভূত মূলধন দেখা দিলে মূলধনের অতিদীর্ঘকালীন জড়ত্ব (secular stagnation of capital) দেখা দেয়। আবার হ্যারড্ বলেন, দীর্ঘকাল, সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রধানত নির্ভরশীল আয়বৃদ্ধির হারের উপর (rate of income growth.)

আয়স্তর নিরপেক্ষ। সরকার নূতন স্কুল কলেজ, রাস্তাঘাট, গৃহনির্মাণ, সামরিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে যে সকল টাকা খাটায়—উহারা স্বয়ংভূত বিনিয়োগ, ইহাদের পরিমাণ সমাজের আয়স্তরের উপর নির্ভর করে না। যুদ্ধের সময়ে বা পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বিনিয়োগকে স্বয়ংভূত বিনিয়োগ বলা চলে, কারণ ব্যবসায়ীদের লাভ-লোকসানের উপর ইহা নির্ভর করে না। অধ্যাপক টিনবারগেন-এর ভাষায় বলা চলে যে **'if public Investments are used as a political means to influence employment, it is justified to consider investment activity as an independent variable.'** অপরপক্ষে, বিভিন্ন আয়স্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন, আয়স্তর বৃদ্ধির ফলে এবং সেই বর্ধিত আয়স্তর রক্ষা করার জন্য যে বিনিয়োগ ঘটে, তাহাই উদ্ভূত বিনিয়োগ। সংক্ষেপে বলা চলে,

স্বয়ংভূত বিনিয়োগ ও উদ্ভূত বিনিয়োগ

যে বিনিয়োগের আয়গত স্থিতিস্থাপকতা নাই (**Income-inelastic investment function**), তাহা স্বয়ংভূত বিনিয়োগ; আবার, যে বিনিয়োগের আয়গত স্থিতিস্থাপকতা আছে, (**Income-elastic Investment function**), তাহা উদ্ভূত বিনিয়োগ। নিচের ছবিতে ইহাদের দেখান হইতেছে। বাঁ দিকের ছবিতে স্বয়ংভূত বিনিয়োগের রেখাটি আয়স্তর রেখা অর্থাৎ Y অক্ষের সমান্তরাল, আয়স্তর বাড়িলেও ইহা সমান থাকে।





ডানদিকের চিত্রটিতে I(Y) রেখাটি উদ্ভূত বিনিয়োগের রেখা। সাধারণত ধরিয়া লওয়া হয় যে, আয়স্তর বাড়িলে মুনাফা বাড়ে তাই ব্যবসায়ীদের মনে বিনিয়োগের ইচ্ছা দেখা দেয়। বিভিন্ন আয়স্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের বিভিন্ন পরিমাণ কিভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক দ্বারা যুক্ত (**Functionally related**), এই রেখা তাহা প্রকাশ করিতেছে। I(Y) রেখাটি তলার দিক দিয়া Y রেখাটিকে ভেদ করিয়া উপরে উঠিতেছে। অর্থাৎ OY_2 পরিমাণ আয় থাকিলে কোনরূপ বিনিয়োগের উদ্ভব হয় না, OY_2 পরিমাণের কম থাকিলে ঋণাত্মক বিনিয়োগ

বা অবিনিয়োগ ঘটে। OY_1 আয়স্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ হইল OY_1.

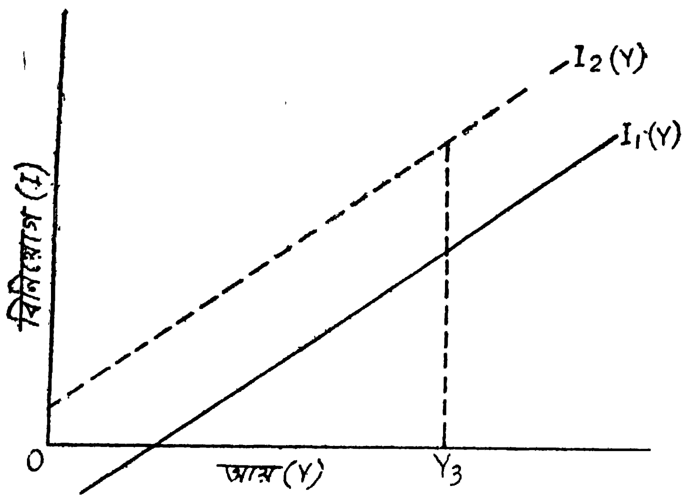
পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রের $I(Y)$ রেখা হইতে আমরা দুইটি বিষয় জানিতে পারি : ইহারা হইল গড় বিনিয়োগ প্রবণতা এবং প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা (**average propensity to invest and marginal propensity to invest**)। মোট আয় ও ঐ স্তরে মোট বিনিয়োগের অনুপাতকে বলা হয় গড় বিনিয়োগ-প্রবণতা ; ইহাকে আমরা I/Y রূপে প্রকাশ করিতে পারি। আর আয় বৃদ্ধির হার এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার—এই দুই-এর অনুপাতকে বলা হয় প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা। ইহাকে আমরা $\delta I/\delta y$ রূপে প্রকাশ করিতে পারি। এই দুইটি ধারণার অর্থনৈতিক তাৎপর্য খুব কম নয়। মোট আয়ের কত অংশ মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করিয়া পাওয়া যাইতেছে অথবা মোট আয়ের কত অংশ মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে নিযুক্ত হইতেছে প্রতিটি আয়স্তরের ক্ষেত্রেই আমরা তাহা জানিতে পারি এই গড় বিনিয়োগপ্রবণতা দ্বারা। আবার, জাতীয় আয়ে সামান্য পরিবর্তন হইলে বেসরকারী বিনিয়োগ কতখানি উঠানামা (**Fluctuate**) করিবে তাহা আমরা জানিতে পারি এই প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতার সাহায্যে।

গড় ও প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা এবং ইহাদের তাৎপর্য

বিনিয়োগপ্রবণতার রেখা বা $I(Y)$ রেখা সম্পর্কে আমাদের আর একটি কথা জানা প্রয়োজন। পরপৃষ্ঠার চিত্রের মত এই রেখাটি যদি সম্পূর্ণ উপরে উঠিয়া যায়, তবে বোঝা যাইতেছে যে, সকল আয়ের স্তরেই উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে। সকল আয়স্তরেই বিনিয়োগের পরিমাণ সমানভাবে বাড়িবে এমন কোন কথা বলা যায় না। তবুও সহজে বুঝিবার জন্য ইহা আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা সকল আয়স্তরেই সমান, তাই $I_2(Y)$ রেখা $I_1(Y)$ রেখাটির সমান্তরাল।*

* বাস্তবে অবশ্য এইরূপ না হওয়ারই সম্ভাবনা। আয়স্তর কম থাকিলে প্রান্তিক বিনিয়োগ-প্রবণতা কম থাকিতে পারে, কারণ, এই অবস্থায় দেশে কিছু পরিমাণ মজুত করা দ্রব্য ও উপকরণ এবং যন্ত্রপাতির ক্ষমতা অব্যবহৃত অবস্থায় থাকিতে পারে (idle capacity in the form of unused inventories and fixed equipment)। আয়স্তর বৃদ্ধি পাইলে এই অব্যবহৃত ক্ষমতা দূর হয়, তাই উচ্চ আয়স্তরে প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা বেশি থাকারই সম্ভাবনা। এইরূপ অবস্থায় প্রতিটি আয়স্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন থাকিবে, দুইটি উদ্ভূত বিনিয়োগের-রেখা সমান্তরালে অবস্থিত থাকিবে না। সংক্ষেপে বলা হয় যে, বিনিয়োগ-অপেক্ষক তখন non-linear হইবে ('non-linear' investment function)।

সমগ্র বিনিয়োগের রেখাটি উপরে উঠিয়াছে, অনেক কারণে এইরূপ ঘটিতে পারে। যেমন দেশে সাধারণভাবে, সকল আয়স্তরেই, সুদের হার হ্রাস পাইয়াছে,



তখন এইরূপ সম্ভব। মজুরি হ্রাস, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি বা টেকনোলজির উন্নতি—যে-সকল কারণে সমগ্র অর্থনৈতিক দেহে ব্যয়ের কাঠামোতে পরিবর্তন আসে, তাহারাই বিনিয়োগের রেখাটির অপসরণের পরিসীমা (**shift parameter**)।

মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও সুদের হার

(খ) মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও সুদের হার উভয়ে মিলিয়া কিরূপে বিনিয়োগের পরিমাণ স্থির করে, এখন তাহা আলোচনা করা দরকার। মূলধনী দ্রব্যের চাহিদার উপর বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে তাহা আমরা জানি। এই চাহিদা বা বিনিয়োগপ্রবণতা দুইটি বিষয়ের কার্যফল, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও সুদের হার।*

কোন বিনিয়োগকারী ব্যক্তি (**investor**) বিনিয়োগ করে কেন? ইহার কারণ হইল, এই বিনিয়োগ হইতে সে কিছু প্রতিদান (**return**) পায়।

* এই আলোচনার সময়ে আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, সুদের হার স্বাধীনভাবে নিরূপিত হইতেছে (Independently given)। এই অবস্থায় বিভিন্ন সুদের হারে যে বিভিন্ন পরিমাণ বিনিয়োগ ঘটিবে তাহার তালিকাকে বলা হয় মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার তালিকা (**Schedule of the Marginal efficiency of capital**)।

কোন ব্যক্তির হাতে কিছু পরিমাণ টাকা আছে, সে এই টাকা নূতন মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে অর্থাৎ বিনিয়োগে না খাটাইয়া উহা দিয়া যে-কোন প্রকার বণ্ড কিনিতে পারে। মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে ঝুঁকি কম নয়, সাফল্য-অসাফল্যের কথা কিছু বলা যায় না। তবুও সে বণ্ডের বাজারে টাকা না খাটাইয়া একমাত্র তখনই বিনিয়োগ করিবে যখন বণ্ড হইতে তাহার আয়ের তুলনায় বিনিয়োগ হইতে আয় বেশি হয়। অর্থাৎ বিনিয়োগ হইতে পাওয়া আয় বাজারে চলিত সুদের হার হইতে বেশি; অন্ততপক্ষে কম নয়। আর একটি অবস্থার কথা চিন্তা করা যায়। যদি ব্যবসাদার ব্যক্তিটি নিজের টাকা না খাটান, অপরের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া আনেন, তবে তাহাকে নজর রাখিতে হইবে যেন তিনি যে-সুদ দেন তাহার তুলনায় সেই টাকা খাটাইয়া তিনি বেশি প্রতিদান পাইতে পারেন। তিনি নির্দিষ্ট সুদের বণ্ড বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই টাকা দিয়া তিনি যে নূতন মূলধনী দ্রব্য তৈয়ারীর ব্যবসায় করিবেন, তাহা হইতে কিরূপ লাভ বা প্রতিদান তিনি আশা করেন, এই কথা তাঁহাকে সর্বদাই ভাবিতে হইবে। ইহার অর্থ হইল মূলধনী দ্রব্যের নূতন ইউনিট হইতে প্রতিদান, অর্থাৎ মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা চলতি সুদের হারের তুলনায় কম হইলে সেই বিনিয়োগ হইতে পারে না। বিনিয়োগপ্রবণতা তাই নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও সুদের হারের মধ্যে এই সম্পর্কের উপর।

প্রান্তিক কার্যকারিতা সুদের হারের কম হইলে চলিবে না

সুদের হারের সহিত সমাজে বিনিয়োগের এই সম্পর্ককে আমরা একটি তালিকার (schedule) আকারে প্রকাশ করিতে পারি। পর পৃষ্ঠার চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

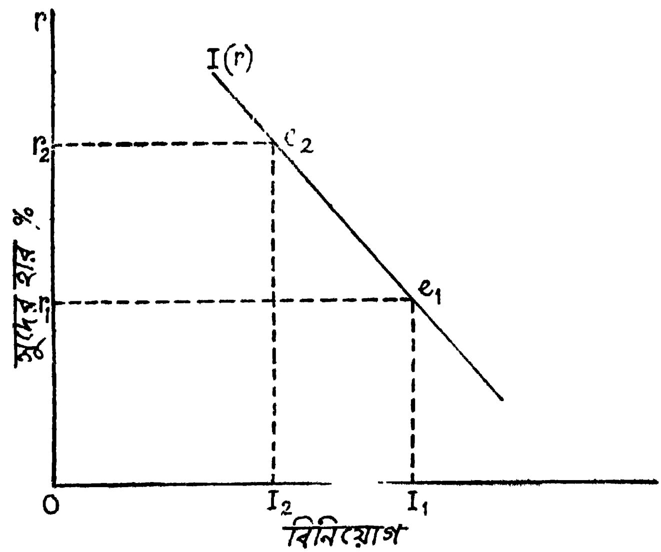
চিত্রটিতে আমরা ভূসমান্তরাল অক্ষে বিনিয়োগের পরিমাণ এবং লম্বমুখী অক্ষে সুদের হার পরিমাপ করিতেছি। I(r) হইল বিভিন্ন সুদের হারে বিভিন্ন পরিমাণ বিনিয়োগের রেখা। সুদের হার Or_1 হইতে বাড়িয়া Or_2 হইলে বিনিয়োগ OI_1 হইতে হ্রাস পাইয়া OI_2 হইতেছে। সুদের হার কমিলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। বিশেষ ধরনের কোন একটি মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে থাকিলে উহার প্রান্তিক কার্যকারিতা কমিয়া যাইতে থাকে। ইহার কারণ হইল সেই ধরনের যন্ত্রের যোগান যত

বৃদ্ধি পাইবে, উহা হইতে সম্ভাব্য প্রতিদানের পরিমাণও তত হ্রাস পাইবে।

মূলধনী দ্রব্যের পরিমাণ ও প্রান্তিক কার্যকারিতার সম্পর্ক

এই ধরনের যন্ত্র বেশি থাকিলে বাজারে উহার বিক্রয়জাত দ্রব্যের দাম কমিবার সম্ভাবনা, ফলে সেই যন্ত্রটি হইতে সম্ভাব্য আয় (prospective yield) কম। আবার যন্ত্রটি বেশি উৎপন্ন হইতে থাকিলে উহার উৎপাদন ব্যয় বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিবে, তাই যোগান দাম বাড়িতে থাকিবে। সম্ভাব্য আয়ে হ্রাস অথচ যোগান দামে বৃদ্ধি উভয়ের ফলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা হ্রাস পাইবে।



ইহা সকল মূলধনী দ্রব্যের ক্ষেত্রেই সত্য। উপরের চিত্রের I (r) রেখার প্রতিটি বিন্দু MEC পরিমাপ করে, ইহা আমরা বলিতে পারি। বিনিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে MEC হ্রাস পাইতেছে।

বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা (Interest-Elasticity of Investment)

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করিলাম যে, সুদের হারে উঠানামার উপর বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে। কিন্তু এই নির্ভরশীলতা কতদূর তাহা দেখা দরকার।

বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা বলিলে বোঝা যায় সুদের হারে অল্প পরিবর্তন হইলে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ কতখানি পরিবর্তিত হয়। এই দুই পরিবর্তনের হারের অনুপাতকে বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা বলে। পূর্বের ছবিতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা যত কম (more inelastic) I (Y) রেখাটি তত অধিকতর খাড়া (steeper)। ইহার সুদগত স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি (more elastic), এই রেখাটি তত বেশি চেটাল (flatter)। ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছি। কথা হইল, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, যেমন ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় মূলধনী যন্ত্রপাতির চাহিদা সুদের হারের উপর কতখানি নির্ভর করে। সাধারণভাবে আজকাল মনে করা হয়, এই সকল দেশে বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা কম। এই স্থিতিস্থাপকতা কম হইবার সম্ভাব্য কারণ কি কি?

বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা কাহাকে বলে

যত কম সময়ের মধ্যে যন্ত্রপাতির আয় হইতে উহার যোগান-দাম ফেরৎ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সুদের হারের প্রভাব তত কম হয়। যন্ত্রের জীবনকাল যত দীর্ঘ, উহা হইতে সম্ভাব্য আয়ের পরিমাণে উঠানামার সম্ভাবনা তত প্রবল, কারণ বহু বিচিত্র ঘটনা ও শক্তির প্রভাব ইহার উপর পড়িতে পারে। তাই সুদের হারের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি।

উদ্যোক্তার পরিকল্পনা কাল

যখন ফার্মগুলি নিজেদের সঞ্চিত টাকা বা রিজার্ভ হইতে বেশি পরিমাণ বিনিয়োগ করে তখন মূলধনী দ্রব্যের জন্য চাহিদার সুদগত স্থিতিস্থাপকতা কম হইবে। ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইহার কারণ হইল যে, সাধারণত উদ্যোক্তারা নিজস্ব টাকা খাটাইলে তাহার উপর সুদ হিসাব করেন না। মনে কর, ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ঋণ করিয়া আনিলে যে-সুদ দিতে হয়, তাহা মোট ব্যয়ের এক পঞ্চমাংশ। যন্ত্রটি বিক্রয় করিয়া যে রেভিনিউ পাওয়া যায় তাহা হইতে এই সুদ বাদ দিয়াই নীট রেভিনিউ হিসাব করা দরকার। কোন ফার্মের মালিক, যথেষ্ট হিসাবী হইলে নিজের টাকা খাটাইলেও যে-সুদ (Imputed interest) তাহাকে অন্যত্র দিতে হইত উহা বাদ দিয়া নীট রেভিনিউর হিসাব করিবেন। কিন্তু বাস্তবে অনেকে ইহা করেন না। ফলে সুদের হার পরিবর্তনের উপর বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন ততটা নির্ভর করে না; বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা কম হয়।

এই কারণেই, মজুরির হারে পরিবর্তন মুনাফা কমাইয়া দেয় বলিয়া উদ্যোক্তারা বিচলিত হন, কিন্তু সুদের হারে পরিবর্তনে ততটা বিচলিত হন না।*

তবুও আমরা মনে করিতে পারি যে, সিকিউরিটিতে টাকা খাটাইলে যে সুদ পাইতে পারিত, উদ্যোক্তারা তাহার কিছুটা অন্তত হিসাব করিয়া নিজের ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন।

বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা আলোচনার বাস্তব তাৎপর্য (practical significance) কম নয়। যদি সত্য সত্যই ইহা অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে সুদের হারে পরিবর্তন আনিয়া চলতি বিনিয়োগের হারে পরিবর্তন ঘটানোর সম্ভাবনা কমিয়া যায়। সুদের হারের নীতি বা সুলভ টাকার নীতি (Interest policy or cheap money policy) প্রয়োগ করিয়া বিনিয়োগ, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনাও আর ততটা থাকে না। এই অবস্থায় সুদের হার ব্যতীত আরও যে-সকল বিষয় বিনিয়োগের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নীতি নির্ধারণের সময়ে (policy consideration) তাই, অন্যান্য যে-সকল শক্তি মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার সমগ্র তালিকাকে অপসারণ (shift) করিতে পারে তাহাদেরও বিচার করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

ইহার বাস্তব তাৎপর্য

সুদ ব্যতীত বিনিয়োগ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ (Shift factors affecting Investment Schedule—other than the Interest rate)

সুদের হার ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের উপর মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা (MEC) বা বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন নির্ভর করে। এই সকল বিষয়ে পরিবর্তন হইলে সম্ভাব্য সকল সুদের হারেই বিনিয়োগ বাড়িতে পারে বা কমিতে পারে। হঠাৎ ও বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগে পরিবর্তন আসা সাধারণত এই সকল গতিশীল শক্তির (dynamic forces) উপরই নির্ভর করে, সুদের হারে পরিবর্তনের উপর নয়।

ব্যবসায়ীদের আস্থার উপর যে সকল বিষয় প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের সকলকেই আমরা এইরূপ গতিশীল শক্তি বলিয়া গণ্য করিতে পারি। কেইন্সের ভাষায় বলা চলে যে, উদ্যোক্তাদের মনে মূলধনী সম্পত্তি হইতে

* আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। সমাজে একচেটিয়া শক্তির প্রসার হওয়ায় নির্দিষ্ট একই ব্যক্তি ব্যাঙ্ক ও ফার্মের মালিক থাকে। ফলে সুদের হার বাড়িলে ফার্মের মালিক হিসাবে তাহাদের লোকসান ব্যাঙ্কের মালিক হিসাবে পূরণ হইয়া যায়। তাই সুদের হার বাড়িলে তাহারা ততটা বিচলিত হন না।

সম্ভাব্য প্রতিদান সম্পর্কে দীর্ঘকালীন প্রত্যাশায় (Long term expectations) পরিবর্তন আসিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় পরিবর্তন আসিতে পারে। ব্যবসায়ীদের ভাষায় বলা চলে যে, 'মুনাফার আশা' বা 'লোকসানের ভয়' বেসরকারী বিনিয়োগপ্রবণতায় উঠানামা ঘটায়। নিচের তালিকাতে আমরা এইরূপ প্রধান শক্তিগুলিকে তালিকাবদ্ধ করিতেছি।

আভ্যন্তরীণ (Endogenous)	বহিরাগত (Exogenous)
আয়ের স্তর বা আয়ে পরিবর্তনের হার; ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদার স্তর এবং উহার গতিধারা (trend); মূলধনের বর্তমান পরিমাণ, বিশেষত স্থির মূলধনের; আর্থিক মজুরির হার এবং অন্যান্য উপাদানের দাম; শেয়ার বাজারের কার্যকলাপ, শেয়ারের দামে উঠানামার মাধ্যমে প্রকাশিত।	আবিষ্কার ও উহার প্রয়োগ; জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও উহার গড়ন (Composition); প্রাকৃতিক সম্পদ; ক্রেতা গোষ্ঠীর মনস্তত্ত্ব; সরকারী আর্থিক ও করনীতি; রাজনৈতিক আবহাওয়া; শ্রমিকদের চলনশীলতা (Labour Movements); সামাজিক আইনগত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বৈদেশিক বাণিজ্য; যুদ্ধ, বিপ্লব এবং মনুষ্যসৃষ্ট অন্যান্য প্রকার পরিস্থিতি; আবহাওয়া ও অপ্রত্যাশিত অন্য কোনরূপ অবস্থা।

উপরের তালিকাতে বিষয়গুলিকে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার সুবিধাও কম নয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় আমূল পরিবর্তন অংশত আভ্যন্তরীণ কারণে ঘটে, ইহারা অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্য হইতে উদ্ভূত এবং; অংশত ইহা বাহ্য নানা প্রকার কারণের ফল। এই পার্থক্যের আরও উপকারিতা হইল নিয়ন্ত্রণের নীতি স্থির করা সম্ভব হয় এবং কিছুটা ভবিষ্যদ্বাণী করাও চলে। স্বল্পকালীন ভবিষ্যদ্বাণী করার সময়ে মোটামুটি ধরিয়া লওয়া চলে যে, বহিরাগত বিষয়গুলি সমান থাকিবে, এই উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির আলোচনাই মূলত গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যায় যে, বিনিয়োগের হার স্থির রাখিতে হইলে (to stabilize the rate of investment) আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করাই অধিকতর সুবিধাজনক। এই সকল বিষয় ছাড়াও, কেইন্‌স্ বলেন, আমাদের আরও বহু বিষয়ের কথা মনে রাখা দরকার, যেমন, উদ্যোক্তাদের 'নার্ভ ও হিস্টিরিয়া', এমন কি তাহাদের

'হজমশক্তি এবং আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া'। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার এইরূপ বিপুল পরিবর্তন হইতে বুঝা যায় কেন বাণিজ্য-চক্রের সমৃদ্ধি ও সংকট উভয়ই তীব্রতর, কেন উভয় দিকেই উঠানামা অস্বাভাবিক। শুধু তাহাই নয়। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, "মোটামুটি স্বাভাবিক ধরনের ব্যবসায়ীদের উপযোগী বা অনুকূল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপরই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে" (কেইন্‌স্)। সর্বোপরি, আমরা সাধারণভাবে এই শিক্ষা পাই যে, ভোগ্যদ্রব্যের জন্য চাহিদার তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের জন্য চাহিদা অনেক বেশি অনুভূতিপ্রবণ এবং বিপদজনক, ইহার উপর কখনই পূর্ণ আস্থা রাখা চলে না।

তারল্যপছন্দ ও সুদের হার (Liquidity Preference and the rate of interest)

আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর নির্ধারণ করিতে হইলে আর একটি বিষয় আলোচনা করিতে হইবে, ইহা হইল সুদের হার, বা তারল্যপছন্দের তত্ত্ব। আয় ও কর্মসংস্থান নির্ভর করে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর, ইহাদের দুইটিই প্রভাবিত হয় সুদের হার দ্বারা। সমাজে টাকার পরিমাণ জানা থাকিলে সুদের হার নিরূপিত হয় তারল্যপছন্দের তালিকার দ্বারা। সুতরাং এই তারল্যপছন্দ কিসের উপর নির্ভর করে (Liquidity Function), তাহা আমাদের বিশ্লেষণ করিতে হইবে। বিভিন্ন সুদের হারে সমাজে এই তারল্যপছন্দের তালিকা এবং টাকার যোগান উভয়ে মিলিয়া দেশে সুদের সাধারণ হার (general rate) স্থির করে।

বিনিয়োগের উপর সুদের হারের ও অন্যান্য প্রভাব জানিতে হইলে তারল্যের বিচার দরকার

তাহা ছাড়া ইহারা আরও ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন সময়ের জন্য ঋণের দাম অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে ফলপ্রসূ হইবে এইরূপ সিকিউরিটিগুলির দাম ও ইহাদের উপর সুদের হার। সমাজে তরল সম্পত্তিগুলির (liquid assets) চাহিদা, উহার সহিত সুদের হারের সম্পর্ক, তারল্যহীন সম্পত্তিগুলির দাম (prices of non-liquid assets), প্রত্যাশিত মুনাফার হার, বিনিয়োগ, আয়স্তর ও কর্মসংস্থান, সকল কিছু ব্যাখ্যা করার জন্য এই তারল্যপছন্দের তত্ত্ব আমরা ব্যবহার করিতে পারি।

তারল্যপছন্দ কাহাকে বলে—"মজুত-প্রবণতা" (Liquidity Preference—the "Propensity to Hoard")

তারল্যপছন্দ কাহাকে বলে বুঝিতে গেলে প্রথমে সঞ্চয় করা (saving) ও মজুত করার (hoarding) মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করিয়া বোঝা প্রয়োজন

সঞ্চয় হইল, ব্যক্তির বা সমষ্টির, যে-কোন ক্ষেত্রে, আয় হইতে ভোগব্যয়ের পার্থক্য —ইহাদের বিয়োগ ফল। আয়ের যে-অংশ, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, ভোগ হইতে পারিল না, তাহাই সঞ্চয় ; অর্থাৎ ভোগব্যয় ও সঞ্চয় উভয়ে মিলিয়াই সেই নির্দিষ্ট স্তরের আয়ের সমান। যেমন কোন ব্যক্তির আয় 100 টাকা, ভোগব্যয় 80 টাকা, ফলে সঞ্চয় 20 টাকা। সঞ্চয় সম্পর্কে ধারণাতে আমাদের আর কিছু চিন্তা করার কারণ নাই। এই 20 টাকা ব্যক্তি কোথায় রাখিল, আলমারীতে কিম্বা মাদুরের তলায়, ব্যাঙ্কে বা শেয়ার কিনিয়া তাহা এই ক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য নয়। আয় এবং ভোগের পার্থক্যই সঞ্চয়।

সঞ্চয় কাহাকে বলে

অপরপক্ষে, এই সঞ্চয় ব্যক্তি কি-ভাবে রক্ষা করিবে, তাহারই উপর মজুত হইল কি না তাহা বোঝা যাইবে। "মজুত" হইল, নগদ টাকার রূপে ব্যক্তি সঞ্চয়ের যে-অংশ জমাইয়া রাখিতে চায়। মজুত করা বলিলে আমরা বুঝিব ব্যক্তি অতরল সম্পত্তিগুলিতে (on non-liquid assets) টাকা খাটাইল না, নগদ টাকারূপে হাতে ধরিয়া রাখিল। আয়ের কিছু অংশ ভোগে ব্যয় না করার অর্থ হইল সঞ্চয় করা ; আর সেই সঞ্চয় ধার না দেওয়া বা বিনিয়োগ না করার অর্থ হইল মজুত করা। সঞ্চয় করিলে উহা ভোগ করা যায় না, ইহা এক ধরনের ত্যাগ স্বীকার ; আর মজুত করিলে সেই সঞ্চয় হইতে সুদ পাওয়া যায় না, ইহাও এক ধরনের ত্যাগ স্বীকার। মজুত করার অর্থ ই হইল ব্যক্তি ধার না দিয়া এবং বিনিয়োগ না করিয়া কিছু আয় (সুদ বা মুনাফা) হইতে বঞ্চিত হইতেছে। মজুত করার এই ধারণা একান্ত মনস্তাত্ত্বিক।

মজুত কাহাকে বলে

মজুত না করিয়া সেই টাকা খাটাইলে সুদ পাওয়া যায়, তাই সুদের হারের উপর ব্যক্তির এবং সমাজের সামগ্রিক মজুতের পরিমাণ নির্ভর করে। বিভিন্ন সুদের হারে সমাজে বিভিন্ন পরিমাণ নগদ বা তরল টাকা লোকে হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়, সুদের হার বাড়িলে তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছা কম ; আর সুদের হার কম থাকিলে তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছা বেশি। ইহাকেই কেইন্‌স্ বলিয়াছেন 'টাকার চাহিদা' (demand for money) এবং বিভিন্ন সুদের হারে টাকার চাহিদাকে আমরা একটি তালিকার আকারে অর্থাৎ নগদ-পছন্দের তালিকার রূপে প্রকাশ করিতে পারি (schedule of liquidity preference)। নগদ টাকার জন্য অর্থাৎ তারল্যের জন্য চাহিদা এবং টাকার

যোগান— এই দুইয়ে মিলিয়া সুদের হারে উঠানামা ঘটায়, ফলে সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আসে।

এই প্রসঙ্গে মজুত (**hoarding**) এবং টাকার প্রচলনবেগ (**velocity of money**), এই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করিলে ভাল হয়। সাধারণভাবে, কেইন্‌সের পূর্বে ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, মজুত করার অর্থ হইল টাকার প্রচলনবেগ কমিয়া যাওয়া, ফলে দামস্তর হ্রাস পাওয়া। সুতরাং চিরাচরিত ধারণায় মজুত করার অর্থ হইল প্রচলন বেগ কমিয়া যাওয়া। কিন্তু মজুত করিলে প্রচলনবেগ কমিয়া উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য হ্রাস পাইবে কি না তাহা নির্ভর করে লোকে কি বিশেষ ধরনে তাহাদের একাংশ মজুত করিতে চায় তাহার উপর। কেউ যদি মাদুরের তলায় জমানো টাকা মজুত করিয়া রাখিতে চায়, তবে সে অবশ্যই চলন্ত টাকাকে প্রচলনধারা হইতে অপসারণ করিয়া আনিতেছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ধরনের মজুত করাকেই লোকে উৎপাদন আয় ও কর্মসংস্থান হ্রাসের কারণ বলিয়া মনে করেন। এইজন্যই রবার্টসন বলিতেছেন যে, সঞ্চয়কে কখনও সঞ্চিত করিয়া রাখা চলে না। আবার, অপরপক্ষে, এই মজুত যদি ব্যাঙ্ক-আমানতের রূপ নেয়, অর্থাৎ নগদ তরল টাকা লোকে ব্যাঙ্কে জমা রাখে, তবে উহার ফল খারাপ না-ও হইতে পারে। কারণ ব্যাঙ্কে রক্ষিত তাহার এই টাকা অচল থাকিতেছে না, অপর কোন ব্যবসায়ীরা ধার লইয়া উহাকে সচল রাখিতেছে, কেইন্‌সের ভাষায় বলিতে গেলে এই ধরনের মজুত "**provides the offsetting facilities for some other party.**" যুক্তির দিক দিয়া অবশ্য বলা চলে যে, ব্যাঙ্কগুলি এই টাকা বসাইয়া না রাখিয়া সুদের বিনিময়ে খাটাইতে পারে বটে, কিন্তু ধার লইতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীরা আগাইয়া না আসিলে ব্যাঙ্কগুলি ইহাতে সক্ষম হইবে না। আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলা চলে যে, ঋণগ্রহীতা পাওয়া গেলেও তাহারা সকল ঋণ উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে খাটাইবার সুযোগ পাইতেছে না, ইহাও সম্ভব পর। এই সকল বিরূপ সম্ভাবনার কথা বাদ দিলে আমরা সোজাসুজি বলিতে পারি যে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে বা এই ধরনে টাকা মজুত করিলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।*

মজুতের বিভিন্ন রূপ

* তাহা ছাড়া নিজেদের হাতে জমানো টাকা অনেক আছে, এইরূপ ধারণা লোকের মনে থাকিলে উহার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ভালই হয় কারণ চলতি আয় হইতে বেশি অংশ ব্যয় করার ইচ্ছা থাকিতে পারে।

সুতরাং লোকের মজুত টাকা কোন্‌রূপে আবদ্ধ রাখিতে চাহে, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আয়স্তরের উপর ইহার প্রভাব কি তাহা জানিতে হইলে ইহার আলোচনা দরকার। কেইন্‌সই সর্বপ্রথম মজুতের ধারণা লইয়া সুদের আর্থিক তত্ত্ব (monetary theory of interest) গড়িয়া তুলিলেন এবং ইহাকে আয়স্তর ও কর্মসংস্থান তত্ত্বের সহিত মিলিত করিলেন। তাঁহার মতে, দামস্তরের উপর মজুতের প্রভাব পড়ে সুদের হারের মাধ্যমে। কেইন্‌সের ধারণায় লোকের মনে টাকা ধরিয়া রাখার ইচ্ছায় কিরূপ পরিবর্তন আসিতেছে উহাই মূল কথা, টাকার প্রচলনবেগ নয়। মজুতের পরিমাণ লইয়া কেইন্‌সের ততটা কিছু বলার নাই, কিন্তু মজুত প্রবণতায় পরিবর্তন হইলে সুদের হারে পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রভাবিত হয়, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। আমাদের তাই, এখন আলোচ্য বিষয় হইবে 'মজুত-প্রবণতা' বা 'নগদ-পছন্দের' তালিকার সহিত সুদের হার, টাকার যোগান, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান-এর যোগাযোগ।

মজুতের পরিমাণ সুদের হারে পরিবর্তন আনিয়া বিনিয়োগকে প্রভাবিত করে

নগদপছন্দের অভিপ্রায় (Motives for Liquidity)

নগদ টাকা লোকে হাতে ধরিয়া রাখিতে চায় কেন, অর্থাৎ কেন তাহারা তরলরূপে তাহাদের সম্পত্তি রাখিতে চায়, তাহা কেইন্‌স বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নির্দিষ্ট কোন একটি সুদের হারে টাকার জন্য মোট চাহিদাকে বলা হয় মিশ্রিত চাহিদা (composite demand for money)। এই মিশ্রিত চাহিদা দুই ধরনের চাহিদা লইয়া গঠিত: (ক) বিনিময়ের মাধ্যমরূপে টাকার চাহিদা, ইহাকে বলে সক্রিয় ব্যালান্স (active balance), এবং (খ) মূল্যের ভাণ্ডাররূপে টাকার চাহিদা, ইহাকে বলে নিষ্ক্রিয় ব্যালান্স (Inactive balance)। বিনিময়ের মাধ্যমরূপে টাকার চাহিদা হয় দুইটি অভিপ্রায়ে, লেনদেন ও সাবধানতা (transactions and precaution); আবার মূল্যের ভাণ্ডাররূপে টাকার চাহিদা হয় ফাটকাবাজির (speculation) অভিপ্রায়ে। এই তারল্যের অভিপ্রায়গুলি আলোচনা করা যাউক।

মিশ্রিত চাহিদার মধ্যে বিভিন্নরূপ চাহিদা থাকে

প্রথমত, লেনদেনের অভিপ্রায়। কোন একটি বিশেষ সময়ে, সমগ্র দেশের সকল অধিবাসী একত্রে, দেশের টাকার এক অংশ নিজেদের দৈনন্দিন লেনদেনের

কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে হাতে ধরিয়া রাখিতে চান। ব্যক্তি বা পরিবারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে; ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও টাকা লগ্নী করা এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা হাতে পাওয়া, ইহাদের মধ্যে এইরূপ সময়ের ব্যবধান (time lag) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে লেনদেনের কাজ চালাইবার জন্য নগদ টাকার দরকার হয়। সময়ের এই ব্যবধান যত কম, এই উদ্দেশ্যে নগদ টাকা হাতে রাখার প্রয়োজনও তত কম হইবে। মাসের শেষে যে ব্যক্তি মাহিনা পায়, তাহার তুলনায় সপ্তাহের শেষে যে মাহিনা পায় তাহাকে নগদ টাকা কম হাতে রাখিতে হয়। ঠিক এইরূপ, কোন ফার্ম নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যদি মনে করে যে, টাকার লগ্নী করা ও বিক্রয়লব্ধ মূল্য হাতে পাওয়া ইহাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম হইবে, তবে সে কম নগদ টাকা হাতে রাখিবে; এইরূপ সময়ের ব্যবধান বেশি থাকিবে মনে করিলে তাহার তারল্যপছন্দ তুলনামূলকভাবে বেশি হইবে। এই প্রসঙ্গে যাহা লক্ষ্য রাখা দরকার তাহা হইল এই যে, লেনদেনের উদ্দেশ্যে টাকার এই চাহিদার তীব্রতা বা শক্তি নির্ভর করে আয়স্তরের উপর। ইহাকে আমরা প্রকাশ করিতে পারি এইভাবে যে, $L_t = f(Y)$; L_t হইল লেনদেনের অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা এবং Y হইল আয়স্তর।

লেনদেনের অভিপ্রায় কাহাকে বলে ও কিসের উপর নির্ভরশীল

আমাদের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা জানি যে, দেশে যখন তুলনামূলকভাবে আয়স্তর, কর্মসংস্থান স্তর এবং দামস্তর উঁচুতে আছে সেই অবস্থায় ব্যক্তি ও ফার্ম সকলেরই লেনদেনের উদ্দেশ্যে অধিক টাকা হাতে রাখা দরকার। আয়স্তরই প্রধান শক্তি, যাহা সামগ্রিক চাহিদাকে এবং ফলে সাধারণ দামস্তরকে প্রভাবিত করে। সুতরাং আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি লেনদেনের রক্ষিত টাকা আয়স্তরের উপরই নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, লেনদেনের অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকার চাহিদায় পরিবর্তন আসে অনেক কারণে, যেমন, ব্যক্তির মনে ভবিষ্যৎ আয়স্তর সম্পর্কে প্রত্যাশায় পরিবর্তনের ফলে, আয় ও খরচার মধ্যে প্রচলিত সময়ের ব্যবধান পাল্টাইয়া গেলে, ধারে জিনিসপত্র কেনার সুবিধা বাড়িল কি কমিল তাহার উপরে এবং ব্যক্তিগত গড় আয়ে পরিবর্তনের উপরে।

এই Lt বা লেনদেনের অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকাতে কখন পরিবর্তন আসে

দ্বিতীয়ত, নগদ-পছন্দের আর একটি কারণ হইল যে, অধিবাসীদের সর্বদা আকস্মিক ও অচিন্ত্যপূর্ব ব্যয় মিটাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

ইহাকে বলে সাবধানতার অভিপ্রায়। ব্যক্তিরা বা ফার্মগুলি সাধারণত ব্যাঙ্কে তৎক্ষণাৎ চেক কাটিয়া তোলা যায় এইরূপ আমানতে সর্বদা কিছু পরিমাণ তরল টাকা রাখে; কারণ হঠাৎ কোন না কোন প্রয়োজনে কিছু টাকা সকলেরই দরকার হইতে পারে। হঠাৎ কোন বন্ধুর বিবাহে উপহার দিতে হইতে পারে; সস্তায় সুলভ মূল্যে বা নীলামে জিনিসপত্র কেনার দরকার হইতে পারে, অচিন্ত্যনীয় কোন বিপদ আপদ আসিয়া পড়িতে পারে; ফার্মগুলিও হঠাৎ সস্তায় কাঁচামাল কেনার সুযোগ পাইতে পারে, যন্ত্রটি অসময়ে বিকল হইতে পারে। সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ নির্ভর করে আয়স্তরের উপর—কারণ এই সকল আনুষঙ্গিক ব্যয়গুলি (incidental expenses) আয়স্তর বাড়িলে বৃদ্ধি পায় এবং আয়স্তর কমিলে হ্রাস পায়। এই নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে আমরা এইরূপে প্রকাশ করিতে পারি যে, $L_p = f(Y)$; L_p হইল সমাজে সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকার চাহিদায় পরিবর্তন আসে অধিবাসীদের মনে ভবিষ্যৎ ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি সম্পর্কে ধারণা বদলাইলে, তরল সম্পত্তি পাওয়ার সুবিধা ও তরল টাকা হাতে রাখার খরচা (ব্যাঙ্কের পাওনা) প্রভৃতিতে পরিবর্তন আসিলে।

সাবধানতার অভিপ্রায় কাহাকে বলে ও কিসের উপর নির্ভরশীল

লেনদেনের এবং সাবধানতার জন্য রক্ষিত টাকাকে কেইন্‌স একই শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রধানত দুইটি কারণ আছে। প্রথমত, ইহাদের জন্য চাহিদা মোটামুটি স্থির, স্থিতিশীল সমাজে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা জানা আছে এবং ইহাদের সম্পর্কে সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে। তাই ইহাদের ক্ষেত্রে, টাকাকে নিছক বিনিময়ের মাধ্যমরূপে গণ্য করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা সুদের হার সম্পর্কে সচেতন নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতেই ইহা আমরা দেখিতে পাই। সুদের হার বাড়িলে বা বণ্ডের দাম কমিলে এই দুই উদ্দেশ্যে রক্ষিত টাকার পরিমাণ সাধারণত বদলায় না, মোটামুটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু টাকা এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তি ও ফার্মগুলি হাতে রাখে। সুদের হার $\frac{1}{2}\%$ বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে এই দুই উদ্দেশ্যে লোকে কম টাকা হাতে রাখিয়া বেশি বণ্ড কিনিতে শুরু করিল তাহা দেখা যায় না; আবার সুদের হার $\frac{1}{2}\%$ কমিলে বণ্ড বিক্রয় করিয়া এই উদ্দেশ্যে টাকা বেশি হাতে রাখিতে আরম্ভ করিল, ইহাও ঘটে না। কিন্তু এই দুইটি অভিপ্রায়ে রক্ষিত

ইহাদের একই শ্রেণীতে ধরা হইয়াছে কেন

টাকাকে আমরা আলোচনা হইতে বাদ দিতে পারি না। কারণ লোকের মনে নিষ্ক্রিয় তহবিল হইতে টাকা সরাইয়া আনিয়া সক্রিয় তহবিলে রাখার ইচ্ছা যদি বাড়ে, তবে সুদের হার প্রভাবিত হইবে। তাই টাকার মিশ্রিত চাহিদার (composite demand) মধ্যে ইহাদের গণ্য করা নিশ্চয় দরকার।

তৃতীয়ত, গতিশীল সমাজে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, তাই টাকার সকল কাজের মধ্যে মূল্যের সঞ্চয়রূপে কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টাকার এই ধর্ম বা গুণের দরুনই লোকে ফাটকাদারির অভিপ্রায়ে নগদ কিছু টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়। ইহাকে ফাটকাদারির অভিপ্রায় বলে, কারণ, অর্থ নৈতিক জগতের অনিশ্চয গতিপ্রকৃতির মধ্যে নিহিত মুনাফার আশা লোকসানের ভয় ইহাকে প্রভাবিত করে। বিশেষত, সুদের হারে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনায় টাকার এইরূপ চাহিদা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন ধনী ব্যক্তিরা এবং বিনিযোগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী প্রভৃতি) যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে সুদের হার চড়িবে, তবে তাহারা বর্তমানে দীর্ঘকালীন বণ্ড কিনিয়া টাকা আবদ্ধ করিতে চাহিবে না। যেমন, বাজারে সুদের হার 4%, এক ব্যক্তির নিকট 1000 টাকা আছে। সে এই টাকা দিয়া কিছু বণ্ড কিনিয়া রাখিতে পারে, বছরের শেষে তাহার 40 টাকা আয় হইবে। কিন্তু ইহা না করিযা সে এই 1000 টাকা অলস অবস্থায় হাতে ধরিয়া রাখিতে পারে ; ইহাতে সে সুদ হইতে বঞ্চিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার তারল্য বজায় আছে, এই অবস্থাকেই সে তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক মনে করিতেছে। মনে কর, টাকার বাজারে সকলের মনে ধারণা যে, সুদের হার শীঘ্রই 5% হইবে। ইহার অর্থ হইল 1000 টাকার বণ্ড হইতে 40 টাকার স্থায়ী বাৎসরিক আয় পাইতে হইলে বণ্ডের দাম হইবে 800 টাকা (40/0·05)। ইহার ফলে ব্যক্তির 200 টাকা মূলধন বাঁচিয়া গেল, টাকাটা আবদ্ধ না রাখায় তাহার পক্ষে এই অবস্থার সুযোগ লওয়া সম্ভব হইল। এইরূপে ফাট্কা নিযোগের অভিপ্রায়ে লোকে নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়। উপরের উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, ফাটকা নিয়োগের উদ্দেশ্যে রক্ষিত টাকার পরিমাণে পরিবর্তন আসে সুদের হারে পরিবর্তন আসিলে, ইহাকে তাই সুদের অপেক্ষক (function of rate of interest) বলা চলে। আমরা ইহা প্রকাশ করিতে পারি এইভাবে যে, $L_s = f(r)$. কেইন্‌স টাকার এইরূপ চাহিদার উপর বিশেষ

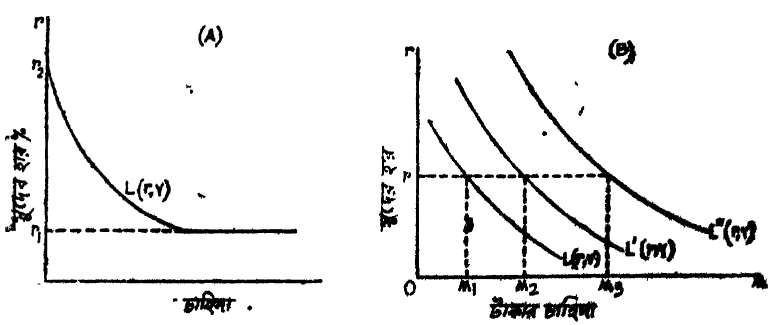
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন কারণ ইহা সুদের হারে পরিবর্তন সম্পর্কে খুবই অনুভূতিশীল।

নগদপছন্দের তালিকা (Schedule of Liquidity Preference or the Liquidity Function)

বিভিন্ন সুদের হারে লোকে যে-বিভিন্ন পরিমাণ টাকার চাহিদা করে, অর্থাৎ নগদ ও তরলরূপে যে সকল বিভিন্ন পরিমাণ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়, তাহাদের তালিকাকে বলে নগদপছন্দের তালিকা (schedule of Liquidity Preference)। আয়স্তর সমান ধরিয়া লইলে টাকার চাহিদা সুদের হারের বিপরীত দিকে উঠানামা করে (inversely varies with the interest rate)। সুতরাং নগদ পছন্দ হইল সুদের হারের অপেক্ষক অর্থাৎ ইহা সুদের হারের উপর নির্ভরশীল (is a function of the interest rate), সুদের হার বাড়িলে ইহার পরিমাণ কমে, এবং সুদের হার কমিলে ইহার পরিমাণ বাড়ে। ইহার কারণ হইল সুদের হার কম থাকিলে নগদ বা তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখায় লোকসান কম, তাই লোকে বেশি টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে কাতর হয় না। সুদের হার যত বেশি বাড়িবে, টাকা হাতে রাখিলে লোকসান তত বেশি। তাই লোকেরা বেশি টাকা ধার দিতে চাহিবে, অর্থাৎ অতরল সম্পত্তিগুলিতে টাকা খাটাইবার দ্বিধা জয় করিতে পারিবে।

নগদ-পছন্দ সুদের হারের অপেক্ষক

কোন এক বিশেষ আয়স্তরে এই নগদপছন্দের তালিকাকে, অর্থাৎ সুদের হারের সহিত নগদপছন্দের অপেক্ষক-সম্পর্ককে (Functional relationship) আমরা নিচের রেখা-চিত্রে প্রকাশ করিতে পারি :



উপরের (A) চিত্রে দেখা যাইতেছে, নগদপছন্দ হইল সুদের হারের হ্রাসমান

অপেক্ষক (a decreasing function of the rate of interest or $\delta L/\delta r < O$)। কম সুদের হারে লোকের নগদপছন্দ বেশি। বেশি সুদের হারে তাহাদের এই নগদপছন্দ কম। খুব বেশি সুদের হারে, যেমন, r_2 তে লোকেরা তরল সম্পত্তি (অর্থাৎ নগদ টাকা) মোটেই হাতে রাখিতে চাহে না, তাই তারল্যপছন্দের রেখা লম্বমুখী অক্ষের সহিত মিশিয়াছে, যেখানে $L(r,Y)=O$. বাস্তবে অবশ্য দৈনন্দিন লেনদেন ইত্যাদির জন্য লোকেরা নিশ্চয় কিছু টাকা হাতে রাখিবে, যদিও উহার উপর সুদ না পাওয়ায় তাহাদের কিছুটা লোকসান হইতে থাকে। লক্ষ্য রাখা দরকার যে, খুব কম সুদের হারে, যেমন r_1-এ টাকার চাহিদারেখা ভূসমান্তরাল হইয়া উঠে। অর্থাৎ, খুব কম সুদের হারে তারল্য পছন্দের সুদগত স্থিতিস্থাপকতা অসীম (demand for money is infinitely elastic with respect to interest)। ইহার তাৎপর্য এই যে, যখন সুদের হার খুব কম তখন লোকে নিজেদের পূর্ণ তারল্য বজায় রাখিতে চায় ; সুদ-প্রদানকারী সম্পত্তির তুলনায় নগদ টাকা হাতে জমাইয়া রাখার সুবিধা অনেক বেশি।

নগদ পছন্দ রেখার আকৃতি কিরূপ ও কেন

উপরের (B) চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে, একই সুদের হারে নগদপছন্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে—OM_1, হইতে OM_2, OM_3 হইতেছে। নগদপছন্দের সমগ্ররেখাটি (অর্থাৎ সমগ্র নগদপছন্দের অপেক্ষক বা the entire liquidity function) উপরে উঠিয়া যাইতেছে। সুদের হার সমান থাকা অবস্থাতেও এইরূপ ঘটিতে হারে, যদি আয়স্তর বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত আয়স্তরে লোকেরা সকলে মিলিয়া পুরাণো স্থির সুদের হারেই পূর্বাপেক্ষা বেশি টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে চায়, তাই সমগ্র রেখাটি উপরে উঠিয়া যাইতেছে।*

কেইন্‌সের মতে, এই নগদপছন্দের তালিকা বা $L(r,Y)$ রেখা এবং সমাজে টাকার যোগান উভয়ে মিলিয়া সুদের হার নিরূপণ করে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে M রেখা দেখা যাইতেছে, ইহা প্রকাশ করে টাকার যোগান। আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, দেশে টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হয় স্বাধীনভাবে ; আর্থিক

* কেবলমাত্র আয়স্তর নহে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যাশায় পরিবর্তন আসিলে, আর্থিক মজুরি, কর হার, প্রভৃতি বদলাইলেও এইরূপ ঘটিতে পারে। তবে ইহাদের পরিবর্তন আয়স্তরে প্রত্যাশিত পরিবর্তনের মাধ্যমেই নগদ পছন্দে পরিবর্তন আনে।

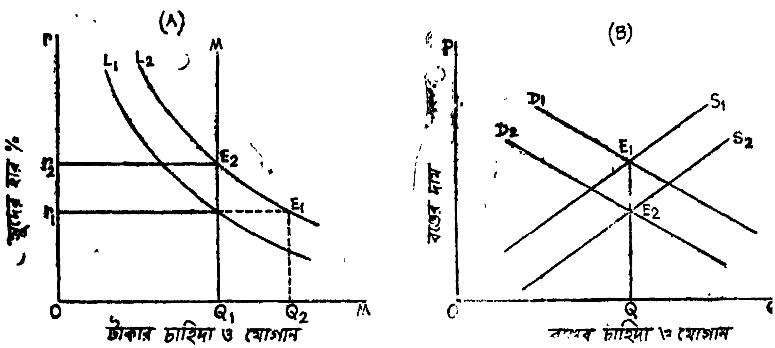
কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা, তাহাদের নিজস্ব কোন নীতি অনুযায়ী। ইহা সুদের হারের অপেক্ষা রাখে না, তাই লম্বমুখী অক্ষের সমান্তরাল। টাকার যোগান বা M রেখা ডাহিনে সরিলে টাকার যোগানে বৃদ্ধি প্রকাশ করে; উহা বামে সরিলে টাকার যোগানে হ্রাস বোঝা যায়। M রেখার অপসরণ (shift), অর্থাৎ টাকার যোগানে পরিবর্তন অনেক কারণে ঘটিতে পারে, যেমন, খোলা বাজারে কার্যকলাপ, ডিসকাউণ্ট নীতি বা ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য নীতিসমূহ।* পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে r_0 হইল ভারসাম্য-সুদের হার; টাকার চাহিদা রেখা $L(r,Y)$ এবং স্বনির্ভরশীল টাকাব যোগান রেখা M—এই উভয়ের ছেদবিন্দুতে এই সুদের হার পাওয়া যাইতেছে। এই সুদের হারে টাকার চাহিদা এবং যোগান উভয়েই OM. যদি বিভিন্ন সুদেব হারে লোকে কম নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায় তবে তারল্যপছন্দের রেখা বামদিকে সরিয়া আসিবে, নূতন রেখা $L_1(r,Y)$ দেখা দেয়। এই অবস্থায় সুদের হার কমিযা আসে, নূতন ভারসাম্যের সুদ r_1 পাওয়া যায়। টাকার পরিমাণ সমান থাকিলেও তাই, নগদ পছন্দ বদ্‌লাইলে সুদের হারে পরিবর্তন আসিতে পারে। আবার নগদপছন্দ সমান অবস্থায় টাকার পরিমাণ কমিলে সুদের হার বাড়িবে এবং বাড়িলে ইহা কমিবে। আমরা মোটামুটি ধরিয়া লইতেছি যে, স্থিতিশীল এই ভারসাম্য স্থাপিত হয় সময়ের গতিপথে (static equilibria have been dynamically established through time)।† ভারসাম্য সুদের হারে টাকার চাহিদা ও যোগান সমান বলিলে বোঝা যায যে, লোকের আর নিজেদের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়াইবার বা কমাইবার কোন ঝোঁক নাই। বণ্ড বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা হাতে রাখা বা হাত হইতে নগদ টাকা ছাড়িয়া দিয়া বণ্ড হাতে রাখা—লোকেরা এখন এইরূপ কিছুই করিতেছে না, তরল ও অতরল সম্পত্তির কোনটির পরিমাণেই এখন কোনরূপ পরিবর্তন আসিতেছে না।

L ও M-এর ঘাত প্রতিঘাতে সুদের হার স্থির হয়

* "Actually, of course, the fiscal monetary authorities and the private banking system exercise their due influence on the availabilities of money and credit. Since the motives underlying the supply of money are highly complex and often non-economic, shifts in the M function might simply be considered a matter of central bank decisions. If this procedure is accepted then it will be rather easy to show the determination of the equilibrium market rate of interest."

† ইহাদের সামঞ্জস্যসাধনকারী শক্তি হইল $dr/dt = f(L_j - m)$। ইহাদের মধ্যে dr/dt হইল সুদের হারে পরিবর্তন এবং $L-m$ হইল টাকার চাহিদা ও যোগানে পার্থক্যের পরিমাণ। ভারসাম্যের স্তরে $L(r,Y)-m=O$, অর্থাৎ যেখানে আয়হীন তরল টাকা বা নগদ-পছন্দের পরিমাণ এবং আয়শীল অতরল সম্পত্তি (যেমন, ষ্টক ও বণ্ড)—উভয়ের কাহারও কোনরূপ পরিবর্তনের দিকে ঝোঁক নাই।

নগদপছন্দ ও সুদের হারের সম্পর্কটি আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করা চলে। আমরা জানি, টাকার যোগান সমান থাকা অবস্থায়, নগদপছন্দ বাড়িয়া গেলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে, কারণ লোকের এই নগদপছন্দ বা মজুতের ইচ্ছা জয় করিয়া ধার দিতে তাহাকে রাজি করাইতে হইলে পূর্বাপেক্ষা বেশি সুদের লোভ দেখাইতে হইবে। অপরপক্ষে, টাকার যোগান সমান থাকা অবস্থায় নগদ-পছন্দ কমিয়া গেলে সুদের হার কমিয়া যাইবে, কারণ এই অবস্থায় পূর্বাপেক্ষা কম সুদেই সে ধার দিতে রাজি থাকিবে, বণ্ড বা সিকিউরিটিতে টাকা খাটাইতে তাহার আপত্তি আর ততটা তীব্র নয়। নিচের ছবিতে ইহা দেখানো হইতেছে। টাকার যোগান M নির্দিষ্ট আছে, নগদ পছন্দ L_1 হইতে L_2-তে বৃদ্ধি পাইলে সুদের হার



r_1 হইতে r_2 হইয়াছে। লোকে বেশি টাকা হাতে রাখিতে চায়, কিন্তু আর্থিক কর্তৃপক্ষ টাকা বাড়াইল না, নগদ টাকা হাতে রাখার সাধ মিটিতেছে না, এই অবস্থায় একটু বেশি সুদ দিলে তবেই প্রান্তিক মজুতকারীরা (marginal hoarders) নগদ টাকার উপর অধিকার কিছুটা ছাড়িয়া দিবে, অতরল সম্পত্তি ক্রয় করিতে রাজি হইবে (অর্থাৎ, বণ্ডের দাম না কমিলে সে উহা কিনিবে না)। r_1 সুদের হারে টাকার নূতন চাহিদা উহার যোগান অপেক্ষা $Q_1 Q_2$ বেশি। এই সুদের হারে, তাই, যোগান ও চাহিদায় ভারসাম্য আসিতেছে না। একমাত্র বর্ধিত সুদের হার r_2-তে টাকার নূতন চাহিদা E_2 বিন্দুতে টাকার যোগানের সমান। তাই r_2, অর্থাৎ $Q_1 E_2$ হইল ভারসাম্যের সুদের হার। বিপরীত পক্ষে, নগদ পছন্দ L_2 হইতে L_1-এ কমিয়া গেলে সুদের হার r_2 হইতে r_1 হইবে।

(B) চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে, কিরূপে বণ্ডের দামে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া সুদের হারে পরিবর্তন প্রকাশ পাইতেছে। মনে কর, নগদ পছন্দ বাড়িয়া

যাওয়ায় বণ্ডের জন্য চাহিদা D_1 হইতে কমিয়া D_2 হইল, অর্থাৎ লোকে নগদ টাকা হাতে রাখা সুবিধাজনক মনে করিতেছে। ফলে তাহারা S_1 হইতে S_2 পরিমাণ বণ্ড (যোগান বৃদ্ধি) বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনিয়াছে। বণ্ডের চাহিদা হ্রাস এবং যোগান বৃদ্ধির দরুন উহাদের দাম কমিয়া QE_2 হইয়াছে। বণ্ডের দাম হ্রাসের অর্থই হইল সুদের হারে বৃদ্ধি। এইরূপে টাকার চাহিদা ও যোগানে পরিবর্তন কিরূপে সুদের হারে পরিবর্তন আনে তাহা বণ্ডের দামে পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই জানিতে পারা যায়। বস্তুত বণ্ডের দামে পরিবর্তনই সুদের হারে পরিবর্তনের সূচক।

সুদের হারে পরিবর্তন প্রকাশ পায় বণ্ডের বাজারে

সুতরাং কেইন্‌সের মতে, ভারসাম্য সুদের হারের শর্ত হইল $M = M_1 + M_2 = L_1(Y) + L_2(r)$. টাকার যোগানের দিকে, M হইল নগদ টাকা ও চল্‌তি ব্যাঙ্ক-আমানত, M_1 হইল লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা ($L_t + L_p$); M_2 হইল ফাটকাদারির অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা। টাকার চাহিদার দিকে, $L_1(Y)$ হইল লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার পরিমাণ, ইহা আয়স্তরের উপর নির্ভরশীল; এবং $L_2(r)$ হইল ফাটকাদারির অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার পরিমাণ, ইহা, সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। তারল্যের এই সমীকরণ (Liquidity equation) হইতে আমরা জানিতে পারি কিরূপে নির্দিষ্ট কোন আয়ের স্তরে টাকার যোগান ও চাহিদার সমতার বিন্দুতে সুদের হার নির্ধারিত হয়।

টাকার যোগান ও চাহিদা যেখানে সমান

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ : ক্লাসিকাল ও নয়াক্লাসিকাল ধারণা (Savings and Investment : Classical and Neo-Classical doctrines) :

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিশ্লেষণের কাজ ছিল সুদের হার নিরূপণ করা, আর আধুনিক কালে বলা হয় যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়ের মিলিত প্রভাবে উৎপাদন, আয়স্তর ও কর্মসংস্থানের স্তর নির্ধারিত হয়। দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে যেমন দ্রব্যের দাম নিরূপিত হয়, ঠিক সেইরূপ ক্লাসিকাল মতে সঞ্চয়ের যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে সুদের হার স্থির হয়। চল্‌তি সুদের হারে পরিবর্তন ঘটিলে সমাজে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আসে, ঠিক যেমন ভারসাম্যের বাজারদরে পরিবর্তন আসিলে

ক্লাসিকাল ধারণা কিরূপ ছিল

বোঝা যায় যে, দ্রব্যটির যোগান ও চাহিদায় ঠিকমত ব্যালান্স নাই। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আসার পথে দেশের আয়স্তর স্থির থাকে, অথবা আয়স্তরে পরিবর্তন না ঘটাইয়াই সুদের হার সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পরিবর্তন আনে ও ইহাদের ভারসাম্য স্থাপন করে।

স্বে-র নিয়ম (**Say's Law**) আলোচনা করিলেই এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে। যোগান নিজেই নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে, এই কথা বলিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সর্বদা আপনাআপনি সমান থাকিবে এই কথা মানিয়া লইতে হয়, কিন্তু কিরূপে ও কোন্ পথে ইহাদের ভারসাম্য আসে তাহা আমরা জানিতে পারি না। ক্লাসিকাল তত্ত্ব ধরিয়া লয় যে, চল্‌তি সুদের হারে যত খুশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা চলে, বিনিয়োগের সুযোগের কোন অভাব নাই, এবং সুদের হারে পরিবর্তনের ফলে সঞ্চয়ে বিপুল পরিবর্তন আসে।

স্বে-র বাজারের নিয়ম হইতেই আমরা ইহা জানিতে পারি

সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয় বাড়ে, এবং ইহাকে লগ্নী করার অফুরন্ত সুযোগ থাকায় সবটাই বিনিয়োগে চলিয়া যায়। এই তত্ত্বের নিহিত ধারণা (**implied idea**) হইল, সঞ্চয়াধিক্য (**over-saving**) বা বিনিয়োগাধিক্য (**over-investment**) বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না।

অপরপক্ষে, সঞ্চয় যদি নির্ভর করে আয়স্তরের উপর, তবে সুদের হারের সহিত সঞ্চয়ের সম্পর্ক ভিন্নরূপ হইয়া পড়ে। ঠিক সেইরূপ চল্‌তি সুদের হারে বিনিয়োগের সুযোগ (**investment opportunities**) যদি সীমাবদ্ধ হয়, তবে বিনিয়োগের সুদগত নির্ভরশীলতা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। যদি আমরা মানিয়া লই যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়ই আয়স্তরের উপর নির্ভর করে, সুদের হারের উপর নয়, তবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে তারতম্য ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়। যেমন উচ্চ আয়-সম্পন্ন দেশগুলিতে আয় এত বেশি যে সকল সঞ্চয় বিনিয়োগের উপযুক্ত সুযোগের অভাব দেখা যাইতেছে। এই আয়স্তরে সুদের হার যত কমই হউক না কেন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আনিতে পারিতেছে না।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ নির্ভর করে আয়স্তরের উপর, সুদের হারের উপর নয়

নয়া ক্লাসিকাল একদল লেখক, যেমন, উইক্‌সেল, মাইসেস, হায়েক, প্রভৃতি এই সম্পর্কে একটু নূতন ধরনের আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মতে

সমাজে অর্থনৈতিক সংকটের কারণ হইল ভোগাধিক্য (over consumption বা সঞ্চয়ের কম্‌তি (under saving)। এই কথা বুঝাইবার জন্য তাহারা সুদের 'স্বাভাবিক হার' (Natural rate) এবং 'বাজারের-হার' (Market rate) সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। সুদের 'স্বাভাবিক হার' বলিলে বোঝা যায় এমন হার যাহাতে দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান থাকে, ফলে দাম-স্তর পরিবর্তিত হয় না। আবার বাজারী সুদের হার হইল দেশে চল্‌তি সুদের হার, টাকার বাজারের অবস্থার উপর এই হার নির্ভর করে। যখন দেশে এই বাজার হার ও স্বাভাবিক হার সমান থাকে তখন সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হয়, দামস্তর অর্থাৎ টাকার মূল্য অপরিবর্তিত থাকে, দেশে আর্থিক ভারসাম্য বজায় থাকে। "স্বাভাবিক সুদের হার" ব্যাখ্যা করা বিশেষ অসুবিধাজনক, কারণ বিভিন্ন লেখক এই ধারণাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে মোটামুটি ভাবে, মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ক্ষমতার ভিত্তিতে মুনাফার যে হার (rate of profit determined by the productivity of capital), তাহাকেই সুদের 'স্বাভাবিক হার' বলা হইয়া থাকে। 'স্বাভাবিক' বিশেষণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'বাজার' হার ইহা হইতে পৃথক হইলে অস্বাভাবিক কোন ঘটনা দেখা দিবে, দামস্তর স্থির থাকিবে না এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য বিচ্যুত হইবে।

উইকসেলের তত্ত্ব: "স্বাভাবিক" সুদের হার

"সুদের স্বাভাবিক হার" কাহাকে বলে

উভয়ের তারতম্যের ফলে আর্থিক ভারসাম্য হইতে কিরূপে বিচ্যুতি ঘটে তাহা আমরা আলোচনা করিতে পারি। সুদের 'বাজার-হার' যখন উহার 'স্বাভাবিক-হার' হইতে কম থাকে, তখন উৎপাদন বৃদ্ধি করা লাভজনক হইয়া উঠে, কারণ ঋণের দাম অপেক্ষা যন্ত্রপাতির প্রতিদান বেশি। এই অবস্থায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং সমৃদ্ধি দেখা যায়। এই সমৃদ্ধির গতি থামিয়া যাইতে পারে, যদি ভুল ব্যাঙ্কিং নীতির ফলে সুদের বাজার-হার চড়িয়া যায় এবং লোকে ভোগ কমাইয়া সঞ্চয় করিতে না থাকে। সঞ্চয়ের ঘাট্‌তি ((under-saving) দেখা দিলেই সংকট দেখা দিবে। অর্থাৎ লোকেরা যদি বর্তমানের ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া ব্যাঙ্ক বা মূলধন-বাজারের মাধ্যমে উৎপাদকদের মূলধন-যোগান অব্যাহত না রাখে, তবে নিশ্চয় সংকট দেখা দিবে। ভোগবিলাসী জনসাধারণই তাই সংকটের জন্য দায়ী, বিনিয়োগকারীরা তো বিনিয়োগের জন্য সর্বদা প্রস্তুত হইয়াই আছে। বাজারে

দামস্তরে উঠানামা কেন হয়

সুদের হার কম থাকিলে বিনিয়োগ-সুযোগের কোন অভাব নাই, ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, তাই আর কোন অসুবিধা নাই।

এই ধারণা কেইন্‌সীয় তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহা আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব। এই তত্ত্বের প্রণেতারা ইহা চোখে দেখিতে পান নাই যে, সুদের 'স্বাভাবিক হার'ই খুব কম হইতে পারে। উহা অপেক্ষা বাজার-হার আর কমানো চলে না, তাই বিনিয়োগ বাড়ানো মোটেই সম্ভব হইতেছে না। যেমন মনে কর, বর্তমান অবস্থায় 'সুদের স্বাভাবিক হার' শতকরা ৩ টাকা; নূতন বিনিয়োগ হইতে গেলে বাজারী সুদের হার ইহা অপেক্ষা অনেক কম হওয়া দরকার। কিন্তু বর্তমানের মনস্তাত্ত্বিক ও প্রতিষ্ঠানগত জটিলতার দরুণ সুদের বাজার-হার শতকরা ২½-এর কম কখনই নামানো চলে না। এই অবস্থায় নূতন বিনিয়োগ বাড়াইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

এই তত্ত্বের ত্রুটি

এই কারণেই, 'সুদের স্বাভাবিক হার' কিসের উপর নির্ভর করে তাহার আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক ভারসাম্যহীনতা (**Monetary disequilibrium**) ব্যাখ্যা করার কাজে সুদের স্বাভাবিক হার ও বাজার হারে পার্থক্য বলিলে এই বিষয়ে সকল কিছু বলা শেষ হয় না, বিশ্লেষণও নিছক অবাস্তব হইয়া পড়ে। দেশে মূলধন-গঠনের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া লোকেরা প্রভূত পরিমাণে সঞ্চয় করিতেছে, ফলে সুদের হারও কম আছে—এইরূপ অবস্থাতেও 'সুদের স্বাভাবিক হার' ততটা উঁচু না থাকিতে পারে যাহাতে দেশের সকল সঞ্চয় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করিবে; বাজারী সুদের হার কম থাকিলেও করিবে না। কেইন্‌স্‌-ই প্রথমে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এই বিষয়ে স্পষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন। নূতন বিনিয়োগের ব্যয় অপেক্ষা উহা হইতে সম্ভাব্য ও প্রত্যাশিত আয়ের পরিমাণ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করিতে পারিলে, 'স্বাভাবিক হার'কে কিরূপে বাড়ানো যায় বা 'বাজারী হার'কে কিরূপে কমানো যায় সেই সকল সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার কথা আমরা আলোচনা করিতে পারি।

কেইন্‌সীয় তত্ত্বের গুরুত্ব

কেইন্‌সীয় সঞ্চয়-বিনিয়োগ তত্ত্ব শুরু করার পূর্বে আমরা আর একটি তত্ত্ব আলোচনা করিব, ইহা হইল সঞ্চয়াধিক্য তত্ত্ব বা ভোগ-ঘাটতির তত্ত্ব (**Theory of over-saving or under-consumption**)। এই তত্ত্বের প্রচারক ছিলেন হব্‌সন (**Hobson**)। ম্যাল্‌থাস,

সিস্‌মণ্ডি ও মার্কসের ধারণার সহিত এই তত্ত্বের কিছুটা মিল আছে, কারণ হব্‌সনের মতে ধনতান্ত্রিক সমাজের আয়বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার মধ্যেই সঞ্চয়াধিক্য ঘটিবার বীজ লুকানো আছে। আয়-বৈষম্যের দরুণ বেশির ভাগ লোকের আয় কম, ফলে দেশে ভোগব্যয় বাড়িতে পারে না, অথচ সঞ্চয় বৃদ্ধির অভ্যাসের দরুণ ক্রমাগত মূলধন-সঞ্চয় বাড়িয়া চলে, ভোগের স্তর রক্ষা করার তুলনায় দেশে অনেক বেশি পরিমাণ বিনিয়োগ ঘটিতে থাকে, সামগ্রিক উৎপাদনাধিক্য দেখা দেয় এবং দেশময় বেকারি সৃষ্টি হয়।

সঞ্চয়াধিক্যের বা ভোগ-ঘাট্‌তির তত্ত্ব

আধুনিক কালের ধারণা, অর্থাৎ কেইন্‌সের তত্ত্বকে গড়িয়া তুলিতে হব্‌সনের তত্ত্ব কয়েকটি দিক হইতে সাহায্য করিয়াছে। (ক) জাতির সমৃদ্ধি নির্ভর করে ভোগব্যয় বৃদ্ধির উপর, (খ) দেশের মূলধন-গঠন সঞ্চয়ের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা প্রকৃত ও প্রত্যাশিত ভোগব্যয়ের উপর নির্ভর করে, এবং (গ) আর্থিক ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে আয়-বণ্টন করাই মূল প্রয়োজন—এই সকল ধারণা হব্‌সনের তত্ত্বে পাওয়া যায়।

এই তত্ত্বের গুরুত্ব

কিন্তু এই তত্ত্বের মূল গলদ হইল, ইহা ধরিয়া লয় যে, যাহা সঞ্চিত হয় উহার সবটাই প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ হইতেছে। অর্থাৎ ইহার ভুল হইল বাড়্‌তি সঞ্চয়কে বাড়্‌তি বিনিয়োগ বলিয়া মনে করা, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য না রাখা। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের বহুবিধ সমালোচনা করিলেও হব্‌সন্‌ মনে করিতেন যে, সুদের হার সর্বদাই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আনিতেছে, ফলে তাঁহার নিকট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারা একই বলিয়া মনে হইত। প্রকৃতপক্ষে হব্‌সন্‌ চিন্তিত ছিলেন অধিক সঞ্চয়ের জন্য নয়, অধিক বিনিয়োগের জন্য, কারণ উহারই ফলে মূলধনী দ্রব্যের বাজারে উৎপাদনাধিক্য দেখা দেয়। মূলধনী দ্রব্যের অধিকোৎপাদন ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ায়, ফলে উভয় প্রকার দ্রব্যের বাজারেই অধিকোৎপাদন দেখা দেয়। কিন্তু সঞ্চয়ের আধিক্য আপনা-আপনি অধিক বিনিয়োগে পরিণত হয় কি করিয়া সেই বিষয়ে এই তত্ত্ব কোনরূপ আলোকপাত করে না। আমরা দেখিতে পাই, পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে দেশে যে-সঞ্চয় হয়, তাহা বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজিয়া পাওয়াই ভার, অন্তত সহজে উহার বিনিয়োগ হয় না। আধুনিক কালের ধনতন্ত্রের মূল সমস্যাই হইল অতিরিক্ত সঞ্চয়কে বিনিয়োগের পথে চালিত করার সুযোগ খুঁজিয়া পাওয়া।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে কেইন্‌সীয় তত্ত্ব (Keynesian doctrine of Savings and Investment)

যেমন, বিভিন্ন দামে ক্রয়ের পরিমাণ ও বিক্রয়ের পরিমাণ উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে কোন দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্যের দাম নির্দিষ্ট করে, ঠিক সেইরূপ কেইন্‌সের মতে বিভিন্ন আয়স্তরে সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং বিনিয়োগের পরিমাণ উভয়ের মিলিত প্রভাবে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভারসাম্যের আয়স্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। দামে উঠানামার মাধ্যমে যেমন দ্রব্যের যোগান ও চাহিদায় ভারসাম্য থাকে, ঠিক সেইরূপ আয়স্তরে উঠানামার মাধ্যমেই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য গড়িয়া উঠে। প্রতিটি সময়ের ক্ষণ-বিন্দুতে যেমন বিশেষ একটি দামে কোন দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য রহিয়াছে, ঠিক সেইরূপ কোন এক বিশেষ ক্ষণে সমাজের মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগও সমান আছে। ইহারা ক্ষণ-বিন্দুতে সমান, কিন্তু আয়স্তরে পরিবর্তনের প্রভাবে সদানিয়তই পরিবর্তিত হইতেছে, নূতন আয়স্তরে ইহাদের পুনরায় ভারসাম্য স্থাপিত হইতেছে। ইহারা তাই সর্বদা সমান, কিন্তু একবার অসমান হইলে আয়স্তরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আবার পরস্পরের সমান হইয়া পড়ে। আমরা তাই ইহাদের দুই দিক হইতেই আলোচনা করিব, হিসাবগত দিক হইতে ইহারা সমান (accounting equality) এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার দিক হইতেও ইহারা সমান (Functional equality)।

আয়স্তরে পরিবর্তন ইহাদের ভারসাম্যে লইয়া আসে

হিসাবের দিক হইতে দেখিতে গেলে সমাজের মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগ সর্বদা সমান। যে-কোন আয়স্তরে ইহা সত্য এবং যদিও সঞ্চয়ের সিদ্ধান্ত ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সমাজে পৃথক ব্যক্তিরা গ্রহণ করে তবুও ইহাতে কোন ভুল নাই। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহাদের সমান বলিলে ঠিক বলা হয় না, ইহারা অভেদ (Identity), একই বিষয়কে দুই দিক হইতে দেখা হইতেছে মাত্র। সঞ্চয় ও বিনিয়োগে এই অভেদরূপের কারণ হইল সমাজের মোট আয় এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ সমান, ইহারা একই, দুই দিক হইতে 'একই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত। ভোগব্যয় ছাড়া সমাজে যে-ব্যয় হয় তাহাকেই আমরা বিনিয়োগ-ব্যয় বা বিনিয়োগ বলি, অর্থাৎ $I = Y - C$. আবার আয় হইতে ভোগ-ব্যয়

হিসাবের দিক হইতে ইহারা অভেদ

বাদ দিলেই পাওয়া যায় সঞ্চয়, অর্থাৎ S=Y−C. সুতরাং S নিশ্চয় I-এর সমান। এই অভেদটিকে এই ভাবে লেখা চলে :

$$Y=C+I \quad \text{অথবা,} \quad 1000=800+200$$
$$S=Y-C \quad\quad 200=1000-800$$
$$\therefore\ S=I \quad\quad \therefore\ 200=200$$

উপরের হিসাবে দেখা যায়, সঞ্চয় হইল আয়—ভোগব্যয়, এবং বিনিয়োগও হইল আয়—ভোগব্যয়, তাই সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান। ইহারা সংজ্ঞাগত ভাবেই সমান (ex definitione), ঠিক যেমন, MV ও PT পরস্পর সমান। এমনভাবে ইহাদের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে যাহাতে ইহারা সমান হয়। মোট ব্যয়ের (Y) মধ্যে আছে ভোগব্যয় (C) ও বিনিয়োগব্যয় (I) ; আবার আয়ের (Y) একাংশ দিয়া ভোগব্যয় করা হইয়াছে, তাই নিশ্চয় বিনিয়োগ ব্যয় (I) করা হইয়াছে সঞ্চয়ের অংশ (S) হইতে।

একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই হিসাবগত অভেদরূপ সামগ্রিক (aggregate) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইহারা পরস্পর সমান—এই কথা চিন্তা করা বা ধারণায় আনা অসুবিধাজনক, যদি আমরা ভুল করিয়া কোন একটি ব্যক্তির দিক হইতে এই কথা চিন্তা করি। যেমন, সমাজে কোন এক ব্যক্তি যে-পরিমাণ বিনিয়োগ করে উহা অপেক্ষা বেশি সঞ্চয় করিতে পারে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজের সকল ব্যক্তি মিলিয়া একত্রে যে-পরিমাণ বিনিয়োগ করে উহা অপেক্ষা বেশি সঞ্চয় করিতে পারে না। ইহার কারণ একজন ব্যক্তি নিজের সঞ্চয় বাড়াইলে তাহার নিজস্ব ব্যয় কমাইয়া দেয়, ফলে অন্যের আয় ও সঞ্চয় উভয়ই কম হয়। তাই নিজে সঞ্চয় করিয়া সে সমাজের মোট সঞ্চয় বাড়াইয়া তুলিতে পারে না। যেমন, কোন এক ব্যক্তি নিজের বিনিয়োগ অপেক্ষা আরও 10 টাকা বেশি সঞ্চয় করিল। ভোগ না কমাইলে সঞ্চয় বাড়ানো যায় না, তাই ব্যক্তির ভোগব্যয় 10 টাকা কমিয়া গেল। যে-সকল জিনিস সে কিনিতেছিল, সেইগুলির মালিকদের হাতে 10 টাকা কম আয় হইল। কিন্তু তাহাদের ভোগব্যয় কমে নাই, তাই তাহাদের এই 10 টাকা কম সঞ্চয় হইল। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান রহিল, শুধু আয়স্তর হ্রাস পাইল।

সামগ্রিক দৃষ্টিতেই ইহাদের সমতা সম্ভব

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই সমতা হইতে আমরা একটি বিষয় জানিতে

পারি। ক্লাসিকাল লেখকদের মনে ধারণা ছিল, কোন ব্যক্তির সঞ্চয় বাড়িলে দেশের মোট সঞ্চয় বাড়ে। তাই তাঁহারা সঞ্চয় বাড়ানোকে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় দিক হইতেই কল্যাণকর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু কেইন্‌স্ দেখাইলেন যে, ব্যক্তির পক্ষে যাহা কল্যাণকর সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে তাহা রীতিমত অকল্যাণকর হইতে পারে। পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের পূর্বে লোকের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পাইলে দেশের সামগ্রিক আয় ও কর্মসংস্থানস্তর হ্রাস পায়।

ব্যক্তিগত গুণ কিন্তু সামাজিক দোষ

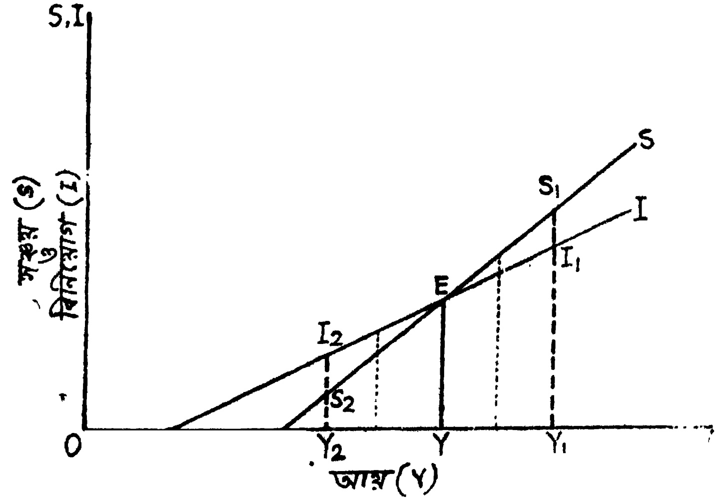
তবে মনে রাখা দরকার যে, ইহার বিশ্লেষণগত উপযোগিতা খুবই সীমাবদ্ধ। সঞ্চয় ও বিনিয়োগে কিরূপে সামঞ্জস্য আসে, সেই পথ বা ধারার (adjusting mechanism) বিশ্লেষণ না থাকিলে এই অভেদটিকে আমরা ব্যবহার করিতে পারি না। ইহা সামঞ্জস্য সাধনের গতি-পথ ব্যাখ্যা করে না, তাই এই অভেদটি স্থিতিশীল বিশ্লেষণের হাতিয়ার (tool of static analysis)। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত কিরূপে গতিশীল ধারার সামঞ্জস্যে পৌঁছে সেই ধারার ব্যাখ্যা না করিলে ইহার বিশ্লেষণযোগ্যতা কমিয়া যাইবে। তাই আধুনিক কালের আয়তত্ত্বে ইহাদের গতিশীল (dynamize) করিয়া তোলা হইয়াছে। নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় ধারণাগুলিতে প্রাণদান করিয়া সচল ও সক্রিয় করিয়া তোলা হইয়াছে।

সমান ধরিলেও ইহাদের গুরুত্ব কমে না

সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পারস্পরিক গতিশীল সম্পর্ক (dynamic relationship) বিশ্লেষণের সময় আমরা ইহাদের তালিকা হিসাবে মনে করি (in the schedule sense)। যেমন, দ্রব্যের বাজারে উহার যোগান ও চাহিদা সমান হয় একমাত্র ভারসাম্যের দাম বজায় থাকিলে, ঠিক সেইরূপ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হইবে ভারসাম্যের আয়স্তরে (at the equilibrium level of income)। যেমন, ভারসাম্যের দাম না থাকিলে যোগান ও চাহিদা অসমান হইতে পারে, ঠিক সেইরূপ ভারসাম্যের আয়স্তর বজায় না থাকিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য আনয়নকারী শক্তি হইল দাম, সেইরূপ এইক্ষেত্রে উহা হইল আয়স্তর। পরপৃষ্ঠার ছবিতে সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও আয়স্তরের এই গতিশীল সম্পর্ক দেখা যাইতেছে। ভূসমান্তরাল অক্ষে আয় এবং লম্বমুখী অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়কে পরিমাপ করা হইতেছে।

ইহাদের মধ্যে গতিশীল সম্পর্ক কি

S ও I হইল সঞ্চয় ও বিনিয়োগের রেখা। বিনিয়োগের রেখা I-কে সঞ্চয়-রেখা S নিচের দিক হইতে কাটিয়া উঠিতেছে। আয়স্তর Y_2 থাকিলে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ I_2S_2 বেশি। বিনিয়োগ বেশি হইলে ব্যবসায়ীদের মুনাফা বেশি,



কারণ সঞ্চয় কম, আয়ের বেশি অংশ ব্যয় হয়। জিনিসপত্র বিক্রয়ের সম্ভাবনা বেশি। সমাজের আয়-পরিমাণ পরবর্তী স্তরে ক্রমাগত উঠিতে থাকে, যতক্ষণ না এইরূপে OY স্তরে পেঁীছে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান থাকে। আয়স্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস পাইতে থাকে, অবশেষে ইহারা পরস্পর সমান হইয়া পড়ে। আয়স্তর OY_1 থাকিলে বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয় বেশি। ক্রমে আয়স্তর কমিয়া আসিয়া OY স্তরে উভয়ের ভারসাম্য ঘটে।

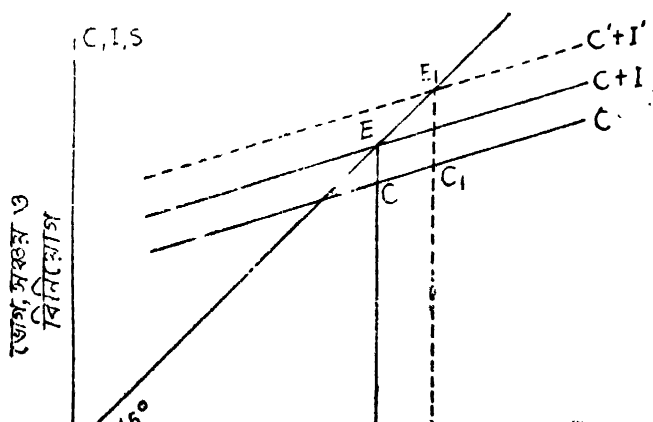
আয়স্তরে পরিবর্তন কিরূপে ইহাদের সামঞ্জস্য ঘটায়

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে এইরূপ তালিকার ধারণায় গ্রহণ করিলে (in the schedule sense) ইহারা পরস্পরের সমান হয়, নিজেদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতে। এই ধারায় কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়া দরকার (over time ', এবং ভারসাম্য সাধনকারী পদ্ধতির ধারাপথ বা কৌশল হইল আয় (equilibrating mechanism of income)। আয়স্তরে পরিবর্তনের হার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সঙ্গে এমন ভাবে যুক্ত যে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বাড়িলে আয়স্তর বাড়ে এবং বিনিয়োগ কমিলে আয়স্তর কমে। সঞ্চয় ও

বিনিয়োগ সমান একমাত্র ভারসাম্য-আয়ের স্তরে, যেখানে আয় বাড়িতেছে না বা কমিতেছে না। আয়স্তরে পরিবর্তনই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছে, ইহাদের পরস্পরকে সমান করার অবস্থা প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

আবার সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়ে মিলিয়া কিরূপে আয়স্তর নির্ধারণ করে

সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে প্রভাবিত করিতে গিয়া, সেই কাজের মধ্য দিয়া সমাজের আয়স্তর নিজেও ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া চলিয়াছে। কিরূপে ভোগপ্রবণতা (অথবা ইহার বিপরীত সঞ্চয়প্রবণতা) এবং বিনিয়োগ-প্রবণতা উভয় শক্তি মিলিয়া আয়স্তর নির্ধারণ করিতেছে? ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে যে, সমাজের ভোগ ও বিনিয়োগকে স্বপ্রভাবিত পরিবর্তনীয় শক্তি (**independent variable**) এবং আয়স্তরকে অপরপ্রভাবিত পরিবর্তনীয় শক্তি (**dependent variable**) হিসাবে গণ্য করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কেইন্‌সের মত অনুসারে আমরা স্বল্পকালে ভোগপ্রবণতাকে অপরিবর্তিত ধরিয়া লইতেছি; এই অবস্থায় বিনিয়োগপ্রবণতায় পরিবর্তন কিরূপে আয়স্তরে পরিবর্তন ঘটায়; নিচের ছবিটি হইতে ইহা বোঝা যাইতেছে।



লম্বমুখী অক্ষে ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং ভূসমান্তরাল অক্ষে আয় পরিমাপ করা হইতেছে। C রেখা হইল ভোগরেখা, উহার উপরে C+I রেখা হইল ভোগ ও বিনিয়োগের সম্মিলিত রেখা। প্রতিটি আয়স্তরে

সেই স্তরের ভোগের পরিমাণের সহিত বিনিয়োগের পরিমাণ যোগ করিয়া এই দুইটি রেখার লম্বমুখী দূরত্ব জানা যাইবে।

C রেখা হইতে C+I রেখাটির দূরত্ব অনুযায়ী বুঝা যাইবে নির্দিষ্ট আয়স্তরে বিনিয়োগের পরিমাণ কতখানি। উপরের ছবিতে C রেখা ও C+I রেখার দূরত্ব সকল আয়স্তরেই সমান, অর্থাৎ ইহারা পরস্পর সমান্তরাল, তাহা দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ বিনিয়োগ হইল স্বয়ংভূত ধরনের, আয়স্তরে পরিবর্তন ইহাতে পরিবর্তন আনে না, ইহা স্বপ্রভাবিত পরিবর্তনীয় বিষয় (Independent variable), অপর কিছু দ্বারা বর্তমানে প্রভাবিত হইতেছে না। এই C+I রেখাটি 45° রেখাটির সহিত E বিন্দুতে মিলিত হইতেছে, OY হইল ভারসাম্যের আয়স্তর। অর্থাৎ লোকেরা কি পরিমাণ ভোগ-ব্যয় করিতে চায় এবং ব্যবসায়ীরা কি পরিমাণ বিনিয়োগ ব্যয় করিতে চায়, এই দুই-এ মিলিয়া স্থির করে ভারসাম্যের আয়—যে-আয়স্তরে লোকেদের ভোগব্যয় করিয়া যাহা বাকি থাকে অর্থাৎ সঞ্চয় হয় উহার সম্পূর্ণ অংশ তাহারা বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয় করে। অর্থাৎ এই দুই বিন্দুতে মোট ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয়ের পর অবশিষ্ট আয়ের অংশ (অর্থাৎ সঞ্চয়) নিশ্চয় বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয়ের সমান। CE পরিমাণ সঞ্চয়, আবার CE পরিমাণই বিনিয়োগ। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ যতক্ষণ পৃথক থাকে ততক্ষণ ভারসাম্যের আয় দেখা দেয় নাই, যখন ইহারা সমান হইল, সেই বিন্দুতে ভারসাম্যের আয় পাওয়া গেল। ভারসাম্য আয়ের স্তরে $YC+CE=YE$; অর্থাৎ ভোগব্যয় + সঞ্চয় (বা বিনিয়োগ)=মোট আয়।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়ের সমতার বিন্দুতে ভারসাম্যের আয় দেখা দেয়

এই অবস্থায় 'স্বয়ংভূত' কোন কারণে যদি C+I রেখাটি উপরে উঠে, তবে আমরা দেখি যে, নূতন C^1+I^1 রেখাটি 45° রেখাকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করে এবং এই বিন্দুতে নূতন বর্ধিত আয়স্তর OY_1 পাওয়া যায়। এই নূতন স্তরে ভোগ ও বিনিয়োগ নূতন আয়ের সমান এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান। অপসরণশীল ভারসাম্যের (shifting equilibrium) এক একটি বিন্দু হইল E এবং E^1, ইহারাই আয়স্তরে পরিবর্তন প্রকাশ করিতেছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, আমরা যদি ভোগের পরিমাণ স্বল্পকালে স্থির ধরিয়া লই, তবে আয়ে এই পরিবর্তন নিশ্চয় বিনিয়োগে পরিবর্তনের ফল। তাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে আয়স্তরের উপর বিনিয়োগে পরিবর্তনের ফল কি।

বিনিয়োগের পরিবর্তনই আয়ে পরিবর্তন ঘটায়

বিনিয়োগ-বৃদ্ধি ও আয়স্তরে বৃদ্ধির সম্পর্ক : গুণক তত্ত্ব (Relation between increase in Investment and Increase in Income-level : the multiplier) :

বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে সমাজে কর্মসংস্থান ও আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায় ; বিনিয়োগে প্রাথমিক বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান ও আয়ে মোট বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে গুণকের উপর। প্রাথমিক আয়ের যতগুণ মোট আয় বাড়ে তাহা আয়ের গুণক (Income Multiplier) ; আবার প্রাথমিক কর্মসংস্থানের যতগুণ মোট কর্মসংস্থান বাড়ে তাহা কর্মসংস্থানের গুণক (Employment Multiplier)। অনেক সময় ইহাকে বিনিয়োগের গুণক (Investment Multiplier) বলা হয়।

গুণক কাহাকে বলে? উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাউক যে, সমাজে চলতি বিনিয়োগ-পরিমাণের অধিক নূতন ভাবে 1 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হইল। যেমন, কোন কারখানা স্থাপনের এই জন্য 1 লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইল। কারখানা স্থাপন এবং চালু করার জন্য বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী, মজুর, প্রভৃতি উপকরণ ক্রয়ের জন্য এই টাকা খরচ করা হইল। অর্থাৎ বিনিয়োগের ফলে পূর্বে বেকার ছিল এইরূপ শ্রমিকের কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি হইল এবং অন্যান্য উপকরণের মালিকদেরও আয় কিছুটা বৃদ্ধি পাইল। 1 লক্ষ টাকা বিনিয়োগের ফলে প্রথমেই জাতীয় আয় 1 লক্ষ টাকা বাড়িয়া গেল।

গুণক কাহাকে বলে : বিনিয়োগে পরিমাণে বৃদ্ধি উহার কতগুণ মোট আয় বাড়াইয়া তোলে

কিন্তু আয়-প্রসারের ধারা এই স্তরে ক্ষান্ত থাকে, তাহা নহে। কারণ, যাহাদের আয় হইল তাহারা সেই আয় মোটেই ব্যয় না করিয়া সবটা সঞ্চয় করে, তাহা হইতে পারে না। যদি বর্ধিত আয়ের সমস্তটাই সঞ্চিত হইয়া যায়. তাহা হইলে সমাজে ওই 1 লক্ষ টাকার-অধিক মোট আয় সৃষ্টি হইতে পারিল না ; আয়-প্রসারের ধারা স্তব্ধ হইয়া গেল। ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে, যদি সমাজের গড় প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 0 হয় (অর্থাৎ আয় বৃদ্ধির ফলে ভোগের পরিমাণ মোটেই না বাড়ে), তাহা হইলে গুণক হইল 1 (K=1), অর্থাৎ নূতন বিনিয়োগের পরিমাণ পর্যন্ত-মাত্র মোট আয় বৃদ্ধি পাইবে, ইহার বেশি নহে।

গুণক নির্ভর করে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার উপর

যদি এইরূপ হয় যে, বিনিয়োগের দরুন যাহারা একলক্ষ টাকা নূতন আয়

হিসাব পাইবে, তাহারা সবটাই ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় করে, তাহা হইলে ওই এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া ভোগদ্রব্য বিক্রেতাদের নূতন আয় সৃষ্টি করিল। ভোগদ্রব্যের বিক্রেতাগণ সেই নূতন আয় যদি সবটা ব্যয় করেন তাহা হইলে তাঁহারা যে সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিলেন, উঁহাদের বিক্রেতাদের 1 লক্ষ টাকা নূতন আয় হইল। রামের ব্যয় হইতে শ্যামের আয় হয়, শ্যামের ব্যয়ই যদুর আয়, যদুর ব্যয়ই মধুর আয়—এইভাবে সমাজের ব্যয় ও আয় পরস্পরসংযুক্ত। যদি মোটেই সঞ্চয় না হয়, তাহা হইলে এই এক লক্ষ টাকার সম্পূর্ণটাই অনবরত ব্যয় ও আয় সৃষ্টি করিতে থাকিবে, এই ধারা কোথাও থামিবে না। ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে, যদি, সমাজের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 1 হয়, অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হইয়া যায়, তবে গুণক হইল অসীম ($K=\infty$)।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 0 হইতে বেশি (অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের সমস্তটা সঞ্চিত হয় না), অথচ ইহা 1 হইতে কম (অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের সমস্তটা ব্যয়িত হয় না)। প্রথমে বিনিয়োগের ফলে 1 লক্ষ টাকা যাহাদের আয় হিসাবে আসিয়াছিল, তাঁহারা কিছুটা সঞ্চয় করিয়া বাকি অংশ ব্যয় করিল, এই ব্যয় আবার অন্যের আয় সৃষ্টি করিবে; তাঁহারা আবার তাঁহাদের বর্ধিত আয়ের কিছু অংশ ব্যয় করিবে, সেই ব্যয় হইতে আরও নূতন আয়. ফলে আরও নূতন ব্যয় ও আয় ক্রমাগত সৃষ্টি হইতে থাকিবে। প্রত্যেক স্তরে সঞ্চয় হইতে থাকায়, প্রতিবারে নূতন আয় সৃষ্টির পরিমাণ এইরূপে কমিতে থাকিবে, অবশেষে বর্ধিত আয়ের পরিমাণ যখন খুব কম, ব্যয়ের দ্বারা আর নূতন আয় সৃষ্টি হইতে পারিতেছে না, সেই স্তর পর্যন্ত এই ধারা চলিয়া অবশেষে ক্ষান্ত হইবে। নূতন বিনিয়োগ হইতে সৃষ্ট প্রাথমিক আয় এইরূপ নিজের বহুগুণ বেশি আয় সৃষ্টি করিবে। পুকুরের ঠিক মধ্যখানে ঢিল ছুঁড়িলে জলে চক্রাকৃতির ঢেউ-এর সৃষ্টি হয়, ঢেউগুলির পরিধি যত প্রসারিত হইতে থাকে উহাদের উচ্চতা তত কমিতে থাকে, তীরের দিকে সেই উচ্চতা মিলাইয়া যায়, কিন্তু সমগ্র জলস্তরে উত্তালতার সৃষ্টি করে। সমাজের অর্থনৈতিক দেহে নূতন বিনিয়োগের ফলও তাই; আয় ও কর্মসংস্থানে প্রাথমিক বৃদ্ধি নূতন আয় ও কর্মসংস্থানের ঢেউ সৃষ্টি করিয়া সমগ্র সমাজ-দেহে সঞ্চারিত হইয়া অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তরে উত্তালতা আনে। প্রথম দিকে আয় ও কর্মসংস্থানের ঢেউগুলি উচ্চতায় বেশ বড়, কিন্তু প্রতিটি পরবর্তী বারে উহার আয়তন কমে, ক্রমে ইহা কমিয়া অবশেষে মিলাইয়া যায়।

সুতরাং, বিনিয়োগ-বৃদ্ধির ফলে সমাজের মোট আয় কত গুণ বাড়িল তাহাকে গুণক বলে, অর্থাৎ $K=\frac{\delta Y}{\delta I}$, অথবা $\delta Y=K\delta I$. গুণকের এই আয়তন (Size of the Multiplier) নির্ভর করে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার আয়তনের উপর। প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বেশি হইলে গুণকের আয়তনও বড়, কারণ প্রত্যেক স্তরের আয় হইতেই বেশি পরিমাণে ভোগব্যয় হইলে উহা পরবর্তী স্তরে বেশি পরিমাণে আয় সৃষ্টি করে। প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা কম হইলে গুণকের আয়তনও ছোট, কারণ প্রত্যেক স্তরের আয় হইতেই কম পরিমাণ ব্যয় পরবর্তীস্তরে কম পরিমাণ আয় সৃষ্টি করে। যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা $\frac{1}{2}$ হয়, তাহা হইলে গুণক হইল 2 ; প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{2}{3}$ হইলে গুণকের আয়তন 3 ; প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{3}{4}$ হইলে গুণকের আয়তন 4।

গুণকের আয়তন কিভাবে পরিমাপ করা হয়? ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা (Marginal Propensity to Save) হইল প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতারই ঠিক অপর দিক। নূতন 100 টাকা আযের 80 টাকা যদি ব্যয় হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় 20 টাকা সঞ্চয় হইতেছে ; অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা $\frac{4}{5}$ হইলে প্রান্তিক সঞ্চয-প্রবণতা $\frac{1}{5}$. গুণককে এইভাবে প্রকাশ করা চলে যে, $K=1/S$; K হইল গুণকের আয়তন এবং S হইল প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা ; উপরের উদাহরণে $K=1/\frac{1}{5}$; $\therefore \quad K=5$.

প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার দিক হইতেও আমরা গুণকের আয়তন পরিমাপ করিতে পারি। মনে করা যাউক, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার নাম হইল m. আমরা জানি প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ও সঞ্চয-প্রবণতা যোগ করিলে 1-এর সমান হয়। যেমন প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা $\frac{1}{5}$ হইলে ভোগপ্রবণতা $\frac{4}{5}$, উভযে মিলিয়া পূর্ণসংখ্যা 1 ; এই অবস্থায় $K=1/S=1/1-m$; এবং প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (m) হইল $=1-S=1-1/K$. উপরের উদাহরণে আমরা m ধরিযাছি $\frac{4}{5}$ এবং S ধরিয়াছি $\frac{1}{5}$. এই অবস্থায় $K=1/S=1/1-m$, $K=1/1-\frac{4}{5}$, $K=1/\frac{1}{5}$, অর্থাৎ $K=5$. আমরা তাই m বা S জানা থাকিলে K বাহির করিতে পারি, অথবা K জানা থাকিলে m বা S জানিতে পারি।

এইরূপে গুণকের আয়তন বাহির করিয়া উহার সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, দেশে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধির কতগুণ আয় বাড়িল। যেমন যদি 1000 টাকার নূতন বিনিয়োগ হয়, এবং K যদি হয় 5, তবে আয়স্তর বৃদ্ধি পাইল 5000, অর্থাৎ, $\delta Y=K\delta I$.

বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে গুণকের আয়তন অনুযায়ী যখন আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ে তখন ইহাকে ধনাত্মক গুণক (Positive Multiplier) বলা হয় ; বিনিয়োগ কমিলে গুণকের আয়তন অনুযায়ীই আয় ও কর্মসংস্থান কমে, সেই অবস্থায় ইহাকে ঋণাত্মক গুণক (Negative Multiplier) বলা হয়। গুণক 5 হইলে 1 লক্ষ টাকার বিনিয়োগে বৃদ্ধি সমাজে 5 লক্ষ টাকার মোট আয় বৃদ্ধি করে ; ঠিক সেইরূপ 1 লক্ষ টাকায় বিনিয়োগ কমিয়া গেলে সমাজে মোট 5 লক্ষ টাকার আয় হ্রাস পায়।

ধনাত্মক গুণক ও ঋণাত্মক গুণক

মনে রাখা দরকার যে, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (যাহার ভিত্তিতে গুণকের আয়তন হিসাবে করা হয়) আয়ের সকল স্তরে সমান থাকে না। আয়স্তর বাড়িতে থাকিলে প্রত্যেক আয়স্তরের বৃদ্ধিই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাকে কমাইয়া দেয় ; সুতরাং আয়স্তরে প্রত্যেকবার বৃদ্ধির ফলে গুণকের আয়তন পূর্বাপেক্ষা কমিতে থাকে। আবার, ঋণাত্মক গুণকের কার্যকারিতার সময়ে আযস্তরে প্রত্যেক বারের হ্রাস প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতাকে পূর্বাপেক্ষা বাড়াইয়া গুণকের আয়তন বাড়াইতে থাকে।

[আ]য়ে পরিবর্তন ঘটাইবার কালে গুণকের নিজেরই পরিবর্তন হয়

গুণকের উপর সময়েরও বিশেষ প্রভাব থাকে। কারণ, বিনিয়োগেব পরিবর্তন সমগ্র সমাজদেহে সঞ্চারিত হইয়া আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণে পরিবর্তন আনিতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয। 1 লক্ষ টাকার বিনিয়োগ প্রথমে 1 লক্ষ টাকার আয স্মৃষ্টি করিলে এবং পরবর্তীবারে ($\frac{4}{5}$ প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা থাকিলে) 80 হাজার টাকাব নূতন আয় সৃষ্টি করিবে, ইহার পরবর্তীস্তরে 65 হাজার টাকার নূতন আয় সৃষ্টি করিবে। কিন্তু প্রথম বারের ভোগ-ব্যয় এবং দ্বিতীয় বারের ভোগ-ব্যয় একই সময়ে ঘটিতেছে না। আয়-সৃষ্টির প্রত্যেক স্তরেই এইরূপ সময় অতিবাহিত হয় ; ইতিমধ্যে অন্যান্য বিনিয়োগের ফলাফল বা প্রভাব আয়ের উপর পড়িতে পারে। কোন বিশেষ বিনিয়োগের বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলাফল সম্পূর্ণ হইতে যে সময় প্রয়োজন তাহাকে গুণককাল বা প্রসারকাল (Multiplier or Propagation Period) বলা হয়।

গুণক কাল বা প্রসার কাল

গুণকের আয়তন বিভিন্ন বিষয় দ্বারা কমিয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রকার "ছিদ্রসমূহ"_(Leakages) গুণকের আয়তন কমাইয়া বিনিয়োগে পরিবর্তনের

দরুণ আয়ে পরিবর্তনের হার কমাইয়া দিতে পারে। (ক) নূতন আয় যাহাদের হাতে আসিল তাহারা উহার সাহায্যে পুরানো ঋণ পরিশোধ করিতে পারে, (খ) আয় বৃদ্ধির ফলে নগদ টাকা বেশি পরিমাণে হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে, বা তারল্য-পছন্দ বাড়িয়া যাইতে পারে, (গ) বিদেশী আমদানি দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে,* (ঘ) দামবৃদ্ধি হইতে পারে। যেমন, পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় বিনিয়োগে বৃদ্ধি ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনক্ষেত্র হইতে শ্রমিক ও উপকরণ সরাইয়া আনিবে, ফলে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন কমিবে। উপাদানের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইবে, যথেষ্ট পরিমাণে আয়-বৃদ্ধি সম্ভব হইবে না।

ছিদ্রসমূহ

অনুন্নত দেশে, এই গুণকের আয়তন বা প্রভাব আরও তিনটি বিষয়ের দ্বারা বিশেষ রূপে প্রভাবিত হয়। প্রথমত, দেশে আর্থিক মূলধনের পরিমাণ কম থাকায়, রাষ্ট্র কর্তৃক বিনিয়োগ ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে কমাইয়া দিতে পারে, কারণ মূলধনের বাজার হইতে রাষ্ট্র নিজেই বিনিয়োগের জন্য মূলধন তুলিয়া লইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ হ্রাস পাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, দেশে আসল মূলধন অর্থাৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতির পরিমাণ কম থাকায় আয় বৃদ্ধি হইলেই ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ান সম্ভব না-ও হইতে পারে। তৃতীয়ত, আয় বাড়িলে খাদ্যদ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে, ফলে উহাদের দাম বৃদ্ধি হয়, অধিক আয় সৃষ্টি করিতে পারে না।

অনুন্নত দেশ ও গুণক প্রভাব

ত্বরণ তত্ত্ব (Acceleration Theory) :

সমাজের ভোগব্যয়ে বৃদ্ধির ফলে যে পরিমাণে নূতন বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয় তাহাদের অনুপাতকে ত্বরণ (Acceleration) বলা হয়।

সমাজে সাধারণত দুই প্রকারের বিনিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়: স্বয়ম্ভূত

* রপ্তানি হইতে প্রাপ্ত নীট আয় দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ-বৃদ্ধির ন্যায় কাজ করে, এবং দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের উপর ইহার প্রভাব আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগেরই ন্যায়। রপ্তানির উপর বিদেশীয়দের ব্যয় রপ্তানি-দ্রব্যে নিযুক্ত শ্রমিক ও উপকরণের মালিকদের আয় বাড়ায়, তাহাদের সেই আয় পুনরায় ব্যয়িত হইয়া দেশে নূতন আয় সৃষ্টি করে, মোট আয়-সৃষ্টির পরিমাণ গুণকের আয়তনের উপর নির্ভর করে। আমদানীকে "ছিদ্র" হিসাবে, আভ্যন্তরীণ প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার (S) মধ্যে একই সঙ্গে ধরিয়া লইয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক পরিমাপ করা চলে। অর্থাৎ দেশের আয়স্তরের উপর রপ্তানির মোট ফল নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা হিসাব করা যায়:

$$\text{আভ্যন্তরীণ আয়ে পরিবর্তন} = \text{রপ্তানিতে পরিবর্তন} \times \frac{1}{\text{সঞ্চয় + আমদানি-প্রবণতা}}$$

বিনিয়োগ (Autonomous Investment) এবং উদ্ভূত বিনিয়োগ (Derived of Induced Investment)। রাষ্ট্র বা অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ রাজনৈতিক, স্বাস্থ্যরক্ষা বা অন্যান্য কারণে যে সকল বিনিয়োগ করিয়া থাকেন, যেমন পার্ক, সরোবর প্রভৃতি; অথবা নূতন আবিষ্কৃত দ্রব্য বা যন্ত্র প্রভৃতিতে বিনিয়োগ; অথবা অনেক কাল পরে উহা হইতে আয় পাওয়া যাইবে এরূপ কার্যে বিনিয়োগ প্রভৃতিকে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বলা চলে, কারণ বর্তমানের কোন আর্থিক বিষয় (যেমন আয়স্তর বা মুনাফার হার প্রভৃতি) এই বিনিয়োগের পিছনে কারণ হিসাবে কাজ করে না। ইহারা তাই স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ। কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের জন্য চাহিদা থাকায় সেই ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে হয়; আবার ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রপাতি-উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতিও দরকার। ইহাদের উপর বিনিযোগের কারণ ভোগ্যদ্রব্যের জন্য চাহিদা; ইহাদের তাই, উদ্ভূত বিনিযোগ বলা হইয়া থাকে। সমাজের ভোগব্যয় বাড়িলে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদকগণ আরও যন্ত্রপাতি কিনিতে চায়, ফলে এই ধরনের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সমাজের ভোগব্যয়ে পরিবর্তন এবং উদ্ভূত বিনিযোগের পরিমাণে পরিবর্তন—এই দুই-এর অনুপাতকে ত্বরণসহগ (Acceleration Coefficient) বা ত্বরক (Accelerator) বলে। যেমন যদি, সমাজের ভোগব্যয়ের পরিমাণ 2 কোটি টাকা বাড়িয়া যায়, ফলে যদি ইহার দরুণ উদ্ভূত বিনিযোগের পরিমাণ 4 কোটি টাকা বাড়ে, তাহা হইলে ত্বরণসহগ বা ত্বরক হইল 2। যদি উদ্ভূত বিনিয়োগ 8 কোটি টাকা হয়, তাহা হইলে ত্বরণসহগ বা ত্বরক হইল 4।

দুই প্রকার বিনিয়োগ

ত্বরণসহগ বা ত্বরক কাহাকে বলে

যদি ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে কোন মূলধনী যন্ত্রপাতির ব্যবহারই না হয় (যেমন অতি প্রাচীনকালের আধা-অসভ্য অবস্থায় বা হাত দিয়া ফল পাড়িয়া আনা—এইরূপ উৎপাদন ক্ষেত্রে) তাহা হইলে ত্বরণ সহগ 0, কারণ ভোগব্যয়ে বৃদ্ধি হইলেও বিনিয়োগ মোটেই বাড়িতেছে না। আরও কয়েকটি কারণে এইরূপ ঘটিতে পারে যেমন, (ক) বর্তমানে যন্ত্রপাতির উৎপাদনী শক্তি অব্যবহৃত অবস্থায় থাকিলে (excess capacity), (খ) ভোগব্যয়ে বৃদ্ধি বা নূতন যন্ত্রপাতির জন্য চাহিদা খুবই সাময়িক ও অস্থায়ী ধরনের হইলে, এবং (গ) স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ঘটিলে কারণ ইহা বিভিন্ন অনার্থিক ও বাহ্য কারণের দ্বারা নির্ধারিত। এইরূপ কোন

কি অবস্থায় ত্বরণ-সহগ 0 বা খুবই কম

কোন ক্ষেত্রে, ত্বরণসহগ 0 হইতে পারে না, বা খুবই কম (অর্থাৎ 1 হইতেও অনেক কম, যেমন, $\frac{1}{10}$ বা $\frac{1}{20}$) হইতে পারে।

কি অবস্থায় ত্বরণ-সহগ বেশি

যদি ভোগব্যয়ে পরিবর্তন অধিক হয়, এবং সেই ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য এমন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় যাহার ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় খুবই বেশি, তাহা হইলে ত্বরণ-সহগ বেশি হইয়া থাকে।

ত্বরণনীতি কি ভাবে কাজ করে

ত্বরণনীতি (Acceleration Principle) কিরূপে কার্য করে, বা ভোগব্যয় বৃদ্ধি হইলে কিরূপে বিনিয়োগ বাড়িয়া যায়? ধরা যাউক্, দেশে এক বিশেষ ধরনের 1000টি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত আছে; প্রত্যেকটি যন্ত্রের স্থায়িত্ব 10 বৎসর। সুতরাং প্রত্যেক বৎসর 100টি যন্ত্র অকেজো হইয়া যায়, ফলে পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে (for replacement) 100টি যন্ত্র নূতনভাবে প্রতি বৎসর প্রস্তুত হয়। এই যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পে 100টি যন্ত্র উৎপাদনের উপযোগী কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ আছে। যদি এই অবস্থায় ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বা ভোগব্যয় শতকরা 10% বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে আরও 100টি নূতন যন্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজন হইবে, পুনঃস্থাপনের জন্য বাৎসরিক 100টি যন্ত্রের উৎপাদন তো চলিতে থাকিবেই। সুতরাং যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পে বৎসরে 100টি যন্ত্রের স্থলে 200টি যন্ত্রের উৎপাদন সুরু করিতে হইবে, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। ভোগব্যয়ে মাত্র 10% পরিবর্তন বিনিয়োগে 100% পরিবর্তন আনিতে পারে। কিন্তু পরের বৎসর যখন উৎপাদন শেষ হইয়া গেল, তখন আর 200টি যন্ত্রের চাহিদা থাকিবে না। আবার পুনরায় 100টি যন্ত্র (পুনস্থাপনের জন্য যাহা প্রয়োজন) উৎপন্ন হইতে থাকিবে। অর্থাৎ বিনিয়োগ 50% কমিয়া যাইবে; 200টির উৎপাদন হইতে কমিয়া 100টির উৎপাদন হইবে। ঠিক এই কারণে বাণিজ্য চক্রের সময়ে দেখা যায় যে, মূলধনী যন্ত্রপাতির উৎপাদন ভয়ানক অস্থায়ী এবং ইহাতে হঠাৎ বিপুল পরিমাণে উঠানামা ঘটে।

গুণক ও ত্বরণের পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত এবং মিলিত প্রভাব (Interactions of Multiplier and Acceleration and their combined effect):

বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে মোট আয়ে বৃদ্ধি, গুণক ও ত্বরণ এই দুই-এর সম্মিলিত ফলাফল। মোট ব্যয় বাড়িয়া গেলে সমাজে আয় বাড়িয়া যায়, কি পরিমাণ মোট আয় বাড়িবে, তাহা গুণকের উপর নির্ভর করে। বর্ধিত আয়

ব্যয়িত হইবার ফলে ভোগব্যয়ের বৃদ্ধির দরুণ উদ্ভূত বিনিয়োগও বাড়িবে, ইহা নির্ভর করিবে ত্বরকের উপর। এই উদ্ভূত বিনিয়োগে বৃদ্ধি গুণকের ফলে পুনরায় আয় বাড়াইবে এবং সেই আয় ব্যয়কে বাড়াইয়া ত্বরণের ফলে পুনরায় বিনিয়োগ বাড়াইবে। উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতায়, উহাদের সম্মিলিত প্রভাবের ফলে বিনিয়োগের বৃদ্ধি মোট আয়, ব্যয় ও কর্মসংস্থান সকল কিছুকেই বাড়াইয়া দিবে। ঋণাত্মক গুণক ও ত্বরণের প্রভাবে বিপরীত পক্ষে, ইহাদের সম্মিলিত ফলে জাতীয় আয় কমাইয়া দিতেও পারে। এই দুই-এর মিলিত ফলকে লিভারেজ্ প্রভাব (Leverage effect) বলে; অর্থাৎ প্রাথমিক বিনিয়োগে বৃদ্ধি এবং উভয়ের মিলিত ফলে মোট আয়ে বৃদ্ধি—এই দুই-এর অনুপাতকে লিভারেজ্ সহগ (Leverage Coefficient) বলা হয়। অনেকে উভয়ের মিলিত প্রভাবকে একত্র করিয়া উহাকে অতিগুণক (Super-multiplier) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

মিলিত ফলাফল

পরিশিষ্ট

উইক্‌সেলের স্বাভাবিক সুদের হার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা (A short note on Wicksell's Natural Rate of Interest):

অষ্ট্রিয়ার ধনবিজ্ঞানী উইক্‌সেল্ (Knut Wicksell) সুদের বাজার-হার (a loan market rate of interest) এবং উহার 'আসল' বা 'স্বাভাবিক হারের' (a real or natural rate of interest) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। ঋণের দাম হিসাবে টাকার বাজারে যে সকল বিভিন্ন হারে সুদ দেওয়া হয়, তাহাদের গড় হিসাব করিলে এই ঋণ-হার অথবা বাজার-হার পাওয়া যায়। আর 'আসল' বা 'স্বাভাবিক হার' বলিলে তিনি বুঝিয়াছেন: (১) যে হারে ঋণপুঁজির চাহিদা এবং সঞ্চয়ের যোগান পরস্পর সমান হয়; (২) যে হার মোটামুটিভাবে নূতন উৎপন্ন মূলধনী দ্রব্য হইতে প্রত্যাশিত আয়ের বা প্রতিদানের সমান; (৩) যে হার বজায় থাকিলে দ্রব্যসামগ্রীর দামের সাধারণ স্তরে উঠানামার ঝোঁক থাকে না: (৪) টাকার লেনদেন-বিনা আসল মূলধনী দ্রব্যকে উহার নিজস্ব আকৃতিতে ঋণ দিলেও যে হার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত।*

স্বাভাবিক হার অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে

* (1) At which the demand for loan Capital and the supply of savings exactly agree; (2) which more or less corresponds to the expected yield of the newly created capital; (3) at which the general level of commodity prices has no tendency to move upward or downward; (4) which would be established if one would not make use of monetary transactions but real capital would be loaned *in natura*.

উইক্‌সেলের মূল বক্তব্য হইল এই যে, সুদের স্বাভাবিক হার হইতে বাজার-হার পৃথক হইলে দেশের অর্থনীতিতে প্রসার বা সংকোচনের গতিবেগ দেখা দিবে। বাজার-হার যতক্ষণ স্বাভাবিক হারের কম, ততক্ষণ নানা কারণে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথমত, সঞ্চয় হ্রাস পায় এবং ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়, এদিকে উদ্যোক্তারা (স্বাভাবিক হার বেশি থাকিলে যে মুনাফা হইতে পারিত উহাপেক্ষা) বিনিয়োগ হইতে অধিক মুনাফা পাইবার প্রত্যাশা করেন। নূতন-সৃষ্ট ব্যাঙ্ক-ঋণের সাহায্যে উদ্যোক্তারা উপকরণের জন্য চাহিদা বাড়াইয়া দেয়, মজুরি ও অন্যান্য উপাদানের দাম বাড়ে, ফলে ভোগদ্রব্যের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঠিক এই সময়ে মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনের উদ্দেশ্যে বেশি দাম দিয়া উপকরণ ক্রয় করা হয় বলিয়া ভোগ্য-দ্রব্যের উৎপাদন কমে। এই সকল কিছুর প্রভাবে দাম বাড়িতে থাকে—যতক্ষণ সুদের বাজার-হার উহার স্বাভাবিক হার অপেক্ষা কম, ততদিন এই ধারা চলিতে থাকে। স্বাভাবিক হার বজায় থাকিলে ঋণপুঁজির চাহিদা ও সঞ্চয়ের যোগান সমান হইত। বাজার-হার উহা হইতে কম থাকায় ঋণযোগ্য ভাণ্ডারের পরিমাণ কেবলমাত্র সমাজের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় দ্বারা ভরান যায় না, স্ফীতিমূলক পদ্ধতিতে (out of inflationary sources) ইহার যোগান বাড়াইতে হয়। এই কারণে দ্রব্যসামগ্রীর দামের সাধারণ স্তর বাড়িতে থাকে। অপর পক্ষে, সুদের স্বাভাবিক হারের তুলনায় উহার বাজার-হারকে কৃত্রিমভাবে বাড়াইয়া রাখিলে সংকোচনের ধারা সুরু হয়, সাধারণ দামস্তর হ্রাস পায়। স্বাভাবিক-হার ও বাজার-হার সমান থাকিলে, অর্থনৈতিক কাঠামো ভারসাম্যে থাকিবে, কেবলমাত্র স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় হইতেই ঋণপুঁজির যোগান হইবে, দামস্তর স্থির থাকিবে এবং টাকার অংকে প্রকাশিত সুদের হার মূলধনী দ্রব্যের প্রান্তিক প্রতিদানের সমান হইবে। এইরূপেই দেশে আর্থিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে (conditions of monetary equilibrium)।

সুদের স্বাভাবিকহার ও বাজার-হারে পার্থক্যই

আর্থিক ভারসাম্য-হীনতার কারণ

ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই বিশ্লেষণের সময় উইক্‌সেল দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান ধরিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ণ কর্মসংস্থানের অনুমান ত্যাগ করিয়া আমরা যদি ধরিয়া লই যে, দেশে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের অব্যবহৃত শ্রম ও উপকরণ আছে, তবে মূলধনী দ্রব্যের প্রসারকালে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন

কমাইতে হয় না, উভয়কে একই সঙ্গে বাড়ান যায়, এমন কি ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেশি রাখাও চলে। এই অবস্থায় দাম বৃদ্ধির ঝোঁক স্থগিত রাখা যায়, অন্তত কিছুকালের জন্য তো বটেই। ইহার তাৎপর্য হইল যে, দেশে দুইটি স্বাভাবিক সুদের হার আছে। একটিতে দেশের দামস্তর অপরিবর্তিত থাকে, আর অন্যটিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হয়। ইহাদের এই পার্থক্যের কারণ আছে। স্ফীতিমূলক উৎস হইতে কৃত্রিমভাবে সংগৃহীত ঋণপুঁজির যোগান বাড়িবার ফলে সমানহারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণও বাড়িতে পারে। তাহা ছাড়া, বলা চলে যে, ইহা এমন অবস্থা যেখানে সম্ভাব্য বিনিয়োগের (investment potential) তুলনায় সঞ্চয়ের যোগান কম থাকে।

এই তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা কোথায়

উইকসেলের পূর্বের লেখকেরা সুদের হারকে মোটেই টাকা বা অর্থসংক্রান্ত বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, সুদ হইল মূলধন-নিয়োগের ফলে পাওয়া অতিরিক্ত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য, যাহাকে বলে মূলধনের আসল প্রতিদান (real return of capital)।

এই শতাব্দীর গুরুতে উইক্সেলের তত্ত্ব প্রচারিত হয়, এবং এই তত্ত্বের গুরুত্বই হইল অর্থ ও মূলধনের তত্ত্বকে একত্রে মেলানো (to integrate the theories of money and capital)। কেইনস্ আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন এবং সুদের হার নিরূপণে একমাত্র আর্থিক কারণ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। কেইনসের মতে "সুদের হার এক ধরণের 'দাম' নয় যাহাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে উপকরণের চাহিদার সঙ্গে বর্তমানের ভোগ হইতে বিরত থাকার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।' ইহা এমন ধরনের 'দাম' যাহা নগদ টাকার রূপে সম্পদ ধরিয়া রাখার ইচ্ছার সঙ্গে নগদ টাকার পরিমাণে সমতা আনে...সুদের হার হইল তারল্য ছাড়িয়া দেওয়ার পুরস্কার।"*

উইক্সেল ও কেইনস্

* "The rate of interest is not the 'price' which brings into equilibrium the demand for resources to invest with the readiness to abstain from present consumption. It is the 'price' which equilibrates the desire to hold wealth in the form of cash with the available quantity of cash......The rate of interest is the reward for parting with liquidity." Keynes, *General Theory*, P 167. তিনি আরও বলিতেছেন যে, "The theory of interest might be expressed by saying that the rate of interest serves to equate the demand and supply of hoards— *i.e.* it must be sufficiently high to offset an increased propensity to hoard relatively to the supply of idle balances." Keynes *Economic Journal*, vol XLVII (1937) P. 250.

অনুশীলনী

1. 'Classical theory tended to explain unemployment as either Frictional or Voluntary.' Explain.

2. "The classical postulates do not admit of the possibility of the third category, which I shall define below as "involuntary" unemployment." (Keynes : *General theory*. P. 6.). Explain.

3. What is Effective Demand ? Why is it unstable ?
4. Discuss the determinants of the level of income and Employment.
5. Explain the Income equation $Y = C + I$.
6. Discuss the consumption function and illustrate it graphically.

7. What is Propensity to Consume ? Distinguish between Average and Marginal Propensity to Consume and show the importance of such distinction in the theory of Income and output.

8. "The fundamental psychological law, upon which we are entitled to depend with great confidence both *a priori* from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience, is that men are disposed, as a rule and on the average, to increase their consumption as their income increases, but not by as much as the increase in their income. (Keynes *General theory*, P. 96) Explain.

9. Compare classical theory and Keynesian theory as to their attitudes towards the process of equalisation of Saving and Investment.

10. If Saving equals Investment at a given income level, how can an increase in investment be financed ?

11. Explain why $S = I$
12. Distinguish between savings *ex ante* and saving *ex post*.
13. Define Knut Wicksells 'real.' or 'natural rate of interest.
14. It was Wicksell's contention that any deviation of the market rate of interest from the natural rate would cause a cumulative process of expansion or contraction. Explain.

15. "An equilibrium level of income is only possible if planned saving equals planned investment." Critically examine the statement.

16. Discuss the subjective and objective factors determining the propensity to consume.

17. Distingusih between Autonomous and Induced Investment. Why such distinction is important ?
18. Discuss the factors determining the volume of Investment in an economy at a particular Income level.
19. Explain the determinants of the I Function.
20. Define Marginal Efficiency of capital. Why this concept is useful in Income theory ?
21. Discuss the inter-relationship between Rate of Interest, Saving and Investment.

22. Discuss the importance of the shape of Liquidity demand curve.

23. Distinguish between "Hoarding" and "Saving," and show the importance of such distinction in the theory of Income and Employment.
24. Explain the motives to Liquidity-Preference.
25. Define the so-called "multiplier". Compare it with the income-velocity of circulation of money.

26. Explain how an increase in investment will change the level of national income. Why is the marginal propensity to consume important in this process ?

27. Explain the Acceleration Principle.
28. Discuss the interactions of Multiplier and Acceleration.

১১

আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানামা ঃ বাণিজ্য চক্র

Fluctuations in Income and Employment : the Trade Cycle

পৃথিবীর যে সকল দেশ শিল্পবিপ্লবের ফলে পুরাণো সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হইতে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণ করে তাহাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রধান রূপ হইল দ্রুত মূলধন-সঞ্চয় (**Rapid Capital Accumulation**) এবং উৎপাদন ধারায় ক্রমাগত মূলধন নিয়োগের অনুপাত বাড়াইয়া দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি। উনবিংশ শতাব্দীর স্বরু হইতে সেই সকল ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির এই ধারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, এই সকল দেশে সুদীর্ঘকালীন ক্রমপ্রসার (**Secular Expension**) ঘটিলেও স্বল্পকালে আয়স্তর, দামস্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান প্রভৃতিতে নিয়মিত-ভাবে, প্রায় নির্দিষ্টকাল অন্তর, তীব্র উঠানামা হয়।* ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জোয়ারের পরেই ব্যবসায় বাণিজ্যের সংকটের ভাঁটা দেখা দেয়। সমৃদ্ধির যুগে আয়স্তর, দামস্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সকলই অধিক, ব্যবসায়জগৎ আশায় উদ্বেল ; তাহার পরেই সংকটের যুগে আয়স্তর, দামস্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

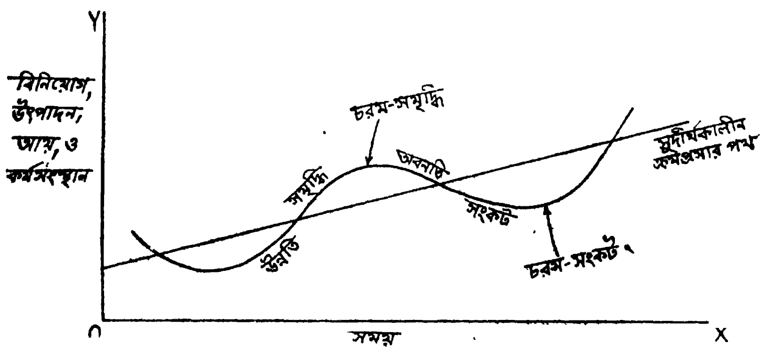
সুদীর্ঘকালীন ক্রমপ্রসার কিন্তু আয়স্তর ও কর্মসংস্থানে স্বল্পকালীন উঠানামা

* ঢেউ-এর মত এই উঠানামা বা চক্র সাধারণত তিন প্রকারের দেখা গিয়াছে : (ক) দীর্ঘ ঢেউ অথবা কনড্রতিয়েফ চক্র : ৫০ হইতে ৬০ বছরের মধ্যে ব্যবসায়বাণিজ্যের উঠানামা—এইরূপ দুইটি চক্রের আলোচনা হইয়াছে (১৭৮৯-১৮১৪, ; ১৮১৪-১৮৯৬,) ; তৃতীয়টি যাহা বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শুরু হইয়াছে, তাহার আলোচনা চলিতেছে। শুম্‌পিটারের মতে, প্রথম চক্রের কারণ হইল শিল্পবিপ্লবের নূতন আবিষ্কার ; দ্বিতীয় চক্রের কারণ হইল বাষ্প ও ইস্পাত প্রচলন ; তৃতীয় চক্রের কারণ হইল বিদ্যুৎ, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতির ব্যবহার। বর্তমানে স্বয়ংক্রিয়শক্তির দ্বারা যন্ত্র চালনা ও অ্যাটমের ব্যবহার নূতন চক্রের অবতারণা করিতেছে। (খ) স্বল্পকালীন ঢেউ অথবা জাগ্‌লার চক্র : ৮ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে এইরূপ উঠানামাকেই বাণিজ্যচক্র বলা হয়। (গ) স্বল্পতর ঢেউ বা অত্যল্পকালীন ঢেউ অথবা কিচিন্ চক্র : প্রত্যেক জাগলার বাণিজ্যচক্রের মধ্যে তিনটি ছোট ছোট চক্র দেখা যায়, প্রত্যেকটির স্থায়িত্ব মোটামুটি ৪০ মাস। ইহা ব্যতীত আমেরিকার ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেষ করিয়া আমেরিকায়, ১৮—২০ বৎসর লইয়া গৃহনির্মাণশিল্পের চক্র লক্ষ্য করিয়াছেন।

খুবই কম, ব্যবসায়জগৎ নিরাশায় আচ্ছন্ন। অর্থনৈতিক কাজকর্মে এইরূপ উঠানামাকে বাণিজ্য চক্র (Trade Cycle) বলা হয় *

সাধারণভাবে বাণিজ্যচক্রকে উর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি (Upswing and downswing) এই দুই দিকে ভাগ করা হয়। উঠার দিকে বা তেজীর দিকে দুইটি স্তর : উন্নতি (Recovery) ও সমৃদ্ধি (Prosperity) ; নামার দিকে বা মন্দার দিকে দুইটি স্তর : অবনতি (Recession) ও সংকট (crisis)। উঠার দিকে সর্বাধিক সমৃদ্ধির বিন্দু হইল চরম-সমৃদ্ধি (Boom) ; নামার দিকে সর্বাধিক সংকটের বিন্দু হইল চরম-সংকট (Slump)। নিচের চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

চক্রের বিভিন্ন স্তর



আয়স্তর ও কর্মসংস্থানের ঢেউ-এর এইরূপ উঠানামাকে 'চক্র' বলা হয় কারণ, এক দিকের অতিরিক্ত গতি অপরদিকের অতিরিক্ত গতি সৃষ্টি করে, একদিকের প্রাবল্য ও আতিশয্য শুধু নিজের অবস্থার সংশোধন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, অপরদিকের প্রাবল্য ও আতিশয্য সৃষ্টি করে। ঘড়ির দোলকের ন্যায় কোনদিকের গতিই আপনা-আপনি অন্য দিকে যাইবার বেগ সৃষ্টি করে ; সমৃদ্ধির মধ্যেই সংকটের বীজ উপ্ত থাকে, আবার সংকটই সমৃদ্ধির দিকে উন্নতির পথ প্রশস্ত

ইহাকে চক্র কেন বলা হয়

* "What we have to study,...is not fluctuation as such, but fluctuation about a rising trend. Historically, the cycle began to appear, with the Industrial Revolution'—just at the stage, that is, when expansion in the social output became a leading characteristic of the economic system. The cycles which have been experienced have all of them taken place against a background of secular expansion." Hicks, *Trade cycle* P. 8.

করে। ইহাকে চক্র বলার আরও কারণ হইল, এই উঠা-নামা ঘটে নিয়মিত ভাবে (Regularity), এবং ইহার কিছুটা নির্দিষ্ট কালব্যবধান (Periodicity) দেখা যায় ; 7 হইতে 10 বৎসরের মধ্যে মোটামুটি একটি চক্রের গতিধারা প্রবাহিত হয়।*

বাণিজ্য চক্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রথম হইল যে, সকল শিল্পে ও ব্যবসায়ে উন্নতি বা অবনতি মোটামুটি একই সময়ে আসে। কোন বিশেষ শিল্পের উন্নতি অন্য শিল্পের উন্নতির সহায়ক ; কোন বিশেষ শিল্পের অবনতি অন্য শিল্পের অবনতি ডাকিয়া আনে ; ইহারা তাই একত্র-সংক্রামক (Synchronic)। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যচক্রগুলি মোটামুটি আন্তর্জাতিক প্রকৃতির। আমদানি-রপ্তানির উপর দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির প্রভাব যত বেশি, ততই অন্য দেশের উন্নতি বা অবনতি (বৈদেশিক-বাণিজ্যের গুণক স্বরণের পরিমাপে) দেশীয় শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি বা অবনতি সৃষ্টি করিবার সুযোগ পায়। তৃতীয়ত, বাণিজ্য চক্রের প্রভাব সকল শিল্পেই অনুভূত হয় বটে, কিন্তু এই উঠানামা সকল শিল্পেই সমান হারে দেখা যায় না। ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে এই উঠানামা তীব্রতর হইয়া থাকে (স্বরণ-প্রভাবের দরুণ)। চতুর্থত, সকল বাণিজ্যচক্র একই প্রকারের হইলেও প্রত্যেকটি চক্র অন্যচক্র হইতে কিছুটা পৃথক, প্রত্যেকটি চক্রেরই নিজস্ব রূপ বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পিগু তাই বলিয়াছেন যে, ইহারা একই পরিবারের সন্তান হইলেও ইহাদের মধ্যে যমজ দেখা যায় না।

বাণিজ্যচক্রের বৈশিষ্টসমূহ
(১) একত্র-সংক্রামক
(২) আন্তর্জাতিক
(৩) মূলধনী শিল্পে প্রভাব তীব্রতর
(৪) প্রত্যেক চক্রের নিজস্ব রূপ

বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন স্তরসমূহ (Different Phases of a Trade cycle)

উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং অবনতি ও সংকট—এই চারিটি স্তর লইয়া একটি বাণিজ্য চক্র গঠিত, ইহাদের প্রত্যেক স্তরেরই নিজস্বরূপ ও বৈশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

* "By a *cyclical* movement we mean that as the system progresses in, e. g. the upward direction, the forces propelling it upwards at first gather force and have a cumulative effect on one another but gradually lose their strength until at a certain point they tend to be replaced by forces operating in the opposite direction ; which in turn gather force for a time and accentuate one another until they too, having reached their maximum development, wane and give place to their opposite." Keynes, *General Theory*. P. 314.

(ক) উন্নতি (Revival or Recovery)

সংকটের কাল অতিবাহিত হইলে দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা ক্রমশ বাড়িতে সুরু করে, বিশেষ করিয়া যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণের জন্য বা অকেজো যন্ত্রপাতি বাদ দিয়া নূতন যন্ত্রপাতি সংস্থাপনের জন্য তাগিদ দেখা দেয়। সেই সময় হইতে উন্নতির সুরু। দেশে প্রচুর, বেকার মজুরির হার কম, উদ্যোক্তা ও ব্যাঙ্কগুলির হাতে বিনিয়োগ-যোগ্য টাকার অভাব নাই। এই পরিবেশই উন্নতির সহায়ক। কিছুকাল ধরিয়া ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় ও ভোগের উদ্দেশ্যে দরকারী জিনিষপত্র কেনে নাই। কিন্তু স্থায়ী ও অর্ধস্থায়ী দ্রব্যসামগ্রী (durable and sami durable goods)। বদলান দরকার, আর উহাদের না কিনিলে চলে না। দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাহিদা সুরু হয়, বিক্রেতাদের নিকট হইতে উৎপাদকগণ অর্ডার পাইতে সুরু করে। শিল্পের উদ্যোক্তা উৎপাদন সুরু করিবার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে কম সুদে ঋণ পাইতে থাকে; অধিক কাঁচামাল ক্রয় করে ও নূতন শ্রমিকদের কর্মে নিয়োগ করিতে থাকে। ইহাদের হাতে আয় সৃষ্টি হওয়ায় তাহা ব্যয়ের ফলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ক্রমেই বাড়িতে থাকে; গুণক ও ত্বরণের নীতি কার্যকরী হইতে থাকে। একে অন্যের ঘাত প্রতিঘাতে আগাইয়া চলে (cumulative expansion process), বিনিয়োগের বৃদ্ধি আয় ও কর্মসংস্থানকে ক্রমে বাড়াইয়া দিতে থাকে, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা অধিক থাকে। মুনাফা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, মুনাফার আশা অপেক্ষাকৃত দ্রুত বাড়ে। যদিও সকল দ্রব্যের দাম সমান হারে বাড়ে না, তাহা হইলেও সাধারণভাবে দামস্তর বাড়িতে থাকে, ব্যবসায় সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

পরস্পর সংশ্লিষ্ট বৃদ্ধির ঘূর্ণাবর্তন বা আয় ও বিনিয়োগে উদ্‌ঘূর্ণমান বৃদ্ধি

(খ) **সমৃদ্ধি (Prosperity):** বিনিয়োগ ও আয়বৃদ্ধির এই ধারা অগ্রসর হইয়া অর্থনৈতিক দেহে সমৃদ্ধির সঞ্চার করে। কাঁচামালের দাম ও সুদের হার বাড়িলেও মজুরির হার পিছনে পড়িয়া থাকে; সংকটকালীন চুক্তিগুলি চলিতে থাকায় স্থির ব্যয় ততটা বাড়িতে পারে না। তাই দামস্তর বাড়িলেও উৎপাদন ব্যয় সেই হারে বাড়ে না, মুনাফা অধিক হয়—আশার প্রাবল্যে উদ্যোক্তাদের মনে ভবিষ্যৎ মুনাফার হার আরও বেশি থাকে; উৎপাদনের পরিমাণ, উপাদান নিয়োগের পরিমাণ, আয় ব্যয় সকল কিছুর বৃদ্ধি পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়া দামস্তর বাড়াইতে থাকে। সমগ্র ব্যবসায়ী সমাজে এক অস্বাভাবিক

ঘূর্ণাবর্তনের অতিবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির শীর্ষবিন্দু

অস্থিরতা ও চাপল্য সুরু হয়, যে কোন ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করাটাই উদ্যোক্তা-দের লক্ষ্য থাকে। দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য ও শেয়ারের মূল্য দ্রুত বাড়িতে থাকে ইহার ফলে দ্রব্যের বাজারে বা শেয়ারের বাজারে ফাট্‌কা সুরু হয়, ফলে দাম ও মুনাফার বৃদ্ধি স্বাভাবিকতার সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যায়।

সমৃদ্ধির মধ্যেই আগামী সংকটের বীজ অংকুরিত হইতে থাকে : কাঁচামাল ও উপ-করণ সমূহের জন্য চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়, ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা কমিয়া আসায় ব্যাঙ্কসমূহ ঋণের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হয়, সুদের হার বাড়ে। উৎপাদন-ব্যয়ে বৃদ্ধি, সুদের হারে বৃদ্ধি এবং দ্রব্যসামগ্রীর অধিক উৎপাদন সকল কিছু মিলিয়া মুনাফার হার কমাইয়া দেয়, দামবৃদ্ধির তুলনায় গরীব জনসাধারণের আয় না বাড়ায় ক্রয়ক্ষমতাও সংকুচিত হইয়া আসে, এবং এইরূপে অবনতির পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে।

(গ) অবনতি (Recession) :

চরম সমৃদ্ধির যুগে হঠাৎ আশাভঙ্গের ফলে ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ কমাইয়া দেয়, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে (a sudden collapse in the marginal efficiency of capital), চরমসমৃদ্ধির বুদ্‌বুদ ফাটিয়া গিয়া ব্যবসায়ে হঠাৎ তীব্র অবনতি দেখা দেয়। বিক্রেতাগণ অর্ডার দেন না, উদ্যোক্তা উৎপাদন করে না, ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য ঋণদাতাগণ ঋণপরিশোধের জন্য চাপ দিতে থাকে। উদ্যোক্তাগণ ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না, কারণ দ্রব্য অবিক্রীত থাকে। সমাজে এমনই ভয়ের আবহাওয়া দেখা যায় যে আমানতকারীরা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইতে চাহে কিন্তু নগদ পরিশোধ করিতে না পারায় ব্যাঙ্কে "দৌড়" (run) হইতে থাকে, জনসাধারণের সঞ্চয়ের সর্বনাশ করিয়া ব্যাঙ্ক-সমূহ ফেল পড়িতে বাধ্য হয়।*

পারস্পরিকভাবে সংশ্লিষ্ট হ্রাসের ঘূর্ণাবর্তন বা আয় ও কর্মসংস্থানে অধোঘূর্ণমান হ্রাস

(ঘ) সংকট (Depression or Crisis)

এইরূপে অর্থনৈতিক সংকট সকল শিল্প বা ব্যবসায়কে আচ্ছন্ন করে, দেশের বিনিয়োগ আয়স্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ ভীষণ কমিয়া যায়

* "prosperity ultimately bring on conditions which start a liquidation of the huge credits which it has piled up. And in this course of liquidation, prosperity merges into crisis." Mitchel.

(ঋণাত্মক গুণক ও ঋণাত্মক ত্বরণের ফলে)। দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্যের মধ্যে ভয়াবহ দারিদ্র্য দেখা দেয়, দামস্তর কম থাকিলেও দ্রব্যবিক্রয় করা সম্ভব হয় না : কারণ লোকের হাতে ক্রয় করিবার মত আয় থাকে না। ঋণের ভিত্তিতে গঠিত ব্যবসায়ী সমাজ ঝাঁকুনি খাইতে থাকে, অনেকের "সম্পত্তি" (assets) মূল্যহীন হইয়া পড়ে, বহু দুর্বল প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যায়। অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রচুর পরিবর্তন আসে, পুরাতন উত্যোক্তারা ব্যবসায় ছাড়িয়া দেয়, বহু উত্যোক্তা দেউলিয়া ঘোষিত হয়। কিছুকাল পরে ব্যাঙ্কসমূহ ক্রমে পুনরায় সুস্থ হইয়া উঠে, ধীরে ধীরে পুনরায় উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মজুত ফুরাইয়া যায়, যন্ত্রপাতিসমূহ অকেজো হইয়া পড়ে, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ অনুভব করা যায় না। যন্ত্রপাতির স্থায়িত্বকাল ও ভোগদ্রব্য মজুতের খরচার উপর সংকটকাল নির্ভর করে। ক্রমে উন্নতি সুরু হইবার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়।*

ঘূর্ণাবর্তনের গতিরোধ, সংকটের নিম্নবিন্দু

বাণিজ্যচক্র কেন ঘটে (Causes or Models of Trade Cycles)

ক্লাসিকাল যুগ হইতে সুরু করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত কোন ধনবিজ্ঞানী বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য কোন তত্ত্ব বা মডেল গঠন করিতে পারেন নাই। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে নিয়মিত এইরূপ ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটে কেন, তাহা লইয়া এখনও পর্যন্ত আলোচনা চলিতেছে। অনেকে বহু বাহ্য বিষয়ের উপর জোর দিয়া আলোচনা করিয়াছেন ; আবহাওয়া, যুদ্ধবিগ্রহ এবং বড় কোন কিছুর আবিষ্কার, ইহার কোনটিই বাদ যায় নাই। এইগুলির দ্বারা ভারসাম্যের বিচ্যুতি এবং পরবর্তীকালীন সামঞ্জস্য অনেকক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা চলে বটে, কিন্তু ঢেউ-এর মত, স্বয়ংগতিসম্প। এই উঠানামার রূপ ফুটাইয়া তোলা যায় না। বিচ্যুতির কারণ হিসাবে ইহাদের গণ্য করিলে সমাধান খুবই সহজ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কেন এই বিচ্যুতি ঘটিলেও অর্থনৈতিক দেহে স্বয়ংশোধনশীল শক্তিগুলি দেখা দেয় ; নিয়মিতভাবে, নির্দিষ্ট কাল-ব্যবধানে এবং

বাহ্যকারণগুলি অসম্পূর্ণ

* "The explanation of the *time element* in the trade cycle, of the fact that an interval of time of a particular order of magnitude must usually elapse before recovery begins, is to be sought in the influences which govern the recovery of the marginal efficiency of capital. There are reasons given firstly by the length of life of durable assets in relation to the normal rate of growth in a given epoch, and secondly by the carrying costs surplus stocks". Keynes. *General theory*, P 317.

কেবলমাত্র ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতেই এই উঠানামা ঘটে তাহার পূর্ণ ব্যাখ্যা ইহাদের দ্বারা পাওয়া যায় না। তাই মনে করা হয় যে, দোলন্ত চেয়ার ও পেণ্ডুলামের মত (rocking chair and the pendulum) এই দোলনের কারণ আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর অভ্যন্তরেই নিহিত আছে। বহিরাগত কোন শক্তি ধাক্কা দিলে এই দেহ উহা আত্মস্থ করিয়া লয়, অনিয়মিত এই চাপ সে নিজের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলে। সকল তত্ত্ব বা বাণিজ্যচক্রের সকল মডেল আমরা আলোচনা করিব না ; আসল (Real), মনস্তাত্ত্বিক (Psychological), আর্থিক (Monetary) এবং সঞ্চয়-বিনিয়োগ (Saving-Investment)—এই কয়টি মাত্র আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে। আসল কারণ বলিলে বোঝা যায়, শিল্পোৎপাদনের অবস্থায় প্রকৃত পরিবর্তন, যেমন নূতন কোন উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ বা ক্রেতাদের রুচিতে পরিবর্তন। মনস্তাত্ত্বিক কারণ হইল বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে লোকের মনে ধারণার পরিবর্তন। আর্থিক কারণের মধ্যে আছে টাকার যোগান বা দামে (অর্থাৎ সুদের হারে) পরিবর্তন। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কারণাবলী লইয়াই আজকালকার মডেলগুলি গঠিত হইতেছে।

আমরা কয়েকটি মডেল আলোচনা করিব

স্যুমপিটারের নূতন-প্রচলন তত্ত্ব (Schumpeter's Theory of Innovation)

অধ্যাপক স্যুম্‌পিটারের মতে, বাণিজ্যচক্রের কারণ নূতন প্রচলন, যন্ত্রকৌশলের কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। স্থিতিশীল সমাজে উৎপাদন পদ্ধতি বা অন্য কোন শক্তির পরিবর্তন ঘটে না, বাণিজ্যচক্রও দেখা দেয় না। কিন্তু অর্থনৈতিক দেহ গতিশীল ; উদ্যোক্তাদের কাজকর্ম এই কাঠামোতে সর্বদা পরিবর্তন সঞ্চারিত করিতেছে। তাহাদের কাজই হইল নূতন উৎপাদনপদ্ধতি, যন্ত্রপাতি, দ্রব্য, বাজার খুঁজিয়া বাহির করা। সমাজের স্থিতিশীল ভারসাম্য ছাপাইয়া এই নূতন প্রচলন নিজের প্রভাব বিস্তার করে। এই নূতন প্রচলনের ফলে সমাজ পুরানো উৎপাদন-কাঠামো হইতে নূতন স্তরে উন্নীত হয়, মূলধনের চাহিদা বাড়ে। ইহার দরুণ যে গতির সঞ্চার হয়, তাহারই মধ্যে সেই গতির বিরোধী শক্তি কাজ করিতে থাকে। কালক্রমে এই নূতন-প্রচলনের ফলে ভোগ্যদ্রব্যের যোগান বাড়ে, উহার দাম কমে। কিন্তু উপকরণের চাহিদা বাড়ে

নূতন প্রচলন সমাজের গতিশীলতা আনে

বলিয়া উহাদের দাম বাড়িতে থাকে, মুনাফা হ্রাস পায়, অধিকতর প্রসারের ইচ্ছা কমিয়া যায়। উদ্যোক্তারা নিজেদের কাজের পরিধি সংকুচিত করে; ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করা হয়; স্যুমপিটারের ভাষায় বলা চলে যে 'আত্ম-সংকোচন' (Auto-deflation) ঘটে।

স্যুমপিটারের মতে বাণিজ্য-চক্র এই নূতন-প্রচলনেরই ফল। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে "If there be a purely economic cycle at all, it can only come from the way in which new things are, in the institutional conditions of capitalist society, inserted into the economic process and absorbed by it." নূতন-প্রচলন প্রবর্তন-কালে প্রসার ঘটে, আবার এই প্রবর্তন শেষ হইলে সংকোচন দেখা দেয়। আবিষ্কার (inventions) ও নূতন-প্রচলনের (innovations) মধ্যে পার্থক্য আছে। আবিষ্কারের ধারা অবিচ্ছিন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু নূতন প্রচলন ঘটে আকস্মিকভাবে, কারণ ইহা নির্ভর করে উদ্যোক্তাদের উৎসাহের উপর। কোন একজন উদ্যোক্তা নেতৃত্ব লইলে অপর সকলে তাহাকে অনুসরণ করে—এই কারণেই অনেক দিকে অনেক পরিমাণে নূতন-প্রচলন একসঙ্গে ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়া থাকে (innovations come in bunches)। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক অগ্রগতি মসৃণ ও অচঞ্চল রেখায় অগ্রসর হয় না, আকস্মিক কতক-গুলি ঝাঁকুনি ও কাঁপুনির মধ্য দিয়া তরঙ্গভঙ্গীতে চলে।

মনে কর, কোন একটি দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান, বেকারি নাই, এই অবস্থায় কোন উদ্যোক্তা কোন বিষয়ে নূতন-প্রচলন সুরু করিল। ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে ঋণ লইয়া এই বিনিয়োগ ঘটিতে থাকে, আরও অনেক উদ্যোক্তা ইহার অনুসরণ করে, মুনাফার লোভে সকলে মিলিয়া বিনিয়োগ বাড়াইয়া দেয়। এই পরিবর্তনের সম্মুখে অনেক পুরানো ফার্ম উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এক দিকের উন্নতি দ্বিতীয় স্তরের উন্নতি ঘটায় (secondary waves)। এই দ্বিতীয় তরঙ্গ দেশের সমগ্র ব্যবসায়-জগতে পরিব্যাপ্ত হয়।

উন্নতি ও সমৃদ্ধি

এই নূতন-প্রচলনের উপযোগী যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ি প্রভৃতি তৈয়ার হওয়া পর্যন্ত প্রসারকাল চলিতে থাকে, তাহার পরে অবনতি দেখা দেয়, সমৃদ্ধির

কারণ নিজেকে নিঃশেষ করিলে অবনতির শুরু। নূতন-প্রচলনের চাপ সমাজদেহ আত্মস্থ করিয়া লয়, এই নূতন অবস্থার সঙ্গে সে নিজের গতির সামঞ্জস্য আনে। অনেক পুরানো ফার্ম এই পরিবর্তনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে না, ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ হয় না, ঋণ-সংকোচন শুরু হয় (credit deflation)।

অবনতি ও সংকট

অবনতি-কালের মধ্যে সমাজ এই পরিবর্তন মানিয়া লইয়া নূতন ভারসাম্যের আশেপাশে ("neighbourhood of equilibruim') পৌঁছে, অবনতি-কালের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে এই সামঞ্জস্য সাধনে কিরূপ সময় লয় তাহার উপর (length of depression depends on the length of the period necessary for adaptation)। গতিশীল ও অগ্রসরমান সমাজ বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগতির সঙ্গে যেভাবে খাপ খাওয়াইয়া লয়, তাহাই বাণিজ্যচক্রের রূপ গ্রহণ করে, ইহাই স্যুমপিটারের অভিমত।

এই তত্ত্বকে বহুভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, আধুনিক সমাজে যৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রসারের ফলে উদ্যোক্তার রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বে অর্থনীতি অপেক্ষা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবল। তৃতীয়ত, উদ্যোক্তার উপর এতটা গুরুত্ব দেওয়ায় শিল্পোন্নয়নের কাঠামো অনেকখানি

এই তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা

অবৈজ্ঞানিক এবং ব্যক্তি ভিত্তিক হইয়া উঠে (strong personal element)। সর্বোপরি, স্যুমপিটার অন্যান্য বহু বিষয়কে তত্ত্বের মধ্যে আনেন নাই, যেমন গুণক, ত্বরণ, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা, সামগ্রিক ব্যয় ও কার্যকরী চাহিদার স্তর প্রভৃতি। একমাত্র নূতন-প্রচলনের ধারার সাহায্যে বাণিজ্যচক্রের পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় না।

মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব (Psychological theory)

অধ্যাপক পিগু (Pigou) এবং তাহার অনুগামীগণ বলেন যে, সমাজের কোন 'আসল' কারণের (real cause) ফলে বাণিজ্যচক্র দেখা দেয় না; ইহার

আসল নয়, মনস্তাত্ত্বিক

মূল কারণ হইল মনস্তাত্ত্বিক। বাস্তব অবস্থাতে কোন কিছু পরিবর্তনকে বলা হয় 'আসল' কারণ, আর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে লোকের মনে ধারণার পরিবর্তনকে বলা চলে 'মনস্তাত্ত্বিক' কারণ। বাস্তব অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন না আসিলেও মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলিতে পরিবর্তন আসিতে পারে। অধ্যাপক পিগুর মতে, বাণিজ্যচক্রের পিছনে

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবই প্রধান, কারণ অর্থনৈতিক কাজকর্মে প্রত্যাশার ভূমিকা (role of expectation) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যাহা ঘটিয়াছে এইরূপ ঘটনার তুলনায় যাহা ঘটিতে পারে তাহাদের প্রাধান্যই বেশি, ইহারাই মানুষকে কাজে প্রেরণা দেয়।

পিগুর মতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক বিচারের অভাব, অর্থাৎ সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করিতে না পারার মধ্যেই বাণিজ্যচক্রের কারণ লুকানো আছে। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে "expected facts are substituted for accomplished facts as the impulse to action. This brings into play variations in the tone of mind of persons whose action controls industry, emerging in errors of undue optimism or undue pessimism in their business forecasts". বর্তমান শিল্প-জগতের দুইটি বৈশিষ্ট্যের দরুন ভবিষ্যদ্বাণীর এই ত্রুটি দেখা দেয়, (ক) ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ধারা দীর্ঘ ও চক্রাকৃতি (round about process), ও (খ) উৎপাদন কাঠামোর ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন, যেখানে কয়েকজন ব্যক্তি সমাজের দ্রব্যসামগ্রীর অভাব মিটাইতে নিযুক্ত, অর্থাৎ কোনরূপ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা না থাকা। চক্রাকৃতি উৎপাদন-ধারার দরুন উৎপাদন শুরু করার সিদ্ধান্ত এবং উৎপন্ন দ্রব্য বাহির হওয়ার মধ্যে বেশ কিছুকাল সময়ের ব্যবধান থাকে। ভবিষ্যৎ চাহিদা সম্পর্কে প্রত্যাশার ভিত্তিতেই বর্তমানে উৎপাদন শুরু হয়। সময়ের ব্যবধান যত বেশি থাকে ভুলের সম্ভাবনাও তত বাড়ে, অসামঞ্জস্যের গভীরতাও তত বেশি। মূলধনী দ্রব্যে সময়ের এই ব্যবধান বেশি বলিয়া প্রত্যাশার উঠানামাও বেশি, সমাজ যত গতিশীল, উহার মধ্যে সামঞ্জস্য হইতে বিচ্যুতির সম্ভাবনা তত প্রখর। এই কারণে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্যচক্রের তীব্রতা অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক।

আশা ও নিরাশার প্রাবল্য দেখা দেয় কেন

ভবিষ্যদ্বাণীর এই ত্রুটিবিচ্যুতির আরও অনেক কারণ আছে। অত্যন্ত জটিল এই শিল্পপ্রধান অর্থনৈতিক কাঠামোতে ক্রেতাদের পছন্দ সর্বদা পরিবর্তনশীল, আর তাহা ছাড়াঃ উৎপাদকেরা বহু দূরের বাজারে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন করে। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল প্রকৃতির মধ্যেই ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর সম্ভাবনা নিহিত, কারণ এই অবস্থায় মোট উৎপাদন হইল বহু সংখ্যক 'স্বাধীন' উৎপাদকের অপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের কার্যফল,

প্রত্যেকেই আশা করে যে অপরের তুলনায় বাজারের বেশি অংশ সে হস্তগত করিবে। দেশে যখন আর্থিক আয় বাড়িতেছে কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের যোগান ততটা বাড়ে নাই, ফলে দাম বাড়িতেছে—এই অবস্থাতেই আশাধিক্যের ভুল ঘটে (errors of over-optimism)। দাম যতদিন বাড়িতেছে, ততদিন ব্যবসায়ীদের মনে উহা বৃদ্ধির প্রত্যাশা প্রবলতর হইতেছে। ফাট্কাদারদের কাজের দরুন প্রসারের ধারা মাত্রাতিরিক্ত অগ্রসর হইতেছে। এই গতির পূর্ণতাকাল (gestation period) শেষ হইলে বাজারে ভোগ্যদ্রব্যের যোগানে আধিক্য দেখা দেয়, চাহিদার তুলনায় বর্তমান দামে বিক্রয়যোগ্য জিনিসের পরিমাণ বেশি হওয়ায় ব্যবসায়ীদের মুনাফার প্রত্যাশা তীব্র আঘাত পায়। অবনতির সময়েও ফাট্কাদারদের কার্যকলাপ এই অবনতির তীব্রতা বাড়াইয়া তোলে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আশা ও নিরাশা উভয়ই সংক্রামক, তাই এক ব্যবসায়ীর মানসিক প্রবণতা অন্য ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হইতে থাকে, ঢেউ-এর মত ইহাদের উঠানামা এবং দলবদ্ধ জনতার মতামত—এই সকল মিলিয়া বাণিজ্যচক্র সৃষ্টি করে।

কখন ও কিরূপে ইহা ঘটে

বিশুদ্ধ আর্থিক তত্ত্ব (Purely monetary theory of the Trade cycle)

টাকার আচরণ বা প্রকৃতির মধ্যেই বাণিজ্যচক্রের বীজ নিহিত আছে, এইরূপ ধারণা এককালে অনেক ধনবিজ্ঞানীর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইত। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হট্রে (Hawtrey), তিনিই প্রথমে কেবলমাত্র আর্থিক কারণের উপর ভিত্তি করিয়া এইরূপ বাণিজ্যচক্রের তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন।

তাঁহার মতে বাণিজ্যচক্রের প্রকৃতি হইল দেশের কার্যকরী চাহিদায় উঠানামা। আধুনিক সমাজে চাহিদা বলিলে বোঝা যায় টাকার সাহায্যে জিনিসপত্র কেনার ইচ্ছা, টাকার জন্য চাহিদাই প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী চাহিদার রূপ লয়। দেশের লোকেরা কত টাকা খরচ করিতে রাজি আছে, তাহাই দ্রব্যসামগ্রীর জন্য কার্যকরী চাহিদা। ক্রেতাদের হাতে আর্থিক আয় বাড়িলে এই কার্যকরী চাহিদা বাড়ে, কারণ তাহারা তখন বেশি টাকা খরচ করিতে

রাজি থাকে। ভারসাম্যের অবস্থায়, ক্রেতাদের ব্যয় তাহাদের আয়ের সমান।

টাকার গতিস্রোতে উঠানামাই বাণিজ্যচক্র

বাস্তব জগতে অবশ্য এই ভারসাম্য বজায় থাকে না, ক্রেতাদের হাতে হয় বেশি টাকা অথবা কম টাকা আসিয়া পড়ে। এই টাকা ক্রেতারা পায় দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থার মাধ্যমে, ব্যাঙ্কগুলি ঋণপ্রসারের সাহায্যে লোকের হাতে টাকা ঢালিয়া দেয়, অথবা ঋণসংকোচন করিয়া টাকা ছাঁকিয়া তুলিয়া লয়। এই মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচনের নিয়মিত আসা-যাওয়াই বাণিজ্যচক্রের বহিঃপ্রকাশ, ইহা সম্পূর্ণ-অর্থসংক্রান্ত ঘটনা ('purely a monetary phenomenon')।

যদিও দেশের ব্যাঙ্কিংব্যবস্থা বাণিজ্যচক্রের জন্য মূলত দায়ী, তবুও এই পতন-অভ্যুদয়ের সূত্রধার হইল দেশের ব্যবসায়ীরা। তাহারা যখন দ্রব্যসামগ্রীর মজুত বাড়াইতে চায়, তখন ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের জন্য চাপ দেয়। ব্যাঙ্কের হাতে ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা আছে, সকল ব্যাঙ্ক সম্মিলিতভাবে ঋণপ্রসার ঘটাইতে থাকে। ব্যাঙ্ক-ঋণের ভরসায় ব্যবসায়ীরা উৎপাদকের নিকট বেশি অর্ডার দিতে থাকে,

কিরূপে সমৃদ্ধি দেখা দেয়

উৎপাদকেরাও উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়াইতে থাকে। চাষী, মজুর ও উপকরণের মালিকদের হাতে এই টাকা পৌঁছায়, দেশের ব্যাঙ্কঋণ লোকের হাতে আয় হিসাবে টাকার রূপে অবস্থান করিতে শুরু করে। এই টাকা নিশ্চয়ই ব্যয় হইবে, তাই দেশে টাকাকড়ির ব্যয় বাড়িতে থাকে। এইরূপে কম সুদ থাকার দরুন ব্যবসায়ীরা দ্রব্যসামগ্রী মজুত করার যে চেষ্টা করে তাহারই মধ্য দিয়া কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ তাহারা বাড়াইয়া তুলিতে পারে। মজুত করার মধ্য দিয়াই কার্যকরী চাহিদা বাড়ে এবং এইরূপে লোকের ক্রয়শক্তি বাড়াইয়া তাহারা মজুতদ্রব্য বিক্রয়ের সুযোগ গড়িয়া তোলে। এইরূপে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়, পরস্পর প্রভাবিত উন্নয়নের ধারা (cumulative process of expansion) কাজ করিতে থাকে; টাকার প্রচলন-বেগ বাড়িয়া যায়; দ্রব্যমজুত, ব্যাঙ্কঋণ, কার্যকরী চাহিদা ও টাকার আয়ব্যয় পরস্পরকে তাড়া করিয়া ঘূর্ণিবেগে যেন উহাদের বাড়াইয়া তোলে।

কিন্তু এই সুসময় চিরকাল চলে না, ইহারই মধ্যে অবনতির বীজ অংকুরিত হইতে থাকে। ব্যাঙ্কের ঋণসৃষ্টির ক্ষমতার সীমা আছে, একটি স্তরে পৌঁছিয়া তাহারা ঋণপ্রসার কমাইয়া দিতে চায়, সুদের হার বাড়াইয়া দেয়। স্বর্ণমান

অবস্থায় দেশে স্বর্ণ-রিজার্ভের অনুপাতই ঋণপ্রদানের এই সীমা নির্দিষ্ট করে।

অবনতি ও উন্নতি

সুদের হার বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীরা মজুতের পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করে, উৎপাদকদের নিকট অর্ডার কমাইয়া দেয়, উৎপাদন কমিয়া যায়, উপকরণের মালিকদের হাতে আয় হ্রাস পায়। কার্যকরী চাহিদাও কমে, ফলে অবনতির গতি তীব্রতর হইয়া উঠে। ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ কমিয়া আসে, লোকের হাতে টাকা কমিয়া গিয়া ব্যাঙ্কের আলমারিতে আবদ্ধ হইতে থাকে। কিছুদিন সংকট চলার পরে কোন কোন ব্যবসায়ীর মজুত করার ইচ্ছা আবার দেখা দেয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি প্রয়োগ করিতে থাকে। ব্যাঙ্কের হাতে টাকা বাড়ে। অলস টাকা হাতে রাখিলে মুনাফা নাই, সুদের হার কমাইলে ব্যবসায়ীরা ঋণ লইতে পারে এই আশায় তাহারা ঋণ বাড়াইবার চেষ্টা শুরু করে। উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হট্রের এই মডেল বিশ্লেষণ করিলে আমরা কতকগুলি বিষয় দেখিতে পাই। যেমন টাকার যোগান স্থিতিস্থাপক না হইলে বাণিজ্য-

হট্রে মডেলের মূলকথা

চক্র ঘটে না; যে-দেশে আধুনিক ব্যাঙ্কব্যবস্থা আছে সেখানকার টাকার যোগান নিশ্চয় স্থিতিস্থাপক হইবে; ব্যাঙ্কব্যবসায়ের সাধারণ নিয়মই হইল টাকার মোট যোগান কমানো ও বাড়ানো; টাকার যোগানে এই হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারাই বাণিজ্যচক্র ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর; এই বাণিজ্যচক্র ব্যাঙ্কঋণের হ্রাসবৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়।

হট্রের তত্ত্বকে বহু বিভিন্ন দিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। বাণিজ্য-চক্রের সকল ঘটনার নেতা হিসাবে পাইকারী ব্যবসায়ীদের গণ্য করা চলে না, উহাদের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, এই ব্যবসায়ীরা সুদের হার সম্পর্কে এতটা অনুভূতি-শীল বলিয়া মনে হয় না। সুদের হার কমিলেই ব্যবসায়ীরা মজুত করিবার জন্য উৎপাদকের নিকট অর্ডার দিল—সংকট হইতে উন্নতির পথ এতটা সরল নয়। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বাড়িলে তবেই বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির ধারা শুরু হইতে পারে, তাহার পূর্বে নয়। উপরন্তু, বাণিজ্যচক্রকে

এই তত্ত্বের বহুবিধ সমালোচনা

আমরা কেবলমাত্র টাকার ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে পারি না। দেশের উৎপাদনপদ্ধতি, আবিষ্কার, যন্ত্রকৌশল, বিক্রয়ব্যবস্থা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার সমস্ত কিছু ইহার সহিত জড়িত। বিনিয়োগের বৃদ্ধিই ব্যাঙ্কঋণ ও টাকার পরিমাণ বাড়ায়,

কিন্তু টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি বিনিয়োগ বাড়াইয়া তোলে, এমন কথা মানিয়া লওয়া চলে না। সর্বোপরি, হট্রের ধারণা যে, ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণে উঠানামাই বাণিজ্যচক্রের কারণ। ইহা আধুনিক জগতে আর সত্য নয়। আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সর্বদাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, অনেক সময় তাহারা সফলও হয়। তাহা সত্ত্বেও বাণিজ্যচক্র ঘটে। আধুনিককালের বাণিজ্যচক্রের তত্ত্বে তাই আর্থিক বিষয়ের প্রভাবগুলিকে (যেমন সুদের হার বা ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ) পূর্বের ন্যায় ততটা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয় না। *

হায়েকের তত্ত্ব (Hayek's theory)

বাণিজ্যচক্রের একটি প্রধান লক্ষণ হইল ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে অধিকতর উঠানামা। অস্ট্রীয়ান মতবাদে বলা হয় যে, এই দুই শ্রেণীর শিল্পে তুলনামূলক উঠানামার কারণ ব্যাঙ্কিংব্যবস্থার মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। লোকের ইচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ ছাপাইয়া ব্যাঙ্কতত্ত্বকে তাই আর্থিক অতিবিনিয়োগতত্ত্ব (Monetary over-investment theory) বলা হয়। একটু গভীরভাবে এই তত্ত্বটি আলোচনা করা যাউক।

নির্দিষ্ট কোন এক সময়ে সমাজের সকল উপকরণ যতপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত আছে, তাহাদের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা চলে। ভোগকারী হিসাবে কতকগুলি দ্রব্য লোকের সদাসর্বদা দরকার হয়, সেইগুলির

* "Recent theory has also tended to minimize the importance of such factors as the rate of interest and the operations of the banking system in explaining the trade cycle. Here again there is a contrast with the theory of a generation or more ago, and here again it probably reflects a contrast between the experience of this century and that of the nineteenth century. Inappropriate monetary policies and banking collapse can exaggerate cycles, even in modern conditions; conversely wise monetary policy can be used as one weapon for helping to control cycles......Nevertheless, it is probably correct to avoid laying emphasis on the purely monetary matters in explaining the core of the cyclical process under twentieth century conditions; they can be introduced later as important embellishments that help explain the great differences in detail between individual cycles." A. C. L. Day, *Outline of Monetary Economics*, P. 322.

উৎপাদন ক্রেতাদের নিকট-স্তরের। আবার, কতকগুলি দ্রব্যসামগ্রী ক্রেতাদের সদাসর্বদা দরকার হয় না, সেইগুলির উৎপাদন ক্রেতাদের দূরবর্তী-স্তরের। ক্রেতাদের কাছের জিনিসপত্রকে বলে নিম্নস্তরের উৎপাদন (**lower stages of production**), আর দূরের জিনিসপত্রকে বলে উচ্চস্তরের উৎপাদন (**higher stages of production**)। এই সকল বিভিন্ন স্তর লইয়া গঠিত থাকে দেশের উৎপাদন-কাঠামো (**structure of production**)। যেমন জামা, জুতা প্রভৃতির উৎপাদন নিম্নস্তরের, আবার ব্লাস্টফার্নেস বা ইঞ্জিন তৈয়ারী উচ্চস্তরের উৎপাদন।

মূলধনী ও ভোগ্যদ্রব্যের শিল্প লইয়া দেশের উৎপাদন কাঠামো গঠিত

সমাজের মোট আয়কে লোকেরা দুইটি ধারায় প্রবাহিত করে, একটি ব্যয় অপরটি সঞ্চয়। যে অংশ ব্যয় হয় তাহা সরাসরি ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে চলিয়া যায়। কিন্তু যে অংশ সঞ্চয় হয় তাহা প্রত্যক্ষভাবে মূলধনী দ্রব্যের ক্রয়ে প্রবেশ করে না। লোকের হাত হইতে সঞ্চয় যায় ব্যাঙ্কের হাতে, বীমা কোম্পানী বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভাণ্ডারে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সঞ্চয় উদ্যোক্তাদের হাতে পড়ে, তাহা বিনিয়োগের পথ ধরে। দেশের মোট সঞ্চয় মোট বিনিয়োগের মূল্যের সমান হয় যদি দেশে 'ভারসাম্য সুদের হার' বজায় থাকে। এই 'ভারসাম্য সুদের হার' হইতে দেশের বাজার-হার বেশি থাকিলে সঞ্চয় বেশি হয় কিন্তু বিনিয়োগ কমে; আবার ইহার তুলনায় দেশের বাজার-হার কম থাকিলে সঞ্চয় কম হয় কিন্তু বিনিয়োগ বাড়ে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান

বাজার-সুদের হার যদি ভারসাম্য-সুদের হারের তুলনায় কম থাকে, তবে লোকের সঞ্চয় কম, কিন্তু বিনিয়োগ বেশি হইবে। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? লোকের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় যদি কম হয়, তবে উদ্যোক্তারা বেশি বিনিয়োগ করার টাকা পায় কোথা হইতে? সঞ্চয় ও বিনিয়োগে এই পার্থক্য সম্ভব হয় এই কারণে যে, দেশের ব্যাঙ্কগুলি ঋণসৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং বাজার-সুদের হার কম থাকিলে অধিক বিনিয়োগ ঘটে কিছুটা স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় হইতে, আর কিছুটা ব্যাঙ্কঋণের সাহায্যে। বাজার-সুদের হারে হ্রাস মূলধনী দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া দেয়, উদ্যোক্তারাও মূলধনী দ্রব্যে বেশি টাকা খাটাইতে থাকে। নিম্ন-স্তরের উৎপাদন হইতে উপকরণগুলি সরিয়া আসিয়া উচ্চস্তরের উৎপাদনে

কিন্তু ব্যাঙ্কঋণের প্রসার দ্বারা সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিয়োগ বেশি হইতে পারে

নিযুক্ত হইতে থাকে। দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন দরকার হইয়া পড়ে।

মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন এইরূপ প্রসারিত হইতে থাকায় লোকের হাতে আয় বাড়ে, তাহারা ভোগদ্রব্যের চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করায় উহাদের দাম বাড়ে। তাহা ছাড়া মূলধনী দ্রব্যোৎপাদন বাড়াইবার জন্যও উপকরণগুলিকে পূর্বাপেক্ষা বেশি দাম দিতে হয়, তাই ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনব্যয়ও বৃদ্ধি পায়, এবং উহাদের দাম বাড়ে। ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়িলে জনসাধারণের বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হয় (forced saving), কারণ অনেকে বেশি দামে জিনিসপত্র কিনিতে পারে না। ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়িতে থাকিলে দেশের উদ্যোক্তারা ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে চেষ্টা করে, সমাজের উপকরণগুলি আবার 'উচ্চস্তর' হইতে 'নিম্নস্তরে' চলিয়া আসিতে চায়। আবার দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন আনা দরকার হইয়া পড়ে। দেশের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুযায়ী উৎপাদন-কাঠামোর সামঞ্জস্য সাধন প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

তখন বাধ্যতামূলক সঞ্চয় দেখা দেয়

সুতরাং হায়েকের মতে, ভারসাম্য-সুদের হার অপেক্ষা বাজার-সুদের হার কম থাকিলে অতি-বিনিয়োগ দেখা দেয় : চরমসমৃদ্ধি (Boom) ইহারই ফল। কিন্তু বিনিয়োগের এই 'আধিক্য' চিরকাল চলিতে পারে না, কারণ উহার পিছনে স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় নাই, ব্যাঙ্কঋণের ভিত্তিতে ইহা আর কতদূর চলিতে পারে? 'সমৃদ্ধির' এই বুদ্‌বুদ্‌ ফাটিয়া যায় কারণ লোকের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় কম। আবার অবনতি হইল এমন সময় যখন দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটানো হইতেছে—স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুযায়ী ঐ মাপে উহাকে ছোট করা হইতেছে। উৎপাদন-কাঠামোর কাটছাঁট করার সময়ে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি করা হইলে এই অবনতি-কাল দীর্ঘদিন ধরিয়া চলে, বেকারি ও সংকট অধিকতর ঘনীভূত হয়।

কেন সমৃদ্ধি ও সংকট দেখা দেয়

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। মূলধনীদ্রব্যের শিল্প-প্রসারের ধারা কেন বন্ধ হইয়া যায় সেই সম্পর্কে হায়েক আর একটি মন্তব্য করিয়াছেন। ইহাকে বলে রিকার্ডো-প্রভাব (Ricardo-effect) রিকার্ডো বলিয়াছিলেন যে, মজুরি বাড়িলে উদ্যোক্তারা শ্রমিকের বদলে যন্ত্র-নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে, আবার মজুরি কমিলে যন্ত্রের পরিবর্তে অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করিতে

হায়েকের দ্বিতীয় মত : রিকার্ডো প্রভাব

থাকিবে। হায়েকের যুক্তি হইল যে ক্রমপ্রসারের ঘূর্ণাবর্তন (cumulative process of expension) ভোগ্যদ্রব্যের জন্য চাহিদা বাড়ায় অথচ ইহাদের উৎপাদন না বাড়িয়া মূলধনীদ্রব্যের প্রসার হয়, তাই ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়ে, অর্থাৎ আসল মজুরি (real wages) কমিয়া যায়। আসল মজুরি কমিলে উদ্যোক্তারা মূলধন-নিয়োগ কমাইয়া শ্রমিক-নিয়োগ বাড়াইয়া দেয়, অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা বিনিয়োগ কমায়। এই বিনিয়োগের হ্রাসই অবনতির পথ উন্মুক্ত করে। মূলধন-নিয়োগের পরিমাণ কমানোর অর্থই হইল উৎপাদনধারাকে হ্রস্বতর করা বা কম চক্রাকৃতি করিয়া তোলা (to shorten the production-process or to make it less round-about)। তাই দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে গুরুতর পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অবনতির সূত্রপাত হয়। আবার, সংকটকালে দেখা যায় ভোগ্য-দ্রব্যসামগ্রীর দাম কম, অর্থাৎ আসল মজুরি বেশি। উদ্যোক্তারা আবার কখনও 'রিকার্ডো-প্রভাব' প্রয়োগ করে, অর্থাৎ শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্রের নিয়োগ বাড়াইতে চেষ্টা করে। উৎপাদনপদ্ধতিতে মূলধনের নিয়োগ বাড়ে, উৎপাদনধারাকে দীর্ঘতর করা হয় বা আরও অধিক চক্রাকৃতি করিয়া তোলা হয়। এইরূপে উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়।

রিকার্ডো প্রভাব কিরূপে কাজ করে

এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহুপ্রকার সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমত, বলা হয় যে, উদ্যোক্তারা 'আসল' মজুরি অনুযায়ী তাহাদের কাজকর্মের রূপ ও নীতি নির্ধারণ করে না। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনপদ্ধতি বা ধারাকে দীর্ঘ হইতে হ্রস্ব করা মোটেই সহজসাধ্য নয়, আর স্বল্পকালে এইরূপ ঘটে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, বিনিয়োগের ধারা একবার শুরু করিলে আসল-মজুরির পরিবর্তন ঘটিলেও কমানো যায় না, উহাকে সম্পূর্ণ করিতে হয়, তাহা না হইলে সবটাই লোকসান। চতুর্থত, ভোগ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক মজুরি বৃদ্ধি পাইলে আসল-মজুরি সমান স্তরে থাকিয়া যাইতে পারে।

এই তত্ত্বের সমালোচনা

কেইন্‌সীয় তত্ত্ব (Keynesian Theory) :

কেইন্‌সের মতে কর্মসংস্থান, আয় ও উৎপাদনের পরিমাণে নির্দিষ্ট সময় অন্তর উঠানামাকে বাণিজ্যচক্র বলা হয়। তাঁহার অভিমতে মূলধনের প্রান্তিক

কার্যকারিতাতে উঠানামার দরুন বিনিয়োগের হারে পরিবর্তন এইরূপ বাণিজ্য-চক্র ঘটাইয়া থাকে। দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ মোট আয় ও উৎপাদন স্থির করে এবং এই কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে সামগ্রিক ব্যয়ের উপর। এই মোট ব্যয় তিনটি পরিবর্তনীয় বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত: মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা, সুদের হার এবং ভোগ-প্রবণতা। সাধারণত, স্বল্পকালে সুদের হার ও ভোগ-প্রবণতা পরিবর্তিত হয় না, সুতরাং আয় ও কর্মসংস্থানের উঠানামার পিছনে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতাই হইল প্রধান সক্রিয় শক্তি। নূতন বিনিয়োগ হইতে প্রত্যাশিত মুনাফার হারকে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বলা হয়।

মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার জোয়ার ভাঁটা

ব্যবসায়-উন্নতির গোড়ার দিকে মুনাফা সম্বন্ধে আশার প্রাবল্য দেখা যায়, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িতে থাকে, আয়স্তর বাড়িয়া যায়, বিনিয়োগের বৃদ্ধি বহু পরিমাণে আয়ের বৃদ্ধি ঘটায়, গুণকের প্রভাবের ফলে ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে বিনিয়োগ ও আয় বাড়াইয়া সমৃদ্ধির প্রসার করে। কিন্তু এই সমৃদ্ধির সীমা আছে। প্রথমত, ক্রমশ নূতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়, কারণ কাঁচামাল, শ্রমিক বা অন্যান্য উপকরণের ঘাটতি শুরু হইতে থাকে, এবং ফলে তাহাদের দাম বাড়িতে থাকে। দ্বিতীয়ত, মূলধনী দ্রব্যের যোগান বাড়িয়া যাওয়ায় প্রত্যাশিত মুনাফার হার কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়িলেও বিক্রয় সেই অনুপাতে বাড়ে না; কারণ আয় বৃদ্ধি হইলেও ভোগপ্রবণতা সেই অনুপাতে বাড়িতে না থাকায় ভোগব্যয়ে অধিক বৃদ্ধি হয় না। এই সকল কারণে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা দ্রুত হ্রাস পায়। অবস্থার চাপে সুদের হার সেই সময়ে বেশি থাকে, উহাকে কমানো সম্ভব হয় না। কারণ (ক) ব্যাঙ্ক-ঋণের জন্য চাহিদা থাকে খুবই বেশি, এবং (খ) বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিশেষ করিয়া ফাটকা ব্যবসায়ে নিয়োগের জন্য নগদ-পছন্দ বাড়িয়া যাওয়ায় লোকে নগদ টাকা বেশি পরিমাণে হাতে রাখিতে চায়। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় দ্রুত হ্রাস অথচ সুদের হারে বৃদ্ধি—এই উভয়ের ফলে বিনিয়োগ একসঙ্গে হঠাৎ কমিয়া যাইতে চায়। 'হঠাৎ' কমিয়া যাওয়ার কারণ হইল ব্যবসায়িগণের সম্মিলিত মনস্তত্ত্বের

উন্নতি

সমৃদ্ধি

অবনতি

প্রভাবে ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কীয় আশা-নিরাশা নির্ধারিত হয়, এই দলবদ্ধ বাজারী মতামত সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল।

অবনতি শুরু হইলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়স্তর সবই কমিতে থাকে ; গুণকের প্রভাবে অবস্থার নিম্নগতি ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে বাড়ে। সমগ্র সমাজ দ্রুতগতিতে চরম-সংকটের স্তরে পৌঁছায়। এই অবস্থায় মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় বৃদ্ধির সূচনা হইলেই পুনরায় উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। কতকাল পরে এই উন্নতি শুরু হইবে তাহা নির্ভর করে, (ক) মজুত করা বা উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রপাতির স্থায়িত্ব কালের (durability) উপর এবং, (খ) গুদামজাত অবস্থায় যন্ত্র বা দ্রব্যাদি মজুত রাখার ব্যয়ের উপর (carrying costs)। তাহা ছাড়া, (গ) মজুত করা ভোগ্যদ্রব্যের যোগান কিছু পরিমাণে কমিয়া যাওয়ার উপর। মূলধনী ও ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইলেই উৎপাদন হইতে মুনাফা এবং মুনাফার প্রত্যাশা উভয়ই বৃদ্ধি পায় ; মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বাড়িতে থাকে ; উৎপাদনের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইতে থাকে।

সংকট

হিক্‌সের তত্ত্ব (Hicks' Theory):

হিক্‌সের মতে, অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শিল্প-বিপ্লবের পর হইতেই বিভিন্ন দেশে শিল্পোন্নতি শুরু হইয়াছে এবং সেই সময় হইতেই বাণিজ্য চক্রের উদ্ভব ঘটিতেছে। অর্থাৎ ইহা ক্রমপ্রসারমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশেষ সমস্যা ; ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ধারার দুইপার্শ্বে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের এইরূপ নিয়মিত উঠানামা ঘটিয়া চলিয়াছে। বলা যায় যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের এইরূপ পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থার মধ্য দিয়াই দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির ঊর্ধ্বমুখী ধারা প্রবাহিত ; ক্রমপ্রসারশীল অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতেই চক্রাকৃতি সংকট এবং সমৃদ্ধির প্রকৃতি ও কারণ বিশ্লেষণ করা দরকার।

বাণিজ্য-চক্র হইল সমাজের উৎপাদন ও আয়স্তরের নিয়মিত উঠানামা : তাই ইহাদের উপর ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রভাব পরিমাপকারী গুণক ও ত্বরক তত্ত্বের সাহায্যেই এই উঠানামার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এই দুই পদ্ধতির মিলিত ফলাফলে কি ভাবে কি কারণে বাণিজ্য-চক্রের উদ্ভব ঘটে, হিক্‌স তাহাই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, উৎপাদন বা আয়ে পরিবর্তন

বিনিয়োগে, বিশেষ করিয়া উদ্ভূত বিনিয়োগে, কিরূপ পরিবর্তন আনে, তাহারই উপর বাণিজ্য-চক্র প্রধানত নির্ভর করে।*

তাঁহার মতে কোন সমাজে বিনিয়োগ প্রধানত দুই ধরনের: স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ এবং উদ্ভূত বিনিয়োগ (Autonomous Investment and Induced Investment)। সমাজে কোন ধরনের বিনিয়োগ-ব্যয় দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না।

দুই শ্রেণীর বিনিয়োগ

রাষ্ট্র কর্তৃক স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বা আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি বা নূতন দ্রব্য উৎপাদন, এবং যাহা হইতে দীর্ঘকালে আয় সৃষ্টি হইতে পারে এইরূপ বিনিয়োগ, ইহারা সকলে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ—ইহা অপরাপর দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল নহে। ক্রম-প্রসারমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এইরূপ বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে। অপরপক্ষে, বিশেষ কোন দ্রব্যের উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে কোন কোন ধরনের যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়াইতে হয় (যেমন, বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে মাকু-র উৎপাদন বাড়ানো দরকার);

* কেইন্‌সীয় কর্মসংস্থানতত্ত্বে গুণকতত্ত্ব প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার মতে মোট আয় হইল মোট বিনিয়োগ × গুণক; গুণককে সমান ধরিয়া লইলে আয়ে পরিবর্তনের হার = মোট বিনিয়োগের পরিবর্তনের হার × গুণক। সুতরাং, বাণিজ্যচক্র বা আয়স্তরে পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করিতে তিনি এই গুণকতত্ত্বের উপর বিশেষ নির্ভর করিয়াছেন।

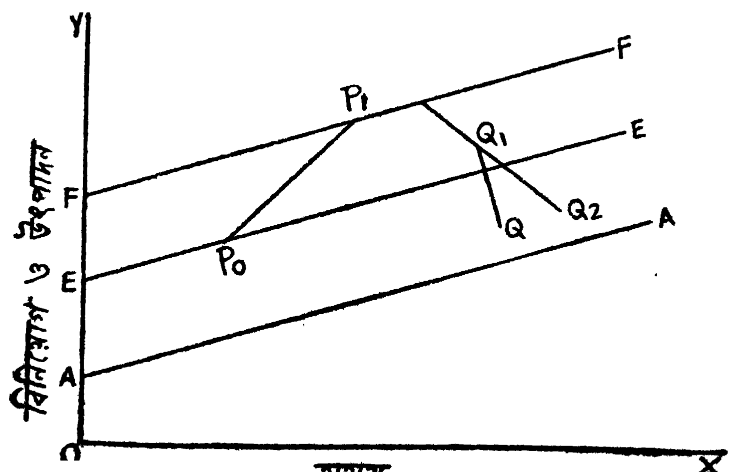
হিক্‌স এই তত্ত্বকে কার্যত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কেইন্‌সীয় গুণকতত্ত্বকে বাদ দিয়াই বাণিজ্যচক্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছে। কেইন্‌সীয় গুণককে তিনি বলিয়াছেন ক্ষণোৎভব গুণক (Instantaneous Multiplier)। গুণক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কেইন্‌সের ভোগপ্রবণতা তত্ত্বের প্রকৃতি মনে রাখা দরকার। তাঁহার মতে, চলতি ভোগব্যয় চলতি আয় হইতেই করা হয়, এবং চলতি ভোগব্যয় সঙ্গে সঙ্গে কি পরিমাণ মোট আয় সৃষ্টি করিতেছে তাহা ভোগপ্রবণতার উপর নির্ভর করে এবং সেই নির্দিষ্ট বা স্থায়ী গুণকের দ্বারা পরিমাপ করা যায়।

হিক্‌স্ কিন্তু ভোগপ্রবণতাকে অন্যভাবে দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে গুণকের পরিমাণকে নির্দিষ্ট ও স্থায়ী বলিয়া ধরা চলে না। আয় প্রসারের ধারার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গুণকের আয়তন বদলাইয়া যাইতে থাকে, ইহা তাই সর্বদাই পরিবর্তনশীল; ইহার সাহায্যে মোট আয় ও মোট কর্মসংস্থানের পরিমাপ করা চলে না। তিনি বলিয়াছেন যে, চলতি ভোগব্যয় নির্ভর করে "গত কালের" আয়ের উপর, সকল "গত কালের" মিলিত আয়ের উপর, কেইন্‌সের মত চলতি আয়ের উপর নির্ভর করে না। আয় এবং ভোগ-ব্যয়ে সময়ের ব্যবধান (time-lag) স্বীকার করিয়া লইলেই এবং সেই ব্যবধানের পরিমাণ সকল ক্ষেত্রে সমান নহে ইহা ধরিয়া লইলেই কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাবে হিসাব করা প্রয়োজন হয়। সেই অবস্থায়, গুণকের আয়তন স্থায়ী ধরিয়া লইলে বিনিয়োগ পরিবর্তনের ফলে নূতন সাম্যাবস্থার আয় পাওয়া যাইবে অসীম এক-কেন্দ্রাভিমুখী শ্রেণীর শেষে (at the end of the infinite convergence series)। সুতরাং বিশেষত, স্বল্পকালীন বিষয়ের বিশ্লেষণে, গুণকতত্ত্বের প্রয়োগ ঠিক হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে এইরূপ বিনিয়োগকে উদ্ভূত বিনিয়োগ বলা হয়। মনে রাখা দরকার যে, দ্রব্যোৎপাদন ও যন্ত্রোৎপাদন ইহাদের মধ্যে পরিমাণগত সম্পর্ক আছে এবং তাহা দ্রব্যের ও যন্ত্রের প্রকৃতি এবং যান্ত্রিক কলাকৌশলের দ্বারা নির্দিষ্ট (যেমন বৎসরে 10000 কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে 50টি মাকুর উৎপাদন প্রয়োজন)। ইহাই ত্বরণনীতির ভিত্তি অর্থাৎ উৎপাদনে বৃদ্ধি কি অনুপাতে বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটায় তাহারই উপর ত্বরণের প্রভাব নির্ভর করে।

বিনিয়োগ ও আয়স্তর

কোন দেশে যে আয়স্তর আছে তাহা সাধারণভাবে তিনটি বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত : স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ; উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং ভোগব্যয়ের পরিমাণ। নিচের চিত্রে দেখা যাইতেছে, স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের রেখা ক্রমে ঊর্ধ্বে উঠিতেছে, কারণ সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র ক্রমেই এইরূপ বিনিয়োগ বাড়াইতে থাকে। উৎপাদনের ও আয়ের রেখা উহার ঊর্ধ্বে অবস্থিত থাকে কারণ উপরোক্ত তিনটি বিষয় লইয়াই মোট আয় গঠিত। নিচের চিত্রে এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হইতেছে :



চিত্রে AA রেখা স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং EE রেখা উৎপাদনস্তর ও আয়স্তরের নির্দেশক ; উভয়ের মধ্যে দূরত্ব গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফল

এই উভয়ের মিলিত ফলকে অতিগুণকের (Super multiplier) ফলাফল বলিয়া মনে করা হয়।

ধরা যাক, P_0 বিন্দুতেআয় ও উৎপাদন হইতেছে এবং সেই সময়ে কোন স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ঘটিল: কোন আবিষ্কৃত দ্রব্যের উৎপাদন বা সরকারী ব্যয় প্রভৃতির ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইল। স্বাভাবিক স্তর হইতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় বাড়িতে লাগিল। গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফলে, উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে, P_0P_1 রেখা অবলম্বন করিয়া উৎপাদন ও আয় বাড়িতে থাকে। ব্যবসায়সমৃদ্ধির যুগে মুনাফার প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ আরও বাড়াইয়া দিতে পারে এবং গুণক ও ত্বরণের ফলে তাহাও অধিক আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করিতে থাকিবে। উৎপাদন-বৃদ্ধির স্তর নির্ভর করিবে (ক) প্রাথমিক স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ, (খ) গুণক, (গ) ত্বরণ, (ঘ) ব্যবসায়ীদের মনে ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার সৃষ্টি, ফলে বর্ধিত বিনিয়োগ—এই সকল বিষয়ের শক্তি কিরূপ তাহার উপরে।

কেন সমৃদ্ধির শুরু হয়

যদি ইহারা মিলিয়া বিশেষ শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে এমন এক অবস্থায় পৌঁছিবে যেখানে আর উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, পূর্ণকর্মসংস্থানের 'ছাদে' (Full Employment ceiling) ঠেকিয়া উৎপাদন আর বাড়িতে পারিতেছে না। পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের উৎপাদন FF রেখায় দেখানো হইয়াছে। নিয়োগযোগ্য উপকরণের অভাবে উৎপাদন ছাদে ঠেকিবার পর আর বাড়িতে পারে না। নূতন আবিষ্কৃত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য সরকারী ব্যয় অর্থাৎ প্রথম স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ শেষ হইয়া যাইবার পর, ইহা নিজে আর বৃদ্ধি পায় না; পুরানো রেখায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। কিন্তু উদ্ভূত বিনিয়োগ নিজে শেষ হয় না; নূতন আয় সৃষ্টি ও উৎপাদন বাড়াইয়া নিজেই নিজেকে বাড়াইয়া চলে; এইরূপে পূর্ণ-সংস্থান স্তরে পৌঁছায়। উহার পরে উৎপাদন আর বাড়িতে পারে না, ঐ রেখার উপরেই গড়াইতে থাকে (এবং ডান দিকেই গড়াইবে কারণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয়স্তর প্রভৃতি বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজ এখন রেখার একটু ডান দিকেই অবস্থিত)। কিন্তু উৎপাদনের রেখাকে নিম্নে নামিতেই হইবে, কারণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ আর নাই, কেবলমাত্র উদ্ভূত বিনিয়োগ অত

সমৃদ্ধির স্তর নির্ণয়

ঊর্ধ্বতম সীমা নির্দিষ্ট-কারী বিষয়সমূহ

উচ্চস্তরে উৎপাদনকে রক্ষা করিতে পারে না। রাষ্ট্র যদি সময় বুঝিয়া আবার স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ না করে বা ক্রমাগত করিতে না থাকে অথবা সমাজে পুনরায় এইরূপ বিনিয়োগ না ঘটে তাহা হইলে উৎপাদন ও আয়ের স্তর কমিয়া আসিবে। উৎপাদন কমিলে (ঋণাত্মক ত্বরণের ফলে) অবিনিয়োগ (Disinvestment) ঘটিতে থাকে। যদি ঠিক যে হারে বিনিয়োগ উদ্ভূত হইয়াছিল ঠিক সেই হারেই উহা হ্রাস পাইতে থাকে, তাহা হইলে উৎপাদন Q_1q রেখায় কমিবে। কিন্তু সাধারণত তাহা ঘটে না। স্থায়ী মূলধনে অবিনিয়োগ ধীরে ধীরে ঘটিতে থাকে, স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি ঘটিতে বেশি সময় লাগে। সুতরাং Q_1Q_2 রেখায় উৎপাদন নামিয়া আসে।

হিক্সের মতে, প্রধানত দুইটি কারণে উৎপাদনের নিম্নগতি ত্বরান্বিত হইবে। প্রথমত আর্থিক কারণের ফলে। এইরূপ অবস্থায় সাধারণত আর্থিক কর্তৃপক্ষ ঋণসৃষ্টি কমাইয়া দিতে চেষ্টা করে, ফলে সুদের হার বাড়িয়া যাইতে থাকে; তাহা ছাড়া তারল্য পছন্দ বাড়িয়া যাওয়াতে সুদের হার বাড়িবে। এই সকল বিষয় ঋণাত্মক গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফলাফলকে তীব্রতর করিয়া তুলিবে; উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান নামিয়া আসার গতি দ্রুততর হইবে। দ্বিতীয়ত, এই অবস্থায় ব্যবসায়ীদের আশাভঙ্গের ফল বিশেষ তীব্র হয়। অনেক অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী সমৃদ্ধি বেশি দিন চলিতে থাকিলেই ভয় পাইয়া উৎপাদন সংকুচিত করিতে থাকেন; তাঁহাদের বাণিজ্য-চক্রের সচেতনতাই (Cycle-consciousness) উৎপাদন ও বিনিয়োগ কমাইবার ঝোঁক সৃষ্টি করে। তাহা ছাড়া, শেয়ার বাজারের "দলবদ্ধ জনতার মতামত" বিশেষ অস্থির প্রকৃতির।

নিম্নগতি কি কারণে ত্বরান্বিত হইয়া থাকে

উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান প্রভৃতি নামিয়া আসারও কিন্তু সীমা আছে; সেই মেঝেতে (floor) ঠেকিয়া উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান আর নামিতে পারে না। তিনটি বিষয়ের দ্বারা এই নিম্নতম সীমার স্তর নির্দিষ্ট হয়।

নিম্নতম সীমা নির্ধারণকারী বিষয়-সমূহ

প্রথমত, সংকট যতই গভীর হউক না কেন, কিছু পরিমাণ ভোগব্যয় সমাজে সর্বদা হইবেই, আয় না থাকিলেও ঋণ করিয়া, সঞ্চয় ভাঙাইয়া যে-কোন উপায়ে ব্যক্তিরা নিম্নতম দৈহিক প্রয়োজন মিটাইতে থাকিবে।

দ্বিতীয়ত, সংকট কালে সরকারী ব্যয় সাধারণত কমে না, সুতরাং তাহা চলিতে থাকিবে; এমন কি দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য কিছুটা বাড়িতেও পারে।

তৃতীয়ত, কিছু পরিমাণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ, যেমন স্কুল, কলেজ, গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতির জন্য ব্যয় সমাজে চলিবেই ; ইহারা চল্‌তি অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না। এই তিনটি বিষয়ের উপর মোট ব্যয় সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার নিম্নতম সীমা এবং সেই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের উপযোগী অর্থনৈতিক কাজকর্ম চরম-সংকটের সময়েও চলিতে থাকিবে ; ইহারা বেকারির উর্ধ্বতম সীমার পরিমাণ (Upper limit of Unemployment) নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

উন্নতির শুরু

মজুত মূলধনী দ্রব্যাদির অবিনিয়োগ (Disinvestment), এবং তাহাদের ক্ষয়ক্ষতির বা অকেজো হইয়া যাইবার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংকটকাল স্থায়ী হইবে ; কারণ তাহার পর উহাদের পুনঃসংস্থাপনের জন্য কিছু নূতন বিনিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। ফলে, আবার সেই গুণক ও ত্বরণের সম্মিলিত ফলাফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দৌড় শুরু হইবে, সমাজের সংকট ত্রাণ ঘটাইয়া উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে।

বাণিজ্য-চক্র নিয়ন্ত্রণ বা অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সাধন (Control of Business cycles or Economic stabilization)

বাণিজ্য চক্রের নিয়ন্ত্রণ করিয়া অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সাধনের উদ্দেশ্যে বহু প্রকার নীতি আলোচিত হইয়াছে। এই সকল নীতিকে সাধারণভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, আর্থিক নীতি (Monetary policies) ও ফিস্‌কাল নীতি (Fiscal policies)। বহুপূর্বকাল হইতেই ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, উপযুক্ত ধরনের আর্থিক নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করিলে বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ করা চলে। যেমন, হট্রে (Hawtrey) মনে করিতেন যে, এই উদ্দেশ্যে দেশের ব্যাঙ্কগুলিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার যাহাতে উহারা ঋণপ্রসারের পরিমাণ নিজেদের খুশিমত বাড়াইতে বা কমাইতে না পারে। হায়েক (Hayek) বলিতেন যে, দেশে এমন সুদের হার বজায় রাখিতে হইবে যাহাতে সমাজের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় দেশে বিনিয়োগের মোট মূল্যের সমান হয়। উইক্‌সেলের (Wicksell) মতে অর্থনৈতিক এই স্থায়িত্ব তখনই সম্ভব হয় যখন দেশে সুদের স্বাভাবিক হার ও বাজার-হার সমান থাকে।

উপযুক্ত আর্থিক নীতি কার্যকরী করা

আমরা জানি দেশের কার্যকরী চাহিদায় উঠানামাকে বাণিজ্যচক্র বলে। এই কার্যকরী চাহিদা নির্ভর করে মোট ব্যয়ের উপর, অর্থাৎ মোট ভোগব্যয় ও মোট বিনিয়োগ ব্যয়ের উপর। আর্থিক নীতির কাজ হইল দেশের বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয়ের উঠানামার পরিধি সংকুচিত করা। দেশে ব্যাঙ্কঋণের প্রসার কমান ও বাড়ান এবং সুদের হার কমান ও বাড়ান—ইহারাই আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য। (ক) ব্যাঙ্ক ঋণের প্রসার কমান বা বাড়ান-র উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারী নীতি প্রয়োগ করিতে পারে, অথবা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নগদজমার অনুপাতে পরিবর্তন আনিতে পারে। উন্নতিকালের শেষে সমাজ যখন সমৃদ্ধির পথ ধরিয়া দ্রুতবেগে অবনতির দিকে ছুটিয়া চলে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক ও ব্যক্তির হাত হইতে টাকা তুলিয়া লইতে চেষ্টা করে এবং ব্যাঙ্কের নগদ জমার অনুপাত বাড়াইয়া দেয়। আবার সংকটকালে সমাজকে যখন উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া দরকার তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই ঋণপত্রগুলি কিনিয়া লয়, ব্যাঙ্ক ও ব্যক্তিদের হাতে প্রভূত পরিমাণে টাকা ঢালিয়া দেয় এবং ব্যাঙ্কের নগদ জমার অনুপাত কমাইয়া দেয়। এইরূপে চরম সমৃদ্ধি বিন্দুর (Boom) পূর্বে সমাজে বেসরকারী বিনিয়োগের মাত্রাতিরিক্ততা রোধ করার চেষ্টা করে ; আবার চরমসংকটবিন্দু (slump) হইতে সমাজকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে বেসরকারী বিনিয়োগের মাত্রাধিক ঘাটতি দূর করার চেষ্টা করে।

খোলাবাজারী নীতি ও নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন

কিন্তু টাকার যোগান বাড়াইবার এই আর্থিক নীতিসমূহ সর্বদা সফল হয় বলিয়া মনে করা চলে না। অতিরিক্ত মাত্রায় সমৃদ্ধি ঠেকাইবার এই চেষ্টা সফল হয় না, কারণ আজকালকার রাষ্ট্রেরা সর্বদা প্রভূত পরিমাণে ঋণ করে বলিয়া বাজারে অজস্র ঋণপত্র থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকা তুলিয়া লইবার জন্য যদি আরও কিছু ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া দেয়, তবে ব্যাঙ্কগুলি বা ব্যক্তিরা পুরাণো ঋণপত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করিয়া বা জমা রাখিয়া আবার নিজেদের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়াইতে পারে। উপরন্তু এই সময়ে নগদ-পছন্দ ভয়ানক কমিয়া যাইতে পারে। তীব্র মুদ্রাস্ফীতির দরুণ টাকার মূল্য দ্রুত কমিতেছে, জিনিসপত্র কিনিয়া রাখাই ভাল, এইরূপ মনে করিয়া লোকে বেশি টাকা বাজারে ছাড়িয়া দিতে পারে। আবার সংকটকালে, টাকার পরিমাণ বাড়াইলেই উন্নতি দেখা দেয় না, কেহ ধার নিতে চাহে না, বিনিয়োগ করার ইচ্ছা না থাকিলে ব্যাঙ্কঋণের প্রসার সম্ভব নয়।

কিন্তু এই নীতিগুলি বাণিজ্যচক্র রোধ করিতে পারে না

তাহা ছাড়া, এই সময়ে ব্যবসায় মন্দা বলিয়া লোকের নগদ পছন্দ বেশি হইতে পারে, ভবিষ্যতের উন্নতি আশা করিয়া বর্তমানে বেশি টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে। (খ) আর্থিক নীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হইল স্থদ-নীতি। চরমসমৃদ্ধির বিন্দুতে পৌঁছাইলে এই সমৃদ্ধির বুদ্‌বুদ্‌ ফাটিয়া যাইবে, তাই তাহার পূর্বে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের অস্বাভাবিক প্রসার রোধ করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে অনেকে বলেন যে স্থদের হার বাড়াইয়া দেওয়া উচিত বেশি স্থদের হারে উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ কমাইয়া দেয়। আবার সংকটকাল হইতে উন্নতি ঘটাইতে হইলে স্থদের হার কমাইয়া দেওয়া দরকার, কারণ তবেই বিনিয়োগ বাড়িতে পারে।

স্থদের হার পরিবর্তন

স্থদের হারে পরিবর্তন ঘটান-র এই নীতির কত প্রকার সীমাবদ্ধতা আছে তাহা আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। সেই সকল সীমাবদ্ধতা ছাড়াও এই নীতির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলার আছে। বিনিয়োগের আতিশয্য বন্ধ করিয়াই সংকট ঠেকান যায়, তাই স্থদের হার বাড়াইয়া বিনিয়োগ বন্ধ করা দরকার, এই বক্তব্যে ত্রুটি আছে। কেইন্‌স বলেন যে, স্থদের হার বাড়াইয়া চরম সমৃদ্ধির বিন্দুতে পৌঁছান রোধ করার এই নীতি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা চরম-সমৃদ্ধিতে পৌঁছাইতে চাই এবং সেই স্তরেই অর্থনৈতিক কাঠামোকে রক্ষা করিতে চাই (Stabilisation at full employment point), ইহা মনে রাখা দরকার। স্থদের হার বাড়াইলে সমাজের পক্ষে দরকারী অনেক বিনিয়োগ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে, লোকের ভোগপ্রবণতা কমিয়া যাইতে পারে, দেশের মোট ব্যয় ও কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ অবনতি ও সংকট স্থরু হইয়া যাইতে পারে, সমৃদ্ধির যুগে স্থদের হার বাড়ান তাই আত্মঘাতী নীতি। এই সময় আপ্রাণ চেষ্টা করা দরকার যাহাতে আয়বণ্টনে পরিবর্তন আনিয়া বা অন্য যে কোন পদ্ধতিতে দেশের ভোগপ্রবণতা বাড়াইয়া তোলা যায়, কিছুতেই যেন কার্যকরী চাহিদা কমিয়া না যায়।* তাই কেইন্‌সের মতে চরমসমৃদ্ধির বুদ্‌বুদ্‌ ঠেকাইতে হইলে

কিন্তু কেইন্‌স্‌ বলেন উহা সম্পূর্ণ ভুল নীতি

* "The remedy would not lie in the clapping on a high rate of interest which would probably deter some useful investments and might further diminish the propensity to consume, but in taking drastic steps, by redistributing incomes or otherwise, to stimulate propensity to consume." Keynes, *General theory*, P. 321.

কিছুতেই উচ্চসুদের হার ধার্য না করিয়া নিম্নসুদের হারের নীতি অনুসরণ করা দরকার। সমৃদ্ধির বিলোপ করিয়া আমাদের আধা-সংকটের স্তরে ফেলিয়া রাখা বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধের সঠিক পথ নয়, ইহার নির্ভুল পন্থা হইল সংকটের বিলোপ সাধন এবং প্রায়-সমৃদ্ধির স্তরে আমাদের স্থায়ীভাবে রক্ষা করা। তাই সুদের হার বাড়াইবার নীতি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, ইহা রোগীকে মারিয়া অসুখ সারান-র নীতির মতই বিপদজনক।* এইসকল বিচার করিয়া কেইনস্ বলিয়াছেন, "The remedy would lie in various measures designed to increase the propensity to consume by the redistribution of incomes or otherwise". এই উদ্দেশ্যে, তাই তিনি আর্থিকনীতি অপেক্ষা ফিস্কাল নীতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

আমরা জানি যে, কার্যকরী চাহিদায় তীব্র উঠানামাকেই বাণিজ্যচক্র বলে তাই সমাজের সামগ্রিক ব্যয়ে হঠাৎ হ্রাসবৃদ্ধি ঠেকান দরকার। সামগ্রিক ব্যয়ের মধ্যে আছে ভোগব্যয়, বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারী ব্যয়; সংক্ষেপে আমরা বলিতে পারি যে $Y=C+I+G$. আর্থিক নীতিগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হইল I-এর পরিমাণে অস্থিরতা রোধ করা; আর ফিস্কাল নীতির প্রধান লক্ষ্য হইল C এবং G এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে Y-তে তীব্র উঠানামা না হইতে পারে। সরকারী কর আদায়, ব্যয়, বাজেট গঠন এই সকল মিলিয়া ফিস্কাল নীতি গঠিত; বাণিজ্যচক্ররোধের কাজে নিযুক্ত হইলে ইহাকে চক্র-বিরোধী ফিস্কাল নীতি বলে (contra-cyclical Fiscal Policy)। বেসরকারী ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয় হঠাৎ কমিয়া যাওয়াই সংকটের কারণ, এই অবস্থায় পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে থাকিতে গেলে সমাজে যতটা সামগ্রিক ব্যয় দরকার হইত ততটা হইতেছে না, ফাঁক থাকিয়া যাইতেছে। এই ফাঁক বা ব্যবধান পূরণ করাই তখন ফিস্কাল নীতির লক্ষ্য। ইহাকে তাই পূরণমূলক ফিস্কাল নীতিও বলা

ফিস্কাল নীতির গুরুত্ব ও বিভিন্ন অংশ

* "Thus the remedy for the boom is not a higher rate of interest but a lower rate of interest! For that may enable the so-called boom to last. The right remedy for the trade cycle is not to be found in abolishing booms and thus keeping us permanently in a semi-slump; but in abolishing slumps and thus keeping us permanently in a quasi-boom......Thus an increase in the rate of interest, as a remedy for the state of affairs arising out of a prolonged period of abnormally heavy new investment, belongs to the species of remedy which cures the disease by killing the patient." Keynes, *General theory*, P. 322-323.

হইয়া থাকে (Compensatory Fiscal Policy)। ইহার দুইটি দিক: (ক) পূরণমূলক ব্যয়ের নীতি (Compensatory Spending Policy) এবং পূরণমূলক করনীতি (Compensatory tax policy)।

সরকারী ব্যয়ের নীতি বা পূরণমূলক ব্যয়ের নীতি আলোচনা করা দরকার। সরকারী ব্যয়কে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে: (১) সাধারণ পরিচালনামূলক ব্যয় (ordinary operating expenses of Government) (২) হস্তান্তর ব্যয় (Transfer payments), এবং (৩) উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় বা সরকারী বিনিয়োগ (outlay on public works or public investment)। বাণিজ্য-চক্র নিয়ন্ত্রণের উপযোগী করিয়া সরকারের সাধারণ পরিচালনামূলক ব্যয় নির্বাহ করা চলে না। হস্তান্তর ব্যয়সমূহ বাণিজ্যচক্রের প্রকোপ রোধ করিতে পারে, যেমন সংকটকালে অধিকতর বার্ধক্য পেনসন, বেকারভাতা প্রভৃতি দিয়া সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়াইবার চেষ্টা করা চলে। সরকারী নির্মাণ কার্য বা বিনিয়োগ এমনভাবে কমান বাড়ান চলে যাহাতে বাণিজ্যচক্রের উঠানামার ব্যাপ্তি কিছুটা হ্রাস পায়। এইরূপে সরকারী ব্যয়-নীতির দ্বারা সমাজের ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয় উভয়ের উপরই কিছুটা প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা যায়।

পূরণমূলক ব্যয়ের নীতি কিরূপে কাজ করে

পূরণমূলক করনীতির গুরুত্ব খুবই বেশি, কারণ আমরা উপরে দেখিয়াছি, মোট সরকারী ব্যয়ের মধ্যে মাত্র অল্প একটু অংশকে বাণিজ্যচক্র রোধের কাজে কমান বা বাড়ান চলে। করনীতিকে দুইটি উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা চলে। যেমন, করের সাহায্যে দেশের আয়-বৈষম্য হ্রাস করা যায়, ফলে সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়িতে পারে। ধনীদের ভোগ-প্রবণতা কম, তাহাদের নিকট হইতে আরও বেশি কর আদায় করিলে সমাজের মোট ভোগব্যয় বিশেষ হ্রাস পায় না। সেই টাকা দরিদ্রদের হাতে দিলে সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়ে, কারণ তাহাদের ভোগ-প্রবণতা বেশি। তাহা ছাড়া, বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়াইবার কাজেও করনীতিকে প্রয়োগ করা যায়। করের প্রকৃতি ও কর-হার সেইরূপ হওয়া দরকার যাহাতে সংকটকালে বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়ে, আবার স্ফীতি-কালে বেসরকারী বিনিয়োগ কমে। কর-কাঠামো এরূপ নমনীয় থাকা দরকার যাহাতে বাণিজ্যচক্রের গতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি করের হার ও দিক পরিবর্তন করা সম্ভব। দেশের কর-কাঠামোর মধ্যে এইরূপ করের ব্যবস্থা রাখিতে পারিলে

পূরণমূলক করনীতির কাজ কিরূপ

সমৃদ্ধির যুগে আপনা-আপনি উহা হইতে আদায় বেশি হয়। আবার সংকট-কালে আপনা-আপনি আদায় কম হয়। বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন স্তরে এই করগুলি হইতে আদায় নিজ হইতে পরিবর্তিত হইয়া চক্রের প্রকোপ উভয় দিকেই কমাইতে পারে। ইহাদের তাই বলে স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্বসাধনকারী শক্তি (Automatic Stabilisers)।

ফিস্‌কাল নীতির এই দুই অঙ্গ—সরকারী ব্যয় নীতি ও করনীতি—বাস্তবে কাজ করে বাজেটের (budget) মধ্য দিয়া। প্রতি বৎসর বাজেটে সরকারী আয় ও ব্যয় সমান রাখিবার ক্লাসিকাল নীতি পরিত্যাগ না করিলে বাণিজ্যচক্র বিরোধী ফিসকাল নীতি কার্যকরী করা চলে না। বাজেটে প্রতি বৎসর সমতাবিধান করা একান্ত গোঁড়ামি, বাণিজ্যচক্র রোধ করিবার উদ্দেশ্যেই চক্রকালীন বাজেট রচনা করা দরকার (cyclical budgeting)। যেমন, সমৃদ্ধির প্রাবল্যকে বাধা দিতে পারিলে আসন্ন সংকট রোধ করা যায়, তাই এই যুগে ব্যয় কমাইয়া আয় বাড়াইয়া বাজেটে উদ্বৃত্ত রাখা প্রয়োজন। সমৃদ্ধি যুগের বাজেট রচনায় সমতা রাখিলে চলে না। অপর পক্ষে সংকটকালে ব্যয় বাড়াইয়া আয় কমাইয়া বাজেটে ঘাটতি রাখা দরকার। সেই সময়েও বাজেটে সমতার নীতি গ্রহণীয় নয়। উদ্বৃত্ত বাজেটের সময় যে অর্থ ছাঁকিয়া তোলা হইয়াছিল, ঘাটতি বাজেটের সময়ে তাহা ঢালিয়া দেওয়া দরকার। এইরূপে সমগ্র চক্রকাল লইয়া একটি বাজেট রচনা করা চলে, এই চক্রকালের উভয় দিক লইয়া মিলিতভাবে বাজেটে পূর্ণ-চক্রকালীন সমতা থাকিলেই চলিবে।

চক্রকালীন বাজেট রচনার নীতি

সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার যে, বাণিজ্যচক্র শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর অঙ্গ, এই পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ্যাতেই ধনতান্ত্রিক দেশে সুদীর্ঘকালীন ক্রমপ্রসার ঘটে; নিয়মিত ঝাঁকুনি, উঠানামা ও অস্থিরতা এই প্রকার সমাজের আভ্যন্তরীণ গতি-প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এইরূপ সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের হাতে, তাঁহারা সমাজের প্রয়োজনের কথা না ভাবিয়া নিজ মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন করেন। বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন এই উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের পিছনে সারা দেশব্যাপী কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা নাই। বাণিজ্যচক্র রোধ করার পন্থা হিসাবে কেইন্সের মত সমর্থন করিয়া বেশির ভাগ ধনবিজ্ঞানীই আজকাল বলেন যে, বিনিয়োগের সামাজিক

কিন্তু বিনিয়োগের সামাজিক নিয়ন্ত্রণই একমাত্র পথ

নিয়ন্ত্রণই বাণিজ্যচক্র রোধ করার অন্যতম প্রধান পথ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার অবস্থা অনুযায়ী বিনিয়োগের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন রূপ লইতে পারে, কিন্তু ইহাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

অনুন্নত দেশ ও বাণিজ্যচক্র :

অনুন্নত দেশসমূহে বাণিজ্যচক্র দেশের অভ্যন্তরে কৃষি-উৎপাদনে উঠানামার উপরেই প্রধানত নির্ভর করে ; শিল্পের সংখ্যা, পরিমাণ ও শিল্পে বিনিয়োগ এইরূপ দেশে কম। তবে, অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশসমূহের সহিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে যোগসূত্র থাকায় অপর দেশের সমৃদ্ধি ও সংকট উভয়ই অনুন্নত দেশসমূহে প্রবেশ করে।

আধুনিক কালে আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হওয়ায় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান প্রদান বাড়িয়া যাওয়ায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থ-নৈতিক অঞ্চল আর বিশেষ নাই ; বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পরস্পর নির্ভরশীল ও সংযুক্ত। সুতরাং কোন উৎপত্তি-কেন্দ্র (Epicentre) হইতে শুরু হইয়া ভূমিকম্প যেরূপ বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে, অর্থনৈতিক জগতেও কোন দেশের সংকট বা সমৃদ্ধি এইরূপে বিভিন্ন দেশে ছড়াইতে থাকে ; ইহারা কিরূপ ছড়াইবে তাহা নির্ভর করে প্রতিবেশী দেশসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক ও ত্বরকের আয়তনের উপর।

যদি কোন অনুন্নত দেশ প্রধানত কৃষিজাত কাঁচামাল রপ্তানি করে তাহা হইলে অধিক রপ্তানি এবং বাণিজ্য হারে আনুকুল্যের মাধ্যমে সে আমদানিকারী উন্নত দেশের সমৃদ্ধির অংশ লাভ করে। সংকটের সময়ে তাহার দুরাবস্থা দুই প্রকারের : (ক) কৃষিজাত কাঁচামালের চাহিদা কমিয়া যাইয়া রপ্তানির উদ্বৃত্ত থাকে না। (খ) সংকটে বিপন্ন উন্নত দেশগুলি হইতে অবিক্রীত দ্রব্যসমূহ আসিয়া তাহার দেশের শিশু শিল্পসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করে।

* "In conditions of *laissez faire* the avoidance of wide fluctuations in employment may, therefore, prove impossible without a far-reaching change in the psychology of investment markets such as there is no reason to expect. I conclude that the duty of ordering the current volume of investment cannot safely be left in private hands." Keynes, *General theory*, P. 320.

তবে যদি কোন অনুন্নত দেশ প্রধানত কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানিকারক হয়, তাহা হইলে সংকটের সময়ে তাহার সর্বাধিক সুবিধা, কারণ উন্নত দেশে সংকট আসিলেও সে খাদ্য ক্রয় করিবেই, সুতরাং অনুন্নত দেশের রপ্তানি বিশেষ কমিবে না, অথচ সংকটকালীন সস্তা দামে নিজের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য সে ক্রয় করিতে পারিবে ; বাণিজ্যহার তাহারই অনুকূলে আসিবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে তাহার লাভ বেশি হইতে থাকিবে। উন্নত দেশে সমৃদ্ধি আসিলে অবশ্য তাহার সুবিধা বিশেষ নাই, কারণ সমৃদ্ধির ফলে খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। ঠিক সেই সময়ে শিল্পজাত আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িবার ফলে বাণিজ্যহার তাহার প্রতিকূলে যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ কম হইতে থাকে।

কৃষিজাত কাঁচামাল অথবা খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানি-কারক

অনুশীলনী

1. Explain what is meant by trade cycle and describe the different phases of a trade cycle.

2. Describe the characteristics and phases of a typical business cycle.

3. Discuss Schumpeters' theory of Business cycles.

4. Discuss the role of Psychological factors in the determination of Business cycles.

5. Examine critically the monetary theory of Trade Fluctuations.

6. In what respects the upper and lower turning points of a trade cycle are dissimilar ?

7. Why Fluctuations are relatively more pronounced in capital goods industries ?

8. Critically examine Hayek's monetary over-investment theory.

9. Critically examine Hayek's Ricardo-effect.

10. "Keynes's-equilibrium theory provides us with the theoritical framework for a theory of stagnation." Explain.

11. Discuss how trade cycle can only be explained through the interaction of multiplier and acceleration.

12. "The Trade cycle is best regarded, I think, as being occasioned by a cyclical change in the marginal efficiency of Capital." (Keynes) Explain.

13. Discuss the role of monetary factors in aggravating the course of Business Fluctuations.

14. Discuss the methods of controlling the Trade Cycles.

15. Compare and evaluate the role of monetary and Fiscal policies in controlling Trade Fluctuations.

১২

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

International Trade

উৎপাদনের উপাদানসমূহ পৃথিবীর সকল অঞ্চলে সমানভাবে বন্টিত নাই; কোন অঞ্চলে কোন উপাদানের পরিমাণ বেশি, কোথাও বা উহার পরিমাণ কম। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে বিভিন্ন উপাদানসমূহ কম বা বেশি পরিমাণে নিয়োগ করা হয়। একটি দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ কোন অঞ্চলে অধিক পরিমাণে ও কম দামে পাওয়া গেলে উহার উৎপাদন-ব্যয় সেখানে কম পড়ে; উপাদানসমূহের যোগান কম হইলে ও দাম বেশি হইলে দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় অধিক হয়। সুতরাং কোন বিশেষ অঞ্চলের উপাদান-লভ্যতা (Availability of factors) অনুযায়ী সেই অঞ্চল বিশেষ ধরনের দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়; ব্যক্তি যেমন নিজের শক্তি, সামর্থ্য অনুসারে বিশেষ প্রকার কর্মে বা জীবিকাতে নিযুক্ত থাকে, সেইরূপ কোন অঞ্চলও এমন দ্রব্য উৎপাদনে উহার সকল উপাদানসমূহ নিয়োগ করে যাহাতে তুলনামূলক ভাবে, উহার উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাধিক বা উৎপাদন-ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম।

আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ

কিন্তু পৃথিবীতে সকল অঞ্চলসমূহ রাজনৈতিক ভাবে এক রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত নহে, বলা যায় যে রাজনৈতিকভাবে পৃথিবী বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারিত আছে। এক রাষ্ট্রের অধিবাসী ও ব্যবসায়ীদের সহিত অন্য রাষ্ট্রের অধিবাসী ও ব্যবসাদারদের পরস্পরের নিকট হইতে ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন-কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়।

এই বিষয়ে পৃথক তত্ত্বের দরকার কি?

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে পৃথক ভাবে আলোচনা করার কারণ কি? কেন এই বিষয়ে পৃথক তত্ত্ব রচিত হইয়াছে ইহার অনেক কারণ আছে। রাজনৈতিক ভাবে রাষ্ট্রবিভাগ রাজনৈতিক কাজ-

কর্মের ক্ষেত্রে বহু প্রকার ও বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রথমত, উপাদান-সমূহ একটি দেশের মধ্যে যতখানি চলনশীল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তাহাদের চলনশীলতা তুলনামূলকভাবে আরও কম। দেশের অভ্যন্তরে কোন অঞ্চলে কোন উৎপাদনের দাম বেশি হইলে অন্যান্য অঞ্চল হইতে উপাদানসমূহ সেই অঞ্চলে ধাবিত হয়, ফলে মোটামুটি ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উপাদানের পারিশ্রমিকে অধিক পার্থক্য থাকে না। কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিক, মূলধন বা উদ্যোগ-ক্ষমতার চলনশীলতা তুলনামূলক-ভাবে অনেক কম; অন্য রাষ্ট্রে মজুরি, সুদ বা মুনাফা অধিক হইলেও উপাদানসমূহ নিজের রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া অন্য রাষ্ট্রে যাইতে চাহে না। ফলে সকল রাষ্ট্রে উপাদানসমূহের পারিশ্রমিকের হার সমান নহে; বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের উপর ইহার বিশেষ প্রভাব দেখা দেয়।

কারণ ইহা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে পৃথক

তুলনামূলক চলনশীলতা

নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থা

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থা আছে, এক রাষ্ট্রের টাকা অপর রাষ্ট্রে লেনদেনের কার্যে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক দেশের টাকাকে অন্য দেশের টাকায় রূপান্তরিত করিতে হয়, উপরন্তু এক দেশের টাকার বিনিময়ে অপর দেশের যে পরিমাণ টাকা পাওয়া যায় সেই বৈদেশিক বিনিময় হার বা টাকার বৈদেশিক মূল্যও সকল সময় স্থির থাকে না, তাহার উঠানামা ঘটে।

পৃথক অর্থনৈতিক সংগঠন ও পরিবেশ

তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক কাজকর্ম, উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় প্রভৃতিনিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ ধরনের আইন-কানুন বা রীতি-নীতি, প্রথা প্রভৃতি প্রচলিত থাকে, তাহাও সেই দেশের উৎপাদন-ব্যয়কে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। প্রত্যেকটি দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পৃথক ধরনের, তাহাদের রীতি-নীতি ও যোগ তা পৃথক। সুতরাং বিভিন্ন দেশের উৎপাদন স্বতন্ত্র পরিবেশে পরিচালিত হয়।

পৃথক বাণিজ্য নীতি

সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক জগতে রাষ্ট্রসমূহ প্রত্যেকে নিজস্ব বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে এবং অপর রাষ্ট্র হইতে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি-রপ্তানিতে বিভিন্ন ধরনের বাধা নিষেধ আরোপ করে। দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলেরমাল চলাচলের উপর সাধারণত এইরূপ কোন বাধা নিষেধ থাকে না। এই সকল কারণে আন্তর্জাতিক

বাণিজ্যের তত্ত্বকে পৃথক করিয়া আলোচনা করা হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি, রীতিনীতি ও সমস্যার বিশ্লেষণ এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি: উৎপাদন ব্যয়সমূহের অনুপাতে পার্থক্য (The basis of International trade: Difference in cost-ratios):

কেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব হয় বা কেন এক দেশ বিশেষ ধরনের দ্রব্যাদি আমদানি বা রপ্তানি করে তাহা বিশ্লেষণের জন্য ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা উৎপাদনব্যয়ের পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, প্রত্যেকটি দেশ সেই সকল দ্রব্যই উৎপাদন করিবে যাহাদের উৎপাদনে তাহার স্বাভাবিক দক্ষতা বা সুবিধা তুলনামূলকভাবে অধিক। সেই দেশের জলবায়ু, জমি, খনিজ ও কৃষিসম্পদ, লোকের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতির দরুণ যে সকল দ্রব্যের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, সেই দেশ সেই সকল দ্রব্যই উৎপন্ন করিবে। নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া সেই উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি হিসাবে অন্য দেশে প্রেরণ করিবে এবং অন্য দেশ হইতে এমন দ্রব্য আমদানি করিবে যাহার উৎপাদনে তাহার স্বাভাবিক সুবিধার পরিমাণ অপর দেশের তুলনায় কম।*

কোন্ ধরনের দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি হইবে

কি কি ধরনের পণ্য উৎপাদনে কোন দেশের কিরূপ স্বাভাবিক সুবিধা আছে তাহা এই সকল দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের দ্বারা প্রকাশ পায়। একটি দ্রব্য অন্য দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিলে বুঝা

* "To the question which goods a country will import and which it will export, the classical theory gives the following answer. Each country will produce those goods for the production of which it is especially suited on account of its climate, of the qualities of its soil, of its other natural resources, of the innate and acquired capacities of its people, and—this must be given special emphasis—of the real capital which it possesses as a heritage from its past, such as buildings, plant and equipment, and means of transport. It will concentrate upon the production of such goods, producing more of them than it requires for its own needs and exchanging the surplus with other countries against goods which it is less suited to produce or which it cannot produce at all." Haberler, *International Trade* P. 125.

যাইবে যে এই দ্রব্য উৎপাদনে স্বাভাবিক সুবিধা বেশি বলিয়া ব্যয় কম পড়িতেছে। এই ব্যয়-পার্থক্য তিন প্রকারের হইতে পারে: সমান ব্যয় পার্থক্য, চরম ব্যয়-পার্থক্য এবং তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য।

(ক) সমান ব্যয় পার্থক্য (Equal difference in costs) :

যদি উভয় দেশের মধ্যে উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে সমান পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে সেই অবস্থায় উহাদের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে না। যেমন, ধরা যাউক—

A দেশে,	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	20 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	30 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়,
আবার, B দেশে,	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	30 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	45 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়।

এমতাবস্থায়, A দেশে 1 ইউনিট ধানের বিনিময়ে 1½ ইউনিট কাপড় পাওয়া যায়, কারণ উভয়ের উৎপাদন-ব্যয় সমান। B দেশে উভয় দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ বিনিময় হার হইল 1 ধান : 1½ কাপড়। এই অবস্থায় উভয় দেশে দ্রব্যের মধ্যে ব্যয়ের অনুপাত সমান হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হইতে পারে না, কারণ কেহ কোন দ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়া নিজের দেশে যাহা পাওয়া যায় তাহার অধিক অন্য দ্রব্য পাইতে পারে না। অবশ্য এই অবস্থাতেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হইয়া গেলে উপাদানের নিযোগে দিক্-পরিবর্তন ঘটিলে, উৎপাদন ব্যয়ে পরিবর্তন আসিবে, ব্যয়-পার্থক্যের অনুপাত সমান থাকিবে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্ভাবনা উন্মুক্ত হইবে।

(খ) চরম ব্যয় পার্থক্য (Absolute difference in costs) :

যদি উভয় দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে চরম পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য হওয়া সম্ভবপর। যেমন, ধরা যাউক—

A দেশে,	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	20 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	10 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়।
B দেশে,	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	10 ইউনিট ধান, এবং
	20 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	20 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়।

A দেশের মধ্যে 1 ইউনিট ধানের বদলে ½ ইউনিট কাপড় পাওয়া যায়, B দেশের মধ্যে 1 ইউনিট ধানের বদলে 2 ইউনিট কাপড় পাওয়া যায়। A দেশের

ধান উৎপাদনে চরম স্থবিধা এবং B দেশের কাপড় উৎপাদনে চরম স্থবিধা। উৎপাদন ব্যয়েও চরম পার্থক্য ; A দেশ ধান উৎপাদনে, B দেশ কাপড় উৎপাদনে তাহাদের সকল উপাদান নিয়োগ করিবে। এইরূপে উভয় দেশের নিজস্ব স্বাভাবিক স্থবিধা অনুযায়ী উপাদান নিযোগের ফলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণই বৃদ্ধি পাইবে। পূর্বে যে-ব্যয়ে 20+10=30 ইউনিট ধান এবং 10+20=30 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হইতেছিল, বাণিজ্যেব দরুণ আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের ফলে সেই একই ব্যয়ে 20+20=40 ইউনিট ধান এবং 20+20=40 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বহুলাংশ এইরূপ চরম ব্যয়-পার্থক্যের উপর নির্ভর করে ; পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশের ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদিব মধ্যে বিনিময ও বাণিজ্যেব দিকে লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যায়।*

(গ) তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য (Comparative difference in costs) :

উৎপাদন ব্যযে চরম পার্থক্য না থাকিয়া তুলনামূলক পার্থক্য থাকিলেও উভয় দেশেব মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পাবে। যেমন, ধরা যাউক—

A দেশে,	10 দিন পরিশ্রমেব ব্যযে	20 ইউনিট ধান. এবং
	10 দিন পবিশ্রমের ব্যযে	20 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয,
B দেশে,	10 দিন পরিশ্রমের ব্যযে	20 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পবিশ্রমেব ব্যযে	30 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়।

A দেশে উভয দ্রব্যেব উৎপাদন-ব্যযের অনুপাত হইল 1 : 1 এবং এই হারেই দেশেব মধ্যে উহাদের বিনিময হইতে থাকিবে। কিন্তু B দেশে উভয় দ্রব্যেই উৎপাদন-ব্যযের অনুপাত হইল 1 : 1½, দেশের অভ্যন্তবে উহাদের এই হারেই বিনিময হয। কোন দেশেবই কোন দ্রব্য উৎপাদনে চরম স্থবিধা নাই, তুলনামূলক ভাবে B দেশের কাপড় উৎপাদনে স্থবিধা বেশি। যেহেতু

* "The classical doctrine assumes that labour is completely mobile within a country and therefore distributes itself among the different branches of production in such a way that its marginal productivity is everywhere equal to its wage. This rule does not apply to international trade, since labour is not mobile between countries. This immobility of factors between two countries clearly will not matter if the distribution of labour between them happens to be the same as that which would come about under complete mobility. In such circumstances an exchange of goods will take place only if each of the two countries can produce one commodity at an *absolutely lower production cost* than the other country... ..A large part of world trade rests upon absolute differences in cost. One thinks at once of the trade between the temperate zones and the tropics .....The same applies to the exchange of goods between agricultural countries with fertile land and industrial countries with deposits of coal and iron." Haberler, *International Trade* P. 127-28.

দুই দেশের মধ্যে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে ব্যয়-পার্থক্য আছে, সেইজন্য উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারিবে।

তুলনালক ব্যয়-পার্থক্যের নীতি

A দেশের ব্যবসায়ীগণ 1 ইউনিট ধানের বদলে নিজের দেশে 1 ইউনিট কাপড় পায়, তাহারা B দেশ হইতে 1 ইউনিট কাপড়ের কিছু বেশি পাইয়া 1 ইউনিট ধান রপ্তানি করিবে। অপরদিকে, B দেশের ব্যবসায়ীগণকে 1 ইউনিট ধান পাইতে হইলে নিজের দেশে $1\frac{1}{2}$ ইউনিট কাপড় দিতে হয়, তাহারা $1\frac{1}{2}$ ইউনিট কাপড়ের কিছু কম বিদেশে রপ্তানি করিয়া 1 ইউনিট ধান আমদানি করিবে। সুতরাং A দেশের উৎপাদকগণ ধানের রপ্তানিতে ও কাপড়ের আমদানিতে আত্মনিয়োগ করিবে; অপরপক্ষে B দেশের উৎপাদকগণ কাপড়ের রপ্তানি ও ধানের আমদানি করিতে থাকিবে। ধরা যাউক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্বরু হইবার পরে উভয় দ্রব্যের বিনিময়ের অনুপাত হইয়াছে 1 ইউনিট ধান $=1\frac{1}{4}$ ইউনিট কাপড়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে A দেশ প্রতি ইউনিট ধান রপ্তানি করিয়া $\frac{1}{4}$ ইউনিট লাভ (gain) করিতেছে; B দেশেও প্রতি 1 ইউনিট ধানের আমদানিতে $\frac{1}{4}$ ইউনিট কাপ লাভ (gain) হইতেছে। উভয় দেশেই উপাদান-সমূহের নিযোগে পুনর্বিন্যাস হইতেছে, A দেশেব উৎপাদকগণ কাপড়ের উৎপাদন হইতে উপাদানসমূহ অপসারণ করিযা উহাদের ধানের উৎপাদনে নিযোগ করিতেছে; B দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদন হইতে উপাদানসমূহ অপসারণ করিয়া উহাদেব কাপড়ের উৎপাদনে নিযোগ করিতেছে। উভয়ের স্বাভাবিক সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদন হওযায় এবং আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হওয়ায় উভয় দেশের শ্রমিক-দক্ষতা ও উভয় দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ফলে, উভয দেশের জনসাধারণের আযস্তব ও জীবনযাত্রাব মান উন্নত হইতেছে।*

* "The theorem can be expressed algebraically. Let us call the labour-cost of good A in the country I a_1 and in country II a_2, and the labour cost of good B in country I b_1 and in country II b_2. Then there is an absolute difference in costs if $\frac{a_1}{a_2} < 1 < \frac{b_1}{b_2}$. Country I has an absolute advantage over country II in A, and country II has an absolute advantage over country I in B. Here is a comparative difference in costs if $\frac{a_1}{a_2} < \frac{b_1}{b_2} < 1$. This means that country I has absolute superiority over country II in both goods but that its superiority is greater in A than B." Haberler, *International Trade*, P. 129.

সমালোচনা :—অনেকে বলেন যে এই তত্ত্ব আলোচনার সময় এমন সব বিষয় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে (Assumptions) যাহাদের কোন সত্যতা নাই। কিন্তু যদি স্বীকার্য বিষয়সমূহ একে একে অপসারণ করা যায়, তাহা হইলেও তুলনামূলকব্যয়ের নীতি বা এই নিয়ম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ ব্যাখ্যার পক্ষে সঠিক বিশ্লেষণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। (১) দ্রব্যের বা দেশের সংখ্যা বাড়াইলেও ইহা লক্ষ্য করা যায় যে কোন দেশের মধ্যে যে সকল দ্রব্যসমূহের ব্যয় তুলনামূলকভাবে অন্য দেশগুলির ব্যয় হইতে কম, সেগুলি রপ্তানি হয়, এবং যে সকল দেশের ব্যয়ের তুলনায় কম সেই সকল দেশেই উহাদের রপ্তানি হইয়া থাকে। (২) শ্রমশক্তির হিসাবে উৎপাদন-ব্যয় হিসাব না করিয়া টাকার হিসাবে দ্রব্যের প্রান্তিক ও গড় ব্যয়ের হিসাব করিলেও তুলনামূলক ব্যয়ের নীতির মূলকেন্দ্র সঠিক বলিয়া ধরা যায়। কারণ, টাকার সাহায্যে হিসাব করিলেও ইহা ভুল নয় যে, যে সকল দ্রব্যসামগ্রী অধিক ব্যয়ে নিজের দেশে উৎপন্ন করিতে হয় আমরা তাহা বিদেশ হইতে আমদানি করার চেষ্টা করি এবং উহার বিনিময়ে আমাদের দেশ হইতে সেই দ্রব্যই রপ্তানি করি যেগুলির উৎপাদন-ব্যয় কম। দেশের পক্ষে এই নীতি যে লাভজনক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। (৩) ক্লাসিকাল তত্ত্ব ধরিয়া লইতেছে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্বরু হইবার পরেও দেশে উপাদান-নিয়োগে পুনর্বিন্যাস সমান থাকে, এবং কোন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাসের দরুণ ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয়ে কোনও রূপ পরিবর্তন হয় না। বাস্তব জীবনে কিন্তু ইহা সত্য নয়, উৎপাদন ব্যয় বাড়িতে পারে বা কমিতেও পারে। কিন্তু তাহাতেও নীতি হিসাবে তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয় না। উভয় দ্রব্যেরই উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকিলে অবশ্য এমন এক সময় আসিবে যখন ব্যয়-পার্থক্য বিলুপ্ত হইবে, বাণিজ্যে লাভ না থাকায় উভয় দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানিই বন্ধ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ সেই সময়ে তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য না থাকায় বাণিজ্য চলিবে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বহুদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য চলে, কাহারও উৎপাদন-ব্যয় বাড়ে বা কাহারও কমে, উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ হইয়া গেলে উৎপাদন আর বাড়ান যায় না, উৎপাদন-ব্যয়েও বিশেষ পরিবর্তন আসে না, সুতরাং এক দেশের সহিত অন্য দেশের বাণিজ্য সর্বদাই চলিতে পারে এবং তুলনামূলক ব্যয়-

সমালোচনা ও তাহার উত্তর

প্রতিদানের নিয়ম ও তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের নীতি

পার্থক্যই তাহার কারণ। উৎপাদন-ব্যয়ে হ্রাস বৃদ্ধি ব্যয়-পার্থক্যের পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ বাড়ায় বা কমায়। (৪) বলা হয় যে, ক্লাসিকাল তত্ত্ব পরিবহন-ব্যয়ের হিসাব করে না, সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ বাস্তব অবস্থাবিচ্যুত ধারণা। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, আলোচনার সুবিধার জন্যই পরিবহন-ব্যয়ের হিসাব এই তত্ত্বের মধ্যে নাই। পরিবহন-ব্যয় ধরিয়া লইলে এই নীতিকে এইরূপ বলা যায় যে, দ্রব্যের পরিবহন-ব্যয় হইতে উভয় দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যটুকু অধিক হইলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব। অবশ্য পরিবহন-ব্যয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও উহা হইতে লাভের আয়তন কমাইয়া দেয়, ইহা অবশ্যই বলা চলে।

পরিবহন ব্যয় ও তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের নীতি

এই তত্ত্বের কয়েকটি দিক (Certain aspects of this doctrine)

(ক) প্রতিদানের নিয়ম ও তুলনামূলক ব্যয়ের তত্ত্ব (**Laws of Returns and the doctrine of comparative costs**):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা সমহার প্রতিদানের নিয়ম ধরিয়া লইয়া এই তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। উপরের উদাহরণে আমরা দেখিয়াছি যে, A দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদনে সকল উপকরণ নিয়োগ করিতে থাকিবে এবং কাপড়ের উৎপাদন হইতে উপকরণ সরাইয়া আনিতে থাকিবে। অপরপক্ষে, B দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদন হইতে উপকরণ সরাইয়া কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করিতে থাকিবে। তাহাদের উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ে কোন দেশে কোনরূপ পরিবর্তন আসে না, অর্থাৎ সমব্যয়ের নীতি কার্যকরী হইতে থাকিবে। এইরূপ ঘটিলে ব্যয়ের অনুপাতে প্রথমে যে পার্থক্য ছিল, অর্থাৎ যে পার্থক্যের দরুণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হইতে পারিয়াছিল, সেই পার্থক্য অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে। A দেশ ধানের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াইলে এবং কাপড়ের উৎপাদন ক্রমাগত কমাইলে ব্যয়ের অনুপাতে কোন পার্থক্য আসে না, B-র ক্ষেত্রেও সেইরূপ। উভয় দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার চলিতেই থাকিবে, কারণ ব্যয়পার্থক্য কখনই মিলাইয়া যাইতেছে না।

সমহার প্রতিদানের নিয়ম ও এই তত্ত্ব

কিন্তু এইরূপ অবস্থা ধরিয়া লওয়া চলে না, ইহা অতি অবাস্তব ব্যাপার।

সাধারণভাবে আমরা মনে করিতে পারি যে, দ্রব্যের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াইলে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Diminishing Returns) দেখা দেয়। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ক্রমাগত A দেশে ধানের প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে ও কাপড়ের প্রান্তিক ব্যয় কমিবে; আবার B দেশে কাপড়ের প্রান্তিক ব্যয় বাড়িবে ও ধানের প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পাইবে। কিছুদিন পরে দেখা যাইবে উভয় দেশেই উভয় দ্রব্যের ব্যয়-পার্থক্যের অনুপাত সংকুচিত হইয়া আসিয়াছে, ক্রমে এই পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। A দেশে ধানের উৎপাদন ব্যয় বাড়িতেছে, কিছুদিন পরে A দেখিবে আর ধান রপ্তানিতে লাভ (gain) নাই, এদিকে নিজের দেশে কাপড়ের ব্যয় কমিয়াছে, B হইতে আর কাপড় আমদানি না করিয়া (B-তে ব্যয় বাড়িয়াছে) নিজের দেশে কিছু কাপড় উৎপাদন করা-ই সুবিধাজনক। ঠিক এইরূপ, B দেশে ধান উৎপাদন কমাইয়া দেওয়ায় উহার উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে, কাপড়ের উৎপাদনব্যয় বাড়িয়াছে, A-র সহিত তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য কমিয়া আসিয়াছে। যতদিন না উভয় দেশে উভয় দ্রব্যের ব্যয় পার্থক্যের অনুপাত সমান হয়, ততদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিতে থাকিবে। কিন্তু উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধির নিয়ম কার্যকরী হওয়ায় বিশেষায়ণ সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না, দুইটি দ্রব্যই দুই দেশে কিছুটা পরিমাণে অন্তত উৎপন্ন হইতে থাকিবে।*

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম ও এই তত্ত্ব

কখন বিশেষায়ণ সম্পূর্ণ হয় না

ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইলে, অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় কমিতে থাকিলে বিষয়টি একটু জটিল হইয়া পড়ে। অনেকে আছেন, যাঁহারা ক্রমবর্ধমান প্রতিদান ঘটিতেই পারে না বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া চলে না। কোন কোন ক্ষেত্রে, সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হইলেও এই নিয়ম কার্যকরী হয় বলিয়া দেখা যায়, এবং সেই সকল ক্ষেত্রের আলোচনাও আমরা একেবারে বাদ দিতে পারি না। গ্রাহাম (Graham)

* আরও দুইটি কারণে বিশেষায়ণ সম্পূর্ণ না হইতে পারে। (ক) যদি ধান বা কাপড়ের মধ্যে কিছু অংশ বিশেষ গুণসম্পন্ন বা অত্যন্ত ভাল ধরনের হয়, তবে বেশি ব্যয় ও দাম থাকিলেও বাহিরের বাজারে উহা কিছুটা বিক্রয় হইতে পারে, তাই দেশের মধ্যে উহার উৎপাদন চলিতে থাকিতে পারে। (খ) শুল্ক বা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে রাষ্ট্র তেমন দ্রব্যের উৎপাদন চালাইতে পারে যাহা সাধারণ অবস্থায় এই নীতি অনুযায়ী উৎপন্ন হইত না। শিশুশিল্প বা জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্পের ক্ষেত্রে এইরূপ দেখা যায়।

বলিয়াছেন যে, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইলে ক্লাসিকাল এই তত্ত্ব অর্থাৎ তুলনামূলক ব্যয়ের এই নীতি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়—ইহা আর মানিয়া লওয়া চলে না। তিনি গণিতের একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, দুইটি দেশের মধ্যে তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি অনুযায়ী বাণিজ্য সুরু হইলে উহার মধ্যে একটি দেশকে হয়তো এমন শিল্পের উৎপাদন ছাড়িয়া দিতে হইল যেখানে ক্রমবর্ধমান প্রতিদান কার্যকরী হইতেছিল এবং উপকরণগুলিকে এমন শিল্পে লইয়া আসিতে হইল যেখানে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান ঘটিবে। তাঁহার মতে, কৃষিপ্রধান দেশগুলিরই এই অবস্থা। যেমন, ভারত যদি তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি সম্পূর্ণ মানিয়া চলে, তবে হয়তো তাহাকে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান-শীল চা-শিল্পের প্রসার ঘটাইতে হইবে কিন্তু ক্রমবর্ধমান প্রতিদানশীল কোন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন কমাইতে হইবে। শিল্পপ্রধান দেশগুলির অবস্থা এই বিষয়ে খুবই সুবিধাজনক—যে সকল শিল্পে ব্যয় হ্রাস পায়, তাহারা সেই শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা বা প্রসার করিতে থাকিবে।

ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম ও এই তত্ত্ব

গ্রাহামের এই বক্তব্য আমরা মানিয়া লইতে পারি না। দীর্ঘকালে কোন শিল্পে ক্রমবর্ধমান প্রতিদান চলিতে পারে না; কিছুকাল পরেই অবশ্যম্ভাবী নিয়ম অনুসারে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান সুরু হয়। এই নিয়মের কার্যকারিতা ধরিয়া লইলেও আমরা জানি যে, সেই অবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হয় এবং একচেটিয়া দেখা দেয়। কোন শিল্পে একচেটিয়া দেখা দিলে উহা নিশ্চয়ই উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করিবে এবং দাম বাড়াইয়া রাখিবে, ও সেই দামে চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিতে থাকিবে।

কিন্তু আমরা পূর্ণ প্রতিযোগিতা ধরিয়া লইতে পারি না

একটি কথা মনে রাখা দরকার। যদি ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাইতেছে এইরূপ কোন শিল্প অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের অধীন কোন শিল্প বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়া পড়ে, প্রতিযোগিতায় হটিয়া গিয়া উৎপাদন কমাইতে বাধ্য হয় ও ফলে উহার ব্যয় বাড়ে, তখন তাহাকে সাময়িকভাবে সংরক্ষণী শুল্ক দিয়া রক্ষা করা দরকার। এইরূপ শুল্কের সাহায্যে উহাকে বাঁচাইয়া প্রসারের

বাহ্য ব্যয়সংকোচ ও শুল্ক

সুযোগ দিলে নিশ্চয় সে বাহ্য ব্যয়সংকোচের সুবিধা কিছুটা লাভ করিতে পারিবে।*

আন্তর্জাতিক মূল্যের তত্ত্ব : বাণিজ্য হার (Theory of International values : The terms of trade) :

আন্তর্জাতিক মূল্যতত্ত্ব ও বাণিজ্যহার (Terms of trade) সম্পর্কীয় আলোচনা করেন জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল এবং তাহার এই আলোচনাকে ক্লাসিকাল তুলনামূলক ব্যয় তত্ত্বের উপসিদ্ধান্ত (Corollary) হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বাণিজ্যহার কাহাকে বলে

উভয় দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে তুলনামূলক পার্থক্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি। যে দেশ যে দ্রব্য অন্য দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিবে, সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদনে সকল উপাদান নিয়োগ করিবে এবং উৎপন্ন দ্রব্য অন্য দেশে রপ্তানি করিবে : নিজের দেশে অন্য দেশের তুলনায় যে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বেশি তাহা সে আমদানি করিবে। রপ্তানি দ্রব্যের বিনিময়ে যে হারে সে আমদানি পাইবে, অর্থাৎ রপ্তানি ও আমদানির বিনিময়ের অনুপাতই হইল বাণিজ্য-হার। তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের মধ্যে যে কোন বিন্দুতে বাণিজ্যহার নির্ধারিত হইতে পারে। যেমন, A দেশে ধান ও কাপড়ের ব্যয়ের অনুপাত হইল 1 ধান : 1 কাপড়, B দেশে উহাদের ব্যয়ের অনুপাত হইল 1 ধান : $1\frac{1}{2}$ কাপড়। 1 ইউনিট ধান রপ্তানি করিয়া কি পরিমাণ কাপড় আমদানি করা হইল (যেমন, $1\frac{1}{12}$, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{3}$ ইত্যাদি) রপ্তানি ও আমদানির এই অনুপাতকেই বাণিজ্য-হার বলা হয়। এই বাণিজ্যহার হইতেই অন্য দেশের দ্রব্যের হিসাবে নিজের দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বিনিময়-মূল্য বোঝা যায়।

* "It follows that decreasing costs due to internal economies are consistent, in the long run, with free competition. This important fact removes the foundations of Graham's argument, for his theory rests upon the assumption of free competion...It may happen that an industry is already benefiting from external economies, and could obtain increased benefit by a further expansion which is impeded by competition...The vicious circle described by Graham makes its appearance. But the industry could survive, and could obtain further benefits from external economies by expanding, if it were temporarily potected by a tariff." Haberler, *International Trade*, P. 204-207.

দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্য বা বাণিজ্য-হার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদার শক্তির উপর। A-এর দ্রব্যের জন্য B-এর চাহিদা যদি B-এর দ্রব্যের জন্য A-এর চাহিদা হইতে অধিক শক্তিশালী হয় তাহা হইলে বাণিজ্যহার B-এর প্রতিকূলে যাইবে (রপ্তানি বিনিময়ে B দেশ আমদানির পরিমাণ কম পাইবে); এবং A-এর অনুকূলে আসিবে (রপ্তানির বিনিময়ে A দেশ আমদানির পরিমাণ বেশি পাইবে। আবার A-এর দ্রব্যের জন্য B-এর চাহিদা যদি B-এর দ্রব্যের জন্য A-এর চাহিদা হইতে কম শক্তিশালী হয় তাহা হইলে বাণিজ্যহার B-এর অনুকূলে আসিবে এবং A-এর অনুকূলে যাইবে। অন্যের দ্রব্যের জন্য নিজের দেশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং নিজের দ্রব্যের জন্য অন্য দেশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—এই দুই বিষয়ের উপর বাণিজ্য-হার নির্ভর করে। বাণিজ্য-হার A-এর প্রতিকূলে আসিলে সে 1 ইউনিট ধানের বদলে, ধরা যাউক, $1\frac{1}{8}$ ইউনিট কাপড় পাইবে; বাণিজ্যহার A-এর প্রতিকূলে আসিলে সে 1 ইউনিট ধানের বদলে, ধরা যাউক, $1\frac{1}{12}$ ইউনিট কাপড় পাইবে।

বাণিজ্যহার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদার উপর

বাণিজ্য-হারকে নিম্নলিখিত সমীকরণের আকারে প্রকাশ করা যায়:

$$\text{বাণিজ্য-হার} = \frac{\text{আমদানির মূল্য}}{\text{রপ্তানির মূল্য}}$$

$$= \frac{\text{আমদানির দাম} \times \text{আমদানির পরিমাণ}}{\text{রপ্তানির দাম} \times \text{রপ্তানির পরিমাণ}}\,।$$

আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ সমান থাকিলে,

$$\text{বাণিজ্য হার} = \frac{\text{আমদানির দাম}}{\text{রপ্তানির দাম}}\,।$$

সুতরাং বাণিজ্যহার জানিতে হইলে রপ্তানি দ্রব্যের দাম ও আমদানি দ্রব্যের দাম তুলনা করা দরকার হয়। ইহা কিরূপে করা যায়? কাছাকাছি কোন একটি বৎসরকে মূল বৎসর ধরিয়া লইয়া রপ্তানি-দামের সূচক ও আমদানি-দামের সূচক তৈয়ার করিতে হয় (**Index of export prices and Import prices**)। ইহার পরে এই দুইটিতে প্রতি বৎসর কতখানি পরিবর্তন আসিয়াছে তাহার হিসাব করিয়া (আমদানি দামের সূচক ÷ রপ্তানি-দামের সূচক) একটি তৃতীয়

বাণিজ্যহারের সূচক গঠন করে কিরূপে

সূচক সংখ্যা গঠন করা হইল। এই তৃতীয় সূচক সংখ্যাটির সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, আমদানির দামস্তরের তুলনায় রপ্তানির দামস্তরে কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে। ইহাকেই বলে বাণিজ্যহারের সূচক (**Index number of the Terms of the Trade**)।

কোন একটি দেশের দিক হইতে দেখিতে গেলে বাণিজ্যহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাণিজ্যহারের কোন বিরূপ পরিবর্তন বাণিজ্য হইতে সেই দেশের লাভ (**gains from trade**) কমাইয়া দেয়, ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। যেমন, মনে কর, পৃথিবীর বাজারে যদি চা-এর চাহিদা হ্রাস পায় ও দাম কমে, তবে ভারতের দিক হইতে দেখিতে গেলে, পূর্বের পরিমাণ আমদানি আনিতে হইলে বেশি পরিমাণে চা পাঠাইতে হইবে। চা-এর উৎপাদকের আয় হ্রাস পাইবে, এই শিল্পে মজুরি ও মাহিনার হার কমিয়া আসিবে, ফলে অন্যান্য শিল্পের আয়ও কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে, বাণিজ্যহার ভারতের অনুকূল হইলে আয় ও কর্মসংস্থান স্তর উপরে উঠিবে। বেনহামের ভাষায় বলিতে গেলে "**The real income per head of a country depends mainly on its output per head and partly on its terms of trade.**"

বাণিজ্যহারের গুরুত্ব, জাতীয় আয়ের উপর প্রভাব

কয়েকজন ধনবিজ্ঞানীদের মতে (যেমন, **Graham**) আন্তর্জাতিক মূল্য সম্পর্কীয় এই ক্লাসিকাল তত্ত্ব কেবলমাত্র প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন দেশসমূহের পারস্পরিক বাণিজ্যহারের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে। বৃহৎ দেশে এবং ক্ষুদ্র দেশের মধ্যে বাণিজ্যহার পারস্পরিক চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, কারণ ক্ষুদ্র দেশের মোট উৎপাদন বৃহৎ দেশের চাহিদার অতি অল্প অংশ অথবা ক্ষুদ্র দেশের মোট চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই বৃহৎ দেশ উৎপাদন চালাইয়া যাইতে পারে।

সমালোচনা

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ (The gains from Foreign Trade):

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে পৃথিবীর সকল দেশ সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, এবং সকল দেশই রপ্তানি দ্বারা অপর দেশ হইতে কম দামে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করে। নিজের দেশে

উৎপাদন করিতে হইলে যে ব্যয় করিতে হইত এবং ফলে যে দাম দিতে হইত, তাহা অপেক্ষা অনেক কম দামে সে দ্রব্যসামগ্রী পাইতে পারে। সুতরাং ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইবে, সকল দেশের মোট লাভ তত বাড়িবে। পরিবহন-ব্যয় ও বাণিজ্য-শুল্ক হ্রাসের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণও বাড়িবে।*

মোট লাভ নির্ভর করে: বাণিজ্যের মোট পরিমাণের উপর

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে প্রত্যেকটি দেশ স্বতন্ত্রভাবে কিরূপ লাভ করে, অর্থাৎ মোট লাভ কিরূপে বাণিজ্যকারী দেশগুলির মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়? কোন্ দেশ কি পরিমাণ লাভ করিতে পারিবে তাহা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

প্রথমত, ইহা নির্ভর করে দুই দেশের দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয়ের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্যের পরিমাণের উপর। যদি দুইটি দেশের তুলনামূলক ব্যয়ের অনুপাতে অধিক পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেকেরই লাভের পরিমাণ বেশি হইবার সম্ভাবনা; উৎপাদন-ব্যয় সমূহের মধ্যে পার্থক্য যত বেশি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভও তত অধিক। উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাতে এই পার্থক্য নির্ভর করে প্রধানত উভয় দেশে শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদনক্ষমতা ও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণের উপর। আমাদের আমদানি দ্রব্যগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত বিদেশী শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে আমাদের লাভ অধিক হইতে থাকিবে (কারণ আমরা একই পরিমাণ রপ্তানি করিয়া বিদেশী দ্রব্য বেশি পরিমাণে আমদানি করিতে পারিব); আমাদের রপ্তানি দ্রব্যগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত দেশীয় শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে বিদেশ অধিকতর লাভ করিতে পারিবে (কারণ বিদেশ হইতে একই আমদানির বিনিময়ে আমরা অধিকতর দ্রব্য রপ্তানি করিব)।

উৎপাদন ব্যয়ে তুলনা-মূলক পার্থক্যের পরিমাণের উপর

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ নির্ভর করে বাণিজ্য-হারের উপর। যে হারে এক দেশ নিজের রপ্তানি দ্রব্যের পরিবর্তে বিদেশ হইতে

* মনে রাখা দরকার যে, জার্মানীর ঐতিহাসিক মতবাদ এই তত্ত্বের বিরোধিতা করিতেন। তাঁহাদের মতে বর্তমানে অবাধ বাণিজ্যের দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি অপেক্ষা বর্তমানে বাণিজ্য শুল্কের দ্বারা দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইয়া তোলা দেশের পক্ষে অধিকতর লাভজনক হইতে পারে।

আমদানি দ্রব্য পায়, তাহাকে বাণিজ্যহার বলা হয়। নিজের দেশের কম দ্রব্যের বিনিময়ে অপর দেশের কত অধিক দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাই লাভের নির্ধারক।

বাণিজ্যহারের উপর

এই বাণিজ্যহার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদার উপর। নিজের দ্রব্যের জন্য অপর দেশের চাহিদার তুলনায় অপর দেশের দ্রব্যের জন্য নিজের চাহিদা অধিকতর শক্তিশালী হইলে বাণিজ্যহার সেই দেশের প্রতিকূলে যাইবে এবং অপর দেশের অনুকূলে আসিবে। সুতরাং এই পারস্পরিক চাহিদা নির্ভর করে আমদান ও রপ্তানির পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার উপর। যে দেশের রপ্তানির জন্য বৈদেশিক চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইবে (অর্থাৎ দাম বাড়িলেও চাহিদা বেশি কমিবে না, মোট রেভিনিউ বৃদ্ধি পাইবে) এবং ইহারই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী আমদানির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবে (অর্থাৎ দাম বাড়িলে চাহিদা অধিক কমিয়া যাইবে, মোট রেভিনিউ হ্রাস পাইবে), সেই দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে বেশি লাভ করিতে পারিবে, কারণ বাণিজ্যহার তাহারই অনুকূলে আসিবে।

টাকা হিসাবে বাণিজ্যহারকে অনেক সময় আমদানি-দাম ও রপ্তানি-দামের অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হয় (**Ratio of Import Prices and Export Prices**)। রপ্তানি-দামের তুলনায় যদি আমদানি-দাম কমিয়া যায় তবে বাণিজ্যহার অনুকূলে আসিবে, লাভও অধিক হইবে।

দেশের আয়তনের উপর

তৃতীয়ত, অন্যান্য দেশের তুলনায় একটি দেশের আয়তন যত ছোট হইবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে তাহার লাভ তত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ, বিদেশী দ্রব্যের জন্য তাহার চাহিদা খুবই কম এবং ফলে বিদেশী দ্রব্যের দামও তাহার চাহিদার দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হয় না। কিন্তু তাহার রপ্তানি-দ্রব্যের জন্য বিদেশী বৃহৎ রাষ্ট্রের চাহিদার পরিমাণ বেশি এবং ফলে সে অধিক দামে ঐ দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা পাইতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের এই তত্ত্ব ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা রচিত, প্রধানত রিকার্ডো ও মিল এই তত্ত্বের কাঠামো গঠন করিয়া গিয়াছিলেন। অধ্যাপক হাবারলার এই তত্ত্বের দুইটি ত্রুটির কথা উল্লেখ

করিয়াছেন এবং তাহা দূর করিবার জন্ম উৎপাদন সম্ভাবনার রেখার (production substitution curve) সাহায্য লইয়াছেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণের সাহায্যে দুইটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ সম্মিলন উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইতেই এই উৎপাদন সম্ভাবনার বা রূপান্তরণের রেখা (Transformation Curve) জানা যায়। এই পদ্ধতিতে, তাঁহার মতে, শ্রম-ব্যয়ের তত্ত্ব বাদ দেওয়া চলে, এবং একই সঙ্গে বহু বিভিন্ন সংখ্যক উৎপাদনের উপাদান দেখান চলে। এই বিকল্পতত্ত্ব একটু পরেই বিশদভাবে আলোচিত হইতেছে।

হাবারলারের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে মার্শাল ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বের সাহায্য লইয়াছেন। তাঁহার মতে দেশের ক্রেতাগণ কোন দ্রব্যের জন্য যে পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তুত আছেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দরুণ বিদেশ হইতে উহা অপেক্ষা কম দামে তাঁহারা জিনিসটি পাইবেন; চাহিদার দর ও বাজার-দরের পার্থক্যই ভোগোদ্বৃত্তরূপে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে একটি দেশের লাভের পরিমাপ।

লাভের পরিমাপ: (১) ভোগোদ্বৃত্তের দ্বারা

টাউসিগ্ বলিয়াছেন, একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পায় দেশের মধ্যে বর্ধিত মজুরির হারের স্তরের ও আয়স্তরের মাধ্যমে এবং ইহাদের দ্বারাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করা যায়। যে দেশ অধিক পরিমাণে রপ্তানি করিতেছে, সেই দেশের রপ্তানি-দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পে মজুরের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে। এবং মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ায় মজুরির হার বৃদ্ধি পাইবে। রপ্তানি-শিল্পে বর্ধিত মজুরির হার (প্রতিযোগিতার দরুণ) দেশের অন্যান্ত শিল্পে মজুরির হার বাড়াইয়া দিবে, ফলে দেশে সাধারণ আয়স্তর বৃদ্ধি পাইবে।

(২) মজুরি ও আয়-স্তরের দ্বারা

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ গুণক তত্ত্বের (Concept of Multiplier) সাহায্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করেন। রপ্তানি-বৃদ্ধির ফল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলের স্থায়, ইহার ফলে দেশে নূতন আয় সৃষ্টি হয়, ভোগ্যদ্রব্যের ও মূলধনী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দেশে আরও বেশি পরিমাণ কর্মসংস্থান, নূতন আয়, নূতন বিনিয়োগের ধারা প্রসারিত হইতে

থাকে। কিন্তু নূতন আয় সৃষ্টি বা আয়স্তরে বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা (Marginal propensity of Import) বাড়িয়া যায়, আমদানির পরিমাণও বৃদ্ধি হয়। এই আমদানির পরিমাণে বৃদ্ধি অপর দেশের আয়স্তরে বৃদ্ধি ঘটাইলে তাহাদের আমদানি বাড়িতে পারে এবং ফলে প্রথম দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি হইতে পারে। আমদানি-প্রবণতার বৃদ্ধি ছিদ্ররূপে (leakage) কাজ করে এবং গুণকের পরিমাণ কমাইয়া দেয়, দেশের আয়স্তর ও কর্মসংস্থানে পূর্ণমাত্রায় প্রসার ঘটিতে দেয় না। কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাবের ফলে জাতীয় আয়ের হ্রাস বা বৃদ্ধি পরিমাপ করা যায় বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের সাহায্যে (Foreign Trade Multiplier)।

(৩) বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের দ্বারা

বিকল্প বিশ্লেষণ পদ্ধতি (An Alternative method of analysis):

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে ক্লাসিকাল তত্ত্ব প্রধানত রিকার্ডোর হাতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। শ্রমশক্তিকে একমাত্র ব্যয় হিসাবে গণ্য করিয়া উহার ভিত্তিতে তিনি এই তত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন। মিল্ এই তত্ত্বকে অগ্রসর করাইয়াছিলেন পারস্পরিক চাহিদার নীতির (Doctrine of Reciprocal demand) সাহায্যে। তাঁহাদের সম্মুখে প্রধান প্রশ্ন ছিল: (১) একটি দেশ কোন্ দ্রব্যগুলিকে ক্রয় করিবে এবং কোন্গুলিকে বিক্রয় করিবে? (২) কি হারে এই বিনিময় চলিতে থাকিবে, অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে বাণিজ্য হার কি হইবে? এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থিত করা চলে, তাহা হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ কতটা হয় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই মোট লাভ কিরূপে বন্টিত হইয়া যায়? ইহাদের সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

রিকার্ডো ও মিল

অধ্যাপক হাবারলার (Haberler) প্রমুখ ধনবিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বকে আর এক স্তর আগাইয়া দিয়াছেন। তিনি এক ধরনের উৎপাদন-পরিবর্তনতার রেখা (production substitution curve) প্রয়োগ করিয়াছেন। দেশে উৎপাদনের উপাদান স্থির ধরিয়া লইয়া উহাদের সাহায্যে দুইটি দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সম্মিলন কি ভাবে উৎপাদন করা যায়—তাহা দেখান এই রেখার উদ্দেশ্য। এই

হাবারলারের উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা

রেখাটিকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে ইহার যে কোন বিন্দুর ঢাল (slope) উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ের অনুপাতের সমান। অধ্যাপক হাবারলার দেখাইয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করিতে না পারিলেও, ইহা কিরূপে সৃষ্টি হইতেছে তাহা এই উৎপাদনপরিবর্ততার রেখার সাহায্যে দেখান যায়। পরবর্তীকালে অধ্যাপক লিয়নটিয়েফ্ (Leontieff) এই উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখার সহিত নিরপেক্ষ রেখা পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া এই তত্ত্বকে আরও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

এই উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা বা রূপান্তরণ রেখা (Transformation curve) কাহাকে বলে ? প্রথমে একটি তালিকার (schedule) রূপে আমরা ইহা আলোচনা করিতে পারি। মনে কর, কোন দেশে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ যেমন, শ্রম বা মূলধন আছে : ইহার সাহায্যে হয় ধান অথবা কাপড় অথবা উভয়ের দ্রব্যেরই কিছু পরিমাণ উৎপাদন করা চলে। সেই উপকরণগুলিকে সম্পূর্ণ ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে অনেকখানি ধান পাওয়া যায়, আবার উহাদের (যন্ত্রের সাহায্য লইয়া) সম্পূর্ণ কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে অনেকটা কাপড় তৈয়ার হইতে পারে। অথবা সেই উপকরণগুলির সাহায্যে দুইটি দ্রব্যই কিছু পরিমাণে উৎপাদন করা যায়। ইহাদের কোন একটি দ্রব্যকে অপর দ্রব্যটিতে রূপান্তরিত করা চলে শারীরিকভাবে নয়। একের উৎপাদন হইতে উপকরণ অপসারণ করিয়া অপরের উৎপাদনে নিয়োগ করা সম্ভব, অর্থাৎ একটির উৎপাদন কমাইয়া অপরটির উৎপাদন বাড়ান চলে। যেমন ধরা যাউক, ভারতবর্ষে ধানকে সর্বদা কাপড়ে রূপান্তরিত করা যায় 10 : 3 এই নির্দিষ্ট অনুপাতে। ইহার অর্থ হইল 10 ইউনিট ধান ছাড়িয়া দিলে তবেই 3 ইউনিট কাপড় তৈয়ার করা চলে। আমরা আরও ধরিয়া লইতেছি যে, সকল উপকরণ ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে 100 ইউনিট ধান এবং 0 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে (অর্থাৎ ইহাদের রূপান্তরণের অনুপাত 10 : 3 হইলে) ভারতে 90 ধান : 3 কাপড়, 80 ধান : 6 কাপড়, 0 ধান : 30 কাপড়—প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাই উৎপাদন-সম্ভাবনার বা রূপান্তরণের তালিকা, নিচে ইহা দেখান হইয়াছে।

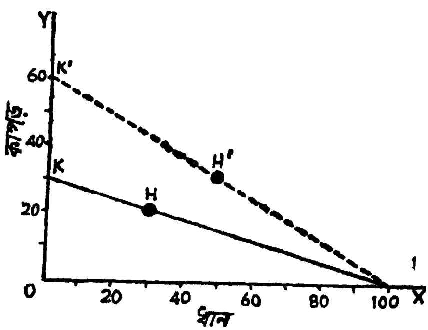
রূপান্তরণ রেখা কাহাকে বলে

* এই তালিকা, রেখাচিত্র Samuelson-এর Economics গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু ছাত্রেরা Haberler-এর International Trade-এর Chapter XII, এবং Kindelberger-এর International Economics-এর Chapter V-ও দেখিতে পারেন।

সম্ভাবনা	ধান	কাপড়
A	100	0
B	90	3
C	80	6
D	70	9
E	60	12
F	50	15
G	40	18
H	**30**	**21**
I	20	24
J	10	27
K	0	30

[illegible]

বা রূপান্তরণের রেখা পাইতে পারি। নিচের চিত্রে, X অক্ষে ধান উৎপাদনের



পরিমাণ এবং Y অক্ষে কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ আমরা পরিমাপ করিতে পারি। AK হইল উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা। ধান ও কাপড়ের ব্যয়ের অনুপাত নির্দিষ্ট ধরা হইয়াছে বলিয়া ইহা সরলরেখার আকার লইয়াছে। (ক্রমহ্রাসমান বা ক্রমবর্ধমান ব্যয় ঘটিলে উহার আকৃতি ভিন্নরূপ হইবে, তাহা পরে আলোচিত হইবে)। আলোচনার সুবিধার জন্য উভয়ের ব্যয়ের অনুপাতে নির্দিষ্টতা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই রেখার মধ্যে ভারতবর্ষ ঠিক

কোন বিন্দুতে উৎপাদন করিতে থাকিবে? অর্থাৎ কত পরিমাণ ধান ও কত পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন করিবে? ধরা যাউক ভারত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার *H* বিন্দুতে উৎপাদন করে, 30 ইউনিট ধান এবং 21 ইউনিট কাপড়ের উৎপাদনে তাহার সকল উপকরণ নিয়োগ করে।*

এই অবস্থায় যদি কাপড়ের উৎপাদনে কোন নূতন যন্ত্রপাতির বা পদ্ধতির আবিষ্কার হয়, তবে উহার ফলাফল কি হইবে? মনে কর, যে উপকরণে 10 ইউনিট ধান হয় তাহাতে 3 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন না হইয়া এখন 6 ইউনিট কাপড় তৈয়ার হইতে পারে, তবে উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা উপরে উঠিয়া যায়। উপরের চিত্রে AK′ রেখা দ্বারা ইহা দেখান হইতেছে। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতবর্ষ H বিন্দু হইতে H′ বিন্দুতে উঠিতে পারে, উহাতে দুইটি দ্রব্যই সে পরিমাণে বেশি পাইতেছে।

আবিষ্কারের ফল কি

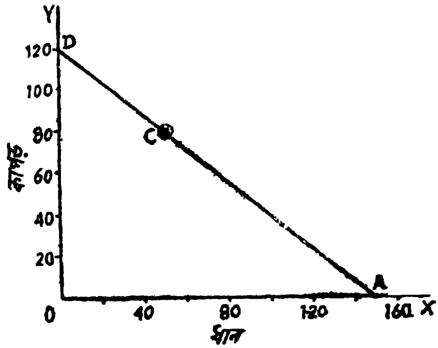
এতক্ষণ আমরা ভারতের কথা আলোচনা করিয়াছি, এখন ইংলণ্ডের কথা আলোচনা করা দরকার। ইংলণ্ডে শ্রমিক বেশি অথচ জমি কম, তাই সেই দেশে ধান ও কাপড়ের ব্যয় অনুপাত পৃথক। এদেশে তুলনামূলকভাবে ধানের উৎপাদন ব্যয় বেশি, কিন্তু কাপড়ের উৎপাদন ব্যয় কম। তাই, আমরা মনে করিতে পারি যে, ইংলণ্ডে প্রতি 10 ইউনিট ধান তৈয়ারীর উপকরণ দিয়া 8 ইউনিট কাপড় তৈয়ার করা যায়। ইহাই ইংলণ্ডের উৎপাদন-সম্ভাবনার বা রূপান্তরণের অনুপাত। ভারতের ন্যায় ইংলণ্ডেরও এইরূপ একটি রূপান্তরণের তালিকা আছে, যেমন:

সম্ভাবনা	ধান	কাপড়
A	150	0
B	100	40
C	50	80
D	0	120

10 : 8 নির্দিষ্ট অনুপাতের হারে ইংলণ্ডের এই উৎপাদন সম্ভাবনার তালিকা

* কেন ভারতবর্ষ ঠিক 30 ইউনিট ও 21 ইউনিট কাপড় উৎপাদন করিতেছে? এই প্রশ্ন এখানে আলোচ্য নয়। তবুও সংক্ষেপে বলিয়া রাখা দরকার। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পরিকল্পনা কমিশন; কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ইহা নির্ভর করে এই দ্রব্যগুলির যোগান, চাহিদা এবং দামের উপর। অনিয়ন্ত্রিত দাম-ব্যবস্থাই বিভিন্ন দ্রব্যোৎপাদনে দেশের উপকরণগুলির নিয়োগ-বিন্যাস নির্ধারণ করে।

বা রূপান্তরণের তালিকাকে আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। নিচে ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে এই রেখা দেখান হইয়াছে। এই চিত্র হইতে আমরা



আরও দেখিতে পাইতেছি যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হওয়ার পূর্বে ইংলণ্ড 50 ধান ও 80 কাপড় উৎপাদনে তাহার সকল উপকরণ নিয়োজিত রাখিয়াছে।

এই অবস্থায় মনে কর উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সুরু হইবে। কি হারে ধান ও কাপড় পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইতে পারে? ভারত রপ্তানি করিবে ধান এবং ইংলণ্ড রপ্তানি করিবে কাপড় ইহা বোঝা যাইতেছে। 10 : 3 ও 10 : 8-এর মধ্যে 10 : 5 ; 10 : 7 প্রভৃতির যে কোন একটি হার স্থির হইবে, ইহাও আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। যে হারে এই বিনিময় ঘটিবে তাহাই বাণিজ্যহার (**Terms of Trade**), বা দামের অনুপাত (**price ratio**)। একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, উভয় দেশের নির্দিষ্ট ব্যয়ানুপাতের বাহিরের দিকে (10 : 3 ও 10 : 8-এর বাহিরে) কোন বাণিজ্যহার থাকিতে পারে না। যেমন, 10 : 1 বা 10 : 12 এই দুইটি অনুপাত লইয়া দেখা যাউক। ভারত যদি নিজের দেশে ধান উৎপাদন না করিয়া সেই উপকরণ কাপড় উৎপাদনে নিয়োগ করে, তবে সে 3 ইউনিট কাপড় পায়, বিদেশ হইতে সে কেন ধানের বিনিময়ে 1 ইউনিট নিতে রাজি হইবে? শুধু তাহাই নহে। যদি 10 : 1 অনুপাত জোর করিয়া চাপান যায় তবে ভারত কেবল কাপড় উৎপাদনে উপকরণসমূহ নিয়োগ করিবে, ধানের উৎপাদন ছাড়িয়া দিবে। ইহার কারণ কি? ভারত নিজের দেশে 1 ইউনিট কাপড়ের বদলে 10/3 অর্থাৎ 3·33

বাণিজ্য সুরু হইবার সম্ভাবনা কোথায়

ইউনিট ধান উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু বাহির হইতে সে যদি 10 ইউনিট ধান পায় তবে কেন নিজের দেশে ধান উৎপাদন করিবে ?

এইবার ইংলণ্ডের দিকটি আলোচনা করা যাউক। যদি বিনিময়ের অনুপাত 10 : 1 রাখা হয়, তবে সে-ও কাপড় বিক্রয় করিয়া ধান কিনিতে চাহিবে। নিজের দেশে ইংলণ্ড এক ইউনিট কাপড়ের বিনিময়ে 10/8 অর্থাৎ 1·25 ইউনিট ধান পায়। বিনিময় করিলে 1 ইউনিটের বদলে সে 10 ইউনিট ধান পাইতে পারে। ভারত ও ইংলণ্ড উভয়েই যদি কাপড় বিক্রয় করিতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্যে ধানের উৎপাদন হইতে সকল উপকরণ সরাইয়া আনিয়া কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করে, তবে উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে না। এইরূপে আমরা দেখিতে পারি যে, উভয় দ্রব্যের বাণিজ্য-হার 10 : 8-এর উপরেও উঠিতে পারে না, যেমন 10 : 12 হয় না, কারণ তাহা হইলে উভয়েই কেবলমাত্র ধান উৎপাদন সুরু করিবে, কেহ কাপড় উৎপাদন করিবে না।

ব্যয় পার্থক্যে অনুপাতের গুরুত্ব

সুতরাং এইরূপে আমরা এই সিদ্ধান্তে নিশ্চয় পৌঁছিতে পারি যে 10 : 3 এবং 10 : 8 এই দুইটি চরম-সীমার মধ্যবর্তী কোন অনুপাতে যেমন 10 : 6 হারে উভয় দ্রব্যের বিনিময় হইতে থাকিবে। উভয় দেশই নিজ নিজ তুলনা-মূলক সুবিধা অনুযায়ী বাণিজ্য করিবে, ভারত ধান উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য লাভ করিবে এবং ইংলণ্ড কাপড় উৎপাদনে বিশেষত্ব লাভ করিবে। উভয় দেশই পূর্বাপেক্ষা উন্নততর জীবনযাত্রার মান লাভ করিবে। ভারত নিজেব দেশে 10 ইউনিট ধানকে 3 ইউনিট কাপড়ে রূপান্তরিত কবিতে পাবে, কিন্তু বাণিজ্যের ফলে সে একই পরিমাণ ধানকে 6 ইউনিট কাপড়ে রূপান্তরিত করিতেছে। ইংলণ্ড নিজের দেশে 8 ইউনিট কাপড়কে 10 ইউনিট ধানে রূপান্তরিত করিতে পারে ; কিন্তু বাণিজ্যের ফলে সে 6 ইউনিট কাপড়কেই 10 ইউনিট ধানে পরিণত করিতে পারিতেছে। উভয় দেশের উপকরণসমূহ তুলনামূলকভাবে দক্ষতর ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইতেছে। তাহাদের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। বাণিজ্যের ফলে তাই সম-পরিমাণ উপকরণের সাহায্যে উভয় দ্রব্যই বেশি পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে তাই পরোক্ষ উৎপাদন (indirect production) বলা চলে।

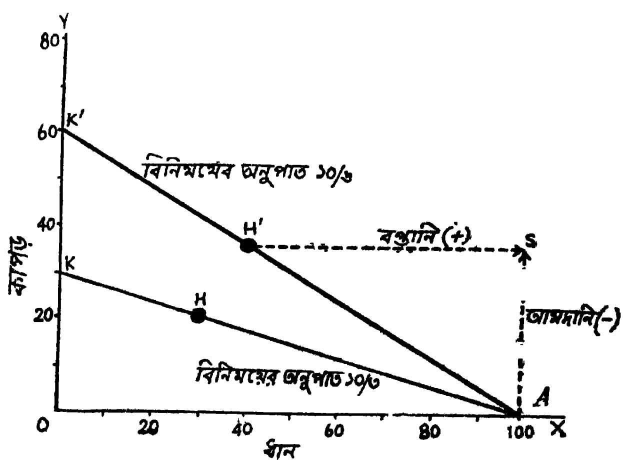
কেন বাণিজ্যে দুই দেশেরই বেশি লাভ হইবে

ঠিক কোন্ বিন্দুতে, উভয় দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতের অন্তবর্তী

কোন স্তরে বাণিজ্যহার স্থির হইবে? সাধারণ বুদ্ধিতে আমাদের প্রথমেই মনে হইতে পারে যে, বাণিজ্যহার 10 : 5½ হইবে, অর্থাৎ উভয়ের পার্থক্যের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় ইহা স্থাপিত হইবে, মোট পার্থক্য সমানভাবে ভাগ করিয়া উভয়ে সমান লাভ করিতে থাকিবে। ইহা কিন্তু সত্য নয়। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল দেখাইয়াছেন যে, দুইটি ব্যযের অনুপাতের মধ্যে বাণিজ্যহার নির্দিষ্ট হইবে ওই দ্রব্য দুইটির প্রত্যেকটির যোগান ও চাহিদার ঘাতপ্রতিঘাতে। ইহাকেই তিনি নাম দিয়াছেন পারস্পরিক চাহিদার তত্ত্ব (Theory of Reciprocal Demand)। সমগ্র পৃথিবীময় সেই দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগানেব পারস্পরিক চাপে এমন স্তরে এই বাণিজ্যহার নির্ধাবিত হইবে যেখানে দ্রব্য দুইটির চাহিদা ও যোগান ভারসাম্যে পৌঁছিযাছে। এই ভারসাম্যের অবস্থা হইতে বিচ্যুতি আসিতে পারে, যদি (ক) লোকের রুচি ও পছন্দ, এবং (খ) যন্ত্র কৌশল প্রভৃতিতে কোনরূপ পরিবর্তন আসে।

ভারসাম্যের বাণিজ্য-হার : পারস্পরিক চাহিদার তত্ত্ব

এই 10 : 6 অনুপাতের বাণিজ্যহারের প্রভাবে উভয় দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা বা রূপান্তরণের রেখা পরিবর্তিত হয়, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছি। যেমন, ভারতেব ক্ষেত্রে ইহার আকৃতি কিরূপ হয়, আমরা তাহা নিচের চিত্রে দেখিতেছি।



আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পূর্বে ভারতের উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা ছিল 10 : 3 বিনিময়ের অনুপাত অনুযায়ী AK রেখা। বাণিজ্যের পরে, যখন 10 : 6

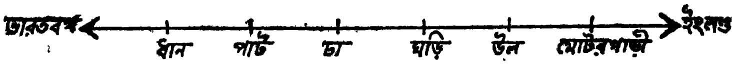
বিনিময়ের অনুপাত নির্দিষ্ট হইল তখন তাহার এই রূপান্তরণ রেখাটি ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। ইহা হইল AK′. ঠিক যেরূপ কোন আবিষ্কার বা যন্ত্রকৌশলের উন্নতি ঘটিলে রূপান্তরণ রেখা উপরে উঠে, এই ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিয়াছে। ভারত পূর্বাপেক্ষা উন্নত স্তরে উন্নীত হইয়াছে। এই AK′ রেখার কোন বিন্দুতে সে দুইটি দ্রব্যের উৎপাদন করিতে থাকিবে, অর্থাৎ তাহার উপকরণবিন্যাস কি হইবে, তাহা নির্ভর করিবে দেশের মধ্যে দামব্যবস্থার উপরে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে দেশের মধ্যে দ্রব্যের ও উপকরণের দামে পরিবর্তন আসিবে, ধরা যাউক সে তাহার নূতন রেখার H′ বিন্দুতে উৎপাদন ও ভোগ করিতে থাকে। এই রেখাটিকে ভোগ-সম্ভাবনার রেখা বলিয়াও গণ্য করা চলে, ইহার H″ বিন্দুতে ভারত 40 ইউনিট ধান এবং 36 ইউনিট কাপড় ভোগ করিতে থাকিবে। ভাঙা রেখা-দুইটির সাহায্যে ভারতের রপ্তানি (+) এবং আমদানি (−) দেখান হইতেছে। এইরূপে ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে দেখান চলে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে তাহার ভোগ ও উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে। বাণিজ্যের ফলে দুইটি দেশেরই উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়া—ইহা কোন ম্যাজিকের ফল নয়, বিশেষায়ণের ফলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনই বাড়িয়া গিয়াছে।

উৎপাদন ও ভোগ-সম্ভাবনার উপর বাণিজ্যের ফলাফল কিরূপ?

যদি একাধিক দ্রব্য থাকে, তবে অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা আলোচনার সময় এখন আসিয়াছে। এই তত্ত্বের মূল সিদ্ধান্ত তাহাতে কিছু পাল্টায় না, এমন কি খুঁটিনাটিতে অল্প কিছু পরিবর্তন আনাও বিশেষ শক্ত নয়। এতক্ষণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, ধান ও কাপড় এই দুইটি দ্রব্যেরই উৎপাদন, ভোগ ও বাণিজ্য চলিতেছে। কিন্তু বাস্তব জগতে ধান ছাড়া গম, পাট, আখ প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের কোন অভাব নাই, আর বহু প্রকারের কাপড় ও বহু প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যও আছে। এত বেশি দ্রব্যসামগ্রী থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ কমিবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রসঙ্গে হাবারলার (Haberler) দেখাইয়াছেন যে, যখন দুইটি দেশে সমহার ব্যয়ের নীতিতে অনেক দ্রব্য উৎপন্ন করা যায়, তখন উহাদের আপেক্ষিক সুবিধা বা তুলনামূলক ব্যয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্তরক্রমে সাজান চলে।

হাবারলার বলিয়াছেন যে,

যেমন, আমাদের তুলনামূলক সুবিধার স্তরক্রম অনুসারে আমরা নিচের জিনিসগুলিকে সাজাইয়া রাখিয়াছি :



এই স্তর অনুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যয় তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম. ভারতে ধানের ব্যয় সবচেয়ে কম, তাহার পর পাট···ইত্যাদি। ইংলণ্ডের তুলনামূলক সুবিধা হইল মোটর গাড়িতে সবচেয়ে বেশি, তাহার পরে উল, তাহার পরে ঘড়ি, এইরূপ। এই অবস্থায় একটি বিষয় আমরা সঠিক বলিতে পারি, বাণিজ্যের ফলে ভারতে ধান উৎপন্ন হইবেই এবং ইংলণ্ডে মোটর গাড়ি প্রস্তুত হইবেই, কারণ ইহাতে তাহারা প্রত্যেকে দক্ষতম। কিন্তু কোন্ কোন্ দ্রব্য রপ্তানি ও আমদানি হইবে তাহার সীমানারেখা (dividing line) কোথায় পড়িবে ? পাট ও চা-এর মধ্যে ? অথবা ভারত চা পর্যন্ত উৎপাদন করিবে এবং ঘড়ি হইতে ডান দিকের দ্রব্যগুলি ইংলণ্ডের হাতে ছাড়িয়া দিবে ? আবার এই সীমানারেখা দুইটি দ্রব্যের মধ্য দিয়া না গিয়া একটি দ্রব্যের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে ; সেই অবস্থার সেই দ্রব্যটি দুইটি দেশেই কিছু কিছু উৎপাদন হইতে থাকিবে। এই অবস্থায় কি ঘটিতে পারে ?

দুইটি দ্রব্যের বেশি থাকিলেও এই তত্ত্ব মূলত সঠিক

ইহা প্রধানত নির্ভর করে বিভিন্ন দ্রব্যের আন্তর্জাতিক চাহিদার তুলনামূলক শক্তির উপর। অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক চাপ অনুযায়ী এই সীমারেখার সঞ্চার-পথ নির্ধারিত হইবে। ধান ও পাট এর জন্য আন্তর্জাতিক চাহিদা বাড়িয়া গেলে ভারতের অনুকূলে বাণিজ্যহার সরিয়া আসিয়া আমাদের এমন সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে পারে যে, আমরা সকল উপকরণ উহাতে নিযুক্ত করিয়া চা উৎপাদন ত্যাগ করিতেও পারি ; উহার উৎপাদন আর ততটা লাভজনক না-ও থাকিতে পারে। আবার রাজস্থানের মরুভূমিতে সহজে চা তৈয়ারী করা যায় এইরূপ কোন আবিষ্কার হইলে বিভিন্ন দ্রব্যের তুলনামূলক সুবিধার স্তরক্রম সম্পূর্ণ নূতনভাবে পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে এবং বিশেষায়ণ ও বাণিজ্যের ধরন বদলাইয়া যাইতে পারে।*

* "So long as our assumptions continue to cover only the cost-data, we cannot determine the exact position of this dividing line. We can say only that it must be drawn in such a manner that country I enjoys a comparative advantage in every commodity it exports relatively to every commodity it imports. If we wish to determine its exact position—whether between B and C or between C and D and so on—we must introduce the further condition that the credit side and the debit side of the balance of payments must be equal." Haberler, *International Trade*, P. 137.

সংখ্যায় দুইটি দেশের বেশি থাকিলেও এই তত্ত্বটির মূলকথা অপরিবর্তিত থাকে। কোন বিশেষ দেশের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তাকাইয়া দেখিলে নিজের বাহিরে অন্যান্য সকল দেশকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া "পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ" (rest of the world) বলিয়া গণ্য করিতে হয়। রাষ্ট্রের সীমানারেখার সহিত বাণিজ্যের সুবিধার কোনরূপ যোগসূত্র নাই। এই তত্ত্ব সর্বত্র প্রযোজ্য, বিভিন্ন দেশের মধ্যে অথবা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে।

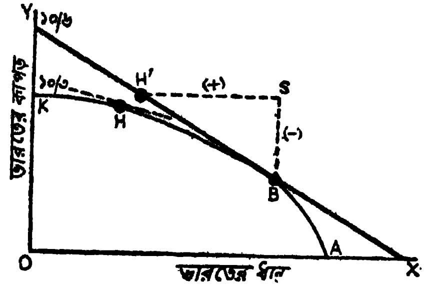
দুইটি দেশের বেশি থাকিলেও ইহা কম সত্য নয়

এতক্ষণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, উৎপাদন বাড়িলে বা কমিলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় সমান থাকে। তাই রূপান্তরণরেখা সরল রেখার রূপ লয়। কিন্তু বাস্তবে সকল শিল্পেই উৎপাদন বাড়াইতে গেলে ব্যয় বাড়ে; এই রেখাটি তাই উৎস বিন্দুর দিকে অবতল (concave to the origin)। সাধারণভাবে ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষ ধান উৎপাদনে অনেক বেশি যোগ্য হইলেও, ভারতে ধানের উৎপাদন বাড়িলে এমন একটা স্তর আসে যখন উৎপাদন আর একটু বাড়াইবার চেষ্টা করিতে থাকিলে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ভারতে প্রতিযোগিতার দরুন ইংলণ্ডে ধানের দাম কমিয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু তবুও কোন কোন অতিরিক্ত উর্বর জমিখণ্ড আছে যেখানে কিছু কিছু ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঠিক এইরূপ ইংলণ্ডে কাপড়ের উৎপাদন ব্যয় বাড়ে বলিয়া ভারতেও কোন কোন দক্ষতর কলকারখানায় কাপড়ের উৎপাদন কিছু কিছু চলিতে থাকে। সুতরাং, ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম বা ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের নীতি কার্যকরী হয় বলিয়া বিশেষায়ণের ধারা সম্পূর্ণ হইতে পারে না; উভয় দ্রব্যেরই কিছু কিছু পরিমাণ উভয় দেশে উৎপাদন হইতে থাকে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান ও উৎপাদন ব্যয়ে বৃদ্ধির ফলাফল

এই ছবিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হওয়ার পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা আমরা দেখিতে পাইতেছি। এই ছবিতে ক্রমবর্ধমান ব্যয় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে; **AK** রেখা তাই উৎসবিন্দুর দিকে অবতল। বাণিজ্য শুরু হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষ **H** বিন্দুতে উৎপাদন ও ভোগ করিতেছিল। দ্রব্য দুইটির আভ্যন্তরীণ দামের

অনুপাত (10 : 3) উহাদের ব্যয়ের অনুপাতের সমান ; H বিন্দুতে AK রেখার চাল ইহা প্রকাশ করিতেছে।



বাণিজ্যের পরে, উভয় দেশের সাধারণ বাণিজ্যহার দাঁড়াইল 10 : 6 ; এই অবস্থায় ভারতের উৎপাদন B বিন্দুতে সরিয়া আসে। কাপড়ের উৎপাদন কমিয়া আসে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হয় না, নূতন উৎপাদন বিন্দু B-তে পৌঁছায়। প্রতিযোগিতার দরুন ঐখানে রেখাটির চাল হইল 10 : 6, অর্থাৎ অল্প কিছু ধান উৎপাদনের জন্য কিছুটা কাপড়ের ব্যয় এবং এই দুইটি দ্রব্যের আন্তর্জাতিক দামের অনুপাত সমান। B বিন্দুতে এবং একমাত্র ঐ বিন্দুতেই ভারতের জাতীয় উৎপাদনের মূল্য (10 : 6 দাম অনুপাতের হিসাবে) সর্বাধিক। সরল রেখাটি হইল ভারতের নূতন ভোগ-সম্ভাবনার রেখা, বাণিজ্যের ফলে ভারত যাহা পাইয়াছে। যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে ভোগের এই স্তর নির্ধারিত হয়, H′ বিন্দুতে উহা প্রকাশ পাইতেছে। পূর্বের ন্যায়, ভাঙা রেখাগুলি রপ্তানি (+) এবং আমদানি (−) নির্দেশ করিতেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভও হইতেছে, তবে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান ও ব্যয়বৃদ্ধির দরুন লাভ ততটা বেশি নয়, বিশেষায়ণও ততদূর প্রসারিত হয় নাই। ভারসাম্যের বিন্দুতে উভয় দেশে উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় দ্রব্য দুইটির বাণিজ্য-হারের, অর্থাৎ 10 : 6-এর সমান।

উপকরণ আদানপ্রদানের পরিবর্তে দ্রব্যের আদান প্রদান

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হওয়ার পরে ইংলণ্ডের উপকরণ ধান হইতে সরিয়া গিয়া কাপড়ের উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে থাকে। এই ধরনের উৎপাদনে জমির দরকার কম কিন্তু শ্রমিকের দরকার বেশি, ফলে ইংলণ্ডের সীমাবদ্ধ জমির উপর জনসংখ্যার চাপ অনেকটা হ্রাস পায়। জমির জন্য অতিরিক্ত চাহিদা কমে, মজুরির তুলনায় তাই খাজনা হ্রাস পায়। অপরদিকে, ভারতে বিপরীত ধরনের

প্রভাব কার্যকরী হয়, ধানের উৎপাদন বাড়াইবার জন্ম জমির উপর চাপ বাড়ে, মজুরির তুলনায় খাজনা বৃদ্ধি পায়।

উভয় ক্ষেত্রেই দ্রব্যের অবাধ আদানপ্রদান বা বাণিজ্যের ফল হইল অনেকটা বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধে উপকরণগুলির যাতায়াতের সমান। ঠিক যেমন, ইংলণ্ড হইতে ভারতে লোক চলিয়া আসিলে এখানকার শ্রমের দুষ্প্রাপ্যতা কমিত, খাজনার তুলনায় মজুরির হার হ্রাস পাইত, দ্রব্য আদানপ্রদানের ফলেও তাহাই ঘটিতেছে। এইরূপে উভয় দেশেই অতি সুপ্রাপ্য (superabundant) উপকরণের সহজলভ্যতা দূর হয় এবং দুষ্প্রাপ্য উপকরণের দুর্লভতার লাঘব ঘটে। ইহাই হেক্সার-ও'লীন তত্ত্ব (Hecksher-Ohlin theory) নামে বিখ্যাত। এই তত্ত্বের মূল কথাই হইল, দ্রব্যসামগ্রীর আদানপ্রদানের ফলে সকল দেশে উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা কিছুটা হ্রাস হয়। ও'লীন ক্লাসিকাল তত্ত্বকে এইভাবে কিছুটা উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রম ও মূলধনের অবাধ যাতায়াত থাকিলে উহা মজুরির হার ও উপকরণের দামে মোটামুটি সমতা আনিবে। কিন্তু নিজ নিজ দেশের সীমানা ছাড়াইয়া উপকরণগুলির যাতায়াত না ঘটিলেও অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে, আংশিকভাবে হইলেও উপকরণের দামে এইরূপ সমতা দেখা দিবে। এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার। দেখা যাইতেছে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ইংলণ্ডের জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু এই জাতীয় আয়ের বণ্টন এমনভাবে বদলাইয়া যাইতে পারে যাহাতে দেশের অধিবাসীদের সামগ্রিক কল্যাণ হ্রাস পায়।

হেক্‌সার-ও'লীন তত্ত্ব

ইহার গুরুত্ব

এতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দুইটি কারণ দেখানো হইয়াছে: (ক) বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনামূলক ব্যয়ে পার্থক্য এবং (খ) ক্রমহ্রাসমান ব্যয়। কিন্তু এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ করার জন্ম বাণিজ্যের তৃতীয় কারণটি বলা প্রয়োজন। উভয় দেশের ব্যয় সম্পূর্ণ সমান হইলেও এবং তাহা বাড়িতে থাকিলেও রুচি ও পছন্দে তারতম্যের দরুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভবপর। যেমন নরওয়ে ও সুইডেন মোটামুটি একই হারে মাছ ও মাংস উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু সুইডেনের অধিবাসীরা মাংস পাইলে খুশী, আবার নরওয়ের অধিবাসীরা তুলনায় মাছ পছন্দ করে বেশি। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উভয়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তৃতীয় কারণ: রুচি বা চাহিদার পার্থক্য

দেশই লাভবান হয়; সুইডেন হইতে মাছ রপ্তানি হইয়া নরওয়ে হইতে মাংস আমদানি চলিতে থাকে। উভয় দেশেরই তৃপ্তি, জীবনযাত্রার মান ও সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

নূতন বিকল্প তত্ত্বের মূল্যায়ণ (Evaluation of this Alternative Doctrine):

এই নূতন তত্ত্বের পক্ষে অধ্যাপক Haberler বলেন যে, ইহা পুরাতনতত্ত্ব হইতে উন্নত, কারণ আমাদের এখানে দুইটি সংকোচক অনুমান (restrictive assumption) না মানিলেও চলে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, শ্রমব্যয়ের তত্ত্ব বাদ দিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব গঠন করা সম্ভব। তদুপরি, এই নূতন ব্যাখ্যায় একই সঙ্গে বহু বিভিন্ন সংখ্যক উৎপাদনের উপাদান দেখান চলে।

অধ্যাপক Viner অবশ্য এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে নূতন পদ্ধতির এই সুবিধাগুলি কাল্পনিক মাত্র, ইহাদের ভূয়া বলিলেও ভুল হয় না। তিনি বলেন যে, উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে আড়াল করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। উৎপাদন-

ভাইনারের সমালোচনা

পরিবর্ততার এই রেখা ধরিয়া লয় যে, দেশে উপকরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট (fixed factor supply)। Viner বলেন যে, ইহা সঠিক নয়। টেক্‌নলজির দ্বারা নির্দিষ্ট এই রেখাটিকে স্থির বলিয়া ধরা যায় না, কারণ উৎপাদনের কোন উপাদানের পরিমাণই নির্দিষ্ট নয়, ইহা নির্ভর করে উপাদানটির দামের উপর। আর উপাদানের দাম নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর। সংক্ষেপে তাঁহার মতে, উৎপাদনের উপাদানগুলির যোগান যদি পরিবর্তন করা যায়, তাহা হইলে লাভ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে দ্রব্যসমূহের উপযোগিতা ছাড়াও এই সকল উপাদানের যোগানের "আসল ব্যয়" হিসাব করা দরকার। নিরপেক্ষ রেখা পদ্ধতির প্রয়োগের বিরুদ্ধেও সমালোচনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তির কল্যাণ পরিমাপ করার সময়ে আমরা সহজেই বলিতে পারি উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় উন্নীত হইলে ব্যক্তির কল্যাণ বাড়িল। কিন্তু জাতির বা দেশের ক্ষেত্রে ইহা বলা চলে না। 5 থান ও 2 কাপড় হইতে দেশে যদি 6 থান ও 2 কাপড় তৈয়ারি হয়, তবে দেশের সমষ্টিগত নিরপেক্ষরেখা (Community Indifference curve)

উপরে উঠিল বটে, কিন্তু আয়-বন্টনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে মোট সামাজিক কল্যাণ হ্রাস পাইতে পারে।

নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণের এই অনুমান যদি বাদ দিতে হয় এবং সমগ্র দেশের উপযোগী সমষ্টিমূলক নিরপেক্ষ রেখা গঠন করা যদি কোন মতে সম্ভব না হয় তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কল্যাণ বাড়ায় কি না এই তত্ত্ব গঠন করার কোন উপায় থাকে কি? স্যামুয়েলসন্ (Samuelson) বলেন যে, ক্লাসিকাল লেখকদের এই সংকোচক অনুমানসমূহ বাদ দিলেও দেখা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যকারী দেশগুলি সম্ভাব্য ও প্রকৃত লাভ (potential and actual gain) পাইয়া থাকে। তাঁহার মতে, বাণিজ্য শুরু হইলে প্রতিটি দেশই সকল উপকরণ কম পরিমাণে ব্যবহার করিয়া প্রতিটি দ্রব্য পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে পাইতে পারে। মোট লাভের কোন বাস্তব পরিমাপক পাওয়া যায় না ইহা ঠিকই; কিন্তু সকল উপকরণ কম ব্যবহার করিয়া প্রতিটি দ্রব্য বেশি পাইলে জাতির কল্যাণ নিশ্চয় বৃদ্ধি পায়। এই দিক দিয়া দেখিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দরুন সকল দেশেরই কল্যাণ হয়। তাই তিনি বলেন যে, "some degree of trade, however restricted or unrestricted it may be, is necessarily better for all countries than no trade at all."

স্যামুয়েল্‌সন্ বলেন যে, লাভ পরিমাপ করা না গেলেও কল্যাণ বাড়ে

বাণিজ্যব্যালান্স ও জাতীয় আয় (Balance of Trade and the National Income):

কোন একটি দেশের আয়স্তর এবং বাণিজ্যব্যালান্সের মধ্যে পরস্পর প্রভাবশীল সম্পর্ক (reciprocal-relationship) আছে। বাণিজ্য ব্যালান্সে পরিবর্তন দেশের আয়স্তরকে প্রভাবিত করে, আবার আয়স্তরে পরিবর্তন বাণিজ্যব্যালান্সের অবস্থায় পরিবর্তন আনে।

এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার জন্য কয়েকটি বিষয় আমাদের ধরিয়া লওয়া দরকার (assumptions)। আমরা মনে করি যে, প্রতিটি দেশে দামস্তর, সুদের হার এবং স্থায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ সমান আছে, উপরন্তু প্রতিটি দেশেই কিছু পরিমাণ বেকারি আছে। এই অনুমানটির কারণ হইল যে, আমাদের ধরিয়া লওয়া দরকার কোন দেশের দ্রব্যের জন্য চাহিদা বাড়িলে দেশের মধ্যে উহার উৎপাদনই বাড়িবে, দাম

বিশ্লেষণের অনুমানসমূহ

বাড়িবে না। সর্বোপরি, আমরা আরও ধরিয়া লইব যে, দুইটি দেশের টাকার বিনিময় হার (exchange rate of two currencies) স্থির আছে।*

আয়স্তরের প্রভাব বাণিজ্যব্যালান্সের উপর কিরূপে পড়িতে পারে? আয়স্তরে কোন পরিবর্তন বাণিজ্য ব্যালান্সের উপর প্রভাব বিস্তার করে আমদানি ও রপ্তানির মাধ্যমে। ঠিক যেরূপ বর্তমান আয়ের ভিত্তিতে আমরা ভবিষ্যতে ভোগের কল্পনা করি, সেইরূপ দেশে বর্তমানের আয়স্তর অনুযায়ী ভবিষ্যৎ আমদানির পরিকল্পনা করা হয়। বর্তমানে আয়স্তর বাড়িলে আমাদের আমদানি বৃদ্ধি পায়, আয়স্তর কমিলে আমদানি হ্রাস পায়। যেমন, আয় পরিবর্তিত হইলে ভোগ পরিবর্তিত হয়—ইহাদের এই সম্পর্ক প্রকাশ করিবার জন্য আমরা 'প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা' ব্যবহার করি; ঠিক সেইরূপ, আয়ের সহিত আমদানির সম্পর্ককে আমরা বলি 'প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা' (Marginal Propensity to import)। আয়স্তর পরিবর্তিত হইলে আমদানির পরিমাণে যে পরিবর্তন হয়, এই দুই পরিবর্তনের অনুপাতকে প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা বলে। যেমন, আয়স্তর 100 বাড়িলে লোকেরা যদি 10 টাকার আমদানি বাড়াইয়া দেয় তবে জাতির প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা হইল $\frac{10}{100}$ অর্থাৎ 0·1.

আয়স্তর ও আমদানিঃ প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা

এই সম্পর্কটির গুরুত্ব দুই দিক হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত, প্রান্তিক আমদানিপ্রবণতা সাধারণত শূন্য (০) হইতে বেশি হয়, অর্থাৎ দেশে আয়স্তর বাড়িলে নিশ্চয় আমদানি পূর্বাপেক্ষা কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ, দেশের মধ্যে আয়স্তর বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফল হইল বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল করার দিকে ঝোঁক সৃষ্টি করা; কারণ আয়স্তর বাড়িলে রপ্তানি বাড়িবেই এরূপ কোন কথা নাই। আবার, বিদেশের আয়স্তর বাড়িলে তাহাদের আমদানি বৃদ্ধি পাইবে, ফলে আমাদের বাণিজ্য-ব্যালান্স অনুকূল করার চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয়ত, আয়স্তর ও আমদানির মধ্যে সম্পর্কের আর একটি দিক আছে। আমদানির উপর আমাদের ব্যয়ের ফল অনেকটা সঞ্চয়ের মত, কারণ এই ব্যয়

আয়স্তর বাড়িলে আমদানি বাড়িবে

* "This, together with the assumption of constant prices within each country, means that prices of imported goods in term of home currency in each country do not vary." A.C. L. Day, *Outline of Monetary Economics*, P. 372.

দেশের মধ্যে নূতন আয় সৃষ্টি করে না। দেশের জিনিস কিনিয়া টাকা খরচ করিলে উহা দেশীয় দ্রব্যোৎপাদনকারী ও বিক্রেতার আয় সরাসরি বাড়াইয়া তোলে, বিদেশী জিনিস কিনিলেও এই আয় বাড়ে বটে, তবে ইহা বিদেশী উৎপাদকদের আয় বৃদ্ধি করে। আমাদের দেশের লোকের আয় ও কর্মসংস্থান ইহাতে বাড়ে না। যেমন, বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশের আয়স্তর বাড়িল। বর্ধিত আয়ের কিছুটা দেশী জিনিস ক্রয়ে ব্যয়িত হইল, আর কিছু অংশ বিদেশী জিনিসে খরচ হইল। যে অংশ দেশীয় জিনিসপত্রে ব্যয় হয়, উহার ফলে দেশের লোকের আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ে, আয় প্রসারের ধারা এইরূপে ক্রমে প্রসারিত হইতে থাকে। অপরপক্ষে বর্ধিত আয়ের যে অংশ আমদানি-বৃদ্ধিতে ব্যয়িত হইল তাহার প্রভাবে দেশের মধ্যে কোনরূপ আয়-বৃদ্ধি দেখা দিল না ; সঞ্চয়ের মতনই উহা দেশের আভ্যন্তরীণ আয়-প্রসার স্রোতের ধারা হইতে বাহিরে রহিল।

আমদানি বৃদ্ধির ফল সঞ্চয়ের মতন

এইরূপ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তুলনা উল্লেখ করা দরকার। রপ্তানির ফল হইল দেশে আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের মতই। আয়-নির্ধারণের তত্ত্ব হইতে আমরা জানি যে, দেশে নূতন বিনিয়োগ আয়স্তরের উপর নির্ভরশীল নয়, বর্তমান আয়স্তর হইতে স্বাধীন বা নিরপেক্ষ ধরনের কোনরূপ কারণে বিনিয়োগ নির্ধারিত হয় (যেমন ইহা অনেকাংশ নির্ভরশীল শিল্প-টেকনিকের উপর)। ঠিক সেইরূপ দেশের রপ্তানি-স্তর উহার আয়স্তরের উপর নির্ভরশীল নয় ; বহিরাগত অনেক শক্তির প্রভাবে ইহা স্থির হয়, যেমন বিদেশী আয়স্তর দ্বারা। অর্থাৎ বিনিয়োগের ন্যায়ই কোন দেশের রপ্তানি-স্তর সেই দেশের আয়স্তরের উপর নির্ভর করে না।

রপ্তানি আয়স্তরের উপর নির্ভর করে না

শুধু তাহাই নহে। রপ্তানিস্তরে পরিবর্তন আসিলে, (অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে) বিনিয়োগের স্তরে পরিবর্তনের ন্যায় প্রভাব হয়। ইহা দেশের মধ্যে উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে বহুগুণ পরিবর্তনের সূচনা করে। রপ্তানি বাড়িলে দেশের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পায় ; এই সকল উৎপাদক ও বিক্রেতাদের আয় বাড়ে, তাহাদের এই বর্ধিত আয় দেশের মধ্যে ব্যয়িত হইয়া গুণ-প্রসারের ধারা (**multiplier expansion**) শুরু করে।

রপ্তানিতে হ্রাসবৃদ্ধির ফল বিনিয়োগের হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায়

সুতরাং আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি যে, রপ্তানি-বৃদ্ধি বা আমদানি-হ্রাসের দরুন বাণিজ্য ব্যালান্সে কোনরূপ উন্নতির ফলে আভ্যন্তরীণ দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে, এইরূপে দেশে আয়ের গুণক প্রসার শুরু হয়। আবার বিপরীত দিকে, বাণিজ্য ব্যালান্সে কোনরূপ অবনতির ফলে অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে আয়ে গুণক-সংকোচনের ধারা দেখা দেয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক (The foreign trade Multiplier)

জাতীয় আয়ের উপর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাব কতটা, তাহা পরিমাপের জন্য আমরা বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক আলোচনা করি। যেমন কোন এক বৎসরে ভারত হইতে 10 কোটি টাকা মূল্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইল। এই রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে 10 কোটি টাকার অনেক বেশি পরিমাণে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। যে পরিমাণ রপ্তানি বাড়িল, তাহার কতগুণ আয়স্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহাই বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক।

যেমন, মনে কর, একটি দেশ হইতে যে পরিমাণ রপ্তানি বাড়িল তাহাকে আমরা E বলিতেছি। তাহার অর্থ হইল এই যে, সেই দেশের রপ্তানিশিল্পের লোকজন পূর্বাপেক্ষা E পরিমাণ টাকা বেশি আয় করিতে পারিল। মালিকদের মুনাফা এবং শ্রমিকদের মজুরিরূপে এই টাকা উহাদের আয় বাড়াইয়া দিল। জাতীয় আয় E পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। বর্ধিত এই আয়কে তিনটি উপায়ে ব্যবহার করা চলে: (ক) দেশীয় জিনিসপত্রে ভোগব্যয়, (খ) বিদেশী বা আমদানি দ্রব্যাদিতে ভোগব্যয় এবং (গ) সঞ্চয়। কিছুটা আভ্যন্তরীণ ভোগব্যয়, কিছুটা বিদেশী ভোগব্যয়, ও কিছুটা সঞ্চয়—এই তিন উপায়ে বর্ধিত আয়কে লোকে ব্যবহার করিবে।

মনে কর, দেশের মধ্যে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইল c. অর্থাৎ, যদি আমরা মনে করি লোকে বর্ধিত আয়ের $\frac{1}{4}$ অংশ আভ্যন্তরীণ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিবে, তবে $c = \frac{1}{4}$। 10 কোটি টাকা নূতন আয় সৃষ্টি হইলে লোকে 10 কোটি$\times \frac{1}{4} = 2\frac{1}{2}$ কোটি টাকা আভ্যন্তরীণ ভোগব্যয় করিবে। সাধারণত মনে করা হয় যে, স্বল্পকালে এই c, বা আভ্যন্তরীণ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা সমান থাকে।

প্রথম স্তরে, E পরিমাণ রপ্তানি বাড়িলে জাতীয় আয় E পরিমাণ বাড়ে। বর্ধিত এই E পরিমাণ আয় হইতে লোকে $E \times c$ পরিমাণ টাকা আভ্যন্তরীণ

ভোগব্যয়ে খরচ করে। ফলে এই সকল দ্রব্যের উৎপাদক ও বিক্রেতাদের আয় Ec পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, দ্বিতীয় স্তরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় Ec পরিমাণ। তৃতীয় স্তরে লোকে এই Ec হইতে $Ec \times c = Ec^2$ পরিমাণ টাকা খরচ করে। জাতীয় আয় Ec^2 বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী স্তরে জাতীয় আয় বাড়ে $Ec^2 \times c = Ec^3$ পরিমাণ। জাতীয় আয়ে এই বৃদ্ধির ধারা ততদূর চলিতে থাকে যতদূরে বর্ধিত আয়ের পরিমাণ এত কম যে, উহা ভোগ হইয়া আর নূতন আয় সৃষ্টি করিতে পারে না। অর্থাৎ E পরিমাণ রপ্তানি বাড়িলে শেষ পর্যন্ত জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি কত হইল তাহা পাওয়া যায় নিচের অংকটি হইতে :

$$E + E_c + E_c^2 + E_c^3 + E_c^4 \cdots\cdots\cdots\cdots O$$

ইহা যোগ করার সূত্র হইল $E \times 1/1-c$. এইরূপে E পরিমাণ রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় উহার কতগুণ বাড়িবে তাহা আমরা জানিতে পারি E-কে $1/1-c$ দিয়া গুণ করিয়া। সুতরাং এই $1/1-c$ কে আমরা বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক বলিতে পারি। যেমন c হইল $\frac{1}{4}$, এই অবস্থায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে $10 \times 1/1-c$ কোটি টাকা। অর্থাৎ, $10 \times 1/1-\frac{1}{4} = 10 \times 1/\frac{3}{4} = 10 \times 4/3 = 13.3$ কোটি টাকা।*

রপ্তানি হ্রাস পাইলেও উহার প্রভাব আমরা এই বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক হইতে পরিমাপ করিতে পারি। রপ্তানি হ্রাসের পরিমাণ যদি হয় F, তবে জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে $F \times 1/1-c$ পরিমাণ।

বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণককে ব্যাখ্যা করার সময়ে 'প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা' ও 'প্রান্তিক সঞ্চয় প্রণবতা' এই দুইটি ধারণার কথা মনে রাখা দরকার। যদি প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা হয় m এবং প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা হয় s, তবে $c+m+s=1$, কারণ বর্ধিত আয়ের কিছুটা অংশ আভ্যন্তরীণ ভোগে ব্যয় হয়, কিছু অংশ আমদানি দ্রব্যে ব্যয় হয় এবং কিছুটা সঞ্চয় হয়। উপরের সমীকরণ হইতে আমরা লিখিতে পারি যে, $1-c=m+s$, সুতরাং বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণককে $1/1-c$ না লিখিয়া আমর, $1/m+s$ লিখিতে পারি। অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক $= \dfrac{1}{\text{প্রাঃ আঃ প্র} + \text{প্রাঃ সঃ প্র}}$; (অর্থাৎ, 1/প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা+প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা)।

* Sum = 1st Term × 1/1—Common Ratio.

অনুশীলনী

1. Why should there be a separate theory for International trade?

2. Show how the comparative cost of producing different commodities in different countries determine international specialisation of production as well as trade.

3. "The fact that a commodity can be produced at a lower cost by one country than by another is no guarantee that it will pay the first country to prcduce it and not to import it from the second." Explain and illustrate.

4. Explain the basis of International trade and examine the possibility of trade between two highly industrialised countries.

5. Do you think that if there are more then two commodities and two countries, the whole theory of comparative advantage has to be scrapped?

6. "Although trade does not equalise the earnings of the factors of production in different countries, it does tend to level out differences." Comment.

7. Explain what is meant by 'terms and trade', and point out the factors on which it depends.

8. What is Reciprocal demand and how does it help to determine the International Values.

9. Examine the meaning of the concept "terms of trade" and point out the repurcussions of a change in the terms of trade on the economy of a country.

10. What are the gains from foreign trade? How these gains can be measured? On what factors these gains depend?

11. Write a short note on the concept of Foreign Trade Multiplier.

১৩

বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি

Foreign Exchange and Trade Policy

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষ সমস্যা হইল এক দেশের অর্থকে অপর দেশের অর্থে রূপান্তরণ (conversion) করা। পৃথিবীর সকল দেশে সমান ধরনের অর্থ নাই, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রচলিত। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে উদ্ভূত দেনা-পাওনা মিটাইতে হইলে ক্রেতার অর্থকে বিক্রেতার অর্থে রূপান্তরিত করিতে হয়। এক দেশের অর্থকে অপর দেশের অর্থে রূপান্তরণের পদ্ধতি, রীতিনীতি ও কাজকর্মকে বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange) বলা হয়।

বৈদেশিক বিনিময় কাহাকে বলে

অর্থের এই রূপান্তরণ কিরূপে ঘটে? মনে করা যাউক, ভারতের মিঃ সেন, ইংলণ্ডের মিঃ টমের নিকট 5000 টাকা মূল্যের চা বিক্রয় করিয়াছে (বা রপ্তানি করিয়াছে)। মিঃ টম ক্রেতা, সুতরাং বিক্রেতাকে এই মূল্য বা ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে পাউণ্ডকে ভারতীয় টাকায় রূপান্তরিত করিতে হইবে।

মিঃ সেন চা রপ্তানির সময় একখানা হুণ্ডি বা বিনিময়-বিল তৈয়ার করিয়া মিঃ টমের নিকট পাঠাইয়াছিলেন ; ধরা যাউক, মিঃ টম্ 90 দিন পরে পাউণ্ড দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া ওই বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। 90 দিন শেষ হইবার পূর্বে বা পরে মিঃ সেন ভারতে অবস্থিত কোন বিনিময়-ব্যাঙ্কের (Exchange Bank) নিকট উপস্থিত হইয়া ওই বিল ভাঙাইয়া টাকা পাইয়া গেলেন, প্রাপ্তি-সময়ের পূর্বে ভাঙানো হইল বলিয়া ব্যাঙ্ক বাট্টা লইল। বিনিময়-ব্যাঙ্কের ইংলণ্ডে যে অফিস আছে, বিল বা হুণ্ডি সেখানে চলিয়া গেল, প্রতিশ্রুত 90 দিন উত্তীর্ণ হইলে মিঃ টমের নিকট উহা উপস্থিত হইল এবং ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কটি তাঁহার নিকট হইতে পাউণ্ড পাইয়া গেল। আমদানি হইলেও এইরূপে মূল্য পরিশোধ করা চলে।

কিরূপে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দাম মিটানো হয় : বিনিময়বিল ও ব্যাঙ্কের ড্রাফট

আধুনিক কালে মূল্য পরিশোধের জন্য বা অর্থের রূপান্তরণের জন্য সাধারণত ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ ব্যবহৃত হয়। যেমন, মিঃ সেন মিঃ টমের নিকট হইতে 600 পাউণ্ড মূল্যের যন্ত্র আমদানি করিয়াছেন। তিনি ভারতে অবস্থিত কোন বিনিময় ব্যাঙ্কে গিয়া টাকার বদলে পাউণ্ড কিনিতে চাহিলেন। ব্যাঙ্ক তাঁহাকে বিনিময়-হার জানাইয়া দিল, অর্থাৎ সে 1 টাকায় কি পরিমাণ ব্রিটিশ অর্থ বিক্রয় করিতে রাজি আছে তাহা জানাইল। সেই হারে 600 পাউণ্ড ক্রয় করিতে যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন তাহা জমা দিয়া মিঃ সেন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 600 পাউণ্ডের একখানি ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ পাইলেন, তিনি উহা মিঃ টমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মিঃ টম্ ড্রাফট্ প্রদানকারী ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখা বা অফিস হইতে পাউণ্ড পাইয়া গেলেন।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষ রপ্তানি করিলে ভারতীয় টাকায় উহার মূল্য পরিশোধের উদ্দেশ্যে বিদেশে বিদেশী অর্থ বিনিময়-ব্যাঙ্কে জমা পড়ে

দেশী টাকার বৈদেশিক চাহিদা ও যোগান

এবং বিদেশের ব্যবসায়ীগণ ভারতীয় টাকা ক্রয় করিতে চাহে। এইরূপেই বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় টাকার চাহিদা সৃষ্টি হয়। আবার, ভারতবর্ষ আমদানি করিলে উহার মূল্য পরিশোধের জন্য বিনিময় ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমরা বিদেশী অর্থ ক্রয় করিতে চাহি; বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় টাকার যোগান হয়, এবং দেশের মধ্যে বিদেশী অর্থের চাহিদা সৃষ্টি হয়। শুধু দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইতেই দেশীয় টাকার বা বিদেশী অর্থের এইরূপ যোগান ও চাহিদা দেখা দেয়, তাহা নহে। আরও অনেক কারণে ইহা ঘটে। যেমন কোন ছাত্র লণ্ডনে পড়িতে যাইবে। সে এখানকার ব্যাঙ্কে দেশীয় টাকা জমা দিয়া ইংলণ্ডের পাউণ্ড কিনিতে চাহে। ইহাতে বিদেশের বাজারে আমাদের টাকার যোগান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের বাজারে বিদেশী অর্থের জন্য চাহিদা সৃষ্টি যায়। ঠিক এইরূপ, ইংলণ্ডের কোন ব্যবসায়ী আমাদের দেশে কোন কোম্পানীর শেয়ার কিনিতে চায় বা সেখানকার কোন ব্যক্তি তাজমহল দেখিতে চায়। সে নিজের দেশের কোন ব্যাঙ্কে পাউণ্ড জমা দিয়া ভারতীয় টাকার

ইহা লইয়াই লেনদেন-ব্যালান্স গঠিত

চাহিদা সৃষ্টি করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তিনটি উদ্দেশ্যে দেশের মধ্যে বিদেশী অর্থের এবং বিদেশের বাজারে দেশীয় টাকার চাহিদা দেখা যায়, লেনদেন, বিনিয়োগ ও ফাট্‌কা নিয়োগের উদ্দেশ্যে (**Transaction, investment and specula-**

tion)। ইহাদের একত্র হিসাবকে বলে লেনদেন-ব্যালান্স। কোন দেশের টাকার যোগান ও চাহিদার সকল কারণ লইয়া সেই দেশের লেনদেন-ব্যালান্স গঠিত হয়।

বাণিজ্য ব্যালান্স ও লেনদেন ব্যালান্স (Balance of trade and Balance of Payments)

কোন দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি হইলে তাহার জন্য বিদেশীয় অর্থে দাম পাওয়া যায় এবং বিদেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করিতে হইলে তাহার জন্য দেশীয় টাকায় দাম দিতে হয়। রপ্তানি দ্রব্যাদির মূল্য ও আমদানি দ্রব্যাদির মূল্যের একত্র হিসাবকে বাণিজ্য ব্যালান্স (Balance of trade) বলা হয়।

বাণিজ্য ব্যালান্স

বাণিজ্য ব্যালান্সে সমতা অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির দামের সমতা থাকিবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। এইরূপ সমতা থাকিলে বোঝা যায় দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির দরুন বিদেশের বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদা সমান। যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কোন দেশের আমদানির মূল্য রপ্তানির মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে সেই দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল (unfavourable)। অপর পক্ষে রপ্তানির মূল্য আমদানির মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে সেই দেশের বাণিজ্য-ব্যালান্স অনুকূল (favourable)।

কিন্তু দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় বিক্রয় ছাড়াও অন্যান্য বহু বিষয়ের জন্য বিদেশে অর্থ প্রেরণ করিতে হয় বা বিদেশ হইতে অর্থ পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের

লেনদেন ব্যালান্স

ক্ষেত্রে দ্রব্যসামগ্রী ছাড়াও বহু বিষয়ে বিদেশের সহিত লেনদেন করিতে হয়; কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দেশের সহিত পৃথিবীর সকল দেশের যে লেনদেন হয়, তাহার হিসাবকে সেই দেশের লেনদেন ব্যালান্স (Balance of payment) বলা হয়।

যে সকল বিষয় লইয়া দেশের লেনদেন ব্যালান্স গঠিত হয় তাহাদের নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়:

চলতি ব্যালান্স (Current Balance)

(ক) দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেন, আমদানি ও রপ্তানির দ্রব্যাদি বা "দৃশ্য" (Visible) বিষয়সমূহ। (খ) "অদৃশ্য" (Invisible) বিষয়সমূহ, যেমন

লেনদেনের উদ্দেশ্যে

জাহাজের ভাড়া বা পরিবহণ ব্যয়, ভ্রমণকারীদের ব্যয়, বিদেশী কোম্পানীদের মুনাফা, সরকারী অর্থ প্রেরণ প্রভৃতি।

II. পুঁজির ব্যালান্স (Capital balance) :

দেশ হইতে বিদেশে পুঁজির রপ্তানি বা বিদেশ হইতে দেশে পুঁজির আমদানি অথবা স্বর্ণের আগমন ও বহির্গমন।

পুঁজির হিসাবকে (Capital Account) দুইভাগে বিভক্ত করা যায়: (ক) দীর্ঘকালীন পুঁজির হিসাব, (খ) স্বল্পকালীন পুঁজির হিসাব। স্থায়ী বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে দেশ হইতে যে মূলধন বিদেশে চলিয়া যায় বা বিদেশ হইতে দেশে আসে তাহাদের এই খাতে হিসাব করা হয়। ইহাকে বলা যায় লেনদেন ব্যালান্সের বিনিয়োগ-ক্ষেত্র (Investment sector), দীর্ঘকালের জন্য দেশীয় মূলধনের বিদেশে বিনিয়োগ বা দেশের অভ্যন্তরে বৈদেশিক মূলধনের বিনিয়োগ এই খাতে হিসাবের জন্য ধরা হয়। তাহা ছাড়া ফাট্‌কা নিয়োগের অভিপ্রায়ে (যেমন দেশে সুদের হার বাড়লে বা কমিলে) স্বল্পকালীন পুঁজি দেশ হইতে বাহির হইয়া যায় বা দেশের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাকে বলে ফাট্‌কা-নিয়োগের ক্ষেত্র (Speculative sector)। স্বল্পকালীন পুঁজির হিসাবে প্রথমেই ধরা হয় স্বর্ণের আগমন বা বহির্গমনের পরিমাণকে। ইহা ছাড়া বিদেশের ব্যাঙ্ক বা ব্যবসায়ীদের নিকট দেশীয় ব্যবসায়ীদের জমা বা পাওনাসমূহকে এবং দেশের ব্যাঙ্ক বা দেশীয় ব্যবসায়ীদের নিকট বিদেশী ব্যবসায়ীদের জমা বা পাওনাসমূহকে এই স্বল্পকালীন পুঁজির হিসাবে ধরা হয়।

বিনিয়োগ ও ফাটকা নিয়োগের উদ্দেশ্যে টাকার বৈদেশিক চাহিদা ও যোগান

লেনদেন-ব্যালান্সে সমতা ও ভারসাম্য (Equality and Equilibrium in the Balance of Payments) :

হিসাব-পদ্ধতি (accounting procedure) অনুযায়ী কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সের দেনা ও পাওনার দুইটি দিক সর্বদা সমান থাকিবে। নিছক হিসাবের ক্ষেত্রে দেনা পাওনার উভয় দিক নিশ্চয় সমান থাকে। দেশ হইতে প্রেরিত সকল অর্থ ইহার দেনা (debit)। যদি কোন দেশ অন্য দেশের তুলনায় অধিক দ্রব্য, শেয়ার ইত্যাদি বিক্রয় করে বা মাল বহন প্রভৃতি কার্যাদির দ্বারা অধিক আয় করে তাহা হইলে এই সকল মিলিয়া তাহার পাওনার দিক (credit) গঠিত হইল, ইহা সে অন্যের নিকট হইতে পাইবে। যদি এই মূল্যের স্বর্ণ বিদেশীরা দেশের মধ্যে পাঠাইয়া দেয়, তবে সেই লেনদেন

লেনদেন ব্যালান্সের দেনা পাওনার উভয় দিকই সর্বদা সমান

দেনার দিকে (debit side) লিখিয়া রাখা হইল (কারণ বিদেশ হইতে উহা পাওয়া যাইতেছে)। যদি স্বর্ণ পাঠাইয়া না দেয়, তাহা হইলে বিদেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীদের নিকট স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন পুঁজি হিসাবে ইহা রক্ষিত আছে। এমন ভাবেই হিসাব লিখিয়া রাখা হইল যেন অন্যকে ঋণ হিসাবে ইহা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ দেশের বৈদেশিক ঋণদানের পরিমাণ (foreign lending) বৃদ্ধি পাইয়াছে, লেনদেন ব্যালান্সে ইহাই ধরা পড়িবে। সুতরাং, লেনদেন ব্যালান্সে দেনা পাওনার উভয় দিক সর্বদা সমানই থাকিবে, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ বলা চলে।

রপ্তানি দ্বারাই আমদানির মূল্য পরিশোধ

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রপ্তানির দ্বারাই আমদানির মূল্য পরিশোধ করা হয় (Export pay for Imports)। কারণ, যে দ্রব্য আমদানি করা হইল উহার বিনিময়ে হয় দ্রব্য-রপ্তানি অথবা মূলধন-রপ্তানি করিয়া উহার মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করিলে তাহার মূল্য মিটানো হয়; দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর বা পুঁজির রপ্তানি করিয়া লেনদেন ব্যালান্সে উভয় দিকের সমতা হইতে ইহা বোঝা যায়।

সমতা ও ভারসাম্যে পার্থক্য: লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য এবং ভারসাম্য-বিহীনতা কাহাকে বলে

লেনদেন-ব্যালান্সের উভয় দিকে এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ সমতা নিছক যান্ত্রিক সমতামাত্র (mechanical equality); ইহাকে লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য (equilibrium) বলা উচিত নয়। ভারসাম্য বলিলে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আছে বা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় আছে এরূপ বোঝা যায়। কিন্তু লেনদেন ব্যালান্সে নিছক হিসাবগত সমতা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য অথবা দেশের আর্থিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলে না, দেশের ঘোর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও লেনদেন ব্যালান্সে তথাকথিত সমতা থাকিবেই। দীর্ঘকালের হিসাবে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের জন্য চাহিদা ও যোগান সমান আছে, প্রভূত পরিমাণ মূলধন দেশ হইতে রপ্তানি হয় না বা দেশে আমদানি হয় না, দেশীয় অর্থের বৈদেশিক মূল্য বা বৈদেশিক বিনিময়-হার (Rate of Foreign Exchange) মোটামুটি স্থায়ী ও বিশেষ উঠানামা হয় না—এইরূপ অবস্থাকেই লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য (Equilibrium in the balance of Payments) বলা হইয়া থাকে। যদি এইরূপ অবস্থা

না থাকে, অর্থাৎ দীর্ঘকাল যাবৎ দেশ হইতে পুঁজি বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকে বা বাহির হইতে দেশের মধ্যে আসিতে থাকে, বৈদেশিক বাণিজ্যহারে ঘন ঘন এবং প্রচুর পরিমাণে উঠানামা (fluctuations) ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে বলা হয় যে, লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যবিহীনতা (disequilibrium) সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং সমতা ও ভারসাম্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যবিহীনতা আসিতে পারে যদি (ক) দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ, অথবা (খ) স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পুঁজির আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। দ্রব্যাদি আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ পরিবর্তিত হয়, যদি (১) চাহিদার পরিবর্তন ঘটে, (২) যোগানের পরিবর্তন ঘটে, (৩) দ্রব্যসামগ্রীর সংখ্যাতে ও উৎকর্ষে পরিবর্তন ঘটে, (৪) দেশের বা বিদেশের উৎপাদনক্ষমতা বিধ্বস্ত হয় বা ভিন্নরূপ হইয়া যায় (যেমন যুদ্ধের ফলে), (৫) জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে (যাহাতে দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়ে বা কমে), (৬) ঋণ গ্রহণ, ঋণদান, ক্ষতিপূরণ দান বা গ্রহণ করা হয়, এবং (৭) বিনিময়-হাবে পরিবর্তনের দরুন আমদানি-রপ্তানির দামে পরিবর্তন হইযা উহাদেব চাহিদাব পরিবর্তন ঘটে। পুঁজির আমদানি ও রপ্তানিতে পরিবর্তন আসে যদি (১) নূতন বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে, (২) ঋণ পরিশোধ বা সুদ প্রদান শুরু হয়, এবং মুনাফা বা নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ফাট্‌কাদারী লেনদেনে পরিবর্তন আসে।

ভারসাম্য সাধনের পদ্ধতি (Theories of Balancing Process):

কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভাবসাম্যহীনতা আসিলে বিভিন্ন শক্তির ক্রিযা ও প্রতিক্রিয়ার ফলে লেনদেন ব্যালান্সে স্বযংক্রিয়ভাবে পুনরায় ভারসাম্য ফিরিযা আসে। ভারসাম্যে পৌছিবার স্বযংক্রিয পদ্ধতি (self equilibrating mechanism) সম্বন্ধে ক্লাসিকাল ও আধুনিক এই দুই প্রকার মতামত প্রচলিত আছে

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণের অভিমতে আর্থিক পদ্ধতির মাধ্যমেই (monetary mechanism.) লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। যদি কোন একটি দেশে রপ্তানির মূল্য উহার আমদানির মূল্য হইতে অধিক হয়, তবে সেই দেশ অপর দেশ হইতে স্বর্ণ পাইবে এবং

ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব : স্বর্ণের গতিবিধি ও দামস্তরে পরিবর্তনের দ্বারা

যে-দেশের লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল, সে স্বর্ণ পাঠাইয়া দিবে। অনুকূল লেনদেন ব্যালান্স থাকায় দরুণ দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিবে, ফলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, দামস্তরও বাড়িয়া যাইবে। অপরদিকে, প্রতিকূল লেনদেন ব্যালান্সের দরুন অপর দেশটি হইতে স্বর্ণ চলিয়া আসিবে, এবং ফলে উহার অর্থের পরিমাণ কমিয়া যাইবে, দামস্তরও কমিয়া আসিবে। কালক্রমে, যে-দেশের আয়স্তর বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার রপ্তানি কমিবে এবং অপর দেশের দামস্তর কমিয়া যাওয়ায় সেই দেশ হইতেই আমদানি বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে সমতা সাধিত হইবে। যে দেশের দামস্তর কমিয়া গিয়াছে সেই দেশ অধিক রপ্তানি করিতে পারিবে এবং বিদেশী দামস্তর অধিক থাকায় উহার আমদানি কমিয়া যাইবে; আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে সমতা ফিরিয়া আসিবে, লেনদেন ব্যালান্সের প্রতিকূলতা থাকিবে না। এইরূপে দুই দেশের লেনদেন ব্যালান্সেই পুনরায় ভারসাম্যাবস্থায় পৌঁছিবে। স্বর্ণ যাতায়াতের ফলে দামস্তরে উত্থান পতনের মাধ্যমে লেনদেন ব্যালান্সে সমতাসাধনের এই ক্লাসিকাল তত্ত্বের নাম হইল 'স্বর্ণের গতিবিধি সংক্রান্ত রিকার্ডীয় তত্ত্ব' (Ricardian theory of Gold Movements)।

ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের সমালোচনা

আধুনিককালে ভারসাম্য-বিধানের এই ক্লাসিকাল স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে যে, এই তত্ত্ব অর্থ-মূল্য সম্পর্কীয় পরিমাণতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ ইহা ধরিয়া লয় যে, স্বর্ণের পরিমাণের পরিবর্তন দেশে অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আনিবেই, এবং অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আসিলে দামস্তরও পরিবর্তিত হইবে (অর্থাৎ সমাজে পূর্ণকর্মনিয়োগ স্তর ধরিয়া লওয়া হইতেছে)।* কিন্তু পৃথিবীতে স্বর্ণমান প্রচলিত নাই, আর অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন হইলেই দেশের দামস্তর পরিবর্তিত হয় না; কারণ সাধারণত দেশগুলিতে অপূর্ণ কর্মসংস্থান রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সুদের হার কমিয়া বিনিয়োগ, কর্মনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়িতে পারে; প্রথমেই দামস্তরে বৃদ্ধি হয় না।

* "The classical theory contains an explicit acceptance of the quantity theory of money as well as an implied assumption that output and employment are unaffected by international monetary disturbances...The Keynesian revolution cast doubt upon both of these crucial assumptions." Metzler, *A survey of contemporary Economics*, P 212.

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে স্বর্ণের যাতায়াত এবং দামস্তরে পরিবর্তন ছাড়াও লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য ফিরিয়া আসিতে পারে। মনে করা যাউক, A দেশের লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল হইয়াছে এবং B দেশের লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল অবস্থায় আছে। A দেশ হইতে অধিক রপ্তানি হওয়ার ফলে সেই দেশে রপ্তানি-দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, কর্মসংস্থান ও আয়স্তরও বর্ধিত হইয়াছে। অপরদিকে B দেশে অধিক পরিমাণ আমদানি হওয়ায় এবং কম রপ্তানি হওয়ায় আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও আয়স্তর কমিয়া গিয়াছে। A দেশে তাহার আয়স্তর বৃদ্ধি হওয়ায় আমদানি-প্রবণতা (Propensity to import) বাড়িয়া গিয়াছে, ফলে A দেশে আমদানির পরিমাণ বাড়িবে। অপরপক্ষে, B দেশে আয়স্তর কমিয়া যাওয়ায় A দেশ হইতে আমদানি কমিবে। এইরূপে উভয়দেশে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণে পরিবর্তন হইয়া উভয়ের সমতা-সাধন হইবে, লেনদেন ব্যালান্সে ভার-সাম্যাবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

আধুনিক তত্ত্ব : আয়-স্তরে ও কর্মসংস্থান স্তরে পরিবর্তনের দ্বারা

ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব ও আধুনিক তত্ত্বের মিল হইল, উভয়েই বলিতেছেন ভারসাম্যাবস্থায় ফিরিয়া আসিবার জন্য স্বয়ংক্রিয় ধরণের পদ্ধতি আছে। কিন্তু মিল অপেক্ষা ইহাদের পার্থক্যই গভীর। ক্লাসিক্যাল মতে দামস্তরে পরিবর্তনের দ্বারা সমতাসাধন হয়, কিন্তু আধুনিক মতে আয়স্তরে পরিবর্তনের মাধ্যমেই ভার-সাম্যের পুনরুদ্ধার ঘটে।

দুই তত্ত্বের মিল ও পার্থক্য

মনে রাখা দরকার যে, ফাটকাদারি মূলধনের আমদানি বা রপ্তানির ফলে ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটিলে এই পদ্ধতিতে ভারসাম্যে পুনরাগমন করা চলে না, কারণ ফাটকাদারি পুঁজির লেনদেন উভয় দেশের আয়স্তরকে পরিবর্তিত করিয়া আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না।*

* "Like the classical theory of the balance of payments, the theory which has emerged in the last ten years envisages a more or less automatic balancing mechanism. Unlike the classical theory, however, the new explanation normally accounts for only a part of the adjustment and thus constitutes a theory of disequilibrium as well as a theory of equilibrium. Moreover, the cumulative movement of income at home and abroad which is the essence of modern theory will not occur unless the disturbing influence affects the circular flow of income as well as the balance of payments." Metzler, P 220.

লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়া না-ও আসিতে পারে। এরূপ ঘটিতে পারে যে, আয়স্তরে পরিবর্তনের পরিমাণ এত বেশি হইল না যাহাতে আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে পুনরায় সমতা ফিরিয়া আসিল। এরূপ অবস্থায় যদি ভারসাম্য-বিহীনতা (ধরা যাউক, প্রতিকূলতা) চলিতেই থাকে তাহা হইলে এইরূপ প্রতিকূলতা দূর করিয়া সাম্যাবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যাইতে পারে :

স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি বিফল হইলে কি করা হয়

(ক) **রপ্তানি বৃদ্ধি :** উন্নত ধরনের বিক্রয় ব্যবস্থার সাহায্যে বা আভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচের দ্বারা রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করা।

(খ) **আমদানি হ্রাস :** প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (direct controls) দ্বারা আমদানির পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করা।

(গ) **অর্থের বহির্মূল্য হ্রাস :** সরকারীভাবে বিদেশী অর্থের হিসাবে দেশীয় অর্থের বিনিময় মূল্য কমাইয়া দেওয়া। ইহার ফলে দেশীয় দ্রব্যাদি বিদেশের বাজারে সস্তা হইবে এবং বিদেশী দ্রব্যের দাম দেশের বাজারে বৃদ্ধি পাইবে। ফলে, রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস একই সঙ্গে ঘটিবে, লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে।

বৈদেশিক বিনিময়-হার কিরূপে নিরূপিত হয় (How the Rate of Foreign Exchange is Determined ?)

দুই দেশের অর্থ যে-হারে পরস্পরের সহিত বিনিময় হয়, তাহাকে উভয় দেশের বৈদেশিক বিনিময়-হার (Rate of Foreign Exchange) বলে। কোন দেশের অর্থের বিনিময়ে অপর দেশের অর্থ যে পরিমাণ পাওয়া যায়, অর্থাৎ অপর দেশের অর্থের হিসাবে নিজ-দেশের অর্থের মূল্য—ইহাকেই বৈদেশিক বিনিময়-হার বলে। ইহাকে অর্থের বহির্মূল্যও (External Value) বলা চলে।*

বৈদেশিক বিনিময়হার কাহাকে বলে

কোন দেশের অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার কোন নির্দিষ্ট ও স্থির অনুপাত নহে, প্রায় সর্বদাই ইহার উঠা-নামা ঘটে। যে-ভাবে এবং যে-শক্তিসমূহের দ্বারা বৈদেশিক বিনিময়-হার নিরূপিত হয় তাহাদের দুইটি পৃথক অবস্থা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন : (১) যখন উভয় দেশের মধ্যে স্বর্ণমান

* যেমন ভারতের অর্থ ১ টাকার বিনিময়ে ব্রিটেনের অর্থ ১ শিঃ ৬ পেঃ পাওয়া যায়।

প্রচলিত আছে, এবং (২) যখন উভয় দেশে বা অন্তত একটি দেশে অরূপান্তরনীয় কাগজী অর্থ (Inconvertible Paper Currency) প্রচলিত।

(১) স্বর্ণমান প্রচলিত থাকাকালীন বিনিময়-হার নিরূপণ :

যদি স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে তাহা হইলে দেশে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকিতে পারে অথবা দেশীয় কাগজের টাকা ও স্বর্ণের মধ্যে বিনিময়ের অনুপাত নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে। এইরূপ অবস্থায়, উভয় দেশের অর্থের মধ্যে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় নিজ নিজ অর্থের সহিত স্বর্ণের পরিমাণগত সম্পর্কের দ্বারা। ধরা যাক্ A দেশের 1 মুদ্রার মধ্যে যে-পরিমাণ স্বর্ণ আছে সেই সমপরিমাণ স্বর্ণ B দেশের তিনটি মুদ্রার মধ্যে রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় স্বর্ণের হিসাবে 1 A মুদ্রা 3 B মুদ্রার সমান মূল্যের; সুতরাং 1 A মুদ্রার বিনিময়ে 3 B মুদ্রা পাওয়া যাইবে (1A = 3B); ইহাই পরস্পরের বিনিময়-হার। ইহাকে বলা হয় মুদ্রণজনিত বিনিময়ের সমহার (Mint Par of Exchange)। স্বাভাবিক অবস্থায়, লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য বজায় থাকিলে, উভয় দেশের মধ্যে এই হারই নির্ধারিত থাকিবে এবং এই হারেই আমদানি ও রপ্তানি হইবে। কিন্তু লেনদেন-ব্যালান্সে ভারসমতা নষ্ট হইলে উভয় দেশের বৈদেশিক বিনিময়-হারেও উঠানামা (Fluctuation) হইবে; তবে এই উঠানামার নির্দিষ্ট সীমা থাকে, ভারসাম্যে বিচ্যুতির পরিমাণ অনুযায়ী সেই নির্দিষ্ট-সীমার মধ্যে বিনিময়-হার নির্ধারিত থাকিবে। বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানামার সীমা (Limit) বা পরিধি নির্ভর করে এক দেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার ব্যয়ের উপর।

স্বর্ণমান ব্যবস্থায়

বৈদেশিক লেনদেন খাতে কোন দেশের আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি হইলে বিনিময় হার তাহার অনুকূলে যাইবে, রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হইতে থাকিলে বিনিময়-হার তাহার প্রতিকূলে আসিবে। প্রথমক্ষেত্রে যদি লেনদেন-ব্যালান্স A এর অনুকূলে হয় তাহা হইলে A এর 1 মুদ্রা B দেশের 3 মুদ্রা + স্বর্ণ প্রেরণের ব্যয়ের সমান হইবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, লেনদেন ব্যালান্স A এর প্রতিকূল হইলে বিনিময়-হারও তাহার প্রতিকূলে যাইবে, অর্থাৎ 1 A মুদ্রা = 3 B মুদ্রা − স্বর্ণ প্রেরণের ব্যয়। বিনিময়-হারের উঠানামা এই দুই হারকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে, B-এর ব্যবসায়ীরা

বিনিময়-হারে বিচ্যুতির সীমা : উচ্চ ও নিম্ন স্বর্ণবিন্দু

উহা হইতে অধিক মূল্য দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে A মুদ্রা কিনিবে না, ব্যাঙ্ক উহা অপেক্ষা অধিক দাম চাহিলে স্বর্ণ ক্রয় করিয়া A-এর ব্যবসায়ীদের নিকট পাঠাইয়া দিবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, A এর ব্যবসায়ীরা ওই দামেই B মুদ্রা কিনিতে বাধ্য হইবে, স্বর্ণ ক্রয় করা ও প্রেরণ করার ব্যয় তাহাদের বহন করিতেই হইবে। বিনিময় হারের উঠানামার এই দুই সীমাকে উচ্চ স্বর্ণবিন্দু (Upper gold point) এবং নিম্ন স্বর্ণবিন্দু (Lower gold point) বলে।

(২) অরূপান্তরনীয় কাগজী অর্থ থাকাকালীন বিনিময়-হার নির্ধারণ :

স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে ধাতুবিন্দুগুলির (Specie points) দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে বিনিময়-হার উঠানামা করিতে পারে না। কিন্তু যখন অরূপান্তরনীয় কাগজী অর্থ প্রচলিত থাকে তখন বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানামার কোন সীমা-পরিসীমা নাই, ইহার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। সেইরূপ অবস্থায় কি ভাবে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় তাহার সম্বন্ধে দুইটি প্রচলিত তত্ত্ব আছে : (ক) ক্রয়শক্তির সমতা তত্ত্ব (Purchasing Power Parity theory), এবং (খ) আধুনিক কালের চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (Demand and Supply theory)।

অরূপান্তরনীয় কাগজী অর্থব্যবস্থায়

(ক) ক্রয় শক্তির সমতা তত্ত্ব : সুইডেনের ধনবিজ্ঞানী গুস্তাভ্ ক্যাসেল (Gustav Cassel) বৈদেশিক বিনিময়-হার নির্ধারণ সম্পর্কে ক্রয়-শক্তির সমতা তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, সাধারণ অবস্থায়, উভয় দেশের অর্থের বিনিময়-হার নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরে অর্থের ক্রয়শক্তির সম্পর্ক প্রকাশ করে। নিজের দেশে অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির এবং অন্য দেশে অপর অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তি—এই উভয় দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির সমতার বিন্দুতেই ইহাদের মধ্যে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয়। যেমন, ইংলণ্ডে কিছু পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী যদি 1 পাউণ্ডে পাওয়া যায় এবং সেই একই ধরনের সমপরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর দাম (similar assortment) যদি ভারতের অর্থে 15 টাকা হয়, তাহা হইলে 1 পাউণ্ডের এবং 15 টাকার ক্রয়-ক্ষমতা সমান। সুতরাং বিনিময়-হার হইবে 1 পাউণ্ড = 15 টাকা।

দুই দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ মূল্যের সমতা

এই তত্ত্বটিকে আর একভাবে বলা চলে। কোন একটি দেশের মধ্যে

অর্থের ক্রয়শক্তি আভ্যন্তরীণ দামস্তরের বিপরীত দিকে উঠানামা করে, তাহা আমরা জানি। সুতরাং দুই দেশের অর্থের ক্রয়শক্তির অনুপাত উহাদের দামস্তরের অনুপাতের বিপরীত হইবে। অর্থাৎ,

$$\frac{1 \text{ পাঃ } (£)}{1 \text{ টাঃ } (Rs.)} = \frac{£\text{-এর ক্রয়শক্তি}}{Rs.\text{-এর ক্রয়শক্তি}} = \frac{\text{ভারতের দামস্তর}}{\text{ইংলণ্ডের দামস্তর}}$$

নিজ দেশে অর্থের আভ্যন্তরীণ-ক্রয়শক্তির পরিবর্তন ঘটিলে বৈদেশিক বিনিময়-হারেরও পরিবর্তন ঘটিবে ; আভ্যন্তরীণ মূল্য কমিলে বহির্মূল্যও কমিবে, আভ্যন্তরীণ মূল্য বাড়িলে বহির্মূল্যও বাড়িবে। সুতরাং ক্রয়শক্তির সমতার বিন্দু স্থিরবিন্দু নহে, ইহা চলনশীল বা পরিবর্তনশীল বিন্দু, দেশের অভ্যন্তরে দামস্তরের পরিবর্তন অনুযায়ী ইহা পরিবর্তিত হয়। ভারসাম্যের বিনিময়-হারকে উভয় দেশের দামস্তরে পরিবর্তনের হার দিয়া গুণ করিলে এই পরিবর্তিত বিনিময়-হার পাওয়া যায়। Cassel বলিতেছেন যে "it is only when we know the exchange rate which represents a certain equilibrium that we can calculate the rate which represents the same equilibrium at an altered value of the monetary units of the two countries."

বিনিময়হারে উঠানামা ও তাহার কারণ

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝা যাইতে পারে। ভারত ও ইংলণ্ডের অর্থের মধ্যে 1 পাঃ = 15 টাকা বিনিময়-হার স্থির ছিল। কিছুদিন পরে উভয় দেশেই দামস্তরে পরিবর্তন হইল, সূচকসংখ্যা অনুযায়ী ইংলণ্ডের দামস্তর হইল 300 এবং ভারতের দামস্তর হইল 200। এরূপ অবস্থায় নূতন বিনিময়-হার হইবে 1 পাঃ = টাকা $\frac{15 \times 200}{300} = 10$, অর্থাৎ 1 পাঃ = 10 টাকা। ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ দামস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় পাউণ্ডের বহির্মূল্যও কমিয়া গিয়াছে, পাউণ্ডের বিনিময়ে পূর্বের তুলনায় কম ভারতীয় টাকা পাওয়া যাইতেছে।

ক্যাসেল বর্ণিত এই ক্রয়শক্তির সমতাতত্ত্ব আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কারণের জন্য গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। (ক) যে সূচক-সংখ্যার সাহায্যে দেশীয় অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় করা হয়, সেই সূচক সংখ্যার নির্মাণকালে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে এইরূপ সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী যদি হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে এই তত্ত্ব নির্ভুল থাকিতে পারে না। কারণ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের দ্রব্যসামগ্রীর দামে পরিবর্তন লেনদেন ব্যালান্সে প্রভাব বিস্তার করে না, বিদেশী বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদাকেও

সমালোচনা

প্রভাবিত করে না। আর, শুধু যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে এইরূপ দ্রব্যের সাহায্যে সূচক-সংখ্যা গঠিত হয়, তবে এই তত্ত্ব নিছক স্বতঃসিদ্ধ, কারণ ইহাদের দামস্তর সকল দেশে স্বভাবতই সমান। (খ) মূলধনের আগমন বা নির্গমনের ফলে বৈদেশিক বিনিময়-হারের পরিবর্তন এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না। (গ) বিদেশে রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে বা কমিলে, অথবা দেশে আমদানি দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে বা কমিলে (দেশে ও বিদেশে উৎপাদন ব্যয়ে পরিবর্তন হইলে) আভ্যন্তরীণ দামস্তরের পরিবর্তন না হইয়াও বিনিময়-হারে পরিবর্তন আসিতে পারে। Metzler তাই বলেন যে, "The inability of the Parity theory to allow for shift in international demand for capital movements, for technological changes, or for any other events altering the terms of trade soon made it apparent that the theory was not a *general* explanation of exchange-rates, but was applicable only under *special* conditions."

সুতরাং উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, ক্রয়শক্তির সমতাতত্ত্ব কেবল মাত্র বিশেষ অবস্থাতেই সত্য হইতে পারে; যখন কোন মূলধনের বা ঋণের লেনদেন হইতেছে না অথবা উৎপাদনের যন্ত্রকৌশলগত অবস্থায় বা বাণিজ্য-হারে কোনরূপ পরিবর্তন আসিতেছে না। বিনিময়-হারে যে-সকল শক্তি পরিবর্তন আনে ক্রয়শক্তির পরিবর্তন তাহার মধ্যে একটি মাত্র। তবুও আমরা এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত গভীর সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারি না। দীর্ঘকালে বিভিন্ন দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তি বিনিময়-হারকে নিশ্চয় কিছুটা প্রভাবিত করে। বিনিময়-হার নির্ধারণের তত্ত্ব হিসাবে আধুনিক কালে ইহাকে আর গ্রহণ করা হয় না বটে, কিন্তু কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সের উপর সেই দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয় শক্তিরও প্রভাব আছে, এই তত্ত্বের সাহায্যে এই সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

এই তত্ত্বের আংশিক সত্যতা

(খ) আধুনিক তত্ত্ব : কি ভাবে বিনিময় হার নির্ধারিত হয় ঃ

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ বিনিময়-হারকে দাম বলিয়া মনে করেন, বৈদেশিক অর্থের হিসাবে প্রকাশিত নিজ দেশের অর্থের দাম। সকল দ্রব্য-সামগ্রীর দাম যেরূপ উহার যোগান ও চাহিদার দ্বারা ভারসাম্যের বিন্দুতে নিরূপিত হয়, সেইরূপ অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার থাকিলে অর্থের বহির্মূল্যও বৈদেশিক বাজারে উহার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

বৈদেশিক বাজারে অর্থের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা

বৈদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের চাহিদা নির্ভর করে রপ্তানির মূল্যের উপর এবং বিদেশীরা বিভিন্ন কারণে কি-পরিমাণ অর্থ সেই দেশে পাঠাইতে চাহে তাহার উপর (অর্থাৎ লেনদেন-ব্যালান্সের পাওনার দিকের উপর)। বৈদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের যোগান নির্ভর করে আমদানির মূল্যের উপর এবং দেশ হইতে কি-পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতে চাহে তাহার উপর (অর্থাৎ লেনদেন-ব্যালান্সের দেনার দিকের উপর)।

বৈদেশিক বাজারে অর্থের চাহিদা ও যোগান কোথা হইতে উদ্ভূত হয়

বৈদেশিক বাজারে অর্থের চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ যদি লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল হয় তাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা অধিক পরিমাণে দেশীয় অর্থ কিনিতে চাহিবে. বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের বিক্রেতাগণ অর্থের দাম বাড়াইয়া দিবে, অধিক বৈদেশিক অর্থ দিয়া দেশীয় অর্থ ক্রয় করিতে হইবে, অথাৎ বৈদেশিক বাজারে বিনিময় হার দেশের অনুকূলে আসিবে। অপরপক্ষে, বৈদেশিক বাজারে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে, অর্থাৎ যদি লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীয়া অধিক পরিমাণে দেশীয় অর্থের চাহিদা করিবে না, বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের বিক্রেতাগণ অর্থের দাম কমাইয়া দিবে, কম বৈদেশিক অর্থ দিয়া দেশীয় অর্থের ক্রয় করিবে, বৈদেশিক বিনিময়-হারও দেশের প্রতিকূলে যাইবে।

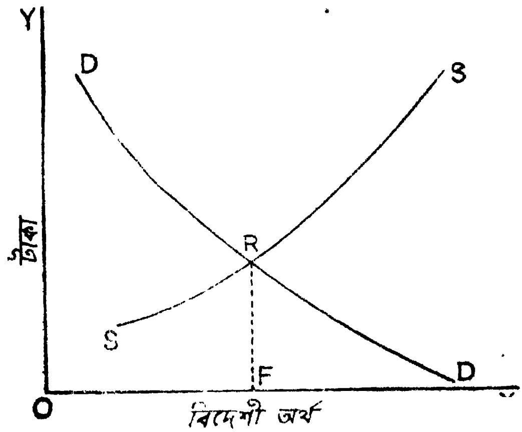
চাহিদা বা যোগানে পরিবর্তন বিনিময়হারকে পরিবর্তিত করে

সুতরাং লেনদেন-ব্যালান্সের উঠানামার উপরই বিনিময়ের হারের উঠানামা নির্ভর করে ; লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য থাকিলে বিনিময়-হারেও ভারসাম্য থাকে, অর্থাৎ লেনদেন ব্যালান্সের উপরই বিনিময়-হার নির্ভর করে। লেনদেন-ব্যালান্স গঠনকারী বিষয়সমূহ বিনিময়-হার নির্ধারণ করে। লেনদেন-ব্যালান্স গঠিত হয়, (ক) আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ এবং (খ) মূলধনের গমনাগমন বা বিদেশে ঋণদানের পরিমাণের (Foreign lending) দ্বারা।

লেনদেন ব্যালান্স গঠনকারী বিষয়সমূহই বিনিময়-হার নির্ধারণ করে

এই তত্ত্বটিকে আমরা একটি রেখা-চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। বিদেশী অর্থের চাহিদা-রেখা (DD) ডাহিনে নিচের দিকে নামিতেছে। ইহার কারণ হইল, যখন টাকার হিসাবে বিদেশী অর্থের দাম কমে তখন উহার

চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বিদেশী অর্থের দাম কমিলে বিদেশী দ্রব্য আমাদের দেশে সস্তা হয়, উহাদের চাহিদা বা আমদানি বাড়ে, তাই বিদেশী অর্থের চাহিদা



বাড়ে। অপরপক্ষে, বিদেশী অর্থের যোগান-রেখা (SS) উপর দিকে উঠার পথে ডান দিকে হেলিয়া থাকে। ইহার কারণ হইল বিদেশী অর্থের দাম বাড়িলে উহার যোগান বৃদ্ধি পায়। বিদেশী অর্থের দাম বাড়িলে দেশীয় দ্রব্য বিদেশের বাজারে সস্তা হয়, ফলে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বাড়ে, বিদেশী অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়। DD ও SS রেখা R বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। এই বিন্দুতে বিনিময়-হার নির্ধারণ হইতেছে RF : OF, অর্থাৎ RF টাকার বিনিময়ে OF বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইতেছে। এই বিনিময়-হার বজায় থাকিলে বিদেশের বাজারে টাকার যোগান ও চাহিদা, অথবা দেশের মধ্যে বিদেশী অর্থের যোগান ও চাহিদা সমান হয়।

আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ বা DD ও SS রেখার আকৃতি নির্ভর করে চারিটি বিষয়ের স্থিতিস্থাপকতার উপর: (ক) দেশীয় রপ্তানির জন্য বৈদেশিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, (খ) নিজ দেশের রপ্তানির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, (গ) বিদেশী আমদানির জন্য আমাদের দেশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, এবং (ঘ) বিদেশী আমদানি দ্রব্যগুলির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা। এই সকল প্রভাবসমূহকে একত্রে বলা হয় "বাণিজ্যাবস্থা" (Trade Conditions)। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত

ভাবে চলিতে পারিলে দেশীয় টাকার ও বিদেশী অর্থের যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে, প্রতি মুহূর্তে বিনিময়-হারে এই ভারসাম্য স্থাপিত হইতেছে। আবার দেশীয় ও বিদেশী অর্থের যোগান ও চাহিদায় পরিবর্তন আসিলে এই ভারসাম্যের বিনিময়-হারও পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। মিসেস্ রবিন্‌সনের ভাষায় বলিতে গেলে "Any change in the conditions of demand or of supply reflects itself in a change in the exchange-rate and at the ruling rate the balance of payments balances from day to day or from moment to moment."

আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ কিসের উপর নির্ভর করে

বিদেশী অর্থ বা দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদা কেবলমাত্র দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি হইতেই দেখা দেয় না, বৈদেশিক ঋণদানের পরিমাণের উপরও ইহা নির্ভর করে। আবার বৈদেশিক ঋণদান (Foreign lending) তিন প্রকার প্রভাবের দ্বারা নির্ধারিত হয়ঃ (ক) শেয়ার বাজারের প্রভাবসমূহ (Stock Exchange Influences): আন্তর্জাতিক ঋণদান, সুদ প্রদান, ঋণপরিশোধ, দেশীয় লোক কর্তৃক বৈদেশিক শেয়ারের ক্রয়বিক্রয় বা বিদেশী কর্তৃক দেশীয় শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি। (খ) ব্যাঙ্কিং প্রভাবসমূহ (Banking Influences), বিনিময়-বিল, ব্যাঙ্কের ড্রাফ্‌ট্ ক্রয়-বিক্রয়, ভ্রমণকারীদের অর্থ প্রেরণ বা আনয়ন প্রভৃতি। (গ) কারেন্সী অবস্থা (Currency Conditions): দেশের মুদ্রাব্যবস্থার উপর বিশ্বাস ও আস্থা থাকিলে বিদেশ হইতে দেশে অর্থ আসে, মূলধনের আগমন (Inflow) ঘটে। অপর পক্ষে, মুদ্রাব্যবস্থার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিলে দেশ হইতে অর্থ বাহির হইয়া যায়, মূলধনের বহির্গমন (out flow) ঘটে।

বৈদেশিক ঋণদান কিসের উপর নির্ভর করে

লেনদেন ব্যালান্স গঠনকারী এই সকল বিষয়সমূহের দ্বারা বৈদেশিক বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় এবং উহাদের পরিবর্তনের ফলে লেনদেন ব্যালান্সে পরিবর্তন ঘটে, বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদার পরিবর্তন আসে, বিনিময়-হারে উঠানামা (fluctuations) ঘটিয়া থাকে।

বিনিময়-হারে উঠানামা

ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার (Equilibrium Rate of Foreign Exchange) :

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় মুদ্রণজনিত বিনিময়ের সমহার (Mint Par of Exchage) অনুযায়ী প্রত্যেক দেশের বিনিময়-হার স্থির হয় ; এবং স্বর্ণ-প্রেরণের ব্যয় পর্যন্ত এই হারের উপরে ও নীচে বিনিময়-হার উঠানামা করিতে পারে। সুতরাং, স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে মুদ্রণজনিত বিনিময়ের সমহারই উভয় দেশের মধ্যে ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়হার।

স্বর্ণমান ব্যবস্থায়

কাগজীমান প্রচলিত থাকিলে, ক্রয়ক্ষমতার সমতা-তত্ত্ব গ্রহণ করিলে, উভয় দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতই ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে বিনিময়-হার স্থির থাকে না ; আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন বিনিময়-হারকে নির্ধারণ করে না ; লেনদেন ব্যালান্সের দেনা ও পাওনার উপর, অর্থাৎ বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদার দ্বারা বিনিময়-হার স্থির হয়।

কাগজীমান ব্যবস্থায় ক্রয়ক্ষমতার তত্ত্বানুযায়ী

আধুনিক লেনদেন ব্যালান্সের তত্ত্ব (Balance of Payments theory) অনুযায়ী, কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিনিময়-হার এইরূপ হইবে যাহাতে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদা সমান থাকে। অর্থাৎ বিনিময়-হার স্থির থাকে যদি এই যোগান ও এই চাহিদা সমান থাকে। বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদা নির্ভর করে বাণিজ্য-ব্যালান্স (Balance of Trade) ও 'ঋণদান-ব্যালান্সের' উপর (Balance of Lending)। বাণিজ্য-ব্যালান্স নির্ভর করে যোগান বা চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণকারী চারি প্রকার স্থিতিস্থাপকতার উপর এবং ঋণদান-ব্যালান্স নির্ভর করে শেয়ার বাজারের প্রভাবসমূহ, ব্যাঙ্কের প্রভাবসমূহ ও কারেন্সীর অবস্থার উপর। যে বিনিময়-হার বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদাকে এমন ভাবে সমান রাখে যাহাতে লেনদেন ব্যালান্সে স্থায়িত্ব থাকে, ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতি-সাধনকারী প্রভাবসমূহের ক্রিয়া শুরু না হয়, সেই হারকেই ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার (Equilibrium Rate of Exchange) বলা চলে।

লেনদেন ব্যালান্স তত্ত্ব বা আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী

বাস্তবক্ষেত্রে, নীতিনির্ধারণ ও প্রযোগের ব্যাপারে, এই তত্ত্বগত ধারণা বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারে না। ইহার কারণ হইল যে, প্রচলিত বিনিময়-হারের দরুণ লেনদেন ব্যালান্স গঠনকারী বিষয়সমূহে (যেমন বিভিন্ন স্থিতি-স্থাপকতাগুলিতে) স্থায়িত্ব আছে কি না, অথবা কতখানি অস্থায়িত্ব (Instabilty) সৃষ্টি হইতেছে তাহা সঠিকভাবে পরিমাপ-যোগ্য নহে। তবুও মিশরের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালক রাগ্‌নার নার্কসে (Ragnar Nurkse) বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের ও কার্যক্ষেত্রে প্রযোগের উপযোগী সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভাব-সাম্যাবস্থার বিনিময়-হার হইল "সেই হার যাহা কিছুদিন ধরিয়া লেনদেন-ব্যালান্সকে ভারসাম্যাবস্থায় রাখে" ("that rate which, over a certain period of time, keeps the balance of payments in equilibrium")।

নার্কসের সংজ্ঞা

"কিছুদিন ধরিযা" বলিলে বুঝা যায যে খুব অল্প সময হিসাব করিলে চলিবে না, কারণ লেনদেন ব্যালান্সে সাময়িক উঠানামা ও বিচ্যুতি ঘটিবেই বা বাণিজ্যচক্রজনিত উঠানামাও স্বাভাবিক। এই সকল স্বল্পকালীন উঠানামা বা ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঠেকাইবার জন্য প্রত্যেক দেশই কোন না কোন বন্দোবস্ত রাখে, সাধারণত বৈদেশিক অর্থ মজুত করিয়া কোন কেন্দ্রীয় তহবিল—স্বর্ণ, বৈদেশিক মুদ্রা ও বিভিন্ন দেশ ঋণ পাইবার সুযোগ, সুবিধা ও ব্যবস্থা প্রভৃতি লইয়া এই কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হয়। লেনদেন ব্যালান্স স্থির থাকিলে বৈদেশিক অর্থের এই কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ থাকে, এই ভাণ্ডারে বৈদেশিক অর্থের পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং বলা চলে "যে হার বজায় থাকিলে কিছুদিনের মধ্যে দেশের বৈদেশিক অর্থভাণ্ডারে মজুতের পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটে না, তাহাই ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার।"

সংজ্ঞার ব্যাখ্যা

"লেনদেন ব্যালান্স" বলিলে এক্ষেত্রে দেনা-পাওনার সকল বিষয় ধরিলে চলিবে না, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বাদ দিয়া হিসাব করিতে হইবে। (ক) ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে ব্যয়িত বৈদেশিক অর্থ। (খ) মূলধনের স্বল্পকালীন আদানপ্রদান। এই স্বল্পকালীন মূলধন দুই প্রকৃতির: (১) ভারসাম্য আনয়নকারী ধরনের, যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কহার বাড়াইলে স্বল্পকালীন মূলধনের দেশে আগমন—যে-কোন মুহূর্তে

বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে বলিয়া ইহাদের প্রকৃতপক্ষে দেনার দিকেই ধরা উচিত। (২) ভারসাম্য বিচ্যুতিকারী ধরনের, যেমন মূলধনের বহির্গমন, "উত্তপ্ত অর্থের" আনাগোনা প্রভৃতি—ওই সকল অস্বাভাবিক বিষয়কে নিয়ন্ত্রণে আনাই উচিত।

"ভারসাম্যাবস্থায়" বলিলে এক্ষেত্রে বোঝা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাধা নিষেধ আরোপ না করিয়া দেনা ও পাওনার পরিমাণ সমান থাকা। আমদানি কমাইয়া বা দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া দেনাপাওনাকে সমান করা হইলে তাহাকে ভারসাম্য বলা চলে না।

মিসেস্ রবিনসন কি বলেন

মিসেস্ জোয়ান রবিনসন্ বলেন যে, কোন দেশের পক্ষে চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট কোন ভারসাম্যের বিনিময়-হার নাই। দেশীয় টাকার বা বিদেশী টাকার যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে সদা-সর্বদাই লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য থাকে; এই যোগান ও চাহিদায় কোনরূপ পরিবর্তন নিজেকে প্রকাশ করে বিনিময়-হারের পরিবর্তন আনিয়া। নির্দিষ্ট অবস্থা-কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন সুদের হারে ও কার্যকরী চাহিদার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভারসাম্যের বিনিময়-হার দেখা দেয়। এমন কি কোন বিনিময়-হার ভারসাম্যের অবস্থা সাময়িকভাবে বজায় না রাখিলে সুদের হারে উপযুক্ত পরিবর্তন আনিয়া বিনিয়োগ ও আয়স্তর বদলাইয়া ফেলিয়া সেই বিনিময়-হারকেই ভারসাম্যের হারে পরিণত করা চলে। সুতরাং, তাঁহার মতে "The notion of the equilibrium exchange rate is a chimera. The rate of exchange, the rate of interest, the level of effective demand and the level of money wages react upon each other like the balls in Marshall's bowl, and no one is determined unless all the rest are given."*

অগ্র-বিনিময় (Forward Exchange)

যখন কোন দেশের বিনিময়-হার সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট থাকে না (স্বর্ণমান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে), তখন ব্যবসায়-বাণিজ্যে ঝুঁকি আসিয়া পড়ে, কারণ বিনিময়-হারে অনিশ্চিত উঠানামার ফলে ব্যবসায়ীদের অপ্রত্যাশিত লাভ বা লোকসান

* Mrs. Joan Robinson. "The Foreign Exchanges", ***Readings in the theory of International Trade.***

ঘটিতে পারে। বিনিময়-হারে উত্থান-পতনজনিত লোকসানের ঝুঁকি এড়াইবার জন্য অনেক ব্যবসায়ী কিছুদিন পূর্বেই ভবিষ্যতে বৈদেশিক অর্থ ক্রয়ের জন্য চুক্তি করিয়া রাখিতে পারেন। যেমন ভারতবর্ষের মিঃ সেন ইংলণ্ডের মিঃ টমের নিকট হইতে 1000 পাউণ্ডের জিনিস ক্রয় করিয়াছেন, তিন মাস পরে এই দাম দিতে হইবে স্থির হইয়াছে। মিঃ সেন যদি মনে করেন, তিন মাস পরে বিনিময়-হার ভারতের প্রতিকূলে যাইবে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে প্রতি পাউণ্ড ক্রয় করিতে হইলে বর্তমানের তুলনায় বেশি টাকা দিতে হইবে, তাহা হইলে তিনি লোকসানের ঝুঁকি এড়াইবার জন্য বর্তমানেই হার নির্দিষ্ট করিয়া তিনমাস পরে পাউণ্ড ক্রয়ের জন্য ব্যাঙ্কের সহিত চুক্তি করিয়া রাখিতে পারেন।

বিনিময় হারে উঠানামার ঝুঁকি কমাইবার উদ্দেশ্যে

সুতরাং দেখা যায়, বৈদেশিক টাকার বাজারে কোন নির্দিষ্ট সময়ে দুই প্রকার বিনিময়-হার থাকে ; বর্তমান লেনদেনের জন্য তৎকালীন হার (Spot-rate) এবং ভবিষ্যৎ লেনদেনের জন্য অগ্রহার (Forward rate)। চুক্তির সময়ে এই তৎকালীন হারের হিসাবে অগ্রহার উল্লিখিত (quoted) হয়। অগ্রহার বাট্টাযুক্ত হইলে বোঝা যায় দেশীয় টাকার বদলে ভবিষ্যতে অধিক বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইবে, অগ্রহার প্রিমিয়ামযুক্ত হইলে বোঝা যায় যে, দেশীয় টাকার বদলে ভবিষ্যতে কম বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইবে।

অগ্রহার কাহাকে বলে

তৎকালীন হার ও অগ্রহারে কি-পরিমাণ পার্থক্য থাকিবে তাহা প্রধানত, দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : (১) দুই দেশে প্রচলিত সুদের হার এবং (২) ভবিষ্যৎ বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে বর্তমানের ধারণা। যদি দেশের তুলনায় বিদেশে সুদের হার অধিক থাকে তাহা হইলে অগ্রহার বাট্টাযুক্ত হইবে। অর্থাৎ, বর্তমানের তুলনায় দেশীয় টাকার বিনিময়ে অধিক বৈদেশিক অর্থ দিতে ব্যাঙ্ক রাজি হইবে। ভবিষ্যতে যে-পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ বিক্রয়ের জন্য সে চুক্তি করিয়াছে ব্যাঙ্ক নিজে ঝুঁকি এড়াইবার জন্য এখনই তাহা বিদেশে প্রেরণ করিবে ; বিদেশে সুদের হার বেশি থাকায় ওই প্রেরিত অর্থ হইতে তাহার যে অধিক আয় হইবে উহারই দরুণ সে বাট্টা দিতে পারিবে। অপর পক্ষে, যদি সুদের হার দেশে অধিক থাকে তাহা হইলে ব্যাঙ্ক এখনই বিদেশে অর্থ প্রেরণ

দুইটি বিষয়ের উপর ইহা নির্ভর করে

করিবে না, তাহাতে সুদ হইতে আয় কম হইবে। সুতরাং সে বর্তমানে প্রিমিয়াম সহকারে বৈদেশিক অর্থ বিক্রয় করিবে অর্থাৎ দেশীয় টাকার বিনিময়ে কম পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ দিতে চাহিবে। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে বৈদেশিক অর্থের দামে উঠানামার সম্ভাবনা, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা প্রভৃতির দ্বারাও অগ্রহার নির্ধারিত হইবে।

বহির্মূল্যপাতন (Devaluation):

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় দেশের লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্যে বিচ্যুতি ঘটিলে দেশের আভ্যন্তরীণ টাকার পরিমাণ সংকুচিত করিয়া দামস্তর, কর্মসংস্থান ও আয়ের পরিমাণ কমাইয়া রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাসের চেষ্টা করা হইত।

লেনদেন ব্যালান্স ভারসাম্যবিহীনতা দূর করিবার উদ্দেশ্য

কাগজীমান ব্যবস্থায় সেরূপ করা সম্ভব হইলেও আধুনিক কালে জাতীয় অর্থনীতির স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির জন্য দেশের উৎপাদন আয়স্তর, ও কর্মসংস্থান কমাইবার নীতি কোন আর্থিক কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে চাহেন না। বিভিন্ন উপায়ে যদি আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে আর্থিক কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার মূল্য কমাইয়া দেন।

বৈদেশিক মুদ্রার বা স্বর্ণের তুলনায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময়-মূল্য কমাইয়া দেওয়া হইলে তাহাকে বহির্মূল্যপাতন (Devaluation) বলে। যেমন, 1949

কাহাকে বলে

সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন ডলারের (এবং স্বর্ণের) তুলনায় ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য 1 টাকা = 30 সেন্ট হইতে 1 টাকা = 21 সেন্টে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বহির্মূল্যপাতনের ফল হইল, মূল্যহ্রাসকারী দেশের বাজারে বিদেশী আমদানি দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যাওয়া এবং বিদেশের বাজারে মূল্যহ্রাসকারী

কেন ভারসাম্য ফিরাইয়া আনে

দেশের রপ্তানি-দ্রব্যাদির দাম কমিয়া যাওয়া। যেমন 1949 সালের সেপ্টেম্বরের পূর্বে 1 টাকার বদলে আমেরিকা হইতে সেখানকার 30 সেন্ট দামের জিনিস পাওয়া যাইত, কিন্তু বহির্মূল্য-হ্রাসের ফলে 1 টাকার বদলে পূর্বের তুলনায় কম, মাত্র 21 সেন্ট দামের দ্রব্য পাওয়া যাইবে; পূর্বের পরিমাণ বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে বেশি টাকা দিতে হইবে অর্থাৎ আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িবে। অপরপক্ষে,

বহির্মূল্য পাতনের পূর্বে ভারতবর্ষের 1 টাকা দামের দ্রব্য আমেরিকাতে 30 সেণ্ট দামে বিক্রয় হইত, কিন্তু বহির্মূল্য-হ্রাসের পরে মাত্র 21 সেণ্ট দিয়াই আমেরিকার ব্যবসায়ীরা তাহা ক্রয় করিতে পারে। ফলে বিদেশের বাজারে বিদেশীরা তাহাদের অর্থে কম দাম দিয়া ভারতীয় রপ্তানি-দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে। সুতরাং বিদেশী বাজারে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশীয় বাজারে বিদেশ হইতে আমদানি কমিয়া যাইবে। লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যের বিচ্যুতি দূর হইয়া পুনরায় ভারসাম্য স্থাপনের ঝোঁক দেখা দিবে।

রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস

বহির্মূল্যপাতনের ফলে রপ্তানি কি পরিমাণ বাড়িবে ও আমদানি কি পরিমাণ কমিবে তাহা নির্ভর করে (১) মূল্যপাতনের পরিমাণ (degree) ও স্থিতিকালের (duration) উপর, এবং (২) আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যাদির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। যদি মূল্যপাতনের পরিমাণ নিতান্ত কম হয় অথবা বহির্মূল্য হ্রাসের স্থিতিকাল খুব কমই হয় তাহা হইলে আমদানি-রপ্তানির পরিমাণের উপর উহা কোন প্রভাব বিস্তার না করিতেও পারে। দ্বিতীয়ত, যদি বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের জন্য দেশের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তবে আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িলে দেশীয় চাহিদা উপযুক্ত পরিমাণে না কমার দরুন বৈদেশিক খাতে দেনার পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। ঠিক সেইরূপ যদি দেশের রপ্তানি দ্রব্যাদির জন্য বিদেশের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে রপ্তানি দ্রব্য বিদেশে সস্তা হওয়ার ফলেও চাহিদা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে না, ফলে বৈদেশিক খাতে পাওনা হ্রাস পাইবে। অপর পক্ষে, উভয় ক্ষেত্রেই চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে মূল্য-হ্রাসের ফলে অধিক পরিমাণে আমদানি কমিবে ও রপ্তানি বাড়িবে। সুতরাং বাহির্মূল্যপাতনের ফলে মোট প্রভাব কি দাঁড়াইবে সেই অনুযায়ী বহির্মূল্যপাতনের পরিমাণ বা হার স্থির করা হয়। 'ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতির পরিমাণ ও মূল্য হ্রাসের মোট ফলাফলের সম্ভাবনা—ইহাদের বিচার করিয়া বহির্মূল্যপাতনের পরিমাণ স্থির করা হইবে।

বহির্মূল্যপাতনের প্রভাব দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল

বহির্মূল্যপাতনের পরিমাণও দুইটি বিষয় অনুযায়ী স্থির করা হয়

রপ্তানি বাণিজ্যে অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিকতর সুবিধা পাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলেও বহির্মূল্যপাতন প্রকৃতপক্ষে বিপজ্জনক কৌশল। প্রথমত,

ইহার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-ব্যয় ও দামস্তর বাড়িয়া যাইতে পারে (মজুরির হার বৃদ্ধির দরুণ এবং আমদানি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির দরুণ)। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য দেশও এই পদ্ধতির প্রয়োগ করিতে পারে; পৃথিবীতে প্রতিযোগিতামূলক বহির্মূল্যপাতন ঘটিতে পারে। অথবা, এইরূপে রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে অন্যান্য দেশ সাধারণত উচ্চহারে আমদানি-শুল্ক বসাইয়া থাকে।

ইহার বিপদও কম নয়

কিন্তু এত বিপদ সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব (Internal economic stability) বজায় রাখিতে হইলে এবং লেনদেন-ব্যালান্সে ভার-সাম্যের বিচ্যুতি দূর করিতে হইলে এই নীতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না। তবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বহির্মূল্যপাতন নীতি প্রয়োগ করা উচিত। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (International Monetary Fund) এক ধারায় তাই বলা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র লেনদেন ব্যালান্সে কোন "মৌলিক বা কাঠামোগত ভারসাম্য-বিচ্যুতি" Fundamental or structural dis equilbrium) সংশোধন করিবার জন্যই বিনিময়-হারে এইরূপ পরিবর্তন করা চলিবে।*

প্রয়োজনীয়তা

বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (Exchange Control):

রপ্তানির পরিবর্তে দেশের পাওনা এবং আমদানির দরুণ দেশের দেনা—অর্থাৎ বৈদেশিক খাতে দেনা ও পাওনার পরিমাণ; বিনিময়-হার এবং দেনা-পাওনার দিক্ নির্ণয়, সবই যদি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত হয় তবে তাহাকে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বলে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ ভাগ হইতে আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ও স্বর্ণমান পরিত্যাগের দরুণ বৈদেশিক

বিনিময় নিয়ন্ত্রণ কাহাকে বলে

* "One special formula for secular dis-equilibrium can be found into which exchange depreciation fits not too badly. Suppose that in the developed country A. technological progress is taking place faster in all commodities than in country B. which is less developed, and that this is reflected in a progressive reduction of prices in A as compared with B...... The decline in A's prices relative to B's tends to produce an export surplus in A and import surplus in B. If the elasticities of demand and supply are high enough, the way to restore balance of payments equilibrium due to this secular cause may be exchange depreciation in B and appreciation in A." Kindleberger, *International Economics*. P. 520.

লেনদেনে যে বিশৃংখল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র বৈদেশিক লেনদেনের খাতে সকল দেনা পাওনাকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য (Objectives of exchange Control):

বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেমন, (১) বিনিময় হারে স্থায়িত্ব (Stability) রক্ষার জন্য, রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য, কৃত্রিম বিনিময় হার রক্ষা করিয়া টাকার বহির্মূল্য কমাইবার উদ্দেশ্যে অথবা, সস্তায় আমদানি করিবার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বিনিময় হার রক্ষা করিয়া টাকার বহির্মূল্য বৃদ্ধির জন্য; (২) মূলধন স্বর্ণ বা অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির রপ্তানিতে বাধা দিবার জন্য; (৩) অত্যাবশ্যক আমদানির যোগান নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে; (৪) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিজ দেশের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য; (৫) লেনদেন-ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষার জন্য; (৬) দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শিল্পের হাত হইতে সংরক্ষণের (Protection) উদ্দেশ্যে; (৭) রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে (যেমন চিলি); (৮) কোন বিশেষ দেশ বা দেশসমূহকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য; (৯) রাজনৈতিক কারণে কোন বিশেষ দেশের বিরুদ্ধে ব্যবসায় বাণিজ্যের মারফৎ আক্রমণ চালাইবার জন্য; (১০) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি; কাঁচামালের রপ্তানি বন্ধ করা, বা প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মূলধন সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (Methods of exchange control):

বিনিময় হার বৈদেশিক খাতে দেনা পাওনার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন রাষ্ট্র বহুবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে বিভিন্ন দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বহুপ্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান তিনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

(১) হস্তক্ষেপ পদ্ধতি (Intervention): রাষ্ট্র যদি মনে করে যে সাধারণ অবস্থায় চাহিদা ও যোগানের শক্তির দ্বারা বিনিময়-হার যেরূপ হইতে পারে তাহা অপেক্ষা ভিন্ন রূপ হওয়া দরকার, তবে সে নিজে সরাসরি বিনিময়-হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে (বহির্মূল্যে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটাইবার জন্য) হস্তক্ষেপ করিতে পারে। ইহার জন্য সে নিজস্ব তহবিল হইতে বৈদেশিক অর্থ বিক্রয় করিতে পারে বা বাজার হইতে উহা ক্রয়

হস্তক্ষেপ পদ্ধতির উপায়

করিয়া লইতেও পারে। হস্তক্ষেপের দ্বারা বিনিময় হার প্রভাবিত করার ক্ষমতা প্রধানত নির্ভর করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বৈদেশিক টাকা মজুত করিবার ক্ষমতার উপর। তাহা ছাড়া, হস্তক্ষেপের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ-নীতি সাময়িকভাবে চলিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালে স্থায়ীভাবে চলিতে পারে না।

(২) অবরোধ পদ্ধতি (Restriction) : সাধারণভাবে সকল বৈদেশিক অর্থসংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষমতা রাষ্ট্র বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা কোন কর্তৃপক্ষ নিজেদের হাতে তুলিয়া লয়। এই বিনিময়-নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নিজের লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে বাজারের অবাধ কাজকর্মের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে বা কেন্দ্রীয় ভাবে সকল বৈদেশিক অর্থসংক্রান্ত ব্যবসায় নিজেই পরিচালনা করে। অনেক রকমের নিয়মকানুন সৃষ্টি করিয়া এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করিয়া তুলিতে হয়। যেমন, (ক) বিদেশে টাকা পাঠাইতে হইলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইতে হইবে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন কারণেই মাত্র অর্থ প্রেরণ করা চলিবে, কোন্ দেশে পাঠাইতে পারিবে তাহাও রাষ্ট্র স্থির করিয়া দিবে। বিদেশ হইতে টাকা আসিলেও তাহা নির্দিষ্ট হারে আসিতে হইবে, সেই সকল বৈদেশিক টাকা কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে এইরূপ নিয়ম থাকিতে পারে। (খ) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ না করিয়া কোন আমদানি-রপ্তানি করা চলিবে না, এরূপ নিয়ম থাকিতে পারে। প্রত্যেক লাইসেন্সে আমদানি রপ্তানির পরিমাণ এবং কোন্ দেশ বা কোন্ মুদ্রাঞ্চল (currency area) হইতে আমদানি-রপ্তানি করা চলিবে তাহা নির্দিষ্ট থাকে। (গ) বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ জমান পদ্ধতি বা আটক-হিসাব পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে (freezing or blocking of accounts)। আটক-হিসাব পদ্ধতিতে বিদেশী পাওনাদারদের নামে রক্ষিত হিসাবে তাহাদের সকল পাওনা জমা দিবার জন্য দেশীয় দেনাদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়। বৈদেশিক পাওনাদারগণ এই অর্থকে নিজেদের দেশীয় মুদ্রায় ব্যয় করিতে পারেন না। আটককারী দেশ হইতেই দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে উহা ব্যয় করিতে হয় অর্থাৎ সেই দেশ হইতেই দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা চলে। অনেক সময়, (যেমন জার্মানীতে) ঐ আটক অর্থের দ্বারা বিদেশী পাওনাদার দেশ হইতে কি জিনিস এবং কত পরিমাণ ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। অনেক সময় বহু কম হারে, লোকসান দিয়া বিদেশী পাওনাদারকে এই আটক অর্থ বা

অবরোধ পদ্ধতির বিভিন্ন উপায়

উহার বিনিময়ে দ্রব্যাদি পাইবার সুযোগ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের রক্ষিত দ্বিতীয় অ্যাকাউন্টে ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং অর্থ ইহার প্রকৃষ্ট নমুনা।

(৩) চুক্তি (Agreements): নিয়ন্ত্রণকারী দেশ অন্যান্য দেশের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য বা বৈদেশিক অর্থসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার চুক্তি করিয়া বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এইরূপ চুক্তি সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইতে পারে।

বিভিন্ন প্রকার চুক্তিসমূহ

(ক) **পণ্যবিনিময় চুক্তিসমূহ** (**Barter Agreements**) : অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃপক্ষ দুই দেশের ব্যবসায়ীগণকে নিজেদের দ্রব্যাদি বিনিময়ের চুক্তি করিবার অধিকার দেন। এইরূপ ক্ষেত্রে, কোন দ্রব্য আমদানি করিয়া তাহার বদলে কোন দ্রব্য রপ্তানি করা হয়, টাকা লেনদেনের কোন প্রয়োজন ঘটে না। সাধারণভাবে, আধুনিক জগতে সমাজতান্ত্রিক-রাষ্ট্রসমূহ অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত বা অন্য রাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের সহিত এইরূপ চুক্তি দ্বারা আমদানি ও রপ্তানি চালাইয়া থাকেন। (খ) **ক্লিয়ারিং চুক্তিসমূহ** (**Clearing Agreements**): উভয় দেশের মধ্যে চুক্তির দ্বারা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বিনিময়-হার স্থির করা হয় এবং উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দেনাপাওনা মিটাইবার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দ্রব্য ক্রয় করিয়া ক্রেতা নিজের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট নিজেদের দেশের টাকাই জমা দেয়, পরে দুই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই দেনাপাওনা মিটাইয়া লন। (গ) **লেনদেন চুক্তিসমূহ** (**Payments Agreements**): নির্দিষ্ট সময়ের শেষে দেনাপাওনার কিছু বাকি থাকিলে স্বর্ণের দ্বারা বা অপর কোন তৃতীয় দেশের টাকার দ্বারা উহা মেটান হইবে এইরূপ চুক্তি করা যাইতে পারে। অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ওই টাকা জমা থাকে, এবং পাওনাদারগণ আগামী বৎসরের বাণিজ্যে দেনাদারদের অধিক দ্রব্য ক্রয় করিয়া ওই অবশিষ্ট পাওনা টাকা ব্যয় করিয়া ফেলেন, এইরূপও হইতে পারে। অনেক সময় দুই-এর বেশি কয়েকটি দেশের মধ্যে একত্রে দেনাপাওনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ চুক্তি থাকে (Multiple clearing), যেমন ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার সংগঠন (Organisation for European Economic co-operation) এবং ইউরোপীয় লেনদেনের সঙ্ঘ (European Payments Union) প্রভৃতি।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দোষগুণ (Merits and Demerits of Exchange Control) :

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের প্রধান সুবিধা বা গুণ হইল, সঠিকভাবে ব্যবহার করিলে এই পদ্ধতির সাহায্যে রপ্তানি বৃদ্ধি করা বা অপ্রয়োজনীয় আমদানি কমান সম্ভব। দ্বিতীয়ত, বিনিময়-হারে তীব্র উঠানামা বন্ধ হয় বলিয়া দেশে বৈদেশিক অর্থ লইয়া ফাট্‌কা ব্যবসায় চালান সম্ভব হয় না এবং বিনিময়-হারে উঠানামার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা না থাকায় ব্যবসায়ীদের দুশ্চিন্তার কারণ থাকে না।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের চারি প্রকার সুবিধা

গত সুবৃহৎ অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে দেখা গিয়াছে, ক্ষুদ্র দেশগুলি নিজেদের মধ্যে এইরূপ চুক্তি করিয়া বা শক্তিশালী দেশগুলির সহিত চুক্তি দ্বারা ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতে সক্ষম হইয়াছে, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে বৃহৎ রাষ্ট্রের চাপে তাহারা ব্যবসায় চালাইতে পারিত না। চতুর্থত, অনুন্নত দেশসমূহ দেশের শিল্পসম্প্রসারণ করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে এবং উন্নয়নের যুগে ইহা খুবই কার্যকরী।

ইহার প্রধান ত্রুটি হইল, ইহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণ কমাইয়া দেয়, সুতরাং সকলের পক্ষেই ক্ষতিকারক। দ্বিতীয়ত, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে পৃথিবীতে বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি দ্বারা (Bilateral Trade Agreements) ব্যবসায় চালান হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পক্ষে ইহা বিশেষ ক্ষতিকারক। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক রেষারেষির ও অন্যকে ভীতি-প্রদর্শনের দ্বারা সুবিধালাভের চেষ্টা—সমগ্র পৃথিবীতে এইরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য যে উন্মুক্ত অবাধ পরিবেশ ও সদিচ্ছার আবহাওয়া থাকা প্রয়োজন তাহা সম্ভব হয় না। চতুর্থত, সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ ; দীর্ঘসূত্রতা, অযোগ্যতা, অক্ষমতা প্রভৃতি থাকার দরুণ ব্যবসায় বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

চারি প্রকার দোষ বা অসুবিধা

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর সকল দেশ শিল্পোন্নয়নের সমান স্তরে উপনীত হয় নাই এবং বিভিন্ন স্তরে প্রত্যেকটি দেশ বিভিন্ন অর্থনৈতিক লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া দ্রুত শিল্পোন্নয়নের চেষ্টা করিতেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহের সার্থক রূপায়নের জন্য আমদানি রপ্তানির পরিমাণ, দিক ও দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই স্বাভাবিক, সুতরাং দোষ ত্রুটি ও রেষারেষি সত্ত্বেও এই সকল পদ্ধতির ব্যবহার নিকট-ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা চলে।

আধুনিক জগতে ইহার প্রয়োজনীয়তা

বহুধা বিনিময় হার (Multiple Exchange Rates)

লেনদেন ব্যালান্সের স্বল্পকালীন উঠানামার ফলে বৈদেশিক বিনিময়হারে উঠানামা ঘটিয়া থাকে ; বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদার পরিবর্তন সদা-সর্বদাই বিনিময়-হারে পরিবর্তন আনে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট বিনিময়-হারে রাষ্ট্রের আর্থিক লেনদেন হয়, কিন্তু বাজারের বিনিময়-হার (Market Rate of Exchange) সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল, একেবারে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নহে।

সরকারী-হার ও বাজার-হার

সেইরূপ বিভিন্ন সময়ের মধ্যে বিচার করিলে দেখা যায় যে, বিনিময়-হারে তারতম্য আছে। যেমন, বাজারে ভারতের টাকার বদলে ব্রিটিশ পাউণ্ড কি পরিমাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহার অনেক বিনিময়-হার রহিয়াছে। বর্তমানেই ক্রয় করিলে যে দামে পাউণ্ড পাওয়া যায়, 30 দিন, 60 দিন বা 90 দিন পরে ক্রয়ের জন্য চুক্তি করিলে পাউণ্ডের জন্য অন্য দাম দিতে হইতে পারে। সুতরাং বর্তমানেই বিভিন্ন প্রকার সময় অনুযায়ী অগ্রবিনিময়ের (Forward Exchange) দরুণ বহুসংখ্যক বিনিময় হার দেখিতে পাওয়া যায়।

সময়ের পার্থক্যে বাজার হারে পার্থক্য

কিন্তু অনেক সময়ে, রাষ্ট্রের নির্দেশেই দুই দেশের টাকার মধ্যে বিভিন্নপ্রকার বিনিময়ের হার রক্ষা করা হয় ; একই সময়ে দুই দেশের টাকার মধ্যে বহুসংখ্যক বিনিময়হার চালু রাখা হইলে তাহাকে বহুধা বিনিময় হার (Multiple Exchange Rates) বলে। সরকার এইরূপ নির্দেশ দেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য বিনিময়-হার পৃথক হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে কৃত্রিম ভাবে (বাজারের যোগান ও চাহিদার প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া) বিভিন্ন প্রকার বিনিময়-হারের প্রয়োগ করাকে কার্যকরী করিয়া তোলেন। যেমন বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে, বা রপ্তানি করিতে হইলে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বৈদেশিক অর্থ ক্রয় করিতে হইলে দেশীয় টাকার হিসাবে বিভিন্ন দাম নির্দিষ্ট থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন বিনিময়-হার থাকে। 1930 সালের পর হইতে প্রথমে লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ ও পরে জার্মানী এইরূপ বহুধা বিনিময়-হার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে এবং বিশেষ নিন্দার্হ হইলেও বর্তমানে অনেক দেশ বহুধা বিনিময়-হার বজায় রাখিয়াছে। যেমন, হিটলারের আমলে জার্মানীর টাকা মার্ক ক্রয় করিতে হইলে উদ্দেশ্য অনুযায়ী উহার দাম নির্দিষ্ট হইত। ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মার্ক কিনিলে এক দাম, কোন দ্রব্য ক্রয়ের

কিন্তু সরকারী-ভাবেই বিভিন্ন বিনিময়-হার ধার্য থাকিতে পারে। উহাকে বহুধা বিনিময় হার বলে

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হয়

উদ্দেশ্যে অন্য দাম. বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ দাম, এইরূপে বিভিন্ন হারে বিদেশীদের নিকট মার্ক বিক্রয় করা হইত। এই সকল হারের সহিত জার্মান অধিবাসীগণ মার্কের বিনিময়ে অন্য দেশের অর্থ যে হারে ক্রয় করিতেন তাহারও কোনরূপ সমতা ছিল না। যেমন, বর্তমানে লাতিন আমেরিকার দেশসমূহের মধ্যে চিলি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ডলার ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন দাম (চিলির টাকা পেসোর হিসাবে) স্থির করিয়া রাখিয়াছে। মূলধনী দ্রব্য আমদানির উদ্দেশ্যে সাধারণত কম পরিমাণ দেশীয় টাকা দিয়াই বৈদেশিক অর্থ ক্রয় করা যায়, কিন্তু বিলাস-দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে অধিক পরিমাণে দেশীয় টাকা দিয়া বৈদেশিক অর্থ পাইতে হয়, সরকারী অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য আবার ভিন্নরূপ বিনিময়-হার নির্দিষ্ট আছে।

এইরূপ বহুধা বিনিময় হার থাকিলে বেআইনী মুনাফার সম্ভাবনা খুবই বাড়িয়া যায় ; কারণ কম দামে বৈদেশিক টাকা ক্রয় করিয়া বেশি দামে বিক্রয়ের সুযোগ ও সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। সুতরাং, বহুধা বিনিময়-হার প্রথা কার্যকরী করিতে হইলে শক্তিশালী ও দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে হয় , বস্তুত আন্তর্জাতিক লেনদেনের সকল দিকই নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন হয়। বহির্মূল্যপাতন Devaluation বা বহির্মূল্যবর্ধনের Appreciation তুলনায় এইরূপ বহুধা বিনিময়-হার প্রথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-বৃদ্ধির পক্ষে এবং অবাধ দ্রব্যচলাচলের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিজনক। এই কারণে আন্তর্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডার বহুধা বিনিময়-হার প্রথা নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

এই পদ্ধতির ত্রুটি সমূহ

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ (Free Trade and Protection)

ইংলণ্ডের ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর ব্যবসায় বাণিজ্যে বিপুল সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিক (Liberalism) মনোভাব এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ-বাণিজ্যের সমর্থন ইংলণ্ডে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর কোনরূপ বাধা নিষেধ আরোপ না করার নীতিকে অবাধ বাণিজ্য নীতি বলা হয়। এই নীতির স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহার ফলে সকল দেশ আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগের সুফল ভোগ করিবার সুযোগ পায়। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ফলে প্রত্যেক দেশ সর্বাধিক সুবিধার সহিত যে দ্রব্য উৎপাদন করিতে সর্বাপেক্ষা

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তিসমূহ : দক্ষতা বৃদ্ধি উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যয়হ্রাস, আয় বৃদ্ধি, ভোগ বৃদ্ধি

উপযোগী, সেই সকল দ্রব্য উৎপাদনেই সকল উপকরণ নিয়োগ করিবে। ফলে সকল দেশেরই উপাদনসমূহের নৈপুণ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, সমগ্র পৃথিবীতে দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাড়িয়া যায়, দ্রব্যসামগ্রীর ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয়ও কমিয়া যায়। উপাদানসমূহের আয় বাড়িয়া যায়, কারণ সর্বাধিক সুবিধার সহিত উৎপাদন করিলে তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ক্রেতা হিসাবে সকলেই উন্নত ধরনের দ্রব্য কম দামে পাইতে পারে। অবাধ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করিয়া আমদানি শুল্ক আরোপনের ফলে দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পায়, উৎপাদকের স্বার্থে ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

সংরক্ষণের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, অবাধ বাণিজ্য আপনাআপনি উপাদান-সমূহকে প্রত্যেক দেশে সর্বাধিক সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগ করে তাহা দেখা যায় না। যেহেতু কোন দেশ অন্য দেশের তুলনায় কিছুকাল পূর্বে শিল্পসম্প্রসারণ সুরু করিয়াছিল, সেই জন্য তাহার অনেক পূর্বলব্ধ সুবিধা থাকিতে পারে। পূর্বে সুরু করার এই সকল সুবিধার ফলে তাহার তুলনায় অন্য দেশগুলির উৎপাদন-ব্যয় বেশি থাকায় তাহারা প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়।

সুতরাং, সংরক্ষণের সাহায্যে উভয়ের সুবিধা প্রথমে সমান করিয়া লইয়া তাহার পরেই অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে পারে। অসমান শক্তিধারীদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতায় দুর্বলের পরাজয় নিশ্চিত; উহা সবলের একাধিপত্য বজায় রাখিবার এবং দুর্বলকে শক্তিশালী না হইতে দিবার ছল মাত্র।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি সমূহ: দুর্বলের বা নবাগতের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা অন্যান্য ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণ বা বাণিজ্যচক্র রোধের উপায় প্রভৃতি

সংরক্ষণের সাহায্যে বর্তমানে দেশের সম্পদবৃদ্ধির ক্ষমতা বাড়াইয়া তোলাই বর্তমানে সম্পদপ্রাপ্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক কারণে অবাধ বাণিজ্য উন্নততর নীতি হইলেও অপরাপর বহু কারণে যেমন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে, সংরক্ষণনীতি অধিকতর গ্রহণ-যোগ্য হইতে পারে। যেমন, অস্ত্রোৎপাদন বা আত্মরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপন করা, উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইলেও অবশ্য-প্রয়োজনীয়। ইহাও মনে রাখা দরকার যে দেশের স্বাস্থ্য বা চরিত্র-হানিকর দ্রব্যের আমদানি অবশ্যই জাতীয় স্বার্থে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। অপর দেশ ডাম্পিং করিয়া দেশীয় শিল্পকে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে, তাহাও ঠিক নয়; সেই ডাম্পিং রোধ করার প্রচেষ্টা সর্বদাই

করা দরকার। অথবা, অপর দেশের শিল্পগুলি সরকারী সাহায্য-পুষ্ট হইয়া রপ্তানি বাড়াইয়া আমাদের দেশের শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে—তাহাও চলিতে দেওয়া জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নহে। তাহা ছাড়া, আধুনিক জগতে দেশীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নতি, জীবনযাত্রার মান বাড়ান প্রভৃতি উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশ নিজস্ব নীতি স্থির করিতেছে; এরূপ অবস্থায়, বিশেষত, অনুন্নত দেশসমূহ দেশের বাহিরের শক্তিগুলির হাত হইতে স্বাভাবিকভাবে নিজেদের রক্ষার প্রচেষ্টা করিবে। বাণিজ্য-চক্রের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণনীতি প্রয়োগ করা খুবই দরকার। চরম সংকটের কালে আমদানি শুল্ক দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, অপর কোন দেশের বাণিজ্য-সংকট যাহাতে আমাদের দেশে প্রসারিত হইতে না পারে, তাহার উদ্দেশ্যেও সংরক্ষণ নীতিকে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সুতরাং, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে সাধারণভাবে অবাধ বাণিজ্যের নীতি সুফল-দায়ী হইলেও, কোন বিশেষ দেশের নিজ-স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাকে কখনই গ্রহণযোগ্য মনে করা চলে না, এবং বলা চলে যে সংরক্ষণনীতি সাধারণ ভাবে জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিসমূহ (Arguments in favour of Protection):

১। দেশের টাকা দেশে রাখা (Keeping money at home):

যুক্তি

অনেকে বলিতে চাহেন যে, বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিলে লোকে দ্রব্য পাইলেও টাকা পায় বিদেশীরা; কিন্তু দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিলে দেশের লোক দ্রব্যও পায় আবার টাকাও পায়। ইহার সমর্থকদের বক্তব্য হইল, যাহাতে দেশের টাকা বাহিরে যাইতে না পারে সেইজন্য বিদেশী দ্রব্য ক্রয় না করাই উচিত।

বিরুদ্ধে যুক্তি

কিন্তু এই যুক্তি একেবারেই ভুল, কারণ আমদানি না করিলে রপ্তানি বন্ধ হইয়া যাইবে, বিদেশীদের দ্রব্য ক্রয় না করিলে বিদেশীরাই বা কি করিয়া আমাদের দেশের রপ্তানি ক্রয় করিবে? দ্রব্য ক্রয় না করিয়া জাতীয় আয় বাড়ান যায় না, কারণ তাহা হইলে রপ্তানি হইতে আয়ও কমিয়া যায়। আর, সকল দেশই এইরূপ নীতি গ্রহণ করিলে অবশেষে কাহারও উপকার হয় না; সকলেরই বৈদেশিক ব্যবসায় ও বাণিজ্য

বন্ধ হইয়া যায় ; বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি কেহই লাভ করিতে পারে না।

২। দেশের বাজার সৃষ্টি করা (Home Market Argument)

সংরক্ষণের ফলে বিদেশী দ্রব্য দেশে না আসিলে দেশীয় শিল্প স্থাপিত হইবে, দেশে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, ফলে দেশীয় দ্রব্যাদির আভ্যন্তরীণ বাজার বিস্তৃত হইবে, দেশের সকল শিল্পেরই লাভ হইবে—ইহাই এই যুক্তির রূপ।

যুক্তি

কিন্তু এই যুক্তির সমর্থকগণ ভুলিয়া যান যে, সংরক্ষণের দ্বারা আমদানি কমাইলে উহার ফলে রপ্তানিও কমিয়া যায়। সুতরাং আমদানি বন্ধ করিয়া সেই দ্রব্য দেশে উৎপাদন সুরু করিলে আয় ও ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি হইয়া দেশীয় বাজার বিস্তৃত করে বটে, কিন্তু, রপ্তানি হ্রাস পাইবার দরুণ রপ্তানি-শিল্পে বেকারির ফলে আয় ও ক্রয় ক্ষমতা সংকুচিত হইয়া দেশীয় বাজারকে অপর দিক হইতে সংকুচিত করিয়া ফেলে।

বিরুদ্ধ যুক্তি

কিন্তু যদি আমদানি-হ্রাসের ফলে দেশে যে পরিমাণ নূতন আয় সৃষ্টি হইল, তাহা রপ্তানি কমিবার ফলে আয় হ্রাসের পরিমাণ হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে দেশের মোট আয়ে নীট বৃদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং উভয় দেশের আমদানি ও রপ্তানির পারস্পরিক চাহিদার শক্তির উপর এই যুক্তির সত্যতা নির্ভর করে, বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ অবস্থায় এই যুক্তি সত্য হইতে পারে।

সত্যতা

৩। বাণিজ্য ব্যালান্স অনুকূল রাখা (Balance of Trade Argument)

প্রাচীন মার্কেণ্টাইলিষ্ট ধনবিজ্ঞানীগণ বলিতেন যে, বিদেশ হইতে স্বর্ণ আনিতে পারিলেই দেশ সম্পদশালী হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যে সর্বদা রপ্তানি-আধিক্যের (export-surplus) নীতি গ্রহণ করা উচিত। রপ্তানি আধিক্যের দ্বারা সর্বদা বাণিজ্য-ব্যালান্স অনুকূল রাখিতে পারিলেই দেশের মধ্যে স্বর্ণ আসিতে পারে।

যুক্তি

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ এই মার্কেণ্টাইলিষ্ট ধারণা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, স্বর্ণ-ই একমাত্র সম্পদ নহে। আর অনুকূল বাণিজ্য-ব্যালান্সের দরুণ দেশে ক্রমাগত স্বর্ণের আগমন আভ্যন্তরীণ অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া দামস্তর বাড়াইয়া দিবে এবং ফলে ভবিষ্যতে রপ্তানি কমিয়া স্বর্ণ পুনরায়

বাহির হইয়া যাইবে (স্বর্ণের গতিবিধি সংক্রান্ত রিকার্ডীয় তত্ত্ব)। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণও মনে করেন যে, অনুকূল বাণিজ্য-ব্যালান্সের ফলে দেশের আয়স্তর বর্ধিত হইবে, সুতরাং প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতায় বৃদ্ধির দরুণ আমদানির পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, বাণিজ্য-ব্যালান্সের আনুকূল্য হ্রাস পাইবে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাণিজ্য-ব্যালান্স অনুকূল রাখার নীতি গ্রহণ করা তাই কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নহে। যদিও কেইন্‌সের মতে রপ্তানি-আধিক্যের ফল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুরূপ—ইহার ফলে আয়স্তর ও কর্মসংস্থান বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও মনে রাখা দরকার যে, সকল দেশ-ই একসঙ্গে এই নীতি গ্রহণ করিতে সুরু করিলে অবশেষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপুল বিশৃংখলা সৃষ্টি হইবে। প্রত্যেক দেশই অপর দেশের স্বার্থের বিনিময়ে নিজের স্বার্থবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া প্রতিবেশীকে দরিদ্র-করার-নীতি (Beggar-my-neighbour-policy) গ্রহণ করিলে মোট ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া গিয়া সকলকেই দরিদ্র করিয়া তুলিবে।

বিরুদ্ধ যুক্তি

(৪) উচ্চ মজুরি বজায় রাখা (To maintain high Wages)

অনেক সময় বলা হয়, নিম্ন মজুরির হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানির বিরুদ্ধে শুল্ক না বসাইলে সেই দেশ হইতে সস্তা আমদানি-দ্রব্য দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেশের উচ্চ মজুরির হারকে নামাইয়া দিবে। কারণ, অপর দেশে নিম্ন মজুরি-হারের ফলে তাহাদের উৎপাদন-ব্যয় কম, কিন্তু নিজ দেশে উচ্চ মজুরি-হারের ফলে উৎপাদন-ব্যয় বেশি। সুতবাং আভ্যন্তরীণ উচ্চ মজুরির হার বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিম্ন মজুরির হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানির বিরুদ্ধে শুল্ক বসান উচিত এইরূপ বলা হইয়া থাকে।

যুক্তি

এই যুক্তি গ্রহণ করা চলে না, কারণ উচ্চ মজুরির ফলে উৎপাদন-ব্যয় সর্বদাই অধিক হইবে বা নিম্ন মজুরির ফলে উৎপাদন-ব্যয় কম হইবে—ইহাও ঠিক নহে। উচ্চ মজুরির হার অধিক উৎপাদন-ক্ষমতার দরুণ বা উন্নত সাংগঠনিক নৈপুণ্যের দরুণ বা প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের দরুণ হইতে পারে। ফলে প্রকৃতপক্ষে সেই দেশে ইউনিট-প্রতি ব্যয় কম, এইরূপ ঘটিতে পারে।

এইরূপ অবস্থায় সংরক্ষণের নীতি দেশের উচ্চ মজুরিকে রক্ষা না করিয়া

কমাইয়া দিতেও পারে। কারণ সংরক্ষণের ফলে সর্বাধিক সুবিধাজনক ক্ষেত্রে নিযুক্ত না হইয়া কম উৎপাদন-ক্ষমতা সম্পন্ন শিল্পে শ্রমিক নিযুক্ত হইতে সুরু করিবে, সুতরাং জাতীয় সম্পদ বা মজুরির হার উভয়ই কমিবে। তাহা ছাড়া, সংরক্ষণী শুল্কের ফলে দ্রব্যের দাম বাড়িবার দরুণ আসল মজুরি কমিয়া যাইবে।

বিরুদ্ধযুক্তি

কিন্তু, সাধারণভাবে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যকারী উভয় দেশের উপাদানের দামে সমতা আসে। এরূপ অবস্থায় নিম্ন মজুরি সম্পন্ন দেশের পক্ষে অবাধ বাণিজ্য সুবিধাজনক, এবং উচ্চ মজুরি-সম্পন্ন দেশের পক্ষে অসুবিধাজনক। কারণ, উচ্চ মজুরি কিছুটা নামিয়া এবং নিম্ন মজুরি কিছুটা উঠিয়া উপাদানের দামে এই সমতাসাধন ঘটে।

(৫) বেকারি দূর করা (To Cure Unemployment)

অনেক সময় বলা হয়, সংরক্ষণের ফলে দেশে বেকারি দূর হইয়া কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে সংরক্ষণের দ্বারা আমদানি হ্রাস পাইলে সেই সকল দ্রব্যের শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়িলেও রপ্তানি কমিয়া যাওয়ার ফলে রপ্তানি দ্রব্যের শিল্পে বেকারি বাড়িবে, সুতরাং দেশের মোট কর্মসংস্থানে নীট বৃদ্ধি হইবে না।

কিরূপে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় ও ক্লাসিকাল যুক্তি: কেন বৃদ্ধি পায় না

তবে, যদি আমদানি শুল্কের দ্বারা আমদানি কমাইয়া দেশে কর্মসংস্থান বাড়ান হয়, অথচ রপ্তানির পরিমাণ যাহাতে না কমে সেই ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে মোট কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। অবশ্য যদি অপর দেশও প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন করিয়া তাহাদের আমদানির উপর শুল্ক বসায় তাহা হইলে রপ্তানি কমিয়া কর্মসংস্থান কমাইয়া দিবে। রপ্তানি হ্রাস বন্ধ করার জন্য দেশটি দুই প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথমত, আমদানি শুল্ক হইতে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা রপ্তানি শিল্পকে অর্থ সাহায্য (Bounty) করা—যাহাতে বিদেশে কম দামে বিক্রয় করিয়া পূর্বের পরিমাণ রপ্তানি বজায় রাখিতে পারে। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় বিদেশও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

আধুনিক যুক্তি কিরূপে আমদানি স্থির রাখিয়া রপ্তানি বাড়ান যায়, ১। অর্থ সাহায্য

দ্বিতীয়ত, যদি সংরক্ষণকারী দেশ রপ্তানি-আধিক্যের দরুণ পাওনা বিদেশী

টাকা দেশে আনিতে না চাহে এবং বিদেশেই ঋণ বা বিনিয়োগ অথবা সাহায্য হিসাবে খাটায়, তাহা হইলে এই রপ্তানি-আধিক্য বজায় রাখা সম্ভবপর হইবে। যেমন, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আমেরিকা সর্বাধিক রপ্তানি করে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নিজ-দেশে সংরক্ষণের দ্বারা আমদানিতে বিপুল বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। রপ্তানির ফলে আমেরিকার পাওনা অর্থ বিদেশী দ্রব্যের আমদানি দ্বারা পরিশোধ লইলে পাছে দেশে আয় ও কর্মসংস্থান কমিয়া যায় এইজন্য উচ্চ সংরক্ষণী প্রাচীরের আড়ালে থাকিয়া সে ব্যবসায়-যুদ্ধ চালায়। যাহাতে বিদেশ হইতে তাহাকে দ্রব্যের আমদানি করিতে না হয়, এইজন্য সে পাওনা-অর্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ঋণ দেয়, দান করে, ইউরোপীয় পুনর্গঠনের দরুণ ব্যয় করে বা বিদেশে সৈন্যবাহিনী রক্ষা করে।

২। বিদেশে ঋণ বৃদ্ধি

কিন্তু এই নীতি নিতান্ত স্বল্পকালীন, কারণ অনির্দিষ্ট কালের জন্য কেহ মূলধনের রপ্তানি চালাইয়া যাইতে পারে না। এমন সময় আসে যখন আসল পরিশোধ লইতেই হইবে বা সুদ লইতেই হইবে; এবং এরূপ অবস্থায় আমদানি বৃদ্ধি না করিলে চলিবে না। তাহা ছাড়া, এই নীতির ফলে দেশে মূলধনের পরিমাণ কমিয়া আভ্যন্তরীণ বিনিময় ও কর্মসংস্থান হ্রাস পাইতেও পারে।

এই পদ্ধতির অসুবিধা

(৬) শিশু শিল্পকে রক্ষা করা (To Protect Infant Industires)

পৃথিবীর সকল দেশে শিল্পোন্নয়নের স্তর সমান নহে, সকলেই শিল্পবিপ্লবের সুবিধা সমান পরিমাণ গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রথমে যাহারা শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারাই অধিকতর সুযোগ, সুবিধা, শিল্পজ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হইয়াছে। সুতরাং, শিল্পে অনুন্নত দেশগুলি শিল্পোন্নয়নের কাজ সুরু করিয়া অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করিলে প্রতিযোগিতায় উন্নততর দেশগুলির নিকট পরাজিত হইবে। অনুন্নত দেশগুলি উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে সংরক্ষণের দ্বারা নিজেদের শিল্প বাণিজ্যে ব্যাপারে শিশু দেশকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচাইবে, শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক জ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা ও সাংগঠনিক প্রস্তুতির স্তর বিদেশীদের হাত হইতে রক্ষা করিবে। জার্মান ধনবিজ্ঞানী ফ্রেডারিক লিষ্ট এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তাঁহার মতে,

অনুন্নত দেশ ও অনুন্নত শিল্প

কৃষি-উৎপাদনের স্তর হইতে কোন দেশে শিল্প সম্প্রসারণ করিতে হইলে এইরূপ সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

লিষ্ট্ এই নীতি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন "অনুন্নত দেশ" সম্বন্ধে, কিন্তু আধুনিককালে দেশের শিশু "শিল্পকে" বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন—এই যুক্তিতে সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন করা হইয়া থাকে। "সদ্যোজাতকে সেবা কর, শিশুকে রক্ষা কর এবং বয়স্ককে মুক্ত কর"—ইহাই এই যুক্তির মূল কথা।

প্রয়োগ-গত অসুবিধা

যুক্তি সঠিক হইলেও এই নীতিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচুর অসুবিধা আসিয়া পড়ে। এই নীতি অনুযায়ী যে সকল "শিশু" ভবিষ্যতে এমনভাবে উন্নত হইয়া উঠিবে যে সংরক্ষণ তুলিয়া লইলেও উন্নত দেশের শিল্পসমূহের সহিত প্রতি-যোগিতা দ্বারা সে নিজেকে বাঁচাইতে পারিবে, তাহাদের রক্ষা করা অর্থাৎ সেই দ্রব্য আমদানির উপর শুল্ক বসান দরকার। কিন্তু পূর্ব হইতেই সঠিকভাবে জানা যায় না কোন্ শিল্প এরূপ বাড়িতে পারে। তাহা ছাড়া একবার শুল্ক বসাইলে সংরক্ষণের আড়ালে বাড়িয়া উঠিবার পরেও সেই শিল্প চিরকাল "সংরক্ষিত" থাকিতেই চায়, নিজের পায়ে স্বাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইবার বাসনা ও মনোভাব কখনও গড়িয়া উঠে না, শিশুর আর বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটিতে চাহে না।

(৭) শিল্পের বৈচিত্র্য সাধন (To Diversify the Industries)

শিল্পের বৈচিত্র্য সাধন

সংরক্ষণের সাহায্যে দেশে সকল প্রকার শিল্প গড়িয়া তোলা উচিত কারণ দেশে বহুপ্রকার ব্যক্তি থাকেন, প্রত্যেকের প্রতিভা সমান নয়। যাহাতে সকল ব্যক্তি নিজেদের ঝোঁক, প্রবণতা বা নৈপুণ্য অনুযায়ী নিজেকে উন্নত করিতে পারে সেইজন্য দেশে সকল প্রকার শিল্প থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের শিল্প স্থাপিত হইলে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা (National Self-sufficiency) ঘটিবে, ইহাতে প্রয়োজনের সময় সকল দ্রব্যোৎপাদনেরই ব্যবস্থা থাকিবে। তাহা ছাড়া, সমরোপকরণ-শিল্প বা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে যে সকল শিল্প থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়—এই সকল শিল্পের উন্নতির জন্য নিশ্চয়ই সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করা উচিত। অ্যাডাম্ স্মিথ্ বলিয়া গিয়াছেন যে, দেশ-রক্ষার তুলনায় টাকার গুরুত্ব কম (opulence is less important than defence)।

(৮) ডাম্পিং-এর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া (To protect from Foreign Dumping)

বিদেশী ব্যবসায়ীরা নিজের দেশে চড়া দাম বজায় রাখিয়া অন্য দেশে উৎপাদন ব্যয় হইতে কম দামে বিক্রয় করিলে ইহাকে সাধারণত ডাম্পিং বলা হয়। এই ডাম্পিং-এর ফলে দেশীয় শিল্পপতিগণ প্রতিযোগিতায় টিঁকিতে না পারায় ক্রমে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হন, বিদেশী ব্যবসায়ীরা তখন বাজারের একচেটিয়া অবস্থার সুযোগ পাইবার জন্য দাম চড়াইয়া দেয়।

ডাম্পিং-এর বিরুদ্ধে

ডাম্পিং ঘটিতে থাকিলে অবশ্যই তাহার বিরুদ্ধে শুল্ক বসাইয়া দেশীয় শিল্পসমূহকে সংরক্ষিত করা উচিত, কিন্তু দেখা যায় যে, ডাম্পিং বন্ধ হইলেও শুল্ক চলিতে থাকে এবং কোন কারণে শুল্ক বসান হইলে সেই শুল্ক অন্যান্য আইন-কানুনের ন্যায় স্থায়ীভাবে সরকারের নীতির অঙ্গ হিসাবে বাঁচিয়া থাকে।

অসুবিধা

সংরক্ষণ নীতির বিপদ (Positive Dangers of Protection) :

সংরক্ষণ নীতির কয়েকটি ত্রুটি ও বিপদ আছে। যেমন, প্রথমত, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা কমিয়া গেলে দেশীয় উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণ অলস, নিরুৎসাহ বা উদ্যোগহীন হইয়া উঠিতে পারে; সকল প্রকার উন্নতি সাধনের প্রেরণা নষ্ট হইতে পারে, উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের কোন প্রচেষ্টা থাকে না; সাধারণত সংরক্ষিত শিল্পে যন্ত্রপাতির উন্নতি করা হয় না এবং অনেক সময় উচ্চ-হারে আমদানি শুল্ক স্থাপনের ফলে আমদানির পরিমাণ খুবই কমে, মোট রাজস্বের পরিমাণও কমিয়া যায়।

প্রতিযোগিতার হ্রাস, আমদানি হ্রাস, দামবৃদ্ধি, একচেটিয়া শিল্পসংগঠন, রাজনৈতিক অসাধুতা, প্রভৃতি

ভোগকারীগণ দামবৃদ্ধির ভয় করেন, কারণ আমদানি শুল্কের ভার খুব কম ক্ষেত্রেই উদ্যোক্তার স্কন্ধে পড়ে, প্রধানত ভোগকারীর নিকট হইতে দাম বাড়াইয়াই উহা আদায় করা হয়। গরীব ভোগকারীর উপর আরও চাপ পড়ে।

বলা যায় যে, শুল্কই একচেটিয়া সংগঠনের জন্মদাতা। বৈদেশিক প্রতিযোগিতা দূর হইলে দেশীয় উদ্যোক্তাগণ একত্রে জনসাধারণকে তীব্রতর ভাবে শোষণ করিবার জন্য একচেটিয়া সংগঠন গড়িয়া তোলেন।

তাহা ছাড়া, দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাধুতা ও অন্যায় বৃদ্ধি পায়; অনেক ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণের জন্য ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থানুযায়ী চলিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে টাকার সাহায্যে রাজনৈতিক নেতাদের ক্রয় করিয়া রাখেন, অন্তত বহু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা দেখা গিয়াছে।

সংরক্ষণের পদ্ধতি ও রূপ (Methods and forms of Protection):

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে বহুপ্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া আমদানি রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ও পদ্ধতিকে বিভিন্ন ধরনে শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছে; দেখা গিয়াছে যে সংরক্ষণ মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি রূপ গ্রহণ করিতে পারে।

(১) **শুল্ক (Duties):**

শুল্ককে দুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়: **রাজস্ব শুল্ক** (Revenue Duties) এবং **সংরক্ষণী শুল্ক** (Protective Duties)। প্রধানত সরকারী আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে প্রথম প্রকার শুল্ক বসান হয়, এবং সাধারণত দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় প্রকার শুল্ক বসে। অবশ্য এইরূপ বিভাগ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত নয়, আইন প্রণয়নকারীদের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শুল্কের সঠিক শ্রেণীবিভাগ করা চলে না। তবুও এইরূপ বিভাগ করিলে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা থাকিতে পারে, অর্থাৎ রাজস্বের দিক হইতে যে শুল্ক বিশেষ আয়কারী তাহা সংরক্ষণের দিক হইতে পর্যাপ্ত নয়; আবার সংরক্ষণের দিক হইতে যাহা পর্যাপ্ত, তাহাতে আমদানি বন্ধ হইয়া যায় ও রাজস্ব আদায় খুবই কমিয়া যাইতে পারে।*

শুল্ককে আরও দুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়: আমদানি শুল্ক ও রপ্তানি শুল্ক।

(ক) **আমদানি শুল্ক:** বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইলে তাহাকে আমদানি শুল্ক বলা হয়। এইরূপ আমদানি শুল্ক, প্রধানত, দুই প্রকারের হইতে পারে: বিনির্দিষ্ট শুল্ক (Specific duty) এবং মূল্যানুসার শুল্ক (Advalorem Duty)। নির্দিষ্টানুসারে শুল্ক দ্রব্যের ওজন,

* অবশ্য দীর্ঘকালে, সংরক্ষণী শুল্কের ফলে দেশে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি হওয়ায় সরকারী রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে।

আয়তন বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শুল্কের হার স্থির করা হয়; মূল্যানুসার শুল্কে দ্রব্যের মূল্য অনুযায়ী শুল্কের হার নির্ধারিত হয়।

(খ) দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সেই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর **রপ্তানি শুল্ক** বসান যাইতে পারে। রপ্তানি শুল্কের ফলে রপ্তানি কমিবে: আভ্যন্তরীণ বাজারে কাঁচামালের দাম কমিয়া যাইবে, বিদেশে ঐ কাঁচামাল দুষ্প্রাপ্য হইবে, উহার দাম বাড়িবে। এইরূপ করিলে দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থার ত্রুটি হইল, ইহা কার্যত কাঁচামাল উৎপাদকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া পণ্য উৎপাদকের স্বার্থ রক্ষা করে।

(২) অর্থ সাহায্য (Bounties and Subsidies):

বিশেষ কোন একটি দেশীয় শিল্পের উৎপাদন ব্যয় অধিক থাকিলে বা বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কম থাকিলে সরকার উহাকে অর্থসাহায্য করিতে পারেন। এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করার নীতিকে অর্থসাহায্য-পদ্ধতি বলা হয়। অনেক সময় কম হারে আমদানি শুল্ক বসাইয়া দেশীয় শিল্পকে একই সঙ্গে কিছুটা অর্থ সাহায্যও করা হয়; আমদানি-শুল্ক হইতে প্রাপ্ত অর্থ অর্থ-সাহায্যে ব্যয়িত হইতেছে, এরূপও দেখা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (I. T. O.) আমদানি-শুল্ক স্থাপন পছন্দ না করিলেও অর্থ-সাহায্য সম্বন্ধে নীরব আছেন। সাধারণত উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী অর্থ-সাহায্য দেওয়া হয়, কিন্তু অনেক সময়ে মোট কিছু অর্থও একত্রে (lumpsum) সাহায্য রূপে দেওয়া চলিতে পারে।

কিরূপে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়

অর্থ-সাহায্য পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা হয়, (ক) এই নীতি কার্যকরী করিতে হইলে উৎপাদনের উৎকর্ষ ও পরিমাণের উপর তীক্ষ্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন, বাস্তবে তাহা সম্ভব না-ও হইতে পারে। (খ) দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াইতে হইলে অত্যন্ত বেশি পরিমাণ অর্থ-সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে। (গ) জনসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া তাহা মুষ্টিমেয় শিল্পপতির স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যয় করা উচিত কিনা তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ।

বিরুদ্ধে যুক্তিসমূহ

কিন্তু অর্থ সাহায্য নীতির স্বপক্ষে বলা হয়, (ক) শুল্কের ফলে দামবৃদ্ধি

হইবে, কিন্তু অর্থ-সাহায্যে দাম বৃদ্ধি হইবে না, (খ) প্রদত্ত অর্থ দেশেই থাকিবে, (গ) দ্রব্যের বিভিন্ন গুণগত স্তরের (grade) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা ও সেই অনুযায়ী অর্থ-সাহায্য করা সম্ভবপর, (ঘ) সকলেই সঠিকভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারে যে এই সংরক্ষণের জন্য ঠিক কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইতেছে।

স্বপক্ষে যুক্তি

(৩) পরিমাণগত বাধা-নিষেধ (Quantitative restrictions)

এই পদ্ধতি অনুযায়ী কোন রাষ্ট্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ স্থির করিয়া দেয় এবং সাধারণত, (ক) **লাইসেন্স** প্রদান করিয়া আমদানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই পদ্ধতির বিশেষ সুবিধা আছে। অনেক সময় শুল্ক ধার্য করিলেও উৎপাদন-ব্যয়ে বা দামে পরিবর্তন ঘটিয়া শুল্কের কার্যকারিতা কমাইয়া দিতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে আমদানির পরিমাণ সংকুচিত করিয়া সংরক্ষণের উদ্দেশ্য সফল করিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহাতে বৈদেশিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ খুবই বাড়িয়া যায়। শুল্কের দ্বারা সংরক্ষণ করিলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দামের মধ্যে কিছুটা সংযোগ রক্ষিত হয়, কিন্তু এই পদ্ধতিতে দুই দেশের দামে কোন সংযোগ থাকে না। আমদানি-নিয়ন্ত্রণের ফলে দাম বৃদ্ধি পায়, এবং তাহার দরুণ মুনাফা ব্যবসায়ীরাই লাভ করিয়া থাকেন ; কিন্তু শুল্ক ধার্য করিলে আমদানিও নিয়ন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের আয়ও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। আমদানি-নিয়ন্ত্রণ করিলে সাধারণত কোন্ আমদানিকারীকে কতটা আমদানির সুযোগ দেওয়া হইবে এবং কোন্ দেশ হইতে কতটা আমদানি করিতে পারিবে ইহাও ঠিক করিতে হয়। পক্ষপাতিত্ব ও অসাধুতার সুযোগ ইহার ফলে বাড়িয়া যায়। আমদানির পরিমাণ বেশি কমাইলে দেশীয় উৎপাদকগণ মিলিয়া একচেটিয়া সংগঠন স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে শোষণের সুযোগ পায়।

লাইসেন্স

শুল্ক ও পরিমাণগত বাধা-নিষেধ, উভয়-পদ্ধতির তুলনামূলক বিচার

(খ). পরিমাণগত বাধা-নিষেধের আর একটি রূপ হইল বিদেশী দ্রব্য আমদানি করিয়া **নির্দিষ্ট অনুপাতে দেশীয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া** তবেই বিক্রয় করা চলিবে এইরূপ নিয়ম করিয়া দেওয়া। সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই নিয়ম চলিতে পারে না, একই প্রকার ও একই ধরনের দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে

(standardised products) এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলে অবশ্য দেশীয় দ্রব্যের কিছু পরিমাণ বিক্রয় নিশ্চিত করা যায়।

(গ) পরিমাণগত বাধা-নিষেধের বিশিষ্ট উপায় হইল আমদানির আনুপাতিক অংশ বা **কোটা** নির্দিষ্ট করা।

যখন কোন দ্রব্য আমদানির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় কিন্তু তাহা পৃথিবীর যে কোন দেশ হইতে আমদানি করা চলে তখন তাহাকে বিশ্বব্যাপী (Global) কোটা বলে। তবে, ইহাতে বিভিন্ন রপ্তানিকারী দেশ অনেক ক্ষেত্রে আমদানিকারী দেশের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনিয়া থাকে। সুতরাং অনেকক্ষেত্রে, একই সঙ্গে কোন্ দেশ হইতে কতটা আমদানি হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

সর্বব্যাপী কোটা

যদি কোন দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনা শুল্কে বা কম হারে আমদানি করিবার অনুমতি থাকে, কিন্তু উহার বেশি আমদানি করিতে হইলে শুল্ক বা অধিক হার শুল্ক দিতে হয়, তবে তাহাকে শুল্ক-কোটা (Tariff Quota) বলে। অধিক হারে শুল্ক দিলে অবশ্য আমদানির কোন পরিমাণগত বাধা থাকে না।

শুল্ক কোটা

অপর কোন দেশের সহিত আলাপ আলোচনা না করিয়া নিজের স্বার্থে কোন সরকার কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমদানির উচ্চতর পরিমাণ স্থির করিয়া দিলে তাহাকে একপাক্ষিক কোটা (Unilateral Quota) বলে। উভয় দেশের সহিত আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে উভয়ের আমদানির পরিমাণ স্থির হইলে তাহাকে দ্বিপাক্ষিক কোটা (Bilateral Quota) বলে।

একপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক কোটা

(৪) শাসনতান্ত্রিক সংরক্ষণ (Adminstrative Protection):

শাসন সংক্রান্ত বহু আইনকানুনের ফলে সংরক্ষণ নীতি কার্যকরী হইতে পারে। যেমন, (ক) শুল্ক কর্তৃপক্ষের আদেশও নির্দেশ, (খ) রেল ও জাহাজ কর্তৃপক্ষের আদেশ, নির্দেশ বা ভাড়ার স্বতন্ত্রীকরণ, (গ) সরকারী প্রয়োজনে দ্রব্যাদি ক্রয়-সংক্রান্ত আদেশ নির্দেশ প্রভৃতি।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে যখন ব্যক্তির হাতে বাণিজ্যের কোন ক্ষমতা না রাখিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের

একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্র নিজের হাতে তুলিয়া লয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল ব্যবসায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে, তাই বৈদেশিক বাণিজ্যও তাহা হইতে বাদ যাইতে পারে না। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবেই রাষ্ট্র আমদানি ও রপ্তানির বাণিজ্য নিজের আয়ত্তে রাখে। প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়া ও পরে জার্মানি এইরূপ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনা পদ্ধতির প্রসার করিয়াছে। অন্যান্য দেশের নিকট হইতে দর কষাকষির ক্ষেত্রে সর্বাধিক সুবিধা লাভ করা রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের অপরাপর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কাহাকে বলে

বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করিতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের দাম স্থির রাখা, অন্য রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলা মজুত করা, প্রভৃতি বিভিন্ন লক্ষ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালিত হইতে পারে। রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ ও নয়া চীন ছাড়াও আর্জেন্টিনা; গমের ব্যবসাতে অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা; কাঁচা তুলা, চা, লৌহ সংক্রান্ত ব্যতীত অন্যান্য ধাতুসমূহের এবং খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ে ইংলণ্ড এবং অনেক ক্ষেত্রে আমেরিকাও এইরূপ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালাইয়া থাকেন। ভারতেও রাষ্ট্রের তরফ হইতে বাণিজ্য চালাইবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যসমূহ

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সুবিধা হিসাবে বলা হয়, ইহার ফলে ক্রেতারা উপকৃত হইবেন, কারণ ব্যবসায়ীদের হাত হইতে আমদানি ও রপ্তানির বিপুল মুনাফা রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আসিলে রাষ্ট্র দ্রব্যাদির দাম কমাইয়া দিতে পারে বা উন্নয়নমূলক কার্যে ওই মুনাফা ব্যয় করিতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া সংগঠন ভাঙিয়া দেওয়াও সম্ভব হইবে। অপর রাষ্ট্রের সহিত দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, বাণিজ্যহার দেশের অনুকূলে আসিবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল করিবার উপযোগী দ্রব্যাদির আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সহজ হইবে।

সুবিধা

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, সরকারী কর্মচারীগণ বাণিজ্য সম্পর্কে একান্ত অনভিজ্ঞ এবং দেশের চাহিদা ও যোগানের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় তাহারা ভুল পরিমাণে এবং ভুল দামে আমদানি ও রপ্তানি করিবে। বাণিজ্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মনান্তর ব্যক্তিদের

ত্রুটিসমূহ

মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকায় আন্তর্জাতিক কলহ, তিক্ততা ও সংঘর্ষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, প্রতিযোগিতা লোপ পাইয়া একচেটিয়া অধিকার সৃষ্টি হইবে এবং সরকারী কর্তৃত্বের অনবরত পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক দলগুলি এই ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিবে না। কোন সরকারের কোন নির্দেশ অপর দল সরকার গঠন করিয়া বাতিল করিয়া দিবে—এইরূপ বিশৃংখলার উদ্ভব হইবে। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, সরকারী সকল ব্যবসায়ের ন্যায় এক্ষেত্রেও উদ্যোগ ও উৎসাহ উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইবে। রাজনৈতিক ভাবে দুর্বল দেশগুলি রাজনৈতিক চাপে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে।

আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহ

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund):

পৃথিবীতে যখন স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তখন বৈদেশিক বিনিময়হার স্বয়ংক্রিয় ভাবে নির্ধারিত হইয়া পড়িত এবং স্বর্ণের আদান প্রদান দ্বারাই আমদানি ও রপ্তানির মূল্য পরিশোধ করা হইত বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল প্রকার লেনদেন করা হইত। 1929-30 সালের মহা অর্থ-নৈতিক সংকটের ফলে স্বর্ণমানের পতন হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিনিময়-ব্যবস্থা (Exchange-Mechanism) সম্পূর্ণ বানচাল হইয়া গেল। তাহার পর সুরু হইল দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, অস্থির ও সদাচঞ্চল বিনিময়হার, বহির্মূল্যপাতন, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, কোটা প্রভৃতির যুগ। আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া গেল, আভ্যন্তরীণ দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর সঠিক রাখাই প্রত্যেক দেশের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। এরূপ বিশৃংখল অবস্থায় এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার প্রয়োজন দেখা দিল যাহার দ্বারা আভ্যন্তরীণ আর্থিকনীতির স্বাধীনতা বজায় থাকে এবং একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন অবাধভাবে চলিতে পারে। ব্রেটনউডস্ চুক্তি দ্বারা স্থাপিত এই আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

পুরাতন স্বর্ণমানের স্থলে প্রতিষ্ঠিত এক নূতন ব্যবস্থা; স্বর্ণ ও কাগজীমান উভয়ের বৈশিষ্ট্য মিলাইয়া গৃহীত এক ধরনের মিশ্রমান; কেইন্‌সের ভাষায় বলিতে গেলে "উন্নত ধরনের আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা" স্থাপনের প্রচেষ্টা। বহু আলাপ আলোচনার পর আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা

আলোচনার প্রথমে ব্রিটেন এবং আমেরিকা উভয় দেশই নিজস্ব প্রস্তাব পেশ করেন; ইংলণ্ডের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাকে বলা হয় ব্যাঙ্কর পরিকল্পনা (Bancor Plan) এবং মার্কিণ প্রস্তাবকে বলা হয় ইউনিটাস্ পরিকল্পনা (Unitas Scheme)।

কেইন্‌সের নেতৃত্বে ব্রিটেন যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিল তাহার মূল কথা ছিল আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে নূতন এক ধরনের মুদ্রা প্রচলন করা। এই পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, এক আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং সংস্থা স্থাপিত হইবে; পৃথিবীর সকল দেশই সেই সংস্থার সভ্য হইবে;

ব্রিটেন কর্তৃক উত্থাপিত কেইন্‌সীয় প্রস্তাব বা ব্যাঙ্কর পরিকল্পনা

ব্যাঙ্কে ব্যক্তি যেমন হিসাব রাখে জাতিসমূহও নিজ নিজ নামে ক্লিয়ারিং সংস্থায় সেইরূপ হিসাব রাখিবে; স্বর্ণের সহিত নির্দিষ্টহারে নির্ধারিত ব্যাঙ্কর (Bancor) নামে নূতন আন্তর্জাতিক অর্থে এই হিসাব রক্ষিত হইবে। আন্তর্জাতিক লেনদেন হইতে উদ্ভূত সকল দেনাপাওনা এই টাকার হিসাবে ক্লিয়ারিং সংস্থার নিকট জাতির জমা বাড়াইয়া বা কমাইয়া মিটাইয়া ফেলা হইবে। সংস্থার সভ্য হইবে সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ইহাদের নামেই এই হিসাব রক্ষিত জমার হিসাব বাড়িতে থাকিবে; লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হইতে থাকিলে সংস্থার নিকট রক্ষিত জমার হিসাব কমিতে থাকিবে। যাহাতে জমা ক্রমাগত বৃদ্ধি বা হ্রাস না পায় সেই জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে; এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহাতে লেনদেন ব্যালান্সের আনুকূল্য বা প্রতিকূলতা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই দূরীভূত হইয়া যাইতে পারে। প্রত্যেকটি সভ্য-রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধ করিলে সংস্থা হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ওভারড্রাফট্ লইতে পারে ঐরূপ ব্যবস্থা থাকিবে; ইহার ফলে কোন একটি দেশ অপর কোন দেশের দেনা মিটাইবার জন্য কিছুটা সময়ও পাইবে।

আমেরিকার পরিকল্পনায় একটি আন্তর্জাতিক স্থায়িত্ব-সাধনকারী ভাণ্ডার (International Stabilization Fund) স্থাপনের কথা বলা হইয়াছিল। নিজ দেশের কিছু মুদ্রা সকল সদস্য রাষ্ট্রই এই ভাণ্ডার-কর্তৃপক্ষের হাতে জমা দিবে, অন্য রাষ্ট্রের নিকট বিক্রয়ের জন্য তাহা ব্যবহৃত হইবে। সকল লেনদেনের রূপই হইবে এক মুদ্রার দ্বারা অপর মুদ্রার ক্রয় ও বিক্রয়, ব্যাঙ্কর পরিকল্পনার ন্যায় কোন আন্তর্জাতিক মুদ্রা সৃষ্টি করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল না। লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল হইলে ভাণ্ডারের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মুদ্রা দ্রুত ফুরাইয়া আসিবে (অন্যান্য দেশ দেনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়া লইবে); লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হইলে ভাণ্ডারের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মুদ্রা মোটেই ফুরাইবে না, ভাণ্ডারের হাতেই থাকিয়া যাইবে (অন্যান্য দেশ ক্রয় করিবে না, কারণ দেনা মিটাইবার প্রয়োজন নাই)।

আমেরিকা কর্তৃক উত্থাপিত হোয়াইট প্রস্তাব বা ইউনিটাস্ পরিকল্পনা

ব্রিটেন ও আমেরিকার পরিকল্পনা লইয়া দুই দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ এবং ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পর নূতন এক পরিকল্পনার উদ্ভব হয় এবং 1944 সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উড্‌স্ নামক স্থানে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনা সম্পর্কীয় চুক্তির দুই অংশ: প্রথম অংশ আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার সংক্রান্ত এবং অপর অংশ আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত। 1956 সালের 27 ডিসেম্বর হইতে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের কার্য সুরু হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার স্থাপন

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সংগঠন ও কার্যাবলী (Organisation and Functions of the I. M. F.):

বৈদেশিক বিনিময় সহজতর করিবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। সকল সভ্যই নিজ দেশের মুদ্রা এবং স্বর্ণ বা ডলারের কিছু পরিমাণ অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা দেয় এবং প্রয়োজন হইলে ভাণ্ডার হইতে অপর দেশের অর্থ ক্রয় করিতে পারে।

880 (আটশত আশি) কোটি ডলার লইয়া এই অর্থ-ভাণ্ডার গঠিত, যাহারা এই ভাণ্ডারের সদস্য তাহারা নিজ নিজ কোটা (Quota) জমা দিয়া এই তহবিল

সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক সদস্যের কোটার 25%, অথবা সরকারী ভাবে রক্ষিত বা ডলারের 10% (উভয়ের মধ্যে যেটির পরিমাণ কম) স্বর্ণ বা ডলারে জমা দিতে হইয়াছে। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অবশিষ্ট অংশ নিজ মুদ্রাতেই জমা দিয়াছে। ছোট ছোট কয়েকটি

ভাণ্ডারের সংগঠনের ও কার্যকলাপ

রাষ্ট্র নিজ কোটার সম্পূর্ণ অংশ জমা দিতে পারে নাই, সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অর্থ-ভাণ্ডারে যোগদান করে নাই। সকল সদস্য রাষ্ট্রই স্বর্ণ বা ডলারের সহিত নিজ মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত করিয়া সরকারীভাবে তাহা ঘোষণা করিয়াছে। সরকারীভাবে নির্দিষ্ট ও ঘোষিত এই বিনিময়হারের উভয় দিকে (ঊর্ধ্বে বা নিম্নে) সর্বাধিক 10% পর্যন্ত বিনিময় হারে পরিবর্তন সদস্যগণ প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেরাই করিতে পারেন ; এবং ভাণ্ডার-কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া বৈদেশিক বিনিময় হারে আরও 10% পরিবর্তন করা চলে। লেনদেন ব্যালান্সে "মৌলিক ভারসাম্যবিহীনতা" (Fundamental Disequilibrium) দেখা দিলেই সরকারী বৈদেশিক বিনিময়হারে এরূপ পরিবর্তন করা সম্ভব ; কিন্তু ভাণ্ডারের কোন নিয়মে বলা হয় নাই যে, কতবার বা কতদিন অন্তর এইরূপ পরিবর্তন করা নিয়মসঙ্গত। স্বর্ণের বা ডলারের সহিত বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময়-হার নির্দিষ্ট হওয়ায় সকল সদস্য-রাষ্ট্রের অর্থের মধ্যেই পারস্পরিক বিনিময়-হার আপনা-আপনি স্থির হইয়া পড়িয়াছে।

লেনদেন ব্যালান্সে প্রতিকূলতা আসিলে বা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেনা হইলে কোন সদস্যরাষ্ট্র এই ভাণ্ডার হইতে অপর দেশের অর্থ ক্রয় করিতে পারিবে। সরকারী ভাবে নির্দিষ্ট দামের উপর $\frac{1}{4}$% হইতে 1% অধিক দামে উহা ক্রয় করিতে হইবে ; ভাণ্ডারের কাজকর্ম চালাইবার উপযোগী ব্যয় এইরূপে পাওয়া যাইবে। কোন সদস্য-রাষ্ট্র প্রতি বৎসর নিজের কোটার 25% পর্যন্ত অন্য দেশের অর্থ ক্রয় করিতে পারেন।* কোন সদস্য দেশ নিজের কোটার 200%-এর অধিক নিজদেশীয় অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা রাখিতে পারিবে। ভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে সুদ দিতে হইবে : দীর্ঘকালের জন্য এবং অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিলে সুদের হার বেশি ; স্বল্পকালের জন্য এবং কম পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিলে সুদের হার কম। ভাণ্ডার কোন

* ভাণ্ডারের বিভিন্ন প্রকার বৈদেশিক মুদ্রা যাহাতে দ্রুত ফুরাইয়া না যায় এবং যাহাতে সদস্যরা ভারসাম্যবিহীনতা দূর করিবার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন—সেই উদ্দেশ্যে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দেশের মুদ্রাকে "দুষ্প্রাপ্য" (Scarce) বলিয়া ঘোষণা করিয়া সেই সদস্য-দেশকে স্বর্ণের বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রয় করিতে বা ভাণ্ডারকে ঋণদান করিতে অনুরোধ জানাইতে পারে।

পরিচালনা

ভাণ্ডারের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করিবে 12 জন লইয়া গঠিত একটি কার্যকরী পরিচালকবৃন্দ (Executive Director); সর্বাধিক কোটাসম্পন্ন পাঁচটি দেশের (সোভিয়েত ইউনিয়ন যোগ না দেওয়ায় ভারতবর্ষ ইহার একজন স্থায়ী সদস্য) পাঁচজন প্রতিনিধি; যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অপরাপর আমেরিকার দেশগুলি হইতে দুইজন; অন্যান্য দেশ হইতে পাঁচজন। কার্যকরী পরিচালকবৃন্দ একজন সভাপতি নির্বাচিত করিবে এবং তিনি কার্যকরী সংস্থার প্রধান হিসাবে ভাণ্ডারের কাজকর্ম পরিচালনা করিবেন।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বৈদেশিক বিনিময়ের বাধানিষেধসমূহ

সাধারণভাবে বলিতে গেলে ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হইল পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও পরিধি বিস্তৃতির জন্য বৈদেশিক লেনদেনের ব্যাপারে সকল প্রকার বাধা নিষেধ অপসারিত করা; সংক্ষেপে বলিলে সকল দেশের অর্থের বহুমুখী রূপান্তরযোগ্যতা (Multilateral convertibility) প্রতিষ্ঠা করা। তাহা সত্ত্বেও বর্তমান অবস্থার প্রয়োজনীয়তা বিচার করিয়া বৈদেশিক বিনিময়ের বাধানিষেধসমূহ (Foreign exchange restrictions) সম্পূর্ণ দূর করার কথা ভাণ্ডারের নিয়মে বলা হয় নাই। পরিবর্তনের যুগে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের সকল পদ্ধতি, এমন কি বহুধা বিনিময় হারও (Multiple Exchange Rates) সচল রাখা যাইতে পারে; তবে সম্ভব হইলেই এবং লেনদেন ব্যালান্সে অবস্থার উন্নতি ঘটিলেই ইহাদের পরিহার করা কর্তব্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ভাণ্ডার হইতে ঋণগ্রহণ না করিয়াই অন্যান্য সকল দেশের দেনা মিটান যায়—এইরূপ অবস্থায় আসিলেই বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাসমূহ পরিহার করা বাঞ্ছনীয় হইবে। 5 বৎসর পরেও এইরূপ ব্যবস্থাদি প্রয়োগ করিতে হইলে ভাণ্ডারের অনুমতি লইতে হইবে, ইহাই নিয়ম দ্বারা স্থির হইয়াছিল। এইরূপে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বিনিময়-কাঠিন্যের (Exchange rigidity) পরিবর্তে বিনিময়-স্থায়িত্ব (Exchange stability) বজায় রাখিতে চাহিয়াছেন এবং কিছু পরিমাণ বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ (Exchange control) বজায় রাখিয়া বিনিময়-নমনীয়তা (Exchange flexibility) আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কেইন্‌সের প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং সংস্থার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন না আনিলেও ইহার কতকগুলি বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। পরিবর্তনের যুগ শেষ হইলে অর্থের বহুমুখী রূপান্তর-যোগ্যতা ফিরিয়া আসিতে পারে, বহুমুখী বৈদেশিক বাণিজ্য (Multilateral Trading) সুরু হইতে পারে, এরূপ আশার সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনের যুগে

আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের গুণাবলী

বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া এই সংস্থা সকল দেশকে যুদ্ধজনিত অবস্থা পার হইয়া আসার সুযোগ দিয়াছে—ইহা সঠিক অবস্থা-বিচার ও বুদ্ধির পরিচায়ক। তৃতীয়ত, বিভিন্ন দেশের কোটা একত্রে মিলাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন কিছুটা সহজ করিয়াছে; কোটার পরিমাণ অল্প হইলেও লেনদেন-ব্যালান্সে সাময়িক ভারসাম্যের বিচ্যুতি দূর করিতে কিছুটা সাহায্য করিয়াছে। চতুর্থত, দেনাদার দেশগুলির ঋণভার লাঘব করিতে পাওনাদার দেশগুলিও যে কিছুটা কর্তব্য আছে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে সেই বোধ জাগ্রত হইয়াছে।

যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব বজায় থাকিলে আন্তর্জাতিক

আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের দোষাবলী বা কিছুটা অসাফল্যের কারণ

অর্থভাণ্ডার সাফল্য লাভ করিতে পারে, তাহার অভাব-ই ইহার অসাফল্যের কারণটি সৃষ্টি করিয়াছে। তাহা ছাড়া, বহু সদস্য রাষ্ট্র ভাণ্ডারের নিয়ম-বিরোধী কাজ করিলেও সেই সকল বেআইনী কার্যাদি বন্ধ করা অসম্ভব হয় নাই। ভবিষ্যতেও ইহা সম্ভব না হইলে "উন্নত ধরনের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা" গড়িয়া তোলা যাইবে না। যেমন, সোভিয়েট রাশিয়া এই ভাণ্ডারে যোগ দেয় নাই; ফ্রাঙ্ক বা ষ্টার্লিং-এর বহির্মূল্যে নিয়মবিরুদ্ধ পরিবর্তন হইয়াছে; ভাণ্ডার কর্তৃক নির্দিষ্ট দামের ঊর্ধ্বে দক্ষিণ আফ্রিকা স্বর্ণ বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছে। তাহা সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে, বহু বাধা বিপত্তি ও পরস্পর-বিরোধী জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করার এই প্রচেষ্টা খুবই প্রয়োজনীয়; আর কেইন্‌সের ভাষায় বলিতে গেলে কোন ভাল কিছু গড়িয়া তুলিতে হইলে, কোথাও হইতে নিশ্চয় সুরু করা দরকার ("One must begin somewhere")।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (International Bank for Reconstruction and Development)

ব্রেটনস্‌উড চুক্তিতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নতির উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক স্থাপনের কথাও বলা হইয়াছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিতে

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং অনুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, ইহাই এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। সদস্য-দেশগুলি হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া 1000 কোটি ডলার অনুমোদিত মূলধন লইয়া এই ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সকল সদস্য এই ব্যাঙ্কেরও সদস্য বটে।

উদ্দেশ্য

যে সকল ধনশালী দেশে উদ্বৃত্ত মূলধন রহিয়াছে তাঁহারা যদি স্বল্প-মূল্য-ধনশালী দেশে মূলধন প্রেরণ না করেন তাহা হইলে পৃথিবীর সকল দেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারে না; পৃথিবীর কোন অঞ্চলে দারিদ্র্য ধনীদেশের জীবন যাত্রার মান-কেও নিচে টানিয়া রাখে। তাই এই ব্যাঙ্কের গুরুত্ব খুবই বেশি, অনুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে এই ব্যাঙ্ক সাহায্য করিবে।

গুরুত্ব

এই ব্যাঙ্ক হইতে বিভিন্ন দেশের সরকার বা ব্যক্তিদের অর্থ সাহায্য করা হয় এবং ব্যক্তি অর্থসাহায্য গ্রহণ করিলে সেই দেশের সরকার উহাতে নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি (Guarantee) প্রদান করেন। একমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি বা উৎপাদন-শীল কার্যের উদ্দেশ্যেই ঋণ দেওয়া হয়। কোন ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী বিদেশে বিনিয়োগ করিলে ব্যাঙ্ক তাঁহাকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন, নিজেরা ঋণগ্রহণ করিয়া অপরকে ঋণ দিতে সাহায্য করিতে পারেন।

কিরূপে সাহায্য করে

1947 সালের মে মাস হইতে ব্যাঙ্কের কার্য সুরু হইয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারেরর ন্যায় এই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয়; কার্যকরী পরিচালকমণ্ডলীর প্রধানকে প্রেসিডেন্ট বলা হয়।

পরিচালনা

এই ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহা প্রধানত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশসমূহকে সাহায্যদান করিতেই ব্যস্ত এবং সেক্ষেত্রেও ইহার সাহায্যের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। তাহা ছাড়া, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার রাজনৈতিক দলভুক্ত দেশগুলিকেই সাধারণত অধিক সাহায্য করা হয়, অর্থাৎ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সহায়ক হিসাবে ইহাকে ব্যবহার করা হয়, এরূপও বলা হয়। অনুন্নত স্বল্প-মূলধনী দেশগুলি এখন পর্যন্ত বিশেষ সাহায্য ইহা হইতে পায় নাই। আরও বলা হয় যে, উদ্বৃত্ত মার্কিন মূলধনের বহির্নিয়োগ এবং মুনাফাশীল নিয়োগই ইহার প্রধান

সমালোচনা

লক্ষ্য ; ইহা হইল আভ্যন্তরীণ নিয়োগের ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ায় বিদেশী বাজারে মার্কিন বিনিয়োগ চালনা করার সংগঠন।

অনুশীলনী

1. "Our Imports are paid for our Exports"—Elucidate.

2. How is difference in the values of Exports and Imports corrected ?

3. On what factors the gains from International Trade depend ? How the gains can be measured ?

4. "There are limits to the fluctuations in Rate of Exchange." Explain with reference to (*a*) Countries on gold standard (*b*) Countries on Inconvertible paper money.

5. Explain how foreign exchange rates are determined between two countries with Inconvertible paper currencies.

6. Enumerate the influence that bring about fluctuations in the rate of Foreign Exchange.

7. Examine the effects of a Depreciating currency on Foreign Trade.

8. State the case for Free Trade.

9. Discuss the case for Production.

10. Examine the principal arguments for Free Trade and Protection.

11. Do you advocate Free Trade or Protection ? Give reasons in support of your answer.

12. Examine the validity of the different arguments that have been advanced in favour of protection.

13. Compare Import duties and Quantitative restrictions as means of protecting home Industries.

14. Write brief explanatory note on the objects and mechanism of Exchange control.

15. Distinguish between Balance of Trade and Balance of payments. How can a continuous deficit in the balance of payments be corrected ?

১৪

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ঃ সরকারী ব্যয়

Government finances : Public Expenditure

ধনবিজ্ঞানের যে অংশ রাষ্ট্র ও অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠানসমূহের (মিউনিসিপ্যালিটি, করপোরেশন প্রভৃতির) আয়-ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রভৃতির নীতি ও পদ্ধতি আলোচনা করে তাহাকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (Public finance) বলে। এই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েরই অংশ।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি : ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

রাষ্ট্রীয় আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ প্রভৃতি দেশের উৎপাদনের পরিমাণ ও ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করে ; জাতীয় আয়ের পরিমাণে ও জীবন যাত্রার মানে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটায়। রাষ্ট্রীয় আয়ে হ্রাস সমাজের সামগ্রিক আয় কমাইয়া দেয়, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে বৃদ্ধি সামগ্রিক আয় বাড়ায়, দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর-নির্ধারণে রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন ও নীতি ব্যক্তির দৈনন্দিন কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। সুতরাং, ইহা ধনবিজ্ঞানের অংশ-বিশেষ।

চিন্তাজগতে উনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারার প্রভাব এখন আর নাই, রাষ্ট্রের কাজকর্মের পরিমাণে ও ধরণে আধুনিককালে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কেবলমাত্র আইন ও শৃংখলা রক্ষা করাই আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য নহে, ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নতি বা বিভিন্নমুখী অর্থনৈতিক কাজকর্ম করা রাষ্ট্রের কর্তব্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ কম হওয়াই মঙ্গল, উনবিংশ শতাব্দীর অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক এইরূপ ধারণা এমতাবস্থায় আর

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি

চলিতে পারে না। কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করা আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের আদর্শ ; সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার জয়যাত্রা আজিকার যুগে অব্যাহত। এরূপ অবস্থায় ক্রমেই রাষ্ট্রের আয়, ব্যয় ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির আলোচনা তাই ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পার্থক্য (Distinction between Private Finance and Public Finance)

ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মধ্যে বহুক্ষেত্রে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম, ইহা লক্ষ্যণীয় যে, সাধারণত ব্যক্তি নিজের আয় অনুযায়ী ব্যয় স্থির করেন, কিন্তু রাষ্ট্র প্রথমে ব্যয় স্থির করিয়া পরে সেই পরিমাণ আয়সংগ্রহের চেষ্টা করে। যদিও অনেকক্ষেত্রেই রাষ্ট্র ব্যয়সংকোচের চেষ্টা করে এবং আয় অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয়-বিভাগের ব্যবস্থা করে, তাহা হইলেও সাধারণত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী একটু পৃথক থাকে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র নিজের অভ্যন্তরে নাগরিকদের বা রাষ্ট্রের বাহিরে বিদেশীদের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিতে পারে। কোন ব্যক্তির দিক হইতে দেখিতে গেলে সকল ঋণই বাহ্যিক ; ব্যক্তি কখনই নিজের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে না।

তৃতীয়ত, প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র অর্থ সৃষ্টি করিয়া নিজের ব্যয় নির্বাহ করে, কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ অর্থ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

চতুর্থত, কোন ব্যক্তি তাহার বর্তমান আয় হইতে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন, কিন্তু রাষ্ট্র সর্বদাই সেইরূপ উদ্‌বৃত্ত-গঠন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করে না। ঘাট্‌তি ব্যয়ের দ্বারাও দ্রুত শিল্পোন্নয়ন বা পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছান রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। তাহা ছাড়া দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব খুবই বেশি, সর্বদা ইহা মনে রাখিয়াই রাষ্ট্র বর্তমানের আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা করে।

পঞ্চমত, ব্যক্তির ব্যয় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে যেরূপে প্রভাবান্বিত করে তাহা হইতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাবের রূপ পৃথক ধরনের। তাহা ছাড়া, নিজের আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের ফলে সমাজ-দেহে সামগ্রিকভাবে কি প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহা বিচার করিয়া ব্যক্তিগত অর্থনীতি পরিচালিত হয় না ; কিন্তু রাষ্ট্র তাহার কাজকর্ম চালাইবার জন্য সর্বদাই সামগ্রিক প্রভাব ও ফলাফল বিচার করিয়া থাকে।

সর্বশেষে বলা চলে, ব্যক্তি যখন ব্যয় করে তখন সে ব্যয়ের প্রত্যেক দিক হইতে সমান প্রান্তিক উপযোগিতা পাইবার চেষ্টা করে। রাষ্ট্র কিন্তু চেষ্টা করিলেও সাধারণত, উহাতে সক্ষম হয় না। কারণ, রাজনৈতিক, দলগত, শ্রেণীগত বা আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষার জন্য অনেক সময় অর্থনৈতিক হিসাবে

অযৌক্তিক ব্যয় করিতে হইতে পারে; অথবা ভবিষ্যতে সুফলদায়ী কিন্তু বর্তমানে প্রান্তিক উপযোগিতা খুবই কম, এরূপ ব্যয়ের প্রয়োজনও হইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য (The objects of Public Finance):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্রীয় অর্থ নীতির লক্ষ্যই হইবে যথাসম্ভব কম কর আদায় ও ব্যয় করা। তাঁহাদের মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ-ই একমাত্র গ্রহণযোগ্য রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য, সুতরাং অর্থনৈতিক কাজকর্ম ব্যক্তির হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া বিশেষ দরকার। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্র ব্যয় করিলে তাহা অনুৎপাদক হইবেই, অন্তত ব্যক্তিরা ব্যয় করিলে যতটা উৎপাদনশীল হইতে পারিত ততটা কিছুতেই হইবে না। সুতরাং গ্লাড্‌ষ্টোনের ভাষায় বলা চলে, ফলপ্রসূ হইবার জন্য অর্থকে ব্যক্তির পকেটেই ফেলিয়া রাখা দরকার (Money should be left to fructify in the pockets of the individual)।

সর্বনিম্ন পরিমাণ ব্যয়ের নীতি

কিন্তু এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়, এবং আধুনিককালে ইহা বর্জিত হইয়াছে। সাধারণভাবে সকল কর সর্বদাই খারাপ এরূপ বলা চলে না, যেমন নেশার উপর কর সরাসরিভাবে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের সাহায্য করিতে পারে। তাহা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, রাষ্ট্র ব্যক্তির তুলনায় অধিক উৎপাদনশীল ভাবে ব্যয় করিতেছে; ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত বিলাসিতায় বা খেয়াল খুশীতে অযথা ব্যয় করিত, রাষ্ট্র তাহা আদায় করিয়া জনসাধারণের উপকারার্থে ব্যয় করিতেছে। অবশ্য, কর এরূপভাবে আরোপিত হওয়া দরকার যাহাতে ব্যক্তির কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়-স্পৃহা কমিয়া না যায় এবং ব্যয় এরূপ প্রকার হওয়া উচিত যাহাতে উহা অপব্যয়িত হইয়া না পড়ে।

এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় আর একটি নীতি হইল সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতার নীতি (the Principle of maximum social advantage)। ব্যক্তি যেরূপ আয় ও ব্যয়ের মাধ্যমে সর্বাধিক তৃপ্তি পাইতে চাহে, রাষ্ট্রও সেইরূপ এমনভাবে আয় ও ব্যয় করিবে যাহাতে সামগ্রিকভাবে সকল সমাজ সর্বাধিক উপকৃত হয়। রাষ্ট্রীয় আয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় উভয়ের ফলেই কাহারও

সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতার নীতি

হাত হইতে অর্থ সরিয়া আসিতেছে এবং কাহারও হাতে উহা চলিয়া যাইতেছে, সম্পদের হস্তান্তর (transfer of wealth) ঘটিতেছে এবং ইহার ফলে উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণ ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটিতেছে (changes take place in the amount and the nature of wealth which is produced)।

সম্পদের এইরূপ হস্তান্তরণের দ্বারা উহার পরিমাণ ও প্রকৃতিতে এমন পরিবর্তন আনিতে হইবে যাহাতে সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতা ঘটে. ইহাই হইল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির লক্ষ্য।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে সর্বাধিক সামাজিক উপকারিতা পাওয়া যায় কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমত, কর-কাঠামোর প্রকৃতি (Nature of Tax-structure) ও কর পদ্ধতি (Methods of taxation) সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার কর আছে এবং তাহাদেব বিভিন্ন পদ্ধতিতে আরোপ করিয়া রাজস্ব তোলা যাইতে পারে। কোন ধরনের করের ক্ষেত্রে এবং পদ্ধতিতে করভার অধিক, কোথায়ও বা ইহা কম। সুতরাং করের প্রকৃতি ও পদ্ধতি এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহাতে করভার (burden of taxtion) সর্বনিম্ন হয়। দ্বিতীয়ত, কর আরোপনের সর্বশেষ ফলাফল বিচার করাও প্রয়োজন। যদি কর আরোপ করাব ফলে কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়-স্পৃহা কমিয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে সমর্থন করা চলে না। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতি ও দিক্-বিচার (Nature and direction) বিশ্লেষণ করাও বিশেষ দরকার। যেমন বর্তমানে অধিক ভার বহন করিতে হইলেও রাষ্ট্রীয় ব্যয় মূলধন-গঠনের কার্যে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক বিচারে উহা গ্রহণযোগ্য। পরিমাণে রাষ্ট্রীয় বায় কম হইলেও অনেকক্ষেত্রে উহা অপ্রয়োজনীয় দিকে নিয়োজিত হয়, অর্থনৈতিক বিচারে উহা পরিত্যাজ্য। রাজনৈতিক কারণে, দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ শৃংখলারক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যয় খাঁটি অর্থ নৈতিক বিচারে গ্রহণযোগ্য না হইলেও সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থে উহা কল্যাণকর হইতে পারে।

বিচার্য বিষয় সমূহ :
(ক) কর প্রকৃতি ও কর পদ্ধতি
(খ) রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতি ও দিক্ বিচার

আধুনিক কালে শিল্পপ্রধান দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছান-ই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। রাষ্ট্র এরূপ হারে ও এমন প্রকার কর স্থাপন করিবে যাহাতে কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অনিয়োজিত উপকরণ-সমূহের নিয়োগ বাড়ে, আয়স্তর বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের উপযোগী ভারসাম্য বজায় থাকে। এমনভাবে কর আরোপিত হইবে যাহাতে কম ভোগপ্রবণতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরিয়া আসে, এবং এমনভাবে ব্যয় হইবে যাহাতে অধিক ভোগপ্রবণতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট সেই অর্থ চলিয়া যায়; সমাজের মোট বিনিয়োগ ব্যয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। অনেকক্ষেত্রে সমাজে আয়বৈষম্যের পরিধি কমানও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির লক্ষ্য হিসাবে গণ্য হয়।

শিল্পপ্রধান দেশসমূহে পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌছান ও তাহা বজায় রাখা বা আর্থিক অসাম্য দূর করা

শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির লক্ষ্য হইবে দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণ বা অর্থনৈতিক প্রসারকে (economic expansion) ত্বরান্বিত করা। এমনভাবে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থা গঠন করা দরকার যাহাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি (growth) দ্রুততর হইবার উপযোগী মূলধন-গঠনের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উৎপাদন, জাতীয় আয়, বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও মূলধন-গঠন সকল কিছুই যাহাতে একসঙ্গে বাড়িতে থাকে অথচ তীব্র মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে না পারে, ইহা লক্ষ্য রাখা দরকার। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে (Private Sector) আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় না কমাইয়া সরকারী ক্ষেত্রে (Public Sector) বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ক্রমশ অধিক পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইতে থাকে; ইহাই এই নীতির বাস্তব লক্ষ্য।

শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক প্রসারকে ত্বরান্বিত করা

লার্ণারের ফাংশানাল ফিনান্স তত্ত্ব (Lerner's theory of Functional Finance):

অধ্যাপক লার্ণারের মতে, সরকারী অর্থনীতির একমাত্র লক্ষ্য হইবে দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের জাতীয় আয় উৎপন্ন করা। এই উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি ও কাজকর্ম পরিচালিত হইবে, ইহাকেই আমরা ফাংশানাল ফিনান্স বলিতে পারি। তিনি বলেন, "Taxing and spending, borrowing and lending and buying and selling constitute the six fiscal instruments of Functional Finance whose objective is the

ফাংশানাল ফিনান্স কাহাকে বলে

task of adjusting investment and consumption to give full employment."

তাঁহার মতে পূর্ণ-কর্মসংস্থানকে লক্ষ্য ধরিয়া লইলে যে সকল নীতি দ্বারা এই লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে, বাজেট রচনা ও সরকারী কাজকর্ম সম্পর্কে পুরাতন চিন্তা-ধারণা বা রীতিনীতি সম্পূর্ণ বর্জন করিতে হইবে। দেশের জনসাধারণের উন্নতির জন্যই সরকারের প্রতিষ্ঠা, তাই সরকারের নিজস্ব কোনরূপ নীতিকে বিচার করার একমাত্র মানদণ্ড হইল জনকল্যাণ ঘটিতেছে কি না তাহা দেখা। সরকারের নিজের উপর সেই নীতির প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, যে কোন করের দুইটি প্রভাব: করের দরুণ পূর্বের তুলনায় কর-দাতার হাতে টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়, এবং সরকারের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রথম প্রভাবটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যদি লোকের হাতে টাকা কম রাখা দরকার হয়, তবেই যেন সেই করটি বসান হয়। সরকারের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়ানর জন্য যেন কখনই কর-আরোপ করা না হয়, কারণ সরকার যে কোন সময়ে ইচ্ছা করিলেই কোন করদাতাকে দরিদ্র না করিয়াও নিজের হাতে বেশি টাকা পাইতে পারে (নোট ছাপাইয়া বা ঋণ লইয়া)। সুতরাং, লার্ণারের মতে, সরকারের টাকা দরকার, এই যুক্তিতে যেন কখনই কর আরোপ করিয়া টাকা তোলা না হয়। সরকার যদি কোন অর্থনৈতিক লেনদেন বন্ধ করিতে চান, একমাত্র তবেই যেন উহার উপর কর আরোপ করেন। ধনীকে গরীব করা দরকার মনে হইলে একমাত্র তবেই যেন ব্যক্তিদের নিকট হইতে করের নাম করিয়া টাকা তুলিয়া লওয়া হয়, নচেৎ নহে।

করনীতির একমাত্র লক্ষ্য পূর্ণ কর্মসংস্থান

কর-আরোপ এবং সরকারী ঋণনীতি সম্পর্কে লার্ণার একেবারে চরম ধরনের মত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় রাখিয়া সরকারী ঋণের পরিমাণ খুব বেশি পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিলেও কোনরূপ ক্ষতি নাই। তাঁহার মতে, জাতীয় ঋণের পরিমাণ যত বেশিই হউক না কেন, উহার কোনই কুফল নাই, যদি অবশ্য পূর্ণকর্মসংস্থান দেশে বজায় থাকে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট ইহা কোনরূপ ভার নয়, কারণ এই বংশধরগণ ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধের সময়ে নিজেদের টাকা নিজেদেরই নিকট হস্তান্তর করিতেছে। জাতীয় ঋণের

ঋণনীতির লক্ষ্য ও তাই

সুদ দেওয়াও ভারশীল নয়, কারণ, দেশের নাগরিকেরা নিজেরাই নিজেদের টাকা পরিশোধ করিতেছে। প্রতিটি ঋণের পিছনেই কোন না কোন সম্পদ সৃষ্টি হইতেছে সম্পত্তির। একমাত্র বৈদেশিক ঋণই জাতির সম্পদ কমাইয়া দেয়। সুতরাং, প্রয়োজন হইলে সীমাহীন পরিমাণে আভ্যন্তরীণ ঋণ সৃষ্টি করিয়াও দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা সরকারী অর্থনীতির একমাত্র লক্ষ্য, ইহাই লার্ণার বলিতে চাহেন।

রাষ্ট্রীয় ব্যয় (Public Expenditure)

দেশের জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও আয়ের ক্ষেত্রে, তাহাদের জীবন যাত্রার মান প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাব রাষ্ট্রীয় আয় হইতে কিছুমাত্র কম নহে, এই তত্ত্ব আধুনিক যুগের ধনবিজ্ঞানীদের চিন্তা জগতে একটি বিশেষ দান। পূর্বে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণই ছিল খুব কম সুতরাং ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও ফলাফল ধনবিজ্ঞানীদের তত্ত্বালোচনায় অংশ গ্রহণ করে নাই। রাষ্ট্রের কর্তব্যের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায়, রাষ্ট্রীয় ব্যয় দ্রুতগতিতে ও ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িয়া যাওয়ায় এবং কেইন্‌সীয় মতবাদের প্রভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বা সমগ্রালোচন পদ্ধতি (Marco-analysis) প্রসার লাভ করায় ইহার আলোচনা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিতেছে।

পূর্বের তুলনায় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণে বৃদ্ধি

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ অনেক। প্রথমত, আধুনিক কালের রাষ্ট্র আর পূর্বের ন্যায় ক্ষুদ্রায়তন নাই, রাষ্ট্রের সীমানা বর্ধিত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে, ভৌগোলিক সীমানা বর্ধিত না হইলেও ইহার জনসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে; স্বভাবতই সরকারী ক্ষেত্রে (Public sector) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য অধিক অর্থব্যয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তৃতীয়ত, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে, মাথাপিছু ব্যক্তিগত আয় বাড়িতেছে, জীবনযাত্রার মান-ও বৃদ্ধি পাইতেছে। রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় উভয়ই বাড়িতেছে। চতুর্থত, আধুনিক কালে যুদ্ধ চালান বা সমরোপকরণ সংগ্রহ করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধ-প্রস্তুতি, যুদ্ধ-পরিচালনা ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সকল কিছুই রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছে। পঞ্চমত, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসারের ফলে

সাধারণভাবে সর্বত্র আয় ব্যয় বৃদ্ধির কারণ

রাষ্ট্র ক্রমশ অধিক পরিমাণে জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম করিতেছে, ফলে তাহার ব্যয়ও বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন ধরনের শিল্প বা ব্যবসায় রাষ্ট্রের হাতে থাকিলে উৎপাদন-ব্যয় কম পড়ে, উপকরণের অপচয় হয় না। এই সকল কারণে আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় ব্যয় বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ব্যয়ের পরিমাণ সম্পর্কীয় নীতি নির্ধারণ

রাষ্ট্রীয় ব্যয় কতটা কিরূপ হওয়া উচিত তাহার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই, অর্থনৈতিক নীতি এবং জনসাধারণের ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুযায়ী ইহার পরিমাণ ধার্য করা উচিত। তবে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, জাতীয় ও ব্যক্তিগত আয়ের উপর ইহার গভীর প্রভাব থাকায় এইসকল বিষয়কে আকাঙ্খিত স্তরে লইয়া আসিবার উপযোগী পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা উচিত।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Public Expenditure)

বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে শ্রেণীবিভক্ত করা হইয়াছে। যেমন:

(১) প্রথমত, রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে (ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যয় বা কেন্দ্রীয় ব্যয় (খ) রাজ্যের ব্যয় বা প্রাদেশিক ব্যয়, এবং (গ) স্থানীয় ব্যয় বা স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যয়—প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে।

(২) দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে দান (grants) বা ক্রয়মূল্য (Purchase Price)—এইরূপ ভাবে বিভক্ত করা চলে। যে সকল ব্যয়ের দরুণ রাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ কোন দ্রব্য পায় না তাহাদের দান বলে, কিন্তু কোন দ্রব্য বা কার্যাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যে ব্যয় করে, তাহাকে ক্রয়মূল্য বলা হয়।

(৩) তৃতীয়ত, যে সকল ব্যয়ের ফলে দেশের সম্পদ-সম্ভার বৃদ্ধি পায় তাহাকে উৎপাদনশীল (Productive) ব্যয় বলা যায়, যাহাদের ফলে কোনরূপ সম্পদ সম্ভার বর্ধিত হয় না, তাহাদের অনুৎপাদক (Unproductive) ব্যয় বলা হয়।

(৪) চতুর্থত, ডাল্টন এর মতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়: (ক) বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার হাত হইতে দেশকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয়, এবং (খ) সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যয়।

(৫) পঞ্চমত, আসল-ব্যয় (Real Expenditure) এবং হস্তান্তর-ব্যয়

(Transfer Expenditure)—এই দুই শ্রেণীতেও ইহাকে বিভক্ত করা চলে। যে সকল ব্যয়ের ফলে সমাজের উপকরণ বা সম্পদ সমূহের ব্যবহার হয়, তাহাদের আসল-ব্যয় বলে, যেমন যুদ্ধ বা দ্রব্যোৎপাদন প্রভৃতি। কিন্তু যে সকল ব্যয়ের ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বা ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ হস্তান্তরিত হয় মাত্র, যেমন আভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধ বা সুদ প্রদান প্রভৃতি—তাহাদের হস্তান্তর-ব্যয় বলা হয়।

(৬) ষষ্ঠত, প্লেহ্নের মতে জনসাধারণের পক্ষে কতটা কল্যাণকর, ইহা বিচার করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে চারি ভাগে ভাগ করা সম্ভব।

(ক) যে সকল ব্যয় সকল নাগরিকের পক্ষে সমান কল্যাণকর, যেমন পুলিশ, সৈন্যবাহিনী, প্রভৃতি (খ) যাহা কোন কোন শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ কল্যাণকারী, কিন্তু সামগ্রিক ভাবেও কল্যাণকর বলিয়া বিবেচ্য, যেমন সমাজবীমা প্রভৃতির জন্য ব্যয়। (গ) যাহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকারী এবং সকলের পক্ষে কল্যাণকর, যেমন বিচার বিভাগের জন্য ব্যয়। (ঘ) যাহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর, যেমন সরকারী চাকুরীতে বা সরকারী শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য ব্যয়।

সরকারী ব্যয় ও জাতীয় আয় (Public Expenditure and National Income) :

সরকারী ব্যয় সম্পর্কে রাষ্ট্রের নীতি কি হওয়া উচিত তাহা সঠিক বিচার করিতে হইলে জাতীয় আয় নির্ধারণকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। জাতীয় আয় বলিতে আমরা কি বুঝি? ইহা হইল দেশের সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য অথবা সকল উপাদানের আয়ের সমান। এই দুইটির যোগফল পরস্পর সমান হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন I বৎসরের মধ্যে, দেশে সকল ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের মূল্য যোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। এই সকল দ্রব্যের মূল্য পাওয়া যায় মোট বিক্রয় হইতে, অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে দেশের লোকের মোট ব্যয় যোগ করিলে জাতীয় আয়ের সমান হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাতীয় ব্যয় ও জাতীয় আয় সমান।

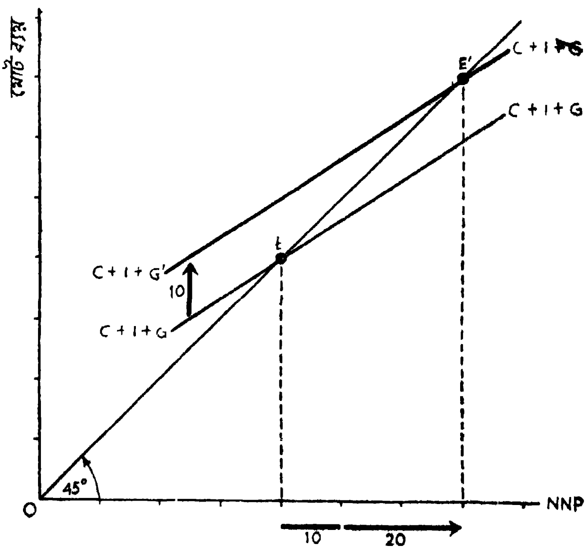
কি কি বিষয় লইয়া জাতীয় আয় গঠিত

জাতীয় ব্যয়ের তিনটি অংশ :—(১) ব্যক্তিগত ভোগব্যয় (C), (২) ব্যক্তিগত বিনিময় ব্যয় (1) এবং, (৩) সরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় (G)। দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিতে হইলে এই সামগ্রিক ব্যয় এত বেশি হইতে হইবে যাহাতে অনিয়োজিত উপকরণসমূহের পূর্ণ নিয়োগ ঘটিতে পারে। সাধারণত অপরিকল্পিত ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে এইরূপ কোন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি নাই যাহাতে সামগ্রিক ব্যয় সর্বদা আপনা-আপনি এই স্তরে বজায় থাকে।

ইহার মধ্যে সরকারী ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ

সার্মগ্রিক ব্যয়ের বিভিন্ন অংশ আলোচনা করা যাউক। ভোগব্যয় নির্ভর করে আয়স্তর ও ভোগপ্রবণতার উপরে। সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব ভোগপ্রবণতা পৃথক হইলেও সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে, আয় ও ভোগের মধ্যে কার্যকারণগত এক ধরনের সম্পর্ক আছে। ভোগ হইল আয়ের ক্রমবর্ধমান অপেক্ষক (increasing function of income), যদিও আয় বৃদ্ধির তুলনায় ইহাতে বৃদ্ধি হয় কম। আয়ের যে অংশ ব্যয় হইল না তাহা সঞ্চয় হয়। কিন্তু সঞ্চয় হইলেই উহার বিনিয়োগ হয় না, কারণ বিনিয়োগ নির্ভর করে উদ্যোক্তাদের মুনাফার প্রত্যাশার উপর। দেশে মোট সঞ্চয়ের একটি অংশ যদি বিনিয়োগ না হয়, তবে আয়স্তর কমিয়া যাইতে বাধ্য। কালক্রম বা ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণের (Period or Sequence analysis) সাহায্যে এই বিষয়টি আরও ভালভাবে বোঝা যাইতে পারে। মনে কর I কালস্তরে সমাজের মোট আয় হইল 10000 টাকা : এই সময়ের মধ্যেই 6000 টাকার ভোগব্যয় এবং 4000 টাকা সঞ্চয় হইতেছে। মনে কর, এই সময়ে দেশের সকল উদ্যোক্তা মিলিয়া 2000 টাকা বিনিয়োগ ব্যয় করিতেছে। ফলে পরবর্তী কালস্তরে অর্থাৎ II-তে, সমাজের আয় হইবে 8000 টাকা। পূর্ববর্তী কালস্তরে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ কম হওয়ায় পরবর্তী কালস্তরে সামগ্রিক আয় হ্রাস পাইল, কিছু পরিমাণ সঞ্চয় মজুত করার (hoarding) ফলে এই অবস্থা দেখা দিয়াছে। সুতরাং I কালস্তরের আয় হইতে যতটুকু ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় হইতেছে তাহাই সৃষ্টি করে II কালস্তরের আয়। I কালস্তরে সমাজের ব্যয়স্রোতে যদি নূতন টাকা ঢালিয়া দেওয়া হয়। (injection of new money) বা মজুত-পরিত্যাগ (dishoarding) সুরু হয়, II কালস্তরে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। এই বিশ্লেষণ হইতে সহজেই বলিতে পারা যায় যে, সরকারী ব্যয়ের প্রভাবে সমাজের আয়-

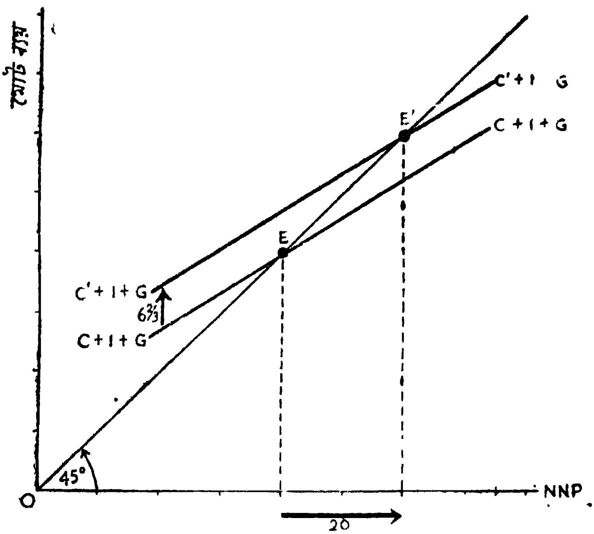
স্রোত প্রভাবিত হয়, মোট ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল এই সরকারী ব্যয় বা G। নিচের ছবিতে দেখা যাইতেছে যে C+I+G হইতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অর্থাৎ C+I+G′-এর ফলে জাতীয় আয়ের স্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে।



পূর্ণকর্মসংস্থানে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় G হইতে বাড়িয়া G′ হওয়ায় জাতীয় আয় ব্যয় ও কর্মসংস্থানের স্তর বাড়িয়া গিয়াছে, E হইতে E′ হইয়াছে। জাতীয় আয়ে এই বৃদ্ধি সম্ভবপর হইতে পারে যদি সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধির ফলে অথবা অন্য কোন কারণে এই সময়ে ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়, অর্থাৎ C এবং I কমিয়া না যায়।

এইরূপে জাতীয় আয়ের উপর কর-হ্রাসের ফলাফলও আমরা পর পৃষ্ঠার চিত্রে দেখিতে পাইতেছি। কর-হ্রাসের ফলে ক্রেতাদের হাতে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বেশি থাকে, ফলে C+I+G-র মধ্যে C বাড়িয়া যায়। নূতন C′+I+G-র ফলে সমাজের মোট ব্যয় এখন E হইতে E′ বিন্দুতে উঠিয়া গিয়াছে। এই চিত্র দুইটি হইতে দেখা যাইতেছে যে, সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধির ফল কর-হ্রাসের ফলের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী।

ইহার কারণ হইল, কর-হ্রাসের ফলে যে আয় বাঁচিয়া যায়, তাহার কিছু অংশ ব্যক্তি সঞ্চয় করে।



যেমন প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা $\frac{২}{৩}$ অবস্থায় 10 কর হ্রাস হইলে CC বৃদ্ধি পাইবে $\frac{২}{৩}\times 10 = 6\frac{২}{৩}$। মনে রাখা দরকার, কর হ্রাসের ফলে সরকারী আয় কমিলেও তাহার ব্যয় সমান আছে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

তিনটি উৎস হইতে সরকার তাহার ব্যয় বাড়াইবার জন্য টাকা সংগ্রহ করিতে পারে: (১) চল্‌তি আয়, (২) পুরানো মজুত, (৩) টাকা তৈয়ারী করা। সরকার যদি চল্‌তি আয়ের উপর কর আরোপ করিয়া টাকা তোলে, তবে উহার ব্যয়ে জাতীয় আয় বাড়িবে কি না তাহা নির্ভর করে যাহারা ঐ কর দিল তাহারা সেই টাকা লইয়া কি করিত তাহার উপর। যদি সেই কর-উত্তোলন সমাজে ব্যক্তিগত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় সংকুচিত করে, তবে জাতীয় আয় পূর্বাপেক্ষা বাড়িতে পারে না। ঋণের সাহায্যেও যদি সরকার এইরূপ টাকা তুলিয়া লয়, তাহা হইলেও ইহার ফল একই দাঁড়াইবে। যদি অবশ্য জাতীয় আয়ের যে অংশ মজুত (hoarded) হইত, সেই অংশ হইতে সরকার টাকাটা তুলিয়া লয়, তবে সরকারী ব্যয় বাড়িলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। সর্বোপরি, যদি নূতন টাকা সৃষ্টির দ্বারা সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি ঘটান

এই ব্যয়ের প্রভাব নির্ভর করে কিরূপে সরকারী আয় হইল তাহার উপর

হয়, তবে অন্যান্য সকল কিছু সমান অবস্থায়, জাতীয় আয় নিশ্চয় প্রসারিত হইবে।

সরকারী ব্যয়ের ফলে জাতীয় আয় কতখানি বাড়িবে তাহা নির্ভর করে গুণক ও ত্বরকের আয়তনের উপর। সরকারী ব্যয় একবার বাড়াইলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্তী স্তর সমূহে উহার প্রভাব ভোগব্যয় ও উদ্ভূত বিনিয়োগ ব্যয়ের মাধ্যমে প্রসারিত হইতে থাকে। শেষ স্তর পর্যন্ত জাতীয় আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের যে পূর্ণ প্রভাব দাঁড়াইবে তাহাকে বলে চাপ-লব্ধ বা ভার-লব্ধ প্রভাব (Leverage effect)।

গুণক ও ত্বরণের দরুণ মোট চাপলব্ধ প্রভাব

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলাফল (Effets of Public Expenditure)

(ক) উৎপাদন (Production) :

ডাল্‌টনের মতে উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাব তিন দিক হইতে বিচার করা যাইতে পারে: কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা (Ability to work and save), কর্মোদ্যাম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা (Desire to work and save), এবং সম্পদ ও উপকরণ সমূহের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন (Diversion of economic resources)। যে সকল ব্যয়ের ফলে জনসাধারণের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়া যায়, যেমন শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য ব্যয়, তাহারা লোকের কর্মোদ্যম বাড়াইতে সাহায্য করে। আয় বৃদ্ধি পায়, সঞ্চয়ের ক্ষমতাও বাড়ে। আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের একাংশ জনসাধারণকে সাহায্য, বেকারভাতা, বৃদ্ধ বয়সে পেন্‌শন্ ইত্যাদি হিসাবে দেওয়া হয়, ডাল্‌টনের মতে ইহার অর্থনৈতিক ফলাফল অশুভ, কারণ ইহা কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহাকে কমাইয়া দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র নিজেই শিল্প প্রতিষ্ঠা করে বা অর্থ-সাহায্য করিয়া বিশেষ ধরনের শিল্প স্থাপনে সহায়তা করে। এইরূপ ব্যয়ের ফলে উৎপাদন-উপকরণসমূহ এক ব্যবহার হইতে সরিয়া আসিয়া অপর ব্যবহারে নিযুক্ত হইতে থাকে, উহাদের নিয়োগে দিক্-পরিবর্তন ঘটে। এইরূপ দিক্-পরিবর্তনের ফলে যদি মোট উৎপাদন ও জাতীয় আয় এবং উপাদান সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় আয়ের ফল অর্থনৈতিক বিচারে সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর বলিয়া বিবেচ্য।

(ক) কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা
(খ) কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা
(গ) উপকরণের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন

(খ) বণ্টন (Distribution) :

এমনভাবে সরকারী ব্যয় করা সম্ভব যাহার ফলে সমাজে আয়-বৈষম্য কমাইয়া ফেলা যায়। যেমন ধনীদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেকারভাতা, বৃদ্ধ বয়সে পেন্‌শন্‌, বিনাব্যয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ব্যয় করিলে আয়-বৈষম্য কিছুটা কমে। ডাল্‌টনের মতে এইরূপ উদ্দেশ্যে ব্যয় প্রগতিমূলক (Progressive) নীতিতে করা দরকার, অর্থাৎ ব্যক্তি যত অধিক গরীব হইবে তত অধিক হারে রাষ্ট্রের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইবে। সরকারী ব্যয়ের সাহায্যে আয়-বৈষম্য কমাইয়া মোটামুটি বণ্টন-সাম্য আনিবার এই নীতির উৎপাদনের উপর প্রভাব অর্থ নৈতিক দিক হইতে শুভকর না-ও হইতে পারে। ধনীদের উপর অধিকহারে কর বসাইলে তাহাদের কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিয়া যাওয়া, অপরদিকে গরীবদের মধ্যে আলস্য বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা কমিয়া যাওয়া—উভয় প্রকার প্রভাবই ঘটিতে পারে।

বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ধন-বণ্টন

(গ) কর্মসংস্থান ও আয় (Employment and Income) :

সমাজে মোট কর্মসংস্থান ও আয়ের স্তর মোট ব্যয়ের পরিমাণের দ্বারা স্থির হয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় মোট ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ। সমাজে ব্যক্তিদের মোট ভোগব্যয় বা বিনিযোগ ব্যয় কমিয়া গেলে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা; সুতরাং এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়াইয়া কর্মসংস্থান ও আয়স্তরে হ্রাস ঠেকান যাইতে পারে। বাণিজ্য-চক্রের সমৃদ্ধির যুগে যখন অত্যধিক ব্যবসায়স্ফীতি ঘটে, তখন রাষ্ট্রীয় ব্যয় হ্রাস করিলে দামস্তরে ও বাণিজ্যে অস্বাভাবিক স্ফীতি কমিতে পারে, বাণিজ্য চক্রের সংকটের যুগে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে বৃদ্ধি দামস্তরে ও বাণিজ্যে উন্নতির সহায়ক হইতে পারে। সমাজে পূর্ণকর্মসংস্থান না থাকিলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়াইয়া অপূর্ণ-কর্মসংস্থান স্তর হইতে ক্রমোন্নতির পথ প্রশস্ত করা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে। উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রেই অবশ্য এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যয়-বৃদ্ধির ফলে যদি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে মোট কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বাড়িবে না, উপাদানসমূহের নিয়োগে দিক্‌-পরিবর্তন হইবে মাত্র।

অপূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিলে বাণিজ্য চক্রের সংকট-কালে বা সংকট প্রতি-রোধের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ব্যবহার

ইহাও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে কি পরিমাণে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহা নির্ভর করে গুণক ও ত্বরকের (Multiplier and Acceleration) আয়তনের উপর।

পূরণকারী ব্যয় (Compensatory Spending) :

যখন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় তখন রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের দ্বারা সেই ফাঁক পূরণ করিতে পারিলে সমাজে সর্বাধিক জাতীয় আয় ও কর্ম-সংস্থান বজায় রাখা চলে। বাণিজ্য-সংকটের যুগে যখন ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় কম, তখন রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হয়; যখন বাণিজ্যোন্নতি (recovery) সুরু হইয়াছে তখন ক্রমশ অধিক পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হয়; চরম-উন্নতির (boom) কাছাকাছি আসিয়া পড়িলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় খুবই কমাইয়া দিতে হয়। পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের পরে মুদ্রা-স্ফীতির যুগে এমন কি ঋণাত্মক রাষ্ট্রীয়-ব্যয় (negative public spending) করিতে হয়, অর্থাৎ ব্যয় না করিয়া করের সাহায্যে অধিক আয় তুলিয়া বাজেটে উদ্বৃত্ত করিতে হয়।

দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান কমিতে থাকিলে এবং বাণিজ্যসংকট গভীরতর হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত ব্যয়ধারা সংকুচিত হইতে থাকে; রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজের ব্যয়স্রোতে অধিক টাকা সঞ্চালিত করা। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র অধিক ব্যয় করিতে থাকিবে। জনসাধারণের মজুত-প্রবণতা (propensity to hoard) বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংকোচনশীল (contractionary) প্রভাবসমূহকে দূর করিয়া প্রসারশীল (expansionary) প্রভাবসমূহকে শক্তিশালী করাই এই প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের উদ্দেশ্য। এইরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ সাধারণত খুবই বেশি হওয়া দরকার; কারণ দেখা যায় যে, সংকটের সময়ে ব্যক্তির ভোগপ্রবণতা স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় আরও কম থাকে, ফলে সমাজের মোট ভোগব্যয়ও কম।

দামস্তর, আয়স্তর ও কর্মসংস্থানের স্তর কমিতে থাকিলে

পূরণমূলক ব্যয় সাধারণত ঘাট্‌তি ব্যয়, কারণ কর-বৃদ্ধির দ্বারা অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে ব্যক্তির হাত হইতে আরও অর্থ সরাইয়া আনা হইবে, ব্যক্তি-ক্ষেত্রে ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয় আরও কমিয়া যাইবে। অবশ্য করের সাহায্যে লুকান মজুত অর্থ আদায় করিতে পারিলে এরূপ কিছু ঘটিবে না। যে অর্থ ব্যক্তির হাতে থাকিলে ভোগে বা বিনিয়োগে নিযুক্ত হইতে পারিত তাহা

করের দ্বারা রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া আনিয়া ব্যয় করিলে উহার প্রসারশীল প্রভাব (expansionary effects) অনেক কম হইবে। শুধু তাহাই নহে। রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে সর্বাধিক প্রসারশীল প্রভাব পাইতে হইলে এরূপভাবে উহা ব্যয় করা দরকার যে, যাহাদের হাতে সেই ব্যয় ব্যক্তিগত আয় হিসাবে যাইবে তাহারা উহা মজুত না করিয়া পুনরায় ব্যয়ে প্রবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ, এরূপ ভাবেই রাষ্ট্রীয় ব্যয় হওয়া দরকার যে, সমাজে যে-শ্রেণীর লোকের ভোগপ্রবণতা সর্বাধিক তাহাদের হাতেই উহা আয় হিসাবে চলিয়া যায়।

দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিলে এবং সমাজ চরমসমৃদ্ধির (boom) দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত ব্যয়ধারা বিস্তৃত ও প্রশস্ত হইতে থাকে, রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজের ব্যয়স্রোত হইতে ক্রমশ অধিক পরিমাণে অর্থ তুলিয়া লওয়া। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ব্যয়-সংকোচন করিতে থাকিবে। ব্যক্তি-ক্ষেত্রে ব্যয় যত বাড়িতে থাকিবে, রাষ্ট্র নিজের ব্যয় তত কমাইবে। যে পর্যন্ত উপাদানের পূর্ণনিয়োগ না ঘটে সেই পর্যন্ত কিছু পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে থাকিবে। পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরের কিছু পূর্ব হইতেই এইরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের সংকোচন প্রয়োজন হইবে; যদি সেই স্তরের পরেও অর্থনৈতিক কাজকর্ম প্রসার লাভ করিতে থাকে তাহা হইলে ঋণাত্মক রাষ্ট্রীয় ব্যয় করিতে হইতে পারে অর্থাৎ করবৃদ্ধির দ্বারা ব্যয়ের তুলনায় আয়াধিক্য সৃষ্টি করার প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতিমূলক প্রসার রোধ করিবার উদ্দেশ্যে বাজেটে উদ্বৃত্ত করিতে হইবে।

দামস্তর, আয়স্তর ও কর্মসংস্থানের স্তর বাড়িতে থাকিলে

আধুনিককালের ধনবিজ্ঞানীরা পূরণমূলক ব্যয়ের সঙ্গে পাম্প-প্রাইমিং ব্যয়ের (Pump-priming expenditure) বা উত্তোলন-মূলকব্যয়ে পার্থক্য করিয়া থাকেন। পূরণমূলক ব্যয় বলিলে বোঝা যায় পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের তুলনায় দেশের সামগ্রিক ব্যয় যতখানি কম থাকে সেই ফাঁকটুকু সরকারী ব্যয় দ্বারা পূরণ করা। আর, পাম্প-প্রাইমিং ব্যয় বলিলে বোঝা যায় অবনতি বা সংকটেরসময়ে সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে এমন পরিমাণ টাকা একবার ঢালিয়া দেওয়া যাহার ফলে, আর কোন সরকারী ব্যয় না করিলেও, অবনতি বা সংকটের মোড় ঘুরিয়া দেশে উন্নতির যাত্রা সুরু হইতে পারে। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের নিরাশার মনোভাবে পরিবর্তন আনিয়া আশার সঞ্চার করাই প্রকৃতপক্ষে এই পাম্পিং-ব্যয়ের কাজ, কারণ একমাত্র তাহা হইলেই একবারের

সরকারী ব্যয় দেশে উন্নয়নের নিজস্ব গতিবেগ সৃষ্টি করিতে পারে। পূরণমূলক ব্যয়ের এইরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকে বলিয়া ধরা হয় না। অবশ্য ইহা ঠিক যে, প্রকৃতপক্ষে, পূরণমূলক ব্যয়ের পাম্প-প্রাইমিং প্রভাব দেখা যায়, আবার পাম্প-প্রাইমিং ব্যয় কিছুটা পূরণমূলক বটে। কিন্তু ইহাদের কার্যপদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বাস্তবে কখনই পাম্প-প্রাইমিং নীতি বিশেষ কার্যকরী হয় না; অবনতির গহ্বর হইতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে টানিয়া তুলিতে হইলে পূরণমূলক ব্যয়ের নীতিরই অধিকতর সাফল্য লাভের সম্ভাবনা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

অনুশীলনী

1. What is public finance? Is there any essential difference between private finance and public finance?

2. "The basic principles of public finance are the same as those of a family budget". Explain.

3. What are the objectives of public finance in a modern state?

4. What is Functional Finance?

5. What are the causes of increase in Public Expenditure in recent years?

6. Classify Public Expenditure.

7. Discuss how Public expenditure influences National income.

8. What are the effects of Public Expenditure on (*a*) Production, (*b*) Distribution, and (*c*) Employment & Income.

9. What is Compensatory Spending? What are its limitations?

10. Under what circumstances would it be desirable to resort to deficit financing? Can you suggest any safeguards to ensure that it does not produce any adverse effect?

11. What are the principles which should guide public expenditure?

---

* Pump-priming means a volume of public spending, for the purpose of setting the economy on the way towards full utilisation of resources on its own power without further aid from governmental spending......Pump priming is intended to be a remedy for a temporary maladjustment which prevents the society from functioning in a normal manner so as to recover from depression when the economy needs to be shaved off from dead-centre...The concept of pump-priming is different from 'compensation' in that the latter connotes no implications with respect to setting the system going on its own momentum. The latter concept, strictly conceived, implies merely that public expenditures may be used to compensate for the decline in private investment. It may be said to be successful even though it succeeds in achieving a rise in the national income no greater than the volume of expenditures made. Hansen, ***Fiscal policy and Business cycles***, ch 12.

১৫

সরকারী আয় ও করনীতি

Public Revenue and Taxation

রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎসসমূহ (Sources of Public Revenue) ঃ

আধুনিক যুগের রাষ্ট্রসমূহের ব্যয় বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা নিত্য নূতন আয়ের উৎস খুঁজিয়া বাহির করিতেছে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে রাষ্ট্রীয় আযের চারিপ্রকার উৎস আছে : (ক) কর, (খ) দান ও সাহায্য, (গ) শাসনতান্ত্রিক আদায়সমূহ, এবং (ঘ) বাণিজ্যিক আদাযসমূহ।

কোন প্রত্যক্ষ উপকারিতা আশা না করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে ব্যক্তি রাষ্ট্রকে যে অর্থ দিয়া থাকেন, তাহাকে কর বলে। আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলকভাবে এই কর আদায় করা হয় এবং এই করের বিনিময়ে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে, সমপরিমাণ কোন সুবিধা ব্যক্তি লাভ করে না।

অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অন্যান্য সূত্র হইতে সাহায্য পায় যেমন, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাদেশিক সরকারসমূহ আর্থিক সাহায্য পায়। কোন দাতা নির্দিষ্ট কোন কার্যে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে সরকারকে দান হিসাবে কিছু অর্থ দিয়া যাইতে পারেন, এরূপ ভাবেও রাষ্ট্রের আয় হইতে পারে। এইরূপ সাহায্য বা দান উভয়ই দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

শাসনতান্ত্রিক আদায়সমূহ বলিলে বোঝা যায় ফী, লাইসেন্স প্রভৃতি পাইবার জন্য প্রদেয় অর্থ, জরিমানা, বাজেয়াপ্ত জমা, এবং বিশেষ আদায় সমূহ। সাধারণত এই সকল শাসনতান্ত্রিক আদায়গুলি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং ইহার বিনিময়ে কোন কোন উপকার পাওয়া যায়। অবশ্য উপকারের পরিমাণের সহিত প্রদেয় অর্থের পরিমাণের কোন সম্পর্ক থাকে না।

বাণিজ্যিক আদায়সমূহ বলিলে রাষ্ট্র যে সকল দ্রব্য বা কার্য বিক্রয় করে তাহাদের জন্য দানসমূহকে বোঝা যায়। নির্দিষ্ট দ্রব্য বা নির্দিষ্ট কার্যের বিনিময়ে রাষ্ট্র ব্যক্তিদের নিকট হইতে যে দাম পায় তাহাই বাণিজ্যিক আদায়। অবশ্য উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী ফার্মের ক্ষেত্রে যেরূপ গড় বা প্রান্তিক ব্যয় অনুযায়ী দাম নিরূপিত হয়, সরকারী দ্রব্যাদির দাম সেইরূপ হিসাবে নির্ধারিত

না-ও হইতে পারে, রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়া দাম স্থির থাকিতে পারে। অথবা, উহাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার থাকায় একচেটিয়াসুলভ মুনাফা দামের সহিত যুক্ত থাকিতে পারে।

মনে রাখা দরকার যে, এখন পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কর হইতে আদায়ের পরিমাণ অন্যান্য উৎস হইতে আদায়ের তুলনায় বেশি। কিন্তু ক্রমশঃ শাসনতান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক আদায়সমূহ হইতে রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইবার দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে। অবশ্য এইরূপে রাজস্বের সকল উৎসকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। যদি রাষ্ট্রীয় দ্রব্যের বা কার্যের দাম উহার উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক হারে ধার্য করা হয়, তাহা হইলে কার্যত উহা করের পর্যায়ভুক্ত হইল। আবার অনেক রাষ্ট্রীয় কার্যের জন্য ব্যয় করা হয় কিছুটা দাম এবং কিছুটা কর হইতে, যেমন সরকারী কলেজের ছাত্রগণ মাহিনাও দেন এবং আদায়কৃত কর হইতেও তাহাদের জন্য ব্যয় করা হয়।

কর-কানুন (Canons of Taxation)

কর-কর্তৃপক্ষ যে সকল কানুন মানিয়া চলিয়া কর আরোপ করিবে ও আদায় করিবে, তাহাদের কর-কানুন বলা হয়। অ্যাডাম্ স্মিথ চারিটি কর-কানুনের কথা বলিয়াছেন।

সমতার কানুন

প্রথমত, কর প্রদান-ক্ষমতা বা সমতার কানুন। প্রত্যেক দেশের প্রজাগণ সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য তাহাদের প্রত্যেকের কর-প্রদান-ক্ষমতা অনুযায়ী কর দিবে ইহাই প্রথম কানুন। অ্যাডম্ স্মিথের মতে,- প্রদান ক্ষমতা অনুযায়ী কর দিলেই সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে ত্যাগ-স্বীকারের সমতা সাধিত হইবে। এইরূপ ঘটিলে ব্যক্তিগত ভাবে সকল করদাতার আসল ভার (Real burden) এবং সমাজের সামগ্রিক কর-ভার সর্বাপেক্ষা কম থাকিবে।

নিশ্চয়তার কানুন

দ্বিতীয়ত, নিশ্চয়তার কানুন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে যে কর দিতে হইবে তাহার প্রদানকাল, পরিমাণ প্রভৃতি নিশ্চিত থাকা দরকার। অ্যাডাম্ স্মিথের মতে সমতার কানুন হইতেও নিশ্চয়তার কানুন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। করের পরিমাণ ও প্রদানকাল সম্পূর্ণ নিশ্চিত না থাকিলে করদাতাকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়,

ঘুষ এবং অব্যবস্থা বৃদ্ধি পায়, সরকারী বাজেট-গঠনও বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

তৃতীয়ত, সুবিধার কানুন। প্রত্যেক কর এরূপভাবে ও এরূপ সময়ে আরোপিত হওয়া উচিত যাহাতে করদাতাদের বিশেষ সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। এই কানুনের অর্থ হইল করদাতাদের অসুবিধা যেন সর্বাপেক্ষা কম হয়; যখন ও যেভাবে কর দেওয়া তাহার পক্ষে সর্বাধিক সুবিধাজনক, যেন ঠিক সেই সময়ে ও সেই ভাবেই কর আদায় করা হয়। যেমন চাষীর নিকট হইতে কর আদায় ফসল উঠিবার পরে করা উচিত, তাহার পূর্বে নহে।

সুবিধার কানুন

চতুর্থত, ব্যয়-সংকোচের কানুন। প্রত্যেক কর এরূপ হইবে যেন ইহা হইতে রাষ্ট্রের যে আয় হয় তাহার তুলনায় এই কর আদায়েব ব্যয় খুব কম পড়ে। যদি কর হইতে যে রাজস্ব আদায় হয় তাহা সম্পূর্ণ পরিমাণে উহা আদায় করিবার জন্যই ব্যয়িত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই কর অর্থনৈতিক বিচারে আরোপযোগ্য নহে। উপরন্তু ব্যয়সংকোচ কথাটিকে সংকীর্ণ শাসনতান্ত্রিক অর্থে গ্রহণ না করিলে বলা চলে যে, ইহা লক্ষ্য রাখা দরকার যেন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর কর-আরোপের ফলাফল সামগ্রিক ভাবে ক্ষতিকারক না হয়।

কম ব্যয়ে রাজস্বসংগ্রহের কানুন

করকানুনসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রথম কানুন হইতে অন্যান্য তিনটি কানুন পৃথক, কারণ প্রথমটি করনীতি সংক্রান্ত এবং অপর তিনটি কর-আদায় পদ্ধতি সংক্রান্ত।

প্রথম কানুন অর্থাৎ করপ্রদান ক্ষমতা বা সমতার কানুন সম্বন্ধে বলা চলে, ইহা যথেষ্ট অস্পষ্ট ধরনের; কিছুটা নৈতিক এবং কিছুটা অর্থনৈতিক বিবেচনার উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই কানুনটির অস্পষ্টতার আরও কারণ হইল করপ্রদান-ক্ষমতা পরিমাপের কোন বাস্তব মানদণ্ডের উল্লেখ ইহাতে নাই। আরও অসুবিধা হইল, সমানুপাতিক হার বা ক্রমবর্ধমান হার, কোন নীতি গ্রহণ করা উচিত এবং কি পদ্ধতি অনুযায়ী সকলের ত্যাগ স্বীকার সমান করিতে পারা যায়, তাহার সুস্পষ্ট বিচার ইহা হইতে পাওয়া যায় না। 'অন্যান্য কানুনগুলিও অত্যন্ত সাধারণ ধরনের; উহারা শাসনতান্ত্রিক সমস্যা মাত্র, অর্থনৈতিক আলোচনার দিক হইতে গুরুত্বহীন।

কানুনসমূহের সমালোচনা

পরবর্তী কালের ধনবিজ্ঞানিগণ উপরোক্ত কানুনসমূহের সহিত আরও দুইটি নূতন কানুন যোগ করিয়াছেন, তাহারা হইল (ক) উৎপাদনশীলতা, ও (খ) স্থিতিস্থাপকতা। করসমূহ উৎপাদনশীল হইবে, অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কর হইতে অধিকতর রাজস্ব আদায় হইতে থাকিবে (যেমন দ্রব্যাদির উপর কর বসাইলে জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে অধিকতর রাজস্ব আদায় হইতে থাকে)—ইহাই উৎপাদনশীলতার কানুন। স্থিতিস্থাপকতার কানুন হইল, রাষ্ট্রের বা দেশের প্রয়োজনে সেই কর হইতে অধিক আয় করা চলে বা আয় কমাইয়া দেওয়া চলে। কর-কাঠামোর এই নমনীয়তা আধুনিক কালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ বাণিজ্যচক্রকালীন বা উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এইরূপ নমনীয়তা বিশেষ প্রয়োজন।

উৎপাদনশীলতা ও স্থিতিস্থাপকতার কানুন

করসংক্রান্ত নীতিসমূহ (Principles of Taxation):

যে নীতিসমূহ মানিয়া লইয়া রাষ্ট্র জনসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় করে, অর্থাৎ কর-কাঠামো গঠন করার পিছনে যে নীতিসমূহ প্রচলিত থাকে, তাহাদের করসংক্রান্ত নীতি বলা হয়। প্রধান নীতিগুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

(ক) উপকারিতা তত্ত্ব (The Benefit theory):

এই নীতি অনুযায়ী, রাষ্ট্রের আঁওতায় ব্যক্তি যতখানি সুবিধা লাভ করে তাহার করের পরিমাণ সেই অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রের নিকট হইতে ব্যক্তি যত বেশি সুবিধা লাভ করিবে তত বেশি কর তাহাকে দিতে হইবে।

কর আরোপ করার নীতি হিসাবে ইহা মোটেই গ্রহণ যোগ্য নহে। রাষ্ট্র কর্তৃক যে সাধারণ সুবিধাগুলি সকলকে দেওয়া হয়, তাহারই জন্য কর দেওয়া হয়, কোন বিশেষ সুবিধার জন্য নহে। তাহা ছাড়া, সৈন্য, পুলিস বা বিচার-বিভাগ হইতে আমাদের প্রত্যেকের পৃথক সুবিধা পরিমাপের উপায় কি? আরও বলা চলে, যদি গরীব ব্যক্তি ধনীর তুলনায় রাষ্ট্র হইতে বেশি সুবিধা পায় তাহা হইলে তাহাকে অধিক কর দিতে হইবে, ইহা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। তবে সামগ্রিক বিচারে এই তত্ত্ব গ্রহণীয়, অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে বা সকল নাগরিককে একত্রে বিচার করিলে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত মোট সুবিধা অনুযায়ী সামগ্রিক ভাবে সকলে মিলিয়া মোট করভার বহন করা কর্তব্য।

(খ) কার্যের ব্যয় তত্ত্ব (The cost of service Theory):

এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন প্রকার কার্যাদি সম্পন্ন করিতে রাষ্ট্রের যে-ব্যয় করিতে হয়, ব্যক্তির নিকট সেই পরিমাণ কর আদায় করিয়া লওয়া উচিত।

কার্য্যের ব্যয় তত্ত্ব

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নীতির প্রয়োগ অবাস্তব। ডাক বিভাগের দ্রব্যাদির দাম, রেলের ভাড়া, সরকারী বাসের ভাড়া বা সরকারী কারখানা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে বটে; কিন্তু সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্রের কি-পরিমাণ ব্যয় হয় তাহার অংশ নিরূপণ করা সম্ভব নহে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বৃদ্ধ বয়সে পেনশনভোগিগণ প্রতি মাসের পেনশন তো ফেরত দিবেনই, উপরন্তু সরকারী পেনশন দপ্তরের আংশিক ব্যয়ভারও তাঁহারা বহন করিবেন।

সমালোচনা

(গ) প্রদানক্ষমতা তত্ত্ব (Ability to Pay Theory):

এই তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যক্তি তাহার কর প্রদানক্ষমতা অনুযায়ী রাষ্ট্রকে কর দিবেন। রাষ্ট্র সকলের স্বার্থরক্ষার জন্য স্থাপিত সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান, সুতরাং সকলেই নিজের সাধ্যমত ইহাকে কর দিবেন—ইহাই প্রদানক্ষমতার তত্ত্ব। অ্যাডাম্ স্মিথও তাঁহার করকানুন-সমূহের মধ্যে ইহাকে প্রথম স্থান দিয়াছেন। নৈতিক বা অর্থনৈতিক বিচারে ইহা সর্বোত্তম, ন্যায়সঙ্গতও বটে, সুতরাং আধুনিক কালে এই তত্ত্বই গৃহীত হইয়াছে।

প্রদানক্ষমতা তত্ত্ব

কিন্তু এই তত্ত্বানুযায়ী বাস্তবে প্রয়োগগত নীতি নির্ধারণ করিবার সময়ে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়; কারণ করপ্রদান ক্ষমতা পরিমাপের কোন সঠিক ও উপযুক্ত মানদণ্ড পাওয়া যায় না।

প্রয়োগগত অসুবিধা

পূর্বে ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণকেই কর প্রদানক্ষমতার মানদণ্ড হিসাবে ধরা হইত। অধিক সম্পত্তি থাকিলে কর অধিক; সম্পত্তি কম থাকিলে কর কম। কিন্তু দেখা গেল যে, কর প্রদানক্ষমতা পরিমাপের আদর্শ মান হিসাবে সম্পত্তিকে গ্রহণ করা চলে না। অনেক ব্যক্তির প্রচুর আয় অথচ সম্পত্তি কম, তাঁহারা করের আওতায় পড়েন না; কর প্রদানক্ষমতা অধিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা কর হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

প্রদান-ক্ষমতা পরিমাপের মানদণ্ড: সম্পত্তি: সমালোচনা

ব্যক্তিগত ব্যয় : সমালোচনা

এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য অনেকের মতে ব্যয়কে প্রদানক্ষমতার মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করা উচিত। এই মতানুসারে, যাঁহারা অধিক ব্যয় করেন, তাঁহাদের কর-প্রদানের ক্ষমতা বেশি, এইরূপ ধরিয়া লওয়া চলে। কিন্তু ইহা ঠিক নয়; কারণ ব্যক্তির পোষ্য বেশি থাকিলে বা অসুখ-বিসুখের জন্য ব্যয় বেশি হইলে উহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে, তাহার কর-প্রদানক্ষমতা অধিক।*

ব্যক্তির আয়

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আধুনিক কালে আয়কেই কর-প্রদান-ক্ষমতা পরিমাপের সঠিক মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। সাধারণত, উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অধিক হারে কর এবং নিম্ন আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর স্বল্পহারে কর আরোপ করা হয়। বলা হয় যে, এইরূপেই সকল ব্যক্তির মধ্যে ত্যাগ-স্বীকারে সমতা আনা যাইতে পারে।

সমালোচনা

কিন্তু আয়কেও সম্পূর্ণরূপে সঠিক ও নিখুঁত মানদণ্ড বলা চলে না। ব্যক্তির আর্থিক আয় তাহার কর-প্রদানক্ষমতার সঠিক পরিচায়ক নহে, কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা পৃথক, ফলে দুই ব্যক্তির আর্থিক আয় সমান হইলেও উভয়ের কর-প্রদানক্ষমতা পৃথক হইতে পারে। তাহা ছাড়া, উভয়ের আর্থিক আয় সমান হইলেও উভয়ের প্রয়োজনীয় ব্যয়-পরিমাণে পার্থক্য থাকিতে পারে। উপরন্তু, উভয়ের ত্যাগস্বীকারে যথেষ্ট তারতম্য থাকা সম্ভব। সমান পরিমাণ আয় করিতে কাহারও অধিক পরিশ্রম করিতে হইতে পারে; কাহারও-বা কম পরিশ্রম করিতে বা কোন পরিশ্রমই না করিতে-হইতে পারে।

সুতরাং ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা সঠিক নিরূপণ করিতে হইলে আয়ের সহিত আরও কয়েকটি বিষয় একত্রে বিচার ও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

* এতদসত্ত্বেও আধুনিক ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্যাল্ডরের মতে ব্যক্তিগত ব্যয়কর স্থাপন করা বৈজ্ঞানিক নীতিসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার মতে (ক) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আয় গোপন করিয়া কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে। (খ) তাহা ছাড়া, আয়ের উপর অধিক কর স্থাপন করিলে কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা কমিয়া যায়। ব্যয়ের উপর কর কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহাকে ব্যাহত করে না। (গ) তাহা ছাড়া বর্তমানের আয়-বৈষম্য কমাইতে হইলে বা সম্পদের পুনর্বণ্টন করিতে হইলে ব্যয়-কর অধিকতর উপযোগী। (ঘ) ধনিব্যক্তিগণ পুরানো মজুত সম্পদ, সম্পত্তি ও মূল্যবান অলঙ্কারাদি হইতে যথেষ্ট আয় অথবা সুখ-সুবিধা ভোগ করেন, তাহাদের কর-প্রদানক্ষমতা অধিক, অথচ ইহারা আয়করের আওতায় আসেন না। ব্যয়-কর স্থাপিত না হইলে তাঁহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে কর আদায় করা যায় না।

স্যার জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে আর্থিক আয়ের পরিমাণের সহিত আরও পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা নির্ধারণ করা দরকার। প্রথমত, কাল-বিচার (Time Test)। দেখা দরকার যে, কোন্ সময়ে ব্যক্তির আয় হইল। সাধারণত, পূর্ববর্তী বৎসরে আয়ের উপর বর্তমান কর লওয়া হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী বৎসরে লাভ হইলেও হয়তো বর্তমান বৎসরে প্রভূত লোকসান হইতেছে, সুতরাং কর দেওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। তাই যখন আয় হইল তখনই কর আরোপ করিয়া উহা আদায় করিয়া লওয়া দরকার। ইহাকেই 'আয়-করো-আর দিতে-থাকো' ব্যবস্থা (Pay-as-you earn) বলা হয়। শুধু তাহাই নহে, ইহাও দেখা দরকার ব্যক্তির ওই আয় নিয়মিত বা অনিয়মিত কি না। উপরন্তু ওই আয় পাইবার জন্য ব্যক্তি সারাবৎসর পরিশ্রম করিয়াছে, অথবা আংশিক পরিশ্রম করিয়া অবশিষ্ট কাল আলস্যে কাটাইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য রাখা দরকার। দ্বিতীয়ত, নীট-আয় বিচার (Pure-Income test)। দেখা দরকার যে, সেই আয় পাইবার জন্য কিরূপ আনুষঙ্গিক ব্যয় বা যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। তৃতীয়ত, আয়ের উৎস বিচার (Income Source Test)। লক্ষ্য রাখিতে হইতে হইবে যে, সম্পত্তি বা পরিশ্রম কোন্‌টির মাধ্যমে আয় হইতেছে; সম্পত্তি হইতে আয় হইলে অধিক হারে এবং পরিশ্রম দ্বারা আয় হইলে কম হারে কর বসানো সঙ্গত। চতুর্থত, পারিবারিক অবস্থা বিচার (Domestic circumstances Test)। পরিবারে পোষ্যসংখ্যা অধিক হইলে কম হারে, এবং সংখ্যা কম হইলে অধিক হারে, কর আরোপ করা যুক্তিযুক্ত। পঞ্চমত, উদ্বৃত্ত-বিচার (Surplus-Test)। দেখিতে হইবে যে, আয়ের মধ্যে উদ্বৃত্তের অংশ কতখানি; ব্যয় করিয়া কিরূপ উদ্বৃত্ত থাকে। শুধু তাহাই নহে; নিম্নতম যোগান-দামের (Minimum Supply Price) তুলনায় ব্যক্তির আয় কত অধিক।

আয় অনুযায়ী সঠিক কর-প্রদানক্ষমতা নির্ধারণের পাঁচটি বিচার
১। কালবিচার
২। নীট-আয়বিচার
৩। আয়-উৎস বিচার
৪। পারিবারিক অবস্থা বিচার
৫। উদ্বৃত্ত-বিচার

(ঘ) অর্থনৈতিক নীতির হাতিয়ার (Instrument of economic policy):

উপকারিতা, কার্যের ব্যয়, প্রদানক্ষমতা বা ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি বিচার

না করিয়া অনেকক্ষেত্রে ছোটখাট বহু নীতি অনুযায়ী কর ধার্য করা হয়।

অবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী কর-নীতি নির্ধারণ

রাষ্ট্রের প্রধান অর্থনৈতিক নীতিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে অনেকক্ষেত্রে করনীতি রচিত হয়। যেমন, দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য, কোন দ্রব্যের ব্যবহার কমাইবার জন্য (যেমন নেশার দ্রব্যাদি), যুদ্ধের সময়ে সমরোপকরণ পাইবার জন্য, জনসাধারণের ভোগ কমাইবার উদ্দেশ্যে, প্রভৃতি নানারূপ কারণে কর আরোপ করা যাইতে পারে।

শিল্পোন্নত দেশসমূহের পূর্ণকর্মসংস্থান বা আয়-বৈষম্য কমানো

আধুনিক কালে শিল্পোন্নত দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছানো, অথবা আয়-বৈষম্য কমানো, ইহাই করস্থাপনের পিছনে প্রধান নীতি। ব্যক্তির নিকট হইতে এরূপভাবে কর আদায় করিতে হইবে যাহাতে সমাজের মোট বিনিয়োগ ও সঞ্চয় না কমে এবং ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্য-চক্রের সংকটকালে কর-হার কমাইয়া অধিক অর্থ ব্যক্তিদের হাতে ভোগ বা বিনিয়োগ-ব্যয়ের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়, সমৃদ্ধির কালে কর-হার বাড়াইয়া ব্যক্তিদের হাতে ভোগ ও বিনিয়োগের জন্য অর্থ কম রাখা হয়। ভোগব্যয় বাড়াইবার জন্য ভোগ-প্রবণতা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে বিক্রয়-কর কমানো চলে, অথবা ধনীদের দ্বারা ব্যবহৃত দ্রব্যাদির উপর বিক্রয় কর অধিক রাখিয়া গরীবদের দ্বারা ব্যবহৃত দ্রব্যাদির উপর বিক্রয় কর কমাইয়া দেওয়াও সম্ভব।

অনুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক প্রসার

শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে করস্থাপনই হইল প্রধান নীতি। কিরূপভাবে করস্থাপন করিলে দ্রুত শিল্পসম্প্রসারণ ঘটিবে বা অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি (economic growth) ত্বরান্বিত হইতে পারে তাহা বিচার করিয়া কর নিরূপণ করা হয়। অযথা বিলাস-দ্রব্যের বা ভোগ্যদ্রব্যের ক্রয় কমাইয়া সঞ্চয় স্পৃহা ও কর্মোদ্যম বাড়ানো, দেশে মূলধন-গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত মজুত (hoards)-সরাইয়া আনিয়া সরকারী ক্ষেত্রে অধিকতর বিনিয়োগ—এই সকলই অনুন্নত দেশসমূহের কর-সংক্রান্ত প্রধান নীতিসমূহ।

করভার বণ্টন সংক্রান্ত অনুপাতিক হারের এবং ক্রমবর্ধনশীল হারের নীতি (Principles of Proportion and Progression)

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে করভারের বণ্টনসংক্রান্ত নীতি আলোচনা করিলে তিনপ্রকার নীতি দেখিতে পাওয়া যায়: আনুপাতিক, ক্রমবর্ধনশীল ও ক্রমহ্রাসমান।

আনুপাতিক, ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান

আয় যাহাই হউক না কেন, সকল আয় হইতে একটি নির্দিষ্ট হারে কর আদায় করিবার নীতি অনুসরণ করিলে তাহাকে (Proportional Tax) বলা হয়। উচ্চস্তরের আয় হইতে ক্রমশ অধিক হারে কর আদায় করিবার নীতি অনুসরণ করিলে তাহাকে ক্রমবর্ধমান কর (Progressive Tax) বলা হইয়া থাকে। অধিক আয়স্তরের ব্যক্তিদের নিকট হইতে ক্রমশ কম হারে কর আদায় করিবার নীতি অনুসৃত হইলে উহাকে বলা হয় ক্রমহ্রাসমান কর (Regressive Tax)। ইহা ক্রমবর্ধমান নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণভাবে আনুপাতিক ও ক্রমবর্ধমান-হারের নীতি দুইটিই প্রধান ও আলোচ্য।

আনুপাতিক নীতি অনুযায়ী করস্থাপনের পদ্ধতি খুবই সরল এবং ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল আয়বণ্টনের বর্তমান ধরনে কোনরূপ পরিবর্তন না আনা। সকল ব্যক্তিই যদি তাঁহার আয় হইতে নির্দিষ্ট একই হারে কর দেন, তাহা হইলে কর আদায়ের পরেও বণ্টনের কাঠামোতে কোনরূপ পরিবর্তন আসে না। অ্যাডাম্ স্মিথের কর-সংক্রান্ত প্রথম কানুনে তাই এইরূপ করস্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। এই নীতির গুণ হইল ইহার সারল্য। কিন্তু নিছক প্রয়োগগত সরলতাই কর-নীতি নিরূপণের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইতে পারে না। তাছ ছাড়া ইহা সম-ত্যাগ নীতির বিরোধী। কারণ, উচ্চ আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা কম এবং নিম্ন আয়-শীল ব্যক্তির ক্ষেত্রে টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা অধিক। যেমন, 100 টাকা আয়কারী ব্যক্তির নিকট 5 টাকা এবং 1000 টাকা আয়কারী ব্যক্তির নিকট 50 টাকা কর লইলে তুলনামূলকভাবে প্রথম ব্যক্তিকে অধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়।

আনুপাতিক নীতির গুণ ও দোষ

ক্রমবর্ধনশীল কর (Progressive Taxation):

অ্যাডাম স্মিথের করকানুন সংক্রান্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার ক্ষমতা অনুযায়ী রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য কর

দিতে প্রস্তুত থাকিবে। ক্ষমতা অনুযায়ী কর দেওয়ার কথাতে স্মিথ প্রধানত সমানুপাতিক করের কথা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক কালে ক্ষমতার নীতি অনুযায়ী কর আরোপ কথা বলিতে প্রধানত ক্রমবর্ধনশীল করের কথাই বোঝায়। বর্তমান কালের সকল রাষ্ট্রেই ক্রমবর্ধনশীল হারে করের নীতি মানিয়া লইয়াছেন। এই নীতির পক্ষে তত্ত্বগত দিক হইতে গুরুতর যুক্তি ততটা নাই, কিন্তু সকল দেশের জনমতের সমর্থনের উপর ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত। আয়-বৈষম্য দূর করা উচিত এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের মধ্যে দেখা যায়, আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ অধিকাংশ অধিবাসীদের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত হয় বলিয়া এই ক্রমবর্ধনশীল করনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তবুও বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিরা ইহার স্বপক্ষে যে-সকল তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে উহাদের মধ্যে কয়েকটিকে আলোচনা করিতে পারি।

• স্বপক্ষে যুক্তি কি কি

ক্রমবর্ধনশীল করের স্বপক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির ভিত্তি হইল ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার নিয়ম। দ্রব্যসামগ্রীর মত টাকার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ব্যক্তির হাতে ইহার পরিমাণ যত বাড়িতে থাকে, টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা তত কমে। তাই কোন এক ব্যক্তির 100 টাকা আয় হইতে শেষ টাকাটি লইয়া আসিলে যে তৃপ্তি-হ্রাস হয়, উহাপেক্ষা কোন ব্যক্তির 1000 টাকা আয় হইতে শেষ টাকাটি সরাইয়া লইলে তৃপ্তি-হ্রাসের পরিমাণ কম। শুধু তাহাই নহে। 1000 টাকা আয় হইতে 10 টাকা লইলেও ত্যাগ স্বীকার সমান হয় না। 100 টাকার আয়ে 1 টাকার যেরূপ গুরুত্ব, 1000 টাকার আয়ে 10 টাকার গুরুত্ব উহাপেক্ষা কম। সুতরাং এই আয় হইতে 10 টাকার বেশি, যেমন, 50 টাকা তুলিয়া লইলে তবেই ত্যাগ-স্বীকারে সমতা দেখা দিতে পারে।

আয়ের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতা

দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক হব্‌সন একটু ভিন্নভাবে ক্রমবর্ধনশীল করনীতিকে সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের মধ্যে দুইটি অংশ দেখা যায়; ব্যয় এবং উদ্বৃত্ত। আয়ের মধ্যে ব্যয়ের অংশের উপর কর আরোপ করা ঠিক নয়, কারণ উহাতে আয়ই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তাই সকল প্রকার করের উদ্দেশ্যই হইল আয়ের ঐ

উদ্বৃত্ত

উদ্বৃত্ত অংশটুকু হইতে কিছুটা পরিমাণ সরাইয়া আনা। হবসনের মতে, আয় যত কম উহাতে ব্যয়ের অংশ বেশি; আবার আয় যত বেশি ততই তুলনা-মূলকভাবে উহাতে উদ্বৃত্তের অংশ অধিক। সুতরাং ক্রমশ বেশি হারে কর আরোপ করিলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ উর্ধ্ব-আয় স্তরে আয়ের মধ্যে অধিকতর উদ্বৃত্তের অংশ হইতে সেই কর আদায় হইবে।

সামাজিক ন্যায়বিচার

তৃতীয়ত, অধ্যাপক মার্শাল ইহাকে সমর্থন করিয়াছেন বণ্টনের দিক হইতে। তাঁহার মতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সম্পদের বিপুল বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ধনীদের হাত হইতে সম্পদ সরাইয়া লইয়া দরিদ্রদের হাতে দিলে সামাজিক ন্যায় বিচার রক্ষিত হয়, রাষ্ট্রের হাতে এই ন্যায়বিচার সাধনের অন্যতম প্রধান অস্ত্র হইল ক্রমবর্ধনশীল কর।

নিম্নতম এবং সমান ত্যাগের নীতি

সর্বোপরি, অধ্যাপক পিগু এই করনীতিকে সমর্থন করিয়াছেন দুইটি তত্ত্বের সাহায্যে: সর্বনিম্ন সামগ্রিক ত্যাগের তত্ত্ব (Least aggregate sacrifice theory) এবং সম-ত্যাগের তত্ত্ব (Equal sacrific theory)। প্রথম তত্ত্ব অনুযায়ী তিনি বলেন যে, বিশেষ একটি স্তরের পরে উচ্চ আয়ের সবটাই রাষ্ট্রের তুলিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু বণ্টনের দিক হইতে (from distributional aspects) ইহা ভাল হইলেও সঞ্চয়, কর্মোদ্যম বা উৎপাদনের দিক হইতে (from announcemental aspects) ইহা ক্ষতিকারক। তাই এই দুই বিরোধী অবস্থার চাপে, মধ্যপন্থা হিসাবে, ক্রমবর্ধনশীল করনীতি সমর্থনের যোগ্য। দ্বিতীয় তত্ত্ব, অর্থাৎ সমত্যাগের নীতি অনুযায়ী তিনি বলেন যে, কোন ব্যক্তির নিকট নিজের টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির হাতে আয়ের মোট পরিমাণ দ্বারা প্রভাবিত হয় না, অন্য লোকের হাতে আয়ের পরিমাণের উপরও তাহা অনেকটা নির্ভর করে। সুতরাং ক্রমবর্ধনশীল করের সাহায্যে মোটামুটি আয়ে সমতা আনার চেষ্টা করা দরকার।

এই সকল যুক্তির ত্রুটি কোথায়

উপরের এই সকল প্রতিটি যুক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনা করা সম্ভবপর। আজকালকার ধনবিজ্ঞানীরা টাকার ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার নীতি মানেন না। অনেকে বলেন যে, আয় বাড়িলে ব্যক্তির প্রয়োজনবোধ ও অভাববোধের পরিমাণ বাড়ে, উহা আরও তীব্র হয়। আন্তঃব্যক্তি উপযোগিতার তুলনা

(interpersonal comparisons of utility) এই নীতির মূল কথা ; তাহাও আর মানিয়া লওয়া চলে না। তাহা ছাড়া, আয় হইতে তৃপ্তি অনেকাংশে নির্ভর করে "প্রতিবেশীর আয়ের উপর" (Jones-factor)। সর্বোপরি, যদি-বা ইহা মানিয়াই লওয়া গেল, কিন্তু কি-হারে ব্যক্তির প্রান্তিক আয়গত উপযোগিতা (marginal income utility) হ্রাস পায় তাহার কোন বাস্তব (objective) মানদণ্ড নাই। সুতরাং ক্রমবর্ধনশীলতার যে-হার বিভিন্ন রাষ্ট্র স্থির করে উহা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক।

দ্বিতীয়ত, হব্‌সনের যুক্তির বিরুদ্ধে বলা চলে যে, আয়ের মধ্যে ব্যয় ও উদ্বৃত্তের যে দুইটি অংশের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন সেই পার্থক্য নিতান্ত মনস্তাত্ত্বিক (psychological), ব্যক্তির ভাবজগতের বিষয়। সর্বশেষ বিশ্লেষণে এই পার্থক্য করার মালিক সেই ব্যক্তি নিজেই। রাষ্ট্র নিজে এই পার্থক্য ধরিয়া লইতে পারে না, কারণ তাহার হাতে ইহা পরিমাপের কোনরূপ বাস্তব মানদণ্ড (objective criteria) নাই। কিসের ভিত্তিতে, তবে ক্রমবর্ধনশীলতার হার স্থির করা সম্ভব ?

তৃতীয়ত, মার্শাল ও পিগুর বক্তব্য সম্পর্কে বলা যায় যে, তাঁহাদের যুক্তি স্থায়-অন্থায়বোধ ও নিজস্ব মনগড়া নীতিবোধের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, 'উচিত-অনুচিত' বলিয়া এই শাস্ত্র কোন কিছু বিশ্লেষণ করিতে পারে না।

অনেক ধনবিজ্ঞানীর মতে ক্রমবর্ধনশীল নীতির পরিবর্তে আমাদের সমানুপাতিক নীতি গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, কারণ ক্রমবর্ধনশীলতার হার নির্ভর করে, সম্পূর্ণভাবে, কর-আরোপকারীদের খেয়াল-খুশির উপর। Mc Culloch বলিয়া গিয়াছেন, "The moment you abandon, in the framing of such taxes, the cardinal principle of exacting from all individuals the same proportion of their income or of their property, you are at sea without rudder or compass, and there is no amount of injustice and folly you may not commit." এই নীতির বিরুদ্ধে আরও বলা হয় যে, করের ক্রমবর্ধনশীলতার দরুন ব্যক্তির সঞ্চয় ও কর্মোদ্যম ব্যাহত হয়, বিনিয়োগের হার কমে, অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হ্রাস পায়।

এই সকল সমালোচনা এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে

ক্রমবর্ধনশীল করনীতি গৃহীত হইয়াছে। কর-আরোপকারীর খেয়ালখুশি অনুযায়ী এই সকল দেশে ক্রমবর্ধনশীলতার হার স্থির হয়, তাহা নহে। সমাজের অধিকাংশ জনমত দেশের আয়-বৈষম্য সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে, তাহাদের সেই মূল্যবোধ ও সাম্যবোধের উপর মোটামুটি ভিত্তি করিয়া এই হার স্থির করা হয়। তাহা ছাড়া, ক্রমবর্ধনশীলতার দরুন দেশের মূলধন-গঠন ব্যাহত হইয়াছে, বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্তও বাস্তবে বিশেষ দেখা যায় না। সর্বোপরি, কেইন্‌সীয় তত্ত্ব ক্রমবর্ধনশীলতার স্বপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সমর্থন যোগাইয়াছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা অধিকাংশই কেইন্‌সীয় তত্ত্বের অনুগামী। তাঁহাদের মতে দেশে বেকারি ও অপূর্ণ কর্মসংস্থান দূর করিতে হইলে এইরূপ কর দরকার। ধনিকদের ভোগপ্রবণতা কম, দরিদ্রদের ক্ষেত্রে ইহা বেশি। আয় বাড়িলে ভোগপ্রবণতা ক্রমশ কমিতে থাকে, তাহাদের আয়ের ক্রমশ বেশি অংশ সঞ্চিত হইয়া জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি ঘটাইতে দেয় না। কার্যকরী চাহিদা বাড়িতে পারে না, কর্মসংস্থান পূর্ণস্তরে উঠিতে পারে না। ধনীদের উপর অধিক হারে কর বসাইয়া সেই টাকা বিভিন্ন উপায়ে দরিদ্রদের হাতে দিলে তবেই সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়ে এবং দেশ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌঁছাইতে পারে। তাই তিনি এই করের সমর্থক। কেইন্‌সের মতে, "Since a policy of full employment requires a high marginal propensity to consume, progressive taxation is apparently necessary for transferring wealth from the rich who have a low marginal propensity to the poor who have a high marginal propensity to consume."

এই বিষয়ে কেইন্‌স্ কি বলেন

করনীতিসমূহ সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা (A further discussion on the Principles of Taxation) :

প্রত্যেকটি দেশেরই কতকগুলি অর্থনৈতিক লক্ষ্য (economic goals) আছে, সেই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সকল অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও নীতি গৃহীত হইয়া থাকে। রাষ্ট্র যে-ধরনের কর ও যে-হার নির্বাচন করিবে তাহা এই অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনের উপযোগী হওয়া দরকার। সে এমনভাবে করের ভার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ছড়াইয়া দিবে যাহাতে এই লক্ষ্যসাধনের প্রচেষ্টা কোনমতেই ব্যাহত না হয়।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেশের করকাঠামো গড়িয়া তুলিতে হইলে যে-ধরনের মানদণ্ড অনুযায়ী আমরা করগুলির উপযুক্ততা বিচার করিব তাহাদের করনীতি (principles of taxation) বলে।

বহুদিন পূর্ব হইতে এই আলোচনার শুরু

সুপ্রাচীন কাল হইতে বিভিন্নভাবে এই আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। মার্কেণ্টাইলিস্ট ও ফিজিয়োক্রাটগণ তাঁহাদের করনীতি প্রচার করিয়াছিলেন; অ্যাডাম স্মিথ তাঁহার বিখ্যাত করকানুন (canons of taxation) ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ক্লাসিকাল যুগের McCulloch, Say, John Stuart Mill সকলেই এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালে Edgeworth, Dalton, Pigou-ও এই বিষয়ে কম আলোচনা করেন নাই। করনীতি সম্পর্কে আলোচনার প্রসার প্রধানত নির্ভর করে অর্থনৈতিক কল্যাণ সম্পর্কীয় তত্ত্বের বা কল্যাণমূলক ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতির উপর; এই শাস্ত্রের বর্তমান রূপের ভিত্তিতে অধ্যাপক Musgrave ইহার আলোচনা করিয়াছেন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্মুখে যে-ধরনের লক্ষ্য থাকে, তাহার উপযোগী ও অনুরূপ করনীতি সেই দেশে গৃহীত হয়। আধুনিককালে, মোটামুটি সকল দেশের সমাজে সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণের উপযোগী তিনটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়: (১) সকল ব্যক্তির কল্যাণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যক্তি:ক তাহার নির্বাচন বা পছন্দের ব্যাপারে সর্বাধিক স্বাধীনতা দেওয়া; * (২) দেশের উপকরণ, উৎপাদনকৌশল, এবং ক্রেতা ও উপকরণ-মালিকদের পছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবনযাত্রার মান সর্বোত্তম করা; † (৩) তৎকালীন সামাজিক ন্যায়বোধের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আয়-বণ্টন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা। ‡ এই সকল অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী দেশের করকাঠামোর তিনটি বৈশিষ্ট্য বা প্রধান নীতি আজকাল গৃহীত হইতেছে। ইহারা হইল:

তিনটি লক্ষ্য অনুযায়ী

(১) অর্থনৈতিক নিরপেক্ষতা (Economic neutrality): দেশের করকাঠামো এমনভাবে গঠিত হইবে যাহাতে উহা সকল উপকরণের সর্বোত্তম

* Maximum freedom of choice consistent with the welfare of others.

† Optimum standards of living, in terms of available resources and techniques and in the light of consumer and factor-owner preference.

‡ A distribution of income in conformity with the standards of equity currently accepted by society.

নিয়োগ-বিন্যাস ও ব্যবহারে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করিবে না; এবং সম্ভব হইলেও এই সর্বোত্তম অবস্থায় পৌঁছিতে সাহায্য করিবে।

তিনটি নীতি

(২) ন্যায় (Equity): সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি যে আয়বণ্টনকে সর্বোত্তম বলিয়া মনে করে, করভারের বণ্টন যেন তাহার অনুরূপ হয়। (৩) করশাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ (Quality of Tax adminstiaticn): দেশের কর-কাঠামো এমন হইবে যেন কর-আদায়ের খরচ, কর-ফাঁকি এবং নাগরিকদের করদানে অসুবিধা সবচেয়ে কম থাকে। এখন একে একে ইহাদের আলোচনা করা যাউক।

প্রথম নীতি হইল যে, অর্থনৈতিক নিরপেক্ষতা (Economic neutrality) রক্ষার জন্য করসমূহ এরূপ ধরনের হওয়া দরকার যাহাতে সমাজে ব্যক্তির অর্থনৈতিক কাজকর্মের ধরনে গুরুতর পরিবর্তন না আনে। অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনের পক্ষে অপরিহার্য কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়া ব্যক্তির কাজকর্মে পরিবর্তন না-আনা করনীতির একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সাধারণত তিন দিক হইতে রাষ্ট্রের কর ব্যক্তির কাজকর্মে পরিবর্তন আনিতে পারে। প্রথমত, ইহা ক্রেতার পছন্দ বদলাইয়া দিতে পারে। যেমন, ধুতি কাপড়ের উপর কর বসিলে লোকে ইহার বদলে প্যাণ্ট ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে, কারণ তুলনামূলক ভাবে প্যাণ্টের দাম এখন কম। দ্বিতীয়ত, করের ফলে কোন উপাদানের মালিক পূর্বাপেক্ষা কম বা বেশি তাহার উপাদান যোগান দিবার সিদ্ধান্ত করিতে পারে। যেমন, আয়কর বেশি হইলে পরিশ্রম কমাইয়া লোকে অধিক পরিমাণে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে পারে। তৃতীয়ত, করের ফলে উদ্যোক্তা উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হইতে পারে। ভোগ্যদ্রব্য এবং মূলধনী-দ্রব্য উৎপাদনের অনুপাত বদলাইতে পারে। সুতরাং, এই সকল দিকে পরিবর্তন যাহাতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনে সাহায্য করে সেইরূপ করই আরোপ করা উচিত।

১। অর্থনৈতিক নিরপেক্ষতা

দ্বিতীয় নীতি হইল যে, যাহাতে ন্যায়ভাবে করভার বণ্টিত হয় (Equity in the distributicn of the burden) সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এখানে ন্যায্য বলিলে বোঝা যায় সমাজের সাধারণ জনমত বা সর্বজনীন ইচ্ছা যে-আয়বণ্টনকে ন্যায্য বলিয়া গণ্য করিতে চান, করভার যেন উহার অনুরূপ ভাবে বণ্টিত হয়। ন্যায়নীতির দুইটি দিক আছে (two aspects): একটি

হইল সমান অবস্থার সকল ব্যক্তির সহিত সমান আচরণ করা (equal treatment of equals) এবং দ্বিতীয়টি হইল পৃথক অবস্থার ব্যক্তিদের অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী আপেক্ষিক ধরনের আচরণ করা (relative treatment of persons in unlike circumstances)। প্রথম দিকটি লইয়া বিশেষ কোন সমস্যা নাই; কিন্তু দ্বিতীয় দিকটি লইয়াই বহুপ্রকার সমস্যা দেখা দেয়। যাহারা অপরের তুলনায় একটু "ভাল অবস্থায়" (better off) আছে তাহারা একটু বেশি কর দিবে ইহা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু "ভাল অবস্থা" কাহাকে বলে এবং বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তিদের উপর আপেক্ষিক করভার কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা লইয়া যথেষ্ট মতবিরোধ আছে।

২। ন্যায্যতা

করভারের ন্যায়-সংগত বণ্টন সম্পর্কে সাধারণভাবে দুই ধরনের আলোচনা বা তত্ত্ব দেখা গিয়াছে: একটির ভিত্তি হইল উপকারিতা (benefit), আর অপরটির ভিত্তি হইল প্রদানক্ষমতা (ability to pay)। উপকারিতা তত্ত্বের মূল কথা হইল ব্যক্তি যেমন দাম দিয়া জিনিস কেনে, কারণ সেই জিনিসটি তাহার নিকট উপকারী, ঠিক সেইরূপ সরকারের কাজকর্ম হইতে উপকার পায় বলিয়াই সে কর দেয়। কোন না কোন উপায়ে এই দেয় করের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে উপকারিতা অনুযায়ী। এই তত্ত্বের সমর্থকেরা ইহাই ন্যায়সংগত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু দেখা যায়, সরকারের বেশির ভাগ কাজই জনকল্যাণমূলক হইয়া উঠিতেছে, দরিদ্র শ্রেণীর কল্যাণ বাড়াইবার উপযোগী সরকারী কাজকর্ম করা হইতেছে। এই সকল কাজের ব্যয় হিসাবে একমাত্র তাহাদের নিকট হইতেই কর আদায় করা উচিত, ইহা কখনই ন্যায়সংগত হইতে পারে না। তাই বর্তমানে ন্যায়নীতি অনুসারে প্রদান-ক্ষমতা অনুযায়ী করভার বণ্টনই মোটামুটি গৃহীত হইতেছে।*

উপকারিতা ও প্রদানক্ষমতা

* "In tracing the development of thought on this matter, we find two distinct points of view. One may be referred to conveniently as the *benfit approach*........The other may be referred to as the *ability-to-pay approach*. ......In the benefit approach, the relation of the tax payer and Government is seen, as John Suart Mill puts it, in *quid-pro-quo* terms. Since the relation is one of exchange, the rules of the public household are taken to be more or less the same as those of the market. In the ability to pay approach, the proper contribution to public services is treated as an independent problem, quite separate from that of benefits received. Taxes are seen as compulsory payments, and the revenue-expenditure process is viewed as a planning problem not subject to solution by the automatic functioning of the market."

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রদান ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকারের কথা আলোচিত হইতেছে। প্রদান-ক্ষমতা অনুযায়ী ত্যাগ স্বীকার করা সম্পর্কে মোটামুটি তিন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী দেখা গিয়াছে; সমত্যাগনীতি (principle of equal sacrifice), আনুপাতিক ত্যাগনীতি (principle of proportional sacrifice) এবং নিম্নতম সামগ্রিক ত্যাগনীতি (principle of minimum or least aggregate sacrifice)। এই সকল তত্ত্বই মোটামুটি দুইটি অনুমানের ভিত্তিতে আলোচিত হইয়াছে, (ক) ক্রমহ্রাসমান আয়গত উপযোগিতার নিয়ম (law of diminishing income utility) এবং (খ) সমান আয় হইতে সকল ব্যক্তির তৃপ্তি-লাভের ক্ষমতা সমান অর্থাৎ উপযোগিতার আন্তঃব্যক্তি তুলনা (interpersonal comparisons of utility)। বর্তমান কালের কল্যাণমূলক ধনবিজ্ঞান উপরের এই দুইটি অনুমানই মানিয়া লয় না। তাই ত্যাগ স্বীকারের এই সকল তত্ত্বগুলির সাহায্যে প্রদানক্ষমতা পরিমাপ করা বর্তমানে আর চলে না।

বিভিন্নরূপ ত্যাগের নীতি

তৃতীয় করনীতি হইল কর আদায়ের নিম্নতম ব্যয়ের নীতি—(Minimum costs of tax collection)। করের উদ্দেশ্য, হার, করদানের পদ্ধতি প্রভৃতি যত সুস্পষ্ট থাকে, কর-আদায়ের ব্যয় ও বিঘ্ন ততই কম হইবে। সরলতা ও স্পষ্টতাই করনীতির অন্যতম গুণ।

৩। নিম্নতম ব্যয়

কর-বহন যোগ্যতা (Taxable capacity)

কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশের জনসাধারণ মোট যে-পরিমাণ কর দিতে প্রস্তুত আছে, তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা। কোন জাতির এই কর-বহন যোগ্যতাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। স্যার্ জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে, দেশের মোট উৎপাদন হইতে অস্তিত্ব রক্ষার স্তরে জনসাধারণকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যে-টাকা প্রয়োজন তাহা বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা। কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার স্তর কোথায় নির্দিষ্ট করা হইবে বা সেই স্তর বজায় রাখিতে কি-পরিমাণ টাকা ব্যয় করা দরকার হইবে, তাহা স্থির করার কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নাই। তাহা ছাড়া, এই উদ্বৃত্তের

কর-বহন যোগ্যতা কাহাকে বলে

সবটুকুই রাষ্ট্র লইয়া গেলে মূলধন-গঠন হয় না, জাতির ভবিষ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ কর-বহন যোগ্যতা কমিয়া যায়।

সুতরাং জাতীয় আয় হইতে মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখা এবং জনসাধারণের দক্ষতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা, সাধারণত এইরূপেই ইহাকে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও বিশেষ অস্পষ্ট এবং অসুবিধাজনক। মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখা বা জনসাধারণের দক্ষতা বজায় রাখার জন্য কি-হারে টাকা নির্দিষ্ট করিতে হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। স্বাভাবিক সময়ে শুধু মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখিলে চলিবে না, আরও অধিক হারে টাকার সঞ্চয় করিতে হইবে, কারণ তাহা হইলেই জাতীয় আয় ক্রমশ বর্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং, এই ধারণার বিশ্লেষণে বিশেষ অসুবিধা আছে। ইহা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক; ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে, অপরিমাপযোগ্য বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

কর-বহন যোগ্যতা নির্ধারণের অসুবিধা

কর-বহন যোগ্যতাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না বটে কিন্তু যে-বিষয়গুলির দ্বারা ইহা নির্ধারিত, তাহাদের আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত, জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব। যেমন স্বাভাবিক সময়ে লোকে যে-কর দিতে রাজি থাকে, যুদ্ধের সময়ে তাহা অপেক্ষা তাহাদের কর-বহনযোগ্যতা অনেক বেশি, কারণ ওই সময়ে তাহাদের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। দ্বিতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় আয়ের বণ্টনের উপরও কর-বহন যোগ্যতা নির্ভর করে। আয়-বৈষম্য যত বেশি থাকে, কর-বহন যোগ্যতা তত বেশি। তৃতীয়ত, জাতীয় আয়ের অনুপাতে জনসংখ্যার পরিমাণের উপর ইহা নির্ভর করে। জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্রুততর বা অধিকহারে হইলে মাথাপিছু আয় কমিয়া যায়; জাতির কর-বহন যোগ্যতা হ্রাস পায়। চতুর্থত, দেশের সামগ্রিক শিল্প-সংগঠনের প্রকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে। যদি মূলধন-গঠনের হার অধিক রাখিতে হয় (যেমন অনুন্নত দেশে পরিকল্পনার সময়ে), তাহা হইলে সেই সময়ে দেশের কর-বহন যোগ্যতা কম। কিন্তু বর্তমানে মূলধন-গঠনের ফলে ভবিষ্যতে জাতীয় আয় বাড়িতে পারে, এমতাবস্থায় দেশের ভবিষ্যৎ কর-বহন যোগ্যতা বেশি হইবে। পঞ্চমত, ইহা

নির্ধারণকারী বিষয়-সমূহ: মনস্তত্ত্ব, জাতীয় আয়ের বণ্টন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, দেশের শিল্প-সংগঠন, জীবন-যাত্রার মান, কর-ব্যবস্থার প্রকৃতি, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতি

নির্ভর করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উপর; কারণ উহা দ্বারাই তাহাদের মনস্তত্ত্ব, দক্ষতা, কাজ করিবার ক্ষমতা ও স্পৃহা নির্ধারিত হয়। ষষ্ঠত, কর-ব্যবস্থার (Tax System) প্রকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে। কর-কাঠামোতে তুলনামূলকভাবে প্রত্যক্ষ কর অধিক থাকিলে কর-বহন যোগ্যতা বেশি; দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহাদের সাহায্যে অধিক পরিমাণ কর-রাজস্ব আদায় করা চলে। সর্বশেষে ইহাও লক্ষ্য রাখা দরকার যে, কর-বহন যোগ্যতা নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতির উপর। যদি বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপর ব্যয় অধিক হয়, তাহা হইলে দেশের কর-বহন যোগ্যতা বাড়িবে। কিন্তু বর্তমানে যদি সমরসম্ভার প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বা প্রতিযোগিতামূলক সমরপ্রস্তুতিতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে দেশের কর-বহন যোগ্যতা কমিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে করা চলে।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে ইহার স্থান

ডাল্টনের মতে এই ধারণা অত্যন্ত ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট, চূড়ান্ত কর-বহন যোগ্যতা বলিয়া কিছু নাই, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ইহাকে মোটেই স্থান দেওয়া উচিত নয়। অপরপক্ষে, ফিণ্ড্লে শিরাস্-এর মতে এই ধারণার কিছুটা বাস্তব কার্যকারিতা আছে; স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক অবস্থায় কোন্ দেশ সর্বাধিক কি-পরিমাণ কর দিতে রাজি আছে সেই সীমা, অস্পষ্টভাবে হইলেও, সরকারের জানিয়া রাখা সর্বদাই ভাল। আধুনিক কালে, কলিন ক্লার্ক জাতীয় আয়ের 25%-এর বেশি কর-আদায় উচিত নয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

করঘাত ও করপাত (Impact and Incidence of Taxes) :

কোন কর ধার্য করা হইলে যাহার নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ কর গ্রহণ করেন, তিনি করের প্রথম আঘাত বহন করেন, কিন্তু তিনি নিজে প্রকৃতপক্ষে করের আর্থিক ভার বহন না-ও করিতে পারেন। তাঁহার উপর কর আরোপিত হইল বটে, কিন্তু তিনি করের দরুন প্রদত্ত অর্থ অপর কাহারও নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারেন। অর্থাৎ তাঁহার উপর কর আরোপিত হইলেও সেই করের আর্থিক ভার অপর কেহ বহন করিল, এইরূপ ঘটিতে পারে। যাহার উপর কর আরোপিত হইয়াছিল তিনি কর-ঘাত (impact) বহন করেন;

আর যিনি সত্যই আর্থিক ভার বহন করেন, অর্থাৎ নিজের আয় হইতে কর-প্রদান করিয়া যাহার আর্থিক আয় কমিয়া যায়, তিনি প্রকৃতপক্ষে কর-পাত (Incidence) বহন করেন, এরূপ বলা হয়। কাহারও উপর কর আরোপিত হইলে তিনি কর-প্রদানের দায়িত্ব অপরের নিকট সরাইয়া দিতে পারেন। কর-প্রদানের দায়িত্ব অপরের নিকট অপসারণ করার এই ধারাকে করসরণ (Shifting) বলা হয়।

ফলাফল ও করপাত এক নয়

করের ফলাফল (Effects) এবং কর-পাত (Incidence) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন, কোন উদ্যোক্তা যদি দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া আরোপিত করকে সরাইয়া ভোগকারী ক্রেতাদের দিকে ঠেলিয়া দেয়, তাহা হইলে বিক্রয় কমিয়া তাহার নিজের, শ্রমিকদের বা কাঁচামালের বিক্রেতাদের আয়, ব্যয়, সঞ্চয় প্রভৃতি কমিবে, সমাজে সেই কর আরোপিত হইবার দরুণ বহু প্রকার ফলাফল দেখা দিবে। করপাত বলিলে এই সকল ফলাফল বুঝায় না; ইহার অর্থ হইল সর্বশেষ স্তরে করের আর্থিক ভার কাহার উপর পড়িতেছে, কে সত্যই কর প্রদান হইতে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

কর-সরণের রূপ

কর-সরণ অনেক রূপ লইতে পারে। কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হইলে উৎপাদক করের পরিমাণ অনুযায়ী দাম বৃদ্ধি করিয়া সেই কর ক্রেতার নিকট সরাইয়া দিতে পারে, অথবা দ্রব্যের গুণ বা উৎকর্ষ কমাইয়া দিয়া পূর্বাপেক্ষা খারাপ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আসল ভার ক্রেতার নিকট পাঠাইতে পারে।

কর-সরণের দিক্ নির্ণয়

কর-সরণ অগ্রমুখী (Forward) বা পশ্চাৎমুখী (Backward) হইতে পারে। যদি উৎপাদকের উপর কর আরোপ করা হয় তাহা হইলে উৎপাদক কর-প্রদানের দায়িত্ব ক্রেতাদের নিকট সরাইয়া দিলে তাহা অগ্রমুখী কর-সরণ; যদি সে কাঁচামালের বিক্রেতার উপর চাপ দিয়া কম দামে কাঁচামাল ক্রয় করিয়া কর-ভার তাহার নিকট সরাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে উহা পশ্চাৎমুখী কর-সরণ।

কর-পাতের পরিমাণ নির্ভর করে উৎপাদক ও ক্রেতার পারস্পরিক করাপসারণের ক্ষমতার উপর। সাধারণত, যিনি কর-ঘাত বহন করেন, তিনি

করের সম্পূর্ণ অংশ নিজেই বহন করেন না অথবা সম্পূর্ণ অংশই অন্যের উপর সরাইয়া দিতে পারেন না। করের পরিমাণ পর্যন্ত দামে বৃদ্ধি করিতে পারিলে কর-ভার সম্পূর্ণ অন্যের উপর সরাইয়া দেওয়া যায়; দাম মোটে বাড়াইতে না পারিলে করের পরিমাণ সম্পূর্ণ নিজে বহন করিতে হয়। সাধারণত এইরূপ অবস্থায় দাম অল্প কিছু বাড়িয়া যায়, বিক্রয় ও মুনাফা কমে এবং উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে কর-পাতের অংশ বিভক্ত হইয়া যায়।

করপাতের সাধারণ নীতি

দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে, কর-সরণের পরিমাপ কিরূপ হইবে তাহা সাধারণভাবে নির্ভর করে দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। করের আর্থিক ভার উৎপাদক ও ক্রেতাদের মধ্যে কিরূপে বিভক্ত হইবে, তাহা দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে। যদি দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়, তবে দাম বাড়ান বিশেষ চলিবে না, কারণ তাহাতে বিক্রয় খুবই কমিয়া যাইবে; এমতাবস্থায় উৎপাদক বা বিক্রেতাকেই করের অধিক অংশ বহন করিতে হইবে। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি হইলেও বিক্রয় বেশি কমিবে না, ক্রেতাদেরই করের অধিকাংশ বহন করিতে হইবে। যদি যোগান স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে করের অধিক অংশ ক্রেতাদের বহন করিতে হইবে; যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে করের অধিক অংশ বিক্রেতা বা উৎপাদককে বহন করিতে হয়। সুতরাং করের আর্থিক-ভার ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাইবে, এই বিভাগের পরিমাণ চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পারস্পরিক শক্তির উপর নির্ভর করিবে।

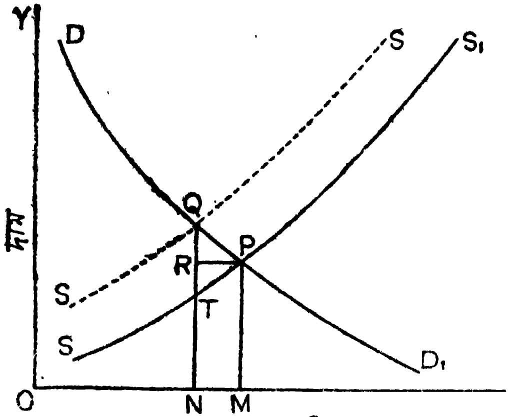
চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

সূত্রাকারে প্রকাশ করিলে বলা যায়:

$$\frac{\text{করভারের বিক্রেতার অংশ}}{\text{করভারের ক্রেতার অংশ}} = \frac{\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা}}{\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা}}$$

কোন একটি পণ্যের উপর করপাত আমরা রেখা-চিত্রের সাহায্যেও প্রকাশ করিতে পারি। পরপৃষ্ঠার চিত্রে DD_1 এবং SS_1 হইল যথাক্রমে দ্রব্যটির চাহিদারেখা ও যোগান রেখা। P বিন্দুতে ভারসাম্যের দাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। PM দামে OM পরিমাণ চাহিদা ও যোগান হইতেছে। কর-আরোপের ফলে বর্তমান দাম দাঁড়াইল QN; এই দামে বিক্রয় হইতেছে ON, দাম বাড়িয়াছে

QN – PM = QR এবং বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়াছে OM – ON = PR. মোট কর QT-র মধ্যে ক্রেতারা বহন করে QR এবং উৎপাদকেরা বহন করে RT.*



বিক্রেতা ও ক্রেতাদের উপর করভারের এইরূপ বণ্টন হয় দাম ও উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তনের মারফৎ এবং এই সকল পরিবর্তন কিছুটা সময়সাপেক্ষ। সুতরাং দীর্ঘকালেই কর-পাত সম্পূর্ণ ঘটে; স্বল্পকালে, করের প্রভাবে দাম বৃদ্ধি হয় এবং সাধারণত ভোগকারী বা ক্রেতাদেরই সম্পূর্ণ ভার বহন করিতে হয়।

সময়-বিচারের গুরুত্ব

দীর্ঘকালে, অপরাপর বহু প্রভাব দেখা দিতে পারে। সাধারণত, সমাজে সকল দ্রব্যাদির দাম পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত; কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপ করিলে অন্যান্য দ্রব্যাদির (পরিবর্ত দ্রব্যাদি, সহযোগী দ্রব্যাদি, বা কাঁচামাল প্রভৃতি) দাম, উৎপাদন প্রভৃতি প্রভাবান্বিত হয়, যেমন কাঁচামালের উৎপাদক কম দাম গ্রহণ করিতে

দীর্ঘকালীন করপাত

---

* যদি করে খুব অল্পহারে পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি, তাহা হইলে P ও Q খুব কাছাকাছি অবস্থিত অর্থাৎ একেবারে পরস্পর নিকটতম বিন্দু বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সেই অবস্থায়,

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{MN}{OM} \div \frac{QR}{PM} = \frac{MN}{OM} \times \frac{PM}{QR}$$

$$\text{এবং যোগানের স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{MN}{OM} \div \frac{RT}{PM} = \frac{MN}{OM} \times \frac{PM}{RT}$$

$$\text{সুতরাং, } \frac{\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা}}{\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা}} = \frac{RT}{QR}$$

$$= \frac{\text{করভারের বিক্রেতার অংশ}}{\text{করভারের ক্রেতার অংশ}}$$

বাধ্য করিতে পারে। এই সকল বিষয়ে সম্মিলিত প্রভাবে দীর্ঘকালীন কর-পাত নির্ধারিত হয়।

সমহার প্রতিদানের নিয়ম ও কর-পাত

যদি দ্রব্যটি সমহার উৎপন্নের নিয়ম (Law of Constant Returns) অনুযায়ী উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সাধারণত আরোপিত করের সম্পূর্ণ পরিমাণ পর্যন্ত দামে বৃদ্ধি হইতে পারে। কর-আরোপের ফলে দাম বৃদ্ধি হইবে এবং চাহিদা কমিয়া যাইবে, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় সমানই থাকে সুতরাং করের পরিমাণের অধিক দাম বৃদ্ধি হইতে পারে না।

ক্রমহ্রাসমান-প্রতিদানের নিয়ম ও করপাত

দ্রব্যটি যদি ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের নিয়ম মানিয়া চলে অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অনুযায়ী উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে দামে বৃদ্ধি করের পরিমাণ হইতে কম হইবে। যেমন, ধরা যাক 1000 ইউনিট দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় 7 টাকা। ইউনিট-প্রতি 1 টাকা কর আরোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া 8 টাকা হইবে, ফলে চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদন কমিবে। কম উৎপন্ন হইলে, (ধরা যাক, 800) ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া $6\frac{1}{2}$ হইল; ইহার সহিত কর যোগ করিয়া দাম হইবে $7\frac{1}{2}$, অর্থাৎ করের পরিমাণের তুলনায় দামে বৃদ্ধি কম হইল।

ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম ও কর-পাত

দ্রব্যটি যদি ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের নিয়ম মানিয়া চলে অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অনুযায়ী উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করের পরিমাণ হইতে বেশি হইতে পারে। যেমন, ধরা যাউক 1000 ইউনিট দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় 7 টাকা। কর আরোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া 8 টাকা হইবে, ফলে চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদন কমিবে। কম উৎপন্ন হইলে, ইউনিট-প্রতি ব্যয় বাড়িয়া $7\frac{1}{2}$ টাকা হইল; ইহার সহিত কর যোগ করিয়া দাম হইবে $8\frac{1}{2}$, টাকা অর্থাৎ করের পরিমাণের তুলনায় দামে বৃদ্ধি বেশি হইল।

একচেটিয়া ব্যবসায়ে ও কর-পাত

একচেটিয়া দ্রব্যের উপর কর-পাত নির্ভর করে করের প্রকৃতির উপর। সাধারণত, যে পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে প্রান্তিক রেভিনিউ ও প্রান্তিক ব্যয় সমান,—একচেটিয়াদার সেই পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করে এবং সেই অনুযায়ী দাম স্থির করে। মুনাফার উপর কর আরোপিত হইলে, দামে

কোন পরিবর্তন হইবে না—তাহার নিজের উপরই সম্পূর্ণ কর-পাত ঘটিবে।*

উৎপাদনের পরিমাণের উপর কর আরোপিত হইলে, সাধারণত দাম একটু বাড়িয়া যায় এবং ভোগকারী কর-পাতের অংশ বহন করে। করকে উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যেই ধরিয়া লইলে প্রান্তিক ব্যয় বেশি সুতরাং দামও বাড়িয়া যায়।

মুনাফার উপর কর ও উৎপাদনের উপর কর

দাম কি পরিমাণে বাড়িবে বা একচেটিয়াদার ও ভোগকারীকে কর-পাতের কিরূপ অংশ বহন করিবেন, তাহা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে। চাহিদা যত বেশি স্থিতিস্থাপক হইবে একচেটিয়াদার তত অধিক অংশ বহন করিবেন। উৎপাদন যত বাড়িবে করহার ততই কমিবে—এইরূপ কর স্থাপিত হইলে একচেটিয়াদার দাম কমাইয়াও (অধিক চাহিদা সৃষ্টি করিয়া) উৎপাদন বাড়াইতে পারে; অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে তাহার কর-ভার এড়াইবার চেষ্টাতে ভোগকারীদের সুবিধা হইয়া যাইতে পারে।

প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর (Direct and Indirect Taxes)

যে-ব্যক্তির উপর কর আরোপিত হয়, যদি সেই ব্যক্তিই সর্বশেষ স্তরে করের আর্থিক ভার বহন করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে এইরূপ করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। (যেমন, আয়কর প্রভৃতি)। যাহার উপর কর-আরোপিত হয় বা যাহার নিকট হইতে কর আদায় করা হয় যদি সেই ব্যক্তি

প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর কাহাকে বলে

কর-ভার অন্যের উপর সরাইয়া দিতে পারে বা অন্যের নিকট হইতে সেই টাকা তুলিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সেইরূপ করকে পরোক্ষ কর বলে (যেমন বিক্রয়কর, আমদানি শুল্ক প্রভৃতি)। অর্থাৎ, কর-ঘাত ও কর-পাত একই ব্যক্তির উপর হইলে তাহা প্রত্যক্ষ কর; কর-ঘাত ও কর-পাত পৃথক ব্যক্তির উপর হইলে তাহা পরোক্ষ কর।

প্রত্যক্ষ করের সুবিধা হইল যে (১) ইহা ক্রমবর্ধমান হারে আরোপিত করা যায়, ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা অনুযায়ী তাহার নিকট হইতে কর

---

* মুনাফার উপর তিন প্রকার কর আরোপিত হইতে পারে, (ক) মুনাফা হইতে মোটামুটি কিছু পরিমাণ অর্থ, (খ) মুনাফার শতকরা কিছু অংশ, (গ) মুনাফার উপর ক্রমবর্ধমান হারে। সকল ক্ষেত্রেই সাধারণত কর-পাত একচেটিয়াদারের উপর। এই বিষয়টি আবার পরে আলোচিত হইতেছে।

আদায় করা সম্ভবপর। (২) প্রত্যক্ষ করের আর্থিক ভার সকলেই নিশ্চিত-রূপে জানে। কখন, কি-পরিমাণ, কোথায়, কিভাবে কর দিতে হইবে তাহা নিশ্চিত ও স্পষ্ট; ইহাতে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র উভয়েই নিজেদের ব্যয় ও আয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে। (৩) প্রত্যক্ষ কর আদায়ের ব্যয় খুবই কম; ইহা ব্যয়সংকোচশীল। (৪) প্রত্যক্ষ কর খুবই প্রসারশীল (elastic); কর-হার অল্প একটু বাড়াইলে প্রত্যক্ষ কর হইতে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যাইতে পারে। (৫) প্রত্যক্ষ করদাতা রাষ্ট্রীয় ব্যয় সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে; নিজেদের নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি দেখা যায়।

প্রত্যক্ষ করের সুবিধা

প্রত্যক্ষ করের অসুবিধা হইল, (১) ইহা সাধারণত খুবই অপ্রিয়। সরাসরি পকেট হইতে এই কর দিতে হয় বলিয়া লোকে ইহা বিশেষ অপছন্দ করে। লোকে ব্যক্তিগত আয়ের উৎস প্রকাশ করিতে চাহে না, তাহাও ইহা অপছন্দের অন্যতম প্রধান কারণ। (২) প্রত্যক্ষ কর লোকের কর-ফাঁকি দেওয়ার বা অসাধুতা অবলম্বন করার প্রবণতা বাড়াইয়া দেয়। (৩) প্রত্যক্ষ করের ক্রমবর্ধমান হার সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ক্রমাগত উচ্চ আয়স্তরে যে-হারে টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা কমিয়া যায়, তাহার সহিত ক্রমবর্ধমান কর-হারের যোগ থাকা উচিত, কিন্তু বাস্তবে উহা পরিমাপ-যোগ্য নহে। (৪) উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের উপর উচ্চহারে প্রত্যক্ষ কর আরোপ করিলে উহা সঞ্চয়-স্পৃহা বা কর্মোদ্যম কমাইয়া দিতে পারে।

প্রত্যক্ষ করের অসুবিধা

পরোক্ষ করের সুবিধা হইল (১) ধনী-গরীব সকলকেই সাধারণত এই কর দিতে হয়, ফলে কর-কাঠামো বিস্তৃতভিত্তিক (broad-based) হইতে পারে। (খ) এই ধরনের কর প্রদান করদাতাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক, কারণ ইহা প্রতিবারে খুব অল্প পরিমাণে দিতে হয়। (গ) দ্রব্যের দামের মধ্যে কর জড়িত থাকে বলিয়া ইহা বিশেষ অপ্রিয় বোধ হয় না। (ঘ) কতকগুলি দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় উহাদের উপর কর-স্থাপন করিলে প্রভূত রাজস্ব পাওয়া যাইতে পারে। (ঙ) পরোক্ষ করের সাহায্যে সামাজিক সংস্কারের কার্য কিছুদূর অগ্রসর করানো যাইতে পারে (যেমন, মদ প্রভৃতির উপর শুল্ক)।

পরোক্ষ করের সুবিধা

পরোক্ষ করের অসুবিধা হইল (১) ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ বিবেচনা না করিয়াই ইহা আদায় করা হয়, সুতরাং ইহাকে প্রগতিশীল বলা চলে না। তুলনামূলকভাবে গরীবদের উপর এই করের চাপ অধিক পড়ে, তাহাও বাঞ্ছনীয় নয়। (২) এই কর আদায় করার শাসনতান্ত্রিক ব্যয় অনেকক্ষেত্রে খুবই বেশি; সুতরাং ব্যয়নির্বাহ করিয়া বিশেষ উদ্বৃত্ত রাজস্ব পাওয়া যায় না। (৩) সমাজের ভোগ-প্রবণতায় আঘাত দেওয়ায় এই কর মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে। (৪) পরোক্ষ কর প্রদান করিলে লোকের মনে রাজনৈতিক চেতনা ও সজাগ দৃষ্টি জাগ্রত হয় না, রাষ্ট্রের কাজকর্মের উপর অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রেরণা সৃষ্টি হয় না।

পরোক্ষ করের অসুবিধা

যদিও ন্যায়ের দিক হইতে বা কর-প্রদানক্ষমতা বিচার করিলে প্রত্যক্ষ কর তুলনামূলকভাবে অধিকতর কাম্য, কিন্তু বর্তমানকালে রাষ্ট্রসমূহের রাজস্বের প্রয়োজন এত বেশি যে, উভয় প্রকার করই কর-কাঠামোর স্থান পায়। বরং দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্রমাগত পরোক্ষ করের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

উপসংহার

করের ফলাফল (Effects of Taxation)

ডাল্টনের অভিমতে উৎপাদনের উপর করের প্রভাব তিন দিক হইতে বিচার করা চলে: (১) কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর প্রভাব, (২) কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর প্রভাব, (৩) অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগের দিক্ পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাব।

যদি কর আরোপের ফলে ব্যক্তি তাহার ভোগব্যয় কমাইতে বাধ্য হয় (যেমন মজুরি বা খাদ্যের উপর কর) তাহা হইলে সেই করের ফলে তাহার কর্মোদ্যম ও ক্ষমতা কমিয়া যায়। যাহাদের আয় খুব কম, কিছুই সঞ্চিত থাকে না, তাহারা ব্যতীত অপর সকলেরই সঞ্চয়-ক্ষমতা কর আরোপের ফলে কমিয়া যায়। সাধারণত দেশের আয়-কর একটি নির্দিষ্ট আয়ের উর্ধ্ব হইতে ধার্য করা হয়; সেই নির্দিষ্ট আয়ের নিচে বা নিম্ন আয়কারী ব্যক্তিদের আয়কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সুতরাং আয়কর তাহাদের কর্মোদ্যম বা কর্মক্ষমতা সংকুচিত করে না।

কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর ফলাফল

কোন কর সম্বন্ধে যদি এরূপ ধারণা হয় যে, ইহা স্বল্পকাল স্থায়ী

হইবে, তাহা হইলে উহা কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু কোন স্থায়ী কর করদাতার আয়কে স্থায়ীভাবে কমাইয়া দেয়; সুতরাং তাহার কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের যে-শ্রেণীর আয় বেশি, সেই শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর উচ্চহারে কর আরোপণ তাহাদের কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা কমাইয়া দিবে। ডাল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অধিক (the elasticity of demand for income is large)। নিম্ন আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের উপর কর ধার্য করা হইলে আয় কমিয়া যাওয়ায় তাহা পূরণ করিবার জন্য কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা বাড়িয়া যাইতে পারে। যে-সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিক সংখ্যক পোষ্য আছে বা ব্যক্তি ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট আয় পাইবার জন্য বর্তমানে সঞ্চয় করিতেছে, সেখানে ইহা খুবই সত্য। ডাল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম (the elasticity of demand for income is small)।

কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উহার ফলাফল

যে-শিল্পের উপর অধিক কর আরোপ করা হইয়াছে সেখানে মুনাফার হার তুলনামূলকভাবে কমিয়া যাওয়ায় সেই শিল্প হইতে মূলধন সরিয়া অন্য শিল্পে (যেখানে তুলনায় কর অধিক নহে) চলিয়া যাইতে চাহিবে। অনেক সময়ে এইরূপ মূলধনের ক্ষেত্রান্তরে নিয়োগ সমাজের সামগ্রিক উৎপাদন বাড়াইতে পারে বা সামাজিক উপযোগিতার দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় (যেমন মদ, গাঁজা বা আফিমের উপর কর)। যেমন, আমদানি-শুল্কের ফলে দেশের শিশু শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ কর-আরোপনের ফলে মূলধন-নিয়োগের যেরূপ দিক্-পরিবর্তন ঘটে তাহা অবাঞ্ছনীয়, যেমন রপ্তানি-শুল্কের ফলে দেশের রপ্তানি শিল্প হইতে মূলধন সরিয়া আসিতে পারে। অনুপার্জিত মূল্য বৃদ্ধির উপর (Unearned Increment) এবং মূলধনের সকল ব্যবহারের উপর সমভাবে কর স্থাপিত হইলে (যেমন, আয়কর) উপাদানের ক্ষেত্রান্তরে নিয়োগ বা নিয়োগে দিক পরিবর্তন ঘটে না।

উপাদানসমূহের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন সংক্রান্ত ফলাফল

যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে স্থানীয় করের (Local Taxes) হার অধিক হয়, তাহা হইলে মূলধন অপর কোন অঞ্চলে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে।

সাধারণভাবে, কর-আরোপনের ফলে দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কিছুটা ব্যাহত হইবেই। যদি অবশ্য সেই আয় হইতে উপযুক্ত ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে থাকে, তবে সেই ব্যয়ের দরুণ সমাজে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রবণতা করের দরুণ উৎপাদন হ্রাসের প্রবণতা হইতে অধিক হইতে পারে।

উৎপাদন ও কর্ম-সংস্থানের উপর ফলাফল

কয়েকটি কর ও তাহাদের করপাত (Some taxes and their incidence)

১। **আয়কর (Income tax):** সাধারণত, আয়করকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ কর বলিয়া মনে করা হয়। তাহার কারণ হইল করদাতা ইহাকে অপর কাহারও নিকট অপসারণ করিতে পারে না। সুতরাং ইহার করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির উপর এইরূপ ধরিয়া লওয়া চলে। কল্‌উইন্ কমিটিও সাধারণভাবে এই মত সমর্থন করিয়াছেন।* এই বিষয়টি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাউক।

কেহ কেহ বলেন যে, ব্যবসায়ীরা তাহাদের উপর আরোপিত আয়করকে কিছুটা অপসারণ করিতে পারে; দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য বাড়াইতে পারিলেই ক্রেতা-দের নিকট অপসারণ করা অনেকাংশে সম্ভব হইল। "কোন ব্যবসায়ী দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করার সময়ে যখন তাহার ব্যয়ের হিসাব করে, তখন সে পরোক্ষভাবে হইলেও চিন্তা করিয়া থাকে যে তাহাকে কি পরিমাণ আয়কর দিতে হইবে, এবং বাজারের অবস্থা তাহার অনুকূল হইলে সে এমন স্তরে দাম স্থির করে যেখানে তাহার ইচ্ছা বা প্রয়োজন অনুযায়ী নিম্নতম নীট আয় সে পাইতে পারে।" †

ব্যবসায়ীদের যুক্তি: কিছুটা অপসারণ সম্ভব

কিন্তু ব্যবসায়ীদের এই যুক্তি ধনবিজ্ঞানীরা মানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতে, বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্র ছাড়া, আয়করকে অপসারণ করা চলে না, দামের মধ্যেও ইহা প্রবেশ করে না। যেমন ডাল্টন্ (Dalton) বলেন যে, অন্যান্য স্থির ব্যয়ের মত আয়কর কোনরূপ নির্দিষ্ট বা স্থায়ী ধরনের

* *The colwyn commitee Report on National Debt and Taxation.*

† "When a trader endeavours to ascertain his costs with a view to fix prices, he often takes into account, at least indirectly, the amount of income-tax he will have to pay, and if the market conditions permit, fixes his prices at such a level as would yield to him the minimum net income that he desires to obtain or actually needs." *Evidence of the Association of British Chambers of Commerce before Colwyn committee.*

ব্যয় নয় (not a true overhead charge)। ব্যবসায় হইতে আয়ের ক্ষেত্রে ইহা হইল নীট মুনাফার উপর কর, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যয় বাদ দিয়া যে উদ্বৃত্ত টাকা ফার্মটির হাতে রহিয়া গেল তাহার উপর কর। সুতরাং দামের মধ্যে ইহা প্রবেশ করে না। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ীরা দ্রব্যের জন্য বাজারে কি দাম পাইবেন, তাহা আয়কর দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যেমন, কোন একচেটিয়া ব্যবসাদার যে-বিন্দুতে উৎপাদন ও দাম স্থির করিলে একচেটিয়া রেভিনিউ সবচেয়ে বেশি পাইবে নিশ্চয় সে সেই স্তরেই দাম নির্ধারণ করিবে, কারণ অন্য কোন দামে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হইতে পারে না। তাহার উপর কর আরোপিত হইলেও সে অন্য বিন্দুতে দাম স্থির করিবে না, ফলে আয়কর তাহার দামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা আরও অসুবিধাজনক। তাহার ক্ষমতা তিন দিক হইতে সীমাবদ্ধ। (ক) প্রতিযোগীর দ্রব্য ও তাহার দ্রব্য আকার ও প্রকৃতিতে সমান; (খ) অন্যান্য প্রতিযোগীদের যোগান নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতা তাহার নাই, সুতরাং সে নিজদ্রব্যের দাম বাড়াইলে অন্যেরা যোগান বাড়াইয়া দিবে, এবং (গ) প্রতিযোগীরা উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইয়া তাহাদের উৎপাদন-ব্যয় কমাইয়া দিবে এবং তাহার চেয়ে কম দামে বাজারে বিক্রয় সুরু করিবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম হইল প্রান্তিক উদ্যোক্তার ব্যয়ের সমান; প্রান্তিক উদ্যোক্তার কোন উদ্বৃত্ত থাকে না, তাহার কর দিবার ক্ষমতা নাই। তাই আয়কর দামের মধ্যে প্রবেশ করে না। প্রান্তিক উদ্যোক্তাকে কর দিতে হইলে সে ব্যবসায় ছাড়িয়া উঠিয়া যাইত, দ্রব্যটির মোট যোগান হ্রাস পাইত, করের দরুণ দাম বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু প্রান্তিক উদ্যোক্তা কর দেয় না, তাই করও দামের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

কেন আয়কর দামের মধ্যে প্রবেশ করে না

যৌথমূলধনী কোম্পানীর আয়করের ক্ষেত্রেও (corporate income tax) দেখা যায় যে, ইহার অপসারণ ঘটে না। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ব্যক্তিগত মালিক নহেন, তাই তাঁহাদের মধ্যে অপসারণের চেষ্টা নাই। উপরন্তু, যদিও মুনাফার উৎসবিন্দুতে সমান হারে কর আরোপিত হয় (at a flat rate at the source) তবুও ধনিক শেয়ার-ক্রেতারা অধি-কর (surtax) দেন, আবার কম বিত্তবান শেয়ার ক্রেতারা রিবেট (rebate) ফেরৎ পান। বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি লইয়া

যৌথকোম্পানীর আয়কর

শেয়ার ক্রেতাগোষ্ঠী গঠিত বলিয়া কোন কোম্পানী দ্রব্যের দাম বাড়াইতে ততটা উৎসুক হয় না। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত ফার্মগুলির উপর বিভিন্ন হারে ও পরিমাণে আয়কর আরোপিত হয়, প্রত্যেকটি ফার্ম উহা দামের সঙ্গে যোগ করিলে বাজারে প্রতিটি ফার্মের দাম পৃথক হইত। কোন কোন ফার্ম তাহাদের প্রতিযোগীদের হটাইয়া দিবার জন্য দাম কম বাড়াইত। দাম বাড়াইবার এইরূপ ঝুঁকি সহসা কোন ফার্ম তাই লইতে পারে না। বিদেশী প্রতিযোগিতার ভয়েও দেশের মধ্যে এইরূপ দাম-বাড়ান সম্ভব নহে।

সর্বশেষে, আর একটি কথা বলা দরকার। আয়করের অপসারণ সম্ভব হয় না কারণ যাহাদের উপর কর আরোপিত হইল তাহাদের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা খুব কম, একেবারে নাই বলিলেও চলে। অর্থাৎ আয়কর দিতে হইবে বলিয়া লোকে আয় করা বন্ধ করিয়া দেয় না, কাজের যোগান দিতেই থাকে। তাহা ছাড়া, আয়কর হইল সাধারণ বা সার্বিক ধরনের (general); ফলে এক ধরনের জীবিকা হইতে সরিয়া গিয়া অপর ধরনে আয় করিলেও তাহাকে কর দিতে হয়; কর-আরোপিত-ব্যক্তি নিজের যোগান কোন দিকে সংকুচিত করিতে পারে না। আয়ের জন্য ব্যক্তির চাহিদাও সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক অর্থাৎ আয়ের উপর কর হইলেও সে আয়-করা স্থগিত রাখে না। এই কারণেই আয়-কর এড়ান সম্ভবপর নয়।

ব্যক্তির যোগান ও আয়ের জন্য চাহিদা উভয়ই অস্থিতিস্থাপক

অধ্যাপক সেলিগ্‌ম্যান (Seligman) অবশ্য দুইটি বিশেষ অবস্থার কথা বলিয়াছেন যখন আয়কর দ্রব্যের দামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। প্রথমত, দ্রুত দাম-বৃদ্ধির আবহাওয়ায় উৎপাদকেরা করের সমান পরিমাণে দাম বাড়াইয়া দিতে পারে। স্বল্পকালে ইহা সম্ভবপর। কিন্তু দীর্ঘকালে, এই শিল্পে বেশি দাম পাওয়া যায় এই প্রলোভনে আরও অনেক ফার্ম প্রবেশ করিবে, তাই দাম কমিয়া আসিবে, করাপসরণ লোপ পাইবে। দ্বিতীয়ত, কোন বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে, অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা সৃষ্টি করিয়া কোন খুচরা দোকানদার যখন কাজকারবার চালায়, তখন এই অবস্থায় সে নিজের উপর আরোপিত করের কিছু অংশ বর্ধিত-দামের মাধ্যমে ক্রেতার উপর চাপাইয়া দিতে পারে।

সেলিগ্‌ম্যান কি বলেন

অধ্যাপক রবার্টসনও (Robertson) মনে করেন যে, আয়কর কিছুটা পরিমাণে অপসারণ করা সম্ভবপর। তাঁহার মতে, দ্রব্যটির দাম যদি প্রতিনিধি-

স্থানীয় ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়, তবে দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে অন্তত ধরিয়া লইতে হইবে যে, ঐ ধরনের ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা পাইতেছে। দীর্ঘকালীন এই স্বাভাবিক মুনাফা তাহার প্রান্তিক ব্যয়েরই অন্তর্ভুক্ত। এই স্বাভাবিক মুনাফাই উদ্যোক্তার আয় এবং ইহারই উপর আয়কর লওয়া হয়। আয়কর বাড়িলে এই ধরনের ফার্ম উৎপাদন কমাইবেন, এমন কি একটু উন্নত ধরনের ফার্মগুলিও উৎপাদন হ্রাস করিবে, ইহার ফলে দাম বৃদ্ধি পাইবে। রবার্টসন তাই মনে করেন যে, যদি আয়করের হারে বৃদ্ধি বেশি হয় এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া লইয়া বিশ্লেষণ করা হয়, তবে আয়করের অপসরণ একেবারে সম্ভবপর নয়, এমন কথা বলা চলে না।

রবার্টসন কি বলেন

মাসগ্রেভ্ (Musgrave) প্রমুখ আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরাও মনে করেন যে, কোম্পানীসমূহের উপর নির্ধারিত আয়কর বা মুনাফাকর বহুক্ষেত্রেই দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে। স্বল্পকালে ফার্মের চল্‌তি মূলধন (working capital) হইতে প্রতিদান বা আয়ের ভিত্তিতেই এই কর দেওয়া হয়, তাই উৎপাদন-ব্যয় প্রভাবিত হয়। তাহা ছাড়া, পরিচালনার পারিশ্রমিককে মোটামুটির মুনাফার অংশ বলিয়াই মনে করা চলে; আয়করের ফলে এই পারিশ্রমিকের অংশ কমিয়া যায়, উচ্চপদস্থ পরিচালকবৃন্দ দাম বাড়াইতে সচেষ্ট হয়। একচেটীয় ও অলিগোপলীয় ব্যবসায়ীর আয়করের প্রভাবে নিজের উৎপাদন ও দামনীতিতে (output and price policy) পরিবর্তন আনে। সংঘবদ্ধ দরকষাকষির ক্ষেত্রে ফার্মের মজুরি দিবার ক্ষমতা যখন বিচার করা হয়, তখন আয়কর বাদ দিয়া হিসাব করা হয়। মালিকপক্ষ শক্তিশালী হইলে এই অবস্থায় আয়করের কিছু অংশ শ্রমিকদের উপর অপসারণ সম্ভব হয়। দীর্ঘ-কালে আয়করের ফল দেখা যায় দেশে মূলধনের ও উদ্যোগক্ষমতার যোগানের মাধ্যমে।*

মাসগ্রেভ্ কি বলেন

* "The traditional rule that a profits tax cannot give rise to short-run adjustments in price remains a good point of departure, but hardly more. Without falling back upon the 'parctical' argument that businessmen do not act in this way, we find a variety of situations where the tax may lead to adjustments in price and output. These include the return to working capital, monopoly pricing under restraint, oligopoly pricing, and situations of collective bargaining where the firm's ability to pay is taken into consideration. Possibilites, such as these throw considerable doubt on the conventional position that price policy remains unaffected in the short run. In addition, there are the longrun considerations where the tax may act upon the supply of capital and entrepreneurship. On balance, the theoritical argument lead more support to the moderate conclusions that short run adjustments in price (1) play a significant role, and (2) that a part of the tax is passed on, than it lends to the extreme position that no such adjustments occur." Musgrave, *The theory of Public Finance*. P. 286.

একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপর কর (A tax on Monopoly)

একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপর কর দুই উপায়ে আরোপিত হইতে পারে : (১) উৎপাদন-পরিমাণ হইতে নিরপেক্ষভাবে (independent of monopoly output) অথবা, (২) উৎপাদন-পরিমাণের উপর।

উৎপাদন-পরিমাণ নিরপেক্ষভাবে আরোপিত কর দুইটি রূপ লইতে পারে : (ক) মোটমাট কিছু পরিমাণ কর (lumpsum tax) ; অথবা, (খ) একচেটিয়া মুনাফার উপর শতকরা কিছু হারে। এই উভয় ক্ষেত্রেই করপাত হইল একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপর, কারণ ভোগকারী বা ক্রেতাদের উপর দাম-বৃদ্ধির মাধ্যমে করভার অপসারণ করা সম্ভব নয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ী এমন পরিমাণ উৎপাদন করে এবং এমন দাম বাঁধিয়া রাখে যেখানে তাহার নীট একচেটিয়া মুনাফা সবচেয়ে বেশি। এই দাম হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে, অন্য কোন দাম নির্ধারণ করিলে তাহার লাভ কমিয়া যাইবে, সর্বাধিক পরিমাণ থাকিবে না। তাই, (ক) মোটামুটি-কিছু-পরিমাণ কর ধার্য হইলে সে দাম বাড়াইতে চাহিবে না, প্রান্তিক রেভিনিউ (MR) এবং প্রান্তিক ব্যয়ের (MC) সমতার বিন্দুতে উৎপাদন ও বিক্রয় কার্য চালাইতে থাকিবে। সমস্ত করপাত তখন সে নিজেই বহন করিবে, কারণ করের পূর্বে যে দামে তাহার সর্বাধিক রেভিনিউ হইত, করের পরেও সেই দামেই রেভিনিউ সবচেয়ে বেশি। (খ) যদি আমার একচেটিয়া মুনাফার উপর শতকরা কিছু হারে কর আরোপিত হয়, যেমন 15% হারে ; তাহা হইলেও দাম পাল্টাইবার কোন কথা উঠে না। করদানের পরে তাহার নীট রেভিনিউ হইবে সর্বাধিক পরিমাণের 85%। সুতরাং একচেটিয়ার উপর সমানুপাতিক আয়কর (proportional income tax) বসাইলে উহার করপাত একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপরই পড়িবে।

[ক] মোটামুটি-কিছু-পরিমাণ কর এবং [খ] মুনাফার উপর শতকরা হারে কর

যখন একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উৎপাদন-পরিমাণের উপর কর আরোপিত হয়, এবং উৎপাদনে পরিবর্তন আসিলে কর-হারও পরিবর্তিত হয়, তখন এই করের করপাত নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। দ্রব্যটির চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে একচেটিয়া ব্যবসায়ী দাম বাড়াইয়া ক্রেতাদের উপর কর অপসরণ করিতে পারিবে, করপাত তখন ক্রেতাদের

উপর। অপরপক্ষে, দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে, একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে অন্তত কিছুটা করপাত বহন করিতে হইবে, কারণ পূর্ণ কর-পরিমাণে দাম বাড়াইলে চাহিদা বেশি কমিয়া যায়। যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে সে কতটা কর অপসরণ করিতে পারে। যোগান যতটা স্থিতিস্থাপক হইবে, ততই করের বেশি-অংশ ক্রেতাদের নিকট অপসারণ করা সম্ভবপর হইবে। ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইলে করের ফলে দামবৃদ্ধি হইলেও এই দাম পূর্বাপেক্ষা কম হয়, কারণ উৎপাদন কমিয়া যাওয়ার গড় ও প্রান্তিক ব্যয় কমে, এবং এই কম ব্যয়ের সহিত কর-পরিমাণ যুক্ত হয়। আবার ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী থাকিলে উৎপাদন কমিলে গড় ও প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়, ফলে উহার সহিত করের পূর্ণ পরিমাণ যুক্ত হইলে কর-পরবর্তীকালের দাম পূর্ববর্তী দাম অপেক্ষা বেশি হইয়া পড়ে। সুতরাং, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী থাকিলে, হ্রাসমান প্রতিদানের তুলনায়, ক্রেতাদের উপর করের ভার অধিকতর।

উৎপাদন পরিমাণের উপর কর

আমদানি-রপ্তানি-শুল্কের করপাত (Incidence of Import-Export duties)

সাধারণত দেখা যায়, বহির্বাণিজ্যের উপর শুল্ক আরোপ করিলে উহার আর্থিক ভার আমদানিকারী ও রপ্তানিকারী দুইটি দেশের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। করপাতের কতটা অংশ কোন্ দেশ বহন করিবে তাহা নির্ভর করে, চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। চাহিদার তীব্রতা যাহার যত বেশি করপাতের তত বেশি অংশ তাহাকে বহন করিতে হইবে।

যেমন, কোন দেশ আমদানি শুল্ক আরোপ করিলে আমদানিকারী ব্যবসায়ী দামের সহিত উহাকে যুক্ত করিয়া, অর্থাৎ দাম বাড়াইয়া, ক্রেতাদের নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তবে দাম একটু বাড়াইলে চাহিদা অধিক হ্রাসের সম্ভাবনা। এই অবস্থায় আমদানিকারী নিজে করপাত বহন করিতে বাধ্য হইবে। যদি আমরা ধরিয়া লই যে, এই আমদানিকারীরা স্বাভাবিক মুনাফার বেশি পাইতেছে না, তবে তাহারা অন্য ব্যবসায়ে চলিয়া যাইতে থাকিবে। এই

আমদানি-শুল্কের ভার : চাহিদার দিক হইতে

অবস্থায় যোগান কমিবে ও দাম বাড়িবে, উহা ক্রেতাদেরই বহন করার সম্ভাবনা। যদি অবশ্য বিদেশী উৎপাদকের যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়, (অর্থাৎ সে দাম কম পাইলেও উৎপাদন কমাইতে পারে না), এবং তাহার সম্মুখে আর অপর কোন বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে, তবে এই করপাত অনেকটা (বা কিছুটা) বিদেশী উৎপাদকের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া চলে।

আরও একদিক হইতে বিষয়টি বিচার করা চলে: যে দেশ আমদানি শুল্ক আরোপ করিল, সেই দেশে ঐ দ্রব্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কিরূপ। নিজদেশে দ্রব্যটির যোগান যত বেশি স্থিতিস্থাপক ততই দাম বৃদ্ধি কম হইবে, ফলে আমদানি শুল্কের বেশি অংশ বহন করিবে বিদেশীরা।

যোগানের দিক হইতে

আমদানি শুল্কের ফলে দাম একটু বাড়িলেই দেশের মধ্যে উহার উৎপাদন যদি খুব বাড়ে, তবে স্বভাবতই এই করভারের বেশি অংশ বিদেশী উৎপাদকের দিকে অপসারণ করা চলে। ঠিক এইরূপে বলা চলে যে, বিদেশী যোগান যত কম স্থিতিস্থাপক এবং দেশীয় যোগানের তুলনায় যত কম, তাহাকে শুল্কের তত বেশি অংশের ভার বহন করিতে হইবে।

রপ্তানি-শুল্কের ভার সাধারণত রপ্তানিকারী নিজেই বহন করে, কারণ কোন একজন রপ্তানিকারী একা বিশ্বের বাজারে একটি দ্রব্যের দাম প্রভাবিত

রপ্তানি-শুল্কের ভার

করিতে পারে না। তবে (ক) কোন রপ্তানিকারী যদি একটি দ্রব্যের যোগানে একচেটিয়া অধিকার পায়, অথবা (খ) বিদেশে দ্রব্যটির জন্য চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, এবং (গ) রপ্তানিকারীর সম্মুখে দ্রব্যটির জন্য বিকল্প বাজার থাকে, তবে রপ্তানি-শুল্কের পূর্ণ পরিমাণে দাম বাড়াইয়া উহা বিদেশী ক্রেতার নিকট অপসারণ করা সম্ভবপর।

যদি কোন দেশ প্রধানত কাঁচামাল রপ্তানি করে তবে এই সকল দ্রব্যের জন্য চাহিদা সাধারণত অস্থিতিস্থাপক; অথচ তাহার আমদানি হইল শিল্পজাত দ্রব্য, উহাদের চাহিদা সাধারণত স্থিতিস্থাপক। এই অবস্থায় সেই দেশের আমদানি-রপ্তানি শুল্কের কিছুটা বিদেশীরা বহন করিবে। কিন্তু যদি বিদেশীদের হাতে এই কাঁচামালের অপর কোন উৎস থাকে, অথবা মাল বিক্রয়ের বিকল্প বাজার থাকে, তবে তাহারা মোটেই করভার বহন করিবে না। সুতরাং, দেখা যায় যে, খুব কম ক্ষেত্রেই এই সকল শুল্কের ভার বিদেশীদের নিকট অপসারণ সম্ভবপর।

উপসংহারে আমরা ডাল্টনের ভাষায় আমদানি-রপ্তানি শুল্কের করপাত সম্পর্কে মূলনীতি উল্লেখ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন, "Taxes on imports and exports may be regarded as obstacles to exchange. The direct money burden of any such obstacle is divided between the two parties to the exchange in inverse proportion to the elasticities of their respective demands. In other words, it is divided in direct proportion to the urgencies of their respective needs, which are satisfied by the exchange."*

জমি ও বাড়ির পর কর (A tax on land and buildings)

যদি দেশের সকল জমির অর্থনৈতিক খাজনার (economic rent) উপর কর আরোপিত হয়, তবে তাহার করপাত জমির মালিকের উপর পড়ে।

সকল জমির অর্থনৈতিক খাজনার উপর

আমরা জানি খাজনা হইল উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে উদ্বৃত্ত (surplus), ইহা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়, সুতরাং দাম বাড়াইয়া জমির ব্যবহারকারীর উপর ইহাকে অপসারণ করা চলে না। এই উদ্বৃত্ত বা খাজনা হইতেই কর দিতে হয়, জমির মালিক তাই এই কর বহন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু, যদি মালিকেরা উদ্বৃত্তের সবটুকুই ইতিমধ্যে খাজনা হিসাবে তুলিয়া লইতে না থাকেন, তবে খাজনা বাড়াইয়া করের কিছু অংশ জমির ব্যবহারকারীর উপর অপসারণ করিতে পারেন।

যদি দেশের সকল জমির উপর একসঙ্গে কর আরোপিত না হইয়া কোন একটি বিশেষ শস্য-উৎপাদনকারী জমির উপর আরোপ করা হয়, তবে কিছুটা

কোন বিশেষ শস্য উৎপাদনের ব্যবহারের উপর

কর-অপসারণ সম্ভবপর। যেমন, কেবল চা-উৎপাদনকারী জমির উপর কর আরোপিত হইলে, এই কর এড়াইবার জন্য ঐ জমিতে চা ব্যতীত অন্যান্য শস্য উৎপাদন সুরু হইতে পারে। ফলে চা-এর উৎপাদন হ্রাস পাইবে, ইহার দাম বাড়িবে, ক্রেতারা বর্ধিত দাম দিতে রাজি থাকিলে করের ভার তাহাদের উপর পড়িবে।

আবার, জমি হইতে উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী করহার ধার্য করা

*Dalton, *Public Finance*, p. 57.

হইলে করপাত নির্ভর করিবে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। এই করের দরুণ শস্যের উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, উহাদের দাম বাড়িবে। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে করের পূর্ণ পরিমাণে দাম বাড়িয়া যাইবে, ফলে ক্রেতাদের উপর করপাত হইবে, খাজনা সমানই থাকিবে, জমির মালিক এইরূপ অবস্থায় করাহত হইবে না। অপরপক্ষে, চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে, শস্যের দাম বাড়িলে উহার চাহিদা বিশেষভাবে কমিয়া যায়, উৎপাদন হ্রাস পায়, প্রান্তিক জমিতে উৎপাদন বন্ধ হয়, খাজনা কমে, জমির মালিক কর বহন করে।

উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী করের ভার

বাড়ির উপর কর বসাইলে উহার সর্বশেষ ভার কে বহন করে? ইহার করপাত অন্তত চারিটি শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে: বাড়ির মালিক, বাডর ভাড়াটিয়া, বাডির নির্মাতা ও বাড়িতে যে দ্রব্যটির ব্যবসায় চলিতেছে তাহার ক্রেতারা। ইহাদের মধ্যে প্রধান দুই শ্রেণীর, অর্থাৎ মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে, সাধারণত করভার বহন করে ভাড়াটিয়ারা, কারণ বাড়ির জন্য চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। তবে করের পূর্ণ পরিমাণ বাড়িভাড়া বাড়াইলে ভাড়াটিয়ারা যদি অন্যত্র চলিয়া যাইতে সুরু করেন, তবে বাড়ির মালিক বাধ্য হইয়া করভার কিছুটা বহন করিয়া থাকেন। বাড়ির উপর উচ্চহারে কর বসাইলে বাড়ি-তৈয়ারীর পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া যায়, নির্মাণকারীরা কম পারিশ্রমিক লইতে রাজি হইলে করের কিছুটা অংশ তাহাদের উপর ঠেলিয়া দেওয়া চলে। বাড়ির উপর উচ্চহারে কর বসাইলে কম বাড়ি তৈয়ারী হইতে পারে, ফলে বাড়িভাড়া বাড়িয়া যাইবে; এই অবস্থায় ভাড়াটিয়ারা করভার বহন করিবে। কিন্তু ভাড়াটিয়া যদি দোকানদার হয়, তবে সে তাহার জিনিসপত্রের দাম অল্প একটু বাড়াইয়া বর্ধিত ভাড়া ঐ দ্রব্যের ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারে, অর্থাৎ এই কর সে ক্রেতাদের উপর অপসারণ করিতে পারে।

বাড়ির উপর করের ভার চারিটি শ্রেণীর উপর পড়িতে পারে

করের মূলধনীকরণ (Capitalisation of Taxes):

করভার এড়াইবার আইনসঙ্গত উপায় বলিতে গেলে একটিই, ইহা হইল করের মূলধনীকরণ (capitalisation or amortisation of tax)। কোন

ব্যক্তি কোন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করার সময়ে লক্ষ্য করে যে, এই সম্পত্তি হইতে আয়ের উপর কোনরূপ কর আরোপিত আছে কি না। স্থায়ী সম্পত্তির উপর কর আরোপিত থাকিলে উহা হইতে নীট আয় কমিয়া যায়, ফলে নূতন ক্রেতারা এই সম্পত্তির জন্য কম দাম দেয়। ইহাকে বলে করের মূলধনীকরণ। করের পরিমাণকে প্রচলিত সুদের হারে মূলধনে রূপান্তরিত করিয়া সেই হিসাব অনুযায়ী ক্রেতারা সম্পত্তির জন্য কম দাম দিতে প্রস্তুত হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝা যাইবে। মনে কর, একটি বাড়ি হইতে বছরে 100 টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। বাজারে প্রচলিত সুদের হার হইল বাৎসরিক 5%। এই অবস্থায় ঐ বাড়িটির দাম হইবে 2000 টাকা। মনে কর, বাড়ি ভাড়ার উপর 10% হারে নূতন কর বসান হইল। কর দিবার পরে ঐ বাড়ির নীট আয় দাঁড়াইবে 90 টাকা। বাজারে 5% সুদের হার অনুযায়ী এই 90 টাকাকে মূলধনে পরিণত করিয়া দেখা যায় বাড়িটির দাম হইবে 100 টাকা। বাড়ির ভবিষ্যৎ ক্রেতারা জানে যে, উহার আয়ের উপর কর আরোপিত হইয়াছে, তাহারা এই করকে মূলধনে রূপান্তরিত করিয়া, বাড়ির পূর্ব-মূল্য হইতে উহা বাদ দিয়া কম দামে বাড়িটি কিনিবে, এইরূপে ভবিষ্যতে চিরকালের জন্য কর-ভার এড়াইয়া যাইবে। এই ক্রেতা ভবিষ্যতে 10 টাকা কর দিবে, কিন্তু সে যে 200 টাকা কম দাম দিয়াছে, সেই 200 টাকার মূলধন হইতেই 5% সুদের হারে তাহার 10 টাকা আয় হইবে, তাই প্রকৃতপক্ষে কমদামের মাধ্যমে সে কর এড়াইতে পারিয়াছে। আর বাড়ির বর্তমান বিক্রেতা বা মালিক কম দাম পাইয়া এই করভার বহন করিয়াছে।

করের মূলধনীকরণ কাহাকে বলে

এরূপ করভার এড়ান সম্ভব

বাড়ির বর্তমান মালিক দুই দিক দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। করের দরুণ তাহার বর্তমান আয় কমিয়া গেল; আর যদি সে এই আয়-হ্রাস এড়াইবার জন্য বাড়িটি বিক্রয় করিতে চায় তবে তাহাকে কম দামে বিক্রয় করিতে হইবে। কর-আরোপণের পরবর্তীকালের ক্রেতারা কম দামে সম্পত্তি কিনিয়া করের ভার এড়াইতে পারিবে। এইজন্যই একটি কথা চলিত আছে যে "পুরানো করের কোন কর-ভার নাই" ("an old tax is no tax")।

করের এইরূপ মূলধনীকরণ সম্ভব হয় যদি ইহার অনুকূল পরিবেশ থাকে, অর্থাৎ কয়েকটি শর্ত বজায় থাকে। প্রথমত, যে সম্পত্তি আয়ের উপর কর আরোপিত হইতেছে উহা দীর্ঘস্থায়ী ধরনের হওয়া দরকার। স্থায়ী না হইলে

করের ফলে উহা হইতে আয় কমিবে, ফলে যোগান হ্রাস পাইবে। তখন উহার দাম বাড়িবে। এইরূপে করভার ক্রেতাদের উপর অপসৃত হইবে। দ্বিতীয়ত, করটি এমন হইবে যে, সকল ধরনের সম্পত্তির উপর ইহা আরোপিত হয় না, কেবল বিশেষ কোন এক ধরনের স্থায়ী সম্পত্তির উপর ইহা আরোপিত হইতেছে। সকল ধরনের সম্পত্তির উপর এই কর বসান হইলে লগ্নীকারীরা সর্বত্রই এই কর দিতে বাধ্য, অপর কোথাও গেলে এই কর এড়ান চলে না। তৃতীয়ত, করটি এমন হইবে যাহাতে ক্রেতাদের নিকট অপসারণ করা সম্ভব হয় না। করের মূলধনীকরণ বলিলে বোঝা যায় সম্পত্তির মূলধনীমূল্য হ্রাস পাওয়া (a reduction in the capital value of the asset) ; ইহা তখনই সম্ভব যদি এই করের অপসারণ সম্ভব না হয় ; চতুর্থত, করের পরেও সম্পত্তির যোগান ও চাহিদার সাধারণ সম্পর্কগুলিতে কোনরূপ পরিবর্তন আসিলে চলিবে না, উহারা মোটামুটি সমানই থাকিবে। যেমন বাড়ির আয়ের উপর কর বসান-র পরে যদি হঠাৎ বাড়ির চাহিদা খুব বাড়িয়া যায়, তবে বাড়ির দাম বাড়িয়া যাইবে, করের মূলধনীকরণ না-ও ঘটিতে পারে।

মূলধনীকরণের শর্তসমূহ

আর একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। এইরূপ সম্পত্তির উপর কর-হার হ্রাস পাইলে বা ইহাদের বিশেষ কোন সুবিধা দেওয়া হইলেও একধরনের মূলধনীকরণ ঘটিতে পারে। কোন সম্পত্তির উপর কর-হার হ্রাস বা কোনরূপ বিশেষ সুবিধাদানের ফলে ওই সম্পত্তির মূলধনী মূল্য বৃদ্ধি পায়। মনে কর, বাড়ি ছাড়া অন্য সকল প্রকার সম্পত্তির উপর কর আরোপিত হইল। এই বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্য, এই সুবিধার আর্থিক পরিমাণকে ক্রেতারা মূলধনে রূপান্তরিত করিবে, এবং বাড়ির জন্য পূর্বাপেক্ষা বেশি দাম দিতে রাজি হইবে।

বিপরীত দিকেও মূলধনীকরণ দেখা দিতে পারে

অনেক ধনবিজ্ঞানী বলিতে চান যে করের মূলধনীকরণ একপ্রকার পশ্চাৎমুখী অপসারণ (backward shifting)। তাঁহাদের মতে নূতন ক্রেতা সম্পত্তির জন্য কম দাম দিয়া করের ভার পুরাতন মালিকদের নিকট ঠেলিয়া দিতেছে, তাই ইহা একপ্রকার অপসারণ। কিন্তু, করের অপসারণ ও মূলধনীকরণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। বিশেষ কোন কর অপসারণের তাৎপর্য হইল প্রতিবার বিক্রয়ের সময়ে এই করের দরুণ দ্রব্যটির মূল্য কর-পরিমাণ পর্যন্ত কমিয়া যাইতেছে

কর-অপসারণ ও কর-মূলধনীকরণ এক নয়

বিক্রেতার নিকট হইতে কম দামে ক্রেতা দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারিতেছে। কিন্তু মূলধনীকরণ হইল করের ফলে ভবিষ্যতে কম আয় হওয়া, বাৎসরিক কম আয়গুলিকে বাজারের সুদের হারে মূলধনে রূপান্তরণ, তাহার ফলে সম্পত্তির মূলধনী-মূল্য (Capital Value) হ্রাস পাওয়া, একসঙ্গে অনেক বছরের করের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া,। অধ্যাপক সেলিগ্‌ম্যান এইজন্য বলিয়াছেন "If a tax is shifted, it cannot be capitalised ; if a tax is capitalised, it cannot be shifted."

কয়েকটি করের প্রকৃতি ও ফলাফল: আয় কর (Nature and effects of few taxes : Income-tax)

আজকাল পৃথিবীর সকল দেশে কর ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে আয়-কর। সকল প্রত্যক্ষ করের মধ্যে ইহা সর্বপ্রধান। সকল উৎসের মধ্যে আয়-করের স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশি। ক্রমবর্ধনশীল নীতি অনুযায়ী ব্যক্তির প্রদান ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহার হার সাজান চলে। এই কর আদায়ের খরচা কম, তাই ইহা খুবই উৎপাদনশীল (productive)। আয়-কর হইতে সরকারের কত আদায় হইতে পারে তাহা মোটামুটি সঠিক পরিমাণে হিসাব করা সম্ভবপর। আয়-করের আরও একটি সুবিধা এই যে ইহাকে অপসরণ করা চলে না, মোটামুটি ইহার প্রত্যক্ষতা (directness) অপরের তুলনায় বেশি।

আয়করের গুরুত্ব কি

আয়-কর সম্পর্কে আলোচনার সময়ে আরও দুই ধরণের কর সম্পর্কে জানা থাকা দরকার। অতি-কর (super-tex) বলিলে বুঝা যায় ঊর্ধ্ব আয়স্তরে সাধারণ হারের তুলনায় বেশি হারে কর আরোপ করা। অনেক সময় সাধারণ আয়-করের সহিত এইরূপ অতি-কর আরোপ করা হয়। ইহাতে ধরিয়া লওয়া হয় যে, কোন এক নির্দিষ্ট স্তরের পরে টাকার বা আয়ের প্রান্তিক উপযোগিতা খুবই কম। যৌথ-কর (corporate-tax) বলিলে বুঝা যায় যৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহের মোট মুনাফা বা আয়ের উপর কর। শেয়ার-ক্রেতার মধ্যে বণ্টিত হওয়ার পূর্বে কোম্পানীর আয়ের উপর এই কর আরোপ করা হয়। কর-আদায়ের ব্যাপারে কোম্পানীকেই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করিয়া এই কর আদায় করা হয়।

অতি-কর ও কোম্পানী কর

কথা হইল কর আরোপের দিক হইতে দেখিতে গেলে 'আয়' কাহাকে বলে? ধনবিজ্ঞানে 'আয়' বলিলে ইহার দুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে আসে: প্রথমত, কিছু সময়ের মধ্যে ব্যক্তি ইহা পাইতেছে (flow of receipts during a period of time) এবং দ্বিতীয়ত, তাহার এই পাওয়া নিম্নলিখিত-ভাবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অন্তর বারবার ঘটিতেছে (regularity or recurrence)।

আয়কে আবার তিনভাবেও দেখা চলে: আসল আয়, মানসিক আয় এবং আর্থিক আয়। মূলধন বা শ্রমশক্তি হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়মিতভাবে দ্রব্যসামগ্রীর যে স্রোত পাওয়া যায় তাহাই আসল আয় (Real Income)। এই দ্রব্য সামগ্রী হইতে ব্যক্তি যে তৃপ্তি পায়, তাহার সেই সকল উপযোগিতার স্রোতই ব্যক্তির মানসিক আয় (Psychic Income)। আর আর্থিক আয় (Money Income) হইল মূলধন বা শ্রমশক্তির ভাণ্ডার হইতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত কিরূপ টাকা সে পাইতেছে। কর আরোপণের দিক হইতে মানসিক আয়ের ধারণা গ্রহণ করা চলে না, কারণ ইহা নিতান্ত অনুভূতির বিষয় এবং সমান আয় পাইতেছে এইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুভূতির মাত্রায় বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। নিখুঁতভাবে কোন ব্যক্তির আসল আয় জানিতে পারা অসুবিধাজনক; ইহার হিসাবও শক্ত। তাই আর্থিক আয়কেই করের ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু ব্যক্তির কর প্রদান ক্ষমতা হিসাব করার ব্যাপারে আর্থিক আয় সম্পূর্ণ নিখুঁত মাপকাঠি হইতে পারে না। অর্থাৎ আয় সমান হইলেও বিভিন্ন ব্যক্তির আসল আয় পৃথক হইতে পারে। তাই অনেক দেশেই, কর আরোপের সময় ব্যক্তির আয় হিসাব করার সময়ে টাকা ছাড়াও "অন্যান্য সুবিধাগুলি" হিসাব করা হয়। নিজের বাড়ীতে থাকা, বেতনের অংশ হিসাবে কোম্পানী হইতে বিনা ভাড়ায় বাড়ি পাওয়া—এই সকল সুবিধা যোগ করিয়া ব্যক্তির মোট আয় হিসাব করা হয়।

আয় বলিলে কি বুঝা যায়

ব্যক্তির আয় হিসাব করার সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার। মূলধন হইতে যাহা পাওয়া যায় সেই আয় হইতে কর দিতে হইবে. কিন্তু মূলধন কাটিয়া যেন কর দেওয়া না হয়। কারণ তাহাতে দেশের মূলধন হ্রাস পাইবে। সুতরাং আয়ের সংজ্ঞা নির্ণয়ের সময়ে মনে রাখা দরকার যেন উহার মধ্যে মূলনধকে ধরা না হয়। মূলধনকে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে স্থূল আয় হইতে

ক্ষয়-ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছুটা সরাইয়া রাখিয়া তবেই কর-আরোপণযোগ্য নীট আয় হিসাব করা দরকার। অন্তত বাস্তব ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার উপযোগী এমন কোন মানদণ্ড বা সংজ্ঞা চাই যাহাতে স্থূল আয়ের মধ্য হইতে মূলধন ও আয়ের অংশ স্পষ্টভাবে চিনিতে পারা যায়। Value and Capital গ্রন্থে অধ্যাপক হিক্‌স্ 'আয়' কাহাকে বলে সেই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্যক্তির আয় হইল সেই সপ্তাহে তাহার মোট ভোগব্যয়, যাহার পরেও সে সপ্তাহ-সুরুর অবস্থার মত সমান স্তরে থাকিতে পারে ("a person's income is what he can consume during the week and still expects to be as well off at the end of the week as he was at the beginning.)। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ব্যক্তি যদি তাহার পূর্ণ আয় ভোগে ব্যয় করে তাহা হইলেও ভবিষ্যতে ঐ পরিমাণ আয় পাইতে তাহার কোন অসুবিধা হয় না। ইহা তখনই সম্ভব হয় যদি তাহার মূলধন অক্ষুণ্ণ থাকে।

মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখা

কর-কাঠামোকে মোটামুটি ন্যায়সংগত করিয়া তুলিতে হইলে নিম্নতম একটি সীমা পর্যন্ত আয়কে করের আওতা হইতে বাদ দিতে হইবে। করমুক্ত এই নিম্নতম আয়-সীমা স্থির করার সময়ে করদাতার জীবনযাত্রার মান এবং তাহার আর্থিক দায়িত্বের কথা স্মরণ রাখা দরকার। উচ্চ আয়-স্তরসমূহে আয়করের হার খুব বেশি রাখা হয়, এই সময়ে করদাতার আয়ের উপর নির্ভরশীল লোকজনের সংখ্যা হিসাব করা দরকার। স্যার জোশিয়া ষ্ট্যাম্প আরও অনেক কিছু বিচার করার কথা বলিয়াছেন। যেমন, তাঁহার মতে পরিশ্রম-লব্ধ আয় এবং পরিশ্রম-বিনা আয়ের মধ্যেও পার্থক্য করা দরকার (earned income and unearned income): প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির উপর কর-হার অনেক বেশি হওয়া উচিত।

ন্যায্যতার নীতি

সাধারণত এক বৎসরের মধ্যে আয় হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, অর্থাৎ সেই বৎসর কালীন আয়ের উপরই কর আরোপিত হইয়া থাকে। ক্যালেণ্ডারের হিসাব ধরিয়া বারো-মাসের মধ্যে ঐ আয় তখন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। অর্থাৎ, আয় যখন হাতে আসে, তখনই আয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়। মজুরি মাহিনা সুদ প্রভৃতি আয়ের ক্ষেত্রে ইহা কিছুটা সত্য হইলেও মুনাফা বা রয়ালটির ক্ষেত্রে ইহা সত্য নয়। প্রতিটি

আয় কখন হাতে আসিল বা কতদিন ধরিয়া উহা সৃষ্টি হইল

ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, নূতন ব্যবসায় হইতে প্রথমে বেশি আয় হয় না। প্রথমদিকে লোকসান হয়, ক্রমে ব্যবসায়িক সুনাম সৃষ্টি হয়, কয়েক বৎসর পরে উহা হইতে নীট আয় হইতে থাকে। আয়ের পরিমাণ কর-যোগ্য স্তরে উঠিলে মনে হয় যেন উহা সেই চল্‌তি বৎসরকালের মধ্যেই উদ্ভূত হইয়াছে। ফলে সেই করের ভার বেশি বলিয়া মনে হইতে পারে। ডাক্তার, উকিল, লেখক প্রভৃতির আয়ের কথাই ধরা যাউক না কেন। তাঁহারা উপযুক্ত পরিমাণে আয় পাওয়ার পূর্বে অনেক বছর তেমন বেশি কিছু আয় করিতে পারেন না, কিন্তু পরবর্তী কোন বৎসরে আয় বাড়িলে তাঁহারা নিয়মিত আয়শীল ব্যক্তির সহিত সমান হারে কর দেন। ইহা ন্যায়সংগত নয়। যেমন, কোন এক ব্যক্তি প্রথম পাঁচ বছরে খুব কম আয় করিয়া ষষ্ঠ বৎসর হইতে 10000 টাকা আয় করিতে লাগিল। অপর কোন এক ব্যক্তি প্রথম বৎসর হইতেই ঐ আয় পাইতেছিল। উভয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির তুলনায় দ্বিতীয় ব্যক্তির করবহনযোগ্যতা বেশি বলিয়া মনে করা উচিত।

অনেকে তাই কর বহনযোগ্যতার দিক হইতে বিচার করিয়া কয়েক বৎসরের আয়ের গড়কে বাৎসরিক আয় বলিয়া গণ্য করিতে বলেন। ইহার নাম গড়-বৎসর-পদ্ধতি (average-year method)। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ডে এই নীতি গৃহীত ছিল, পূর্ববর্তী তিন বৎসরের গড় আয়কে কর-যোগ্য আয় বলিয়া মনে করা হইত। আবার অনেকে ঠিক পূর্ববর্তী বৎসরের আয়কে করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করিতে বলেন, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ভারতে দেখা যায়। ইহাকে বলে পূর্ববর্তী-বৎসর-পদ্ধতি (Previous year method)। এই দুইটি পদ্ধতির পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধার কথাও সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়।

গড়-বৎসর পদ্ধতি ও পূর্ববর্তী বৎসর পদ্ধতি

পূর্ববর্তী-বৎসর পদ্ধতির পক্ষে প্রধান বক্তব্য হইল করদাতার নিকট ইহা সরল ও সুবিধাজনক (simple & convenient)। কিন্তু এই নীতির ত্রুটি হইল পূর্ববর্তী বৎসরটুকু মাত্র হিসাবে ধরিলে কর-ভিত্তি সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, ইহাতে করদাতার করদানযোগ্যতার সঠিক পরিমাপ হয় না। এই দোষ গড়-বৎসর পদ্ধতির নাই। কিন্তু গড়-বৎসর পদ্ধতির অসুবিধা হইল এই যে, লোকে পূর্বের ভাল বৎসরগুলির হইতে আয় কিছু অংশ সঞ্চিত রাখিল তাহা বিশেষ দেখা যায় না, তাই পরবর্তী বৎসরে আয় কমিয়া গেলে গড় অনুযায়ী কর দিতে বেশ কষ্ট হয়। আয় এবং কর-হার প্রতি বৎসরই বদলাইবে এইরূপ ধারণা থাকায়

গড়-বৎসর পদ্ধতি লোকে আর ততটা পছন্দ করে না। ইংলণ্ডে এই নীতির সমর্থন আর বিশেষ পাওয়া যাইতেছে না। অর্থনৈতিক উঠানামা এবং করহারে প্রতি বৎসর পরিবর্তন, এই দুটি কারণের ফলে পূর্ববর্তী বৎসর পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে অবশ্য পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই বর্তমান-বৎসর পদ্ধতি (currnet year method) প্রয়োগ করা হইতেছে। এই পদ্ধতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে মাহিনা-ভোগী করদাতাদের উপর। তাঁহারা এই PAYE পদ্ধতিতে (Pay-as-you-earn, অর্থাৎ আয়-করো-আর-দিতে-থাকো) কর দেওয়া খুবই সুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু নীতির দিক হইতে ইহার গুরুত্বপূর্ণ একটি ত্রুটি হইল বর্তমানের চল্‌তি আয় হিসাব করার অসুবিধা। এই পদ্ধতিতে তাই পরবর্তী বৎসরে টাকা ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থাও (refunds) রাখিতে হয়।

চল্‌তি বৎসর পদ্ধতি

আয়করের ফলাফল লইয়া ধনবিজ্ঞানীরা প্রচুর বিতর্ক করিয়াছেন। আমরা উহার মাত্র কয়েকটি দিক লইয়া আলোচনা করিব। প্রথমেই দেখিতে হইবে ব্যক্তির সঞ্চয়ের ও কাজকর্মের ক্ষমতার উপর আয়করের প্রভাব কি (effects on peoples ability to work and save)। আয়করের হার যদি এত বেশি রাখা হয় যে ব্যক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনতে না পারে তাহা হইলে কাজ ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা নিশ্চয়ই প্রভাবিত হইবে। সুতরাং আয়করের ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে আয়করের হার, কোন শ্রেণীর আয়ের উপর এই কর আরোপিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন আয়সম্পন্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রা বিচার করিয়া নিম্নতম করমুক্তির যে সীমারেখা টানা হইয়াছে—এই সকল বিষয়ের উপর। প্রতিটী করই লোকের হাত হইতে টাকা টানিয়া তুলিয়া লয়, তাই আয়করও নিশ্চয়ই তাহাদের সঞ্চয়ের ও কর্মোদ্যমের ক্ষমতা কিছুটা কমাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট সঞ্চয় ও কাজের ক্ষমতা কমায় কি না তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে কি পদ্ধতিতে কর হইতে পাওয়া টাকা সরকার ব্যয় করেন তাহার উপর। যদি সরকারী ঋণের উপর সুদ দিবার উদ্দেশ্যে কর-প্রাপ্ত এই টাকাকে ব্যয় করা হয় তবে বণ্ড-মালিকদের আয় বাড়িবে বা ক্রয়শক্তির হস্তান্তর ঘটিবে। সাধারণ করদাতার তুলনায় তাহাদের ভোগপ্রবণতা অনেক কম বলিয়া দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে।

আয়করের ফল কি

সঞ্চয় ও কর্মোদ্যমের ক্ষমতার উপর

লোকের কাজকর্মের এবং সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর আয়করের প্রভাব কিরূপ সেই সম্পর্কে বহু বিতর্ক হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা চলে যে, ইহার অনেকটাই নির্ভর করে করহারের উচ্চতা এবং জনসাধারণের মানসিক অবস্থার উপর।

সঞ্চয় ও কর্মোগুমের ইচ্ছার উপর

যদি লোকে টাকা চায় সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে বা পরিবারের সকলের নিরাপত্তার জন্য, তবে আয়কর আরোপের ফলে স্বভাবতই তাহাদের কাজের ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে। অধিবাসীদের মধ্যে বিচার-বিবেচনা, ভবিষ্যৎ চিন্তা প্রভৃতি থাকিলে আয়করের ফলে এই ইচ্ছা নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং এই বিষয়ে আমরা সাধারণভাবে বলিতে পারি যে, ব্যক্তির আয়গত স্থিতিস্থাপকতার উপর ইহা নির্ভর করে। অন্যান্য সকল কিছু সমান অবস্থায়, আয়ের জন্য চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে আয়করের প্রভাবে সঞ্চয় ও কর্মোগুমের ইচ্ছা কমিয়া যাইবে। আবার, আয়ের জন্য চাহিদা অস্থিতি-স্থাপক হইলে সঞ্চয় ও কর্মোগুমের ইচ্ছা বাড়িয়া যাইবে।

সঞ্চয়ের উপর আয়করের প্রভাব সম্পর্কে ধনবিজ্ঞানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তর্ক আছে। ব্যক্তি যখন আয় করিল তখন সেই সমগ্র আয়ের উপরই সে কর দেয়। কর দেওয়ার পরে অবশিষ্ট আয় হইতেই সে সঞ্চয় করে। সুতরাং এই সঞ্চয়-অংশের উপর একবার কর দেওয়া হইয়া গিয়াছে। পরে যখন আবার সেই সঞ্চয় হইতেই আয় সৃষ্টি হইতে থাকে তখন সেই পরবর্তী আয়ের উপর আবার কর আরোপ করা হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, আয়কর প্রকৃতপক্ষে সঞ্চয়ের উপর ডবল কর আরোপণ (Double Taxation)। মার্শাল, পিগু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানীরা আয়করের এই ত্রুটির কথা বলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য স্যার জোশিয়া ষ্ট্যাম্প এই বিষয়ে একটু ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাতে ডবল কর-আরোপণ ঘটে না। কারণ পরবর্তী বৎসরের কর ঠিক সঞ্চয়ের উপরই আরোপিত হইতেছে না, উহা আরোপ করা হইতেছে সেই সঞ্চয়-জাত আয়ের উপর। সঞ্চয় হইতে আয় হয় 'অপেক্ষা'-র দরুণ সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কর আরোপিত হইল এই 'অপেক্ষা'র উপর, সঞ্চয়ের উপর নয়। এই বিষয়ে আমরা জোশিয়া ষ্ট্যাম্পের কথা মানিয়া লইতে পারি, কারণ সঞ্চয় যদি পুনরায় আয় সৃষ্টির কাজে মূলধন হিসাবে নিযুক্ত হয় তবেই

ইহা সঞ্চয়ের উপর দুইবার কর-আরোপ করে কি না

আয়-করের আঁওতায় পড়ে; কেহ সঞ্চয় জমাইয়া রাখিলে তাহাকে আর দ্বিতীয়বার কর দিতে হইবে না।

সর্বশেষে, আয়করের ভূমিকা সম্পর্কে আজকাল দৃষ্টিভংগী অনেকাংশ বদল হইয়া গিয়াছে। বাণিজ্যচক্র রোধের কাজে ইহার কার্যকারিতা (contra-cyclical role) সম্পর্কে আধুনিককালের ধনবিজ্ঞানীরা ইহার গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্ব সাধক (Antomatic stabiliser) হিসাবে ইহাকে আজকাল বাজেটের মধ্যে অতি উচ্চ আসন দেওয়া হইতেছে। চক্র-বিরোধী করনীতির (counter-cyclical taxation) একটি প্রধান অস্ত্র হইল এই আয়কর। এইরূপ কর-নীতির উদ্দেশ্য হইল অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে বেসরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান এবং পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে এই ভোগ ও বিনিয়োগের বৃদ্ধিকে সীমার মধ্যে রাখা, কারণ তাহা না হইলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। অপূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে, যখন উৎপাদক ও ক্রেতাদের মধ্যে উপযুক্ত আশার সঞ্চার হইতেছে না, তখন ফিস্‌কাল নীতির প্রধান দিক হইল সরকারী ব্যয়। এই সময়ে করনীতি ততটা সাহায্য করিতে পারে না। এই স্তরের প্রধান কাজ ভোগব্যয় বাড়ান, যাহাতে বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়িতে পারে। কিন্তু আয়কর হ্রাস করিয়া ভোগব্যয় সাধারণত বাড়ান যায় না। নিম্ন আয়স্তরে করভার লাঘব করিলে এই বিষয়ে অল্প-কিছু ফল পাওয়া যাইতে পারে। উন্নতির কাল শেষ হইয়া সমৃদ্ধির যুগে সমাজ প্রবেশ করিলে আয়কর ধীরে ধীরে বাড়ান চলে, যাহাতে ফাট্‌কামূলক বিনিয়োগ ও আয় সমাজে ততটা বাড়িতে না পারে। সমাজ যত বাণিজ্যচক্রের শীর্ষদেশে পৌঁছিতে থাকিবে, নিম্ন আয়-শ্রেণীর উপর কর তত বাড়ান দরকার। এইরূপে আয়করকে চক্রবিরোধী কার্যে নিয়োগ করা চলে।

আয়করের চক্রবিরোধী ভূমিকা

আয়করের বিবিধ সমস্যা (Miscellaneous Problems of Income Taxation):

(১) মূলধনী লাভের সমস্যা (The Problem of Capital Gains) আয়করের যত সমস্যা আছে উহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল মূলধনী লাভের উপর কর-আরোপ করার সমস্যা এবং মূলধনী-লোকসানকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া। কোন ব্যক্তির হাতে যে মূলধন আছে উহার বিক্রয়-মূল্য

যদি পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, তবে তাহার মালিকের মূলধনী-লাভ হইল বলিয়া মনে করা হয়। মূলধনী দ্রব্য বা সম্পত্তিটির বিক্রয় করিয়া উহার ব্যয় বা ক্রয়মূল্য অপেক্ষা অধিক নগদ টাকা হাতে আসিলে এই মূলধনী-লাভ ঘটে। অপরপক্ষে বিক্রয় করিয়া ক্রয় মূল্য অপেক্ষা কম টাকা পাওয়া গেলে মূলধনী-ক্ষতি ঘটে। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মূলধনী-লাভ ঘটিলে ব্যক্তির কর প্রদান ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং মূলধনী-ক্ষতি হইলে তাহার করপ্রদান ক্ষমতা হ্রাস পায়। এইরূপ মূলধনী-লাভ কখনও নিয়মিত ঘটে না; ব্যক্তির আয় পাইবার যে সাধারণ চিরাচরিত পথ আছে, তাহার বাহিরে এই আয় বা ক্ষতি দেখা দেয়। মূলধনী লাভের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। (১) ইহাদের অনিয়মিত চরিত্র; (২) কর ভার এড়াইবার উদ্দেশ্যে ব্যক্তির খুশিমত ইহাদের ঘটাইবার চেষ্টা করা; এবং (৩) উচ্চআয়গোষ্ঠীদের মধ্যেই ইহার অধিকতর প্রাদুর্ভাব। সাধারণ, বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধিকালে মূলধনী-লাভ ঘটিতে থাকে, আর অবনতিকালে মূলধনী দেখা দেয়।

মূলধনী-লাভ ও ক্ষতি কাহাকে বলে :

মূলধনী-লাভকে আয় বলিয়া গণ্য করা চলে বলিয়া অনেক ধনবিজ্ঞানী মনে করেন না। তাঁহাদের মতে আয় হইল মূলধন নামক কোন এক ভাণ্ডার বা সম্পত্তি হইতে নিয়মিত ধারায় যাহা পাওয়া যাইতে থাকে সেই স্রোত। মূলধন হইতে উহার আয়কে পৃথক করা সম্ভব নয়, ইহা অনিয়মিত, উহা মূলধনের বিক্রয়-মূল্যের উঠানামা মাত্র; ইহাকে আমরা তাই আয় বলিয়া গণ্য করিতে পারি না * অপরপক্ষে, ইহা স্পষ্টই যে, মূলধনী-লাভ ঘটিলে করপ্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, কারণ ক্রয় মূল্য অপেক্ষা বিক্রয় মূল্য বেশি বলিয়া ব্যক্তির হাতে

ইহাকে আয় বলা চলে কি না

* "the value of the capital asset may change because of variations in earning prospects; or it may change because of price variations, even though there be no difference in physical output of goods and services; or it may change, regardless or any of the above variations, because of fluctuations in interest rates. In short: the capital value, is the image in the mirror It may be magnified by price increases or by a decline in the capitalization rate; or it may be reduced to less than life size by changes of prices or interest rate in the respective contrary directions. It is mistaking the image for the reality to regard the changes that occur in the reflected and derived value of the capital asset as being in any sense income............The recognition of a realized capital gain as income implies that the gain is in someway severable' that it can be diverted to consumption or in payment of tax, without impairing the wealth of the owner". *Lutz Public Finance* P, 410.

টাকার পরিমাণ সরাসরি বাড়িয়া যায়। ইহা কর-আরোপ-যোগ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তবে ইহা ঠিক যে, মূলধনী-লাভকে আমরা আয় বলি বা না-বলি ইহাতে ব্যক্তির করপ্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে ; এই টাকা তাহার নিকট এমনরূপে আসিতেছে যে তিনি উহা ভোগব্যয় বা সঞ্চয় যাহা কিছু করিতে পারেন। এই টাকা সম্পূর্ণ ব্যয় বা সঞ্চয় করিলেও তাহার ভবিষ্যৎ আয় পাইতে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। তাই উহা করযোগ্য। কিন্তু যদি উহাকে আমরা করযোগ্য বলিযা মনে করি, তবে মূলধনী-ক্ষতিকেও করের সময় হিসাব হইতে বাদ দিতে হয়। কয়েক বৎসরকে হিসাব-কাল বলিয়া ধরিতে হয়, সেই সময়ের মধ্যে লাভ ও ক্ষতি পরস্পর মিটাইয়া নীট মূলধনী লাভ-ক্ষতি হিসাব করিতে পারা যায়। কিন্তু এই সম্ভাবনার সুযোগ থাকিলেই বৃহৎ ব্যবসায়ীরা উহার দৌলতে নিশ্চয় কিছু কর ফাঁকি দিবে। তাহা ছাড়া, বাণিজ্য চক্রের অবনতির যুগে যখন মূলধনী-ক্ষতি ক্রমশ দেখা দিতে থাকিবে তখন সরকার কিছু কিছু মূলধনী ক্ষতিকে স্বীকার করিযা লন বটে, কিন্তু ইহার সর্বত্র প্রয়োগ স্বীকার করেন না। ন্যায়-নীতির দিক হইতে ত্রুটি থাকিয়া গেলেও কর-শাসনের সুবিধার দিক বিচাব করিলে এই সকল রাষ্ট্র ঠিকই করেন বলিয়া মনে হয়।

তবুও ইহা করযোগ্য কেন

আর একটি কথা আছে। সাধারণ আয়কর যে হারে আরোপিত হয়, মূলধনী লাভ-করেব হারও সেইরূপ হইবে কি না। বলা হইয়াছে যে, সাধারণ চল্‌তি আয়করের হারে মূলধনী-লাভ-কর আরোপ করিলে মূলধনের বাজারে বহুবিধ সংঘাত সৃষ্টি হয়, আস্থা ও বিশ্বাস ভাঙিয়া পড়ে, এবং মূলধনের বাজারে অস্বাভাবিক ধরনের কাজকর্ম দেখা দেয়। যেমন, অবনতি-কাল সুরু হওয়ার সময়ে সকল ব্যবসায়ীরা তাহাদের শেয়ার বা মূলধনী-সম্পত্তি একসঙ্গে বিক্রয় করিতে উদ্যত হইবে, লোকসান দেখাইতে পারিলে পূর্বের মূলধনী-লাভের উপর করভার কিছুটা কম হইবে। সুতরাং উচ্চহারে মূলধনী-লাভের উপর কর আরোপ করার অসুবিধা আছে।

ইহার হার কিরূপ হওয়া উচিত

(খ) উপার্জিত আয় ও অনুপার্জিত আয় (Earned Income Unearned Income)

আয়কে আরও দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ; 'উপার্জিত' আয় ও 'অনুপার্জিত' আয়। সাধারণত মজুরি, মাহিনা এইরূপ পরিশ্রমসাধ্য

কাজকর্ম হইতে যে আয় হয় তাহা 'উপার্জিত' আয় : আবার শেয়ারের লভ্যাংশ সুদ প্রভৃতি অনায়াসলব্ধ যে আয় তাহাকে 'অনুপার্জিত' আয় বলে।

'অনুপার্জিত' আয়ের তুলনায় স্বল্পহারে 'উপার্জিত' আয়ের কর বসান হউক এইরূপ কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। স্বল্প আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর বেশির ভাগ আয়ই 'উপার্জিত', জীবিকানির্বাহের উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের আয় ব্যয়িত হয়। উচ্চ আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর বেশির ভাগ আয়ই 'অনুপার্জিত', এইরূপ আয়ের অধিংকাশ বিলাসব্যসনে ব্যয়িত হয়। বিলাসে ব্যয়িত না হইলেও এই আয় আবার সুনিশ্চিত ক্ষেত্রে এইরূপ ভাবে বিনিয়োগ হয় যে, তাহা হইতে আবার 'অনুপার্জিত' আয় সৃষ্টি হইতে পারে।

এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে দুইটি কথা বলা হয়। প্রথমত, বিনিয়োগ হইতে আয় অনেক সময় ,উপার্জিত' মাহিনা ও মজুরির তুলনায় অনেক বেশি অনিশ্চিত। দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগ হইতে তথাকথিত 'অনুপার্জিত আয়ের অনেকটাই তাহার বুদ্ধি, দক্ষতা ও ক্ষমতার দরুণ প্রাপ্য।

অসুবিধা হইল এই যে করের উদ্দেশ্যে এই দুই প্রকার আয়ের মধ্যে কার্যত পার্থক্য নিরূপণ করা বিশেষ অসুবিধাজনক। 'উপার্জিত' আয়ের তুলনামূলক ভাবে সুবিধা দেওয়ার একমাত্র পথ হইল নিম্নতম করমুক্তির সীমানা যথাসম্ভব উঁচুতে রাখা এবং ক্রমবর্ধনশীল হারে আয়কর আরোপ করা।

(গ) আকস্মিক আয় বা অচিন্ত্যপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি হইতে আয়ের উপর কর (Tax on windfalls or unearned increment)

আকস্মিক আয় (windfall income) বলিলে বুঝা যায় হঠাৎ কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির হাতে বিশেষ কিছু পরিমাণ আয় আসিয়া পড়া। এই আয় সে প্রত্যাশা করে নাই অথবা ইহার জন্য সে কোনরূপ চেষ্টা করে নাই। অধ্যাপক পিগু (Pigou) এই শব্দটিকে আর একটু সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন. তাঁহার মতে, বিনা চেষ্টায় বা বিনা পরিশ্রমে নিজের অজানিতে লোকের সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য বাড়িয়া যাওয়াকেই আমরা আকস্মিক আয় বলিয়া থাকি। সাধারণভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা দুই ধরনের আয়কর দেখিতে পাই : প্রথমটি হইল জমির মূল্যবৃদ্ধির উপর কর (tax on increment value of land) এবং দ্বিতীয়টি হইল যুদ্ধকালীন অতি-মুনাফার উপর কর (tax on wartime excess profits)।

আকস্মিক আয় কাহাকে বলে : ইহার দুই রূপ

আকস্মিক আয় বা অচিন্ত্যপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির উপর কর আরোপ করার স্বপক্ষে বহু যুক্তি দেখান হইয়াছে। ব্যক্তির মোট আয় যাহাই হউক না কেন, নূতন কোন আয়প্রাপ্তি ঘটিতে পারে এইরূপ ধারণা তাহার মনে কখনই ছিল না, ইহার জন্য সে কোন পরিশ্রম করে নাই। বর্ধিত এই হঠাৎ-আয় হইতে কিছু পরিমাণ কর দিলেও তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না। এই করের স্বপক্ষে আর একটি যুক্তি হইল যে, জমির ক্ষেত্রে অচিন্ত্যপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ঘটে একান্তভাবে সামাজিক কারণে। মালিকের বিনা চেষ্টায়, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, শিল্পপ্রসার, সহর ও গ্রাম ও জনপদের অর্থনৈতিক উন্নতি সব কিছু মিলিয়া জমির এইরূপ অচিন্ত্যপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ঘটে; তাই এই মূল্যবৃদ্ধির কিছু অংশ কর-রূপে রাষ্ট্রের নিকট যাওয়া দরকার।

১। জমির মূল্য বৃদ্ধির উপর কর

যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত মুনাফা-করের স্বপক্ষেও অনেক যুক্তি দেখান হইয়াছে। স্যার জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে, রাষ্ট্র বহু বিভিন্ন পদ্ধতিতে অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিয়া ব্যবসায়ীদের বহুবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। বলিয়াই তাহারা এই অতিরিক্ত মুনাফা করিতে পারিয়াছে আর তাহা ছাড়া, যুদ্ধকালীন মুনাফা বৃদ্ধির উপযোগী চাহিদা ও পরিবেশ সৃষ্টি করাও রাষ্ট্রের কাজের ফল। তাই অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর বসাইয়া উহার কিছু অংশ রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া লওয়া খুবই যুক্তিসংগত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

২। অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর

অতিরিক্ত বলিলেই কোন একটি নির্দিষ্ট মান-এর কথা প্রথমে মনে আসে। যাহার তুলনায় উহা অতিরিক্ত। কোন দেশে যুদ্ধ পূর্ব দুই বৎসরের গড় মুনাফাকে এই মান হিসাবে ধরা হয়, আবার কোথাও বা তিন বৎসরের গড়কে এইরূপ স্বাভাবিক মান হিসাবে ধরিয়া লয়। এই মানের ঊর্ধ্বে সরাসরি একটি নির্দিষ্ট হারে (Flat rate) এই কর আরোপ করা হয়।

কিন্তু এই সকল করের আদায়গত বা শাসনগত অসুবিধা খুবই বেশি। যেমন জমির মূল্য যদি বাড়ে তবে প্রথমেই আমাদের জানিতে হইবে এই মূল্যবৃদ্ধি প্রকৃত বা অপ্রকৃত। দীর্ঘকালীন সুদের হার কমিলে বা সকল কিছু দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িলে জমির দাম বাড়িতে পারে। ইহা অপ্রকৃত মূল্যবৃদ্ধি, কর আরোপযোগ্য নহে। কারণ মালিকের বিনিয়োগের বা টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া,

এই সকল করের অসুবিধা

যদি কোন অঞ্চলে এইরূপ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে পারে কিছুকাল পূর্ব হইতেই এইরূপ আশা করা হইতে থাকে, তবে উহাকে আর সম্পূর্ণভাবে আকস্মিক বলা চলে না।

মৃত্যু-কর (Death Duty)

আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্রের করকাঠামোতেই মৃত্যুকর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেছে। এই করের গুরুত্ব বেশির ভাগই সামাজিক ও অর্থনৈতিক; ইহা হইতে রাষ্ট্রের রেভিনিউ আদায় হইবে, তাহা নহে।

মৃত্যুকর কাহাকে বলে: ইহার দুইটি রূপ

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তাহার সম্পত্তি যখন উত্তরাধিকারীর নিকট হস্তান্তরিত হয় তখন রাষ্ট্রকে এই কর দেওয়ার কথা উঠে। এইরূপ মৃত্যুকর সাধারণত দুই ধরনের: সম্পত্তি-কর (estate duty), উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হওয়ার পূর্বে সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী উহা হইতে এই কর আদায় করা হয়। কর আদায় হইবার পরে ঐ সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হয়। (২) অপরটি হইল উত্তরাধিকারী কর (inheritance tax)। ইহাতে মূল সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হইলে প্রত্যেকে যে-অংশ পাইত তাহাকে করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রথমে এইরূপ মৃত্যুকর আরোপ করিয়াছে, পরে শিক্ষিত জনমতের নিকট ইহাকে গ্রহণীয় করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে ধনবিজ্ঞানীরা ও রাজনীতিক পণ্ডিতেরা ইহার স্বপক্ষে বহুপ্রকার যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন।

মৃত্যুকরের স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ

প্রথমতঃ, উপকারিতা তত্ত্ব (benefit theory) অনুযায়ী বলা হইয়াছে যে, সমাজে সকল অধিকার সৃষ্টি করিয়াছে রাষ্ট্র। আমার ইচ্ছামত সম্পত্তি অপরকে দান করার অধিকার সম্ভব হইয়াছে রাষ্ট্রের ফলে, এই উপকারের বিনিময়ে সম্পত্তির কিছু অংশ কর হিসাবে রাষ্ট্রের প্রাপ্য। দ্বিতীয়ত, ধনতান্ত্রিক সমাজে আয় ও সম্পদবৈষম্য দেখা দিবেই। এই সমাজ-ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হইলে আয় ও সম্পদ-বৈষম্যের পরিধি সংকুচিত করা প্রয়োজন। তাই সম্পত্তি-কর বা উত্তরাধিকার-কর আরোপিত হওয়া দরকার। তৃতীয়ত, অনেক সময় ইহার সমর্থনে অতীত-করের তত্ত্ব (back-tax theory) প্রয়োগ করা হয়। অতীতে ব্যক্তির জীবদ্দশায় কর ফাঁকি দিয়া এই সম্পত্তি গড়িয়া

উঠিয়াছে, তাই মৃত্যুকরের সাহায্যে একেবারে সেই সকল প্রাপ্য আদায় হইয়া হইয়া গেল—অনেকে এইরূপ বলিতে চাহেন। চতুর্থত, আজকাল ইহা সমর্থন করা হয় ব্যক্তির প্রদানক্ষমতার নীতি অনুসারে (ability to pay principle) বলা হয় যে, যদিও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি একেবারে আকস্মিক (windfall) নয়, তবুও ইহার ফলে হঠাৎ ব্যক্তির হাতে করপ্রদানক্ষমতার উদ্ভব হয়। এইরূপ বিশেষ-যোগ্যতার নীতি (principle of special ability) অনুযায়ী আমরা বলিতে পারি যে মৃত্যুকর সমর্থহীন। পঞ্চমত, করবহন-যোগ্যতার নীতি অনুযায়ী এই কর শুধু সমর্থনীয়ই নয়, ইহার ক্রমবৃদ্ধির হারও অবশ্য বাঞ্ছনীয়। সম্পত্তির পরিমাণ যত বেশি, করদানের ক্ষমতাও তত অধিক তাই ক্রমবর্ধনশীল হারে এই কর আরোপ করা সম্ভবপর। উত্তরাধিকারের মধ্যে আকস্মিকতার উপাদান যত বেশি, ক্রমবর্ধনশীলতার মাত্রাও তত বাড়ান চলে। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক যত দূরবর্তী, আকস্মিকতার মাত্রা তত বেশি, করহারও বেশি রাখা সম্ভব। প্রদানক্ষমতার নীতি অনুযায়ী, তাই, মৃত্যুকরকে দুই দিক দিয়া ক্রমবর্ধনশীল করিয়া তোলা চলে: সম্পত্তির আয়তনের দিক হইত, এবং, উত্তরাধিকারীর মৃত্যুব্যক্তির সহিত সম্পর্কের নিকটবর্তিতার দিক হইতে।

সম্পত্তি-কর ও উত্তরাধিকার-করের মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথম ধরনের করটি দ্বিতীয় ধরনের অপেক্ষা প্রয়োগের দিক হইতে অধিকতর সুবিধাজনক। প্রথম ধরনের করটিতে কেবল সম্পত্তির পরিমাণের দিকে তাকাইলেই চলে, কিন্তু উত্তরাধিকার-করটিতে আরও অনেক কিছু বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়। উত্তরাধিকার-করে ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা সম্পর্কে অধিকতর নজর রাখা যায়; সম্পত্তি-করে তাহা সম্ভব হয় না। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে একজন পাইলে কর হিসাবে যাহা দেওয়া উচিত আর পাঁচজন পাইলে কর হিসাবে যাহা দেওয়া উচিত—ইহাদের পরিমাণ সমান হইতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবে করভার বহন করে ব্যক্তি, সম্পত্তি নয়, তাই কেবল সম্পত্তির পরিমাণের দিকে তাকাইয়া উত্তরাধিকারীদের অংশের কথা বিচার না করিয়া কর আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে ইহাদের তুলনার সময়ে উত্তরাধিকার-করের বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলার আছে। যাহাতে কর কম দিতে হয় সেইজন্য মৃত ব্যক্তি এমনভাবে

সম্পত্তিকর ও উত্তরাধিকার করের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা

সম্পত্তির বণ্টন নির্দিষ্ট করিয়া যাইতে পারেন যাহাতে কাহারও খুব কম আবার কাহারও খুব বেশি প্রাপ্য হইল। করদানের পর সকলে সমান পাইবে—এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে বেশি দূরবর্তী সম্পর্কের উত্তরাধিকারীকে বেশি কর দিতে হইবে বলিয়া তাহাদেরই সম্পত্তির বেশি অংশ দিয়া নিকটবর্তীদের করভার কম বলিয়া কম সম্পত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন। সুতরাং উত্তরাধিকার-কর ব্যক্তির মনে সম্পত্তি-বণ্টনের স্বাভাবিক ধরন বদ্‌লাইয়া দিতে পারে।

আধুনিক কালে কেইন্‌সীয় ধনবিজ্ঞান এইরূপ মৃত্যুকরের পক্ষে আর এক ধরনের সমর্থন তুলিয়া ধরিয়াছে। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা আয়-বণ্টন চাহিতেন নীতিগত (ethical) কারণে; কিন্তু কেইন্‌স ও তাঁহার অনুগামীরা ইহা পছন্দ করেন নিছক বৈজ্ঞানিক কারণে; তাঁহাদের মতে, অর্থনৈতিক কারণে। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীদের মন ছিল দ্বিধা-বিভক্ত। দ্রুত শিল্পপ্রসার ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়োজনে প্রভূত সঞ্চয় দরকার, এবং তাহা কয়েকটি হাতে কেন্দ্রীভূত থাকা প্রয়োজন, তাই আয়-বৈষম্য থাকা চাই। ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের নীতিবোধ বা কল্যাণাকাংখা এই আয়-বৈষম্য সহ্য করিতে পারিত না। দ্বিখণ্ডিত-বিবেকের যন্ত্রণা তাঁহাদের সহ্য করিতে হইত। কিন্তু কেইন্‌সের সময়ে ধনতন্ত্রের প্রসার-গতি শ্লথ হইয়া আসিয়াছে, ইহার অচলাবস্থা দেখা দিয়াছে। সংকট ও জড়ত্বের কারণ হিসাবে কেইনস্ দেখাইলেন ভোগব্যয়ে ঘাটতি, যাহা আয়-বৈষম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রাণশক্তি জাগাইতে হইলে ভোগব্যয় বাড়ান দরকার, এবং ইহারই জন্য চাই স্বল্প প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা সম্পন্ন ধনীর নিকট হইতে টাকা সরাইয়া আনিয়া অধিক প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাসম্পন্ন দরিদ্রের হাতে উহা তুলিয়া দেওয়া। মৃত্যুকরের সাহায্যে ইহা সম্ভব, তাই ইহাকে দেশের আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াইবার উপযোগী কর-নীতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

কেইন্‌সীয় দৃষ্টিতে এই করকে দেখা

মৃত্যুকরের করপাত (incidence of death duty) কাহার উপর সেই সম্পর্কে বহু বিতর্ক দেখা দিয়াছে। একদল বলেন যে ইহা মৃত ব্যক্তির উপর, অপর দল বলেন যে ইহা উত্তরাধিকারীদের উপর, এবং তৃতীয় দল বলেন যে, ইহা উপরের দুই শ্রেণীর কাহারও উপর নয়, উহা সেই সম্পত্তির উপর। প্রথম দলের অভিমতে মৃতব্যক্তি ঐ সম্পত্তি বণ্টনের অধিকারী, তাই কর-পাত তাঁহারই

উপর। যদি তিনি এমন কোন বীমা ব্যবস্থা বা ভাণ্ডার তৈয়ার করিয়া যান যাহা হইতে কর দেওয়া হইল, তবে প্রকৃতপক্ষে কর-ভার তাহারই উপর পড়িল। কারণ এই বীমা বা ভাণ্ডার তৈয়ার করিতে তাঁহাকে বর্তমানের বিশ্রাম ও ভোগ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। মৃত্যুকরকে যদি কেহ অপেক্ষমান আয়-কর বলিয়া মনে করে (as deferred income tax) তবে উহার করপাত মৃতব্যক্তির উপরই মনে করা করা চলে। অপরদিকে, দ্বিতীয় মতের পক্ষেও বলার কম নাই। করপাত উত্তরাধিকারীদের উপর কারণ কর তাঁহারাই দেন, মৃতব্যক্তির নিকট হইতে কর আদায় করা চলে না। উত্তরাধিকারীদের নিজস্ব অংশ, তাহাদের আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থা এবং মৃতব্যক্তির সহিত সম্পর্কের নৈকট্য বা দূরবর্তিতা—এই সকল বিষয় বিচার করিয়া কর আরোপ করা হয়, সুতরাং আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে করপাত উত্তরাধিকারীদের উপর। এই দুই মতের মধ্যে কাহাকেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না, তাই এই বিতর্কের অবসান এখনও হয় নাই। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে করপাত নিশ্চয় উত্তরাধিকারীদেরই উপর, কারণ মৃতব্যক্তির পকেট হইতে টাকা বাহির করা চলে না। কিন্তু যদি মৃত্যুর পুর্বে সেই ব্যক্তি করের কথা চিন্তা করিয়া উহা বহন করার উদ্দেশ্যে সুবৃহৎ সম্পত্তি গড়িয়া তুলিতে থাকেন যাহাতে কর দিবার পরেও উত্তরাধিকারীরা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিবে, অথবা তিনি যদি করদানের উদ্দেশ্যে কোনরূপ বীমার পলিসি বা ভাণ্ডার নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া যান, তবে কি মৃতব্যক্তির উপরই করপাত বর্তাইল না? আবার অপরপক্ষে মৃত-ব্যক্তি যদি করের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া সম্পত্তি গড়িয়া তোলে, তবে উহার করপাত স্পষ্টতই উত্তরাধিকারীর উপর। করপাত কে বহন করে ইহা তাই মৃতব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ইচ্ছা বহু বিচিত্র রূপ লয় বলিয়া এই সম্পর্কে কোনরূপ সাধারণ সুত্র বা নিয়ম গঠন করা চলে না।

মৃত্যুকরের করপাত : তিনটি মত

করপাত মৃত ব্যক্তির উপর হইতে পারে, জীবিত উত্তরাধিকারীদের উপর হইতে পারে; আংশিকভাবে উহার কিছুটা উভয়েই বহন করিতে পারে—এই অনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এড়াইবার জন্য তৃতীয় একদল বলিতে চাহে যে মৃত্যুকরের করপাত জীবিত কি মৃত কাহারও উপর নয়, উহা সম্পত্তির উপর। কিন্তু এইরূপ উপসংহার গ্রহণ করা চলে না। তাহার কারণ হইল যে,

কেবলমাত্র সম্পত্তির পরিমাণের উপরই করের হার নির্ভর করে না, আর তাহা ছাড়া কর দেয় ব্যক্তিরা, কোন বিষয়-সম্পত্তি নিজ হইতে কর দিতে আগাইয়া আসে না।

মৃত্যুকর ও আয়-করের ফলাফল তুলনা করা দরকার (Comparison of the effects of Death duties and Income-tax)। আমরা জানি, মৃত্যুকরকে অপেক্ষমান আয়-কর (deferred income tax) বলিয়া মনে করা চলে। আয়করের ক্ষেত্রে, প্রতি বৎসর আয়ের উপর কর আরোপিত হয়, কিন্তু মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে সেই আয়কর প্রতি বৎসর না তুলিয়া অপেক্ষা করা হয়, মৃত্যুর সময়ে একসঙ্গে পূর্বের সকল কর তুলিয়া লওয়া চলে। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতিতে সমান পরিমাণ রেভিনিউ তোলা সম্ভবপর। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য হইল এইটুকু যে আয়করের ক্ষেত্রে করের ভিত্তি (tax base) হইল তাহার বাৎসরিক আয়, আর মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে ইহা হইল তাহার সঞ্চিত মূলধন। কিন্তু এই তুলনা আর বেশিদূর টানা চলে না, কারণ কোন একব্যক্তি সারাজীবন আয় করিয়া কোনরূপ সঞ্চয় না করিয়া সকল আয় ব্যয় করিতে পারে। কেবলমাত্র মৃত্যুকর থাকিলে এই ব্যক্তির নিকট হইতে কোনরূপ কর আদায় করা যায় না। সুতরাং ইহাদের তুলনা করিতে হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, বিনিয়োগ-আয়ের উপর কর (a tax on investment income) এবং মৃত্যুকর— উভয়ের তুলনামূলক ফলাফল কি। এই দুই প্রকার করের ফলাফল সাধারণত দুইটি অংশে আলোচনা করা হয়: বাস্তব ফলাফল (physical effects) ও মনস্তাত্ত্বিক ফলাফল (psychological effects)।

মৃত্যুকর ও আয়করের তুলনা

বাস্তব ফলাফল বিচার করিলে দেখা যাইবে বিনিয়োগ-আয়ের উপর কর অপেক্ষা মৃত্যুকরের প্রভাব ব্যক্তির সঞ্চয়ের পক্ষে অধিকতর হানিকর। বাৎসরিক আয় হইতে আয়কর দিতে হয় তাই ব্যক্তি তৎকালীন ভোগব্যয় কমাইয়া সেই কর দিয়া দেয়। কিন্তু মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে তাহা হয় না, ব্যক্তি তাহার ভোগ কমায় না। তাই ব্যক্তির মূলধন কাটিয়া মৃত্যুকর দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ আয়করের তুলনায় মৃত্যুকরের আওতায় ব্যক্তির সঞ্চয়ের ইচ্ছা তুলনামূলকভাবে কম।

বাস্তব ফলাফল: আয়কর উন্নততর

ব্যক্তি যদি মৃত্যুকর দেওয়ার জন্য বীমাব্যবস্থা করিয়া রাখে এবং প্রিমিয়াম দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে ভোগ কমাইয়া সঞ্চয় করিতে থাকে, তাহা

হইলেও আয়করের তুলনায় ইহা ব্যক্তিগত মূলধন-সঞ্চয়ের অধিকতর প্রতিকূল। ইংলণ্ডের কলউইন্ কমিটিও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন।

কিন্তু সঞ্চয় ও মূলধন-গঠনের মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, মৃত্যুকর তুলনামূলকভাবে উন্নততর। আয় বাড়াইলে কর দিতে হইবে, তাই নির্দিষ্ট কোন এক সীমার পরে ব্যক্তি আর আয় বাড়াইতে না-ও ইচ্ছুক হইতে পারে। এইরূপে আয়কর কাজের ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমাইয়া দেয়। কিন্তু মৃত্যুকরের এইরূপ কোন বিরূপ প্রভাব নাই, কারণ ব্যক্তি তাহার জীবদ্দশায় কোনরূপ কর দিতেছে না। বংশধরেরা সম্পত্তি কম পাইবে এই চিন্তায় অবশ্য কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কিছুটা কম হইবে, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই নিজের জীবদ্দশায় ধনী বলিয়া পরিচিত হওয়ার অহংবোধ তৃপ্ত করিতে চায়। মৃত্যুকর এই ইচ্ছাকে কোনরূপ বাধা দেয় না। পুত্রকলত্রের নিরাপত্তা-ই যদি প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয় তাহা হইলেও মৃত্যুকর উন্নততর। কারণ লোকে ইহাদের নিরাপত্তা বাড়াইবার জন্য কর প্রদানের পরেও সম্পত্তির পরিমাণ বেশি রাখার উদ্দেশ্যে বর্তমানে কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দিতে পারে। সুতরাং সঞ্চয় ও কর্মোদ্যমের ইচ্ছার উপর প্রভাব তুলনা করিলে মৃত্যুকর অপেক্ষাকৃত ভাল।

মনস্তাত্ত্বিক ফলাফল : মৃত্যুকর উন্নততর

ব্যয়কর (The Expenditure Tax) :

আধুনিককালে অধ্যাপক নিকোলাস্ ক্যাল্ডর (Nicholas Kaldor) করের ভিত্তি (base) হিসাবে ব্যক্তির আয়ের পরিবর্তে তাহার ব্যয়কে গ্রহণ করার কথা বলিয়াছেন। আয় অথবা ব্যয়—কিসের ভিত্তিতে ব্যক্তির নিকট হইতে কর তোলা হইবে, তাহা লইয়া বহুশতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীতে বাদানুবাদ চলিয়াছে। হব্সের লেখা হইতে সুরু করিয়া জন ষ্টুয়ার্ট মিল, মার্শাল পিগু, আরভিং ফিসার ও আরও অনেকে করের ভিত্তি হিসাবে ব্যয়কে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

ব্যয়-করের পুনরুজ্জীবন

বিশেষ কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হইলে উহাকে পণ্যকর বা বিক্রয়কর বা আংশিক ব্যয়কর বা বিশেষ ব্যয়কর (Partial outlay tax) বলে। কিন্তু সাধারণ ব্যয়কর (General Expenditure tax) ইহা হইতে পৃথক। সাধারণ ব্যয়কর আরোপিত হয় ব্যক্তির মোট ভোগব্যয়ের উপর ; ইহা প্রত্যক্ষ করও বটে। আয়-করের মতই নির্দিষ্ট কিছু নিষ্কৃতির সীমা

(exemption limit) বাদ দিয়া ইহা ক্রমবর্ধমান হারে আরোপ করা চলে।

বিক্রয়-কর ও আয়-কর হইতে ইহার পার্থক্য কি

তবে করের ভিত্তি হিসাবে আয় ও ব্যয় একটু পৃথক বটে। লোকের মোট আয়ের এক অংশ হইল ব্যয়, অপর অংশ সঞ্চয় বা নীট সম্পদের বৃদ্ধি। সুতরাং কর-ভিত্তি হিসাবে আয়ের তুলনায় ব্যয় সংকীর্ণতর। আয়কে যদি সম্পদের নিয়মিত স্রোত হিসাবে ধরা হয়, তবে এই সম্পদের এক অংশ যাহা ভোগের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইতেছে, শুধু সেই অংশের উপরই কর আরোপিত হইবে। যে সকল ব্যক্তি আয় অপেক্ষা বেশি ব্যয় করে, তাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর অপেক্ষা ব্যয়করে কর ভিত্তি অধিকতর প্রসারিত।

ব্যক্তির বাৎসরিক মোট ব্যয় হিসাব করা যাইবে কি উপায়ে? ক্যালডরের মতে ইহার উপায় হইল : প্রথমে, বৎসরের সুরুতে তাহার নগদ টাকা ও ব্যাঙ্ক-আমানতের পরিমাণ হিসাব করিতে হইবে; উহার সহিত বৎসরের শেষে সেই বৎসরে তাহার সকল আয় ও উপহার (gifts) যোগ করিতে হইবে। এই যোগ-ফল হইতে বাদ দিতে হয় বৎসরের শেষে তাহার নগদ টাকা ও ব্যাঙ্ক-আমানত এবং এই বৎসরের সকল ঋণদান ও বিনিয়োগ। এইরূপে ব্যক্তির বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ জানিতে পারা যায়।

আয়করের তুলনায় ব্যয়কর অনেকদিক হইতেই উন্নততর, অধ্যাপক ক্যাল্ডর ইহা মনে করেন। প্রথমত, ব্যক্তির করবহনযোগ্যতার সঠিক পরিমাপ তাহার আয় হইতে পাওয়া যায় না, তাহার ব্যয়ই ইহার উপযুক্ত মানদণ্ড।

১। করবহনযোগ্যতার দিক হইতে বিচার করিলে

আয়ের মধ্যে অনেক বিষয় ধরা হয় না, যেমন হঠাৎ কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা হইতে আয়, অনিয়মিতভাবে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় এইরূপ আয় অথবা মূলধনী লাভ প্রভৃতি। এই সকল ধরনের টাকা ব্যক্তির করবহন-যোগ্যতাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথচ আয়ের মধ্যে এই ধরনের বিষয়গুলি ধরা হয় না বলিয়া ইহাদের উপর হইতে কর আদায় করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ব্যয়করের এই ত্রুটি নাই। নিয়মিত বা অনিয়মিত, হঠাৎ লাভ বা মূলধনী লাভ, সম্পত্তি বা পরিশ্রম, যে কোন সূত্র হইতেই ব্যক্তির হাতে টাকা আসুক না কেন, ব্যয় হইলেই উহার উপর কর আরোপিত হইবে।

দ্বিতীয়ত, ক্যাল্ডর এই করের স্বপক্ষে ন্যায্যতার কথা তুলিয়াছেন।

এই সূত্রে তিনি হব্‌সের বক্তব্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, লোকে জাতীয় সম্পদের সাধারণ-ভাণ্ডারে (Common pool) কি পরিমাণ যোগ করিতে পারে তাহা অপেক্ষা এই ভাণ্ডার হইতে সে নিজে কতটা সম্পদ গ্রহণ করিতেছে তাহারই ভিত্তিতে কর দেওয়া উচিত। ব্যক্তির বর্তমান ও প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে তাহার ভোগব্যয়ের উপর। বর্তমানে সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতে ব্যয় করিলে সর্বশেষস্তরে ভোগের সময় এই করের মাধ্যমে তাহা ধরা পড়িবে। পুরাণো এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সঞ্চয় হইতে ব্যয় করিলে, ন্যায্যতার দিক হইতে বিচার করিয়া বলা চলে যে, সেই ব্যক্তির কিছু কর রাষ্ট্রকে নিশ্চয় দেওয়া উচিৎ। ন্যায়ের দিকে তাকাইয়া ব্যয়করের স্বপক্ষে আরও অনেক কথা বলা চলে। বিভিন্ন ব্যক্তির আয় সমান থাকিলেও তাহাদের দায়িত্ব এবং নিজস্ব স্বভাব পৃথক থাকায় ব্যয়ের পরিমাণ পৃথক হইতে পারে। সুতরাং ব্যয়ের পরিমাণই ন্যায়ত কর-আরোপনের ভিত্তি হওয়া উচিৎ। তাহা ছাড়া আয়করের বিরুদ্ধে মার্শাল-পিগু-ফিসারের সমালোচনাও মনে রাখা দরকার। তাঁহাদের মতে আয়করের ফলে সঞ্চয়ের উপর ডবল কর আরোপন (Double taxation) ঘটে। ব্যক্তির যে আয় সঞ্চিত হয়, তাহার উপর সে প্রথমে একবার কর দেয়, তাহার পরে সেই সঞ্চয় হইতে যতবার আয় হয় প্রতিবার ব্যক্তিকে কর দিতে হয়। ব্যয়করে এইরূপ ঘটে না, কারণ যে অংশ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা করের আঁওতার মধ্যে পড়ে না। তৃতীয়ত, ক্যালডরের মতে আয়করের ফলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা হ্রাস পায়।*

২। ন্যায্যতার দিক হইতে বিচার করিলে

ক্যাল্‌ডর দেখাইয়াছেন যে, ইংলণ্ডের উচ্চ আয়শ্রেণীর লোকেরা আরও সঞ্চয় করা ছাড়িয়া দিয়াছে, কারণ আয়-করের প্রান্তিক হার (marginal income-tax rates) এত বেশি যে বর্ধিত সঞ্চয় হইতে আয় বাড়িলে ব্যক্তিকে উহাপেক্ষা অনেক বেশি টাকা কর হিসাবে দিয়া দিতে হয়। ব্যয়কর আরোপ

৩। সঞ্চয়ের উপর ইহার প্রভাব

* .....'income taxes, by reducing the net income from savings, distort the choice of the individual between present and future consumption, by making the latter less attractive than it would otherwise be. Persons are prevented from making their choices in terms of the relative costs to society of providing goods at various times, as reflected in the interest rate. In simple terms, persons are given added incentive to consume now." Due, *Government Finance*, P 275.

করিলে, এই অবস্থা দূর হইবে। নানাবিধ ব্যয়ের আতিশয্য লোপ পাইবে, সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে। অনুন্নত দেশসমূহে, তাই, ব্যয়-করের গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ এই সকল দেশে উন্নত দেশগুলির জীবনযাত্রার মান "অনুকরণ করার" ইচ্ছা খুবই বেশি (Demonstration effect)। মূলধন-গঠনে সাহায্য করার কাজে এই করকে তাই প্রয়োগ করা চলে।

চতুর্থত, বিনিয়োগের উপরও আয়করের তুলনায় ব্যয়করের প্রভাব ভাল, ক্যাল্ডর ইহা মনে করেন। আয়-করের ফলে কোম্পানী ও ধনীব্যক্তিদের হাত হইতে বিনিয়োগযোগ্য টাকার পরিমাণই কেবল কমিয়া যায় না, বিনিয়োগের ইচ্ছাও হ্রাস পায়, কারণ বর্ধিত আয় হইতে বৃহৎ অংশ আয়কর হিসাবে সরকারকে দিয়া দিতে হইবে। তাই, ক্যালডরের মতে, আয়করের ফলে ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগে মূলধন নিযুক্ত হইতে চায় না। ব্যয়করের সেইরূপ কোন অসুবিধা নাই, কারণ আয় ও সঞ্চয় বাড়াইলে উহার উপর কর আরোপিত হয় না, একমাত্র ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িলেই বেশি কর দিতে হইবে।

৪। বিনিয়োগের উপর ইহার প্রভাব
৫। কর্মোদ্যমের উপর ইহার প্রভাব

পঞ্চমত, আয়করের তুলনায় কর্মোদ্যমের উপর ব্যয়করের প্রভাব ভাল ইহাও দেখান চলে, ইহার কারণ হইল সঞ্চয় করিয়া ব্যয়কর এড়ান চলে, কিন্তু আয়কর এড়াইবার কোন পথ নাই।

ব্যয়করের বিরুদ্ধেও যুক্তির কোন অভাব নাই। প্রথমত, ন্যায়ের দিক হইতে দেখিলে ইহার প্রধান ত্রুটি হইল পক্ষপাতদুষ্টতা (discrimination)। যাহারা অধিক ব্যয় করে বা ব্যয় করিতে বাধ্য হয় তাহাদেরই উপর কর আদায় হয়; কিন্তু যাহারা ব্যয় না করিয়া টাকা মজুত করে, তাহারা করের হাত হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইতে পারে। ইহাতে সঞ্চয়শীল ধনিকদের বা কৃপণ লোকদের অধিকতর সুবিধা; বড় পরিবার বা বিভিন্ন কারণে ব্যয় বেশি হয় এইরূপ পরিবারের অসুবিধা। তাই ন্যায়ের দিক হইতে ইহা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। অবশ্য এই ত্রুটি দূর করার জন্য উচ্চহারে মৃত্যুকর বা সম্পদকর বসান চলে; কিন্তু উহাতে এখনই সরকারের আয়বৃদ্ধি না পাইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতির সময়ে এইরূপ ব্যয়কর মুদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধের জন্য ভালই কাজ করিতে পারে; কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এই

ইহা ১। পক্ষপাতদুষ্ট
২। সংকোচনশীল
৩। আদায়গত অসুবিধা

করের প্রভাব সংকোচনশীল (deflationary)। যদি দেশে কিছুটা বেকারি থাকে, তবে ব্যয়করের ব্যবহার উহাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবে, এবং অনেক বেশি ঘাট্‌তি-ব্যয় না করিলে এই অবনতি দূর হইবে না। এই অবস্থায় কিন্তু আয়কর লোকের ভোগব্যয়, বিনিয়োগব্যয় বা কর্মোত্তম কিছুই বিশেষ কমায় না। শুধু তাহাই নহে। আয়কর অনেকটা অর্থ নৈতিক অবস্থা বা কাঠামোর অঙ্গ-লগ্ন ও নমনীয় ধরনের (built-in flexibility) কারণ, চক্রকালীন অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি উহা হইতে আদায় কমে, আবার সমৃদ্ধির সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই উহা হইতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, ব্যয়করের অন্যতম একটি অসুবিধা হইল ইহাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সংগঠন গড়িয়া তোলা। আদায়-বিষয়ক অসুবিধা ইহার একটি অন্যতম প্রধান ত্রুটি।

ব্যয়-করের আরোপ সম্পর্কে সাধারণভাবে দুইটি পদ্ধতি গৃহীত হইতে পারে। প্রথমত, সারা বৎসরে ব্যক্তির ব্যয়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে কর-আরোপ করা চলিতে পারে। ব্যক্তি যে আয়ব্যয়ের হিসাব (returns filled in by individuals) দেয় তাহার ভিত্তিতেই কর আরোপিত হইতে পারে। ইহাকেই আমেরিকায় বলে খরচা-কর (spendings tax) ; আর ইংলণ্ডে ইহার নাম ব্যয়কর (expenditure tax)। দ্বিতীয়ত, বিকল্প পদ্ধতি হইল দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করিয়া বিক্রেতাদের নিকট হইতে উহা আদায় করা। ইহাকে পণ্যকর (commodity taxes) বলে। বিক্রেতারা ক্রেতাদের নিকট এই পণ্যকরগুলির ভার অপসারণ করিবে, ফলে প্রকৃতপক্ষে দেশের ভোগব্যয়ের উপর হইতেই এই কর আদায় হইয়া যাইবে। এই দুই পদ্ধতির মধ্যে কোনটি ভাল বা কোন্‌টি মন্দ তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, খরচা-কর বা ব্যয়-কর প্রত্যক্ষভাবে আরোপ করা চলে, তাই ইহার ভার মোটামুটি ইচ্ছামত কাহারও উপর কম বা বেশি হারে চাপান যায়। ইহার হার ক্রমবর্ধমান করা চলে, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার অনুযায়ী বিভিন্ন আয়স্তরে বা ব্যয়স্তরে হার নির্ধারণ করা যায়, মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে ইহার প্রবল প্রভাব। কিন্তু সাধারণ পণ্যকরগুলির তুলনায় ইহাতে আদায়ের অসুবিধা। সাধারণ পণ্যকরগুলি আদায়ের দিক হইতে সুবিধাজনক হইলেও ইহার ভার

দুই ধরনের ব্যয়কর পদ্ধতির ভালমন্দ

এলোমেলো ধরনের ও প্রগতিবিরোধী, ইহাদের হার ক্রমবর্ধমান করিয়া তোলা চলে না, মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী ক্ষমতাও ইহাদের কম।

এই কারণে আজকাল সাধারণ ব্যয়করের বদলে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উপর বিক্রয় কর আরোপ করা হয়, ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যয়কে করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য না করিয়া উহার বিশেষ বা নির্দিষ্ট একটি অংশের উপর কর আরোপ করা হয়। ইহাকে তাই অনেকে আংশিক-ব্যয় কর বা বিনির্দিষ্ট ব্যয়-কর (Partial outlay tax) বলেন।

আংশিক ব্যয় কর

বিক্রয় কর (Sales tax) ঃ

বর্তমানকালে ব্যয়ের ভিত্তিতে যতপ্রকার কর আরোপিত হইতেছে তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান হইল বিক্রয় কর।* আপাতদৃষ্টিতে পণ্যসামগ্রীর বিক্রয়ের উপর এই কর আরোপিত হইলেও, কার্যত বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর উপর ব্যক্তির ব্যয় হইতেই এই কর আদায় হয়। সামগ্রিক বিক্রয়কর (general sales tax) সকল প্রকার ব্যয়ের উপর হইতেই কর আদায় করে। কিন্তু সাধারণত এইরূপ সামগ্রিক বিক্রয়কর কোন দেশে দেখা যায় না, নিত্যব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতিকে বিক্রয়করের পরিধির বাহিরে রাখা হয়। এই করের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন বলিয়া দাবি করা চলে, কারণ কৌটি-ল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'ও ইহার উল্লেখ আছে।

বিক্রয় করের প্রকৃতি

বিক্রয়করের স্বপক্ষে অনেক প্রকার যুক্তি দেখান হয়। প্রথমত, বলা হয় যে, বিক্রয়-কর হইতে প্রচুর পরিমাণে রেভিনিউ আদায় করা সম্ভব। কিন্তু শুধু তাহাই নহে। আয়করের তুলনায় বিক্রয়করের রেভিনিউ সাধারণত অধিকতর স্থিতিশীল ধরনের (Revenue from sales tax more stable than that of income tax)। বিক্রয়করের ভিত্তি হইল ভোগব্যয়, আর আয়করের ভিত্তি হইল আয়। কেইন্‌সীয় মতে আমরা জানি যে, বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন স্তরে মোট আয় অপেক্ষা মোট ভোগব্যয়ে উঠানামা কম হয়। তাই আয়কর

* আবগারী শুল্ক, কাষ্টমস্ শুল্ক প্রভৃতির ন্যায় বিক্রয়করও একপ্রকার আংশিক ব্যয়কর (Partial outlay tax)। বিক্রয়করের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ এবং আলোচনা সকলই আংশিক ব্যয়কর সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তাই পৃথকভাবে আর আংশিক ব্যয়কর আলোচিত হইল না।

হইতে পাওয়া রেভিনিউর তুলনায় বিক্রয়কর হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ মোটামুটি স্থির, ইহাতে উঠানামার পরিধি কম। আয়করের তুলনায় ইহার আপেক্ষিক স্থিরতার আর একটি কারণ আছে। আয়কর ক্রমবর্ধনশীল হারে আরোপিত, আর বিক্রয়কর সমানুপাতিক হারে। সমাজে সংকটকালে এই ক্রমবর্ধনশীলতার দরুণ আয়কর হইতে রেভিনিউ বিশেষভাবে কমিয়া যায়, কিন্তু সমানুপাতিক বিক্রয়কর হইতে আদায় ততটা হ্রাস পায় না। তাই ইহা হইতে রেভিনিউর স্থিরতা আয়করের তুলনায় বেশি।

ইহাতে রেভিনিউ বেশি ও স্থির

দ্বিতীয়ত, শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে দেখিতে গেলে ইহার সুবিধা আয়করের তুলনায় অনেক বেশি। যেমন, রাজনৈতিক বা বিভিন্ন কারণে অনেক রাষ্ট্র আয়করের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করার নীতি পছন্দ করে না, কারণ সঞ্চয় ও কর্মোদ্যমের উপর উহার সংকোচক-প্রভাব প্রবল। এই অবস্থায় ব্যক্তির ব্যয়কে করের ভিত্তি হিসাবে পাইলে খুবই ভাল হয়। যদি আমরা ধরিয়া লই যে, করভারের সম্পূর্ণ অংশ সম্মুখে অপসারিত হইতেছে, অর্থাৎ সবটাই ক্রেতার নিকট হইতে আদায় হইতেছে, তবে আমরা জানি যে, প্রত্যক্ষ কর হিসাবে আয়কর যাহা করে তাহার তুলনায় ব্যয় কর বা বিক্রয়কর পরোক্ষভাবে একই কাজ করে।

আয়করের ত্রুটিগুলি এখানে নাই, অথচ আদায়ের সুবিধা

তৃতীয়ত, অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে কর শাসন ব্যবস্থা ভাল করিয়া গড়িয়া উঠে নাই, করপ্রদান বিষয়ে নীতিবোধের মানও বিশেষ উন্নত নয়। এই সকল দেশে বিক্রয়-করের গুরুত্ব বেশি। এই করের আদায়গত সুবিধা বেশি আবার খরচও কম। এরূপ কথা প্রচলিত আছে যে, বিক্রয়-কর নিজেই নিজেকে সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। সমাজের বিক্রেতারা বিক্ষিপ্ত ক্রেতাদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেয় বলিয়া এইরূপ বলা হইয়া থাকে। আয়-কর হইতে রাষ্ট্রের কর-আদায়ে যতটা কালক্ষেপ হয়, বিক্রয় করে তাহা হয় না, কর আরোপ করার পর হইতেই সরকারী তহবিলে টাকা আসিতে থাকে। এই সকল দেশে উচ্চ আয়করের নিরুৎসাহী প্রভাব (dis-incentive effect) খুবই তীব্র, তাই অনেকে কর-ভিত্তি হিসাবে ব্যয়কেই গ্রহণ করার পক্ষপাতী। আবগারী শুল্ক একান্তভাবে পক্ষপাতমূলক

আদায়ের খরচ ও হাঙ্গামা কম লুকানো আয়ের উপর কর চাপান যায়

(discriminatory), কিন্তু বিক্রয়-করের এই দোষ নাই। আইনী বা বে-আইনী উপায়ে যাহারা পূর্বে আয়-কর ফাঁকি দিয়াছে বা এখনও দিতেছে, এবং দ্রব্য-সামগ্রীর ভোগে সেই টাকা নিয়োগ করিতেছে তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করার প্রকৃষ্ট পন্থা হইল বিক্রয়-কর আরোপ করা।

গরীবদের উপর করভার বাড়াইতে হইলে

চতুর্থত, যাঁহারা ব্যয়ের অধিক অংশ নিম্ন আয় গোষ্ঠীর নিকট হইতে তুলিতে চান তাঁহাদের মতে বিক্রয়-কর আরোপ করাই যুক্তিযুক্ত। আয়করের তুলনায় বিক্রয়-কর নিম্ন আয়-গোষ্ঠীর নিকট অনেক সহজে পৌছিতে পারে। দেশে দ্রুত মূলধন-গঠনের জন্য তাই অনেকে বিক্রয়-করের স্বপক্ষে কথা বলেন।

বাণিজ্যচক্র বিরোধী স্থিরিত্ব আনয়নকারী শক্তি

সর্বোপরি, অধ্যাপক হান্‌সেন্ (Hansen) বলিতে চান যে, আয়স্তর ও কর্মসংস্থানে তীব্র উঠানামা বন্ধ করার কাজে ইহাকে নিয়োগ করা সম্ভবপর। অর্থাৎ বিক্রয়-করের বাণিজ্যচক্রবিরোধী ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া তিনি মনে করেন। সমৃদ্ধি-যুগের শেষপ্রান্তে উচ্চ বিক্রয়-কর ভোগের পরিমাণ কমাইয়া দেয়, মুদ্রাস্ফীতির গতিরোধে সাহায্য করে। ঠিক এইরূপ, সংকটকালে, বিক্রয়করের হ্রাস এবং সেই সঙ্গে পূর্বের আদায় করা টাকার ব্যয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে। এই কাজ ছাড়াও বিক্রয়করের অন্যান্য ভূমিকা কম নাই। যেমন, যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার উদ্দেশ্যে দেশের ভোগব্যয় কমান প্রয়োজন, তখন এই কর আরোপ করা চলে। করের দরুণ ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়িবে, তাই ভোগব্যয় হ্রাস পাইতে থাকিবে।

অর্থ নৈতিক প্রভাব বাঞ্ছনীয় নয়

বিক্রয়করের বিরুদ্ধে বহু প্রকার আলোচনা হইয়াছে। প্রথমত, ইহার অর্থনৈতিক প্রভাব বাঞ্ছনীয় নয় অনেকে এইরূপ বলেন। একটি টাকা আয়কর আদায় করিলে সমাজের মোট ব্যয়ের উপর উহার ফল ততটা নয়, কিন্তু একটি টাকা ব্যয়কর বা বিক্রয়-কর আদায় করিলে সামগ্রিক-ব্যয় বেশি পরিমাণে কমে। দেশের মোট ব্যয়ের উপর এইরূপ করের প্রভাব ভাল নয় বলিয়া তাই অনেকে মনে করেন। দেশ যখন অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে আছে বা বাণিজ্যচক্রের সংকটের যুগে বিক্রয়করের ফলে লোকে ব্যয় কমাইয়া সঞ্চয়

বাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়, ফলে মোট ভোগব্যয় সংকুচিত হয় এবং দেশের সংকট গভীরতর হইয়া উঠে।

দ্বিতীয়ত, বিক্রয় করের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হইল ইহা ন্যায়নীতির বিরোধী। বিক্রয়কর আরোপিত হয় সমানুপাতিক হারে, তাই নিম্নে আয়-গোষ্ঠীর উপর করভার তুলনামূলকভাবে বেশি। উপরন্তু, উচ্চ আয়-গোষ্ঠীতে আয়ের অধিক অংশ সঞ্চিত হয়, তাই করভারের সামগ্রিক বণ্টন অধোগতিমূলক বা ক্রমপতনশীল (regressive)। নিম্ন আয়-গোষ্ঠীর লোকের তুলনায় উচ্চ আয়গোষ্ঠীর লোকেরা সাধারণত তাহাদের আয়ের কম অংশ ব্যয় করে। শুধু তাহাই নহে। উচ্চ আয়-গোষ্ঠীর লোকের ব্যয়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল ব্যক্তিগত সেবা-মূলক কাজকর্ম। ইহাদের উপর কর আরোপিত নাই, তাই এই করের অধোগতিত্ব (regressiveness) আরও বেশি।

ন্যায়নীতির বিরোধী

করের অধোগতিত্ব ভাল কি মন্দ তাহা আজকাল আর আলোচিত হয় না, কারণ করভার বণ্টন সম্পর্কে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির মত হইল ইহা ভাল নয়। অপরপক্ষে সমগ্র কর-কাঠামোর প্রকৃতি ক্রমবর্ধনশীল হইলে উহার মধ্যে কোন বিশেষ একটি কর অধোগতিমূলক হইতে পারে। তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এই করের এই ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে সাধারণত খাদ্য বস্ত্র ও নিম্ন আয়-শ্রেণীর ব্যবহার্য দ্রব্যাদি করের আওতা হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

তৃতীয়ত, বিক্রয়করের কর ভারের বণ্টন সম্পর্কে আরও অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। যেমন বলা হইয়াছে যে, এই কর পক্ষপাতদুষ্ট। আদায়গত অসুবিধার জন্য কতকগুলি দ্রব্যের উপর কর আরোপ করা চলে না, যেমন ব্যক্তিগত সেবাকার্য, বৈদেশিক ভ্রমণ, সুসজ্জিত দামী বাড়ি প্রভৃতি। ইহার ফলে এই সকল দ্রব্য যাহারা বেশি ব্যবহার করেন, অন্যের তুলনায় তাহারা এই কর বেশি পরিমাণে এড়াইয়া চলিতে পারেন। সমান আয়বিশিষ্ট পরিবারগুলির মধ্যে লোক বেশি থাকায় বড় পরিবারকে বেশি কর দিতে হয়, আর লোক কম থাকায় ছোট পরিবার করভার কম বহন করেন। অবশ্য খাদ্য ও বস্ত্রের উপর কর না থাকিলে বড় পরিবারের বিরুদ্ধে এই পক্ষপাত অনেকটা কমিয়া যায়।

ইহা খুবই পক্ষপাত দুষ্ট

উপসংহারে বলা চলে যে, এই সকল বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও বিক্রয়কর

আরোপিত হইবেই কারণ ইহার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আছে যাহার নিকট সকল যুক্তিই ম্লান হইয়া যায়। ইহা হইল, এই করের উৎপাদনক্ষমতা খুবই বেশি। আধুনিক কালের রাষ্ট্রগুলি বেকারি ও অসন্তোষ দূর করিয়া কোন মতে এই ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। তাই বিভিন্ন দিকে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার জন্ম রাষ্ট্রের হাতে বেশি টাকা থাকা দরকার, তাই বিক্রয়করের গুরুত্ব এত বেশি। বণ্টনের উপর প্রভাব খারাপ থাকা সত্ত্বেও তাই এই করের প্রয়োগ একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। তবে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ইহার এই ত্রুটি কিছুটা দূর হইতে পারে। যেমন, বহু বিন্দু কর (Multi-point tax) অপেক্ষা এক-বিন্দু কর (Single-point tax) ভাল। যদি কোন দ্রব্য প্রতি-বার হাত-বদলের সময় বিক্রয়কর দিতে হয়, তবে সর্বশেষ স্তরের ক্রেতাকে বেশি করভার বহন করিতে হয়। কিন্তু একবার একটি স্তরে, খুচরা বিক্রয়ের উপর যদি করটি আরোপিত থাকে, তবে দামের সঙ্গে কর যোগ হয় কম। করের পিরামিড-গঠন (phenomenon of tax-pyramiding) তখনই ঘটিতে পারে, যদি করটি প্রতি-স্তরে আদায়-যোগ্য হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি পরবর্তী স্তরের ব্যক্তির উপর করভার অপসারণ করিয়া দিতে পারে। এইরূপ করের ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে ফার্ম বা ব্যবসায়ীরা লম্বমুখী প্রসারণ সুরু করে (vertical expansion)। ইহা সম্ভব হইলে বহু-বিন্দু করটি প্রকৃতপক্ষে এক-বিন্দু করে পরিণত হইয়া পড়ে, একমাত্র খুচরা বিক্রয়ের সময় করপ্রদানের কথা উঠে। আদায়ের সুবিধা বিবেচনা করিলেও দেখা যায় যে, এক-বিন্দু কর তুলনামূলক ভাবে অধিকতর সুবিধাজনক।

কিন্তু আজকাল সরকারের টাকার প্রয়োজন বেশি

বিভিন্ন ধরনের বিক্রয় কর

অনুশীলনী

1. What are taxes ? Discuss the principles that underlie the system of modern taxation.

2. Enumerate the principles that should guide the system of taxation.

3. How would you justify the principle of progressive taxation ?

4. Examine critically the case for a system of progressive taxation.

5. Distinguish between Progressive and Proportional taxation and consider their advantages and limitations.

6. On what grounds can you justify the principle of progressive taxation ?

7. Discuss how equity in taxation can be ensured.

8. How far Income is a satisfactory measure of ability to pay ?

9. Discuss the concept of taxable capacity. Do you consider it totally useless ?

10. "Unless hedged about with many qualifications and assumptions the taxable capacity of a community is a phrase which has very little meaning" (Dalton)—Explain.

11. Discuss the factors that determine the shifting and incidence of taxation.

12. Discuss the incidence of a tax under (a) Perfect Competition, and (b) Monopoly.

13. How far, in your opinion, the income tax may be shifted ?

14. Discuss wherein lies the incidence of (a) Income tax, (b) a tax on Monopoly, (c) Customs duties. (d) a tax on Land & buildings.

15. What is meant by Capitalisation of taxes ? Discuss how far 'an old tax no tax' ?

16. Discuss the effects of taxation on will to work and save.

17. Discuss the concept of taxable income.

18. How far Income tax checks the incentive to work— and save ?

19. What is a Capital gains tax ? Discuss its nature and effects.

20. Discusss the importance and effects of Death duties.

21. What is Expenditure tax ? Do you support it instead of Income tax ?

22. Discuss the importance and effects of Sales tax in a modern economy.

23. Write short notes on : (a) gifts tax, (b) customs, Excise and use taxes.

24. Compare Income tax and Death duties.

25. Discuss the use of Partial outlay taxes on welfare grounds.

১৬

সরকারী ঋণ

Public Debt

আয় হইতে ব্যয় অধিক হইলে ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্রকেও সেই ফাঁক ঋণ করিয়াই পূরণ করিতে হয় বটে ; কিন্তু ব্যক্তিগত ঋণ রাষ্ট্রীয় ঋণে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

ব্যক্তিগত ঋণ ও রাষ্ট্রীয় ঋণের পার্থক্য

(১) রাষ্ট্র জনসাধারণের নিকট হইতে জোর করিয়া বা বাধ্যতামূলক ভাবে ঋণগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি কাহারও উপর জোর খাটাইতে পারে না। (২) সরকারী ঋণ সম্পূর্ণ অপরিশোধ্য বা চিরস্থায়ী ধরনের হইতে পারে, কবে ইহা শোধ দেওয়া হইবে সে-সম্বন্ধে কোন তারিখ নির্দিষ্ট না-ও থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঋণ অপরিশোধনীয় অবস্থায় রাখিতে পারে না। (৩) রাষ্ট্র নিজের নাগরিকদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজের নিকট হইতে ঋণ পাইতে পারে না। (৪) ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র দেউলিয়া হয় না। (৫) রাষ্ট্র নূতন কাগজী অর্থ প্রস্তুত করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে, বা পুরাতন ঋণ শোধ দিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির সেইরূপ কোন সুবিধা নাই। (৬) ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক কর বসাইতে পারে, ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। (৭) দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রভাব ও ফলাফল ব্যক্তিগত ঋণের প্রভাব ও ফলাফল হইতে পৃথক ও ব্যাপক।

ক্লাসিকাল ধন-বিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্র যত কম ঋণ করে ততই ভাল এবং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে রাষ্ট্রের ঋণ করা উচিত নহে। কিন্তু দেখা যায়

কয়েকটি অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হয়। (১) যদি স্বাভাবিক অবস্থায়, হঠাৎ কোন অচিন্ত্যপূর্ব কারণে আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হইতে থাকে, তাহা হইলে ঋণ না করিয়া উপায় নাই। যুদ্ধ প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থায় এত অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তখন কর-রাজস্ব হইতে সকল ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। (২) অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজেই অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের পূর্ণনিয়োগের উদ্দেশ্যে বা বিশেষ ধরনের শিল্প ব্যবসায় প্রভৃতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করেন; এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ঋণের সাহায্যে সেই অর্থ তোলা চলিতে পারে। এই ধরনের ব্যয় প্রকৃতপক্ষে মূলধন-বিনিয়োগ, ইহা হইতে ভবিষ্যতে অধিকতর সম্পদ বা আয় সৃষ্টি হইবে, সুতরাং বর্তমানে ঋণ করিয়া সেই ঋণভার ভবিষ্যতের উপর বিস্তৃত করিয়া রাখা চলে। ওই সকল রাষ্ট্রীয় বিনিযোগ হইতে ভবিষ্যতে যে-আয় হইবে তাহা হইতেই সুদসহ উহা পরিশোধ করা চলিবে।

রাষ্ট্রীয় ঋণের যুক্তি-সঙ্গত কারণসমূহ

অ্যালেন্ ব্রাউনলীর মতে আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ঋণের উদ্দেশ্য হইল প্রধানত তিনটি: (ক) যে-সকল উপকরণ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত, তাহাদের সরাইয়া আনিয়া সরকারী ক্ষেত্রে নিয়োগ করার উদ্দেশ্য, (খ) অব্যবহৃত বা অনিযুক্ত উপকরণগুলিকে ব্যবহারের বা নিয়োগের উদ্দেশ্য, এবং (গ) আকস্মিক প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্য।

অ্যালেন্ ও ব্রাউনলীর মতে

সাধারণ হারে সুদ প্রদান করিয়া যদি উপযুক্ত পরিমাণে ঋণ আকর্ষণ করা না যায় তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে অধিক ঋণ দানে প্ররোচিত করার চেষ্টা হয়। যেমন, (১) ঋণ প্রদান করিলে উহা হইতে প্রাপ্ত সুদকে আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান, (২) কর-প্রদানের সময়ে সরকারী ঋণপত্রসমূহের মূল্য অধিক ধরিতে দেওয়া, (৩) ঋণপত্রের লিখিত-মূল্য অপেক্ষা কমমূল্যে উহা বিক্রয় করা, যেমন, 100 টাকার সরকারী ঋণপত্র 99 টাকাতে বিক্রয় করা, (৪) ঋণপরিশোধের সময়ে ঋণপত্রের লিখিত-মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য প্রদান (যেমন 100 টাকার ঋণপত্র পরিশোধের সময় 102 টাকা ফেরৎ দেওয়া)।

অধিক ঋণ আকৃষ্ট করার বিশেষ পদ্ধতি সমূহ

রাষ্ট্রীয় ঋণের পক্ষে যুক্তি হইল, (১) ইহা দ্বারা আকস্মিক প্রয়োজন মিটানো

সম্ভবপর হয়। কর আদায় করা সময়সাপেক্ষ, ইতিমধ্যে ব্যয়ের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রাষ্ট্র স্বল্পকালীন ঋণগ্রহণ করে (Ways and Means Advances); অথবা, বাজার হইতে সরকারী বিল ভাঙাইয়া লয় (Treasury Bills)। (২) দীর্ঘকালীন ঋণ ব্যতীত দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের কাজ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। (৩) যুদ্ধের সময়ে কর দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করা অপেক্ষা ঋণ দ্বারা ব্যয় মিটানো তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য নীতি। (৪) জনসাধারণের পক্ষে ইহা নিশ্চিত ও কম-ঝুঁকিসম্পন্ন অর্থ-বিনিয়োগ, ফলে দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও মূলধন-গঠন ত্বরান্বিত হয়। (৫) সরকারী ঋণপত্রসমূহ দেশের ঋণ-ব্যবস্থাকে উন্নত করে এবং ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রনে সাহায্য করে (খোলাবাজারে কার্যকলাপ প্রভৃতির দ্বারা), মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ এবং সংকট-ত্রাণ ঘটায়। (৬) অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রসার ঘটাইবার পক্ষে উপযোগী আর্থিক নীতি ও কৌশল হিসাবে রাষ্ট্রীয় ঋণ কাজ করে। শিল্পে উন্নত দেশসমূহে পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌছানো অথবা, অনুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা রাষ্ট্রীয় ঋণের অন্যতম প্রধান সুফল।

রাষ্ট্রীয় ঋণের পক্ষে যুক্তি বা ঋণের উপকারিতা

রাষ্ট্রীয় ঋণের ত্রুটি হইল (১) ঋণগ্রহণের সুবিধা থাকিলে অযৌক্তিক বা অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র অথবা ঋণগ্রহণে প্রলুব্ধ হইতে পারে। (২) সরকারী রাজনৈতিক দল স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইহাকে ব্যবহার করিতে পারে। (৩) বিদেশ হইতে ঋণ সত্যই বিশেষ ভারবহুল, কারণ জাতীয় আয়ের একাংশ সুদ প্রদান ও ঋণ পরিশোধের মারফৎ বিদেশে চলিয়া যায়। (৪) প্রভূত রাষ্ট্রীয় ঋণের ফলে করের পরিমাণ ও হার খুবই বেশি হইতে থাকে (সুদ প্রদান ও ঋণ পরিশোধের প্রয়োজনে)। ইহার দরুণ দেশে কর্মোদ্যম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা এবং স্পৃহা কমিতে পারে। (৫) সুদের ভার অধিক হওয়ায় উহার আসল ভার কমাইবার উদ্দেশ্যে সরকার অনেক সময় 'সুলভ অর্থের নীতি' (Cheap Money Policy) গ্রহণ করে; দেশে অত্যধিক পরিমাণ ঋণপত্র প্রভৃতি ছড়াইয়া পড়ায় মূলধনের বাজারে ফাটকাদারির সুবিধা হয়, দামস্তর অস্থিতিশীল (Unstable) হইয়া পড়ে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক অস্থিরতা দেখা দেয়।

রাষ্ট্রীয় ঋণের বিপক্ষে যুক্তি বা ঋণের অপকারিতা

রাষ্ট্রীয় ঋণের শ্রেণী বিভাগ (Classification of Public Debt) ঃ বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া রাষ্ট্রীয় ঋণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

(১) কোন্ কর্তৃপক্ষ ঋণগ্রহণ করিতেছে সেই অনুযায়ী ঋণকে কেন্দ্রীয় ঋণ, প্রাদেশিক বা রাজ্য-ঋণ এবং স্থানীয় ঋণ প্রভৃতিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(২) যদি জোর করিয়া ঋণ আদায় করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাধ্যতা-মূলক ঋণ বলে, আর যদি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ঋণদান ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহাকে স্বেচ্ছামূলক ঋণ বলা হয়।

(৩) রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অধিবাসীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে আভ্যন্তরীণ ঋণ বলে, এবং বিদেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে বাহ্য ঋণ বলা হয়।

(৪) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করা হইবে যদি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে নির্দিষ্ট-পরিশোধ্য (Redeemable) ঋণ বলে ; আর, যদি এই ঋণ পরিশোধের কোন সময়-সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া না হয় তাহা হইলে উহাকে অনির্দিষ্ট-পরিশোধ্য (Irredeemable) ঋণ বলা হয়।

(৫) অতি-দীর্ঘকাল পরে ঋণ পরিশোধ করা হইবে, এইরূপ ঋণকে দীর্ঘ-আবদ্ধ ঋণ (Funded Debt) বলে ; এবং স্বল্পকালের মধ্যে, যেমন এক বৎসরের মধ্যেই ঋণ পরিশোধ করা হইবে এইরূপ ঋণকে স্বল্প-আবদ্ধ ঋণ বা ভাসমান ঋণ (Unfunded Debt or Floating Debt) বলা হয়। এই সকল শব্দ ইংলণ্ডে একটু পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ইংলণ্ডে দীর্ঘ-আবদ্ধ ঋণ বলিতে বোঝায় এমন ঋণ যাহার সুদ দিতে সরকার আইনত বাধ্য, কিন্তু মূল-পরিমাণ (Principal) পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। ইহা তাই স্থায়ী ধরণের ঋণ, যেমন কন্‌সলস্ (consols)। অপরপক্ষে, স্বল্প-আবদ্ধ ঋণ বলিতে বোঝায়, যে ঋণ নির্দিষ্ট কোন তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিয়া লইতে হইবে।

(৬) অনেক সময় রাষ্ট্র অ্যান্যুইটির দ্বারা ঋণ গ্রহণ করে। এই অ্যান্যুইটি-গুলি সমাপনীয় (Terminable) বা চিরন্তনীয় (Perpetual) হইতে পারে। প্রথমক্ষেত্রে, কয়েক বৎসর যাবৎ সুদ ও মূল-পরিমাণের কিছু অংশ

প্রদান করিয়া ঋণ পরিশোধ করা হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যতদিন অ্যান্যুইটি-ক্রেতা (Annuitant) বাঁচিয়া থাকেন ততদিন রাষ্ট্র নিয়ামতভাবে সুদ ও মূল-পরিমাণের কিছু অংশ প্রদান করিতে থাকে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়।

(৭) ঋণের দ্বারা অর্থ তুলিয়া যদি এরূপভাবে ব্যয় করা হয় যাহাতে (ক) সেই মূল্যের সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে থাকে, বা (খ) সম্পত্তি হইতে এমন আয় হয় যাহার দ্বারা সুদ প্রদান বা ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর, অথবা (গ) সমাজের উৎপাদন শক্তি খুবই বাড়াইয়া দেয়—তাহা হইলে সেই ঋণকে উৎপাদক ঋণ (Productive Debt) বলা হয়। মিসেস্ হিক্‌স এইরূপ ঋণকে সক্রিয় ঋণ (Active Debt) বলিয়াছেন।

ঋণের দ্বারা গৃহীত অর্থের বিনিময়ে কোন সম্পত্তিই রাষ্ট্রের হাতে না থাকিলে বা আয় প্রদানকারী সম্পত্তিতে ব্যয়িত না হইলে অথবা সমাজের উৎপাদন-শক্তি না বাড়াইলে উহাকে অনুৎপাদক ঋণ (Unproductive Debt) বলা হয়। যদি তাহা শুধুমাত্র সমাজের ভোগ বা তৃপ্তিকে বাড়াইয়া দেয় (যেমন মিউজিয়াম্ বা পার্ক প্রভৃতি) তাহা হইলে মিসেস্ হিক্‌সের ভাষায় তাহাকে নিষ্ক্রিয় ঋণ (Passive Debt) বলে।

যে-সকল ঋণ-সৃষ্টির কারণ অনুৎপাদক ব্যয় এবং কখনই সেইরূপ ব্যয় হইতে সমাজে তৃপ্তি বা উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িবে না, তাহাদের তিনি মৃতভার ঋণ (Deadweight Debt) বলিয়াছেন।

সরকারী ঋণের উৎস (Sources of Public Borrowing):

দেশের সামগ্রিক চাহিদা এবং জাতীয় আয়ের উপর সরকারী ঋণের প্রভাব স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইলে জানা দরকার যে কোন ধরণের উৎস হইতে সরকারী ঋণ আসিতেছে। প্রধান উৎসগুলিকে তাই আলোচনা করা প্রয়োজন।

১। ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা চলে। ব্যক্তি সরকারকে ঋণ দেয় সরকারী বণ্ড ক্রয় করিয়া। এই উদ্দেশ্যে হয় তাহার ভোগব্যয় বদলাইতে হয় অথবা তাহার সঞ্চয় পূর্বে যে-রূপে আবদ্ধ ছিল তাহাতে পরিবর্তন আনিতে হয়। সাধারণত, কোন-ব্যক্তি ভোগব্যয় কমাইয়া সরকারী বণ্ড ক্রয় করে না। যে বিশেষ ধরণে ব্যক্তির সঞ্চয় নিযুক্ত হইয়াছিল, সরকারী ঋণ গ্রহণের ফলে প্রধানত তাহাতেই পরিবর্তন আসে।

ব্যক্তিদের নিকট হইতে

সঞ্চয়ের যে সকল পরিবর্ত-ব্যবহার হইতে ব্যক্তি উহা সরাইয়া আনিয়া সরকারী বণ্ডে খাটাইতে পারে তাহা আমরা আলোচনা করিতে পারি। প্রথমত, বণ্ড না কিনলে ব্যক্তি নিজের ব্যবসায় প্রসারের জন্য ঐ সঞ্চয় নিয়োগ করিতে পারিত। দ্বিতীয়ত, বণ্ডগুলি পাওয়া না গেলে ব্যক্তি অলস-নগদের রূপে সঞ্চয় জমাইয়া রাখিতে পারিত। অবশ্য বাজারে সরকারী বণ্ড থাকিলেই ব্যক্তি নিজের ব্যবসায় বা অলসভাণ্ডার হইতে সঞ্চয় সরাইয়া আনিয়া বণ্ডগুলি কিনিতে থাকিবে তাহা নহে। নূতন সরকারী বণ্ডগুলি যদি পূর্বাপেক্ষা কিছু বেশি সুযোগ সুবিধা দিবার প্রতিশ্রুতি বহন করে, তবেই সঞ্চয়ের এইরূপ রূপান্তরণ সম্ভব হইবে। তৃতীয়ত, অন্যান্য প্রকার সিকিউরিটি হইতে সঞ্চয় সরিয়া আসিয়া সরকারী বণ্ডে নিযুক্ত হইবে। ইহাতে সেই অপরাপর সিকিউরিটির দাম হ্রাস পাইবে, সুদের হার বাড়িয়া যাইবে, ব্যবসায়ের প্রসার ব্যাহত হইবে। ২। ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে সরকারী ঋণ উঠান চলে। বীমা কোম্পানী, বিনিয়োগী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নিকট সরকারী বণ্ড বিক্রয় করা সম্ভবপর। এই সকল প্রতিষ্ঠান যখন সরকারী বণ্ড কেনে তখন তাহারা নগদ জমার পরিমাণ কিছুটা কমাইয়া দেয়। কিন্তু সাধারণত তাহাদের সরকারী বণ্ড কেনার বেশির ভাগ টাকা আসে অন্যান্য সিকিউরিটি কেনা কমাইয়া দিয়া। ইহাতেও, পূর্বের মতন, সিকিরিটির দাম কমে ও সুদের হার বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে

৩। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে সরকার ঋণ করিতে পারে। অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যাঙ্কের পার্থক্য হইল এই যে, ব্যাঙ্ক ঋণসৃষ্টি করিতে পারে, আর সকলে ইহা পারে না। ব্যাঙ্কগুলির হাতে নিম্নতম রিজার্ভের উর্ধ্বে টাকা থাকিলে সেই অতিরিক্ত টাকার কয়েকগুণ বেশি পরিমাণ সরকারী বণ্ড ইহারা ক্রয় করিতে পারে। এইরূপে সরকারী বণ্ড কেনার ক্রয়শক্তি ইহারা নিজেরাই সৃষ্টি করে, ব্যক্তির ন্যায় কেবল এক ব্যবহার হইতে আমরা অপর ব্যবহারে সঞ্চয় সরাইয়া লইয়াই ইহারা ক্ষান্ত হয় না। ৪। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট সরকারী বণ্ড বিক্রয় করা চলে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট সরকারী বণ্ড বিক্রয় করিলে যেরূপ সমাজেম ক্রয়শক্তির পরিমাণ বাড়ে, ঠিক সেইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী বণ্ড কিনিলে দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। কারণ এই বণ্ড কিনিয়া তাহারা সরকারের নামে রক্ষিত অ্যাকাউণ্টে জমার

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে

পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়, এবং সরকার সেই অ্যাকাউণ্ট হইতে দরকার-মত চেক কাটিয়া টাকা তুলিয়া লয়। সেই টাকা ক্রমে ব্যক্তিদের হাতে আসে, তাহাদের নিজস্ব নামে কোন এক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে জমা হয়, ঋণসৃষ্টির ধারা সুরু হয়। এইরূপ ঋণ করিলে তাই সংকোচনমূলক ধারার কোনরূপ সম্ভাবনা তো নাই-ই বরং প্রসার শীল ধারার সূত্রপাত ঘটিতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে

রাষ্ট্রীয় ঋণের ভার (The burden of Public Debt) ঃ

সরকারী ঋণের ভার সম্পর্কে আধুনিক কালে বেশ কিছুটা মতপার্থক্য দেখা যায়। কেহ বলেন উহা আশীর্বাদ, কেহ বলেন উহা অভিশাপ। যাঁহারা কেইন্সীয় বিশ্লেষণের পক্ষপাতী, তাঁহারা ঘাট্তি ব্যয়কে সমর্থন করেন ; দেশের সামগ্রিক আয়স্তর ও কর্মসংস্থান স্তর উন্নত করা একমাত্র রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। সরকারী ঋণ বাড়াইয়া বিনিয়োগ বাড়াইলে দেশে আয়প্রসারের সম্ভাবনা—তাই তাঁহারা স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে, আভ্যন্তরীণ ঋণের কোনরূপ ভার নাই। অপরপক্ষে, রক্ষণশীল ক্লাসিকাল তত্ত্বের মতধারা এখনও শুকাইয়া যায় নাই. তাঁহারা ঋণ ব্যাপারটাকেই রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক দেহের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার প্রকাশ বলিয়া তীব্র অপছন্দ করেন, ঋণপ্রসারকে 'দেউলিয়ার পথ' বলিয়া ঘোষণা করেন। এই উভয় মতই একপেশে, ইহাদের মধ্যে কোনটিই পূর্ণ সত্য প্রকাশ না করিয়া অর্ধসত্য প্রকাশ করে।

প্রাচীন ও অর্বাচীন : দুই মত দেখা যায়

জাতীয় ঋণ জাতিকে দেউলিয়া করিয়া তোলে—এই মতের সূত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। সেই সময় এই মত ছিল খুবই সত্য, আর 'দেউলিয়া' কথাটিরও সেই যুগে এক বিশেষ তাৎপর্য ছিল। ইহার কারণ হইল, সেই সময় জাতীয় ঋণ ব্যয়িত হইত প্রধানত অপচয়মূলক কাজে, অন্যায় যুদ্ধে বা অপ্রয়োজনীয় বিলাসবহুল রাজকীয় আড়ম্বর ও বিলাসব্যসনে। কিন্তু আজিকার যুগে সরকারী কাজ-কর্ম দেশের আয়স্তর ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে অনেক বেশি পরিমাণে প্রভাবিত করে, পূর্বের ঐ দৃষ্টি লইয়া ইহাদের আর বিচার করা চলে না। তাই, রক্ষণশীল মতের পরিবর্তে, অপর একটি মত প্রচলিত হইয়াছে। ইহার বক্তব্য হইল যে, আভ্যন্তরীণ ঋণের কোন ভার

প্রত্যেক মত নিজের দৃষ্টিতে সমস্যাটি বিচার করে

নাই, কারণ 'আমরা নিজেদেরই নিকট ঋণী'। এক পকেট হইতে টাকা লইয়া ইহা অন্য পকেটে ফেলা মাত্র। সুদ আর ঋণ পরিশোধে যে টাকা খরচ হয়, তাহা মহাজনদের আয় হইল, দেশের সামগ্রিক আয় তাই সমানই রহিয়া গেল। যদি অবশ্য এই ঋণ বিদেশীদের নিকট হইতে আনা হয়, তবের ঋণের জন্য সুদ প্রভৃতি দিলে জাতীয় আয় কমিয়া যায়, জাতীয় অর্থনৈতিক কল্যাণের মান বা স্তর হ্রাস পায়। এই কথার অর্থ এই নয় যে, বৈদেশিক ঋণ কোন দেশের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইতে সাহায্য করে না। ইহা আভ্যন্তরীণ ঋণের সমান উৎপাদনক্ষম হইতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে দেশের মধ্য হইতে ঋণ করিলে তাহার নীট প্রতিদান অপেক্ষা বৈদেশিক ঋণের নীট প্রতিদান কম। আভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে আমরা দেশের মধ্যেই ঋণী, এই কথার গুরুত্ব হইল জাতীয় আয়ের স্তর ইহাতে প্রভাবিত হয় না। ঋণ করার সময়ে সমাজের মধ্যে একের হাতে হইতে সম্পদ অন্য হাতে চলিয়া আসে, ঋণের ফলে সমাজের হাতে সামগ্রিক জাতীয় সম্পদ হ্রাস পায় না; বরং এই ঋণের ব্যয়ের ফলে উহা বাড়িতেই পারে।

আভ্যন্তরীণ ঋণের কোন ভার নাই

উপরের আলোচনায় অবশ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বাদ দেওয়া হইতেছে। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক দেহে, প্রতিটি ঋণের ব্যক্তিগত দিক এবং জাতীয় দিক দুই-ই আছে। আভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা নিজেদেরই নিকট ঋণী ইহা ঠিকই, কিন্তু আমাদেরই মধ্যে কেহ সেই ঋণ দিয়াছে, আর অন্যেরা সেই ঋণ শোধ করার জন্য দায়ী। ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে ইহা অতি সুস্পষ্ট, দেনাদার ও মহাজন একই সমাজের অধিবাসী হইলেও ইহারা একই ব্যক্তি নন। সরকারী ঋণের ক্ষেত্রে, সর্বশেষ দেনাদাররা (করদাতাগণ, কারণ তাঁহাদেরই কর দিয়া ঐ ঋণ শোধ করিতে হইবে) কেহ কেহ মহাজনও হইতে পারেন (বণ্ড-ক্রেতাগণ), ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকারী ঋণের মালিকানা এবং করভারের বণ্টন ঠিক একই অধিবাসীদের উপর পড়িবে, এমন কোন ব্যবস্থা নাই। একমাত্র তাহা হইলেই মহাজন হিসাবে ব্যক্তির সুবিধা করদাতা হিসাবে করভার বহনের অসুবিধা দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারিত।

আভ্যন্তরীণ ঋণের কিছু ভার আছে : কারণ ব্যক্তি ও জাতি একই নয়

তাই আমরা এই কথা অনায়াসে মানিয়া লইতে পারি না যে, দেশের

অধিবাসীরা সামগ্রিকভাবে নিজেরাই মহাজন বলিয়া আভ্যন্তরীণ ঋণের কোনরূপ ভার নাই। আভ্যন্তরীণ ঋণের কোনরূপ ভার আছে কি নাই তাহা নির্ভর করিবে আমরা কি দৃষ্টিতে ইহা দেখি—সামগ্রিক দৃষ্টিতে, অথবা একক-ভিত্তিক দৃষ্টিতে। ঋণ লইয়া উহাকে উৎপাদনক্ষম কাজে খাটাইলে তাহার কোন নীট ভার নাই, বরং সামগ্রিকভাবে সমাজের নীট কল্যাণ বাড়ে, কারণ বিনিয়োগ না-হওয়ার তুলনায় উহা হওয়ার ফলে সমাজ পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে (better off)। কিন্তু ঋণের ফলে সমাজের মধ্যে এই ঋণমূল (principal) ও সুদের হস্তান্তর এমনভাবে ঘটিতে পারে যে, সমাজের বিশেষ বিশেষ অধিবাসীদের উপর নির্দিষ্ট প্রকার ভার বাড়াইয়া তুলিতে পারে। উৎপাদনের দিক হইতে যাহা ভাল, এইরূপ অনেক নীতিই বণ্টনের দিক হইতে গ্রহণীয় নয়।

উৎপাদন ও বণ্টনের দিক হইতে ইহাদের বিচার করা যায়

উপরের এই আলোচনার পরে এখন আমরা জাতীয় ঋণের ভার সম্পর্কে আমাদের আলোচনাকে সংক্ষেপে সাজাইতে পারি। নিচের এই বিষয়গুলি মনে রাখিলেই এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে।

(১) উৎপাদক ঋণের ভার কিছুই নাই কারণ উহার ব্যয় দ্বারা যে-সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে আসে তাহা হইতে আয় বা উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সুদ বা ঋণ-মূল পরিশোধ করা যায়। অনুৎপাদক ঋণের ভার দেশের লোকের উপর পড়ে, কারণ কর-রাজস্ব হইতেই উহার পরিশোধ বা সুদ প্রদান করিতে হয়।

(২) ঋণ-ভার পরিমাপ করিতে হইলে বহু বিষয় গণনার মধ্যে আনিতে হয়; যেমন ঋণের পরিমাণ, আভ্যন্তরীণ বা বাহ্য, ঋণের উদ্দেশ্য, পরিশোধের শর্ত ও পদ্ধতি প্রভৃতি। তাহা ছাড়া, জাতীয় আয়ের পরিমাণ, দেশে কর-ব্যবস্থার রূপ, এবং সরকারী ঋণপত্র-সমূহ দেশের কোন শ্রেণীর হাতে কিরূপভাবে বণ্টিত আছে —প্রভৃতি সকল কিছু বিচার করা দরকার।

ঋণভার পরিমাপের বিষয় সমূহ

(৩) রাষ্ট্রীয় ঋণভার দুইপ্রকার: আর্থিক ভার ও আসল ভার। ইহার প্রত্যেকটি ভার আবার দুই প্রকারের হইতে পারে—প্রত্যক্ষ ভার ও পরোক্ষ ভার।

(৪) কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাহ্য ঋণের প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার হইল, সুদ ও ঋণ পরিশোধের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়। সুদ ও ঋণ-

পরিশোধের জন্য দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করিবার ফলে সমাজের ভোগ, তৃপ্তি বা অর্থনৈতিক কল্যাণ কমিয়া যায়, তাহাই প্রত্যক্ষ আসল ভার; ঋণের প্রত্যক্ষ আসল ভার নির্ভর করে সমাজের কোন্ শ্রেণীর নিকট হইতে কিরূপ অর্থ আদায় করিয়া ঋণ পরিশোধ করা হইতেছে, তাহার উপর। যেমন, যদি ধনিক শ্রেণীর নিকট হইতে অধিক অর্থ আদায় করা হয়, তাহা হইলে ঋণের প্রত্যক্ষ আসল ভার কম হইবে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক কল্যাণ কম হ্রাস পাইবে। বাহ্য ঋণের পরোক্ষ আসল ভারও দেখা যায়, কারণ (ক) পরিশোধনীয় অর্থ তুলিবার জন্য অধিক হারে কর বসাইলে দেশের উৎপাদন ও উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পাইতে পারে, এবং (খ) বিভিন্ন দিকে নিয়োগ করিয়া দেশের কল্যাণ বাড়াইবার কার্যে ওই অর্থ নিয়োগ করা সম্ভব হয় না।

বাহ্য ঋণভার

(৫) আভ্যন্তরীণ ঋণের কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার নাই, কারণ সুদ ও ঋণপরিশোধ করিলে উহা দেশবাসীগণই পাইয়া থাকেন, এক শ্রেণীর নিকট হইতে অপর শ্রেণীর নিকট ওই অর্থ হস্তান্তরিত করা হয় মাত্র। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঋণের পরোক্ষ আর্থিক ভার দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, (ক) ধনী-গরীব সকলেই কর দেয়, কিন্তু সুদ হিসাবে আয়-বৃদ্ধি হয় ধনী শ্রেণীর, তাঁহারাই সরকারী ঋণ-পত্র ক্রয় করেন। এরূপ অবস্থায়, দেশের সম্পদ গরীবদের হাত হইতে ধনীদের হাতে চলিয়া যায়—সম্পদের এইরূপ হস্তান্তর আর্থিক বৈষম্যের পরিধি বিস্তৃত করে। (খ) উচ্চহারে কর স্থাপনের ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (গ) কল্যাণমূলক সরকারী ব্যয় কমে। (ঘ) দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হয়, গরীবদের জীবনযাত্রার মান ও কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। (ঙ) সুদের দরুণ পূর্বাপেক্ষা অধিক আয় পাইতে থাকায় ধনিকশ্রেণীর কর্মপ্রচেষ্টাও হ্রাস পায়। (চ) যুদ্ধের সময়ে গৃহীত ঋণের আসল ভার যুদ্ধের পরে বাড়ে, কারণ যুদ্ধোত্তর যুগে দামস্তর ও সুদের হার কমিয়া যায়।

আভ্যন্তরীণ ঋণভার

(৬) লার্নারের মতে কেবলমাত্র বাহ্য-ঋণই ভারশীল এবং ব্যক্তিগত ঋণের ন্যায় তাহা রাষ্ট্রকে দরিদ্র করিয়া তোলে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঋণের ভার বিশেষ কিছু নাই। বর্তমান ঋণের ভার ভবিষ্যতের বংশধরদের উপর পড়িতেছে, অনেকে তাহা বলিলেও লার্নারের মতে উহা ঠিক নয়, কারণ ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সেই ঋণ অন্যকে নয়, নিজেদেরই পরিশোধ করেন। তাঁহার মতে, রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণও মোটেই

লার্নারের মত

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে। আর আভ্যন্তরীণ ঋণের সুদকে কখনই ভার বলা চলে না কারণ উহা ব্যক্তিরা নিজেরাই পাইয়া থাকেন।

রাষ্ট্রীয় ঋণের অর্থনৈতিক ফলাফল (The Economic Effects of Public Debt)

রাষ্ট্র ঋণ করিলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ রাষ্ট্রের নিকট চলিয়া আসে ; সেই অর্থ ব্যয় করিলে পুনরায় তাহা কিছুসংখ্যক ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া যায় ; সেই ঋণ পরিশোধের সময়ে সাধারণ করদাতাদের নিকট হইতে অর্থ চলিয়া আসিয়া সরকারী ঋণপত্র-ক্রেতাদের নিকট চলিয়া যায়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ঋণ, উহার ব্যয় ও পরিশোধ বহুপ্রকার অর্থনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করে।

অর্থের পরিমাণের উপর প্রভাব

যদি রাষ্ট্র ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে তাহা হইলে দেশে অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে। ব্যাঙ্কসমূহ সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া উহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক দিয়া ঋণ-গ্রহণের দ্বারা জনসাধারণকে ঋণ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও সেই ঋণপত্রকে জমা হিসাবে গণ্য করিয়া উহার ভিত্তিতে অধিক অর্থ প্রচলিত করিতে পারে। ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে যেমন, ব্যক্তির নিকট ঋণপত্র বিক্রয় করিলে মুদ্রাসংকোচনশীল প্রভাব ঘটে, কারণ ব্যক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরাইয়া লইলে সমাজের ব্যয়স্রোত সংকুচিত হয়।

দামস্তরের উপর প্রভাব

দামস্তরের উপর প্রভাব নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর : (ক) অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন, ও (খ) অর্থনৈতিক কাজকর্মে পরিবর্তন। ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ বাড়ে, দামস্তরও বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্যান্য সূত্র হইতে ঋণগ্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ কমে, দামস্তরও হ্রাস পায়। রাষ্ট্রীয় ঋণের ব্যয়ের ফলে যদি উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটে তাহা হইলে দামস্তরে বৃদ্ধি না-ও হইতে পারে ; অপরক্ষেত্রে, সেই ব্যয়ের ফলে আয় ও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে এবং দামস্তরে হ্রাস না-ও হইতে পারে। কেইন্‌সের মতে, দেশে অনিযুক্ত উপাদান থাকিলে উৎপাদন বাড়িবে কিন্তু দামস্তর স্থির থাকিবে, কিন্তু

* তবে লুকানো মজুত অর্থ হইতে রাষ্ট্রকে ঋণ প্রদান করিলে এইরূপ ফলাফল নাও ঘটিতে পারে।

পূর্ণনিয়োগের পরেও ঋণ ও ব্যয় করা হইলে উৎপাদন সমান থাকে, তবে দামস্তর বাড়িয়া যাইবে †

ঋণ-পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি ও নিয়মসমূহের দ্বারা (Debt Management) সুদের হার প্রভাবান্বিত হয়। ঋণ-পরিচালনার কাজ হইল ঋণ-গ্রহণের সময়, ঋণ গ্রহণের রূপ ও পদ্ধতি, কোন্ শ্রেণীর নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করা হইবে, কি সুদ দেওয়া হইবে কবে ও কি হারে কি পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা হইবে, ঋণপত্রে ক্রেতাদের কি সুযোগ দেওয়া হইবে এই সকল বিষয়ে নীতি-নির্ধারণ করাকে ঋণ-পরিচালনা বলে। যে-হেতু স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয়প্রকার ঋণের বাজারেই রাষ্ট্র প্রধান ঋণগ্রহীতা, সেই জন্য ইহার ঋণ-পরিচালনার প্রভাব সুদের হারের উপর পড়ে।

সুদের হারের উপর ইহার প্রভাব

ঋণ গ্রহণ করিয়া সেই অর্থ যে-দিকে ব্যয় করা হয় সেইদিকে উপাদান-সমূহ নিযুক্ত হইতে থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে উপাদান-সমূহের নিয়োগে এমন দিক্-পরিবর্তন ঘটা উচিত যাহা সামাজিক ভাবে কল্যাণবর্ধক।

উপাদানসমূহ নিয়োগের দিক-নির্ধারণের উপর প্রভাব

সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করেন ধনী ব্যক্তিগণ, কিন্তু উহার সুদ বা পরিশোধ করা হয় দেশের সকলের নিকট হইতে কর-রাজস্ব তুলিয়া। সুতরাং সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির বা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এইরূপে সম্পদের হস্তান্তরণ ঘটে। যদি ব্যয় এরূপ করা হয় যে পুনরায় সেই অর্থ গরীবদের নিকট বর্ধিত আয়রূপে ফিরিয়া আসে, তবে সামগ্রিকভাবে তাহা কল্যাণজনক।

আয়-বণ্টন কাঠামোর প্রভাব

আধুনিক কালে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্রমশ ইহার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। মোটের উপর বলা চলে যে, ইহার প্রভাব নির্ভর করে, (ক) কিরূপে ঋণ তোলা হইল, (খ) কিরূপে এই ঋণ রক্ষিত হইল, এবং (গ) কিরূপে এই ঋণ পরিশোধ করা হইল, এই সকল বিষয়ের উপর।

উপসংহার

† সোমার্সের মতে রাষ্ট্রীয় ঋণ এবং দামস্তরের সহিত কোন সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; কিন্তু অ্যালেন ও ব্রাউন্লীর মতে ইহাদের মধ্যে কিছুটা সুদূর সম্পর্ক আছে। তবে, যেহেতু বাজেটের মধ্যে ঋণের সুদ ও পরিশোধনীয় অর্থ প্রভৃতির পরিমাণ কম, তাই সাধারণভাবে দামস্তরের উপর ইহাদের প্রভাবও কম।

আবার একে একে ইহাদের আলোচনা করিব। তবে তাহার পূর্বে আমাদের ঋণ পরিশোধের পদ্ধতিগুলি জানা প্রয়োজন।

ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি (Methods of Debt Repayment)

সাধাবণভাবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ করা হইয়া থাকে:

(১) **বাজেট উদ্বৃত্তের দ্বারা:** যদি বাজেটে উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলে সেই উদ্বৃত্তের দ্বারা আংশিকভাবে ঋণপরিশোধ করা চলে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় বাজেটে উদ্বৃত্ত হইলে তাহার দ্বারা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয় (যেমন করহ্রাস বা কল্যাণমূলক কাজকর্ম প্রভৃতি), এবং শেষ পর্যন্ত উহার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হইয়া উঠে না।

(২) **নিমজ্জমান তহবিল (Sinking Fund):** অনেকক্ষেত্রে ঋণ-পরিশোধের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ তহবিল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে নিয়মিত-ভাবে অর্থ জমা দেওয়া হয়, এবং বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ জমা হইলে উহা হইতে ঋণ পরিশোধ করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়মিতভাবে জমা দিলে তাহাকে নির্দিষ্ট-নিমজ্জমান তহবিল (Definite Sinking Fund) বলা হয়। আর, যখন যে-পরিমাণ অর্থ জোটানো গেল তাহা জমা দেওয়া হইলে তাহাকে অনির্দিষ্ট নিমজ্জমান তহবিল (Indefinite Sinking Fund) বলে। প্রতি-বৎসর তহবিলজাত অর্থের সুদ উহার সহিত যোগ করিলে তাহাকে বর্ধনশীল নিমজ্জমান তহবিল (Cumulative Sinking Fund) বলা হয়; উহা হইতে প্রাপ্ত সুদ উহাতেই জমা না রাখিলে তাহাকে স্থির-তহবিল (Constant Sinking Fund) বলে। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনৈতিক প্রভাবে ওই অর্থ অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইয়া যায় এবং উহা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হইয়া উঠে না।

(৩) **রূপান্তরণ ((Conversion):** অধিক সুদবহনকারী ঋণকে কম সুদবহনকারী ঋণে রূপান্তরিত করাকে রূপান্তরণ (Conversion) বলে। বাজারে সুদের হার পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গেলে বর্তমানের কম সুদে নূতন ঋণ করিয়া পুরাতন অধিক সুদ বহনকারী ঋণ পরিশোধ করিলে ঋণের ভার কিছুটা কমে।

(৪) **মূলধনী কর স্থাপন (Capital Levy):** সকল প্রকার মূলধনের উপর ক্রমবর্ধমান হারে কর বসাইলে প্রভূত পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় এবং

তাহার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা চলে। এই পদ্ধতিকে মূলধনী-কর স্থাপন বলা হয়। ইহার সুবিধা হইল: (ক) দ্রুত ঋণ পরিশোধ হইয়া যায়, (খ) করভার প্রধানত ব্যবসায়ী ও ধনিকশ্রেণীর উপর পড়ে, সাধারণ ব্যক্তিদের উপর নহে। (গ) বৃদ্ধ ও বয়স্ক ব্যক্তিরা ভার বহন করে এবং যুদ্ধে যাহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে সেই সকল অল্পবয়স্ক ব্যক্তিরা ভারগ্রস্ত হয় না। (ঘ) স্থায়ী ও উচ্চ আয়করের অসুবিধার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহার বিরুদ্ধে বলা চলে যে, (ক) ইহার বহু প্রয়োগগত অসুবিধা আছে। (খ) সমস্ত রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ না করাই উচিত, কারণ সমাজে সরকারী ঋণপত্রসমূহের প্রচুর সুবিধা আছে। (গ) ইহা পক্ষপাতদুষ্ট, কারণ যাঁহাদের সম্পত্তি আছে বা যাঁহারা চাকরি করিয়া প্রচুর আয় করেন তাঁহারা করের হাত হইতে বাঁচিয়া যান, কিন্তু মূলধনের মালিকগণের উপর অধিক চাপ পড়ে। (ঘ) ধনিকশ্রেণীর অবস্থা ও সঞ্চয়-ক্ষমতা আঘাত পায়, ফলে দেশের সঞ্চয় ও মূলধন-গঠন হ্রাস পায়।

(৫) **অস্বীকার করা (Repudiation) :** অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অবশেষে বাধ্য হইয়া পরিশোধের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারে। প্রভূত পরিমাণ ঋণের দায়িত্ব হইতে এই পদ্ধতি দ্বারা সরকার মুক্তিলাভ করিলেও ইহা সঙ্গত নহে, কারণ সুনাম নষ্ট হয় বলিয়া সরকারের ভবিষ্যৎ ঋণগ্রহণ ক্ষমতা কমিয়া যায়।

ঋণ গ্রহণ, ঋণের মালিকানা ও ঋণ-পরিশোধের অর্থনৈতিক ফলাফল (Economic effects of Borrowing, Owning of existing debt and Debt repayment) :

(১) ঋণ-গ্রহণের ফলাফল (Economic effects of borrowing) : সরকারী ব্যয় করার উদ্দেশ্যে কর-আরোপন দ্বারা টাকা তোলা বা ঋণ সংগ্রহ করিয়া টাকা উঠান এই দুই পদ্ধতির অর্থনৈতিক ফলাফল সমান নয়। ইহার কারণ হইল: (ক) সরকারকে ঋণ দেওয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত, এবং (খ) এইরূপ ঋণদানের ফলে ঋণদাতাদের ব্যক্তিগত সম্পদ কমিয়া যায় না, ঐ সম্পদের রূপান্তরণ ঘটে মাত্র। এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের প্রধান ফল হইল যে, মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে, একই পরিমাণ টাকা ঋণ করিয়া তোলা হইলে, কর আরোপনের তুলনায় ইহাতে দেশের সামগ্রিক চাহিদার উপর সংকোচনশীল প্রভাব খুব কম। বরং বলা চলে যে, কর আদায়ের সাহায্যে

কর ও ঋণের তুলনামূলক ফলাফল

টাকা তুলিয়া বিশেষ কোন একটি সরকারী ব্যয় করিলে যে প্রভাব দেখা দিবে, তাহার তুলনায় ঋণ করিয়া সেই ব্যয় করিলে উহাতে অধিকতর প্রসারশীল প্রভাব দেখা দিবে। এই পার্থক্যের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। প্রথমত, ঋণদান স্বেচ্ছাকৃত হওয়ায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যে টাকা সঞ্চিত বা জমানো অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, একমাত্র তাহারাই সরকারের হাতে আসিতেছে, দেশের ভোগ-ব্যয় সংকুচিত হইতেছে না। দ্বিতীয়ত, ঋণদান স্বেচ্ছাকৃত হওয়ায় এবং লোকের হাতে নীট সম্পদ কমে না বলিয়া লোকের সঞ্চয় ও কর্মোদ্যমের উপর কোন বিরূপ প্রভাব ইহাতে দেখা দেয় না। করের ক্ষেত্রে এই বিরূপ প্রভাব নিশ্চয় কিছুটা দেখা দিবে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে, সরকারী ঋণের বৃদ্ধি সরকারের আর্থিক স্থায়িত্বের উপর আস্থা কমাইয়া দেয়, ফলে দেশে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বেসরকারী ব্যয় কমিয়া যাইতে পারে।

সরকারী ঋণ গ্রহণের প্রভাব মূলত নির্ভর করে কোন্ ধরনের উৎস হইতে ঋণ তোলা হইতেছে উহার উপর। ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঋণ তোলা হইলে, ইহা স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া, সাধারণক্ষেত্রে ভোগব্যয় না কমিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু রাষ্ট্র যদি নৈতিক চাপ দেয় (যেমন যুদ্ধের সময়), অথবা ঋণপত্রগুলিকে খুবই আকর্ষণীয় ও সুবিধাজনক শর্তে ঘোষণা করে, তবে ভোগব্যয় অল্প কিছু কমিতে পারে। শুধু তাহাই নহে। ইহাতে সরকারী বিনিয়োগ ব্যয়ও বিশেষ প্রভাবিত হইবে না। কারণ বেশির ভাগ সরকারী ঋণপত্রই কেনা হইবে ব্যক্তির অলস সঞ্চয় হইতে। তবে বেসরকারী বণ্ডগুলির সঙ্গে সরকারী বণ্ডের প্রতিযোগিতা কিছুটা দেখা দিবে না এমন বলা চলে না ; কারণ ব্যক্তি নিজের সঞ্চয় হইতে সরকারী বণ্ড অথবা বেসরকারী বণ্ড কিনিবে। এই প্রতিযোগিতার দরুণ উভয়কেই সুদ বাড়াইতে হইতে পারে। এইরূপে দেশে সুদের হার বাড়িলে বিনিয়োগ কিছুটা সংকুচিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিনিয়োগ কতটা বাধা পাইবে তাহা নির্ভর করে সুদের হারে বৃদ্ধির পরিমাণের উপর এবং বিনিয়োগের সুদগত স্থিতিস্থাপকতার উপর।

ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণ তোলা হইলে

ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ করিলে (যেমন বীমা কোম্পানী, ইস্যু হাউস প্রভৃতি) দেশের বিনিয়োগব্যয় ততটা বেশি প্রভাবিত

হয় না। এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের সঞ্চিত নগদ টাকা আংশিক পরিমাণে ছাড়িয়া দিয়া সরকারী বণ্ড কিনিবে বটে; কিন্তু নিশ্চয় অন্যান্য ঋণপত্র না কিনিয়া উহাদের পরিবর্তে তাহারা সরকারী বণ্ডে টাকা খাটাইতে চাহিবে। সুতরাং সুদের হারে বৃদ্ধির দরুণ বিনিয়োগের উপর বিরূপ প্রভাব পাড়বে। এই অবস্থায় সরকারী ঋণ উঠান-র আর একটি সংকোচনশীল প্রভাব হইল এই যে, সরকারী বণ্ড কেনার ফলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা দেশে কমিয়া যায়।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে

ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে উহার ফলে দেশে তীব্র ঋণপ্রসারের সম্ভাবনা। ইহা দুইটি উপায়ে সম্ভবপর: (১) সরকারী বণ্ড কেনার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে ব্যক্তিরা ঋণ লইতে পারে, অথবা, (২) রাষ্ট্র ব্যাঙ্কগুলির নিকট সরাসরি বণ্ড বিক্রয় করিতে পারে। ইহাদের যে কোন উপায় গৃহীত হউক না কেন সরকার এই ঋণ বা ক্রয়শক্তি হাতে পায় অতিরিক্ত ব্যাঙ্ক-ঋণ সৃষ্টি করিয়া। তাই ইহার প্রভাব প্রসারশীল। ইহা সম্ভব হয় যদি দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে অধিক জমা থাকে এবং অন্যান্য ঋণ না কমাইয়াই তাহারা সরকারী বণ্ড ক্রয় করিতে পারে।

ব্যাঙ্কের নিকট হইতে

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বণ্ড বিক্রয় করিয়া যদি রাষ্ট্র ঋণ-গ্রহণ করে তবে উহাও তীব্রভাবে প্রসারমূলক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের খাতায় আমানত লিখিয়া রাখিয়া সরকারকে ঋণ দেয়, এই ক্রয়শক্তি রাষ্ট্র দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়ে ব্যয় করিতে পারে। এই ক্রয়শক্তি একেবারে নূতন তৈয়ারী করা হইল, সমাজের অন্য কোন অংশ এই ক্রয়শক্তির ব্যবহার পরিত্যাগ করে নাই। নূতন-সৃষ্ট এই ক্রয়শক্তি সরকার ব্যয় করিলে উহা আমানতের রূপে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আলমারিতে পৌঁছায়, উহার ভিত্তিতে ব্যাঙ্কগুলি আবার ঋণপ্রসার সুরু করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সামগ্রিক ব্যয়ের উপর সরকারী ঋণের মোট প্রভাব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ভোগব্যয় হ্রাসের সম্ভাবনা খুব কম। বিনিয়োগব্যয়ের উপর ইহার প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি কারণ ব্যক্তিদের নিকট বণ্ড বিক্রয়ের ফলে তাহাদের টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হওয়ার সুযোগ পায় না, নূতন শেয়ার বা বণ্ডের বাজারে তাহাদের খাটান টাকার পরিমাণ কমিয়া

সামগ্রিক প্রভাব আলোচনা

যায়। একটি পরোক্ষ পথ আছে যাহা দিয়া সমাজের অর্থনৈতিক দেহে সরকারী ঋণ প্রত্যক্ষভাবে সংকোচনশীল প্রভাব আনিতে পারে। সরকারী ঋণ বৃদ্ধি পাইলে ভবিষ্যতে করবৃদ্ধির বা জাতীয় দেউলিয়াবস্থায় ভয়ে বর্তমানে বেসরকারী বিনিয়োগব্যয় ও ভোগব্যয় দুই-ই কমিতে পারে।

তবে সাধারণক্ষেত্রে সরকারী ঋণের সংকোচনমূলক প্রভাব কম বলিয়া ঋণ করিয়া সরকারী ব্যয়-বৃদ্ধির নীট প্রভাব নিশ্চয় প্রসারশীল। কর-আদায় করিয়া ব্যয়ের তুলনায় ঋণ করিয়া ব্যয়ের প্রভাব অনেক বেশি প্রসারমূলক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভোগব্যয়ের উপর সরকারী ঋণ তোলার কোন প্রভাব নাই, এবং বিনিয়োগের উপরও প্রভাব কম। অথচ, অপরপক্ষে, কর-অরোপের ফলে সামগ্রিকভাবে সংকোচনমূলক প্রভাব নিশ্চয় বেশি। সরকারী ঋণের ফলে দেশের সংকোচনশীল প্রভাব একমাত্র তখনই দেখা দিতে পারে যখন লোকের মনে সরকারী আর্থিক স্থায়িত্ব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও আস্থাহীনতা আসে। উপসংহারে, আমরা বলিতে পারি যে, সরকারী ঋণের প্রসারমূলক ফল সেই ঋণ ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল, কেবলমাত্র ঋণ-উঠান-র উপরই অর্থ নৈতিক প্রসার নির্ভর করে না।

নীট প্রভাব প্রসারশীল

(২) বর্তমান ঋণ ও তাহার মালিকানার ফলাফল (Economic effects of owning and servicing the debt) ঃ

সরকারী ঋণ-উঠান এবং সেই ঋণের টাকায় সরকারী ব্যয়—এই উভয়ের ফলাফল হইতে পৃথক করিয়া বিচার করা দরকার যে, দেশের মধ্যে কিছু পরিমাণ সরকারী ঋণ থাকিলে উহার অর্থনৈতিক ফলাফল কি। এই সরকারী ঋণপত্রগুলি হইল একপ্রকার দাবি বা অধিকার। সরকারের উপর, অর্থাৎ দেশের করদাতাদের উপর এই সকল বণ্ডক্রেতাদের একরূপ দাবি বা অধিকার আছে। মালিকদের দিক হইতে দেখিতে গেলে বণ্ডগুলি ব্যক্তিগত সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহারা জাতীয় সম্পদ নয়, কারণ ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে তাহাদের মূল্য করদাতাদের বিরুদ্ধে তাহাদের দাবি হিসাবে খণ্ডিত হইয়া যায়। যতদিন দেশের অভ্যন্তরে এই ঋণ থাকে ততদিন ইহা দেশের প্রকৃত সম্পদে হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রকাশ করে না। তবুও সারা দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর এইরূপ সরকারী ঋণের গুরুত্ব কম নয়।

বণ্ডের পরিমাণ বাড়িলে বা কমিলে উহা জাতীয় সম্পদে হ্রাস-বৃদ্ধি প্রকাশ করে না

দেশে সরকারী ঋণ থাকার সাধারণ প্রভাব হইল ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া। ইহার কারণ হইল যে, বণ্ড হাতে থাকিলে ব্যয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। ইহাতে অর্থনৈতিক দেহে প্রসারশীল প্রভাব ঘটে। বিনিয়োগের দিক হইতেও ইহার প্রভাব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশে প্রচুর পরিমাণ সরকারী ঋণপত্র থাকায়, রাষ্ট্র সুদের হার বাড়াইতে অনিচ্ছুক থাকে, ঋণপত্র না থাকিলে যে সুদ থাকিত, তাহাপেক্ষা বাস্তবে দেশে সুদের হার কম থাকিতে পারে। ইহাতে বিনিয়োগের প্রসার ঘটার সম্ভাবনা। অপরপক্ষে, ঋণের দরুণ সরকারের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব সম্পর্কে আস্থাহীনতার মনোভাব দেখা দিলে উদ্যোক্তারা দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা খাটাইতে অনিচ্ছুক হইতে পারে।

সমাজে এত ঋণপত্র থাকার ফলে ইহাদের মালিকদের সুদ দিবার দায়িত্ব সরকারের উপর আসিয়া পড়ে। করের প্রধান ভার হইল সুদ দিবার জন্য দেশের অর্থনীতিকে যে ধরনের চাপ বহন করিতে হয়। সাধারণত সুদ দেওয়া হয় কর আদায় করিয়া। ইহার ফলে অনেক অবাঞ্ছনীয় ফলাফল দেখা দিতে পারে। যেমন, উহাতে আয়ের বণ্টন-কাঠামো পরিবর্তিত হইবে। সকল দেশের দিকে তাকাইলেই দেখা যায় যে, বণ্ডগুলি অতি অল্পসংখ্যক ধনী ব্যক্তির মালিকানায় কেন্দ্রীভূত (আমেরিকায় ৬২% বণ্ড মাত্র ১০% ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ); অথচ দেশের করগুলি, এমন কি ক্রমবর্ধমান করগুলিও, গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাত হইতে টাকা তুলিয়া লয়। এইরূপ ইহা আয়-বৈষম্য বাড়াইয়া তুলিতে পারে, ফলে সমাজের মোট ভোগব্যয় হ্রাস করিয়া আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর কমাইয়া দিতে পারে।

সুদ প্রদানের ভার কাহার উপর

এই অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, বণ্টনগত কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না যদি ব্যক্তিরা যে অনুপাতে কর দেয় সেই অনুপাতে বণ্ডের মালিকানা তাহাদের হাতে থাকে। কিন্তু সঠিক কথা বলিতে গেলে তাহা সম্ভব নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। ইহা সম্ভব নয় কারণ, প্রথমত, বণ্ডক্রেতারা সমজাতীয় অর্থনৈতিক দল নয় যাহাদের উপর করের জাল ফেলিয়া একত্র ছাঁকিয়া তোলা যায়। দ্বিতীয়ত, বণ্ডের মালিকানা এবং করের ভিত্তি সদাসর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে। এই পদ্ধতি বাঞ্ছনীয় নয়, তাহার কারণ হইল, সুদ দিবার উদ্দেশ্যে কর আরোপন ও আদায়ের পথে বহুপ্রকার

বণ্ডের ও করের সমবণ্টন হইলেও কিছু কিছু ভার থাকে

সংঘাত (frictions) দেখা দেয়। উচ্চ হারে আরোপিত কর কর্মোদ্যম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কমাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতির সংখ্যাও বাড়াইয়া দেয়। তাহা ছাড়া, কোন গণতান্ত্রিক দেশে করের ভার বাড়িলে রাজনৈতিক চাপ এবং গণ-অসন্তুষ্টি বাড়ে বই কমে না। এই সকল চাপ ও টানাপোড়েনের দরুন বণ্ডের মালিকানার সমান অনুপাতে কর-ভারের বণ্টন ঘটিলেও দেশের সুস্থ অর্থনৈতিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। প্রতি বৎসর ইহারা যে অনিশ্চয়তা ও সংঘাত সৃষ্টি করে, তাহার ভারও কম নয়।

দেনা-পাওনার মালিক এক হইলে সুদের দরকার কি

কোন কোন ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, যদি করদাতা হিসাবে কর দিয়া একই ব্যক্তি বণ্ডদাতা হিসাবে উহা সুদের আকারে ফেরত পায় তবে সুদ না দিলেও কোন ক্ষতি নাই, সুদ দেওয়া একেবারে স্থগিত রাখিলেও চলে। এই প্রস্তাবের অর্থ হইল জাতীয় ঋণের পরিমাণ প্রতি বৎসর কেবল বাড়িয়াই চলিবে। তাহা ছাড়া, সুদ না থাকিলে সরকারের পক্ষে বণ্ড বিক্রয় করিয়া ঋণ তোলা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করা যায় না।

টাকা বাড়াইয়া সুদের ভার কমানো যায়

করভার কমাইবার জন্য অনেক ধনবিজ্ঞানী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কৃত্রিম উপায়ে বণ্ডের বাজার বাড়াইয়া তুলিয়া সরকার সুদের হার কম রাখিতে পারেন। অর্থাৎ রাষ্ট্র দেশে টাকার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়া চলিবেন। এই নীতি সরকারের পক্ষে বিশেষ বিপদজনক হইতে পারে। দেশে কম সুদ এবং অজস্র সরকারী বণ্ড থাকিলে, সরকারের পক্ষে ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক নীতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে ঋণপ্রসারের উপযুক্ত প্রভূত পরিমাণ সরকারী বণ্ড থাকে।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে, আভ্যন্তরীণ ঋণের সুদের ভার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সাহায্য না করিয়া বাধারই সৃষ্টি করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৩) ঋণ পরিশোধের অর্থনৈতিক ফলাফল (Economic effects of debt repayment) :

সমাজে মোট সরকারী ঋণের পরিমাণ কমাইতে হইলে কর বা অন্য

রেভিনিউ খাতে সরকারী আয়ের পরিমাণ সরকারী ব্যয়ের তুলনায় বেশি করা দরকার। ঋণ পরিশোধ অনেক রূপ লইতে পারে, যেমন ফলপ্রসূকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের হাত হইতে সরকারী বণ্ড কিনিয়া লইয়া টাকা মিটাইয়া দেওয়া, অথবা ফলপ্রসূকাল শেষ হওয়ার পূর্বেই বণ্ড-বাজার হইতে উহাদের কিনিয়া লওয়া।

উদ্বৃত্ত বাজেট খাটানো দরকার

ঋণ-পরিশোধের অর্থনৈতিক ফলাফল অনেকটা ঋণ-গ্রহণের বিপরীত। বণ্ড-ক্রেতাদের দাম মিটাইয়া দেওয়ায় কিছুটা প্রসারমূলক প্রভাব দেখা দিবে, কারণ ইহার ফলে বণ্ড-ক্রেতাদের সম্পত্তি অধিকতর তরল আকার ধারণ করে। কিন্তু এই প্রভাব বিশেষ কিছু শক্তিশালী হইবে না। বণ্ড বিক্রয় করিয়া ব্যক্তি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হাতে যে-টাকা আসিল তাহা সমাজের সঞ্চয়ের অংশ, এই সঞ্চয় দ্বারা তাহারা আবার নূতন ঋণপত্র ক্রয় করিবে। বেসরকারী বণ্ডের জন্য চাহিদার এই রূপ বৃদ্ধি সুদের হার কমাইয়া দিবে এবং বাজারকে তেজী করিয়া তুলিয়া কিছুটা বিনিয়োগ বাড়াইতে পারে।

ঋণ গ্রহণের বিপরীত প্রভাব

ব্যাঙ্ক-কর্তৃক রক্ষিত ঋণপত্র কিনিয়া লইলে উহার প্রসারশীল প্রভাব আরও কম বলিয়া মনে হয়। ব্যাঙ্কগুলির হাতে পূর্ব হইতে বেশি রিজার্ভ থাকিলে বণ্ড কিনিয়া লওয়ায় আমানত কমিয়া গিয়া নগদ টাকার পরিবর্তন বাড়িয়া গেল মাত্র। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়িলে ঋণ সৃষ্টি কিছুটা পরিমাণ বাড়িতে পারে, যদি অবশ্য পূর্বে তাহারা নগদ টাকার পরিমাণ কম থাকায় ঋণপ্রসারের সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতের ঋণপত্রগুলি সরকার কিনিয়া লইলে উহার কোনরূপ প্রসারশীল প্রভাব নাই।

অপরপক্ষে, ঋণ পরিশোধের উপযুক্ত পরিমাণ টাকা সরকারের হাতে তুলিয়া আনার জন্য যে-পরিমাণ কর বসাইতে হইবে, তাহার সংকোচনশীল প্রভাব অনিবার্য, কারণ এইরূপ করের ফলে ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ-ব্যয় উভয়ই কমে। তাই কর আদায় ও ঋণ পরিশোধের মিলিত প্রভাব সংকোচনমূলক হইতে বাধ্য।

আধুনিক কালে, অবশ্য সরকারী ঋণ পরিশোধের ব্যাপারটা নিতান্ত ইচ্ছা

বা খেয়াল-খুশির ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোনরূপ ফলপ্রসূকাল উল্লেখ না করিয়া সরকারী বণ্ড বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া আজকাল রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুনরায় ঋণগ্রহণ এবং রূপান্তরণে (Refunding and conversion) সুবিধা থাকায় ঋণের পরিশোধ অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা চলে। এই অবস্থায় তাই, কেহ কেহ বলেন যে, সরকারী ঋণের ঋণমূল (principal) আর বাস্তব নয়, ইহা নিছক কল্পনা ও অবাস্তব অনুমানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত ভার হইল সুদ প্রদানের এবং এই ভারও নিতান্ত আপেক্ষিক ব্যাপার, ইহা প্রধানত নির্ভর করে (ক) জাতীয় আয়ের পরিমাণ, (খ) কর-কাঠামোর প্রকৃতি এবং (গ) দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বণ্ড-মালিকানার বণ্টনের উপর।

আধুনিককালে ইহাকে আর ভার বলিয়া কেন মনে হয় না

বাস্তবপক্ষে, ঋণভারের গভীরতা প্রধানত নির্ধারণ করা যায় জাতীয় আয়ের স্তর অনুযায়ী। ইহা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অন্তত যখন আমরা ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে জাতীয় আয় বাড়াইবার কথা বলি। কারণ জাতীয় উন্নয়নের এই কার্যসূচী সফল হইলে সরকারী ঋণের মূল-পরিমাণ এবং বাৎসরিক সুদের পরিমাণ নিজের আয়তন বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভার কমাইবার ব্যবস্থা সকলের অলক্ষ্যে আপনা-আপনি করিতে থাকে। জাতীয় আয় অধিকতর বৃদ্ধি পাইলে উহার সহিত ঋণের অনুপাত হ্রাস পায়। ঋণভারের এই হ্রাস ব্যক্তিদের মধ্যে কিরূপে বণ্টিত হয় তাহা নির্ভর করে আয়-বণ্টনের উপর এবং উহার সহিত ঋণগ্রহণ ব্যবস্থা, করপাতের ধরন, সুদ প্রদানের বণ্টন-কাঠামো প্রভৃতি তুলনা করিয়া। আর ইহা তো স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঋণ-পরিমাণের তুলনায় জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির হার বেশি হইলে আসল ভার হ্রাস পায়।

আসল কথা জাতীয় আয়ের সহিত ইহার অনুপাত কি

সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার যে, জাতীয় ঋণের আয়তন ও গঠন (size and composition) পরিবর্তিত হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণই বদ্‌লাইয়া যাইতে পারে। ব্যক্তি ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে বণ্ডগুলি ব্যাঙ্কের হাতে পৌঁছিলে প্রসারমূলক ধারা শুরু হইতে পারে। যে-কোন সূত্র হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট পৌঁছাইলে উহার প্রসারশীল প্রভাব আরও

ঋণের আয়তন ও গঠন বদলাইলে জাতীয় আয় প্রভাবিত হয়

বেশি। বিপরীত পক্ষে, বণ্ডগুলিকে অপসরণ করিলে দেশে সংকোচনশীল প্রভাব বাড়িয়া যাইবে।

আন্তর্জাতিক ঋণ পরিশোধ (International debt repayments) :

আধুনিক জগতে কোন দেশ একক ও বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচিয়া থাকে না, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাহাকে অর্থ নৈতিক লেনদেন করিতে হয়। একটি দেশের জাতীয় ঋণ অন্য দেশের সরকারকে কিরূপে পরিশোধ করা চলে? বহু বিভিন্ন কারণে একটি দেশের সরকার অন্য দেশের সরকারকে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে, যেমন (১) যুদ্ধের পরে বিজিত দেশের সরকার বিজয়ী দেশের সরকারকে বাধ্যতামূলক ক্ষতিপূরণ দান করিতে পারে (reparations); অথবা (২) উন্নয়নমূলক কোন কার্যে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে এইরূপ ঋণ পরিশোধের সময় বিশেষ কতকগুলি অর্থ নৈতিক সমস্যা দেখা দেয় যাহাদের আমরা অপসরণ সমস্যা (transfer problem) বলিয়া থাকি।

ক্ষতিপূরণ দান বা ঋণ পরিশোধের দুইটি স্তর প্রধানত লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, দেনদার দেশটিকে কর আরোপণ দ্বারা বা মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইয়া কিছু পরিমাণ টাকা তুলিতে হইবে। ইহাতে দেনদার দেশটিতে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইলে জাতির আসল আয় কমিয়া যাইবে এবং নিম্ন আয় সম্পন্ন শ্রেণীগুলি তুলনামূলকভাবে অধিকতর ঋণ পরিশোধের ভার বহন করিতে বাধ্য হইবে।

কিরূপে টাকা তোলা যায়

দ্বিতীয় সমস্যা হইল, ঐ দেনদার দেশটি যে-টাকা এইরূপে তুলিয়া লইল তাহাকে মহাজনী দেশটির টাকায় রূপান্তরিত করা। ইহাকেই বলে অপসরণ সংকট বা transfer crisis। যেমন জার্মান সরকার কোন উপায়ে নিজের দেশের মধ্য হইতে এই টাকা তুলিল। এখন তাহার নিকট সমস্যা হইল কিরূপে সে জার্মানীর মার্ককে বৃটেনের পাউণ্ডে রূপান্তরিত করিতে পারে। ঠিক কিরূপে জার্মানীর মার্ক বৃটেনের পাউণ্ডে পরিণত হইয়া বৃটেনে পৌঁছে এবং এই পথে দেনদার দেশটিকে কিরূপ ভার বহন করিতে হয় তাহা লইয়া প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। ঋণ পরিশোধ

কিরূপে সেই টাকার রূপান্তর ঘটানো যায়

সম্ভব করিবার জন্য জার্মানীকে রপ্তানি-আধিক্য (export surplus) ঘটাইতে হইবে, অর্থাৎ আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাড়াইয়া বৃটেনের পাউণ্ড আয় করিতে হইবে এবং এইরূপে পাউণ্ড আয় করিয়া উহার দ্বারা বৃটিশ সরকারের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

লর্ড কেইন্‌সের মতে এইরূপ রপ্তানি-আধিক্য ঘটাইতে হইলে রপ্তানি দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমাইতে হইবে। তাহা না হইলে মহাজনী দেশের ক্রেতারা উহাদের ক্রয় বাড়াইবে কেন? দাম কতটা কমাইলে এইরূপ রপ্তানি-আধিক্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে তাহা নির্ভর করে বিদেশের বাজারে জার্মান-দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। এইরূপ দামস্তর কমাইবার দরুন বাণিজ্যের পণ্য-হার (the barter terms of trade) জার্মানীর প্রতিকূলে আসিবে। ইতিমধ্যে যদি আমদানি দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যায় তাহা হইলে জার্মানীর বাণিজ্য-হার আরও বেশি প্রতিকূল হইয়া পড়ে। ইহার অর্থ হইল যে, তাহাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আমদানি পাইতে হইলে পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ রপ্তানি করিতে হইতেছে। কর আরোপণ বা মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবার সময় সে প্রথম স্তরের ভার (primary burden) বহন করিয়াছিল; এখন সে বহন করিতেছে দ্বিতীয় স্তরের ভার (Secondary burden)। তাহার জাতীয় আয়ের এক অংশ বিদেশীদের নিকট শুধু পাঠাইয়া দিলেই চলে না, বাণিজ্য-হার প্রতিকূল হওয়ায় প্রতি-ইউনিট আমদানির জন্য পূর্বাপেক্ষা বেশি দ্রব্য তাহাকে রপ্তানি করিতে হয়। এই দ্বিতীয় স্তরের ভারকেই বলে অপসরণের ক্ষতি (transfer loss)।

কেইন্‌সের মত: দাম কমাইয়া রপ্তানি বাড়াইতে হইবে

অধ্যাপক ও'লীন (Ohlin) অবশ্য এই মত মানিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে রপ্তানি-আধিক্য ঘটাইবার জন্য জার্মানীর আভ্যন্তরীণ দামস্তর কমাইবার কোন প্রয়োজন নাই। এই কারণে ঋণ-পরিশোধের কোন দ্বিতীয় স্তরের ভার দেখা দেয় বলিয়া তিনি মনে করেন না। তাঁহার মতে, সংশ্লিষ্ট দুইটি দেশের ক্রয়শক্তির ক্ষমতাতে পরিবর্তনের কথা কেইন্‌স সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছেন। ক্ষতিপূরণ দানের তাৎপর্য হইল জার্মানী হইতে ক্রয়শক্তি বিদেশে হস্তান্তরিত করা। এইরূপ ক্রয়শক্তি হস্তান্তরিত হইলে জার্মানীর অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যায়, অথচ বিদেশের অধিবাসীদের ক্রয়শক্তি

ও'লীনের মত: দাম না কমাইলেও রপ্তানি বাড়িতে পারে

বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে বিদেশী দ্রব্যের জন্য জার্মানীর চাহিদা অর্থাৎ জার্মানীর আমদানি হ্রাস পাইবে, অথচ অপরদিকে বিদেশী অধিবাসীদের চাহিদা অর্থাৎ জার্মানীর রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে পুরাতন দামেই জার্মানীর রপ্তানি বাড়িবে ও আমদানি কমিবে, ফলে জার্মানীর পক্ষে রপ্তানি-আধিক্য সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে। বাণিজ্যের পণ্য-হার জার্মানীর প্রতিকূলে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই এবং কোনরূপ 'অপসরণের ক্ষতি'ও ঘটিবে না।

অনেকে বলেন যে, প্রকৃত সত্য এই উভয় মতের মধ্যে নিহিত আছে। ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই যে, উভয় দেশের পারস্পরিক ক্রয়শক্তিতে কিছুটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই আসিবে যাহাতে কিছু পরিমাণ রপ্তানি-আধিক্য দেখা দিতে পারে। তবে ইহাও ঠিক যে, উভয় দেশের দামস্তরে এইরূপ পরিবর্তন ঘটা নিশ্চয়ই সম্ভব, দেনদার দেশটির বাণিজ্য-হার প্রতিকূল হওয়াও সম্ভবপর। তাই, দ্বিতীয় স্তরের ভার নিশ্চয় কিছুটা দেখা দিতে পারে।

দুইটি মত মিলিয়াই প্রকৃত সত্য পাওয়া যায়

বাণিজ্য-হারে পরিবর্তন কতদূর দেখা দিবে তাহা অনেক প্রকার শক্তির উপর নির্ভর করে, যেমন পারস্পরিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, জার্মানীতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, দেশে ঋণ সংকোচনের প্রয়োজনীয়তা, বিদেশে শুল্কের পরিমাণ প্রভৃতি। বিদেশে শুল্কের পরিমাণ বাড়াইলে দেনদার দেশটিকে দাম বেশি পরিমাণে কমাইতে হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাজনী দেশের সরকার যদি নিজ দেশের দাম ও আয়স্তর বাড়াইতে বাধা দেয় তবে দেনদার দেশটিতে দাম ও মজুরি বেশি পরিমাণ কমাইতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই, তাই ঋণ পরিশোধের ভার দেনদার দেশটিকে অধিক পরিমাণে বহন করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। বিদেশ হইতে ঋণ পরিশোধ পাইলে মহাজনী দেশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এইরূপ আলোচনা অনেক ধনবিজ্ঞানী করিয়াছেন। দেনদার দেশটির রপ্তানি বাড়িবে এবং মহাজনী দেশটির আমদানি বাড়িবে ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু ইহাতে মহাজনী দেশটির শিল্প

মহাজনী দেশের উপর ঋণ পরিশোধের বিরূপ প্রভাব

ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি নিজের দেশে ও বিদেশে কি পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারিবে না? ইহাতে কি মহাজনী দেশটিতে বেকারি ও শিল্প-সংকোচন দেখা দিবে না? তাই কয়েকজন ধনবিজ্ঞানী মহাজনী দেশটির উপর ঋণ পরিশোধের বিরূপ প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

অবশ্য মনে রাখা দরকার যে সর্বক্ষেত্রেই এরূপ যুক্তি মানিয়া লওয়া চলে না। দেনদার দেশটির পণ্যসামগ্রী যে সব সময়ই মহাজনী দেশটির দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক হইবে উহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেনদার দেশটি কাঁচামাল রপ্তানীতে পারদর্শী হইতে পারে এবং মহাজনী দেশটি শিল্পপ্রধান দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষ হইতে পারে। মহাজনী দেশটির ক্রয়শক্তি বাড়িলে উহা অধিক পরিমাণে দেনদার দেশটির জিনিস কিনিয়া লইতে পারে; এইরূপ ক্ষেত্রে মহাজনী দেশের অভ্যন্তরে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না।

আধুনিক যুগে ইহা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক ঋণ লেনদেনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পুনর্গঠন ও লেনদেনের কাজে ঋণ-প্রদানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহ গঠিত হইয়াছে। এই সকল ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে কিস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে (instalment), ইহাতে মনে হয়, দেনদার দেশগুলির উপর ঋণ-পরিশোধের অত্যধিক চাপ এবং মহাজনী দেশগুলির উপর উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিতে পারিবে না।

অনুশীলনী

1. What are public debts? How do they affect our economic life ?
2. What are the different forms of public debts? Suggest measures by which the burden of public debt may be reduced.
3. Discuss the purposes for which public debts may be legitimately incurred by the Government.
4. Distinguish between the burden of an internal and external loan.
5. Why it is said that an internally held debt has no burden at all?
6. Discuss the economic effects of government borrowing, interest-payments and the repayment of government loans.
7. What are the problems connected with the repayment of intergovernmental debts?

১৭

ফিস্‌কাল নীতি ও বাজেট

Fiscal Policy and budget

সরকারের আয় ও ব্যয়ের ফলে জাতীয় আয়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের স্তর বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। পূর্বে রাষ্ট্রের কর, ঋণ ও ব্যয় প্রভৃতির প্রভাব মূলত বণ্টনের দিক হইতে আলোচনা করা হইত, কিন্তু বর্তমানে দেশের উৎপাদন ও আয়স্তরের উপর ইহাদের প্রভাব অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইতেছে।

কর, ঋণ ও ব্যয়সংক্রান্ত রাষ্ট্রের সকল নীতিকে একত্রে ফিস্‌কাল নীতি (Fiscal Policy) বলা হয়। দেশের অর্থনৈতিক নীতির (economic policy) যে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ধরিয়া লওয়া হয় তাহাকে সফল করিয়া তোলাই ফিস্‌কাল নীতির কাজ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকে। উন্নত দেশসমূহের লক্ষ্য হইল পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা এবং ঐ স্তরে স্থায়িত্ব বজায় রাখা, আবার অনুন্নত দেশসমূহের লক্ষ্য হইল দেশের উৎপাদনে ও টেক্‌নলজিকাল কাঠামোতে এমন পরিবর্তন আনা যাহাতে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধি ঘটিতে পারে।*

ফিস্‌কাল নীতি কাহাকে বলে

ফিসকাল নীতির মধ্যে তাই সকল প্রকার সরকারী ব্যয় ও আয় আলোচনা করা দরকার; চল্‌তি দ্রব্য ও কাজকর্মের উপর সরকারী ব্যয়, ঋণদান, হস্তান্তর-ব্যয় স্থায়ী ধরনের মূলধন গঠন এবং দ্রব্যসামগ্রী মজুত করা—

*"Fiscal policy is concerned with the manner in which all the different elements of public finance, while still primarily concerned with carrying out their own duties (as the first duty of a tax is to raise revenue) may collectively be geared to forward the aims of economic policy." Mrs. Ursula Hicks, *Public Finance*, P 269.

"a policy under which the Government uses its expenditure and revenue programmes to produce desirable effects and avoid undesirable effects on the national income, production and employment." Arther Smithies, article in *Survey of contemporary Economics*, P 174.

আবার অপরদিকে কর হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ, সম্পত্তি হইতে আয়, ঋণ করা —সবকিছুই ফিস্‌কাল নীতির অন্তর্ভুক্ত। ফিস্‌কাল নীতির এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষা করাও এই নীতির অন্তর্ভুক্ত; প্রকৃতপক্ষে এই ব্যালান্সই ফিস্‌কাল নীতির প্রাণ। আয়ের সকল দিক এবং ব্যয়ের সকল দিক মিলিয়া সরকারী ফিস্‌কাল নীতি দেশের মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগে এমন পরিবর্তন আনে যে, দেশের উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান ও দামস্তর বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। আধুনিককালে তাই ফিস্‌কাল নীতির গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ফিস্‌কাল নীতির লক্ষ্য (Objectives of Fiscal Policy)

সরকারী ফিস্‌কাল নীতি বাস্তবে রূপ পায় বাজেট-গঠনের মধ্য দিয়া; রাষ্ট্রের আয়, ব্যয়ের পরিমাণ ও উহাতে পরিবর্তন সরকারী ফিস্‌কাল নীতিকে প্রকাশ করে। সরকারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য সাধনের উপযোগী 'পদ্ধতিই' মূলত ফিস্‌কাল্ নীতি, কিন্তু অর্থনৈতিক লক্ষ্য ছাড়াও বাজেটের মাধ্যমে সরকারের আরও অনেক প্রকার লক্ষ্য সফল করার চেষ্টা হয়। সরকারী নীতির লক্ষ্য হিসাবে আমরা কয়েকটিকে উল্লেখ করিতে পারি, যেমন জাতীয় নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি, এবং রাজনৈতিক স্থায়িত্ব। এই সকল লক্ষ্যের মধ্যে কয়েকটি পরস্পরের প্রতিযোগী, আবার কয়েকটি পরস্পরের পরিপূরক।

অনেকে মনে করেন সরকারী বাজেট-নীতির একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত জাতীয় নিরাপত্তা। ইহা কিন্তু সত্য নয়। কারণ তাহা হইলে আরও বেশি টাকা, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সকল আয় দেশরক্ষাখাতেই খরচ করা দরকার। তাহা না করিয়া, কিছু টাকা, অন্যান্য খাতে ব্যয় করিয়া রাষ্ট্র কিছু ঝুঁকি বহন করে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঝুঁকি না লইলে অন্যান্য লক্ষ্য একান্তই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে লোকের মনে এইরূপ ধারণা ছিল যে, অর্থনৈতিক প্রগতি ও সামাজিক নিরাপত্তা একই সঙ্গে অগ্রসর হয়, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা উন্নততর করিতে পারিলে অর্থনৈতিক প্রগতির হারও দ্রুততর হয়। আজকাল কিন্তু ইহাদের এই সমমুখী অভিযান স্বীকার করা হয় না। প্রগতি ও নিরাপত্তার নীতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে, একই সঙ্গে

দেশরক্ষা, প্রগতি, নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব

উভয়ের দাবি পূরণ করা সম্ভব না-ও হইতে পারে। তৃতীয়ত, সকল দেশের রাষ্ট্রেরই নিজের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষা করা অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পরিবর্তনের মাত্রা বেশি হইলে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব সাধারণত রক্ষা পায় না। সরকারী সকল কাজকর্মই প্রধানত এই রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, অন্যান্য সকল লক্ষ্যই এই প্রধান লক্ষ্যকে অনুসরণ করে।

এই সকল লক্ষ্য ছাড়াও সরকারের অর্থনৈতিক যে-সকল লক্ষ্য থাকিতে পারে তাহাদের আলোচনা দরকার, কারণ ফিস্‌কাল নীতি প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় এই সকল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই। সরকারের বহু অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকিতে পারে। প্রথমত, ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের ঐতিহ্য অনুযায়ী আমরা দেখিতে পারি যে, ইহার লক্ষ্য হইল সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ (maximum economic well-being)। অর্থনৈতিক কল্যাণ-এর ধারণা সম্পর্কে বহুপ্রকার তত্ত্বগত ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিলেও ইহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি দেশে এবং সারা বিশ্বে আধুনিক কালে পূর্ণ কর্মসংস্থানকে অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইতেছে। দেশে অনিচ্ছামূলক বেকারি না থাকার অবস্থাকেই পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তর বলা হয়।*

১। সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধি
২। পূর্ণ কর্মসংস্থান
৩। আসল আয়ে বৃদ্ধি

তৃতীয়ত, অনেকে বলেন যে, দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান অপেক্ষা আসল আয়ের বৃদ্ধিকেই প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা উচিত। মূলধন-সঞ্চয়ের এবং টেকনিকাল জ্ঞান-বৃদ্ধির হারের উপর সরকারী নীতির সুপ্রভাব বজায় রাখাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন, এমনভাবে সরকারী করনীতি রচনা করা প্রয়োজন যাহাতে দেশে মূলধন-সঞ্চয়ের সর্বোত্তম (optimum) হার পাওয়া যায়, ইহা যে সর্বাধিক হার হইতে হইবে, তাহার কোন কথা নাই।

* এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে কেবলমাত্র পূর্ণ কর্মসংস্থানকে গণ্য করা চলে না, কারণ দেশে গড় আসল মজুরি কিরূপ, ইহ'তে ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির হার কত, এই সকল বিষয়ে ঘোষণা না থাকিলে নিছক বেকারী না থাকাকেই অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে ধরা চলে না। আয়ের বণ্টন কিরূপ, অর্থনৈতিক কল্যাণের স্তর কিরূপ এই সকল না বলিয়া কেবলমাত্র পূর্ণ কর্মসংস্থান ঘটলেই অপরাপর সকল আশীর্বাদ দেশের উপর আপনা আপনি বর্ষিত হইবে, একথা মানিয়া লওয়া চলে না।

শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর করনীতির প্রভাব বিবেচনা করিতে হইবে। দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আসল আয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলনা করিয়া উন্নয়নমূলক ও কল্যাণকর কার্যসূচীর মধ্যে সরকারী ব্যয় বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। অনেক সময় আসল আয়-বৃদ্ধির এই লক্ষ্য এবং পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিতে পারে। যে-নীতিতে সর্বাধিক কর্মসংস্থান ঘটে, ঠিক সেই নীতিতে আসল আয় সর্বাধিক না হইতে পারে, অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বোত্তম হার না-ও পাওয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, কেহ কেহ সমাজের মোট উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে বৃদ্ধিকেই একমাত্র লক্ষ্য মনে করেন না, ব্যক্তিগত মালিকানাক্ষেত্রের প্রসারকেই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিতে চান। এই লক্ষ্য অনুযায়ী করহার কমানো এবং ব্যবসায়ীদের অধিকতর অনুবিধা দানের নীতিকে সরকারী কল্যাণমূলক কার্যসূচী অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পঞ্চমত, অনেকে আবার ইহার ঠিক বিপরীত, পরিকল্পিত কল্যাণ-বৃদ্ধিকেই (planned welfare approach) প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। যেমন লর্ড বিভারিজ্‌ (Beveridge) মনে করেন যে, অভাব, ব্যাধি, অশিক্ষা ও দারিদ্র্য দূর করার জন্য দেশের সকল বিনিয়োগের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা খুবই প্রয়োজনীয় - ইহাই সরকারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য। ষষ্ঠত, আর একটি অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হইল আয়ে অধিকতর সমতা আনা। উৎপাদন-বৃদ্ধি বা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নয়, সমতার খাতিরেই আয়-বৈষম্য দূর করিতে হইবে, ইহাই অনেকে লক্ষ্য হিসাবে সম্মুখে রাখিতে চান। এই লক্ষ্যের সহিত অপরাপর অনেক লক্ষ্যের বিরোধ আছে বলা হয়, যেমন আয়-বৈষম্য হ্রাস করিলে ধনীদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা এবং শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার স্তর উভয়ই কমিয়া যাইতে পারে। সর্বশেষে, দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের স্থায়িত্ব বজায় রাখাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ নৈতিক লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

৪। ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার
৫। পরিকল্পিত কল্যাণ বৃদ্ধি
৬। আয়-সমতা আনা
৭। স্থায়িত্ব বজায় রাখা

উপরে আলোচিত এই সকল বহু বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্যসমূহকে অধ্যাপক মাসগ্রেভ (Musgrave) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। কোন দেশের ফিস্‌কাল দপ্তরের মধ্যে তিনটি শাখা কল্পনা করিয়া লইয়া এক এক শ্রেণীর কাজকর্ম এক একটি শাখার দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া তিনি মনে করিয়া

লইয়াছেন। এই তিনটি শাখা হইল 'উপকরণ-বিন্যাস শাখা' (Allocation Branch), 'বণ্টনের শাখা' (Distribution Branch), এবং 'স্থায়িত্ব রক্ষণের শাখা' (Stabilization Branch)। এই সকল শাখা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য করিবে বটে, কিন্তু একে অন্যের কাজ ব্যাহত করিবে না, পারস্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবে।* প্রতিটি শাখা নিজ নিজ লক্ষ্য অনুসারে সেই শাখার নিজ কাজকর্মের পরিকল্পনা করিবে, এই সময় সে ধরিয়া লইবে যেন অন্যান্য শাখাও নিজ নিজ লক্ষ্য অনুসারে কাজ করিতেছে। প্রতিটি শাখার এইরূপ পৃথক পরিকল্পনাগুলি লইয়া জাতীয় বাজেট রচিত হইবে, সরকারী কর ও ব্যয়নীতি, অর্থাৎ রাষ্ট্রের ফিস্‌কাল নীতি এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-পরিকল্পনাগুলির সম্মিলিত প্রকাশ। সুতরাং তাঁহাদের মতে আদর্শ ফিস্‌কাল নীতি এই তিনটি শাখার পৃথক পৃথক লক্ষ্যের মধ্যে সর্বোত্তম সামঞ্জস্য সাধন করিবে: সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ-বিন্যাস, আয় ও সম্পদের বণ্টন এবং স্থায়িত্ব-সাধন, এই তিনটি লক্ষ্যই উপযুক্তভাবে রক্ষিত হইবে।

সর্বশেষে, আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। কেইন্‌সীয় তত্ত্বের উদ্ভব হয় গভীর বাণিজ্যসংকটের পরিবেশ হইতে, তাই আধুনিক কালের ফিস্‌কাল নীতি উপরের ঐ তিনটি শাখার মধ্যে তৃতীয়টিকে তুলনামূলকভাবে অধিকতর গুরুত্ব দেয়, অর্থাৎ স্থায়িত্বরক্ষাকে মূল লক্ষ্য বলিয়া মনে করে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে স্থায়িত্বরক্ষণ বলিলে বুঝা যায় দামস্তর স্থির রাখা এবং পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় রাখা। দামস্তর স্থির রাখার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। ইহাতে সহসা পরিবর্তন হইলে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর দামে পরিবর্তন আসে, আয়-বণ্টনের কাঠামো বদল হইয়া যায়। সমাজের অর্থনৈতিক দেহে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দেখা দেয়, সকল দ্রব্যের দাম সমান হারে পরিবর্তন হয় না বলিয়া

*"The responsibilities of the Fiscal Department in our imaginary state are derived from a multiplicity of objectives. For present purposes these are grouped under three headings: The use of fiscal instruments to (1) secure adjustments in the allocation of resources; (2) secure adjustments in the distribution of income and wealth; and (3) secure economic stabilization ....Let us now think of each of these functions as being performed by a particular branch of our imaginary Fiscal Department. These branches may be referred to respectively as the Allocation, Distribution and Stabilization Branches." Musgrave, *The theory of Public Finance*, P. 5.

উপকরণের নিয়োগ-বিন্যাসও পাল্টাইয়া যায়।* পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় রাখার পক্ষেও যুক্তি কম নাই। সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করা—সকল উদ্দেশ্যেই ইহা প্রয়োজন। এই দুইটি লক্ষ্যের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা অনেক সময়েই দেখা দিতে পারে, কিন্তু এই দুইটিই বাঞ্ছনীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে ফিস্‌কাল নীতির লক্ষ্য হিসাবে সাধারণত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিকাশ বা ক্রমবৃদ্ধিকে (economic growth) অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। সকল দেশেই অবশ্য স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধিকে লক্ষ্য হিসাবে ধরা হয়, (কারণ সমাজকে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে স্থির রাখিতে হইলেই কিছুটা ক্রমবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়); তাহা হইলেও দেশের অবস্থা অনুযায়ী এক এক দেশে ইহাদের তুলনামূলক গুরুত্ব পৃথক থাকে। দেশটি দরিদ্র ও অনুন্নত, জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে—এই অবস্থায় সে স্বভাবতই ক্রমবৃদ্ধির উপর জোর দিবে বেশি। অবশ্য স্থায়িত্বরক্ষণের দায়িত্ব তখনও তাহাকে মনে রাখিতে হইবে, উহাকে অবহেলা করিলে চলিবে না। যেমন আমরা জানি যে, উন্নয়নের যাত্রাপথে মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে লোকের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়িবে, কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ততটা দ্রুত বৃদ্ধি না পাওয়ায় মুদ্রাস্ফীতির চাপ দেখা দিতে থাকে। মুদ্রাস্ফীতির এই ব্যবধান (inflationary gap) সংকুচিত করার জন্য এই দেশের সরকারকে নিশ্চয় কর এবং ঋণের সাহায্যে বর্ধিত আয়ের এক অংশ তুলিয়া লইতে লইবে। তাহা না হইলে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট ও আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতি দেশে অর্থনৈতিক দায়িত্বে বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে। সুতরাং সকল দেশেই, ফিস্‌কাল নীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে আমরা বর্তমান কালে, অন্যান্য লক্ষ্যকে বাদ দিয়া স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে পারি; অবশ্য কোন দেশের বিশেষ অবস্থায় সাময়িকভাবে

*"The objective of price-level stability needs no lengthy defense. To be sure, there are times when some increase in price-level may be desirable to induce entrepreneurial optimism, or a more substantial rise may be needed to speed up transition to a war economy; and there are other times when a decline in price level may be useful, for example, in order to adjust to world markets, to release an excessive margin of profits, or to pass on technological gains where rising money wages cannot be secured. Short of these special situaions, price level stability is desirable............Similarly, we may take it for granted that the objective of full employment is desriable." Musgrave, *Public Finance*, P 406.

ইহাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কোন একটিকে সেই দেশ অপরটির তুলনায় প্রধান স্থান দিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।*

ফিস্‌কাল নীতির কৌশল : ফিস্‌কাল নীতি ও জাতীয় আয় (The mechanics of Fiscal Policy : Fiscal Policy and National Income) :

সরকারের অর্থনৈতিক যে-কোন লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে দেশের জাতীয় আয় বাড়ানো বা কমানো দরকার হয়, অর্থাৎ জাতীয় আয়ের পরিমাণে নিজের ইচ্ছামত উঠানামা ঘটানো প্রয়োজন হয়। সরকারের কর ও ব্যয় কমাইয়া বা বাড়াইয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণে নিজের পছন্দমত পরিবর্তন কিরূপে আনা চলে? ইহা আলোচনা করিতে হইলে আমাদের জাতীয় আয় নির্ধারণের আলোচনা স্মরণ করা দরকার। জাতীয় আয় গঠনকারী অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ অথবা ইহার নিরূপণকারী শক্তিসমূহ স্পষ্টভাবে জানিতে না পারিলে কিরূপে আমরা ইহার উপর সরকারী আয়-ব্যয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করিতে পারিব?

আমরা জানি যে, কোন দেশের জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর নির্ভর করে কার্যকরী চাহিদার উপর এবং এই কার্যকরী চাহিদা সামগ্রিক ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল। দেশের এই সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ (aggregate expenditure) যদি তত বেশি না হয় যাহাতে নিয়োগযোগ্য সকল উপকরণের কর্মসংস্থান সম্ভবপর, তবে রাষ্ট্রকে এই সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিতে হইবে যাহাতে দেশের অর্থনৈতিক সংকট দূর হয় এবং আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়ে। অর্থাৎ সমাজকে পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে থাকিতে হইলে যে-পরিমাণ সামগ্রিক ব্যয় হওয়া দরকার উহা অপেক্ষা কম হইলে এই ব্যয়ের ব্যবধানটুকু রাষ্ট্র নিজে পূরণ করিবে, অথবা এমন নীতি গ্রহণ করিবে যাহাতে সমাজের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

*"Now that Fiscal policy has been developed as an established economic function of Government, every country is anxious to gear its public finances in pursuit of the twin aims of stability and growth ; but their relative importance is very differently regarded from one country to another............ The two aspects are, however, inextricably linked. A steady rate of expansion will tend to reduce the violence of such fluctuations as occur ; a successful full-empolyment policy will provide an atmosphere which is congenial for growth." Mrs. Hicks, *Public Finance*, P. 270-271.

কোন সমাজের সামগ্রিক ব্যয় (E) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া গঠিত :

1. ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (C).
2. ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় (I).
3. কর-আদায় হইতে প্রাপ্ত টাকার সরকারী ব্যয় (R).
4. ঋণ হইতে প্রাপ্ত টাকার সরকারী ব্যয় (L).
5. বৈদেশিক-বাণিজ্যের ব্যালান্স (B), ইহা ধনাত্মক বা যোগসূচক হইতে পারে (আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি হইলে), অথবা ঋণাত্মক বা বিয়োগ সূচক হইতে পারে (রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হইলে)।

সমাজের সামগ্রিক ব্যয় অর্থাৎ $E=C+I+R+L\pm B$. পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের সামগ্রিক ব্যয়কে F ধরিয়া লইলে আমরা বলিতে পারি যে, সমাজে $E=F$ থাকিলে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে। E যদি F হইতে বেশি হয়, তবে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িতে থাকিবে, মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। আবার E যদি F হইতে কম হয়, তবে সমাজে অপূর্ণ নিয়োগ থাকিবে, পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে সমাজ পৌছিবে না। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের কাজ হইবে এমন নীতি অবলম্বন করা যাহাতে $E=F$ হইতে পারে। এই ভারসাম্যের স্তরে সমাজকে রক্ষা করাই ফিসকাল নীতির দায়িত্ব।*

সরকারের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি (Monetary policy) এই কাজ করিতে পারে না বলিয়া ধনবিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। মনে কর, আমরা অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে আছি, এবং এই অবস্থায় টাকার যোগান বাড়ানো হইল। লোকের সম্পত্তি-ধারণ-কাঠামো (asset-structure) সমান ধরিয়া লইলে, অর্থাৎ তাহাদের নগদ-পছন্দ অপরিবর্তিত আছে ধরিয়া লইলে ইহার ফলে সুদের হার কমিবে এবং বিনিয়োগ বাড়াইয়া তুলিবে। কিন্তু (কেইন্সীয় তত্ত্বানুযায়ী) সুদের হার কমিবার সীমা আছে, একটি নির্দিষ্ট স্তরের পরে সুদের হার আর কমে না (নগদ-পছন্দ রেখা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হইয়া

আর্থিক নীতি নিরুপায় কেন

* ক্লাসিকাল মডেলে আমরা পূর্ণকর্মসংস্থান ধরিয়া লই, তাহাদের ধারণায় সমাজে সর্বদাই $E=F$ বজায় থাকে। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদনের পরিমাণ আর বাড়ানো যায় না, কারণ সকল উপকরণের পূর্ণ নিয়োগ আমরা ধরিয়া লইয়াছি। টাকার পরিমাণে বৃদ্ধির সবটাই লেনদেনের খাতে চলিয়া যায়, অর্থাৎ লেনদেনের উদ্দেশ্যে লোকেরা এখন পূর্বাপেক্ষা বেশি টাকা খরচ করিতে চায়। টাকার প্রচলন বেগ (বা V) সমান ধরিয়া লওয়া হয়, তাই ইহা সরাসরি E-র পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে। দামস্তর বৃদ্ধি পায়, অর্থের পরিমাণতত্ত্ব কার্যকরী হইতে থাকে।

উঠে), এই সীমার পরে টাকার পরিমাণ বাড়িলে আর সুদের হার কমে না, বিনিয়োগ ও আয়স্তর বাড়ে না। আর্থিক নীতির ইহাই সীমা, এইখানে সে অসহায়, তাহার কার্যকারিতা আর নাই। এই অবস্থাতেই ফিস্‌কাল নীতির গুরুত্ব।*

জাতীয় আয়ের উপর ফিস্‌কাল নীতির প্রভাব আমরা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করিতে পারি। সরলভাবে বুঝাইবার জন্য আমরা দুইটি অনুমান মানিয়া লইব: (১) কর ও ব্যয়ের ফলে সমাজের আয়-বণ্টনে এখন কোন পরিবর্তন আসিতেছে না, এবং (২) ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা ও ফার্মগুলির বিনিয়োগের ক্ষমতা ও ইচ্ছা সরকারী নীতি-নিরপেক্ষ অন্যান্য কারণের ফলে বা স্বাধীনভাবে নির্ধারিত হইতেছে। এই দুইটি অনুমান ধরিয়া লইলে আমরা কয়েকটি সূত্র গঠন করিতে পারি।

(১) করের পরিমাণ সমান অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্মের উপর সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। সরকার কর্তৃক ক্রয় করা দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্মের মূল্যের সহিত ইহার গুণক ও ত্বরকের দরুন সকল প্রভাব (repurcussion effects) যোগ করিলে জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির পরিমাণ জানিতে পারা যায়।

(২) কর-আদায়ের পরিমাণ সমান রাখিয়া সরকারী হস্তান্তর-ব্যয় বাড়াইয়া দিলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে।

(৩) সরকারী ব্যয় সমান রাখিয়া কর-আদায়ের পরিমাণ কমাইয়া দিলে লোকের হাতে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে (সরকার কর্তৃক হস্তান্তর-ব্যয় বৃদ্ধির সমান ফল হইবে)।

*"Suppose that we are in a position of under-empolyment equilibrium and that the money supply is increased. At the prevailing level of money income, the increment will be an addition to the supply of asset money. Within some limits, this may be expected to reduce interest and raise investment. In the special Keynesian case, interest cannot continue to fall forever; the liquidity preference schedule becomes infinitely elastic, thus setting a floor to the rate of interest. Once this floor is reached, further additions to the money supply will not reduce i and hence, will have no effect on I and Y. This is the characteristic case of the Keynesian model. Monetary policy is totally helpless and without bearing on either real or monetary magnitudes in the system............Fiscal policy now has its day." Musgrave, *The theory of public Finance*, P. 415.

(৪) উপরের সূত্রগুলি হইতে জানা যায় যে, সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি বা কর-আদায়ে সমপরিমাণ হ্রাস ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়ের উপর একই প্রভাব ফেলিবে।

(৫) কর আদায়ে বৃদ্ধি এবং সমপরিমাণে সরকারী হস্তান্তর-ব্যয় একে অন্যকে খণ্ডন করিবে।

(৬) দ্রব্যসামগ্রীর উপর সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি এবং ঠিক সমপরিমাণ কর-আদায়ে বৃদ্ধি পরস্পরকে খণ্ডন করিবে, ফলে কর-আদায়ের পরে ব্যক্তির হাতে আয় ও ব্যয় অপরিবর্তিত থাকিবে।

সাধারণ সূত্রগুলি আলোচনার পরে আমরা এখন পূর্বের অনুমান দুইটি একে একে অপসারণ করিব। আজকাল সকল দেশেই কর-কাঠামো এমন ভাবে রচিত যাহাতে আয়-বৈষম্য হ্রাস পায়, সরকারী ব্যয়ের প্রভাব সমতার দিকে আরও অধিক পরিমাণে ঝোঁকে। সরকারী ব্যয়ের মধ্যে নির্মাণ কার্য (Public works) প্রভৃতির দরুন ব্যয়ের ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সকলেরই আয় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বেকার ভাতা, বার্ধক্য ভাতা প্রভৃতি ব্যয়ের দরুন নিম্ন-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয় অনেক বেশি পরিমাণে বাড়ে। যদি উদ্যোক্তা বা ফার্মের উপর কর-হার খুব বেশি বৃদ্ধি পায়, তবে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-ব্যয় হ্রাস পায়, আবার ইহাদের উপর করের পরিমাণ কমিলে সমাজে এই বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়ে। সরকারী বিনিয়োগ কখনও কখনও ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমাইয়া দেয়, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই বাহ্য ব্যয়-সংকোচের সুবিধা (external economies) বাড়াইয়া দেয় বলিয়া ব্যক্তিগত বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটায়। কম সরকারী ব্যয় করিয়া জাতীয় আয় যদি খুব বেশি বাড়ানো যায়, তবে তাহাই সবচেয়ে ভাল। ইহা অবশ্য নির্ভর করে গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফলাফলের উপর।

স্বল্পকালীন: পূরণমূলক বা চক্রবিরোধী ফিস্‌কাল নীতি (Short run : Compensatory or Contra-cyclical Fiscal Policy)*

আধুনিক কালে শিল্পোন্নত দেশসমূহে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানে সুতীব্র উঠানামা দেখা গিয়াছে, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির সাহায্যে ভারসাম্য-স্তর হইতে সামগ্রিক আয়ের এই বিচ্যুতি রোধ করা সম্ভব হয় নাই। তাই ফিস্‌কাল

---

*আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ফিস্‌কাল নীতিকে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন দুই দিক হইতে বিশ্লেষণ করিব। দীর্ঘকালে আমাদের লক্ষ্য হইল ভারসাম্যের জাতীয় আয় (F) বজায় রাখা। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, টেকনিকাল জ্ঞানের বৃদ্ধি, মূলধন গঠনের পরিমাণ, দীর্ঘকালীন ভোগ ও বিনিয়োগ-প্রবণতার এই সকল বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেশকে পূর্ণ কর্মসংস্থানস্তরে গতিশীল রাখা এই ভারসাম্যস্তরের জাতীয় আয়ের দায়িত্ব। এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধি (economic growth) সরকারী ফিস্‌কাল নীতির সাহায্যে প্রভাবিত হইতে পারে। জাতীয়

নীতির গুরুত্ব বাড়িয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই নীতির কাজই হইল দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ভারসাম্য বজায় রাখা ; "it uses public finance as a balancing factor in the development of the economy." জাতীয় আয় নির্ধারণকারী শক্তি-সমূহ কি কি তাহার সম্বন্ধে আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়াছে, কেইন্‌সীয় তত্ত্ব হইতে আমরা এই শিক্ষা পাইয়াছি। শুধু তাহাই নহে। রাশিবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, জাতীয় আয় গঠনকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রতিটি দেশে বাস্তব জ্ঞান ও সরকারী হিসাব গ্রহণ-ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে। অর্থ-নৈতিক দেহের গ্রন্থিগুলির পরিমাণগত পরিমাপ এবং পরস্পর-নির্ভরশীল গতিশীল সম্পর্ক লোকচক্ষুর সম্মুখে পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত উভয় দিক হইতেই তাই ফিসকাল নীতি কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বল্পকালীন জাতীয় আয়ে উঠানামা রোধ করার কাজে ফিস্‌কাল নীতির কর্মকৌশল আমরা দুই দিক হইতে আলোচনা করিব, সরকারী আয়ের দিক হইতে (from revenue side) এবং সরকারী ব্যয়ের দিক হইতে (from expenditure side)।

ফিসকাল নীতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি : জাতীয় আয় সম্পর্কে তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত জ্ঞানের প্রসার

পূরণমূলক ফিস্‌কাল নীতির কৌশল বা হাতিয়ারগুলি (instruments of compensatory finance) প্রথমে আলোচনা করা যাউক। আমরা ইহাদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। কতকগুলি হইল সরকারী আর্থিক কাঠামোর অঙ্গ-লগ্ন (built-in to the system of puplic finance), ইহাদের অনেক সময় স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্বসাধকও বলা হয় (automatic stabilizers)। আবার, কতকগুলির কার্যকারিতা নির্ভর করে সরকারী সিদ্ধান্তের উপর। ইহাদের মধ্যে প্রথমশ্রেণীর নীতিসমূহ, অর্থাৎ বাজেটের অঙ্গ-লগ্ন নীতিসমূহের দুইটি সুবিধা পাওয়া যায় ; (১) ভারসাম্যের আয়স্তর হইতে কোন বিচ্যুতি দেখা দিলে এইগুলি তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয়, কোন সময়ক্ষেপ হয় না, এবং

আয় ও কর্মসংস্থানের স্তরে স্বল্পকালে যে তীব্র উঠানামা হয়, যাহাকে আমরা বাণিজ্যচক্র বলি, তাহা রোধ করার জন্য, আজকাল পূরণমূলক ব্যয়ের নীতি গ্রহণ করা হয়। তাই ইহাকে চক্রবিরোধী ফিস্‌কাল নীতিও বলা হয় (contra-cyclical Fiscal policy)। আবার, স্বল্পকালীন বিশ্লেষণে আমরা দেখিব, কোন দেশের জাতীয় আয় এই ভারসাম্য স্তরের উপরে নীচে উঠানামা করে, এই ভারসাম্যের স্তর হইতে প্রকৃত জাতীয় আয়ে বিচ্যুতি ঘটে। ইহা দূর করাই স্বল্পকালীন ফিস্‌কাল নীতির কাজ।

(২) ইহাদের জন্য কাহারও কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দরকার হয় না। এই ধরনের পদ্ধতিসমূহ আপনাআপনি বাণিজ্যচক্রের বিরোধীশক্তি হিসাবে কাজ করে। দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে থাকিলে ইহারা নিজেদের স্বাভাবিক রীতিতেই আয় বাড়ায় ও ব্যয় কমায়, মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ কমাইতে সাহায্য করে। আবার অবনতি ও সংকটের সূত্রপাত হইলে এই সকল উৎস স্বাভাবিক-ভাবেই আয় কমায় ও ব্যয় বাড়ায়, সংকটের গভীরতা হ্রাস করে। ইহাদের কাজ অনেকটা তাপমাত্রা-রক্ষণ যন্ত্রের মত (in the manner of thermostat), আকাংখিত তাপমাত্রা রক্ষা করিবার জন্য যে-কোন প্রকার তাপ-বিচ্যুতিকে ইহা বাধা দেয়।

এইরূপ দুইটি বিষয়ের কথা সহজেই উল্লেখ করা চলে। প্রথমত ক্রম-বর্ধনশীল হারের আয়কর। দেশে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বাড়িতে থাকিলে এই উৎস হইতে সরকারী আয় বৃদ্ধি পায়, আবার ব্যবসায়-অবনতি ও সংকটের সময়ে এই উৎস হইতে সরকারী আয় কমিয়া যায়। দ্বিতীয়ত, বেকার-ভাতা।

অঙ্গলগ্ন বিষয়গুলির উদাহরণ : কিরূপে তাহারা কাজ করে

অবনতি ও সংকটের অবস্থা শুরু হইলে দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়িতে থাকে, সরকারী কোষাগার হইতে বেশি টাকাই এই খাতে ব্যয় হইতে থাকে, সংকট-নিরোধক শক্তি হিসাবে কাজ করে। আবার সমৃদ্ধির যুগ পার হইয়া অতিস্ফীতির যুগে পৌঁছিলে বেকারের সংখ্যা কমে, এই খাতে সরকারী ব্যয় আপনাআপনি হ্রাস পাইতে থাকে, বেকারি-বীমা সংস্থায় অর্থমজুতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।*

এইরূপ স্বয়ংক্রিয় কৌশলগুলির প্রধান ত্রুটি হইল ইহাদের দুর্বলতা ; সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে যে-নীতি গৃহীত হয় উহাদের কার্যকারিতা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি সবল।† বিশেষ ধরনের অবস্থা অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার সরকারী সিদ্ধান্ত ফিস্‌কাল নীতির কার্যকারিতা অনেকখানি বাড়াইতে

পূরণমূলক কর ও ব্যয় নীতি

পারে, খুব মৃদু ও হাল্কা ধরনের বিচ্যুতি ছাড়া এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিগুলি কার্যকরী হয় না। শক্তিশালী নীতি-গুলির মধ্যে দেখা যায় যে, মুদ্রাস্ফীতির যুগে পূরণমূলক কর নীতি (Compensatory Tax Policy) অধিকতর সক্রিয়, আবার

*আরও একটি উৎস উল্লেখ করা যাইতে পারে। "Another, which is not so easily recognised as such, is the practice of reckoning the depreciation on fixed assets and stocks for these purposes on the original costs of the equipment or of the longest held stocks respectively. In times of rising prices this practice results in taxing more than true profits while as prices fall tax-liability is less than true profits." Mrs. Hicks, *Public Finance*. P. 277.

† Taylor, *The Economics of public Finance*, P 589.

অবনতি ও সংকটের যুগে পূরণমূলক ব্যয়নীতির (Compensatory Spending Policy) সাফল্য বেশি। অবনতির যুগে করহ্রাস এবং সমৃদ্ধির যুগে ব্যয়-হ্রাস ততটা কার্যকরী হয় না।

মুদ্রাস্ফীতি রোধের কার্যে কোন্ ধরনের কর অধিকতর সাফল্যলাভ করিবে তাহা নির্ভর করে মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও গভীরতার উপর। যেমন, যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি রোধের কাজে মূলধনী-লেভি বা মৃত্যুকর ততটা দ্রুত কার্যকরী হয় না, কারণ এই ধরনের কর সমাজের চল্তি উপকরণকে তৎক্ষণাৎ সরাইয়া আনিতে পারে না। জিনিসপত্রের আমদানি কম, বিক্রয়-করও তাই খুব বেশি কার্যকরী নয়। তাই আয় ও মুনাফাকরের উপরই ভরসা বেশি। রেশনিং-বহির্ভূত দুষ্প্রাপ্য জিনিসগুলির উপরে উচ্চহারে ক্রয়-কর বসাইলে লোকে কিছুটা কম কিনিতে পারে। তবে, এই সময়, সাধারণত, কর বসাইয়া ভোগ বা বিনিয়োগ কিছুই কমানো যায় না, প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি (direct controls) প্রয়োগ করিতে হয়। আজকাল অবশ্য ভোগব্যয় কমাইবার জন্য অনেকে ব্যয় কর (expenditure tax) আরোপ করার প্রস্তাব তুলিয়াছেন, তাঁহাদের মতে ইহার মুদ্রাস্ফীতি-নিরোধক শক্তি খুবই বেশি।

মুদ্রাস্ফীতির যুগে করনীতি কতটা কার্যকরী

সংকট বা অবনতির যুগে কার্যকরী চাহিদা (effective demand) বাড়ানোই মূল কথা, করের সাহায্যে ইহা মোটেই সম্ভব নয়। যেমন, আয়-কর কমাইলে লোকের হাতে যে-টাকা বাঁচিয়া যায় তাহা দিয়া ভোগ-ব্যয় বাড়ে বলিয়া মনে হয় না আর, ব্যবসায়ীরাও আয়-কর কমাইলেই বিনিয়োগ বাড়াইবার উপযুক্ত আস্থা ফিরিয়া পায় না। একমাত্র বিক্রয়-কর বা ক্রয়-কর কমাইলে ভোগব্যয় বাড়িবার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। অর্থনৈতিক সংকট দূর করিয়া উন্নতির (recovery) কথা চিন্তা করিতে হইলে সরকারী ব্যয়ের দিক হইতেই আক্রমণ শুরু করা ভাল।

সংকটকালে ততটা নয়

অবনতির (depression) সময়ে, দেশে যখন কর্মসংস্থান ও আয়স্তর খুব কম থাকে সেই অবস্থায়, সরকারী ব্যয় বাড়ানো অনেকটা সফল হইতে পারে। শিল্পোন্নত দেশসমূহে, মোটামুটি তিন ধরনের বেকারি দেখা যায়: সংঘাতজনিত, বাণিজ্যচক্রজনিত এবং সুদীর্ঘকালীন (Frictional, Cyclical and Secular)। ইহাদের দূর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। যেমন সংঘাতজনিত বেকারি দূর করার উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থান-বিনিময়কেন্দ্র (employment

অবনতির যুগে ব্যয়নীতি অধিকতর কার্যকরী

exchanges) স্থাপন করা প্রয়োজন। ইহা শাসনতান্ত্রিক নীতির অন্তর্গত (adminstrative policies)। দীর্ঘকালীন বেকারি দূর করার উপায় হইল কলকারখানা গড়িয়া তোলা, বেসরকারী বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো, ব্যবসায়ীদের ঋণ দেওয়া, করভার কমানো, দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে কারখানা স্থাপনে ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেওয়া। তাহা ছাড়া, ইহা মোটামুটি দীর্ঘকালীন ফিস্‌কাল নীতির অন্তর্গত। বাণিজ্যচক্রকালীন বেকারিই শিল্পোন্নত দেশের প্রধান সমস্যা। ইহা দূর করার জন্য সরকারী ব্যয়ের দিক হইতে প্রধান নীতি হইল সরকারী নির্মাণ-কার্যসূচীর প্রসার (expansion of Public works programmes)। রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল পার্ক, সরোবর—এই সকল নির্মাণে সরকারী ব্যয় প্রত্যক্ষভাবে লোকের কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ দেয়। ইহাদের দরুন বেসরকারী বিনিয়োগের বাহ্য ব্যয়সংকোচের সুবিধা (external economies) বৃদ্ধি পায় ; তাহা ছাড়া, গুণক ও ত্বরণের দরুণ এই সরকারী ব্যয় অল্পকালের মধ্যে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে। ইহাই পূরণ-মূলক ব্যয়ের নীতি।

বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারির বিরুদ্ধে আক্রমণে সাফল্যের মূল কৌশল হইল দ্রুততা। কার্যকরী চাহিদায় তীব্র হ্রাস কোনমতে অতিক্রুত ঠেকাইতে পারিলেই সাফল্য সম্ভবপর। সরকারী নির্মাণ কার্যের বাধা বা কালক্ষয় (obstacles and delays) তিন দিক হইতে দেখা দিতে পারে। প্রথমত, ঠিক সময়মত ইহা শুরু করা দরকার। রোগ নির্ণয়ে দেরি হইলে বা ভুল হইলে রোগীর অবস্থা খারাপের দিকেই যাইবে। ঠিক কখন, কোন্ অঞ্চলে কতটা এবং ঠিক কোন্ ধরনের ব্যয় শুরু করা দরকার সেই বিষয়ে বাঁধা-ধরা নীতি অপেক্ষা বাস্তব অভিজ্ঞতাই বড় কথা। সিদ্ধান্ত করার পরেও প্রতিটি কার্য-সূচীর খুঁটিনাটি পরিকল্পনা রচনা করা দরকার, ইহাতে বেশ কালক্ষেপ হয়। দ্বিতীয়ত, কণ্ট্রাক্ট দেওয়ার ব্যাপারেও প্রচুর সময় অতিবাহিত হয়, জমি কেনার ব্যাপার থাকিলে আরও বেশি সময় লাগে। তৃতীয়ত, বেশির ভাগ নির্মাণ-কার্যেই উপকরণের চাহিদা শুরু হইতে বেশ কিছুটা সময় যায়, কয়েক মাস কাটিয়া যাওয়ার পরে উপকরণ ও শ্রমিকের চাহিদা সর্বাধিক পরিমাণে দেখা দেয়। সর্বোপরি, যদিও তত্ত্বের দিক হইতে বলা সহজ যে, উন্নতি শুরু হইলে এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় সমৃদ্ধি দেখা দিলে এই নির্মাণকার্য

কিন্তু ইহার অসুবিধা কম নয়

গুটাইয়া ফেলিতে হইবে, কিন্তু বাস্তবে চল্‌তি নির্মাণকার্য হঠাৎ থামাইয়া দেওয়া চলে না। এইরূপ অবিবেচক কার্যের দরুন সমৃদ্ধি স্থায়ী হইয়া না অকালে অবনতি শুরু হইয়া যাইতে পারে।

ফিস্‌কাল নীতির সমালোচনা ও সীমাবদ্ধতা (Criticisms and qualifications to Fiscal Policy)

আধুনিককালে ফিস্‌কাল নীতির গুরুত্ব খুবই বাড়িয়া গিয়াছে এবং সকল দেশের সরকারই ক্রমশ বেশি পরিমাণে ইহার সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব (economic stabilization) বজায় রাখার চেষ্টা করিতেছেন। এই অবস্থায় এই নীতির সীমাবদ্ধতা জানা দরকার এবং ইহা কার্যকরী করার অন্যান্য শর্ত কিরূপ তাহাও আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমত, ফিস্‌কাল নীতির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া ভারসাম্যের বিচ্যুতি রোধ করার চেষ্টা চলিতে থাকিলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মূলগত দোষ ত্রুটি ও অসামঞ্জস্য অনেক সময় চাপা থাকে। অর্থনৈতিক দেহের সংস্কার ও কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার, কিন্তু ফিস্‌কাল নীতির মলম দ্বারা বৃহত্তর পরিবর্তন রোধের প্রয়োজনীয়তা এড়াইয়া চলা ভাল নয়। যেমন, একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা কৃত্রিমভাবে দাম বাড়াইয়া রাখিয়াছে, অথবা একচেটিয়া শ্রমিক সংঘ তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা হইতে কৃত্রিমভাবে অনেক বেশি মজুরির হার বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক দেহে তাহাদের ক্ষমতা কমানোই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া লোকের হাতে কৃত্রিমভাবে টাকা ঢালিয়া দিয়া এই প্রয়োজনীয় কাজে অবহেলা করা হইতেছে, এইরূপ ঘটিতে পারে।* দ্বিতীয়ত, ফিস্‌কাল নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহার ফলে দেশে প্রচুর পরিমাণ সরকারী ঋণ দেখা দিবে। অধিক পরিমাণ সরকারী ঋণ থাকিলে দেশের আয়-বৈষম্য বাড়িয়াই চলিবে, কারণ এই ঋণের সুদ হিসাবে সমাজের অধিকাংশ লোকের হাত হইতে কর তুলিয়া সরকারী ঋণপত্রের মালিক কতিপয় ধনী ব্যক্তিকে নিয়মিত পরিশোধ করিতে হইবে। তৃতীয়ত,

ফিস্‌কাল নীতির সমালোচনা

*"Reliance on fiscal policy perpetuates maladjustments and may obscure the need for economic reforms. For instance, public investment in times of depression may prevent reduction of construction costs which may be used to offset the ill effects of monopolistic action and consequently remove pressure to go to the source of the trouble." Arthur Smithies, *A Survey of contemporary Economics*, P 177.

অনেকে বলেন যে, বাৎসরিক বাজেটে সমতা প্রতিষ্ঠা করার এই নীতি লঙ্ঘন করা শুরু হইলে সরকারী অপব্যয় ও অতিব্যয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। চতুর্থত, ইহাও বলা হয় যে, ফিস্‌কাল নীতির উপর নির্ভরশীলতা এইরূপ বাড়াইয়া দেওয়ার ফলে অন্যান্য উপায়গুলির গুরুত্ব অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। আমেরিকার কমিটি অব্‌ ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট-এর গবেষণা-বিভাগের ধনবিজ্ঞানীদের মতে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সাধনের কার্যসূচীতে আর্থিক নীতি ও সরকারী ঋণ পরিচালনার নীতি অনেক বেশি সক্রিয় হওয়ার সুযোগ আছে। পঞ্চমত, পূরণমূলক ফিস্‌কাল নীতির বিরুদ্ধে বহু প্রকার রাজনৈতিক যুক্তি দেওয়া হয়। যেমন, এই নীতির দরুন সরকারের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক অনেকটা চাকুরিদাতা মালিক ও চাকুরিজীবী শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্কের ন্যায় দাঁড়াইয়া যাইবে। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হইবে, সরকারী বিনিয়োগ বাড়িবার অর্থই হইল ব্যক্তিগত বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়া। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধের জালে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার কণ্ঠরোধ হইবে, দেশে সমাজতন্ত্র দেখা দিবে।

এই সকল সমালোচনা ছাড়া আমাদের আর একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে ধনবিজ্ঞানীরা কয়েকটি শর্ত বা পরিবেশের কথা উল্লেখ করেন, যাহা বজায় থাকিলে তবেই পূরণমূলক ফিস্‌কাল নীতি পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারে। এই সকল শর্ত বা অনুকূল পরিবেশের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল প্রশাসনিক জ্ঞান ও দক্ষতা। সমাজের বিভিন্ন অংশের কাজকর্ম ও গতিবিধি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও পরিমাণগত হিসাব থাকা দরকার, রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগ ব্যবস্থায় এইজন্য উপযুক্ত সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। প্রশাসনিক দক্ষতা সততা ও গতিশীলতা থাকা দরকার, তাহা না হইলে এই নীতির পূর্ণ সাফল্য সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, ইহার জন্য দেশের জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি থাকা দরকার। বাণিজ্যচক্রের উঠানামার সহিত করের পরিমাণ ও হার কমাইতে বাড়াইতে হইলে দেশের সাধারণ আইনসভা বারবার বাধা দিতে পারে, তাঁহারা এই কাজে ততটা দক্ষ নহেন। এই উদ্দেশ্যে যোগ্য ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত কমিশন থাকা প্রয়োজন, যাঁহারা অবস্থার পরিবর্তনের দিকে সর্বদা তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিবেন এবং সেই অনুযায়ী কর ও ব্যয় কাঠামোতে উপযুক্ত পরিবর্তন আনিতে

ফিস্‌কাল নীতির সাফল্যের শর্ত

থাকিবেন। ঘন ঘন কর-পরিবর্তন করদাতাদের মনে এমন অনিশ্চয়তার মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে যে, হয়তো তাহাদের এই মনোভাবই সামাজিক অস্থায়িত্বের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তৃতীয়ত, বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিস্‌কাল নীতি সফল হইতে হইলে বাজেটের পুনর্গঠন দরকার। বাজেট-রচনার পুরাতন রীতি পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নূতন ধরনের বাজেট রচনা ও সেই বাজেট কার্যকরী করার নিয়মকানুন দেশে গড়িয়া উঠা প্রয়োজন। তাহা না হইলে এই নীতির পূর্ণ সাফল্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

বাজেট (The Budget)

বাজেট কাহাকে বলে

এক বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন-প্রকার ব্যয়ের পরিমাণ এবং উহার বিভিন্ন প্রকার আয়ের উৎস ও আয়ের পরিমাণ সম্বলিত হিসাবকে বাজেট বলা হয়। পূর্ব বৎসরের প্রকৃত আয় ছাড়াও আগামী বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব; ব্যয়ের তুলনায় আয় অধিক হইলে সেই অর্থ কি করা হইবে; আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হইলে কোন্ উৎস হইতে সেই ঘাটতি পূরণ করা হইবে, এই সকল তথ্য লইয়া বাজেট গঠিত হয়। সম্ভাব্য ব্যয় অপেক্ষা সম্ভাব্য আয় অধিক হইলে তাহাকে উদ্বৃত্ত বাজেট (Surplus budget) বলা হয়; সম্ভাব্য ব্যয় অপেক্ষা সম্ভাব্য আয় কম হইলে তাহাকে ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget) বলে; সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সমান হইলে তাহাকে সমতাসিদ্ধ (Balanced Budget) বলা চলে।

সমতাহীন বাজেট (Unbalanced Budget)

ক্লাসিকাল বাজেটীয় নীতিসমূহ

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, (ক) বাজেট সর্বদাই ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয়, অর্থাৎ ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যক্তিপ্রধান অর্থনীতি ক্ষুণ্ণ না করিয়া রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় উভয়ই খুব কম হওয়া উচিত। (খ) প্রতি বৎসর রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় সমান হওয়া দরকার, বাজেটে ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত কিছুই থাকা উচিত নয়। (গ) প্রধানত, ভোগব্যয়ের উপরই কর বসানো উচিত, সঞ্চয়ের উপর নহে, (ঘ) যদি কোন মতেই ঘাটতি এড়ানো না যায়, তবে দীর্ঘকালীন ঋণপত্র দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়, (ঙ) উৎপাদন-ক্ষম বিনিয়োগের উদ্দেশ্যেই কেবলমাত্র ঋণ গ্রহণ করা

সঙ্গত (চ) যত দ্রুত সম্ভব রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে সমাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগই পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রাখে, সুতরাং রাষ্ট্রে অধিক আয় ও ব্যয়ের চেষ্টা করিলে (ক) ব্যক্তির সঞ্চয় কমিবে, বা (খ) ব্যক্তির কর্মোদ্যোগ ও উৎপাদনের পরিমাণ কমিবে, বা (গ) মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে।

ক্লাসিকাল যুক্তিসমূহ

আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে, ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ ও কর্ম-প্রচেষ্টায় সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে নাও থাকিতে পারে অথবা এইরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে বাণিজ্যচক্রের উদ্ভব সর্বদাই ঘটিতে পারে; সুতরাং ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের নির্ধারিত এই ফিস্‌কাল নীতি গ্রহণযোগ্য নহে। তাহা ছাড়া, ১২ মাস পরে প্রত্যেক বৎসর নিয়ম করিয়া বাজেটে সমতা ঘটাইতে হইবে বা উহারই মধ্যে যে-কোন প্রকারে আয়-ব্যয়ের হিসাবগত মিলন সাধন করা দরকার এইরূপ ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ধরনের।

বাৎসরিক সমতাসাধন নিছক অজ্ঞান ও প্রথা মাত্র

উপরন্তু, বাজেটে তথাকথিক সমতা সাধনেরই বা গুরুত্ব কি, আধুনিক ধন-বিজ্ঞানিগণ এই প্রশ্ন করিয়াছেন। দেশের কর্মসংস্থান, আয়স্তর, জীবনযাত্রার মান সকল কিছুই ভারসাম্যবিহীন থাকিয়া বৎসরান্তে বাজেটে নিছক সমতা বজায় রাখাটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ—আধুনিক ধন-বিজ্ঞানিগণ তাহা স্বীকার করেন না। শুধু তাহাই নহে, বৎসরান্তে বাজেটে সমতা সাধনের নীতি বাণিজ্য-সংকট ও বাণিজ্য-সমৃদ্ধিকে তীব্রতর ও গভীরতর করিয়া তুলিতে পারে। সংকটের সময়ে রাষ্ট্রীয় আয় কম থাকায় সমতার নীতি অনুযায়ী (ক) উচ্চ-হারে কর বসাইতে হয় এবং (খ) রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমাইতে হয়—উভয়ই সঙ্কটকে তীব্রতর করে। সমৃদ্ধির যুগে (ক) রাষ্ট্রীয় ব্যয় বেশি থাকে এবং (খ) কর কমাইয়া দেওয়া হয়—উভয়ই মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইতে সাহায্য করিয়া সমৃদ্ধির অবসান ও আগামী সংকটের সম্ভাবনা বাড়াইয়া দেয়।

বাজেটে সমতা সাধনের নীতি অর্থনৈতিক যুক্তিতে গ্রহণযোগ্যও নহে

বাজেটে সমতা সাধনের প্রাচীন নীতি পরিত্যাগ না করিয়া, ইহার দোষ-ত্রুটি পরিহার করার উদ্দেশ্যে, আধুনিক কালের কতিপয় সুইডিশ ধনবিজ্ঞানী

বাণিজ্যচক্রকালীন বাজেট (Cyclical Budget) গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সমতাসিদ্ধ বাজেট গঠনের চিরাচরিত নীতি ভালই, তবে দেওয়াল-ক্যালেণ্ডারের দ্বারা বারো মাসে এক বৎসর হিসাব করিয়া উহারই মধ্যে আয় ও ব্যয় সমান না হইলেও ক্ষতি নাই। সমৃদ্ধির যুগ ও সংকটের যুগ—উভয় যুগ লইয়া যে বাণিজ্যচক্র-কাল—ইহার মধ্যে বাজেটের আয় ও ব্যয় সমান হইলেই চলিবে। সংকটের যুগে কয়েক বৎসর বাজেটে ঘাট্‌তি যাইবে, সংকট হইতে উত্তরণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যয় অধিক হইতে থাকিবে। সংকটকালের শেষে ক্রমে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমাইতে হইবে, সমৃদ্ধির যত প্রসার হইবে বাজেটে ঘাট্‌তি তত কমিবে এবং চরম-সমৃদ্ধির স্তরে পৌঁছিবার সময়ে রাষ্ট্রীয় আয় অধিক বাড়াইয়া বাজেটে উদ্বৃত্ত করিতে হইবে। সংকটের যুগের ঘাট্‌তির পরিমাণ সমৃদ্ধির যুগের উদ্বৃত্তের দ্বারা পুরাইয়া লইতে হইবে।

চক্র-কালানুযায়ী বাজেট রচনা ও চক্র-কালীন সমতা সাধন

কিন্তু চক্রকালানুযায়ী বাজেট গঠনের এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ কোথাও এখন পর্যন্ত হয় নাই, ইহার কিছু কিছু প্রয়োগ-গত অসুবিধা আছে। আগামী বাণিজ্যচক্র ঠিক কবে আসিবে ; কতদিন সমৃদ্ধি বা সংকট থাকিবে ; শুরু হইল কিনা ; ইহার তীব্রতা কিরূপ ; ঘাট্‌তি বা উদ্বৃত্তের পরিমাণ কিরূপ হওয়া উচিত ; ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের আশা-নিরাশার তীব্রতা কতখানি—এই সকল বিষয় বিচার বিবেচনা করা বাস্তবে খুবই অসুবিধাজনক। এই নীতি সফল হইতে হইলে প্রশাসনিক সংগঠন ও আর্থিক সংস্থাসমূহকে কার্যকারিতার দিক হইতে খুবই নমনীয় ও সচেতন ধরনের হইতে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বাস্তব অসুবিধাসমূহ

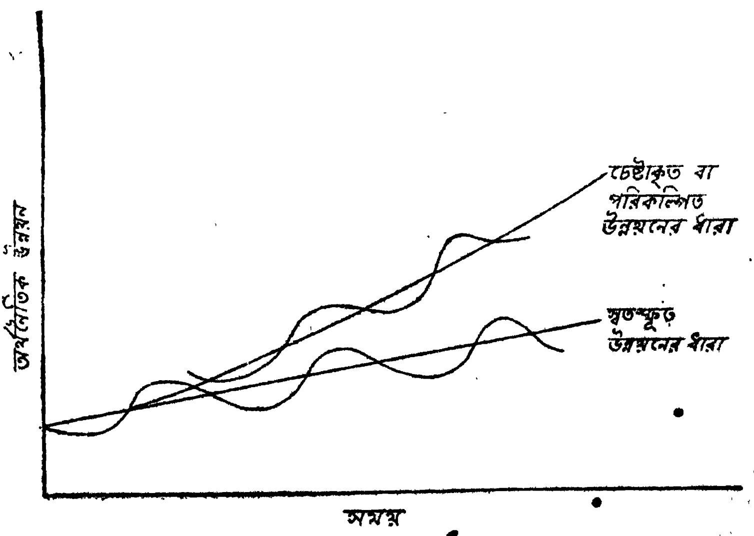
দীর্ঘকালীন ফিস্‌কাল নীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Long-run Fiscal Policy and Economic Growth)

সাধারণত, শিল্পোন্নত দেশে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রমবৃদ্ধির হার (spontaneous growth rate) মোটামুটি বেশি ; ইহারই আশে পাশে জাতীয় আয় ও কর্ম সংস্থান স্তরে স্বল্পকালীন উঠানামা ঘটে। এই বাণিজ্যচক্র রোধ করার উদ্দেশ্যে পূরণমূলক ফিস্‌কাল নীতি প্রয়োগ করা হয়। এই সকল দেশের স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধির হারকে বাড়াইবার জন্য রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের চেষ্টা এখন চলিতেছে। তবে তাহা অপেক্ষাও ভারসাম্যের আয় হইতে স্বল্পকালীন বিচ্যুতির গতিরোধ করিতে পারাই বড়

শিল্পোন্নত ও অপূর্ণোন্নত দেশে

কথা। অপরপক্ষে, অপূর্ণোন্নত দেশসমূহে, এই স্বতঃস্ফূর্ত ক্রমবৃদ্ধির হার মোটামুটি কম ; ইহার আশে-পাশে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান স্তরে স্বল্পকালীন উঠানামাও ঘটিয়া থাকে। এই স্বল্পকালীন উঠানামা রোধ করার উদ্দেশ্যে চক্রবিরোধী বা পূরণমূলক ফিস্‌কাল নীতি গ্রহণ করা দরকার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দেশে দীর্ঘকালীন ফিস্‌কাল নীতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন যাহাতে ক্রমবৃদ্ধির হার বাড়িতে পারে। স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধি (Stability and Growth) ইহারাই ফিস্‌কাল নীতির দুইটি লক্ষ্য ; কিন্তু শিল্পোন্নত দেশে স্থায়িত্বের উপর জোর বেশি, আর অপূর্ণোন্নত দেশে ক্রমবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব অধিকতর। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, এই দুইটি লক্ষ্য পরস্পরের পরিপূরক, স্থায়িত্বের অবস্থা বজায় রাখিতে পারিলে ক্রমবৃদ্ধি ঘটে, আবার ক্রমবৃদ্ধি না ঘটিলে স্থায়িত্ব দীর্ঘকাল বজায় থাকে না। নিচের চিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, স্বতঃস্ফূর্ত উন্নয়নের ধারা অল্পহারে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু চেষ্টাকৃত উন্নয়নের ধারা অধিক হারে জাতীয়

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ফিস্‌কাল নীতির লক্ষ্য



আয় ও কর্মসংস্থানকে বাড়াইতে পারে। উভয় হারের আশে পাশে চক্রকালীন উঠানামা রোধের চেষ্টা করা পূরণমূলক ফিস্‌কাল নীতির কাজ, কিন্তু দীর্ঘকালীন

স্বতঃস্ফূর্ত উন্নয়নের ধারা উপরে তুলিয়া ঐ ধারাকে অধিকতর উর্ধ্বমুখী করা দীর্ঘকালীন ফিস্‌কাল নীতির দায়িত্ব।

ফিস্‌কাল নীতির সাধারণত দুইটি অংশ, অর্থাৎ ব্যয়-নীতি ও কর-নীতি; ইহারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিরূপে সাহায্য করে আমরা তাহা আলোচনা করিব।

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানে দীর্ঘকালীন উন্নয়ন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় দুইদিক হইতে সাহায্য করে। প্রথমত, দেশের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্ত করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য রাষ্ট্র অনেক সময় "জাতীয়" বা "সামাজিক" ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্ম নিজের হাতে তুলিয়া লয়। ব্যক্তিগত শিল্পপতি ও উদ্যোক্তারা যাহাতে অধিকতর "বাহ্য ব্যয়-সংকোচের" সুবিধা (external economies) পাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ তাহাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বাড়াইবার উপযোগী অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট করিয়া তোলাই দীর্ঘকালীন সরকারী ব্যয়ের লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, সরকারী ব্যয় প্রত্যক্ষভাবে কলকারখানা স্থাপন করিয়া দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা সরাসরি বাড়াইয়া তুলিতে পারে।

ক্রমবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয়ের দুই ধরন

প্রথম ধরনের ব্যয় বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সাধারণত অপূর্ণোন্নত দেশে পথঘাট, শহর, বন্দর গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় হইতে থাকে। আর তাহা ছাড়া, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতির জন্যও রাষ্ট্র ব্যয় করিতে শুরু করে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির উপর ব্যয় এমন ধরনের হওয়া দরকার যাহাতে উহার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; কল্যাণ বৃদ্ধি ঘটিলেও উহা সরকারী ব্যয়ের প্রাথমিক লক্ষ্য নহে। এই সকল ব্যয় সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা দরকার। এই ধরনের সুদীর্ঘকালীন সমাজ-উন্নয়নমূলক স্থায়ী অর্থলগ্নী (long-term social over-head outlays) হইতে এমন দ্রুত হারে উন্নয়ন হয় না যাহাতে রাষ্ট্রের আয় দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহাদের প্রভাব অতি ধীরে ধীরে বেশ কিছুদিন পরে পরোক্ষভাবে দেখা দিতে থাকে। দ্বিতীয় ধরনের ব্যয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হইল দেশে শিল্প ও কৃষিতে দ্রুত উন্নয়নের উপযোগী মূল পরিবেশ গড়িয়া তোলা, অর্থাৎ বিদ্যুৎশক্তি, বন্যারোধ, জলসেচ, মৃত্তিকারক্ষণ প্রভৃতি কাজকর্মে ব্যয়। ইহারাও 'সমাজকল্যাণমূলক' ব্যয়ের মত, অর্থাৎ অনেককাল পরে এই ব্যয়ের

১। স্বাধীন ব্যবসায়ের পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যয়

ফলে দেশের সম্পদবৃদ্ধির ধারা শুরু হইতে পারে। উপরন্তু, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা যে-সকল শিল্পে বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহণে ইচ্ছুক নন, অথবা সমাজের অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রস্থলগুলি যাহাতে কতিপয় ব্যক্তির কুক্ষিগত হইয়া না পড়ে, এই সকল উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র সরাসরি উন্নত ধরনের যান্ত্রিক কৃষিক্ষেত্র ও কলকারখানা স্থাপন করিতে পারে। এই ধরনের সরকারী ব্যয় বেশি হওয়া ভাল, কারণ ইহাতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার দ্রুততর হয় এবং রাষ্ট্রের হাতে আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ উন্নয়নের সম্ভাবনা আরও বাড়াইয়া তোলে।

২। সরাসরি দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয়

ক্রমবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারী কর-নীতি কিভাবে সাহায্য করে এখন তাহা আলোচনা করা দরকার: অপূর্ণোন্নত দেশে ব্যক্তিদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ কম বলিয়া এই সকল দেশের ফিস্‌কাল নীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশই হইল অর্থ ও উপকরণ সংগ্রহ করা। মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় কম, সুতরাং উন্নয়নমূলক ব্যয় কেবলমাত্র করের সাহায্যে তোলা সম্ভব হয় না। উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সরকারী কর-নীতির দুই ধরনের কাজ আছে: (১) পূর্বে আলোচিত উন্নয়নমূলক সরকারী ব্যয় করার উপযোগী আয় বাড়ানো, এবং (২) উন্নয়নকালে যে অবশ্যম্ভাবী মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা। উন্নয়নমূলক ব্যয় ও দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনবৃদ্ধি—ইহাদের মধ্যে কিছুটা সময়ের ব্যবধান (time lag) দেখা দিবে, সেই সময় মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে। কিছুটা মুদ্রাস্ফীতি ভালই, উন্নয়নের রথচক্র ইহাতে মসৃণ হয়, কারণ মৃদুবর্ধনশীল দামস্তর ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি করে, ক্রমবর্ধমান সরকারী ঋণের আসল ভার লোকচক্ষুর অন্তরালে কমিতে থাকে। কিন্তু উহাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখার জন্য এই সময় সরকারী করনীতির ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুদ্রাস্ফীতি রোধের অন্যান্য পদ্ধতিগুলি, যেমন আর্থিক ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের নীতিসমূহ এইরূপ দেশে ততটা কার্যকরী নয়; তাই করনীতির প্রয়োগ আরও গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রমবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে করনীতির ব্যবহার

উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোন্ ধরনের করের উপর ভরসা করা চলে, তাহা আলোচনা করা দরকার। অপূর্ণোন্নত দেশে সাধারণত, আমদানি-শুল্কের ব্যবহার অধিক মাত্রায় ঘটে। ইহা সংগ্রহের দিক হইতে সুবিধাজনক, দেশে যাহাদের আয় বাড়িয়াছে তাহাদেরই পকেট হইতে এই টাকা আদায় হয়, এই শুল্কের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও প্রসার সম্ভবপর হয়,

ইহাতে দেশের ব্যবসায়ীরা উৎসাহ পান, বাহিরের পুঁজিপতিরাও সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার জন্য দেশের মধ্যে বিনিয়োগ করেন। রপ্তানি-শুল্কের গুরুত্বও কম নয়, বিশেষত, কৃষি-দ্রব্যের উপর রপ্তানি-শুল্ক হইতে প্রভূত আয় হয়, দেশের শিল্পোন্নয়নে সাহায্যের জন্য এই সকল কৃষি-দ্রব্যের রপ্তানি কমানোও কিছুটা দরকার।

এই সকল দেশে আয় ও মুনাফা-করের সাহায্যেও উন্নয়নের কাজ অগ্রসর করা যায়। এইরূপ অপূর্ণোন্নত দেশে ব্যক্তিগত মালিকানায় ছোট ছোট ফার্মের সংখ্যাই বেশি, তাই কোম্পানী-কর মোটামুটি আয়করেরই রূপ গ্রহণ করে। বিদেশী মালিকানার ফার্মগুলির উপর অধিক কর বসাইবার ঝোঁক খুবই বেশি দেখা দেয়। অনেক সময়, এইরূপ দেশে, কোম্পানীদের প্রথম দিকে কিছুকাল কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া চলে, এইরূপ 'কর-নিষ্কৃতিকাল' (tax-holiday) যত বেশি হইবে, ব্যক্তিগত মালিকানার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ তত বাড়িবার সম্ভাবনা। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে করনীতি অপেক্ষা সরকারী ব্যয়-নীতির কার্যকারিতা অনেক বেশি।*

অনুশীলনী

1. What is Fiscal Policy ? How it differs from Monetary policies ?
2. What are the objectives of Fiscal Policy in developed and under-developed economies ?
3. What are the economic objectives of modern states ?
4. Discuss the relationship between Fiscal policy and National Income.
5. Analyse the mechanism of Fiscal Policy.
6. Give an idea of the contra-cyclical fiscal policy,
7. What is compensatory spending ? How it works ? What are its limitations ?
8. Write short Notes on : (a) Public works programme, (b) Interest-free financing, (c) Pump-priming, (d) Automatic or Built-in Stabilisers, (e) Functional Finance.
9. Assume that a Government balances the budget every year. Can it still pursue policies which will increase total outlay ?
10. If the Government is willing to incur a deficit, would tax reduction or deficit spending be preferable if we want to increase total outlay ?
11. Discuss the role of Fiscal Policy in promoting Economic Growth.

*"......it is very doubtful how far tax concession in their own right really succeed in promoting development.........The services which the Government of a backward country can offer through its expenditure to promote development are likely in the long run to be more helpful than the taxes it refrains from collecting." Mrs. Ursula Hicks, *Public Finance*, P 808